বঙ্গবাণী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

.৫৪।৬৫

756.3
.002

৭৭৫

(ষষ্ঠ বর্ষ)—প্রথমার্দ্ধ
(ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ)
(১৩৩৩-'৩৪)

সম্পাদক
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কার্য্যাধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কার্য্যালয়—৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৪৸৹] [প্রতি সংখ্যা ৷৵৹

ষষ্ঠ বর্ষ

প্রথম ষাণ্মাসিক বর্ণানুক্রমিক

বিষয়-সূচী

ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ

১৩৩৩-'৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অঞ্জলি (কবিতা)	৪০	ইউরোপের সমাজ-[illegible]	১০৪
শ্রী[illegible]েন্দ্রনাথ [illegible]		শ্রী[illegible]	
অন্তরের দান (গল্প)	৫৩	[illegible] (গল্প)	৯০
শ্রী[illegible]		শ্রী[illegible]	
অলকা (কবিতা)	৬১১	কবির প্রতি (কবিতা)	[illegible]
শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত		শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়	
আকবর (কবিতা)	১৯০	কুল (কবিতা)	৫২
শ্রীহুমায়ুন কবির		শ্রীকালিদাস রায়	
আপন কথা	১০০, ৩০৫, ৪৫০, ৫২৯, ৬২৬	[illegible]	৩০১
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর		শ্রী[illegible]লাল দে	
আধুনিক ভারতীয় [illegible]	৫২৯	কোরক (গল্প)	৮৭
শ্রী[illegible] সেন		শ্রী[illegible]কান্ত দাস	
আমরা ও তাঁহারা	১৪৩	[illegible] (গল্প)	৬১০
শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়		শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী	
আমি কবি (কবিতা)	১৮০	[illegible] ও [illegible]	৭
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়		শ্রী[illegible]চন্দ্র মজুমদার	
[illegible]-স্মৃতি (কবিতা)	[illegible]	গজল গান	৩৪৯, ৫০০
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী		শ্রীনজরুল ইসলাম	
আষাঢ় (কবিতা)	৫৩৭	গল্প	৬৭০
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী		শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	
আসাম		গিরিশ-স্মৃতি	৩৭২, ৫২৩, ৮৩১
(১) [illegible]		শ্রীকুমুদবন্ধু সেন	
(২) [illegible]		[illegible] (কবিতা)	৬
(৩) [illegible]		শ্রীকালিদাস রায়	

বিষয়	পৃষ্ঠা
চৈত্রে	
(১) অদ্ভুত সাধন	২০০
(২) বিলাতী গাভীর বেশী মূল্য	২০৩
(৩) অনাবাদীর জমে চাষ করা চলে কিনা	২০৫
(৪) আমাদের সমাজের বিলাতী ব্যবস্থা	২০৬
(৫) বোবা ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন	২০৬
ছন্দের কথা	২৪২, ৩৮০
শ্রীকালিদাস রায়	
ছিটে-ফোঁটা	
(১) চাতুরীর কাহিনী	১০৬
(২) মর্মান্তিক	
(৩) ধনী ও ব্রহ্মজ্ঞ	১০৮
(৪) ভবিষ্যৎ ও অতীত	১৮২
(৫) মানে কি	১৮২
(৬) পারিবারিক সংস্কার	৭০২
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	
(১) ভিখারী	৭০৩
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	
ছিন্নপত্র (কবিতা)	৬১৯
শ্রীবি [illegible]চন্দ্র মজুমদার	
জরা-প্রশস্তি (কবিতা)	১২৪
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক	
জ্যৈষ্ঠে	
(১) সুভাষচন্দ্রের মুক্তি	৬৭৮
(২) ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তাগুলি সম্বন্ধে নূতন প্রস্তাব	৬৭৯
(৩) শোক-সংবাদ	৬৮০
তারপর (গল্প)	৪৪৪
শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	
তৃপ্তি (উপন্যাস)	১৪, ১২৫
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	
দশচক্র (উপন্যাস)	৭১, ১৫৩, ২৯০, ৪২৭, ৫৫৬, ৭০৪
শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়	
ধাত্রী কে ? (কবিতা)	৮৬
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	

বিষয়	পৃষ্ঠা
দিল্লীর সাহিত্য-সম্মিলন	২২০
শ্রীঅবনীনাথ রায়	
দেউলির দিনে (গল্প)	২০১
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
দেওঘর (কবিতা)	২২২
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	
ধ্বংসের মুখে বাঙ্গালার হিন্দু	৩০
শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল	
ধ্বংসের মুখে বাঙ্গালার হিন্দু (আলোচনা)	৬৬৮
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	
নতুন আলো (কবিতা)	৪৪০
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	
নদীর কুহক (গল্প)	৩৩৩
শ্রীগোপাল হালদার	
নাচগান সম্বন্ধে আপত্তির উত্তর	৬৫৪
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	
নাপোলিয়ঁ (কবিতা)	২৮৮
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	
পিছনের বন (গল্প)	১৭৪
শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
পুরাতন কাহিনি	১০০
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
পুস্তক-পরিচয়	১১৪, ২২৬, ৪৭০, ৭১৩
প্রজাপতির দৌত্য (উপন্যাস)	৩২১, ৪৪৪, ৬০৮
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	
প্রাণী ও উদ্ভিদের খাদ্য	৪৪৭
শ্রীজগদানন্দ রায়	
প্রেতনাদ	৭৬
শ্রীহৃষীকেশ সেন	
ফাল্গুনে—	
(১) ব্যবসা চলিতে পারে কিনা	১১৫
(২) ওড়িশার ভবিষ্যৎ	১১৬
(৩) সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি পরিবর্জ্জিতভুক্ত প্রদেশ	১১৭

বিষয় পৃষ্ঠা

বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য—
(১) ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষ ১০৯
(২) ভারতীয় শিল্প ১০৯
(৩) উন্নতিশীল জাপান ১১২
(৪) জাপান ও ভারতবর্ষ ১১৭
(৫) মশার সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ১১৩
(৬) ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ২১২
(৭) যুদ্ধ বনাম রোগ ২১২
(৮) যীশুখৃষ্ট কি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ? ২১৩
(৯) ম্যালেরিয়া কি দূর হইবে ? ২১৩
(১০) নেপালে দাসত্ব-প্রথা রদ হইতেছে
আমেরিকান মতামত ২১৪
(১১) ভারতবর্ষে সংবাদ সরবরাহ ২১৫
(১২) ভারতে ইংরাজী শিক্ষা ২১৬
(১৩) সাহিত্যে বাঙালী ৩১৯
(১৪) ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের দোষ ৩১৯
(১৫) মহাত্মা গান্ধী ৩২১
(১৬) ভারতে চিত্রশিল্পের পুনরুত্থান ৪০৫
(১৭) কার্পাসশিল্পের দুরবস্থা ও তাহার প্রতীকার ৭৮৭
(১৮) ভারতের স্বাধীনতা কি ইংলণ্ডের ঘরোয়া ব্যাপার ৬৯৩
(১৯) হাঙ্গেরিয়ার দমন ৭৪৪
(২০) দেড় লক্ষ টাকায় পাণ্ডুলিপি ৭১৫
(২১) দ্বিতীয় হিউগোর বাদাবাদী ৬১৫
(২২) অদ্ভুতক্রম অনুশীলন ৬১৫

বড়লোকের স্মৃতি
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
(১) রামতনু লাহিড়ী ৮০
(২) কালীকৃষ্ণ মিত্র ১৯৭
(৩) ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩৩৮
(৪ ও ৫) কেশবচন্দ্র সেন ৫৭৬, ৬৭৯

বঙ্গ-বাসন্তী (কবিতা) ৫২
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত

বন্দী ভগবান (কবিতা) ১২০
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বনপ্রিয়া (গল্প) ৫৭৯
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা ৪২
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের চিঠি ৬৯

বার্ণার্ড শ ৬১৭
শ্রীগোপাল হালদার

বিপ্র পরশুরাম (আলোচনা) ৪৭২
শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

বেণুগীত (কবিতা) ৬৮
শ্রীনিরুপমা দেবী

বৈদেশিকী—
(১) নিরাশ্রয় কমিটির দুর্গতি ৩৪২
(২) পদচ্যুত রাজার দিন ৩৪২
(৩) সমাজে বোকার বোকা বোকামি ৩৪৩

ভাঙা (কবিতা) ২৭৩
শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

ভারতী (কবিতা) ৯০
শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

ভারতীয় অর্থ-পরিষদ ৩৪২
শ্রীহৃষীকেশ সেন

ভারতের ভবিষ্যৎ ৬০১
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ভাব ৩২৫
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধু-স্মৃতি ১৮৪
শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

ময়মনসিংহের কাব্য-কথা ৫০৭, ৬৪০
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মল্লিক পুকুর (গল্প) ২৬০
শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা
মারে কেষ্ট রাখে কে (গল্প ৪০১
শ্রী[illegible] গুপ্ত
মেজো মা (গল্প) ২[illegible]
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ১, ১১৯, ২৩৭, ৪৯৭
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রস (কবিতা) ৬৩৯
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
রাজা রামমোহন ও বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ১২৩, ৬১২
শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
রূপ (কবিতা) ৫৩৫
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
রূপের মান ও পরিমাণ ১২৪
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
"লক্ষ্মী গিয়াছে ছাড়ি" (কবিতা) ৬৭০
সুদর্শন
লীলাবতী (কবিতা) ২৫৩
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
শরৎচন্দ্রের "মহেশের" প্রতি (কবিতা) ৪১
শ্রীকালিদাস রায়
শিবস্তোত্র (কবিতা ৬১২
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শোকসংবাদ ৭১৬

বিষয় পৃষ্ঠা
শ্মশানে বসন্ত (কবিতা ৩০৮
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রাবণে
(১) জাতি ও জাগরণ ৭১৭
(২) প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা ৭১৮
সতী (গল্প) ৪৮১
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্মান ৩১৭
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাহিত্য ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য ৫৬৮
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সিমলা—তারাদেবী ৪২৪
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
স্মৃতি দূরদেশে (কবিতা) ২০০
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
হরণ ও বরণ ২৩০
শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
হাসি (কবিতা) ৫১৫
শ্রীসুনীতি দেবী
হিন্দুস্থান (কবিতা) ৩৩৬
শ্রীসজনীকান্ত দাস
হৃদয়-নদীয়া (কবিতা) ১৩৪
শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-সূচী

লেখক পৃষ্ঠা
শ্রীঅবনীনাথ রায়
[illegible] সাহিত্য-সম্মিলন ২২০
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আপন কথা ১০০ ৩০৯, ৪৪০, ৫৯৪, ৬৯৬
ভাব ৩৫৫
রূপের মান ও পরিমাণ ১২৪

লেখক পৃষ্ঠা
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্মশানে বসন্ত (কবিতা) ৩০৮
শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক
ইউরোপের সমাজ-বিপ্লব ১৬৫
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরাতন কাহিনি ১০৩

সূচীপত্র

লেখক	পৃষ্ঠা
শ্রীকালিদাস রায়	
ঝুম (কবিতা)	৪৯৫
চূত মঞ্জরী (কবিতা)	৬
ছন্দের কথা	২৭২, ৩৮০
শরৎচন্দ্রের "মহেশের" প্রতি (কবিতা)	৭১
শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়	
কবির প্রতি (কবিতা	৫০৪
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন	
গিরীশ-স্মৃতি	৩৭২, ৫৩১, ৬৩১
শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী	
রাজা রামমোহন ও বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য	১৯৫, ৩১২
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	
সাহিত্য ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য	৫৬৮
শ্রীগোপাল হালদার	
নবীর কুহক (গল্প	৩৩৩
বার্ণার্ড শ	৬১৭
শ্রীজগদানন্দ রায়	
প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যু	৬৪৭
শ্রীজগদীশ গুপ্ত	
অরূপের রাস (গল্প	৫৩
কাঁদুনে ছেলে (গল্প)	৬৮১
মারে কৃষ্ণ রাখে কে (গল্প)	৪০১
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়	
ভিখারী (ছিটেফোঁটা)	৭০৩
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত	
বধূ বাসরী (কবিতা)	৫২
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	
সিম্ন:—তারাদেবী	৪২৯
শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
আমরা ও তাঁহারা	১৪৩
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
নারী কে? (কবিতা)	৮৬
শ্রীনজরুল ইস্‌লাম	
গজল গান	৩৭৯, ৪০০
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	
শুদ্ধি (উপন্যাস)	১৪, ১২৫
ময়মনসিংহের কাব্য-কথা	৫০৭, ৬৪০
শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী	
বিপ্র পরশুরাম (আলোচনা)	৪৪২
শ্রীনলিনীকান্ত দাশগুপ্ত	
ভাষা (কবিতা)	২৭৩
ভাগ্য (কবিতা)	১৭
শ্রীনিরুপমা দেবী	
বেণুগীত (কবিতা	৯৮
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	
বেওয়ার (কবিতা	২২২
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	
বন্যা (গল্প)	৫৭৯
শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
হৃদয়-নদীর (কবিতা	১৯৫
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	
স্মৃতি দুয়ারে (কবিতা)	২০০
শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
পিছনের বল (গল্প)	১৭৪
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
সেঁউতির দিনে (গল্প)	২০১
শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়	
দশচক্র (উপন্যাস)	৭১, ১৫৩, ২৯০, ৪৩৭, ৫৪৬, ৭০৭
শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	
মল্লিক পুকুর (গল্প)	২৯০

লেখক	পৃষ্ঠা
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	
আষাঢ়ে—	
(১) হিন্দুদের আতঙ্ক	৫২৮
(২) হিতৈষীর আতঙ্ক	৫২৮
(৩ কাঁটালপাড়ার বঙ্কিমস্মৃতি	৬০০
জেবুন্নিসা ও তিলোত্তমার চুলাচুলী	৭
চৈত্রে —	
(১) অসাধ্য সাধন	২০৩
(২) বিলাতী পাটের দেশী মূল্য	২০৪
(৩) জমিদারির আয়ে দিন চলে কিনা	২০৫
(৪) আমাদের সমাজের বিলাতী খাদ্য	২০৬
(৫) যোগ্য ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন	২০৬
ছিটে-ফোঁটা—	
(১) চাতুরীর কাহিনী	১০৬
(২) বর্ষাবিদ্ধ	১০৭
(৩) ধনী ও মহাজনী	১০৮
(৪) জমীদার ও প্রজা	১০৯
(৫) মানে কি ?	১০৯
ছিন্নবস্ত্রা (কবিতা	৬৫১
বৈশাখে—	
(১) প্রতাপচন্দ্রের স্মৃতি	৫৭৮
(২) বিক্টোরিয়া বাজারে'র সম্বন্ধে নূতন সংবাদ	৫৭১
(৩) শোক-সংবাদ	৫৭১
ফাল্গুনে—	
(১) খবর চলিতে পারে কিনা	১১৫
(২) বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ	১১৬
(৩) সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি পরিশিষ্টভুক্ত করণ	১১৭
বড়লোকের স্মৃতি—	
(১) রামতনু লাহিড়ী	৮৩
(২) কালীকৃষ্ণ মিত্র	১৪৭
(৩) ভূদেব মুখোপাধ্যায়	৩৯
(৪।৫) কেশবচন্দ্র সেন	৫৭৮, ৬৭১

লেখক	পৃষ্ঠা
বৈশাখে—	
(১) শিবাজির জন্মভিটের স্মৃতি	৩৪২
(২) খড়্গ. বাহাদুর সিং	৩৪২
(৩) সমাজবাদের মোহে বোকামি	৩৪৩
ভারতের ভবিষ্যৎ	৬০১
ফুল (কবিতা)	৬০৯
স্বপ্ন (কবিতা)	৫০৪
শ্রাবণে—	
(১) জাতি ও কাপড়	৭১৭
(২) প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষা	৭১৯
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	
বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা	৪২
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	
"স্বদেশের মুখে বাঙ্গালার হিন্দু" (আলোচনা)	৬৬৮
শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	
তারপর (গল্প)	৪৪৪
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
মেকি মা (গল্প)	২১৭
শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	
মধু-স্মৃতি	১৮৫
শ্রীমুনীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী	
আশুতোষ-স্মৃতি (কবিতা)	৫৬৭
কেল্লাফতে (গল্প)	৬৬০
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	
শিবস্তোত্র (কবিতা)	৬৪২
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	
নতুন আলো (কবিতা)	৪৪০
পারিবারিক পাহারা (ছিটেফোঁটা)	৭০২
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী	
আষাঢ়ে (কবিতা	৫৬৭

লেখক পৃষ্ঠা
শ্রীযামিনীকান্ত সেন
আধুনিক ভারতীয় প্রতিকৃতিকলা ৫৩৬
শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল
যবনের মুখে বাঙলার হিন্দু ৩০
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ১, ১১১, ২৩৭, ৪১৭
সম্মান ৫১৭
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
গয়া ৬৭০
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
অঞ্জলি (কবিতা ৪৩
শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
চরণ ও বন্ধন ২৩০
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সতী (গল্প) ৪৮১
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
জরা-প্রশস্তি (কবিতা ১২৪
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
নাপোলিয়ঁ (কবিতা) ২৮৮

লেখক পৃষ্ঠা
শ্রীসজনীকান্ত দাস
কেষ্টর মা (গল্প) ৮৭
হিন্দুস্থান (কবিতা) ৩৬৬
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
আদি কবি (কবিতা) ১৮০
বন্দী ভগবান (কবিতা) ১২০
সুদর্শন
"লক্ষ্মী গিয়াছে ছাড়ি" (কবিতা) ৬৩০
শ্রীসুনীতি দেবী
হাসি (কবিতা) ২৭৫
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রজাপতির দৌত্য (উপন্যাস) ১২১, ৪৪৫, ৬০৮
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
নাচগান সম্বন্ধে অনাড়ির উক্তি ৬৫৫
শ্রীহুমায়ুন কবির
আকবর (কবিতা) ১৭০
শ্রীহীরেন্দ্রলাল দে
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৩০১
শ্রীহৃষীকেশ সেন
প্রেতশাসন ৭০
ভারতের অর্থপঞ্জিকা ৫৫২

চিত্র-সূচী

ফাল্গুন

বিষয় পৃষ্ঠা
কবি (ত্রিবর্ণ) সম্মুখে ১
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২

বিষয় পৃষ্ঠা
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৫
রামতনু লাহিড়ী ৮৪

চৈত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
রাধাকৃষ্ণ (ত্রিবর্ণ)	সম্মুখে	১১৯

বৈশাখ

বিষয়		পৃষ্ঠা
সমুদ্রে ওকনা (ত্রিবর্ণ) শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সম্মুখে	২৩৭

জ্যৈষ্ঠ

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পদ্মাবতী (ত্রিবর্ণ) শ্রীমনীষী দে	সম্মুখে	৩৯৫	সদ্যোমুক্ত শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু	৪৬৪

আষাঢ়

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ওমর খৈয়াম (ত্রিবর্ণ)	সম্মুখে	৪৮১	ভারতীয় প্রতিরূপকলা (৬ খানি চিত্র)	৫৩৯-৫৪২

শ্রাবণ

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অমিতাভ (ত্রিবর্ণ	সম্মুখে	৬০১	গয়ার বিষ্ণু মন্দিরের ভিত্তির গঠন-প্রণালী	৬৭৪
প্রেতশিলা পাহাড়		৬৭১	ইন্দ্রমূর্ত্তি (?)	৬৭৫
প্রেতশিলার মন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তি		৬৭২	বৌদ্ধগয়ার মন্দির	৬৭৬
গয়া বিষ্ণুপদ মন্দির		৬৭৩	বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের কারুকার্য্য	৬৭৭

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৩৩৩-'৩৪

ফাল্গুন

প্রথমার্দ্ধ
১ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে লিখিত)

(১)

ঙ

যোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

অদ্য রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আমাদের যোড়াসাঁকোর বাটিতে উপস্থিত হইয়া আহার ও আলাপ করিলে বড় সুখী হইব। যদি ভোজন সম্বন্ধে আপনি বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন তবে আহারের পরেও আসিতে পারেন ;—আমাদের ভোজটা হিন্দু-মুসলমানী। অনুগ্রহপূর্ব্বক একটা উত্তর পাঠাইবেন। ইতি ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

ওঁ

বোলপুর

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

নববর্ষের প্রিয় সম্ভাষণ জানিবেন। নিশ্চয় বাড়ি গেছেন। সব খবর ভাল ত ?

একটি ছাত্রের আবেদন পরপৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। বোধ হয় এমন আরো অনেক ছাত্র আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন জানিতে ইচ্ছুক আছি।

আমি ময়মনসিংহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অর্শরোগ প্রেরণ করিয়াছেন—এবার দেশের জন্য কিছু করা হইল না, ঘরে বসিয়াই প্রচুর রক্তপাত করিতেছি।

ভাণ্ডার বাহির হইয়াছে—প্রথম সংখ্যা ছাপার ভুলের ভাণ্ডার হইয়াছে। ভাণ্ডারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্ন, অমনি এক আধটা প্রবন্ধ ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই কাগজটাকে কেজো কাগজ করিতে চাই। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের স্কুলে ছুটিমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র আছে—তাহাদিগকে আপনার নির্দ্দেশমত পরিষদের কাজে লাগাইয়া দিব। যে সকল ছেলের বয়স বারো বৎসরের অধিক নহে তাহাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করিবেন না। নিতান্ত কচি এবং সম্পূর্ণ বুনো এই দুটোকেই বাদ দিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলি ভাণ্ডারে চালান দিব।

কথাসরিৎসাগরের তর্জ্জমায় কোনো অধ্যাপককে লাগাইয়া দিব। পঞ্চতন্ত্র ছেলেদের দিয়া তর্জ্জমা করাইয়া লইব।

অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" এখানকার দুটি ছাত্র তর্জ্জমা করিতেছে—প্রায় শেষ হইয়াছে। মনে করিতেছি নিখিলবাবুর ঐতিহাসিক চিত্রে ছাপিতে পাঠাইব।

ধর্ম্মপূজার খোঁজ লওয়া যাইবে।

আমাদের দেশে "নেশন" ছিল না ও নাই সে কথা সত্য—তাহার পরিবর্ত্তে কি আছে বা ছিল সেইটেই ভাল করিয়া বিচার্য্য। কারণ, ধরিয়া রাখিবার মত কিছু একটা না থাকিলে

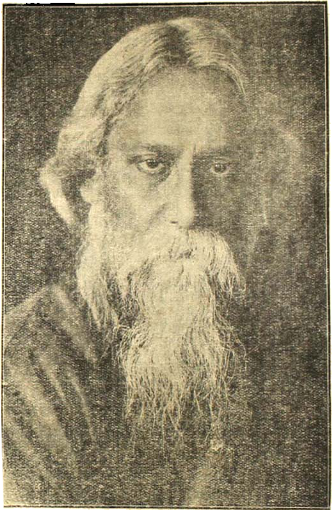

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"কালি কলম"-এর সৌজন্যে]

ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত ? আপনার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খোলসা করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন তবেই কতকটা সন্তোষজনক উত্তর আশা করিতে পারিবেন।

এবারকার ভারতীতে খেয়ালখাতা নামক একটা নির্লজ্জতার সৃষ্টি হইয়াছে সেটাতে আমাদিগকে বড়ই কাতর করিয়াছে। আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল তাহাতে আত্মীয় বন্ধুরা যখন যাহা খুসি লিখিতেন। বেশ বুঝিতেই পারিতেছেন যেমন লেখায় সত্যও থাকে না রচনার সৌন্দর্য্যও থাকিতে পারে না— * * * হঠাৎ সেগুলিকে পাঠক সমক্ষে তুরী ভেরী দামামার কোলাহল সহকারে প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে আমি, বিশেষতঃ বড়দাদা, অত্যন্ত ধিক্কার অনুভব করিতেছি। ভবিষ্যতে এই সমস্ত লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছি তাহা পালিত হইবে কিনা জানি না কারণ, আজকাল দোকানদারিই সব চেয়ে নিদারুণ হইয়া দয়াধর্ম্ম গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

পরিষদের শৈশববিভাগের ভার সম্পূর্ণ আপনাকেই লইতে হইবে। ইহাকে লাল ফিতার উদ্বন্ধনে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে দিবেন না। ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি পড়িয়া যাহা বুঝিলাম সেইরূপই সন্দেহ করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমাকে লইয়া টানাটানি করিয়া কি লাভ ? বস্তুত দেশ যদি প্রস্তুত হইয়া না থাকে তবে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কেবল আমারই মাথার পক্ষে অসুবিধা—তাহাতে জাতীয় বিদ্যালয়ের মত বৃহৎ ব্যাপারের কোনই সুবিধা হইবে না। টাকা এ সকল কাজে যে আকর্ষণে অজস্র আসিয়া পড়ে তাহা ভাবের আকর্ষণ—আমাদের দ্বারা ধনী লোকের চরণ আকর্ষণ নহে। আমি নিশ্চয় জানিতাম * * * টাকা দিবেন না। তাঁহারা কোনো দিন উচ্চভাবের দ্বারা চালিত হন নাই—তাঁহাদের অভ্যাস ও সংস্কার সর্ব্বপ্রকার মহৎ ত্যাগস্বীকার ও দুষ্কর তপশ্চর্য্যার বিরোধী। হঠাৎ একটা আন্দোলনের বেগে কতদিনের জন্য কতটুকুই বা আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে পারে ? * * * কে আমি ঠিক চিনি না—কিন্তু তাঁহার মন্ত্রদাতা * * * এর প্রতি আমার লেশমাত্র শ্রদ্ধা নাই—আমি ইঁহাদের কাছে যাতায়াত করিয়া বৃথাই সময় নষ্ট করিয়াছি।

ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা-

প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন—যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্দ্ধাপ্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্ত্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্ত্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই "লীডার" বা জনসংঘের চালক নহি—আমি ভাটমাত্র—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্য্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব কিন্তু "নেতা" হইবার দুরাশা আমার মনে নাই—যাঁহারা "নেতা" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি—ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ইতি ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ক্রমশঃ)

চূতমঞ্জরী

আম্রমুকুল, ছন্দোদোদুল গন্ধমৃদুল মিঠে,
বনের তূণীর ছাপিয়ে জাগিস্ রতিপতির পিঠে।
'রূপ' ছেড়ে কোন্ তৃষ্ণা লয়ে
তীক্ষ্ণ কুহুঃ 'শব্দ' হ'য়ে
আসিস্ ছুটে, বিঁধিস্ মোদের প্রাণের গাঁঠে গাঁঠে।
আম্রমুকুল, অমৃত ফুল, মদির রসের ঝোরা,
বনবালাদের হাজার হাতে পিচ্কারী কি তোরা?
রাখিস্ বাগান রঙীন ক'রে,
তুলিস্ কূজন গগন ভ'রে,
তোদের 'দোলে' মনে প্রাণে রঙীন্ হ'লাম মোরা।
রঙের মশাল, মুকুল বশাল, আছিস্ রসে ফুলি',
মাধবিকার আঙুলে সব আতস রঙিল তুলী।
নানান রঙের চিত্র এঁকে,
দিলি বনের শ্যামল ঢেকে,
গগনপটে আঁক্বি বুঝি বনের স্বপনগুলি?
রসাল মুকুল, সঙ্গীতাকুল, ফুলন্ত মঙ্গল,
কষায় দুকূল স্মরকেতু তুই দিগন্তে উজ্জ্বল।
ভ্রমর পাঁতির আঁখর লেখা
জয়গাথা তায় যাচ্ছে দেখা।
ন'বৎ বাজায় তাহার তলায় বৈতালিকের দল।
রসাল মুকুল, রসরাজের পূজার আয়োজন,
ধূপশলা নৈ-বেদ্য মধু-পর্ক নিবেদন।
ভোগ আরতির বাদ্যঘটা
হোমানলের শিখায় ছটা,
বোধনকলস অর্ঘ্যকুসুম,—সবার সম্মিলন।

শ্রীকালিদাস রায়

ক্ষেত্রমণি ও তিলোত্তমার চুলাচুলি

ক্ষেত্রমণি ওরফে খেতু আমাদের এই মাটির ধরায় কাজ-কর্ম্মের ক্ষেত্রে ধূলা-কাদা উপেক্ষা করিয়া ঘর-সংসারের কাজ করেন, কাঁথা কাচেন, ভাত রাঁধেন, আর তাঁহার অতি প্রিয়তমকেও সময়ে সময়ে বিনা বীণার ঝঙ্কারে ডেক্‌রা বলেন ; তবে তিনি সুন্দরী ও মোহিনী কি না, তাহার বিচার ও পরিচয় পরে হইবে। অন্য দিকে তিলোত্তমা তিনি, যাঁহাকে আমাদের কল্পনার তৃপ্তির জন্য আমাদেরই নানা আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর ভাবগুলির মাধুর্য্য তিল-তিল করিয়া পুড়াইয়া স্বয়ং ব্রহ্মা অতি উত্তম চেহারায় গড়িয়াছেন। এই ক্ষেত্রমণিতে ও তিলোত্তমায় চুলাচুলি হয় কেন, সে ইতিহাস পাইব সাহিত্যের আঙ্গিনার একটা অফুরন্ত তর্কের আলোচনায়।

ইউরোপীয়দের সাহিত্য দরবারের একটা তর্ক খাঁটি ইউরোপের পোষাকে আমাদের সাহিত্যের আঙ্গিনায় দেখা দিয়াছে ; তর্ক উঠিয়াছে—সাহিত্যের আদর্শ realistic হইবে, না, idealistic হইবে   তর্কের সময় ঐ বিলাতি শব্দ দুইটিকে নানা দেশী পোষাকে খাড়া করা হয়, তবে বিলাতি ভাবের সঙ্গে অপরিচিতেরা দেশী পোষাকেও উহাদের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। এই ভাব দুইটির মধ্যে একটির নাম দিয়াছি ক্ষেত্রমণি, আর অপরটির তিলোত্তমা। ধীরে ধীরে উভয়ের রীতি ও প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যে ধরণে আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া-পরা চলে, ঘর-সংসার চলে, আর ঠিক যে পদার্থটি চোখে যেমন দেখি, কেবল তাহাই সাজাইয়া গুছাইয়া লিখিব, না, আমাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় যে সকল সাধের অবস্থা কল্পনা করি—ভাবের মোহে যে সকল স্বপ্ন দেখি, কেবল তাহাই সাহিত্যে বর্ণিত ও চিত্রিত হইবে,—এই হইল তর্কের বা বিবাদের মূল।

সাহিত্য যে মানুষের জীবনের ছবি, উহা যে একটা আন্‌খা অজানা সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়, ইহা বিবাদকারীদের উভয় দলেই স্বীকৃত ; একথাও অস্বীকার করিবার পথ নাই যে, যাহা মোটা রকমে চোখে দেখি বা আটপৌরে ধরণে ঘটে তাহাও যেমন জীবনে স্বাভাবিক, সেইরূপ আমরা ভোগের অতৃপ্তিতে যাহা কামনা করি বা কল্পনা করি, তাহাও মানুষের জীবনেই ঘটে ও জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষের কল্পনার দৌড় যত বড় বিস্তৃত পথে চলিলেও এমন কিছু কল্পিত হওয়া অসম্ভব যাহা অজানা ও সৃষ্টি-ছাড়া ; মানুষের দেখা বা কল্পিত যাহা কিছু তাহার একটি টুক্‌রাও অপার্থিব নয়, অবাস্তব অর্থাৎ বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। তবে কথা এই, সাহিত্য জীবন ছাড়া কিছু না হইলেও জীবনে যাহা কিছু ঘটে তাহার সকলগুলিই সাহিত্যের উপাদান হওয়া উচিত কি না। তর্কের আসরের হট্টগোলে যে ধরণের সাহিত্যের নাম হইয়াছে বাস্তব সাহিত্য আর যাহার নাম হইয়াছে কল্পনার আদর্শ সাহিত্য, তাহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ বুঝিয়া, দু-য়ের বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিব।

ধর, একটি ছেলে তাহার বাড়ীর কাছের একটা গাছের ছবি আঁকিল। অতি নিপুণ দক্ষতায় আঁকিলেও ছবিটি ঠিক গাছটির মত হয় না,—খাঁটি গাছে ও ছবিতে ভেদ থাকে। বাড়ীর-লোকে ও পাড়ার লোকে যখন গাছের ছবি দেখিয়া ছেলেটিকে বিস্ময়ে ও আনন্দে বাহাবা দিল, তখন তাঁহাদের মনে এমন ধারণা হয় নাই যে বাড়ীর পাশের গাছটি ঐ চিত্রে হুবহু উঠিয়াছে, বা চিত্রের গাছটি সত্যকারের গাছের কাজ করিতে পারে; ছবিতে যে গাছের চিত্র এমনভাবে ফুটান যায়, যাহাতে ছবি দেখিলেই ঠিক গাছটি মনে পড়ে, এই দক্ষতা দেখিয়া মানুষে এখানে ছবিটির প্রশংসা করিয়াছে; অর্থাৎ প্রশংসা হইল বালকের দক্ষতার,—একটা প্রার্থিত অভাব পূর্ণ হইবার আনন্দে সে প্রশংসা হয় নাই, কারণ গাছ দেখিবার যে আনন্দ তাহাত ঘরের কাছেকার গাছটিতে জমাট ছিল।

আবার ধর, একজন চিত্রকর নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে একটা জায়গার দৃশ্য বাছিয়া এমন ছবি আঁকিল, যে ছবিটি দেখিলেই মানুষের চোখের ও মনের তৃপ্তি হয়। ছবি উঠিল খাঁটি গাছ পাহাড় প্রভৃতির, তবে সেগুলি প্রকৃতিতেই একম-ভাবে সাজান যে তাহার দৃশ্যে গভীর আনন্দ জন্মে। যেখানকার সেই দৃশ্য, সেখানে অনেক লোক যায়, আর হয়ত অনেকে অজ্ঞাতে আনন্দ পায়; কিন্তু চিত্রকর এমন কৌশলে সে দৃশ্যের ছবি তুলিয়া আনিল, যাহাতে যে কেহ ছবিটির দিকে তাকাইলেই তৃপ্ত ও আনন্দিত হয়। এখানে দর্শকেরা একটা যথার্থ তৃপ্তির পদার্থ পাইল, কেবল বিস্ময়ে চিত্রকরের দক্ষতার প্রশংসা করিয়া দেখা শেষ করিল না। এস্থলে প্রকৃতিতে যাহা আছে ঠিক তাহাই কেবল বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে,—ক্ষেত্রমণিরই অবস্থা বিশেষের চিত্র আঁকা হইয়াছে, তিলোত্তমা গড়া হয় নাই।

এই ধরণের আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। একজন লোকের ক্ষমতা আছে, সে অপর দশ জনের কথা কহিবার সুর ও ধরণ নকল করিয়া কথা কহিতে পারে, অথবা অপরের চলন-ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া হাঁটিতে পারে। এই লোকটির অভিনয়ে কেবল তাহার দক্ষতার প্রশংসা হয়; এক জনের কথা কওয়া বা চলা অন্যের কথা কওয়া বা চলায় অভিনীত হওয়াতেই সেই কথা বা চলন একটা তৃপ্তির বা আনন্দের কারণ হয় না। তবে ঐ অভিনয়কারী যদি মানুষের আচরিত এরূপ শ্রেণীর ঘটনা বিশেষের অভিনয় করিতে পারে, যাহার দৃশ্যে শিক্ষা ও আনন্দ হয়, তাহা হইলে অভিনয়ের কৌশলকে বাহাবা দেওয়া ছাড়াও স্থায়ী আনন্দলাভের পদার্থ মেলে। একজন বৌ-কাঁট্কি শাশুড়ী যে ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকাইয়া বৌ-বেচারীকে তিরস্কার করে, বা নিষ্ঠুর রকমের খোঁটা খাওয়াইয়া বৌটির মনে বেদনা দেয়, তাহার খাঁটি অভিনয়ের ভিত্তিতে সমাজের সেই বিষময় অবস্থা ফুটাইয়া তোলা যায় যাহার ফলে মানুষের সুখের সংসার প্রেতের শ্মশানে দাঁড়ায়; এ চিত্র শিক্ষাপ্রদ সাহিত্য। সমাজের যে কোন অবস্থার চিত্রই সাহিত্য নয়,—sketch বা চিত্র যত নিপুণ হইলেও নয়।

প্রকৃতিতে যাহা ঘটে,—ঠিক যেমনটি দেখা যায় শুধু তাহারই বর্ণনা কবিতা নয়, সে কবিতায়—যত ললিত পদ বা ভাল মিল থাকিলেও নয়। "রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,—শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"—খাঁটি বর্ণনা হইতে পারে, তবে উহা কবিতা নয়। ঐ ধরণের প্রভাতের বর্ণনায় একটা উপমা জুড়িয়া দিলেও কবিতা হয় না, যথা—"ঘরের চালে পালে পালে ডাক্‌ছে কত কাক,—পূজাবাটিতে জোড় কাঠিতে বাজ্‌ছে যেন ঢাক।" শিক্ষার নামে এই ধরণের গরুগম্ভীর উপদেশও কবিতা নয়, যথাঃ—"এখনও হিতবচন শুন যতনে করি ধারণা।"

আবার অন্যদিকে খাঁটি প্রকৃতির যে অবস্থার বর্ণনায় মানুষের শরীর-মনকে ক্ষয়ের দিকে টানে, অর্থাৎ ভোগের লালসা যে দৃশ্যের বা অবস্থার সঙ্গে জড়াইয়া থাকে, তাহার বর্ণনা মানুষ বিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের ভোগলিপ্সার আনন্দ দিলেও তাহা রক্ষণীয় সাহিত্য নয়। ফিন্‌ফিনে পাতলা কাপড় পরিয়া মায় রাধা যে কোন স্ত্রীলোক "সিনান" করিয়া উঠিলে যে দৃশ্য হয়, তাহা কাব্যের বাহিরে অনেক স্থানে ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় আর সে দৃশ্যের আনন্দ অতি বড় আত্মক্ষয়লোলুপ ব্যক্তিও এক মিনিটের অধিক উপভোগ করিতে পারে না; উহা জীবনের স্থায়ী আনন্দের সাহিত্য নয়। ঠিক এই বর্ণনার প্রসঙ্গে ক্ষয়-লোলুপেরা বলিয়া থাকেন যে উহা যখন প্রাকৃতিক বর্ণনা, তখন দোষের হইবে কেন। ইহার উত্তর সোজা। ভোরের সময়কার এমন নিত্যকৃত্য আছে যাহা না হইলে শরীরে রোগ জন্মে, ও যাহা ঘটাইবার জন্য কেষ্টর্‌ অয়েল্‌ বা ভেরেণ্ডার তেল খাইতে হয়। এমন অতি প্রয়োজনের প্রাকৃতিক ঘটনার প্রক্রিয়া যদি ক্ষুদ্র কুঠুরি-বিশেষের দরজা ঠেলিয়া কোন কবি উঁকি মারিয়া দেখেন ও বর্ণনা করেন, তবে প্রাকৃতিক শব্দের ওজুহাতে সে বর্ণনা সাহিত্যে চলিবে না। সকল প্রাকৃতিক অবস্থাকেই খোলা গায়ে আসরে আনা চলে না। তবে সমাজে এমন লেখক ও পাঠক অনেক থাকিতে পারে যাহারা ক্ষেত্রমণির পায়ে লাগা পচা পাঁক চাটিয়াই সুখী। পাঁক, পাঁকই; তাহার গায়ে ভাষার ও ছন্দের মধু ও চন্দন ছিটাইয়া দিলেও দুর্গন্ধ পাঁক। জীবন ও সাহিত্য অভিন্ন বটে, তবে সকল জীবনেরই খাঁটি প্রার্থিত সামগ্রী স্থায়ী আনন্দ, স্থিতি, ও উন্নতি; উহা যে স্থায়ী আনন্দের পরিবর্ত্তে ক্ষণিকের জন্য লভ্য সুড়সুড়ি নয়, স্থিতি ও উন্নতির পরিবর্ত্তে প্রমত্তমনে ক্ষয়ের সাধনা নয় তাহা ভুলিলে চলিবে না।

যাঁহারা তাঁহাদের বর্ণনা হুবহু প্রাকৃতিক করিবার ওজুহাতে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া ক্ষেত্রমণির সারা অঙ্গের ঠিকঠাক তালিকা গড়েন, তাঁহাদের অন্য যে বিদ্যাই থাকুক, তাঁহারা জানেন না ও বোঝেন না, যে কোন মানুষের দৃষ্টিতেই দৃষ্ট পদার্থের এনাটমি-বিশুদ্ধ পূর্ণ ছবির অনুভব জন্মে না। তুমি যখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাও, একদল মানুষ বা এক পাল গরু আসিতেছে, তখন কি মানুষের বা গরুর সারা অঙ্গের এনাটমি-বিশুদ্ধ ছবি দেখ? দূর ছাড়িয়া কাছের কথা

বলি। তুমি একজন নারীর সঙ্গে কথা কহিতেছ ও তাঁহার আলাপে মুগ্ধ হইয়া প্রেমে পড়িতেছ; কাছে বসিয়া কথা কহিবার সময় সেই নারীর মুখ-চোখ-নাক দেখিতেছ বটে, কিন্তু তুমি কি সেই সেই অঙ্গের এনাটমি-বিশুদ্ধ ছবি তোমার দৃষ্টি দিয়া আহরণ করিতে পার? তোমার আকর্ষণ প্রেম না হইয়া কাম হইলেও পার না। প্রেম ফটোগ্রাফ তোলে না; কামের পক্ষে ত ফটোগ্রাফ তোলা একেবারে অসম্ভব, কেন না সে মনের মত্ততায় একেবারে অন্ধ হইয়া নিজের প্রবৃত্তির পাঁকের মধ্যে সারা মাথাটা ডুবাইয়া থাকে। আবার দেখ যে, এনাটমি আলাদা ও কাব্য-সাহিত্য আলাদা। যে দৃষ্টিতে ও মনের টানে আমরা দেখি, কথা কই, ঘৃণা-বিদ্বেষ বাড়াই ও প্রেম করি, তাহাতে এনাটমি বা শারীর বিদ্যার বিশ্লেষণ নাই। অঙ্গে সূচিত হয় প্রাণের ছবি; যে চিত্রে ভাব ফুটাইবার অঙ্গ-বিন্যাস নাই, অথবা দৃষ্টিতে ভাবের ব্যঞ্জনা নাই, তাহা ছবি নয়,—তাহা কেবল খানিকটা রংএর সমষ্টি বা মাটির ডেলা।

এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমণির কথাই বলিয়াছি, কিন্তু এই প্রাণের কথার প্রসঙ্গে তিলোত্তমার একটু ছায়া পড়িয়াছে। কথাটি বুঝাইতেছি। ঐ দেখ ক্ষেত্রমণি শিশু ছেলেকে বকিয়া ও ঠেঙ্গাইয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসিল ও নিজেও খাইতে বসিল; খাইবার যে পদার্থটি ছেলের মুখে ভাল লাগিল সেটা খাইবার লোভ ক্ষেত্রমণির একেবারে উড়িয়া গেল,- সে নিজে না খাইয়া ছেলেকে খাওয়াইয়া ও ছেলের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া প্রকৃত আনন্দ পাইল। ক্ষেত্রমণির মুখের এই আনন্দের ছবি, এই স্বার্থত্যাগের দৃশ্য আমাদের মনে এমন একটা অসীম স্নেহকরুণার জগৎ ফুটাইয়া তুলে, যাহার ঠিক প্রত্যক্ষ শারীর রূপ কোন একজন নির্দ্দিষ্ট মানুষের শরীর-মনের আয়ত্তনে স্থাপিত করিতে পারি না। যে মোহের দৃশ্য একস্থানে এক তিল দেখিয়াছি, অন্য স্থানে আর এক তিল দেখিয়াছি, তাহাই কুড়াইয়া কুড়াইয়া আমরা প্রাণ-জগতের অধিষ্ঠাত্রী তিলোত্তমা গড়িয়াছি। বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা আমাদের প্রত্যেক প্রাণের ভাবের জন্মের ইতিহাস দিতে পারি, অর্থাৎ শরীরের কি অবস্থার ধর্ম্মে ঐ ভাবের বিকাশ হয় তাহা বলিতে পারি, কিন্তু তাহাতেও ঐ ভাবটিকে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করিতে পারি না; ভাবটি যে কারণেই জন্মুক না কেন উহার দৃশ্যে ও অনুভূতিতে মনে এইরূপ স্বপ্নময় অবস্থার সৃষ্টি করে যাহাকে সময় ও সীমার মধ্যে বাঁধা যায় না। আমরা যতখানি মনের মধ্যে ধরিতে পারি, তাহা ছাড়া বাদবাকি যতখানি অস্পষ্ট ও অনায়ত্ত থাকে ততখানিতেই আমাদের মনে ভাবের নেশা জমাইয়া তুলে। কথাটিকে আর একটু স্পষ্ট করিতেছি।

যাহা নিঃশেষে দেখিয়া বুঝিয়া ও ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারি তাহা আমাদের স্থায়ী তৃপ্তি ও সুখ দিতে পারে না; একখানি উপনিষদে আছে—নাল্পে সুখমস্তি। ছেলে-মেয়ের মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন ভাব ফুটে, আকাশ, বন পাহাড় প্রভৃতির দৃশ্য প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আকার ধারণ করে; এই অফুরন্ত ভাবের অবস্থা আমরা সকলে ধরিতে পারি না,

কিন্তু ঐ অবস্থা আছে বলিয়াই উহারা আমাদের কাছে সুন্দর। যেখানে স্নেহ ও ভালবাসা আছে সেখানে যে আমাদের দৃষ্টি নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাপাইয়া চলে, আর বাহ্যিক প্রকৃতির দৃশ্য যে একটা সীমানাশূন্য রাজ্যের ভাব আনিয়া দেয়, তাহা একটু ভাবিয়া বুঝিতে হয়। জীবনের গতিবিধির একটু আলোচনা করিলে আমাদের এই অসীমের দিকের ঝোঁক ধরা পড়িবে। ধর একজন মুখে তর্ক করিয়া বলিতেছে যে প্রাচীন কাল ছিল ভাল আর যত একাল বাড়িতেছে ততই অপ্রার্থিত কলিকাল বাড়িতেছে; কিন্তু সে যখন চলিতেছে তখন অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া নয়,—তাহার মনের মধ্যে নিগূঢ় ভাবে ভবিষ্যতের দিকে ছুটিবার যে টান আছে, সে সেই টানের আনন্দে কাল-পর্ত্ত ডিঙ্গাইয়া চলিতে চাহিতেছে। আবার ধর, একজন গভীর বিশ্বাসে তর্ক করিয়া বলিতেছে যে পরলোক নাই, চোখ বুঁজিলেই সব ফুরায় ও আরও বলিতেছে—তুমি কার, কে তোমার; তবুও সে ভবিষ্যতের জন্মে সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে, ও যাহার ফল সে নিশ্চয় জানে যে একশ বৎসরের আগে পাওয়া যাইতে পারে না, সে অনুষ্ঠান করিতেও সে ছাড়িতেছে না। আমাদের জীবনের মূলে অর্থাৎ আমাদের ধাতে এমন একটা নিগূঢ় অপরিহার্য্য টান আছে যাহা আমাদিগকে দৃষ্ট সীমা এড়াইয়া অদূরস্থ দূরের দিকে টানে। এ টান ব্যর্থ কি সার্থক তাহার বিচার নিষ্ফল; তবে সে টান যে আছে ও তাহার ফলে যে আমাদের দৃষ্টি অজানার দিকে তাকাইয়া তৃপ্তি পায়, এইটিই বুঝিয়া লইবার কথা। এই কথাটা ধরিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ক্ষেত্রমণির গায়ে-গায়ে তিলোত্তমা জড়াইয়া আছে, আর যেখানেই ক্ষেত্রমণি মোহিনী সেখানেই সে তিলোত্তমার আলোকে দীপ্ত।

জানা সীমার কূলে যাঁহারা যতখানি অজানা অসীমের ইঙ্গিত জমাইয়া দিতে পারেন তাঁহাদেরই রচনা তত অধিক তৃপ্তি দিতে পারে। যে শ্রেণীর পাঠকেরা বেশির ভাগ মেটে ক্ষেত্রমণি ছাড়া বোঝেন না তাঁহারা কবিতাকে দুর্ব্বোধ্য ও ত্যজ্য বলেন; তাই দেখিতে পাই অনেকে মেটে বুদ্ধির অহঙ্কার দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকেই এই বলিয়া দুষিয়া থাকেন, যে তাঁহার মত পণ্ডিতও ওই কবিতার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

আমরা যে কেবল নিগূঢ় ভাবের টানে অজ্ঞাতে তিলোত্তমা খুঁজি, তাহাই নয়; আমরা প্রত্যেক লোকে (যত মেটে বুদ্ধি থাকিলেও) প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তে সজ্ঞানে তিলোত্তমা গড়িয়া চলিয়াছি। প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে ভাবে যে, তাহার যদি ক্ষমতা থাকিত তবে সে আমাদের জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মকে অনেক কমাইয়া দিত, যে গাছে মধুর ফল ধরে না সে গাছে আমের চেয়ে সুস্বাদু ফল ফলাইত, মরুভূমির নিরর্থক বালিতে সুখাদ্য শস্য জন্মাইত, আর এই মৃত্যু, দুঃখ, শোক প্রভৃতির কাঠাম বদলাইয়া নূতন সুখের রাজ্য গড়িত। যাহা পাইয়াছে তাহা লইয়া তৃপ্ত আছে ও আর কিছু চায় না, এমন লোক একেবারেই নাই; তবে হইতে পারে যে একজন ধন-দৌলত চায় না,—চায় কেবল অধিক হইতে অধিকতর আধ্যাত্মিক

দৃষ্টির প্রসারবৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে চায় বিজন জঙ্গলে অপর্য্যাপ্ত সুস্বাদু ফল ও হিংসাধর্ম্মত্যাগী বাঘ-ভাল্লুক। এই যে আমাদের তৃপ্তি নাই, এই যে আমরা সুন্দর হইতে সুন্দরতর পদার্থের জন্য লুব্ধ, এ আমাদের ধাতের গুণে হইয়াছে—হাড়-মাসের ধর্ম্মে জন্মিয়াছে। চিতা বাঘ বরং সাধনা করিয়া তাহার চামড়ার রং বদলাইতে পারে, কিন্তু মানুষে তাহার এ ধর্ম্ম বদলাইতে পারে না; সে ক্ষেত্রমণির শরীরের ভিত্তিতে চিরকাল তিলোত্তমা গড়িয়াই চলিবে। দেখিলাম, সকলেই তিলোত্তমা গড়ে, আর ক্ষেত্রমণি ও তিলোত্তমায় রহিয়াছে গলাগলি। তবে গোড়ায় চুলাচুলির কথা বলিলাম কেন; চুলাচুলি ঘটে, তবে কে ঘটায় বলিতেছি।

পূর্ব্বেই এক শ্রেণীর লোকের কথা বলিয়াছি যাহারা ক্ষেত্রমণির পায়ের পচা পাঁক চাটিতে চায়। ইহারা ক্ষণিক ভোগের তিলোত্তমা গড়িয়া ক্ষেত্রমণির ঘাড়ে চাপায়, আর তাহাদের সৃষ্টির হাতযশে ক্ষেত্রমণি ও তাহার ঘাড়ের ভূত মিলিয়া তখন পেত্নী হইয়া দাঁড়ায়। পেত্নীর সাধকেরা অজানা অসীম ভাবের খাঁটি তিলোত্তমার ছায়া সহিতে না পারিয়া তাহার বিরুদ্ধে পেত্নীকে লেলাইয়া দেয়। এই দল ছাড়া আর এক দলের লোক আছে যাহারা আধ্যাত্মিকতার নামে ক্ষেত্রমণিতে ও তিলোত্তমাতে চুলাচুলি বাধায়। এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষেত্রমণিকে ছলনা, পাপ ও মিথ্যার ফাঁকি মনে করিয়া তাহাকে 'নাস্তি' মন্ত্রে উড়াইতে চায় ও যাহা কিছুতেই সম্ভব নয় তাহাই করিতে চায়.—অর্থাৎ ক্ষেত্রমণির ভিত্তি এড়াইয়া একটি আকাশ-কুসুম তিলোত্তমা গড়িতে চায়। মানুষের সঙ্গ না হইলে মনুষ্যত্ব জন্মিতে পারে না, সংসারের আঘাতে মনে দুঃখ-শোকের ঢেউ না খেলিলে অসীম ভাবের সাগর দেখা দেয় না ও ধূলামাটির ক্ষেত্রে কর্ম্মনিষ্ঠ না হইলে প্রাণের মঞ্চে তিলোত্তমার আসন পাতা যায় না। তবুও যাহারা মানুষকে দূরে রাখিয়া, সংসারকে পায়ে ঠেলিয়া ও কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া অদ্ভুত রকমের মুক্তি চায় অর্থাৎ ফাঁকা বুদ্বুদে গড়া তিলোত্তমা চায়, তাহারাই তাহাদের গড়া তিলোত্তমাকে লেলাইয়া দেয়—ক্ষেত্রমণির টুঁটি টিপিতে ও চুল ধরিয়া টানিতে; এই জন্যই যথার্থ কাব্যজগতে রহিয়াছে যাহাদের গলাগলি, তাহাদের মধ্যে একটা চুলাচুলির সংবাদ পাই।

চুলাচুলির আর একটি অবস্থা আছে; এই অবস্থা ঘটে রূপের উপাসক শিল্পদক্ষের কৃতিত্বে। এই শিল্পীদের কল্পিত ষোল আনা অঙ্গ-সৌষ্ঠব না থাকিলে যে ক্ষেত্রমণির স্নেহ, প্রেম, করুণা, সংযম প্রভৃতি জন্মিতে বাধা পায়, ইহা ডাহা মিথ্যা কথা; পটলচেরা চোখ, শাঁখের মত গলা, চাঁপার কলির মত আঙ্গুল চাই-ই—চাই, নইলে ক্ষেত্রমণির আদর হইতে পারে না; একথা বলিলে যে প্রকৃতির খাঁটি ক্ষেত্রমণিকে অপমান করা হয় ও নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করা হয়, তাহা রূপের উপাসকেরা ভুলিয়া যান, আর তাঁহারা তিল তিল করিয়া রূপ কুড়াইয়া রূপোত্তমা গড়েন। এই গ্রীক ছাঁচের রূপোত্তমা, এই অসার পটের বিবি ক্ষেত্রমণির প্রতিভূ

সাজিয়া প্রাণময়ী তিলোত্তমার সঙ্গে চুলাচুলি করে। আমাদের খাঁটি ক্ষেত্রমণি রূপোত্তমা না হইয়াও তিলোত্তমার অস্বাভাবিক দীপ্তিতে যে সত্য সত্যই মোহিনী হয় তাহা বিন্দুমাত্রে ভুলিলেও মানুষের সুখের সংসার দুঃখের শ্মশান হয়। একথাও ভুলিলে চলিবে না যে ক্ষেত্রমণি ষোলআনা পরিমাণে তিলোত্তমার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতে পারে না। আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রমণি যে তাহার গুণের দিকের অনেক ত্রুটি ও অপরাধ সত্বেও প্রাণময়ী ও মাহাত্মময়ী, আর তাহার সেই প্রাণের স্পর্শ পাইতে হইলে ও মাহাত্ম্যে ধন্য হইতে হইলে যে, মানুষকে অনেক খুঁটি-নাটির দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া বড় হইতে হয়, সেকথা কবি ব্রাউনিঙ্‌-এর ভাষায় অতি চমৎকার ফুটিয়াছে। অন্য কোথাও এমন প্রাণস্পর্শী দৃষ্টান্ত না পাইয়া ঐ কবির "নারীর শেষবাণী" কবিতার কয়েকটি ছত্র তুলিতেছি ; অনুবাদ অসম্ভব। সারা বিশ্বের নারীর প্রাণ যেন সারা অসূয়া বৃদ্ধির পুরুষ-জগৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছে—

What so false as truth is,
False to thee ?
Where the serpent's tooth is,
Shun the tree —

Where the apple reddens,
Never pry—
Lest we lose our Edens,
Eve and I.

Be a god and hold me
With a charm !
Be a man and fold me
With thy arm !

গ্রীক ছাঁচে পটের বিবির প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। রূপোত্তমার উপাসকদিগকে বলি, তোমরা পটের বিবির ধ্যান করিলে মনুষ্যত্ব হারাইবে। যদি মনুষ্যত্বের বিকাশ চাও, প্রাণে দয়া, মমতা, ও করুণার নির্ঝর বহাইয়া অজানা ও অসীম সুন্দরের সৌন্দর্য্যরসে ডুবিতে চাও, তবে যাহারা দৈন্যে পীড়িত, আভিজাত্যের পায়ে দলিত ও পেটের দায়ে হীনতায় মগ্ন, তাহাদের অতি দুঃস্থ ও মলিন ছবি—অর্থাৎ খাঁটি ফটোগ্রাফ চোখের সম্মুখে রাখ ও পটের বিবিকে ফেলিয়া দাও। সত্যের সঙ্গে অসত্যের চুলাচুলি বাধাইও না।

তৃপ্তি

(২৩)

বাহির হইয়া মিনতি দেখিল রামধারী দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল।

দুয়ার খুলিতেই সে গড় হইয়া মিনতিকে প্রণাম করিল। মিনতি প্রশান্তচিত্তে তাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

রামধারী বলিল, "অনেক দিন মাকে দেখতে পাই নি। প্রয়াগজীতে মাইজীকে দেখতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম মাইজী চলে গেছেন।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে মিনতি বলিল, "ভাল আছ রামধারী?"

"হাঁ মা, আমি ভাল থাকবো না কেন? গরীব দুঃখী মানুষ, ছোট লোক, আমার ভাল মন্দে তো কিছু আসে যায় না। ভগবান বেটা দুঃখ কষ্ট দেয় বড় বড় লোককে। আমার বাবু আছেন, মাইজী আছেন, দেবতার মত মানুষ, তাদের ভগবান যত দুঃখ দেন।"

"ভগবান কাউকে দুঃখ দেন না বাবা। তাঁকে বুঝতে পারি না, আমরা তাই দুঃখ পাই।"

"হাঁ মাইজী সে ঠিক! সে ঠিক!"—তারপর অনেকক্ষণ নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া অনেক আয়োজন করিয়া রামধারী আমতা আমতা করিয়া বলিল, "মাইজী, রামধারী ছোট লোক, বোকা সোকা মানুষ, তবু সে আপনাদের অনেক দিনের নোকর, আপনাদের ভালমন্দ আমার কলিজায় লাগে মাই। দুটো আবদার করতে চাই মা, যদি কিছু না মনে করেন।"

"কি রামধারী, কি চাও তুমি?"

"মাইজি, এই খোকা বাবুকে আপনি মাপ ক'রবেন।"

মিনতি অবাক হইয়া গেল। জগতে যে এমন লোক এখনও আছে যে দিলীপকে তার কাছে অপরাধী মনে করে তাতে সে বিস্মিত হইল। রামধারীর কথায় তার চক্ষে জল আসিল। রামধারী বলিয়া গেল,

"সে ছেলে মানুষ মাই, তাতে এতদিন বিলাতে থেকে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। আর হাজার হ'লেও মা, সে আপনার বেটা, আপনি মা। আপনার কাছে সে হাজার অপরাধ ক'রলেও তাকে আপনি মাপ করবেন।"

মিনতি কথা কহিতে পারিল না। সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

রামধারী বলিল, "মা, আপনার ছেলে আমি, বুড়া মানুষ, হুকুম হয় তো দু একটা কথা

বলি। অনেক দুঃখ পেয়েছেন বাবু, মা—সে দুঃখ এই রামধারী বেটা দুই চক্ষু দিয়ে শুধু দেখেছে; কিছু ক'রতে পারে নি। অনেক দিন পর যদি বাবু দেশে ফিরে এসেছেন, আর তাকে দুঃখ দেবেন না মা—আপনিও আর দুঃখ পাবেন না। বাবু আমার ঝোঁকী মানুষ,, ঝোঁকের মাথায় কখন কি ক'রে বসেন তার ঠিক থাকে না। আমাকে তো দুশোবার তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি মা যদি তাতে রাগ করেন কি অভিমান করেন তবে সব ভাল হ'য়ে এসেও সব আবার নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই যে মা এতদিন আপনি রাগ ক'রে রইলেন তা না থেকে যদি একবার বাবুর কাছে যেতেন, অমনি বাবু জল হয়ে যেতেন, সব মিটে যেতো। সে যাক, যা' হ'বার হয়ে গেছে। এখন মা আপনি একটু ক্ষমা ক'রে নেবেন। বাবুর শেষ বয়সে আর যেন বাবু দুঃখ না পান। সব আপনার হাত মা।"

মিনতি চক্ষু মুছিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার হাত আর কই বাবা? আমি কি ক'রতে পারি। এখন বাবু আমাকে কাছে থাকতে দেবেন কি না তারই ঠিক:না নেই।"

"না মা না—সেজন্য ভাববেন না আপনি। একটু চুপ ক'রে সুধু চেপে থাকবেন, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমার বাবুকে তো আমি চিনি মা। এখন ষোল আনা আপনারই হাত। আমি আপনার ছেলে মা, আমার কাছে লজ্জা কি আপনার? আজ যা' হ'য়ে গেল এতো আমি বুঝতে পারছি, আমার বাবুর খোকা বাবুর সব দোষ। আপনার কিছু দোষ নেই। কিন্তু বাবু তাতে রাগ' ক'রবেন, হয় তো আপনাকে মন্দ বলবেন আরও কিছু ক'রবেন। আপনি যদি তাতে রাগ করেন তবেই সব নাশ হ'বে। আপনি এত সহ্য ক'রেছেন—আর কয়েকটা দিন যদি সুধু সহ্য ক'রে যেতে পারেন তবে শেষে কোনও গোল থাকবে না। বাবু যা' বলেন যা' করেন, কিছুতে কিছু বলবেন না—সুধু এ বাড়ী ছেড়ে যাবেন না মা। তা' হ'লেই, বস্, সব মিটে যাবে। রামধারী বুড়া কথা দিচ্ছে মা—কিছু গোল হবে না।"

বুড়ার কথায় মিনতির মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। এ তাকে বিশ্বাস করে। এই একজন লোকের তার উপর শ্রদ্ধা আছে। এ শিশিরকে অপরাধী করিয়া তার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে ইহাতে মিনতি অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

রামধারী যাহা বলিল তাহাতে মিনতির আস্থা হইল না। এত সহজে এ গোল মিটিবে বলিয়া তার মনে হইল না। কিন্তু সে কথা লইয়া রামধারীর সঙ্গে আলোচনা করিতে তার প্রবৃত্তি হইল না।

সে বলিল, "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক রামধারী। তুমি আমার বাপের বয়সী, তোমার কথা আমি রাখবো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার হাতে যা আছে তা আমি করবো। আমি এমন কিছুই করবো না যাতে তোমার বাবুর দুঃখ হয়। আমি সব সহ্য করবো।"

রামধারীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ভগবানজী আপনার ভাল করুন মাই। আমার আর কোনও চিন্তা নেই। আপনি এই বুড়ার কথাটা মনে রাখবেন। এখন আপনি কাজ কর্ম্ম করুন গে যান—বাবুকে এখন কোনও রকম ঘাটাবেন না। দু'দিনেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কোনও চিন্তা নেই।"

মিনতি একটু ভাবিল। সে যে কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছিল এ কথায় তাহা সব উলট পালট হইয়া যায়। সে ভাবিয়াছিল এখনি গিয়া সে শিশিরের সঙ্গে দেখা করিয়া শান্তভাবে তার সঙ্গে বোঝা পড়া করিবার চেষ্টা করিবে। তার অদৃষ্টে এখন কি আছে সেটা যত শীঘ্র জানা যায় তাই ভাল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ঠিক করিল রামধারীর বুদ্ধিই সে শুনিবে। সে শান্তভাবে গিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিল। কাজ করিতে করিতে সে সর্ব্বদাই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল শিশিরের আহ্বানের। শিশির একটু সুস্থ হইলেই যে তাহাকে ডাকিয়া তার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে এ সম্বন্ধে তার কোনও সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে শিশির একবার তার খোঁজও করিল না। সে স্নান আহার করিল, রামধারী ও দিলীপ তার দেখাশুনা করিল —মিনতি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া খাইবার জায়গায় না যাওয়াই স্থির করিল।

খাওয়া দাওয়ার পর যখন শিশির ও দিলীপ বিশ্রাম করিতে গেল তখন মিনতি দেবার্চ্চনায় বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া একাগ্র নিষ্ঠার সহিত সে পূজা করিল, তার পর বিগ্রহের সম্মুখে প্রণত হইয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া মনকে শান্ত করিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে স্থির করিবার চেষ্টা করিল। পূজান্তে প্রসন্ন অন্তরে উঠিয়া সে খাইতে গেল।

খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মিনতি বই পড়িতে লাগিল। তোতারাম তুলসীদাস খানা ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহা লইয়া সে পড়িতে লাগিল। বইখানা হাতে লইতেই তার চক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল। তোতারামের জন্য তার প্রাণটা ভয়ানক কাঁদিয়া উঠিল। সে আহ্লাদীর খোঁজ করিল। জানিল সে তখনও ফেরে নাই। মিনতি একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল।

বহুকষ্টে মন শান্ত করিয়া সে রামায়ণ পড়িতে লাগিল। সে পড়িল সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথা, তার পর সীতার নির্ব্বাসনের কথা। পড়িতে পড়িতে জানকীর দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে সে পড়িয়া গেল।

তার পর বই বন্ধ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল। জগতের আদর্শ সতী, লক্ষ্মীর অবতার সীতা দেবীকে তাঁর স্বামী সন্দেহ করিয়াছিলেন। সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় আপনাকে শুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার অযোধ্যায় আসিয়া প্রজার মধ্যে তাঁর অখ্যাতি রটিল। রামচন্দ্র

তাহাতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাপলেশশূন্য হইয়া দেবী সীতার যদি এ নিগ্রহ হইয়াছিল তবে সামান্য মানবী মিনতির যে এ দুর্গতি হইবে এ আর আশ্চর্য্য কি? পূর্ণ ব্রহ্মের অবতার শ্রীরামচন্দ্র যদি ভ্রান্ত হইয়া সীতার সতীত্বের প্রতি সন্দিহান হইতে পারিয়াছিলেন, তবে শিশিরের পক্ষে মিনতির চরিত্রে সন্দেহ করা এমনি কি গুরুতর অপরাধ? একথা ভাবিতে মিনতি আশ্চর্য্য শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিল। ইহার পূর্ব্বে সে এই ভাবিয়া গ্লানি বোধ করিয়াছিল যে নির্দ্দোষ হইয়াও সে সমাজে নিন্দিত হইবে, হীন পাপিষ্ঠা স্বৈরিণী ও গণিকার সঙ্গে এক পর্য্যায়ে তার স্থান হইবে। এখন সে এই কথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিল যে তার স্থান হইবে জানকীর পার্শ্বে। দেবচরিত্র যে সকল বীর পুরুষ ও নারী সমাজের অজ্ঞতা ও অত্যাচারে নির্য্যাতিত হইয়া বীরত্ব ও গৌরবের অশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন গৌরবে না হউক অপমানে ও দুঃখভোগে মিনতি তাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান লাভ করিবে একথা ভাবিয়া তার চিত্ত গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল।

তার মনে হইল এইতো চাই। সুখভোগ তো সবাই করিতে পারে দুঃখ সহিবার শক্তিতেই প্রকৃত বীরত্ব। যারা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাদেরই সৌভাগ্য হয় অন্যায় নির্য্যাতন ভোগ করিবার। সাধারণ লোকের জন্য সুখ—দুঃখ আছে জগতে বীরের জন্য। খৃষ্টানদের ধর্ম্মে ক্রুশ এই অন্যায়ের নির্য্যাতনের প্রতীক—ক্রুশ বহন করা খৃষ্টানের সব চেয়ে বড় গৌরব। চৈতন্যদেব জগাই মাধাইয়ের কাছে দারুণ লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছিলেন। এযাবৎ সেই জগাই মাধাই জগতের লোক ভালকেই চিরদিন নির্য্যাতন করিয়া আসিয়াছে।

একথা ভাবিতে ভাবিতে মিনতির চিত্ত একটা বৃহৎ গৌরব বোধে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যে গৌরবের নেশায় উন্মত্ত হইয়া খৃষ্টীয় martyr গণ হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন, যে গৌরবের উত্তেজনায় ভারতের সতী হাসিতে হাসিতে অগ্নিবরণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরবের মদিরায় তার চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে তার শাস্তিকে যীশুর কণ্টক-মুকুটের মত পবিত্র ও গৌরবময় বলিয়া মনে মনে সম্বর্দ্ধনা করিল, ভগবান যে তাকে এত দুঃখের যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলিয়া প্রকাশ করিলেন, সেইজন্য সে তাঁহাকে বারবার নমস্কার করিল।

বৈকালে আহ্লাদী ফিরিয়া আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া একখানা চিঠি দিল। ফিস ফিস করিয়া সে বলিল, “মা গো, সে কি খুঁজে পাই? এ-ঘাট সে-ঘাট, এঘর সেঘর খুঁজতে খুঁজতে সেই গেনু সেই রথতলার ঘাটে। সেখানে গিয়ে দেখি সন্ন্যাসী ঠাকুর গাছ তলায় কম্বল বিছিয়ে পড়ে রইছে। চিঠি তো দিলাম—তা জবাব দিবেক কেমন করে? সেই ছুটলাম আবার সেই মল্লিকদের ঘরে। সেখানে আমার এক বহিন কাজ করে। তার ঠেঙ্গে আনলাম চেয়ে একটা কলম দোয়াত তবে ঠাকুর চিঠি লেখে—আর লিখতে কি চায়? বলে কি—না

চিঠি লিখবো নাই তুমি মুখেই বলো গিয়ে। কি জানি চিঠি লিখিলে ফির কে কি ভাববেক। আমি বল্লাম সে ভয় করো নাই ঠাকুর—আহ্লাদী সে মেয়ে নয়।”

ইত্যাদি করিয়া আহ্লাদী সুদীর্ঘ বাক্য বিন্যাসের সহিত নিজের দৌত্যের বিবরণ বলিয়া গেল। এবং সে যে একটা ভারী রকম বকশীসের আশা রাখে তাহা জানাইল। মিনতির হাতবাক্স খুঁজিয়া পাঁচটা টাকা বাহির হইল তাহা সে আহ্লাদীকে দিল। বড় দুঃখে তার হাসি পাইল। আহ্লাদী তাকে যাহা ভাবিতেছে তাহা ভাবিয়া সে একটু কৌতুক অনুভব না করিয়া পারিল না।

আহ্লাদীকে বিদায় করিয়া মিনতি চিঠি পড়িল। তোতারাম লিখিয়াছে—

“মা, আপনার আশীর্ব্বাদী টাকা পাইলাম। টাকার আমার দরকার ছিল না। তবু আপনার স্নেহের দান আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম।

“আমি আপনার দুঃখের কতক নিবৃত্তি করিবার আশায় আসিয়াছিলাম। আপনার মাতৃস্নেহে আমার জীবন ধন্য হইয়াছে কিন্তু আপনাকে কেবল আমি অশেষ দুঃখ দিয়া গেলাম। এখন আর আপনার কাছে থাকিয়া অপরাধ বাড়াইব না।

“যদি আপনার কোনও বিষয়ে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এবং আমাকে যদি স্মরণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে এই ঠিকানায় জানাইলেই আমার কাছে সংবাদ পৌঁছিবে।” তারপর সে ঢাকা জেলার একটা ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছে।

পত্রখানা মিনতি সযত্নে বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখিল।

(২৪)

সন্ধ্যা বেলায় রামধারী বিছানা করিবার পূর্ব্বে শিশিরকে জিজ্ঞাসা করিল, “খোকা বাবুর বিছানা কি তাঁর পুরানো ঘরেই ক'রে দেবো ?”

শিশির বলিল, “না এই ঘরেই আর একখানা খাটিয়া এনে দে।”

রামধারী বলিল, “এ ঘরে মাইজী থাকবেন—তা খোকা বাবু”—

শিশির ধমক দিয়া বলিল, “না মাইজী এখানে থাকবে না। যা' বলছি কর।”

রামধারী মুখ ভার করিয়া শিশিরের বিছানা তুলিয়া ঝাড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বিছানা করিতে লাগিল আর বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতে লাগিল, “বেশ হ'বে। আমার কি ? লোকে থুক দেবে। ঘরের কথা ঢাক পিটিয়ে বললে মান ইজ্জত সব থাকবে আর কি ? মিথ্যে একটা কেলেঙ্কারী হ'বে।”

ছাড়াছাড়াভাবে এই কথাগুলি বলিয়া বলিয়া রামধারী বিছানার এক একটা জিনিষ টানিয়া উঠাইতে লাগিল। তার পর তোষকটা ঝাড়িয়া সে বলিল, “ভদ্রলোকের মান আপনি রাখলেই থাকে, আপনি বিলিয়ে দিলেই যায়।” তোষকটা পাতিয়া বলিল, “ঘরের

মেয়েছেলের কথা সত্যি হ'লেও জান গেলে কেউ বাইরে জানতে দেয় না।" তারপর চাদরটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "এতো মিথ্যে কথা—এক দম মিথ্যা!"

"কি বিড়্ বিড়্ বকছিস্ তুই?" বলিয়া শিশির আর একটা ধমক দিয়া উঠিল।

"না কি বকবো? অনেকদিন আছি হুজুরের কাছে—তাই মনে লাগে। বলি।"

"তুই কি বলতে চাস্? তোর্ আস্পর্দ্ধাটা বড় বেড়ে গেছে।"

"কি আর বলবো? আপনি যা ভাবছেন সব মিথ্যে, এই আর কি? নাহক সুধু খোকা বাবু একটা সাধু-সন্ন্যাসীকে নাকাল ক'রলে।"

"চুপ কর! তুই সবজান্তা কি না?"

কিন্তু শিশিরের ক্রমে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল যে রামধারীর কথা কতকটা ঠিক। মিনতির চরিত্র সম্বন্ধে তার যে সন্দেহ সেটা যে সত্য তাতে কোনও সংশয় তার হইল না, কেন না সে যাহা শুনিয়াছে ও নিজ চক্ষে যাহা দেখিয়াছে তার উপর আর কারও কোনও কথা বলা চলে না। কিন্তু তবু দিলীপের পক্ষে সে বিষয় লইয়া এমন হট্টগোল করাটা ঠিক হয় নাই। ইহাতে ব্যাপারটা বিসদৃশ রকমে জানাজানি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এ সব কথা লোকের কাছে ঢাক পিটিয়া জানাইবার মত কথা নয়। কেন না ইহাতে সমাজে যে কেবল অপরাধিনী পত্নীর নিন্দা হয় তাহা নয় সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীর ও তার পরিবারের কলঙ্ক হয়। এতটা না করিলেই ভালো হইত।

তারপর এতদিন পর দেশে ফিরিয়া আজ যদি সে মিনতিকে ঘরে আসিতে না দেয়, সে যদি স্বতন্ত্র ঘরে শোয় তবে সেও এক রকম ঢাক পিটাইয়া কথাটা প্রচার করা হইবে। সুতরাং মিনতির সান্নিধ্য তার কাছে যত কষ্টকর হউক, যে কয়দিন শিশির এখানে আছে, সে কয়দিন মিনতির এ ঘরে শোয়াই ভাল। বেশী দিন শিশির এখানে থাকিবে না। কালই সে দিলীপকে লইয়া কলিকাতা যাইবে—না হয় তো পরশু দিন। এ একটা দুইটা দিন কোনও মতে কাটাইয়া দিলে বোধ হয় কলঙ্কটা কমিতে পারে। তার পর আর তো শিশির মিনতির কাছে আসিবে না।

যখন রামধারী বিছানা সারিয়া আবার গজর গজর করিতে করিতে ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল, তখন শিশির তাকে বলিল, "আচ্ছা যা' খোকার বিছানা পাশের ঘরেই করগে।"

রামধারী খুশী হইয়া খুব জোরে জোরে ঝাঁটা চালাইতে লাগিল। ঝাঁট দেওয়া হইয়া গেলে সে বলিল, "মাইজী তা' হ'লে এখানেই শোবেন।"

শিশির বলিল—"হাঁ।"

উৎফুল্ল হৃদয়ে রামধারী চলিয়া গেল। মিনতির কাছে গিয়া বলিল, "এইবার মা,

বুড়ার কথা মনে রাখবেন। বাবুর ঘরে আপনার বিছানা হ'য়েছে। রাত্তিরে হয় তো কথা কিছু হ'তে পারে। মা, আপনি একটু ক্ষমা ক'রে সয়ে যাবেন দয়া ক'রে।"

প্রভুভক্ত ভৃত্যের এই আগ্রহ দেখিয়া মিনতির চক্ষে জল আসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "আচ্ছা বাবা আমার জন্ম কোনও ভয় নেই।"

রাত্রে শিশির ও দিলীপ যখন খাইতে বসিল তখন মিনতি সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার মুখ প্রসন্ন উদ্বেগশূন্য। সে হৃদয়কে নিয়মিত করিয়া সকল দুঃখ বরণের জন্ম প্রস্তুত করিয়াছে, তার সমস্ত চিন্তা ভগবানের পায় সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে—তাই সে প্রসন্ন।

শিশির অনুভব করিল মিনতি আসিয়াছে। সে কোনও কথা না বলিয়া নীরবে গম্ভীর হইয়া আহার করিল। দিলীপও কোনও কথা বলিল না। মিনতি কেবল তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহারা খাইয়া গেলে মিনতি আহার করিল। তারপর সে আপনার ঘরে গিয়া তার মহাপরীক্ষার জন্ম কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিবাহ বাসরে কেবল এক রাত্রিমাত্র সে স্বামীর সঙ্গলাভ করিয়াছিল, তারপর একদিনও সে স্বামীর শয্যায় স্থান পায় নাই—তার ফুলশয্যা হয় নাই।—আজ তার ফুলশয্যা—অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! কত আশা ভরসা, কত আনন্দের স্বপ্ন লইয়া সে ফুলশয্যায় যাইবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু আজ তার ফুলশয্যা রচিত হইয়াছে তার সকল আশা ভরসার ভগ্নস্তূপের উপর, ভগ্নহৃদয়ের জীর্ণ সমাধির উপর। স্বামীর প্রতি কি অপরিসীম প্রেম লইয়া সে এ ঘরে আসিয়াছিল—আজ আট বৎসর দুঃখের নিপীড়নে সে প্রেম এক তপ্ত উদাস বাষ্পে পরিণত হইয়াছে। সে বাষ্প তার হৃদয় পরতে পরতে দগ্ধ করিয়া তাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আজ সে নববধূর বেশে যাইতেছে স্বামীর শয্যায় স্থান লইতে—কিন্তু সে নববধূর কঙ্কালমাত্রও তার অন্তরে নাই। তার সে প্রেম নাই, সে আশা নাই, সুখ নাই—বুঝি হৃদয় পর্য্যন্ত নাই। তার নিজের অসীম দুঃখের মাঝেও সে একথা মনে করিল যে তার স্বামীকে দিবার তার কিছুই নাই। সম্পূর্ণ রিক্তা হইয়া সে শূন্য হৃদয় লইয়া ফুলশয্যায় চলিয়াছে।

মিনতি ভাবিল, এখন কি হইবে? স্বামী তাকে কি ভাবে সম্ভাষণ করিবেন? কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন? তার কাছে কোন দাবী করিবেন? কেমন করিয়া সে স্বামীর কথার উত্তর দিবে?

স্বামী যে তাকে স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইবেন এমন সন্দেহের আভাসমাত্রও তার মনে উঠিল না। আর সে সম্ভাষণের জন্ম বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষাও তাকে

P30192

পীড়া দিল না। সে স্বামীকে কল্পনা করিল বিচারকরূপে। স্বামী হয়তো তাহাকে তার কল্পিত অপরাধের জন্ম তিরস্কার করিবেন।

তখন সে কি উত্তর দিবে? প্রথমেই সে ভাবিল, সে কোনও উত্তর দিবে না, নিজের দোষক্ষালনের কোনও চেষ্টা করিবে না। অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টার মধ্যে যে একটা হীনতা আছে তাহার কল্পনায় তার হৃদয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তারপর ভাবিল সে মাথা খাড়া করিয়া বলিবে, "আমি যাই ক'রে থাকি সে সম্বন্ধে জবাবদিহি করবার তোমার কি অধিকার আছে। তুমি তো আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছ। বিবাহের পর হ'তে তো তুমি আমার কোন খবরই নেও নি। তুমি আমার বিচার করবার কে?" কিন্তু তার মনে পড়িল যে সে রামধারীকে কথা দিয়াছে সে সহিয়া যাইবে। তাই একথা সে নামঞ্জুর করিল। তারপর সে ভাবিল সে কোনও কথা বলিবে না, তার যে শাস্তি হয় নীরবে তাহা গ্রহণ করিবে। এমন শাস্তি জানকীর হইয়াছিল—তার কেন না হইবে?

ভাবিতে ভাবিতে রামধারী আসিয়া পড়িল। সে বলিল, "যান মা, বাবু শুয়েছেন আপনি এখন ঘরে যান।"

মিনতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "রামধারী তুমি মানুষ নও দেবতা। আর জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার বাপ ছিলে। আমি তোমার মেয়ে বাবা।"

বুড়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "মা, ভগবানের কাছে ভিক্ষা করি যেন আর জন্মে আমি রাজা হই আর তুমি আমার বেটী হও।"

সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

মিনতি তখন ভাবিতে লাগিল কি বেশে সে যাইবে। সে অন্যমনস্ক ভাবে চিরুণী হাতে করিয়া এতদিনকার অযত্নে লাঞ্ছিত চুলগুলি আঁচড়াইতে লাগিল। একবার ভাবিল কাপড় খানা ছাড়িয়া লইবে। তারপর হাসিল। সাজিয়া গুজিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার দিন কি তার আছে? আর সাজাইবেই বা কাকে। আরসীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তার মুখের সে শ্রী আর নাই। আটাশ বৎসর বয়সেই সে শুকাইয়া বার্দ্ধক্যের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তার যে চক্ষের দৃষ্টিতে শিশির একদিন মুগ্ধ হইয়াছিল তাহা এখন কোটরে প্রবেশ করিয়াছে। রূপ তার কোনও দিনই বেশী ছিল না, এখন তার কিছুই নাই। যে করুণ তপঃক্লেশের মাধুরী তার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা মিনতির চক্ষে পড়িল না।

সে স্থির করিল সে যেমন আছে ঠিক তেমনি অবস্থায়ই যাইবে। একখানা মোটা চাদর লইয়া সে তার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া চলিল।

রামধারী বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। সে দেখিয়া মনে মনে রাম নাম জপ করিতে লাগিল। দ্বারের কাছে মিনতির কানে কানে বলিল, "মনে রাখবেন না, রাগ ক'রবেন না।"

23,185

একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া লজ্জিত হাস্যের সহিত মিনতি ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরে ঢুকিয়া মিনতি দেখিল শিশির পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। ঘুমের ভাণ করিয়া সে পড়িয়া আছে তাহা মিনতি বুঝিতে পারিল, কিন্তু সে ভাণ ভাঙ্গিতে তার ইচ্ছা হইল না।

অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল এখন সে কি করিবে। খাটে উঠিয়া স্বামীর পাশে শুইবার চিন্তায় তার দারুণ ঘৃণা বোধ হইল। সে কি বেশ্যা? স্বামী যদি তাকে না চান তবে সে কোন লজ্জায় তাঁর শয্যা অধিকার করিবে। সে মেঝের দিকে চাহিয়া দেখিল—বেশ পরিষ্কার। বিছানা হইতে অতি সন্তর্পণে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া সে মাটিতে তাহা রাখিয়া গায়ের চাদরখানা বেশ করিয়া মুড়িয়া শুইয়া পড়িল—অনেকক্ষণ তার ঘুম হইল না। এই নূতন অবহেলার অপমানে তার অন্তরের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল। তার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। দারুণ জিঘাংসায় সে দগ্ধ হইল। শেষে সে আয়ত্ত করিল যে এ অপমানের কোনও প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তার নাই। তখন সে কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে তার উপাধান ভিজাইয়া ফেলিল, তারপর অনেক রাত্রে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর বেলায় উঠিয়া শিশির দেখিল মিনতি মেজেয় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তখনও তার মুখে অশ্রুর ছাপ লাগিয়া আছে। একবার শিশিরের মনে একটু করুণার উদ্রেক হইল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উপরের দিকে চাহিল। বিদ্যুতের ছবির দিকে তার দৃষ্টি পড়িল। এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত অন্তর বিষে ছাইয়া গেল। শিশির দুয়ার খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিনতির যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন সে দেখিতে পাইল শিশির উঠিয়া গিয়াছে। মিনতি উঠিয়া বসিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। অপমান বোধে তার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল—সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তার মনে হইল কেন সে এ অনাদরের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া এ ঘরে আসিতে গিয়াছিল; তার স্বামীর দৃষ্টি ও ব্যবহারের ভিতর যে নীরব অভিযোগ, তার যোগ্য উত্তর দিয়া সে কেন দূরে থাকে নাই। তার মানের মাথা খোয়াইয়া সে কেন এঘরে শুইতে আসিয়াছিল?

শিশির না জানি কি ভাবিতেছে। তার এ অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়া সে নির্লজ্জের মত ছুটিয়া আসিয়াছিল—স্বামীর আদর কাড়িতে—স্বামী তাকে নিদারুণ অপমান করিয়া তার লোভের লাঞ্ছনা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় তাঁর খুবই তৃপ্তি হইয়াছে। নিষ্ঠুর বালকেরা 'তু' বলিয়া কুকুরকে ডাকে কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে কাছে ছুটিয়া যায়, অমনি তারা তাকে চাবুক লাগাইয়া দেয়। কুকুর কেঁউ কেঁউ করিয়া ছুটিয়া পালায়—বালকেরা আনন্দে

হাসিতে থাকে। কিন্তু আবার তু বলিয়া ডাকিলে আবার লেজ নাড়িয়া ছুটিয়া আসে। শিশির নিশ্চয় মিনতিকে এই কুকুরের মত লজ্জাহীন, কুকুরের চেয়ে আত্মসম্মানহীন মনে করিতেছে, আর তার এই অপমান করিয়া শিশির খুব একটা নিষ্ঠুর আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। একথা মনে হইতে মিনতির আপনাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। ছি! ছি! ছি! বুদ্ধিহীন রামধারীর কথায় ভুলিয়া সে নিজের আত্মসম্মান এমন করিয়া বিলাইয়া দিল! ধিক!

আপনাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া মিনতি ছুটিয়া নিজের ঘরে গেল। পথে রামধারী দাঁড়াইয়া ছিল। তার দৃষ্টির ভিতর জিজ্ঞাসার ছায়াপাত দেখিয়া মিনতি যেন একবারে মর্ম্মে মরিয়া গেল। আত্মগোপন করিবার এক নিদারুণ আকাঙ্ক্ষায় সে মাথার উপর চাদরটা টানিয়া দিয়া ধাঁ করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দিল।

(২৫)

মিনতির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের আঘাত সামলাইয়া উঠিবার পর শিশির মিনতির সম্বন্ধে কোনও কথা কারও সঙ্গে বলে নাই। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তার একটা নিদারুণ লজ্জা বোধ হইতেছিল। বিশেষ করিয়া দিলীপের কাছে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

দিলীপও এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে নাই। প্রথম রাগের ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া সে তোতারামকে নিদারুণ আঘাত করিয়াছিল কিন্তু তার পর সে আর কিছু বলে নাই। তারও এ বিষয়ে যথেষ্ট লজ্জাবোধ ছিল।

যখন মিনতির ঘর হইতে বাহির হইয়া আহ্লাদী বাহিরে চলিয়া গেল তখন দিলীপ লক্ষ্য করিয়াছিল। তখন সে কিছু মনে ভাবে নাই। কিন্তু যখন সারাদিন পরে আহ্লাদী ফিরিয়া আসিয়া তার সম্মুখ দিয়া আবার মিনতির ঘরে গেল, তখন তার সন্দেহ হইয়াছিল। আহ্লাদী যে মিনতির কাছে ফিস ফিস করিয়া গোপনে কোনও কথা বলিতেছে তাহা দিলীপ একটু দেখিতে পাইয়াছিল এবং পত্রখানা দেওয়াও তার চক্ষে পড়িয়াছিল।

তার পর হইতে দিলীপ আহ্লাদীকে গোপনে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইল, কিন্তু সেদিন কোনও সুবিধাই করিতে পারিল না।

পরের দিন সকাল বেলায় দিলীপ বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গার ধারে গিয়াছিল। সেখানে সে হঠাৎ আহ্লাদীকে দেখিতে পাইল। তখন সেখানে আর কোনও লোকজন ছিল না। দিলীপ আহ্লাদীর কাছে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল তুই সন্ন্যাসীটার কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিলি?"

আহ্লাদী জিভ কাটিয়া একেবারে অস্বীকার করিল। কিন্তু দিলীপ যখন তাকে খুব জোরে ধমক দিল—তখন আহ্লাদীর মনে পড়িয়া গেলে দিলীপের হাতে তোতারামের লাঞ্ছনার

চিত্র। সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমে দিলীপ তার কাছে সব কথাই আদায় করিয়া লইল—অর্থাৎ আহ্লাদী যেমন বুঝিয়াছিল তেমনিভাবে। তখন দিলীপের মনে একটা দারুণ ঘৃণা ও ক্রোধ গর্জ্জিয়া উঠিল। সে সেই ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তার ইচ্ছা হইল যে মিনতির মাথা মুড়িয়া ঘোল ঢালিয়া চাবুক মারিতে মারিতে বাড়ী হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ ভাবিতে তার মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। ইহা যে একেবারে অসম্ভব, আর এ সম্বন্ধে তার পিতা কিছু না করিলে যে ইহা দিলীপের পক্ষে অসহ্য অনধিকার চর্চ্চা তাহা সে বুঝিল। তাই সে কেবল আপনার ঠোঁট কামড়াইয়াই নিবৃত্ত হইল। স্ত্রীজাতির প্রতি তার যে গভীর ঘৃণা ছিল, তাহা আরও বাড়িয়া গেল।

যখন দিলীপ বাড়ী ফিরিল তখন শিশির তাকে ডাকিয়া বলিল, “চল দিলীপ, আমরা ক'লকাতায় গিয়ে বাস করি'গে।”

দিলীপ বলিল, “চলুন; সেই ভাল।” “চল আজই বৈকালে যাওয়া যাক।”

দিলীপ সম্মত হইল, কিন্তু সে বলিল, “চুঁচুড়ার এবাড়ী রাখবার তো কোনও দরকার দেখি নে—মিথ্যেমিথ্যি কতকগুলো খরচ।

শিশির গম্ভীরভাবে বলিল, “তা ঠিক—কিন্তু সে সম্বন্ধে ওঁর যা ইচ্ছা তাই হ'বে।”

“ওঁর এখানে থাকবার কোনও দরকার নেই। উনি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকলেই পারেন, না হয় দেশে গিয়ে থাকতে পারেন। সেখানে দেখবার শোনবার লোক আছে।”

শিশির চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, “যাক, সে সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলতে চাই নে। কলকাতায় গিয়ে ভেবে চিন্তে যা'হয় একটা কিছু ক'রতে হ'বে। এখন তা'হ'লে সব ঠিক ঠাক ক'রে নেও। চারটের গাড়ীতেই যাওয়া যাবে।”

দিলীপ বলিল, “তা হ'লে আমি একবার গোপেনের কাছে ব'লে আসি। তার সঙ্গে একটা engagemet ক'রেছিলাম।”

দিলীপ বাহির হইয়া গেল। শিশির রামধারীকে ডাকিয়া জিনিষ-পত্তর সব গুছাইতে বলিল।

রামধারী বলিল, “ক' দিনের জন্য যেতে হ'বে ?” খুব জোরে শিশির বলিল, “চিরদিনের জন্য। আর ফিরবো না। সব জিনিষ-পত্তর নিয়ে চল্।

রামধারী স্তম্ভিত হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, সে নড়িল না।

শিশির বলিল, “কিরে দাঁড়িয়ে রইলি যে। যা জিনিষ পত্তর গুছাগে।”

রামধারী ক্ষেপিয়া উঠিল। সে বলিল, “আপনি কি পাগল হ'য়েছেন বাবু ? এত দিন ঘুরে যদি বা ঘরে ফিরলেন আবার ছুট। এমন ক'রে ক' দিন বাঁচবেন।”

"ঠিক যতদিন ভগবান বাঁচাবেন তত দিন বাঁচবো। তোর পাহারাদারীতে আমি তার চেয়ে একদিনও বেশী বাঁচবো না ; যা।"

তবু রামধারী নড়ে না।

শিশির আবার তাগাদা করিতে তার মনের ভিতর যে কথাটা সব চেয়ে বেশী খোঁচা দিতেছিল তাহা বলিয়া ফেলিল। সে বলিল, "তার পর মাইজী থাকবেন কোথায় ?"

শিশির গর্জ্জিয়া বলিল, "যে চুলোয় তার মন চায় সেইখানে সে যাবে। সে জন্ত তোর মাথা ঘামাতে হ'বে না।"

রামধারী রাগ করিয়া বলিল, "আপনার জিনিষ আপনি গুছান গে বাবু, আমি পারবো না। আমি আপনার চাকরী ক'রবো না।"

রোষরক্ত দৃষ্টিতে শিশির তার দিকে চাহিল। চাহিয়া দেখিল বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। পুরাতন ভৃত্যের দুঃখ দেখিয়া শিশিরের মনটা নরম হইয়া গেল।

সে একটু নরমসুরে বলিল, "তোর কি হ'য়েছে রামধারী, তুই কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিস ?"

"পাগল হইনি বাবু। আমার দোষ এই যে আমি আপনার মত চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ হইনি। আমি মানুষ দেখলে চিনতে পারি। তা ছাড়া কান দিয়েছেন ভগবান, সব কথা শুনতে পারি। আর চক্ষের উপর যখন দেখছি আপনারা একটা নির্দ্দোষ মেয়েমানুষকে পিষে মেরে ফেলছেন আর নিজে মরতে ব'সেছেন তা' সইতে পারি না। এই আমার দোষ।"

"চোখ আমারও আছে রামধারী। কান দিয়ে আমিও শুনতে পাই। তাই আমার তোর সঙ্গে পরামর্শ করবার দরকার হয় না। সত্য মিথ্যা বিচার করতে করতে জীবন কেটে গেল, আজ তোর কাছে আমার সে কথা শিখতে হ'বে না।"

"ভগবান আপনার কি বুদ্ধি দিচ্ছেন আর কেন দিচ্ছেন তা তিনিই জানেন। কিন্তু বাবু, আমি জান কবুল ক'রে বলতে পারি মাইজী দেবতা—তাঁর কোনও দোষ নেই। আর আপনি যদি মাইজীর উপর এ অত্যাচার করেন তবে আপনার চাকরী আমি করবো না— আমার সাফ কথা।"

বিরক্ত হইয়া শিশির বলিল, "আচ্ছা না করিস না করবি। বেরো এখান থেকে।"

রামধারী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল। শিশির তার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তার মর্ম্মস্থল হইতে বাহির হইল। এই পুরাতন প্রভুভক্ত ভৃত্যের অশ্রুজল তার অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিল।

রামধারী মিনতির কাছে গিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "মা, বাবুর চাকুরী ছেড়ে দিলাম, আজ থেকে আমি আপনার চাকর।"

"সে কি রামধারী? কি হ'য়েছে?"

"কি আর হ'য়েছে? বাবুর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

ক্রমে নানা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে রামধারী শিশিরের সঙ্গে তার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিল। মিনতির মুখখানা সামান্য একটু ভার হইয়া উঠিল।

সে শান্তভাবে বলিল, "কেন, তুমি আমার জন্য তোমার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে গেলে রামধারী? আমি তো তোমাকে কিছু বলি নি।"

"আপনি কিছু বলেন নি। কিছু বলেন না সেই তো যত গোল। যদি আপনি কথা ব'লতে জানতেন তবে কি এ সব হ'তে পারে? এখনও ধর্ম্ম আছেন মা। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। এমন অধর্ম্ম সইবে না মা, সইবে না।"

"ছি রামধারী, তুমি বুড়ো মানুষ হ'য়ে বাবুকে শাপছো।"

"ভগবান জানেন মা বাবুর জন্য আমার বুকটা কেমন ক'রছে। আমি তাকে শাপছি না। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি ভগবান তাকে শাস্তি দেবেন?"

"ভগবান কাকে শাস্তি দেবেন, কাকে পুরস্কার দেবেন তার মালিক তিনি। আমাদের সে বিচারে কাজ কি বাবা? যাও তুমি বাবুর জিনিষ-পত্তর গুছাও গে।"

"না মা, বাবুর চাকরী আমি করবো না।"

"তা না ক'রলে। আমার চাকরী তো ক'রবে। চল আমি সব গুছাব, তুমি আমার সাহায্য করবে।"

মিনতি অগ্রসর হইল। রামধারী স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। এ মেয়ে কি? সে নীরবে স্বামিনীর অনুগমন করিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া মিনতি শিশিরের বাক্স পেটারা খুলিয়া আবার তাহা ভাল করিয়া গুছাইয়া দিল। তার বিছানা-পত্র রামধারীর সাহায্যে বাঁধিয়া ফেলিল। শিশিরের যে সব জিনিষ বরাবর এ বাড়ীতে ছিল, সেগুলি সে আর দুই তোরঙ্গ ভরিয়া গুছাইল। বিদ্যুতের ছবিখানা সাবধানে নামাইয়া সযত্নে বাঁধিয়া দিল। এমন সৌষ্ঠবের সহিত সে এ সব করিল যে রামধারী অবাক হইয়া গেল।

এ সব করিতে করিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। শেষ বাক্সটা গুছাইবার সময় শিশির আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণ পরিশ্রম করিয়া মিনতি অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছিল। মুক্তার মত স্বেদবিন্দু সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে অঞ্চল দিয়া মুখ মুছিয়া মুক্ত কেশ পৃষ্ঠে সরাইয়া দিয়া আবার নতমুখে বাক্স গুছাইতে লাগিল। শিশির তার এ মূর্ত্তি দেখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

শিশিরকে দেখিতে পাইয়াই মিনতি মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রামধারী অন্ত দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। মিনতি নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। শিশিরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিনতি শেষে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "রামধারী বল্লে তুমি একেবারে চলে' যাচ্ছ। আমাকে কি আদেশ দিয়ে যাচ্ছ?"

শিশিরের মোহ কাটিয়া গেল। সে খাটের পায়ার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমাকে আমার বলবার কিছুই নেই। তোমার যা' ইচ্ছা ক'রতে পার।"

"কেন? আনি কি ক'রেছি?"

ভ্রুকুটি করিয়া শিশির বলিল, "কি ক'রেছ তা তুমিও জান আমিও জানি, আর আমি যে জানি তাও তুমি জান। সে কথা নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি?"

একবার নিনতির চক্ষের ভিতর একটা বিদ্যুতের ঝলক দিয়া গেল। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া আবার মুখ নত করিয়া বলিল, "আনি অপরাধ ক'রেছি এই যদি স্থির ক'রে থাক, তবে শাস্তি তো দিতে পার? আমি কি শাস্তি পাবার যোগ্যও নই?"

মিনতির এই প্রশান্ত মূর্ত্তি ও শান্ত বাক্যে শিশিরের অন্তর যেন খড়্গাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ওঃ কি ভয়ঙ্কর এই নারী। এত বড় অপরাধ করিয়া সে এমন নির্ব্বিকার? আর স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অম্লানবদনে নির্ব্বিকারভাবে এমনি করিয়া সে অপরাধ স্বীকার করিতে পারে। বুকের ভিতর দারুণ ঝঞ্ঝা অনেক কষ্টে চাপিয়া শিশির বলিল, "না, শাস্তি দেবার কর্ত্তা ভগবান। আমি কেবল মুক্তি গ্রহণ ক'রলাম।"

"বেশ তাই ভালো। কিন্তু তবে তোমার এ সংসারের ভার থেকে আমায় মুক্তি দেও। এ আট বৎসর আমি এ সংসার আগলে র'য়েছি কেবল দিলীপের ফিরে আসবার প্রতীক্ষায়। এখন দিলীপ এয়েছে। তুমি তোমার ছেলে পেয়েছ। এখন আর আমার এ বিড়ম্বনায় প্রয়োজন নেই। আমাকে বিদায় দেও।"

এ কথায় শিশিরের মনে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিয়া বিষ ঢালিয়া দিল। দারুণ হিংসা ও আক্রোশে তার সমস্ত মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। তার চেষ্টালব্ধ শান্ততা এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। সে দাঁত খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন? কোথায় যাবে? কোন ভাগাড়ে? ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে?"

এ কথায় মিমতির মনের ভিতর চাপা আগুন যেন ঘৃতাহুতি পাইয়া দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে দৃষ্টিতে আগুন ছড়াইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ অসহনীয় অকথ্য ঘৃণায় রুদ্ধবাক্ হইয়া রহিল। তারপর বলিল, "দেখ, ও কথা বলো না, জিভ খসে' পড়বে। সে আমার ছেলে—আমি তার মা।"

দর্পের সহিত কথাটা বলিয়া মিনতি বেগে মুখ ফিরাইয়া চলিল—তার বুক ঠেলিয়া যে কান্না আসিতেছিল তাহা সে কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না। তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

শিশির সে তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তার মনে ভয়ানক গোল লাগিয়া গেল। সে বলিল, "দাঁড়াও যেও না।"

মিনতি থামিল, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া রহিল। তার অশ্রুপ্রবাহ সে কিছুতেই তার স্বামীর সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারে না।

শিশির বলিল, "তুমি বলতে চাও তুমি নির্দ্দোষ?"

দর্পের সহিত মিনতি বলিল, "সে কথা জেনে তুমি কি ক'রবে। আমি—আমি তো তোমার কেউ নই—বিবাহের পরের দিন থেকে তুমি আমার কোনও খবর নেওয়া দরকার মনে কর নি আমার কোনও কথা তো তোমার শোনবার দরকার নেই।"

শিশির ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, "দরকার আছে ব'লেই বলছি মিনতি—আমার মরণ বাঁচন তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রছে বলে জিজ্ঞাসা করছি—তুমি নির্দ্দোষ?"

মিনতি কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়াইয়া চুপ করিয়া রহিল—তারপর মাথা উঁচু করিয়া গর্ব্বিত দৃষ্টিতে শিশিরের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ আমি নির্দ্দোষ—কোনও পাপ আমি করি নি, কোনও অপরাধ করি নি।"

শিশির কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু কেমন করে এ কথা বিশ্বাস করবো—কি প্রমাণ আছে?"

মিনতি অস্বাভাবিক ধীরতার সহিত বলিল, "বিশ্বাস না করতে চাও না ক'রলে। কিন্তু যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, আমি প্রমাণ দিয়ে তোমার বিশ্বাস করাতে যাব, নিজের ধর্ম্ম নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবো, এত ছোট লোক আমি নই। তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাক—আমার ধর্ম্ম আমি দেখবো। শাস্তি দিতে চাও,—সে সইবার শক্তি আমার আছে।"

দিলীপ আসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়াছিল। শিশির বা মিনতি তাহা লক্ষ্য করে নাই। মিনতির কথা শুনিয়া শিশির একটু দ্বিধাযুক্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

দিলীপের ভারী রাগ হইল। সে বলিল, "দেখুন, বাবাকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন, আপনি, এখন ক্ষমা দিন। আর উৎপাতটা ক'রবেন না।"

মিনতি যেন একথায় জ্বলিয়া উঠিল। সে গর্জ্জিয়া বলিল, "আমি দুঃখ দিয়েছি তোমার বাবাকে? একথা তোমার মুখে সাজে বটে!" সে আর কিছু বলিতে পারিল না, রাগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

দিলীপ বলিল, "দেখুন অতটা injured innocence নাই দেখালেন। এ কথা নিয়ে ঘাঁটান আমার কাছে মোটেই প্রীতিকর নয়, তবু দু'একটা কথা বলতে হ'চ্ছে। আচ্ছা বলুন দেখি পরশুদিন আপনি মালতীকে এক কথায় রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছিলেন কেন?"

"সে কথার জবাব তোমার কাছে আমি দেব না।"

"দিলীপ রাগে ফুলিতে লাগিল। সে বলিল তা নাই দিলেন, কিন্তু আপনার জবাব ছাড়াও অনেক কথা প্রমাণ হ'তে পারে। কাল সেই সন্ন্যাসীটাকে বের ক'রে দেবার পরও আপনি তার কাছে চিঠি এবং টাকা আহ্লাদীকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং সে চিঠির জবাব আহ্লাদী আপনাকে দিয়েছে। খুব সম্ভব সে চিঠি আপনার বাক্স দেরাজে কোথাও আছে। সেটা কি আপনিই বের ক'রে দেবেন, না, আমায় জোর ক'রে বের ক'রতে হ'বে?"

অসহ্য বেদনায় মিনতির মুখ কালো হইয়া গেল। তার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সে কেবল চক্ষু দিয়া দিলীপের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর সে কেবল বলিল, "ওঃ দিলীপ! দিলীপ! তুমি আমার এমনি অপমান করছো।" সে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

দিলীপ বলিল, "আচ্ছা তবে আমিই খোঁজ ক'রে দেখছি।" বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল।

শিশির একবার মুখ তুলিয়া বলিল, "দিলীপ, থাক!"

দিলীপ বলিল "না বাবা, অনেক সহ্য ক'রেছি। এতটা অন্যায় ক'রে যে উনি আবার আপনাকে ধমকাবেন এ আমি সহ্য করবো না।"

সে মিনতির ঘরে চলিয়া গেল। দুমদাম করিয়া বাক্স ও দেরাজের তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মিনতি একটা স্তূপের মত হইয়া পড়িয়া রহিল। শিশির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া ভাবিতে লাগিল।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ধ্বংসের মুখে বাঙ্গালার হিন্দু

গত অগ্রহায়ণ মাসের "বঙ্গবাণী"তে আমরা বাঙ্গালার হিন্দুজাতির একটা সাধারণ অবস্থা দেখাইয়াছি। তাহাতে আমরা যে ভাবের আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতেই মোটামুটি বুঝা যায় যে, হিন্দু-সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; ইহার জন্ত বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজই দায়ী। বাঙ্গালা দিন দিন অলক্ষ্যভাবে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ইহা হিন্দু-সমাজ মোটেই লক্ষ্য করে না। যদি তাহারা এদিকে মনোযোগ না দেয়, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যখন বাঙ্গলার হিন্দুর স্মৃতিরেখাটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে না। দুই চারজন যাহারা একটু আধটু চেষ্টা করে, নানা বাধাবিঘ্নের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাদের চেষ্টার প্রথম উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হিন্দুজাতি দিন দিন কেমন করিয়া মরিতেছে, তাহাই আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে মোট ২০৮০৯১৪৮ জন হিন্দু আছে। ১৯২১ সালের লোকগণনা অনুসারে আমরা হিন্দুর এই সংখ্যা পাইয়া থাকি। প্রতি দশ বৎসর অন্তর আমাদের দেশে একবার লোকগণনা হয়। ১৯২১ সালের পূর্ব্বে দশ বৎসর অন্তর আরো কয়েকবার লোক গণনা হইয়া গিয়াছে। আমরা সেই সকল বৎসরের লোক সংখ্যা উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে, হিন্দুজাতি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। জাতি যদি নিজের কুসংস্কারগুলি দূর না করে, এবং নিজে যদি বাঁচিবার চেষ্টা না করে, তবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে একবার লোকগণনা হইয়াছিল; তাহাতে দেখিতে পাই, মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দু চারি লক্ষ বেশী। তারপরবর্ত্তী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় দেখিতে পাই, যে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা ৬॥ লক্ষ অধিক। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নয় বৎসরে ১০॥ লক্ষ মুসলমান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা ঠিক মত হয় নাই; উহাতে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল বলিয়া আমরা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ ছাড়িয়া দিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে আমাদের বক্তব্য আরম্ভ করিব।

খৃষ্টাব্দ	বাঙ্গালার মোট লোক সংখ্যা।
১৮৮১	৩৭০১৪৬২১
১৮৯১	৩৯৮০৫৫২৭
১৯০১	৪২৮৮১৩৫৯
১৯১১	৪৬৩০৫১৭০
১৯২১	৪৭৫৯২৪৬২

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, প্রতি দশ বৎসরেই বাঙ্গলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে অনুপাতে লোকবৃদ্ধি হইয়াছে, সেই অনুপাতে হিন্দুজাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া

স্বাভাবিক; কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু অন্যান্য জাতির অনুপাতে মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই, বরং দিন দিন তাহার হ্রাস হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে :—

খৃষ্টাব্দ	প্রতি দশ হাজারে হিন্দুর স্থান।
১৮৮১	৪৮৫৫
১৮৯১	৪৭২৭
১৯০১	৪৬৬০
১৯১১	৪৪৮০
১৯২১	৪৩২৭

এই তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতি দশ বৎসরেই হিন্দুর কিছু না কিছু হ্রাস হইয়াছে। একদিকে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, অন্যদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে অন্যান্য ধর্ম্মের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ৪০ বৎসরে প্রতি দশ হাজারে ৫২৫ জন হিন্দু কমিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের হিন্দুজাতির এরূপ ধ্বংসের কারণ কি?—কেন এত লোক দিন দিন কমিতেছে, আমরা তাহার প্রধান চারিটি কারণ আলোচনা করিয়া দেখাইব।

১। খৃষ্টান মিশনারিগণের প্রচার কার্য্য—ও অস্পৃশ্যজাতি।

২। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করা।

৩। বাল্য-বিবাহ।

৪। বিধবাবিবাহ স্থগিত রাখা।

ইহা ভিন্ন আরো অন্যান্য কারণ আছে: পণ-প্রথা, অসবর্ণ বিবাহ না হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

(১)

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজগণ আমাদের দেশে বাণিজ্য করিতে আসে। আস্তে আস্তে তাহারা ভারতে রাজ্যস্থাপন করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজত্ব করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মিশনারীগণ দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল; তখন দেশের ইষ্ট ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বাধা দিল না বরং সাহায্য করিতে লাগিল। কেবল সাহায্য নহে কলিকাতায় বিসপ প্রভৃতি ধর্ম্মযাজকগণের লালন-পালনের জন্য বেতন ধার্য্য করিল এবং ঐ টাকা ভারত সরকারের আয় অর্থাৎ ভারতবাসী যে কর দিত তাহা হইতে দেওয়া হইত।* কোথায় তাহারা ভারতের উন্নতি সাধন করিবে—না, ভারতবাসীর টাকা দ্বারা চার্চের বিসপের বেতন দেওয়া হইত।

---

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে মিশনারিগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিলাম,—

ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটা বিলাসিতার স্রোত বহিতে লাগিল। অনেক হিন্দু সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হিন্দুরা তখন অতিশয় গোঁড়া ছিল। সেকালের ইংরেজ-সভ্যতা গ্রহণ করিয়া হিন্দুগণ সমাজে স্থান পাইত না; বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে খৃষ্টান হইতে হইত। প্রবন্ধলেখক দুই একটা খৃষ্টান পরিবারকে জানেন; সেই সকল পরিবারের লোক কেবল একটা হিন্দু মোহের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা উচ্চবংশ হইতে খৃষ্টান হইয়াছিল। আজকালও তাহাদের শ্রেণীর যে সব খৃষ্টান আছে তাহাদের ভিন্ন অন্য কোন ঘরে তাহাদের বিবাহ হয় না,—হওয়াটা তাহারা অন্যায় মনে করে। অপরিচিত লোক তাহাদিগকে দেখিলে হিন্দু, কেবল হিন্দু নয়, গোঁড়া হিন্দু বলিয়া মনে করিবে।

রাজা রামমোহন রায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের পর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন। তারপর আসিল কেশবচন্দ্র সেনের যুগ। সেই যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক কাজ করিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুকে

স্মিথ্ সাহেব 'The Oxford History of India'র ৬১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—"The question of the admission of missionaries was hotly debated (in the Parliament). There admission under licence was allowed. Provision was made for the spiritual needs of the European population by the appointment of a bishop of Calcutta and three archdeacons paid from Indian Revenues."

মেজর বি, ডি, বসু তাঁহার "Rise of the Christian power of India" নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের XLI অধ্যায়ে লিখিয়াছেন:—"Bentink and his compatriots in authority in India were doing everything in their power to encourage the missionaries with the aim of the conversion of the *heathens*."

গভর্ণমেণ্ট কি কি উপায়ে সাহায্য করিতেন সে সম্বন্ধে বি, ডি, বসু মহাশয় Mr. Sydney Smith লেখা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"Revd. Mr. Sydney Smith wrote further that the missionaries 'obtain their passports from Government, and the plan and objects of the mission are printed, free of expense, at the government press."

ভেলর হত্যাকাণ্ডের একপক্ষ পূর্ব্বে মিশনারিগণ লণ্ডন সমাজের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিল, বি, ডি, বসু তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানি এইরূপ:—

"'Every encouragement is offered us by the established government of the country. Hitherto they have granted us every request, whether solicited by ourselves or others. Their permission to come to this place, their allowing us an acknowledgment for preaching in the fort which sanctions us in our work, together with the grant which they have lately given us to hold a large spot of ground every way suited for missionary labours, are objects of the last importance, and remove every impediment which might be apprehended from the source. We trust not to an arm of flesh; but when we reflect on these things, we cannot but behold the loving kindness of the Lord.'"

ঘরে ফিরাইয়া আনিল। তাহারা আর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল না। মিশনারিগণ অনেক শিক্ষিত হিন্দুকে খৃষ্টান করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে তাহা বন্ধ হওয়াতে তাহারা আবার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিল। নিম্ন শ্রেণীর লোক কিছু কিছু খৃষ্টান হইতে লাগিল।

খৃষ্টাব্দ	খৃষ্টান লোকসংখ্যা
১৮৮১	৭২২৮৯
১৮৯১	৮২৩৩৯
১৯০১	১০৬৭৯৬
১৯১১	১২৯৭৪৬
১৯২১	১৪৯০৬৯

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমরা বাঙ্গালাদেশে মোট ৭২২৮৯ জন খৃষ্টান দেখিতে পাই; ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার খৃষ্টানের সংখ্যা ১৪৯০৫৯ দাঁড়াইয়াছে,—প্রায় দেড় লক্ষ। এই ৪০ বৎসরে ৯৬৭৮০ জন খৃষ্টান বৃদ্ধি পাইয়াছে; অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে যতজন খৃষ্টান ছিল, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাহার উবলেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ কি? ইংলণ্ড হইতে আর অধিক লোক আসিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে নাই। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হারও তেমন বেশী নহে;—তবে এত লোক বৃদ্ধি হইল কেন? নিশ্চয়ই আমাদের হিন্দু ভ্রাতভাইগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

"বাঙ্গালার হিন্দু" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, মাত্র ১৫টি হিন্দু উপজাতি জলচল। অন্যান্য ৫৫টি উপজাতি জলচল নহে, এমন কি ইহাদের কোন কোন উপজাতিকে স্পর্শ করিলে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ স্নান না করিয়া গৃহে প্রবেশ করেনা;—এমন নিকৃষ্ট তাহারা।

বাঙ্গালার সমস্ত হিন্দুর মধ্যে প্রায় ১৬০০০০০০ লোকের হাতে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ জলপান করে না। ইহাদের ভিতর চণ্ডাল, মুচি, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর লোক সমাজে এমনিভাবে নির্য্যাতিত যে, তাহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের সহিত কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না। গৃহে বিড়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুর যে অধিকার আছে, তাহাদের সে অধিকার নাই;— তাহারা মানুষ হইয়াও পশু অপেক্ষা অধম। তাহারা হিন্দু হইয়াও হিন্দুর অস্পৃশ্য। যে জাতি তাহার ঘরের ভাইবোনকে এমনি করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখে, তাহাদের ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত করে, তাহার উন্নতি কোথায়?—তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। লাঞ্ছিত, প্রপীড়িত, পদদলিত ভাইগণ যে ভাইকে ছাড়িয়া নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজিয়া লইবে,—অত্যাচার লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি!

হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া এই লাঞ্ছিত হিন্দু উপজাতিগুলি হিন্দুর অত্যাচার সহ্য করিতে

পারে না। আজ সে হিন্দু; ধোপা, নাপিত সকলেই তাহার হিন্দু ভাই। ধোপা আজ নমশূদ্র বা ডোম চণ্ডালের কাপড় কাচিবে না; কিন্তু দুইদিন পর যদি তাহারা খৃষ্টান হয়, অমনি সেই ধোপাই তাহাদের কাপড় কাচিবে। আজ কোন নমশূদ্র-স্ত্রীর কাপড় কোন ধোপা কাচিবে না, কাল যদি সেই স্ত্রীলোকটি বারাঙ্গনা সাজে, অমনি ধোপা তাহার কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিবে। একজন বারাঙ্গনা অপেক্ষা একজন নমশূদ্র-স্ত্রী নিকৃষ্ট। হিন্দু সমাজের এমন উদার নীতি।

আজ অস্পৃশ্য হিন্দু সমাজে স্থান পায় না, ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত একাসনে বসিতে পারে না; দুইদিন পর যখন সে খৃষ্টান হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া বড় চাকুরী করিবে, তখন সে তোমার চেয়ে উচ্চ আসনে বসিবে; হয়ত তোমাকে গিয়া তাহার নিকট জোড় হাতে দাঁড়াইতে হইবে। হিন্দু-সমাজ, যদি তুমি বাঁচিতে চাও, তবে তোমার অস্পৃশ্য শ্রেণীর ভাইগণকে স্পৃশ্যভাবে নিজের বুকে টানিয়া লও; নচেৎ .৬০০০০০০ হিন্দুভাই খৃষ্টান বা মুসলমান হইবে। অবশিষ্টগণ যাহারা থাকিবে তাহাদের অবস্থাও ভাল নহে! নানা কারণে তাহারাও ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। যদি তুমি সমাজ সংস্কার না কর, যদি ভেদনীতি পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যে, তোমার ঐ হিন্দুর অস্তিত্ব আর বাঙ্গালার শ্যামল বুকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

(২)

মুসলমানগণ যে বাঙ্গালাদেশের শ্যামল ক্রোড়ে বাস করে, হিন্দুগণও তাহাদের পার্শ্বে বঙ্গমাতার শ্যামল আঁচলের নীচে দাঁড়াইয়া আছে;—"The Hindus and the Musalmans are the two bright eyes of a young damsel." এমন অবস্থায় হিন্দুগণ দিন দিন হ্রাস পায় কেন, আর মুসলমানগণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় কেন?

এই সমস্যার সমাধান করা সহজ নহে। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে।

১। মুসলমান দ্বারা হিন্দুনারী নির্য্যাতন।
২। মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন।
৩। হিন্দুর দারিদ্র্য।
৪। হিন্দুপ্রধান স্থানে ব্যাধির প্রকোপ।
৫। হিন্দুর বিদেশ গমন।

এই কয়টী কারণই প্রধান, আমরা ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে ৪০ বৎসরে প্রতি দশ হাজারে ৫২৫ জন হিন্দুর হ্রাস হইয়াছে। একদিকে হিন্দুর হ্রাস হইয়াছে, অন্যদিকে মুসলমানের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে নীচের তালিকা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

খৃষ্টাব্দ	প্রতি দশ হাজারে মুসলমানের স্থান।
১৮৮১	৫০০২
১৮৯১	৫১০৮
১৯০১	৫১৭৮
১৯১১	৫২৭৪
১৯২১	৫৩৯২

হিন্দুর সংখ্যা যেমন দ্রুত হ্রাস হইতেছে মুসলমানের সংখ্যা তেমনি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ৪০ বৎসরে প্রতি দশ হাজারে ৩৯০ জন মুসলমান বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি হিন্দুর সংখ্যা এরূপ ভাবে হ্রাস হইতে থাকে, আর মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যখন বাঙ্গালাদেশে একজনও হিন্দু দেখিতে পাওয়া যাইবে না।—ইহা হইবে মুসলমানের দেশ।

বাঙ্গালাদেশে নারীনির্য্যাতন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদ-পত্রে প্রত্যহই প্রায় নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যত নারী-নির্য্যাতন হয়, তাহার সকলগুলির সংবাদ আমরা জানিতে পারি না। শতকরা দশটার সংবাদ আমরা সংবাদ-পত্রের মারফতে পাই কিনা সন্দেহ। অবশিষ্টগুলির সংবাদ সমুদ্রের ঢেউর মত সমাজের বুকে মিলাইয়া যায়। যাহারা নারী-নির্য্যাতন করে তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান। হিন্দুদ্বারা হিন্দুনারীও নির্য্যাতিত সর্ব্বদাই হইতেছে।

মুসলমানগণ হিন্দুনারী নির্য্যাতন করে দুইটী কারণে। প্রথম পাশববৃত্তি চরিতার্থ করা, দ্বিতীয় হিন্দুনারীকে মুসলমান করিয়া নিকা করা এবং তাহাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা।

একটা কথা ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, যত নারী-নির্য্যাতন সমাজের বুকের উপর সংঘটিত হইতেছে, তাহার শতকরা ৫০ জন বিধবা।

৫ বৎসরের কম বয়সের	১৪৩৯	জন বিধবা
১০ „ „ „	৮৭৫১	
১৫ „ „ „	৩৬৩২৩	
	৪৬৫১৩	

১৫ বৎসরের নীচের ৪৬৫১৩ জন বিধবার কাহারও সন্তান নাই বলিয়া ধরা যায়। ইহা ভিন্ন ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের বিধবাগণের মধ্যে প্রায় ৬০০০০ বিধবার কোন সন্তান নাই। মোটামুটি দেখিতে পাই যে প্রায় লক্ষাধিক বিধবার কোন সন্তান নাই। এই লক্ষাধিক বিধবার বিবাহ না হওয়াতে দিন দিন সমাজের পাপের বোঝা ভারি হইতেছে।

হিন্দু-সমাজে ইহা একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সন্তানহীন কন্যা বিধবা হইলে সে আর স্বামীর ঘর করিতে পারে না। নানা অত্যাচারে তাহাকে আবার পিতার নিকট ফিরিয়া আসিতে হয়। পিতার ঘরে বা ভাইর সংসারে সেই কর্ত্রী হইয়া দাঁড়ায়। তাহার কোন

বাঁধাবাঁধি নাই। ঘরের বৌদের মত সে আর সংসারের ঘর কয়খানির মধ্যে সংসার পাতিয়া বসে না। নূতন যৌবন লইয়া যেখানে-সেখানে যাওয়া-আসা করে। গ্রামের অশিক্ষিত বিধবা তাহাদের রূপ যৌবন লইয়া মহা বিপদে পড়ে। চারিদিকেই সে দেখিতে পায়, পুরুষের কুটিল কটাক্ষ। সে নিজেকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; নিজেকে পুরুষের নিকট ছাড়িয়া দেয়।

গ্রামে অধিকাংশই মুসলমান,—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে। তাহারা এই সকল নারীর রূপ যৌবনে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে ঘরের বাহিরে আনিয়া তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিকা করে।

এই সকল নির্য্যাতিত নারী সমাজে স্থান পায় না। যদি তাহারা সমাজে স্থান পাইত তাহা হইলে নারী-নির্য্যাতন অনেক হ্রাস হইত। সমাজে স্থান না পাইয়া নির্য্যাতিত নারী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

মুসলমান-সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে। কোন নারীর স্বামীর মৃত্যু হইলে সে আবার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। সুতরাং নারী-নির্য্যাতন মুসলমান-সমাজে অনেক কম। নারী নির্য্যাতিত হইলেও তাহার জাতি নষ্ট হয় না, বা সমাজচ্যুত হয় না। এবং তাহাদের লোক সংখ্যা হ্রাস না হইয়া কেবল বৃদ্ধিই পাইতে থাকে।

দারিদ্র্যের জন্য অনেকে মুসলমান হয়। অনেক বিধবা আছে যাহারা ছেলে মেয়েদের ভরণ পোষণের জন্য এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য মুসলমান হয়। লেডী অবলা বসু "আর্থিক উন্নতির" সম্পাদকের নিকট কথোপকথনের সময় যে কথা বলিয়াছেন, উহা "আর্থিক উন্নতির" প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার ২৩ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে। আমরা উহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, হিন্দু সমাজের কি ভীষণ দুরবস্থা।

"এই আর্থিক দুর্গতির জন্য অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। পল্লীগ্রামে এর সংখ্যা কত বেশী আমরা ভাবি না। আমি নিজেও ভাবতুম না, কাজের সংস্পর্শে না আসলে এ জ্ঞান হত না। দেখেছি বিধবার শ্বশুর বাড়ীর কেহ সাহায্য করে না, পড়ে রয়েছে, বাপের বাড়ীরও কেহ খোঁজ করে না। প্রতিবেশী আছে মুসলমান, সে এসে দেখল শুনল, অবস্থা খারাপ হলে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। ছোট ছেলে পিলে আছে, মেয়ে মানুষ একলা রয়েছে, ছেলে মানুষ করতে হবে সে ভাবনা রয়েছে, যে যত্ন দেখায় তারই কাছে যায়। এইভাবে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে ……।"

সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—বর্দ্ধমান, রাজসাহী, প্রেসিডেন্সি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। এই পাঁচটি বিভাগের লোকসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির অনুপাতে হিন্দুর ধ্বংস-পথ কিরূপ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে তাহা দেখাইব।

প্রতি দশ হাজারে হিন্দু ও মুসলমান

বিভাগ	হিন্দু	মুসলমান
বর্দ্ধমান	৮২০৭	১৩৪৪
রাজসাহী	৩৭১৮	৬২৮২
প্রেসিডেন্সি	৫০৪৭	৪৭৩২
ঢাকা	২৯৭০	৬৯৬৯
চট্টগ্রাম	২৬০১	৭০৪০

উপরের তালিকা হইতে দেখিতে পাই, বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে মুসলমানের অনুপাতে হিন্দু অধিক। অন্যান্য তিনটি বিভাগে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান অনেক অধিক। যদি দশ বৎসরের একটা তুলনা করি তাহা হইলে কোন বিভাগে কত হিন্দু মুসলমান হ্রাস হইল বা বৃদ্ধি হইল তাহা দেখিতে পারিব।

প্রতি দশ হাজারে হিন্দু মুসলমানের হ্রাস বৃদ্ধি

বিভাগ	হিন্দু		মুসলমান	
	১৯১১	১৯২১	১৯১১	১৯২১
বর্দ্ধমান	৮৩১৯	৮২০৭	১৩৪৪	১৩৪৭
রাজসাহী	৩৯২১	৩৭১৮	৫৯২৭	৬২৮২
প্রেসিডেন্সি	৫০২৩	৫০৪৭	৪৮৩৪	৪৭৩২
ঢাকা	৩১০২	২৯৭০	৬৮৩৭	৬৯৬৯
চট্টগ্রাম	২৬২০	২৬০১	৭০০০	৭০৪০

পশ্চিম বঙ্গ এবং মধ্য বঙ্গের লোক-সংখ্যা নানা কারণে কমিয়াছে। ঐ সকল স্থান ম্যালিরিয়া-পরিপূর্ণ এবং জমি পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় অনুর্ব্বর। ইহা সত্বেও মুসলমান লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ হিন্দুগণ কুসংস্কারাপন্ন আর মুসলমানগণ তাহা নহে।

পূর্ব্বে বঙ্গের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে অনুপাতে বৃদ্ধি হইয়াছে সে অনুপাতে হিন্দুগণ অনেক নীচে পড়িয়া আছে। বিধবা-বিবাহ না দেওয়া এবং নারীনির্য্যাতনে ত লোক-সংখ্যা কমিতেছেই তাহা ভিন্ন হিন্দুগণ অনেকে বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মুসলমান অধিকাংশই কৃষিজীবি। আর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ চাকুরীজীবি। লেখাপড়া শিখিয়াই তাহারা চাকুরীর অন্বেষণে বাহির হয়। বাঙ্গালার বাহিরে যত বাঙ্গালী আছে তাহাদের সংখ্যা কম নহে; প্রায় সাত আট লক্ষ হইবে। ইহাদের শতকরা ৭৫ জন হিন্দু,—বেশী হইতেও পারে। ইহারা ঘরের বাহিরে গিয়াছে বলিয়া হিন্দুর সংখ্যা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

(৩)

বাঙ্গালার অন্যতম সমস্যা হইল বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহ হিন্দু-সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুর সংখ্যা যে হ্রাস দেখা যায়, বাল্য-বিবাহ তাহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। বাল্য-বিবাহ রোধ করিবার জন্য মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি পত্রিকায় মাঝে মাঝে আলোচনা হয়; কিন্তু এই আলোচনা লোক-সমাজে প্রবেশ করে না। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বাল্যবিবাহ অধিক প্রচলিত। সুতরাং কাগজে লিখিয়া কোন লাভ হইবে না। সাধারণলোক পত্রিকা পড়ে না বা পড়িতে জানে না। যদি বাল্য বিবাহ রোধ করিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত বাঙ্গালা দেশে একটা জোর আন্দোলন চালাইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরণ করিয়া বাল্য-বিবাহের বিষময় ফলের কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

০— ৫ বৎসরের নীচে	৩৬৩৯	পুরুষ	হিন্দু বিবাহিত।
	৭৯২৫	স্ত্রী	
৫—১০ বৎসরের নীচে	১২৯৯৮	পুরুষ	হিন্দু বিবাহিত।
	১২১৭১	স্ত্রী	
১০—১৫ বৎসরের নীচে	৫৭৬২১	পুরুষ	হিন্দু বিবাহিত।
	৫৬৫৬৮৯	স্ত্রী	

উপরের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৫ বৎসরের নীচের বয়সের ৭৬২৫৮ জন বালক এবং ৫৮৫৭৮৫ জন বালিকা বিবাহিত। কি ভীষণ দৃশ্য—বাঙ্গালী বাঁচিবে কেমন করিয়া।

হিন্দুদের ভিতর যেমন বাল্য-বিবাহের প্রচলন আছে, মুসলমানদের ভিতরও তেমনি বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে, এবং তাহাদের সংখ্যাও কম নহে। ইহা মুসলমানদের পক্ষেও মারাত্মক; কিন্তু হিন্দুর মত মারাত্মক নহে।

০— ৫ বৎসরের নীচে	৬৪০২	পুরুষ	মুসলমান বিবাহিত।
	১৫৬৩৪	স্ত্রী	
৫—১০ বৎসরের নীচে	২২৬১৯	পুরুষ	মুসলমান বিবাহিত।
	১২৯৮৬৩	স্ত্রী	
১০—১৫ বৎসরের নীচে	৪৫৪৪৮	পুরুষ	মুসলমান বিবাহিত।
	৬৪৪২১৫	স্ত্রী	

মুসলমানদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অধিক হইলেও তত মারাত্মক নহে কিন্তু তাই বলিয়া বাল্য-বিবাহের প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়, তাহাদিগকেও বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হইবে। মুসলমানদের ভিতর বাল্যবিধবাগণ বিবাহ করিতে পারে, হিন্দুদিগের বাল্যবিধবাদের বিবাহ হয় না।

বাল্য বিবাহের জন্য অনেক বালিকাই যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বিধবা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সংসারে তাহাদের সকল সুখের অবসান হয়। এমন অনেক ব্যাপার দেখা গিয়াছে যে, থালার উপর শিশু বসাইয়া বিবাহ হইয়াছে। উহাকে নীচ শ্রেণীর হিন্দুরা 'থালবিবাহ' বলে।

বাল্য বিবাহে যে কি বিষময় ফল ফলে আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। বাল্য বিবাহের সময় আমাদের দেশে ছেলে মেয়ের বয়স প্রায়ই সমান থাকে। ছেলে যখন ১৬ বৎসরের, মেয়ে তখন ১৫ বৎসরে গিয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালা দেশে সাধারণতঃ ২০ বৎসরে ছেলেদের দেহে যৌবন দেখা দেয়। আর মেয়েদের ১৪ বৎসরে যৌবন দেখা দেয়। মেয়ে যখন ভরা-যৌবনের, ছেলে তখন কিছুই বুঝিতে পারে না। অনেক সময় এই অবস্থায় মেয়েরা চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলে।

অনেক সময় যৌবন-প্রাপ্ত যুবকের সহিত ১০।১২ বৎসরের বালিকার বিবাহ হয়। এরূপ অবস্থায় সেই বালিকা বধূকে ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়,—সে অত্যাচার কাহিনী অবর্ণনীয়। অনেক সময় অপ্রাপ্ত বয়সেই বালিকাগণ গর্ভবতী হয় বলিয়া প্রসবের সময় তাহারা ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করে,—অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অহরহ এরূপ ব্যাপার সমাজের বুকের উপর ঘটিতেছে।

বাল্য বিবাহের জন্য যে এদেশে শিশু-মৃত্যু অধিক হয়, অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

দেশ	প্রতিবৎসর প্রতিহাজারে শিশু মৃত্যুর হার।
নিউজিল্যাণ্ড	৪৮
নেদারল্যাণ্ড	৫০
নরওয়ে	৫৮
অষ্ট্রেলিয়া	৬৫
সুইডেন	৭৬
সুইজারল্যাণ্ড	৯২
গ্রেট ব্রিটেন	৮৩
মার্কিণ	৮০
ইতালি	১৪০
জাপান	১৮৯
স্পেন	১৯২
ভারতবর্ষ	২৬১

আমাদের দেশেই সকলের চেয়ে অধিক সংখ্যক শিশু প্রতি বৎসর মরিয়া থাকে। বাল্য বিবাহ তাহার প্রধান কারণ। অপ্রাপ্ত বয়সের মাতা-পিতার সন্তান কোন দিন বাঁচিতে পারে না। বাঁচিলেও তাহারা রুগ্ন হয়, বা নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বাঙ্গালীর

জীবনী-শক্তির হ্রাস হইতেছে। দুর্ব্বল জাতি কখন কি কোন বড় কাজে লাগিতে পারে? যদি বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ বাঁচিতে চায়, তবে তাহাকে সবল হইতে হইবে, তাহার জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে; নচেৎ তাহার ধ্বংস সুনিশ্চিত।

বাঙ্গালার নীচশ্রেণীর মধ্যে বাল্য বিবাহ ত আছেই, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর ঘরেও কম নহে। এমন কি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের ভিতরও বাল্য-বিবাহ আছে। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে মাত্র ৩২৮৩ জন ব্রাহ্ম আছে, তাহার ভিতর ৭টী বালিকা এবং একটি বালকের বিবাহ হইয়াছে; তাহাদের প্রত্যেকের বয়সই ১০ বৎসরের কম। যদি ব্রাহ্ম সমাজে এরূপ বিবাহ চলে তাহা হইলে তাহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত নহে!

(৪)

বাল্য বিবাহের দরুণ বাঙ্গালাদেশে হিন্দু বিধবাগণের সংখ্যাও অধিক হইয়া পড়িয়াছে। "বাঙ্গালার হিন্দু" শীর্ষক প্রবন্ধে বিধবাদের কথা একটু বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে একটু বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। বিধবা-বিবাহ না দেওয়াতে একদিকে যেমন হিন্দুসমাজে ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা, নরহত্যা হইতেছে, অপরদিকে তেমনি দিন দিন হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে দ্রুত ছুটিয়াছে।

বিধবা হইয়া যে হিন্দুনারী রূপ-যৌবন লইয়া ঠিক থাকিতে পারে না, তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই কুপথে গমনের জন্য বিধবাগণ মোটেই দোষী নহে।

মানুষ চায় সৃষ্টি করিতে বা নিজেকে বৃদ্ধি করিতে। "Man wishes to expand himself or to hvae an existence on the surface of the world"—ইহাই জগতের সনাতন নীতি। যৌবন লইয়া বা যৌবনাগমনের পূর্ব্বে অনেক স্ত্রীলোক বিধবা হয়। বিধবা হইবার পর অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা তাহার অজ্ঞাতসারে একদিন যৌবন সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়,—সে ত যৌবনকে তাড়াইয়া দিতে পারে না,—উহা ভগবানের দান।

ভগবান যে যৌবন, সৃষ্টি করিবার জন্য, মানুষের দেহে ঢালিয়া দেন, সমাজ তাহা রোধ করিয়া বসে। তাহার সৃষ্টি করিবার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সে সৃষ্টি করিতে পারে না। মানুষ বুঝে না, ভগবানের দানের উপর তাহার কোন হাত নাই। যদি সে মানুষকে সৃষ্টি করিতে দিবে না, তবে সে তাহার দেহ হইতে যৌবন কাড়িয়া লয় না কেন?—তাহা সমাজ পারে না; তাহার উপর সমাজের কোন হাত নাই। সমাজ পারে কেবল তাহাকে নিপীড়ন করিতে, লাঞ্ছনা করিতে।

বিধবা যৌবন লইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, যে পারে সে দেবী, তাহার সহিত দেবতাদের তুলনা চলিতে পারে। যে বিধবা তাহা পারে না, সেজন্য তাহাকে আমরা দোষী বলিতে পারি না,—সে নির্দ্দোষ। সমাজের ভয়ে যে গোপনে নিজেকে পুরুষের হাতে

ছাড়িয়া দেয়, তাহাকে পাপী বা কলঙ্কিনী বলা চলে না;—কেন না, সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন কাজ করে নাই।

সমাজের এই নিষ্পেষণের জন্য কত বিধবা বারাঙ্গনা সাজে, কত বিধবা মুসলমান হয়, কত বিধবা আত্মহত্যা করে, কত বিধবা সমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহার সংবাদ রাখে কে? আবার কত বিধবা সমাজের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে করিতে ধরিত্রীর কোমল বুকে মিশিয়া যায়।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন ছিল। বহু প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। আবার বিধবা-বিবাহ না হওয়ার জন্য সমাজ দিন দিন ধ্বংস হইতেছে, ইহা সত্বেও যে কেন বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয় না, তাহা ভাবিয়া পাই না। বিধবা-বিবাহের প্রচলন হইলে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ আজ ধ্বংসের মুখে চলিত না, দেশের পাপ অনেক কমিয়া যাইত; বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে একটা নূতন প্রেরণা আসিত, সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া জগতের সহিত লড়াই করিতে পারিত। বাঙ্গালার সে দিন কি আসিবে, বাঙ্গালা কি জগৎসভায় শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিবে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

শরৎচন্দ্রের 'মহেশের' প্রতি

গো-জন্মে খালাস পেয়ে আজি তুমি গেলে কি গো-লোকে?
অনাহারে শুষ্ক হেথা-চর্ম্ম তব বাজিছে ঢোলকে
মস্‌জিদের পুরোভাগে মর্ম্মভেদী বেদনা-চঞ্চল,
শুনে বেগে ছুটে আসে হলস্কন্ধে গো-খুরের দল।
সত্য কে বধিল তোমা, হে মহেশ, বল আজি মোরে,
কে শোষিল রক্ত তব তিলে তিলে বিন্দু বিন্দু ক'রে?
—ধরিনা ক' গোবেচারা উপলক্ষ্য গোঁয়ারের কথা—
বল' গোমূর্খের পুত্র, বল' তর্করত্নের দেবতা,
কে তোমা দেয়নি খেতে বিধাতার দেওয়া ঘাস জল?
কাদের দংশন বিষ গোক্ষুরেরে করিল পাগল?
কাদের নিকটে বড় তোমা হ'তে গোময় তোমার?
বল আমীনার বন্ধু, মূক পশু নহ তুমি আর।
গোজন্মে খালাস পেয়ে ফিরিয়া কি এলে গুণ্ডা সাজি?
শিঙ দুটী ছোরা হ'য়ে তব হস্তে ঝলসে কি আজি?

শ্রীকালিদাস রায়

বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ শাসনের ইতিহাস*

বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও তাহার প্রথম অবস্থার ইতিহাস এবং বৃটীশ শাসনের ইতিহাস সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল আজ তাহার ৬ষ্ঠ বক্তৃতা। আমি ভাবিয়াছিলাম এই ৬ কি ৭ বক্তৃতার দ্বারা পূজার পূর্ব্বে বৃটীশ শাসনের ইতিহাসটা বলিতে পারিব কিন্তু তাহার সম্ভাবনা দেখি না। এ পর্য্যন্ত শাসনের কথা কিছু বলা হয় নাই, কেবল শিক্ষার কথা এই পাঁচ দিন ধরিয়া আলোচনা করিয়াছি, শাসনের কথা বলিতে গেলে অন্ততঃ ৩টী বক্তৃতার প্রয়োজন হইবে, কেন না, প্রথমতঃ যখন ইংরেজ শাসন এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় তখন তাঁহারা কেবল রাজস্ব আদায় নিয়া ব্যস্ত ছিলেন, আর নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিক্ষার দিকে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না, আর দেশের অন্যান্য শাসন ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি করিবার অবসরও তাঁহাদের ছিল না, মুসলমানের আমলে যেমন ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ছিল সেই রকম ব্যবস্থা চলিতেছিল, অথচ মোগলের শাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, দেশে প্রায় কোন শাসনই ছিল না, সেই সকল কথা পরে বর্ণিত হইবে। আজ শিক্ষা সম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা দিয়া আপাততঃ এই বক্তৃতার ধারা স্থগিত রাখিব, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে পূজার পর আরম্ভ করা যাইবে।

ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ আমাদিগকে ইংরেজী লেখাপড়া শিখাইতে চাহেন নাই, তাহাতে তাঁহারা একেবারে নারাজ ছিলেন, কেন না তাঁহাদের ভয় ছিল ইংরেজী লেখাপড়া শিখে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ভেদ বিরোধ আছে তাহা যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে প্রভুশক্তি রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাঁহাদের পুথী পাঁজী ঘাঁটিয়া অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ইহা আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছি। তাহার পর মেকলে প্রভৃতি একদল লোক যখন ইংরেজী শিক্ষা দেওয়াই ঠিক করিলেন তখন নিজেদের প্রভুশক্তি ঠিক রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনে অর্থাৎ যে আশঙ্কায় তাঁহারা প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষা দিতে চাহেন নাই সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই পরে তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। মেকলের ভগ্নিপতি ট্রেভেলিনের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি ও তাঁহার মন্তব্য হইতে অনেক উদ্ধার করিয়া আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা হউক ইহা কি ভাবে তিনি সমর্থন করিয়াছেন তাহা আপনারা জানেন। তখন দু'দল

---

* থিওসফিকেল সোসাইটি হলে ১১।১০।২৬ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক সংক্ষেপ লিখন পদ্ধতি মতে লিখিত।

হইয়াছিল, একদল বলিতেছিল, ইহাদিগকে আরবী পার্সী ও সংস্কৃত শিখাও, আর একদল বলিতেছিল—ইংরেজী শিখাও। প্রথমোক্ত দলকে অরিয়েন্টেলিষ্ট ও শেষোক্ত দলকে এংগ্লীসিষ্ট বলে। অরিয়েন্টেলিষ্টেরা যে কারণে ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, ঠিক সেই কারণে পরে তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। স্যার চার্লস্ ট্রেভেলিন বলেন চিরদিন আমরা ভারতবর্ষকে আমাদের শাসনাধীনে রাখিতে পারিব না, ইচ্ছামত যা খুসী তাই করিব, এইভাবে চিরদিন ভারতবর্ষ শাসনে রাখা সম্ভব নহে। এমন দিন আসিবে যেদিন ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে, মনুষ্য চরিত্রে ইহা সম্ভব নহে, মানব সমাজের ইতিহাসে ইহা দেখা যায় না, তবে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান যে দাস-প্রভু সম্বন্ধ আছে,—আমরা তাহাদের শাসক, তাহারা শাসিত,—এই সম্বন্ধ যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তখন যাহাতে ভারতবর্ষ আমাদের পক্ষাবলম্বী থাকে, সহায়, সুহৃদ থাকে, সেই ভাবে যদি আমরা শাসন করিতে পারি, সেইভাবে যদি ভারতের ইতিহাসটা গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। স্যার চার্লস্ ট্রেভিলিন স্পষ্ট বলিলেন—ইহাতে নিঃস্বার্থতার কথা আসে না, ইহাতে কোন disinterested motive নাই, অথচ আমাদের স্বার্থসাধন করিতে গিয়া তাহাদেরও স্বার্থসাধন করিব এইভাবে চলিতে হইবে; ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা তাহা হইবে, একথা তিনি ১৮৫৩ খ্রীঃ বলেন; তাহার ১৮ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড বেন্টিঙ্ক পরয়ানা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন ইংরাজী শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইবে। পার্লামেন্টরী সিলেক্ট কমিটীতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া স্যার চার্লস্ ট্রেভিলিন একথা বিস্তারিত ভাবে বলেন ও তাঁহার মন্তব্য পার্লামেন্টের কাছে পাঠাইয়া দেন। তিনি বলেন ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষা এদেশে যাহা প্রচলিত হইয়াছে তাহার ফলে নূতন ইংরেজী-নবীশ ভারতবাসীরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা আমাদের চোখে চিনিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে,- যাঁহারা আমাদের জাতীয় জীবনের নেতা, যাঁহারা আমাদের চিন্তানায়ক, যাঁহারা আমাদের ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা যেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখি ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালীরা সেই চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে,—আমাদের শিক্ষা ও সাধনা সম্বন্ধে আমরা যেমন গৌরব অনুভব করি ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালীরাও সেইরূপ গৌরব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং এমন দিন আসিবে যেদিন ভারতবর্ষের লোকের সঙ্গে আমাদের এখন যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবধান আছে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে আমরা যে আদর্শ সাম্রাজ্য গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহারা সেই আদর্শকে নিজেদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং ক্রমে আমাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত থাকিয়া ও আমাদের সঙ্গে সৌখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের ইষ্টসাধন করিতে চেষ্টা করিবে। তিনি আরও বলেন ভারতবর্ষে আগে যে আদর্শের স্বাধীনতা ছিল নতুন ইংরেজী শিক্ষিতেরা

সেই স্বাধীনতার পক্ষপাতী নহে, মোগল-পাঠানের আমলে দেশী লোক শাসনকর্ত্তা ছিল, নতুন শিক্ষিতেরা তাহাদের শাসনের পক্ষপাতী নহে। ইতিমধ্যেই তাহারা সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথে চলিয়াছে, ইউরোপ যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছে, যেমন, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী, ইতিমধ্যেই ইংরেজী শিক্ষিতেরা সেই শাসন-পদ্ধতির জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে শাসন-প্রণালী ছিল তাহার প্রতি এখন তাহাদের অনুরাগ নাই। এই সকল কারণে তিনি বলেন ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার আমাদের পক্ষে যেমন ভাল তাহাদের পক্ষেও তেমন ভাল। দূরদর্শিনী রাজনীতির ইহা পন্থা, পলিসি বা মন্ত্রনীতি হওয়া উচিত। স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময়ে মন্ত্র বা পলিসি সমন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আপনারা দেখিয়াছেন ইংরেজীতে যাহাকে পলিসি বলে, আমাদের প্রাচীন পরিভাষায়—বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে ও মহাভারতে তাহাকে মন্ত্র বা মন্ত্রণা বলা হইত, সুতরাং স্যার চার্লস্ ট্রেভিলিন বলেন আমাদের মন্ত্র বা পলিসি অনুসারে তাহারা চলিবে, তাহারাও তাহাই চাহে, ইহা আমরা disinterested motive হইতে করিতেছি না, কাজেই ইংরেজ আমাদের কল্যাণের জন্য ইংরাজী শিক্ষা দিয়াছে একথা সত্য নহে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের আশঙ্কা ছিল আমরা ইংরেজী শিখিলে তাহাদের অনিষ্ট হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা ইংরেজী শিক্ষায় রীতিমত বাধা দিয়াছে। যখন তাঁহারা দেখিলেন এই পথ সমীচীন পথ, আমরা ইংরেজী শিক্ষা করিলে তাহাদের শাসন শিথিল না হইয়া সুদৃঢ় হইবে, অল্পায়ু না হইয়া দীর্ঘায়ু হইবে, লাভের সম্ভাবনা আছে, তখন তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা দিতে রাজী হইলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠিক হইল এদেশে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারিত হইবে। বহুদিন গেল কাজে কিছুই হইল না, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজে কিছুই হইল না। সেই বৎসর স্যার জর্জ্জ উড্ ডিস্‌পেচে ঠিক হইল রীতিমত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশে প্রচলিত করিতে হইবে, সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং দেশের লোকে যাহাতে নিজের খরচে ও তত্ত্বাবধানে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট-ইন্-এইড্ দিবেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডিস্‌পেচের মূল কথা—শিক্ষানীতি পরিবর্ত্তিত হউক। ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন ডাঃ মেওয়েট, তিনি কোম্পানির অধীনে ডাক্তারী করিতে প্রথম এদেশে আসেন ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে কিছুদিন অধ্যাপকের কাজ করেন। হেয়ার সাহেব যখন এডুকেশন কমিটির সম্পাদকের কর্ত্তব্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি সম্পাদক হন। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় কতকগুলি স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহম্মদ মহসীনের বদান্যতার ফলে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মেডিকেল

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ইহা ছাড়া অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মেওয়েট সাহেব এই সকল স্কুল কলেজ তত্ত্বাবধান করিতেন ও খবরাখবর রাখিতেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন, এ সকল স্কুল কলেজ স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছে, ইহাদিগকে একটা জালের মধ্যে বোনা ভাল, এক শাসনাধীনে এক নিয়মাধীনে আনিয়া এক আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করা প্রয়োজন। এইজন্ত একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। তিনি একটা বড় কথা বলেন,—একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না অন্ততঃ ৩টা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক,—একটা বাংলায়, একটা বোম্বাইয়ে, আর একটা মাত্রাজে। ৩টা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তিনি এই জন্ত বলিয়াছেন, যদিও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার করা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করা, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে, কিন্তু দেশী ভাষার সাহায্যে তাহা করিতে হইবে। দেশী ভাষাকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না. বাংলা প্রদেশের ভাষা বাংলা, মাতৃভাষা এখানে বাংলা, সেইরূপ মাত্রাজের মাতৃভাষা তামিল, বোম্বাইয়ের মাতৃভাষা মারাট্টি। তিনি বলেন বাংলাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে কেবল ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের জন্ত নহে, কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তেমনি মারাটী ভাষা ও মারাটী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্ত বোম্বাইএ একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মাত্রাজে তেমনি তামিলের সাহায্যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক আদর্শে তামিল ভাষা গড়িয়া তোলা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে। কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত কোম্পানি তাহার কথা কানে তোলেন নাই, এদেশের কর্ত্তৃপক্ষও না, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষও না। তাহার পর কেমিরিন্ সাহেব এডুকেশন কমিটীর সভাপতি হন, নাম যতদূর আমার মনে আছে, বোধ হয় H. B. Cameron, গোলমাল হইতে পারে। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলিলে বুঝিতে পারি কিন্তু এস, পি, সিংহ বলিলে সব সময় তাঁহাকে বুঝা যায় না। আমি একবার ভারী মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম, সাউথ আফ্রিকান ডেপুটেশনের সঙ্গে বাজপেয়ী মহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি কোন্ বাজপেয়ী? C. S., R. S., G. S. কতরকম পারমুটেশন কম্বিনেশন হইতে পারে মনে রাখা কঠিন। শেষে ঠিক করিলাম তিনি গৌরীশঙ্কর বাজপেয়ী। যা হউক কেমেরিন সাহেব সভাপতি ছিলেন, তিনি মেওয়েট সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কোম্পানিকে লিখেন। তাঁরা তখন এসম্বন্ধে কোন রায় দেন না। ১৮৫৩ ইংরাজীতে পার্লামেণ্টে ভারত শাসন সম্বন্ধে তদন্তের জন্ত কমিটি বসে এবং কোম্পানীর সনন্দ বদলাইবার কথা হয়, কেমেরিন সাহেব তখন বিলাত যান ও এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এসম্বন্ধে উক্ত কমিটীর সামনে প্রশ্ন তোলেন। আমাদের দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, তর্কালঙ্কার,

মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি যে এদেশে ছিল এ জ্ঞান তাঁহাদের মোটেই ছিল না। হাউস অব লর্ডস এর একজন সভ্য কেমেরিণ সাহেবকে জেরা করেন—তুমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিতেছ, কিন্তু পাশ করিলে তাহাদিগকে কি উপাধি দিবে? তাহারা কি বি এ, এম এ উপাধিতে সন্তুষ্ট হইবে? রাজা মহারাজা উপাধি চাইবে না? কেমেরিন্ সাহেব বলেন, যাহারা ইংরেজী শিখিবে তাহারা বি এ, এম এ উপাধিই চাইবে, রাজা মহারাজা উপাধি চাহিবে না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিসপেচে তাঁহারা ঠিক করিলেন এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল ইহা আপনারা জানেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ করিবেন, আর পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা উপাধি বিতরণ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মেওয়েট সাহেব বলেছেন—ইহার সাহায্যে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। প্রথমে এই উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের চোখের সম্মুখে দিল, সুতরাং তখনকার এণ্ট্রেন্স, এফ এ ও বি এ পরীক্ষায় বাংলা সেকেণ্ডে লেংগুয়াজ ছিল, ইংরেজী সকলকে পড়িতে হইত। যেমন সংস্কৃত, পার্সী, আরবী, উর্দ্দু, লাটিন, গ্রীক সেকেণ্ড লেংগুয়েজ ছিল তেমনি বাংলা ভাষাও সেকেণ্ড লেংগুয়েজ ছিল, যাহার ইচ্ছা হইত তিনি ইংরেজী ও বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারিতেন, সংস্কৃত না পড়িলেও চলিত। তখনকার সাহিত্য হিসাবে এফ এ পাঠ্য ছিল মহাভারতের শান্তি পর্ব্ব, রামায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্রের (?) ইতিহাস, টোটার (টডের?) ইতিহাস; লেম্বো তেল পাঠ্য ছিল কিনা ঠিক বলিতে পারিনা। সেক্সপিয়রের লেম্স্ টেলসের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল লেম্বো তেল। আমি যখন কেলকাটা পাবলিক লাইব্রেরীতে কাজ করিতাম তখন সেখানে এই বই ছিল। ইউনির্ভাসিটীর নথীপত্র হইতে বাহির করিতে পারি নাই, লেম্বো তেল তখন পাঠ্য ছিল;কিনা। স্বদেশীর সময় হইতে অনেক চেষ্টা চলেছে কিন্তু বাংলা এখনও কম্পালসরী হইলনা। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন বটে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে বাংলার প্রতিপত্তি যতটা ছিল এখনও ততটা হয় নাই। এক ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর বাংলায় দেওয়া যাইত, ইতিহাস, গণিত ও ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য সব প্রশ্নের উত্তর সেকেণ্ড লেংগুয়েজে দিতে পারা যাইত। তবে এই একটু ছিল সেকেণ্ড লেংগুয়েজ লিভিং লেংগুয়েজ হওয়া চাই,—জীবন্ত ভাষা, যে ভাষায় বাঙ্গালি কথাবার্তা বলে এইরূপ ভাষা হইলে তাহাতে উত্তর দেওয়া যাইতে পারিত। ইতিহাসের উত্তর যদি কোন পরীক্ষার্থী সংস্কৃতে দেয় অথবা গ্রীক লাটিনে দেয় তাতে পরীক্ষার্থীরও সুবিধা হয় না পরীক্ষকেরও সুবিধা হয় না।

এখন যে লোকে নানা প্রকার টিপ্পনী কাটেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষা হইতেছে না ইত্যাদি,—এ নূতন কথা নয়। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় তখন হইতে এই অপবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ললাটের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, এখানে কিছু হয় না, কিছু হয় না, তোমরা কেবল ইউরোপের নকল করিতেছ, বাইরের খোসা নিতেছ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সত্যভাবে আয়ত্ত করিতে পারিতেছ না। সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক অধিবেশনে যে বক্তৃতা হইত তাহাতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী বক্তৃতা বেশ প্রণিধানযোগ্য, স্যার হেনরি মেইন সাহেব এই বক্তৃতা করেন। তিনি বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৮ পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার ছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ এর কন্‌ভকেশন এড্রেসে তিনি এই প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন—একথা বলা হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু হয় না, শিক্ষা গভীর হয় না, এখান হইতে যাহারা উপাধি লইয়া যায় তাহারা তেমন বিদ্বান হয় না বা তেমন পারদর্শিতা লাভ করে না। তিনি বলেন—আমি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর রাখি, ইংলণ্ডের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ে খবর রাখি, আমি উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারে সেখানে যেমন এখানেও তেমন শিক্ষা দেওয়া হয়, সাধারণ যাহারা উপাধি নেবার জন্য পরীক্ষা দেয় তাহাদের শিক্ষা সেখানে যেমন হয় এখানেও তেমন হয়; তাহারা উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, ইহাদের মধ্যে যাহারা অগ্রণী তাহারা সেখানে যতটা বিদ্যা আয়ত্ত করে আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই শ্রেণীর ছাত্রেরা ততটা বিদ্যা আয়ত্ত করে। কেম্‌ব্রিজে গণিত সম্বন্ধে উপাধি দেওয়া হয়, অনেকে সেই উপাধি লাভ করে, কিন্তু সকলে গণিতবিদ্ হয় না, সকলে গণিতবিদ্যায় অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করে না, করে ২।১ জন। যাহারা সিনিয়র রেংলার হয় তাহারা গণিতবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করে, না হইলে সিনিয়র রেংলার হইতে পারে না। অক্‌সফোর্ডে সচরাচর যাহারা ডিগ্রী নেয় তাহারা পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য উপরে উপরে পড়ে, তাহারা যে-সকল বিষয়ে উপাধি নেয় সেই সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে না। কেম্‌ব্রিজ যেমন গণিতবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ, অক্‌স্‌ফোড তেমনি মনস্তত্ত্বের জন্য প্রসিদ্ধ, অক্‌স্‌ফোর্ডের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ফিলজফিতে বিএ (অক্‌সন্) হইয়া চলিয়া যান। বেশী কিছু পারদর্শিতা লাভ করেন না, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, অগ্রণী, তাঁহারা অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ এর বিএ পরীক্ষার ফল আলোচনা করিয়া তিনি বলেন, আমাদের এই যে বি-এ পরীক্ষা—তখন উচ্চতম পরীক্ষা ছিল বি-এ, তারপর আর পরীক্ষা ছিল না, এম, এ ছিল না, অনার্স ছিল, যাঁহারা অনার্স পাশ করিতেন তাঁহারা এম এ উপাধি পাইতেন—এই বি-এ পরীক্ষায় একটী ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে গণিতে। গণিতের পরীক্ষক ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান্ বিদ্বান কেম্‌ব্রিজের সিনিয়র রেংলার সি বি ক্লার্ক। তিনি বাঙ্গলাদেশে শিক্ষা বিভাগে কাজ করিতেন। তিনি আমাকে বলিলেন

আমাদের যে ছাত্র গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার বিদ্যা কেম্‌ব্রিজের সিনিয়র রেংলারের বিদ্যা অপেক্ষা কম নয়, যদি সেই ছাত্র গণিত চর্চ্চা রাখে ও বিলাতে গিয়া পড়ে তাহা হইলে সে সিনিয়র রেংলারের স্থান অবলীলাক্রমে অধিকার করিতে পারিবে। মেইন সাহেব ছাত্রটীর নাম করেন নাই, খুঁজিয়া তাহার নাম আমি বাহির করিয়াছি, নাম আনন্দ মোহন বসু, তিনি পরে বিলাতে গিয়া রেংলার পরীক্ষা পাশ করেন, কিন্তু স্ত্রীর অত্যন্ত অসুখ থাকায় সিনিয়র রেংলার হইতে পারেন নাই, অধ্যাপকেরা সকলেই মনে করিয়াছিলেন তিনি সিনিয়র রেংলার হইবেন। তার পর দর্শন শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়া মেইন সাহেব বলেন, আমাদের বি-এর দর্শন শাস্ত্রে এমন একজন পরীক্ষক ছিলেন যিনি অক্‌স্‌ফোর্ডের দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আমাদের যে ছাত্র বি-এতে দর্শন শাস্ত্রে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন তিনি যদি অক্‌স্‌ফোর্ডে যেতেন তবে সেখানকার দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন; তিনি রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ (?) মুখোপাধ্যায়, অল্প বয়সে মারা যান, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চর্চ্চার সহচর ছিলেন এবং তিনি বাংলার ঐতিহাসিক মৌলিক গবেষণার প্রথম পত্তন করেন। তখনকার বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর যাঁহারা রাখিতেন তাঁহারা জানিতেন বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চাইতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা খাট ছিল না, এখনো যে তাহারা খাট, একথা আমার মনে হয় না। আমি একটু আধটু বিলাতের খবর রাখি, এখনকার কথা বলিতে পারি না, তার খবর জানি না, ২৫ বৎসর আগেকার কথা বলিতে পারি, প্রথম যখন বিলাত যাই, কিছুদিন অক্‌স্‌ফোর্ডে ছিলাম, তখন কাগজে লিখেছিলাম—আমাদের ১০টী বি-এ যে বৎসর যে পাশ করিয়াছে তাহাদিগকে চোখ বুজিয়ে বাছিয়া নেও, এমনি হাত দিয়ে তুলে নাও, আর অক্‌স্‌ফোর্ডে সেই সেই বৎসর বি-এ পাশ করিয়াছে এমন ১০ জনকে তুলে নাও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নাই, যদি কিছু থাকে, আমাদের বি-এরা বেশী জানে, তাহাদের শিক্ষার অধিকার বেশী, বহু বিষয়ে তাহারা অক্‌স্‌ফোর্ডের ছেলেদের চাইতে বেশী জানে। ইংরেজী সাহিত্য আমাদের দেশের ছেলেরা যা জানিত অক্‌সফোর্ডের বি-এ তাহা জানিত না, সেক্‌সপিয়ার আমাদের বি-এ পাশ ছেলেরা যাহা জানিত অক্‌স্‌ফোর্ডের বিএ নেড়েচেড়ে দেখিলাম তাহারা সে সব জানিত না। ১০টী বাঙ্গালী বি-এ ও ১০টী বিলাতের বি-একে আজকে যদি নাও, দেখিবে বাঙ্গালী বি-এরা বিলাতের বি-এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, গণিতে বাংলার যে সব ছেলে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে তাহারা কেম্‌ব্রিজের গণিতবিদ্যায় পারদর্শী ছেলেদের অপেক্ষা খাট নয়। কিন্তু সব কথা এখানেই শেষ হইল না, ১০ বৎসর যাইতে দাও, ১০ বৎসর পর সেই দশ দশ জনকে যদি তুলিয়া নেও দেখিবে আকাশ পাতাল প্রভেদ, বাঙ্গালী ছেলেরা কোথায় পড়িয়া আছে আর বিলাতের ছেলেরা কোথায় উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি ?

আমার সমাজে, আমার দেশে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সেই সকল অবসর নাই, যে অবসর ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন দেশে আছে। সেখানে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই কি করিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিবে তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না। উপার্জ্জন তাহারা করে, যাহার যেমন শক্তি তেমন করে। কেহ পলিটিকসে যায়, ১০ বৎসর পার্লেমেণ্টে থাকিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদের কাছাকাছি যায়—যদিও প্রধান মন্ত্রীর পদ না পাইতে পারে; অন্যান্য ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাহারা যায় তাহারা ১০ বৎসরে শীর্ষ স্থানে বা তাহার কাছাকাছি গিয়া পৌছে। ১০ বৎসরে যদি বা না পারে সেখানে সুযোগ আছে, ব্যবস্থা আছে, অনুশীলনের সুবিস্তৃত পথ আছে, আমাদের এখানে তাহা নাই, সুতরাং যে বেশ কম হয় তাহা এই জন্য হয়, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উন্নতির অনুকূল নয়, নতুবা গোড়াতে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষা দেয়, আর কেম্‌ব্রিজ ও অক্‌সফোর্ডের ছেলেরা যে শিক্ষা পায় তাহাতে দেখা যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহাদের অপেক্ষা ভাল বই মন্দ নয়। কিন্তু এই ভালটুকুই মন্দ হইয়া যায়, তাহার ২টী কারণ (১) আমরা এখানে অনেক জিনিষ শিখিতে বাধ্য হই, যাহা জীবনে কোন প্রয়োজনে আসে না, এখানে আমাদের শক্তি ক্ষয় হয়, বিলাতে তা হয় না, যাহার যা প্রয়োজন নাই সে তাহা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয় না। (২) সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থোন্নতিক ব্যবস্থা আমাদের অনুকূল নয়।

যাউক, ইংরেজী শিক্ষার ফলে ক্রমে ক্রমে দেশে এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিল, প্রথমে যাহারা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহারা স্বাধীনতার দীক্ষা লাভ করেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিবাদের প্রভাব তখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপে প্রথমে তাহা দেখা দেয়, তাহার প্রেরণাতে ইংরেজী শিক্ষিতেরা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার ব্রতে আপনাকে নিয়োগ করেন, স্বাধীন হইতে হইবে, ব্যক্তিকে স্বাধীন করিতে হইবে, চিন্তাকে স্বাধীন করিতে হইবে, ধর্ম্মবুদ্ধিকে স্বাধীন করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খল মোচন করিতে হইবে, এই সকল কাজে তাহারা আত্মনিয়োগ করিলেন; তখনকার শিক্ষিত লোকের প্রধান প্রেরণা ছিল জীবনের সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে হইবে,—সমাজের শৃঙ্খল, পৌরোহিত্যের শৃঙ্খল, শাস্ত্রের শৃঙ্খল, প্রচলিত ধর্ম্মের শৃঙ্খল, এগুলিকে ভেঙ্গে স্বাধীনতার উপর মানুষকে গড়িয়া তোলা, ইহাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু এখানেই আবদ্ধ রহিল না, আবদ্ধ থাকিতে পারে না। স্বাধীনতা জিনিষ এক, যদি তুমি জীবনের কোন বিভাগে স্বাধীনতা প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সাফল্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে জীবনের অন্যান্য বিভাগেও সেই স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নহিলে তোমার চেষ্টা সফল হইবে না; রাষ্ট্রনীতিতে স্বাধীন হইব, সমাজনীতি সম্বন্ধে পরাধীন থাকিব, গণতান্ত্রিক হইব, আর সমাজে পৌরোহিত্যের অধীন হইয়া পড়িয়া থাকিব—এ

হয় না। মানুষ এক, মানুষের ধর্ম্ম এক, যেখানে সে ধর্ম্মের ঘরে চুরি না করে সেখানে ধর্ম্ম এক। তেমনি স্বাধীনতাও এক, সমাজের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের স্বাধীনতা—তিন বস্তু নয়, এক বস্তু, এই জন্ত প্রথমে ধর্ম্ম এবং সমাজে স্বাধীনতার দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। কেন উঠিল? স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেখানে জাগ্রত হয় যেখানে বন্ধনের বেদনা সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বোধ হয়, আগে বন্ধনের বেদনা, তাহার পর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। বন্ধনের বেদনা যতক্ষণ অনুভব না হইয়াছে ততক্ষণ মানুষের চিন্তায় স্বাধীনতার প্রেরণা আসে না। আর সে কোন যুগ? যখন আমরা ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলাম তখন আমাদের বন্ধন ছিল সমাজে। সমাজে আমরা তখন আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম না, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের বন্ধনের বেদনা ছিল, ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা দেখিলাম জাতিভেদ কিছু নয়, কিন্তু সমাজ সেখানে খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইল, সে আমাদিগকে স্বাধীন মতানুযায়ী কাজ করিতে দিবে না; কিন্তু রাষ্ট্রসম্বন্ধে ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের স্থান ছিল না, আমরা ভাবিতাম ইংরেজ শাসন আমাদের স্বাধীনতার অনুকূল, সুতরাং প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষিতেরা সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিল। কিন্তু বেশী দিন রহিল না, যাহারা সমাজে ও ধর্ম্মে স্বাধীনতার আদর্শের অনুশীলন করিল তাহারা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র সম্বন্ধে—জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগে স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইল। তখন ইংরেজের সঙ্গে গোলমাল বাধিল, ইংরেজ দেখিল এ কি হইল, কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল, আমরা যে ভাবিয়াছিলাম ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের সুবিধা হইবে, তাহা ত হইল না, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া আমাদের সঙ্গে ইহারা প্রতিযোগিতা করিতে চাহে, যতদিন আমরা পৌরোহিত্যকে মানিতাম না, যতদিন আমরা শাস্ত্রকে বর্জ্জন করিয়াছিলাম, স্বাধীনতার নামে—ততদিন ইংরেজ রাজপুরুষেরা পরোক্ষভাবে এবং অপরোক্ষভাবে আমাদের প্রশংসা করিতেন, বেশ, সাবাস, এই ত মানুষ,—এইরূপ বলিতেন। কিন্তু যখন আমরা তাহাদের কাছে এক চেয়ারে বসিতে চাহিলাম তখন মুস্কিল বাধিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিতেন, সাহেব, তুমি আমাদের বাপ দাদা, তোমার সামনে কি এক চেয়ারে বসিতে পারি! তা পারি না,—তাহারা মাটীতে বসিত। এখন উল্টা হইল, তোমার বাড়ীতে গেলাম, তুমি চেয়ারে বসিবে আর আমি দাঁড়াইয়া থাকিব? হবে না, এখানেও সমান সমান। আফিসে তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পার, বাড়ীতে তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট নয়, আফিসে প্রভু হইতে পার, রাস্তায় তা নও, রাস্তায় যখন চলিব তোমাকে দেখিয়া ছাতা গুটাইব কেন? ছাতা মাথায় দিয়াই চলিব; তখন ইংরেজ দেখিল এ ত ভারী বিপদ হইল, যাহারা ইংরাজী শিখে নাই তাহারা ভদ্রলোক ছিল, বিনয়ী ছিল, সদাশয় ছিল, ইহারা একেবারে 'আনরুলী' হইয়া পড়িয়াছে, অসংযত হইয়াছে ইহাদের ভদ্রতা ও বিনয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইংরেজী শিক্ষার দরুণ ইহা হইয়াছে,

সুতরাং এই শিক্ষাকে বদলাইতে হইবে—এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নূতন শিক্ষানীতি প্রচলন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইয়ুনিভার্সিটী আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব আমাদের তত্ত্বাবধানে আসিয়া পড়িয়াছিল, কলিকাতা সহরে মিউনিসিপালটী আমাদের হাতে আসিয়াছিল, সকল বিভাগে আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ইংরেজ দেখিলেন ইহা সুবিধা হইল না, তখন ইউনিভার্সিটীকে আবার ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা হইল, মিউনিসিপালিটীকে ভাঙ্গিয়া নূতন আকার দিবার প্রস্তাব হইল। এই সকল প্রায় ২৫ বৎসর আগেকার কথা, তাহার ফলে আমরা বলিলাম—তোমাদের ঐ শিক্ষা দ্বারা আমাদের চলিবে না, জাতীয় শিক্ষা দিতে হইবে, নিজেদের তত্ত্বাবধানে আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিব, এইভাবে নেশানেল এডুকেশনের সূত্রপাত হইল। তাহার আগেও নেশানেল এডুকেশন একটা ছিল। তখন ছিল—গভর্ণমেণ্টের সাহায্য নিব না, নিজেরা নিজেদের স্কুল কলেজ করিব; নেশানেল এডুকেশনের আদর্শ তখনও ফোটে নাই, আদর্শের সংঘর্ষ যখন উপস্থিত হইল তখন উহা ফুটিয়া উঠিল। লর্ড কুর্জ্জন আসিয়া যখন আমাদের চিন্তাধারাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে লয়েল সিটিজন তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আমরা উহার বিরুদ্ধে জাতীয় শিক্ষা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৯০২ কি ১৯০৩ সালের প্রথম দিকটায় যখন ইউনিভার্সিটী কমিশন বসে তখন আমরা বলিলাম—ওতে হইবে না, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আলাদা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমরা প্রতিষ্ঠিত করিব। ক্লাসিক থিয়েটারে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভায় প্রথম একথা উঠে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের কথা চলিতেছিল, আমরা বলিলাম—লর্ড কুর্জ্জন আমাদের শিক্ষার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার জবাব নেশানেল ইউনিভার্সিটী, কিন্তু ইহা কথার কথা রহিয়া গেল, তাহার পর যখন বঙ্গ-ভঙ্গ নিয়া গোলমাল আরম্ভ হইল, যখন কার্লাইল সার্কুলার জারি হইল। যখন নিয়ম হইল আমাদের ছেলেরা "বন্দে মাতরম্" বলিতে পারিবে না, স্কুলের বাহিরে দেশের কোন কাজে হাত দিতে পারিবে না, তখন আমরা বলিলাম—ওতে হবে না, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমরা নিজেরা গড়িয়া তুলিব। আগে আমরা তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইতে যাই নাই, শিক্ষা সম্বন্ধে বিবাদ প্রথমতঃ আরম্ভ করেন তাঁহারা, প্রথমে তাঁহারা আমাদের মাথায় লাঠি দিলেন, আমাদের আদর্শের পরিপন্থী প্রথমে তাঁহারা হইলেন, আমাদের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করিলেন, সুতরাং আমরা বলিলাম তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের থাকুক, আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিব, এইভাবে নেশানেল কাউন্সিল অব এডুকেশনএর সূত্রপাত হয়; ইহা এখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, এতদিন অর্থের অভাবে পারে নাই, যদিও এখন

অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে কিন্তু লোকের অনুরাগের অভাবে এখন সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেছে না। নেশানেল কাউন্সিল অব এডুকেশন এখন লোহা-লকড় নিয়াই ব্যস্ত আছেন, সাধারণ শিক্ষাবিস্তারে কোন চেষ্টা করিতে পারিতেছেন না, তাহার প্রধান কারণ লোকের অনুরাগ নাই, শিক্ষার চেয়ে দুপয়সা বেশী যাতে আসে সেদিকে লোকের দৃষ্টি ; বিদ্যার জন্ত বিদ্যা, জ্ঞানের জন্ত জ্ঞান,—এই ভাব দেশে আর নাই, যতটা সম্ভব এই 'এক্স্‌টেনসান লেকচার' দ্বারা সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে, উদ্যোগে ও আয়োজনে আমি রাষ্ট্রনীতি ও বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম ; ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি হয় ইংরেজ শাসনের প্রথমকার কথা পূজার পর বলিতে চেষ্টা করিব, তাহা হইতে দেখিতে পাইবেন দুই দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা আসিয়াছে, যে গণতন্ত্রের আদর্শের পশ্চাতে আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি এই আদর্শ দুই দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—(১) ইংরেজী শিক্ষা, (২) ইংরেজ শাসন। ১-১০-২৬।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

বধূ-বাসন্তী

নয়ন-সিক্ত বসন-রিক্ত শীতকম্পিত-ধরণী,
লভিল সজ্জা ঘুচিল লজ্জা রাগ-উজ্জ্বল-বরণী।
কুহেলি-কক্ষে হিমিকা-বক্ষে মধু-ভাস্বর ভাসিল,
সোহাগ-মগ্ন হৃদয়-লগ্ন বধূ-বাসন্তী হাসিল।
পীযূষ-কান্তি ঘুচা'ল ভ্রান্তি চূত-মঞ্জরী ফুটিল,
কুসুম-গন্ধ মধুর-ছন্দ বায়ু-হিন্দোলে ছুটিল।
সুরস-ভক্ত মধুপ-মত্ত মৃদু-গুঞ্জনে মাতিল,
পরাগ-পূর্ণ রেণুকা-চূর্ণ কাল-অঙ্গেতে ভাতিল।
বাঁধন-শীর্ণ পাষাণ-দীর্ণ সিত-নির্ঝর জাগিল,
রভস-রঙ্গে নব-বিভঙ্গে প্রিয়-দর্শন মাগিল।
কিরণ-পুষ্ট তারকা-তুষ্ট গগনাবক্ষে উজলে,
পৃথিবী সুপ্ত চেতনা-লুপ্ত মধু-চন্দ্রমা উছলে।
কোকিল-কণ্ঠে সুরভি-ঘণ্টে সুধা-সঙ্গীত মুখর,
লতিকা-বন্ধে মলয়-ছন্দে ফুল-নর্ত্তন সুকর।
ফাগুন-যত্নে সবুজ-রত্নে প্রীতি-উজ্জ্বল ধরণী,
মধুর-দৃষ্টি ললিত-সৃষ্টি বধূবসন্ত-ঘরণী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত

অরূপের রাস

১

রাণুর সঙ্গে আমার ভাব ছিল—
কিন্তু হঠাৎ একদিন আড়ি হইয়া গেল।

রাণু ছোট, আমিও ছোট ; সে সাত আমি চৌদ্দ বছরের।......

বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয় না, তথাপি বয়োকনিষ্ঠদের সম্বন্ধে বয়োজ্যেষ্ঠের সহজ একটা দায়িত্ব বুঝি থাকেই, বিশেষতঃ যদি প্রতিবেশী হয়।—

রাণুর সম্বন্ধেও আমার দায়িত্ব ছিল......তার শারীরিক কোনো হানি না হয় ইত্যাদি।

তত্ত্বাবধায়কের পদগুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে শাসন করিতেও যাইতাম ; কিন্তু সে শাসনের ফলে তাহার সংশোধন কতদূর হইত তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া, তার রূপের ব্যাখ্যার মতই নিষ্প্রয়োজন......

আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িত ; বলিত,—কানুদা একটা বড় মানুষ কিনা, তাই বক্‌তে' বসেছে। হি, হি, হি।......

কিন্তু হতোদ্যম আমি কখনই হই নাই।

রাণুর পিতা যদুগোপাল দত্ত মহাশয় অবস্থাপন্ন নহেন, নিঃস্বও নহেন। তাঁহার চাক্‌রীতে উপরি পাওনাও ছিল ; এই পয়সাটা অধর্ম্মের পয়সা—কিন্তু মাহিনার অল্প টাকাতেই সাংসারিক খরচটা কুলাইয়া ঐ অধর্ম্মের পয়সার সবটাই জমিত।

জন্ম, মৃত্যু, পাশ, ফেল, আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, বিবাহ—এই রকমের সামান্য পারিবারিক পরিবর্ত্তন ছাড়া গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরে উল্লেখযোগ্য বড় কিছু ঘটে না ; আমাদেরও ঘটে নাই। ...আমি একবার ফেল্ একবার পাশ্ করিয়াছি, আর একবার কি করিব তাহা দৈবের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি ; যদুগোপাল বাবুর চার টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আর একটী বৃদ্ধি আসন্ন হইয়াছে।......

এখন রাণুর বয়স দশ, আমার সতর।—

রাণু আমার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া আমার পাঠ্যপুস্তকের নেল্‌সনের মৃত্যুদৃশ্যের উপর আঙ্গুল রাখিয়া বলিল,—এটা কিসের ছবি, কানুদা ?

—যুদ্ধের ছবি। এই লোকটার বুকে গুলি লেগেছে, গুলি খেয়ে সে মরেছে।...বলিয়া

ডান হাত দিয়া মরণোন্মুখ নেল্‌সনকে দেখাইয়া দিলাম এবং বাঁ হাত দিয়া রাণুর কটি বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

চট্ করিয়া একবার পিছন দিক্‌কার দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাণু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল,—আর কি কি ছবি আছে দেখাও।

রাণুর ঐ চট্ করিয়া দরজার দিকে চাহিবার অর্থটা আমার না বুঝিবার কথা নয়—

এবং অক্লেশে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া দশ বৎসরের বালিকার এই অকাল পরিপক্কতায় আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু আমার কি দুর্মতি ঘটিল জানি না, সকৌতুকে হাসিয়া বলিলাম—ঢের ছবি আছে, কিন্তু আগে তুই বল্, তুই ছবি দেখ্‌তেই এসেছিস্ না আর কোনো মতলব আছে?

মনে হইল, রাণু এই দুরান কথাটার অর্থ ধরিতেই পারিবে না, তবু, পারে কিনা দেখিবার জন্য একটা উৎকণ্ঠাও জন্মিল।……

রাণু তৎক্ষণাৎ কথাটার উত্তর দিল না—খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল,—এসেছিলাম তুমি রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে বসে আছ তাই শুনে। ছবি দেখা মিছে কথা।

চেঁচাইয়া বলিলাম,—রসগোল্লা খেয়ে যা, রাণু।

রাণুও তখন চীৎকার করিয়া বলিতেছিল,—রাধা, পুতুলের একটা বাক্সর একটা টোপ্ সেলাই করব, দুপুর বেলা একটিবার আসিস্ ভাই।

……তাহার চীৎকারে আমার ডাক ডুবিয়া গেল।

আমার উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইল,-কিন্তু পরাজয়ের একটা অব্যক্ত লাঞ্ছনায় আমি নিবিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গেলাম।…ব্যাপারটা নিছক্ কৌতুক, কিন্তু হঠাৎ বিশ্রী হইয়া গেল।

* * *

দু'দিন পরে রাণু আসিয়া খবর দিল—কাল্লুদা আমার বিয়ে।

—বলিস্ কি?

—হ্যাঁ, সত্যিই। কাল দেখ্‌তে আস্‌বে।

বিস্ময়ের কারণ এ-সংবাদে কিছুই নাই। বিবাহরূপ পরিবর্ত্তন বাঙ্গালীর জীবনে নিত্য ঘটিতেছে—কাহারো অল্প, কাহারো বেশী, কাহারো মধ্যবয়সে। রাণুর না হয় দশম বৎসরেই সেই সাধারণ পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়া যাইবে।…

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কোথায়?

—তা জানিনে। বাবা মা ভারি ব্যস্ত। কত রকম খাবার তৈরী হচ্ছে। খেয়ে এলাম।

জিহ্বায় জল আসিল—পুলকিতকণ্ঠে বলিলাম,—নিয়ে আয় কিছু, আমিও খাই।

—আন্‌ছি। বলিয়া রাণু চলিয়া গেল।

আঁচলের আড়ালে লুকাইয়া একটা বাটি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া ঠেলিয়া দিয়া রাণু কহিল,—খাও।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।…সে মুখে বলিল, "খাও," কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে আহ্বানের বাষ্পমাত্রও ছিল না, বরং বিরুদ্ধদিকেই যেন একটা ধাক্কা অনুভব করিলাম।…হঠাৎ এ রাগ কেন ?

যখন সে যায় তখন তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি নাই ; কিন্তু এখন লক্ষ্য করিলাম, রাণুর মুখাবয়বের প্রত্যেকটি রেখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।……

রাণু বলিল,—খাচ্ছ না যে ?

কণ্ঠস্বর কর্কশ শুনাইল।

—তুই রাগ করে দিলি কেন ? রাগ করে খাবার ঠেলে দিলে কেউ খেতে পারে ?

রাণু উত্তর দিল না।

একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলাম,—চুরি ধরা পড়ে গেছে বুঝি ?

—চুরি করিনি, চেয়ে এনেছি।

—তবে বামুনকে খেতে দিতে রাগ কর্‌লি কেন ?

—রাগ কই কর্‌লাম। বল্‌লাম খাও।

আমি তাহার দিকে বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমারও রাগ হইয়াছিল। …এত ভুরু কোঁচ্‌কান কিসের ?…

উঠানে একটা কুকুর শুইয়াছিল—

রাণু দ্রুতপদে নামিয়া যাইয়া তাহারই সম্মুখে সেই দুধ ক্ষীর ছানা সরের মিষ্টান্নগুলি বাটিশুদ্ধ উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল।……

পূর্ব্বে যে আড়ির কথা বলিয়াছি, এই ঘটনায় তার সূত্রপাত।—

রাণুর রূপগুণের পরীক্ষা হইবে—

দেখিতে গেলাম।

প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল ধোঁয়ার আড়ালে লুকান'-মুখ একখানি দেহের উপর……

ধূমাকর্ষণের আর বিরাম নাই……নিরবচ্ছিন্ন ধূমপটল এক সময় সরিয়া যাইতেই দেখিলাম, কাঁচা-পাকা মোটাসোটা প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক হাত বাড়াইয়া রাণুর বাবার হাতে হুঁকা দিতেছেন।—

বারান্দায় একটা মাদুর বিছান হইয়াছে ; তাহারই উপর রাণুর বাবা কন্যার পিতার মত

সবিনয়ে, বরের যে-ই হোন্, তিনি বরপক্ষীয় কর্ত্তাব্যক্তির মত মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া আছেন; এবং আমারই বয়সী একটা ছোঁড়া অধোমুখে মাদুরের বয়নকৌশল প্রাণপণে নিরীক্ষণ করিয়াও দেখা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।……বুঝিলাম, এটা দূত, পাত্রকে গোপনে কনে'র রূপের কথা শুনাইবে।—

পাত্রপক্ষীয় সেই কর্ত্তাব্যক্তি বলিলেন,—মেয়ে পছন্দ হবেই। যেমন শুনেছি ঠিক্ তেমনটি যদি না-ও হয় তবু আপনার মেয়ে সুন্দরীই।

যদুগোপাল বাবু বলিলেন,—মায়ের আমার স্বাস্থ্যও খুব ভাল।

—হবেই ত, একটিমাত্র সন্তান ঐ মেয়েটি, খাইয়েছেন দাইয়েছেন ভালই। দেশের মেয়েরা ত' না খেতে পেয়েই আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাদের যে সন্তান হচ্ছে তারাও আকারে ছোটই হচ্ছে। বলিয়া ভগ্নোদ্যমের মত তিনিও যেন আকারে কিছু ছোট হইয়া গেলেন।

যদুগোপালবাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন,—যে আজ্ঞে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে। আমার ত' মনে হয়, ছোট হ'তে হ'তে একদিন বাঙ্গালী বলে' কোন জাত পৃথিবীতে থাকবে না।……

আমার কিন্তু হাসি পাইতে লাগিল।—

কন্যাদায় বিপদ নিশ্চয়ই; এই কনে দেখাদেখির ব্যাপারটা সমগ্র কন্যাদায়ের অংশ হইলেও, উদ্ধারটা প্রধানতঃ উহারই উপর নির্ভর করে বলিয়া ঢের বেশী জাগ্রত।……উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে থাকে—কন্যার পিতা একবার কন্যার মুখাবলোকন এবং একবার পরীক্ষকের মুখাবলোকন করিয়া একবার দেখেন কন্যার-শ্রী, একবার অন্বেষণ করেন পরীক্ষকের প্রীতি।………স্বর্ণপ্রতিমার সহিত যে-কন্যার রূপের উপমা চলে সেই কন্যার পিতার পরমাত্মাও এই সময়ে শুকাইয়া উঠিয়া দুলিতে থাকে; অথচ জীবনের ট্রাজিডি এম্নি উৎকট যে, ঠিক্ এই সময়টিতেই, মন যখন টাটায় তখন, মনের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন রাখিয়া তোষামোদকে বিনয়ের বেশে বাহির করিয়া বহু মিষ্ট কথা উচ্চারণ করিতে হয়; ব্যাপারটা কষ্টের হইলেও ভিতরে ভিতরে হাস্যকরই।—

সে যা-ই হোক্, কর্ত্তা বলিলেন,—পুরুষদেরও সেই কথা। তারাও কি পেট ভরে' খেতে পায় ভেবেছেন? হুঁ।

যদুগোপালবাবু পূর্ব্বে এ-বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু বাঙ্গালী পুরুষদের আধপেটা দুরবস্থার বার্ত্তা কর্ত্তার মুখে যেন হঠাৎ এই প্রথম পাইলেন এম্নি বিস্ময়ে তাঁর চোখ্ খুব বড় হইয়া উঠিল; বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—আজ্ঞে না, বিস্তর পুরুষ আছে যারা বারমাসই একরকম—

বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন, অনাহারে কাটায়।……

কিন্তু কর্ত্তা তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিলেন না ; বলিলেন,—বেলা বেড়ে' যাচ্ছে, বেশী সাজগোজের দরকার নাই, বাড়ীতে যেমন থাকে তেম্‌নি আন্‌তে বলুন !

যদুগোপালবাবু এবার বাঙ্গালী পুরুষসাধারণের দুরবস্থার সঙ্গে নিজের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া আরও ম্রিয়মাণ হইয়া কহিলেন,—গরীবের ঘরের মেয়ে, সাজ্‌গোজ কোথায় পাব যে তাকে সাজাব, বেয়াই !——তারপর কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া বলিলেন,—ঝি, হ'ল তোমাদের ?

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—হ'য়েছে।

"বেয়াই"—ইনি তবে পাত্রের পিতা স্বয়ং।

একটু পরে ঝি হাত ধরিয়া রাণুকে চৌকাঠের ধারে আনিতেই সেইদিকে চাহিয়া আমার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল —বাঃ।… ……

সাদা সেমিজের উপর লাল চওড়া পেড়ে একখানা কাপড় পরণে, লাল একটা রেশ্‌মী ফিতা দিয়া মাথার মাঝ্‌খানটা বাঁধা, কপালের উপর চুলের পাতা, পায়ে আল্‌তা, দুই ভ্রূর মাঝখানে ছোট্ট একটি কালো টিপ ;—

পরীক্ষা দেবার উপযোগী বেশপারিপাট্য রাণুর মাত্র এইটুকু,—

কিন্তু এই নিতান্ত সাধারণ বেশেই রাণুর রূপ অসাধারণ নূতন মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া আমার চোখে পড়িয়া গেল।··

রাণুর মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া যদুগোপাল বাবুর বেয়াই বলিলেন,—বাঃ-ই বটে।······এস, মা, এস, বস'। বলিয়া সম্মুখস্থ খালি স্থানটিতে হাত রাখিলেন।

ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া রাণু তাঁহার সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া বসিল ; ঝি পাশের দিকে মুখ করিয়া তাহার গা ঘেসিয়া বসিল।·········

কিন্তু আমার বুকের ভিতরকার বাক্‌স্ফূর্ত্তি যেন অকস্মাৎ অবরুদ্ধ হইয়া গেল……বহুদূরের কুজ্ঝটিকার আবরণ যেমন দেখায় তেমনি একটা অনির্দ্দেশ্য অস্পষ্ট ইচ্ছায় আমার মনের আকাশ ধীরে ধীরে আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল।······

হঠাৎ চমক্ ভাঙ্গিয়া শুনিলাম, বেয়াই বলিতেছেন,—আপনার মেয়ে সুলক্ষণা এবং সুন্দরী বটে ; সচরাচর এমনটি চোখে পড়ে না। রূপের খ্যাতি যেমন শুনে এসেছিলাম তার শতগুণ বেশী রূপবতী আপনার মেয়ে……কানে শুনে এ-রূপ ধারণা করা যায় না। এ-মেয়ে আমি নেব। বলিয়া রাণুর হাত দু'খানি তুলিয়া ধরিলেন।

যদুগোপাল বাবু বলিলেন,—আপনার অগাধ দয়া।

——দয়া নয়, গরজ। আপনার মেয়ের অদৃষ্টে আমার ছেলে রাজা হবে।

যদুগোপাল বাবু হাসিলেন———

কিন্তু হাসিলেন বলিলে যেন ঠিক্ হয় না ; বেয়াইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের টানে তাঁহার প্রাণের আনন্দ ও গর্ব্ব যেন এক ঝলক্ উছ্‌লিয়া পড়িল।······

আমিও মনে মনে সর্ব্বান্তঃকরণে কর্ত্তার উক্তির সমর্থনই করিলাম।——রাণুকে যে বিবাহ করিবে সে যে রাজ্যেশ্বরের মতই ভাগ্যবান, এবং দু'টি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে যে রাজৈশ্বর্য্যই গৃহে লইয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই।——

যদুগোপাল বাবু কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ এদিক্ ওদিক্ করিয়া পণের কথাটা তুলিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,——বড় দরিদ্র আমি, শুধু মেয়েটিকেই নিয়ে বসে আছি ; তাকে কি দিয়ে বিদায় দেব সে সংস্থান——

যদুগোপাল বাবু যেন কতবড় একটা লজ্জাকর শ্রুতির অযোগ্য কথা কহিতে সুরু করিয়াছেন এমনি শশব্যস্তে বেয়াই জিব কাটিয়া বলিলেন ; বলিলেন,——সর্ব্বনাশ, অমন কথাও বল্‌বেন না। স্বয়ং মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে যাব, তিনিই আমার ঘর ধনে-পুত্রে পূর্ণ করে' তুল্‌বেন। আপনার দু'এক হাজারের ওপর আমার লোভ নেই।

শুনিয়া, কেন জানিনা, আমারই চোখে জল আসিল। ··

এই দুঃসহ সুসংবাদটা যদুগোপাল বাবুর একেবারেই অপ্রত্যাশিত।·········যদুগোপাল বাবু স্থির দৃষ্টিতে মিনিটখানেক বেয়াইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আচম্বিতে তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন।——

বেয়াইয়ের এ বিপদটাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।···

নিজেরই কথার ফলে এ-হেন সঙ্কটে পড়িতে হইবে জানিলে তিনি বিনাপণে রাজ-লক্ষ্মী ঘরে তুলিবার শুভ-ইচ্ছাটা মুখোমুখী না বলিয়া বোধ করি ডাকযোগেই জ্ঞাপন করিতেন।—মোটা মানুষ, তাহার উপর পায়ের উপর আস্ত একটা মানুষ উপুড় হইয়া পড়িয়া—সহসা পিছে হটা বা উঠিয়া দাঁড়ান' বেয়াইয়ের সাধ্যাতীত, সে চেষ্টাও তিনি করিলেন না।.........যদুগোপালবাবুর দুই কাঁধ তিনি দুই হাতে ধরিয়া পায়ের উপর হইতে তাঁহাকে একরকম ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন ; অপ্রসন্নমুখে বলিলেন,—বেয়াই, এ কী কাণ্ড আপ্‌নি ক'রে বস্‌লেন, মেয়ের সাম্‌নে আপনি আমাকে লজ্জা কেন দিলেন, চোখে আপনার জলই বা কেন?

·········রাণুর মুখের দিকে চাহিলাম—

তার রাগ দেখিয়াছি, কান্না দেখিয়াছি,অবাধ্যতা দেখিয়াছি, চঞ্চলতা দেখিয়াছি······

কিন্তু লজ্জা দেখিলাম এই প্রথম·········

রঙের এই লীলাপুলক।.........

নিম্নের সকল বাষ্পাচ্ছন্নতা অস্পষ্টতার ঊর্দ্ধে সদ্যোত্থিত সূর্য্যের শোণিতাভা শৈলশীর্ষে যেমন—

তেম্‌নি করিয়া রাণুর এই প্রথম লজ্জার রক্তরাগ আমার অন্তরায়তনের সর্ব্বোচ্চ স্থানটি দীপ্ত করিয়া স্পর্শ করিয়া রহিল।.........

.........এ-কাণ্ড কেন করিলেন, মেয়ের সাম্‌নে বেয়াইকে কেন লজ্জা দিলেন, তাঁর চোখেই বা জল কেন?......যদুগোপাল বাবু এ প্রশ্নত্রয়ের একটিরও উত্তর দিলেন না; বেয়াইয়ের ঠেলায় খাড়া হইয়া বসিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন,—আমার মেয়ের বড় সৌভাগ্য যে আপনার মত মহাপুরুষের ঘরে সে যাবে। রাণু, তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর, মা।

রাণুর চোখের পক্ষ্মরাজির সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখাটা শুধু দেখা যাইতেছিল—

এইবার সে চোখ্ তুলিয়া ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল; তারপর চোখ্ নামাইয়া হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তিনি বিড়্ বিড়্ করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় রাণুকে বোধ হয় আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং ঝি-কে বলিলেন,—মাকে ঘরে নিয়ে যাও, দেখা শেষ হ'য়েছে।—

ঝি রাণুর হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল।......তার পিঠের উপর এলান' চুল বাতাসে একবার দুলিয়া উঠিল.........পায়ের আল্‌তার আভা চোখে পড়িল......একটা মিষ্ট গন্ধ নাকে গেল।.........

সবই বুঝিলাম, কেবল বুঝিলাম না ইহাই যে শুধু "মিষ্টিমুখ" করিতে বসিয়া যদুগোপাল বাবুর বেয়াই এত মিষ্টান্ন গলাধঃকরণ করিলেন কেন!—সেই মুড়টাও গিলিল অনেক।

বোধ হয় বাপ্ মায়ের আদেশেই রাণু বাড়ীর বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া দুর্লভদর্শন হইয়া উঠিল। তা উঠুক্......তিন মাস পরেই যে-মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাইবে তাহার নৃত্যপরায়ণতা মানায় না।......

কিন্তু মাঝ্‌খান হইতে আমি তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলাম কেন!—অনেক ভাবিয়াও কারণটা ঠিক করিতে পারি নাই।......কথা বলা একদম্ বন্ধ করিয়া দিয়াছে; দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়—যেন আমার সঙ্গে তার মুখচিনাচিনিও নাই।......একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম; তাহাতে সে হঠাৎ এমনই গর্জ্জন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল যে আমি সাত-তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পালাইবার পথ পাই নাই।......

বাঙ্গালীর মেয়ে শিশুকাল হইতেই বিবাহের কথায় লজ্জা পায়—

বিবাহের পাত্র স্থির হইয়া গেলে, তা সে যত ছোট মেয়েই হোক্ না, কেমন ভারভারিতিক ভাব ধারণ করে।……আমি এখন রাণুর কাছে পরপুরুষ, রাণু তাই আমাকে লজ্জা করিতেছে; এবং সেদিনকার সেই মিষ্টান্নঘটিত ব্যাপারে অপমান বোধ করিয়া রাগ করিয়া আছে তাহা নহে।……লজ্জা রাগ এক কথা, বিরাগভরে পরিহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা—একটিকে অন্যটি বলিয়া ভুল করা অসম্ভব।……রুষ্টমুখে মিষ্টান্ন দিলে তাহা প্রত্যাহার করা ন' দশ বৎসরের বালিকার বিরুদ্ধে এতবড় অপরাধ নহে যে তাহা সে ভুলিতেই পারে না।……যাহা হউক, রাণুকে একগুঁয়ে বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, সে আগে কথা না বলিলে আমিও যাচিয়া কথা বলিতে যাইব না।—

বিনাপণে কন্যার বিবাহ—

যদুগোপাল বাবুর এতখানি সৌভাগ্যের সংবাদে তাঁর আত্মীয় প্রতিবেশী শুভার্থীদের আহ্লাদে চোখ কপালে উঠিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর একটি ফল হইল ইহাই যে, যাঁহারা কন্যার পিতা তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন, দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে—কন্যার বিবাহের পর তাঁহাদের আর কৌপীনধারণ করিতে হইবে না।—

এই সময় রাণু একদিন আমার সঙ্গে যাচিয়াই কথা কহিল।

—কানু দা, তুমি নাকি আমার বিয়েতে পদ্য লিখ্‌বে?

দুর্দৈব ঘটিবেই, কাজেই ঠিক মুহূর্তেই আমি প্রীতি-উপহারকে আরও উপদেশপূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা লাইন কাটিয়া পরিবর্তে নূতন লাইন যোজনা করিতেছিলাম।

কাগজের উপর চোখ রাখিয়াই বলিলাম,—হুঁ।

—কি লিখেছ পড় দেখি শুনি।

একটু গর্ব্বিতভাবেই পড়িলাম।……

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, স্বদেশ, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি গুরুজন, দেবর, দাসদাসী, সমগ্র মানবজাতি এবং গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রতি নারীর কর্তব্য—কিছুই আমার পদ্যে বাদ পড়ে নাই।……অপরিচিত ও বিপদসঙ্কুল সংসারকাননে প্রবেশোদ্যত নব-দম্পতির মস্তকে করুণা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে ভগবানকে সানুনয়ে আহ্বান করিয়া প্রীতি-উপহার শেষ করিয়াছি।—

পড়া শেষ করিয়া কাগজখানা পরম মমতার সহিত টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিতেছি—এমন সময় রাণু ছোঁ মারিয়া কাগজখানা টানিয়া লইয়া বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।……চেঁচাইতে চেঁচাইতে প্রীতি-উপহারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যখন রাণুদের বাড়ীতে ঢুকিলাম তখন রাণু রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছে।

হাঁকিয়া বলিলাম,—আমার কাগজ দে।

রাণু আঙ্গুল তুলিয়া রান্নাঘরের ভিতরটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া গেল।—

রাণুর মা রান্নাঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে কানু ?

আমি বলিলাম,—আমি উপহার লিখেছিলাম ; রাণু নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

—ওমা, তাই বুঝি জলন্ত উনুনে দিয়ে গেল। এমন হতভাগা মেয়েও ত জন্মে দেখিনি।......

ক্রন্দন দমন করিতে করিতে চলিয়া আসিলাম ; দুর্জ্জয় ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।.. ...প্রীতি-উপহার নিজের নাম-সম্বলিত করিয়া ছাপাইয়া বিতরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমার আদৌ দুঃখ হইল না ; ক্ষোভে দুঃখে আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল ইহাই যে, এত শ্রম এত চিন্তার ফল রচনাটিকে নিষ্প্রয়োজনে সে এমন নৃশংসভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিল।......সাতদিনের দিন পদ্যটি খাড়া করিয়াছিলাম,—কত কাটিয়া কত ছাঁটিয়া কতবার নকল করিয়া তবে তাহাকে মনের মত করিয়া তুলিয়াছিলাম......ভাবিতে ভাবিতে কতবার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে......দিনে দুশ' বার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় নাই,—সেই পদ্য কিনা আগুনে দিয়া পুড়াইল।......নিজের মাথা হইতে শব্দ বাহির করিয়া ছন্দ মিলাইয়া পদ্য লেখা এই আমার প্রথম—আমার আদিতম মানসতনয়াকে লইয়া সে এ কী করিল। তাহাকে জলন্ত উনানে ঠেলিয়া দিয়া পুড়াইল।......শোকাগুনে আমিও পুড়িতে লাগিলাম।—

রসনচৌকি বাজিতেছে—

আজ রাণুর বিবাহ।

সেদিন রাণুর সঙ্গে রাজৈশ্বর্য্যের উপমাটা দৈবাৎ মনে আসিয়াছিল।......

আজ সেইটাই যেন খচ্ খচ্ করিয়া কোথায় বিঁধিতে লাগিল—একটা আপ্‌শোষের মত।—

রাণু ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরবাড়ী গেল ; আমি বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলাম।—

রাণু পিত্রালয়ে আসে, আমিও বাড়ী আসি......

কিন্তু বলিবার মত কিছু ঘটে না।......

যে দিন ঘটিল, সেদিন অপূর্ব্ব অননুভূতপূর্ব্ব একটা অসামান্য অনুভূতির অতিশয় বেগবান্ হিল্লোলে আমি সহসা পূর্ণ হইয়া গেলাম—শুষ্ক নদী যেমন বন্যার জলে দেখিতে দেখিতে পূর্ণ হইয়া যায়।......সুপ্তোত্থিত স-বসন্ত রতিপতি কখন আসিয়া উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল টের পাই নাই—

সহসা সে সিংহদ্বার খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—

এবং সেই মুহূর্ত্তেই আমার উল্লসিত চোখের সম্মুখে জলস্থল অন্তরীক্ষে একটা লোহিত মায়াঞ্জন ব্যাপ্ত হইয়া গেল।.......

রাণু আমাকে দেখিতে পায় নাই·······

আমিই তাহার জ্বলন্ত রূপ আর দুরন্ত যৌবনের দিকে চাহিয়া ছিলাম,—নেত্রের সেই উন্মত্ত সম্ভোগ জীবনের প্রতিদিনের বস্তু নয়, তাই চোখের পলক পড়িতে চাহে নাই।·······

ঘটনা আমাদের বাড়ীতেই—

যখন দৈবাৎ একসময় তাহার সঙ্গে আমার দৃষ্টির মিলন হইয়া গেল, তখনই রাণু লাল হইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে স্থানত্যাগ করিয়া গেল।......অন্তরের তৃষার্ত্ত কলুষ অগ্নি-তরঙ্গের মত আমার বুক জুড়িয়া গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।—

রাণুর বয়স এখন চৌদ্দ—

কিন্তু অতুলনীয়! প্রচুর স্বাস্থ্যের প্রভাবে সে ঐ বয়সেই কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ-যৌবনের মধ্যাহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—

দু'দিন পরেই রাণুর সঙ্গে দুই বাড়ীর যাতায়াতের পথে দেখা হইল। আমাকে দূর হইতে দেখিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল—

যেন ফিরিয়া যাইবে........

কিন্তু তার বদলে সে আঁচল তুলিয়া মুখ আড়াল করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।........

পাশ দিয়া যাইতে যাইতে মুখে বলিলাম,—আমি কানু।—

কিন্তু মনের ভিতর যে কাণ্ড চলিতে লাগিল তাহার মূর্ত্তি ঝটিকাহত সিন্ধুর মত......

রাণু বলিল,—তা' জানি। তুমি আমার মুখ দেখ্‌বার যোগ্য নও। বলিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল।

ঘটনার সূত্র ধরিয়া কথার অর্থ ঠিকই বুঝিলাম, কিন্তু বিদ্ধ হইয়া অভিমান করিতে পারিলাম না।.......তাহাকে নূতন চক্ষে দেখিয়া অবধি বুকে যে ঝড় উঠিয়াছিল, ক্রোধ অভিমানের সাধ্যই ছিল না তার মধ্যে মাথা তোলে।......

অন্তরলোকের জ্যোতির্ম্মণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিঃসঙ্গ দুটি গ্রহের মত সে আর আমি।.......

এত খবর রাণু জানে না।—

রাণু স্বামীর ঘরে গেল।

……কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মৃত্যু ক্ষুধিত রাক্ষসের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া নরনারী-গুলিকে যেন দুই হাতে মুখে তুলিয়া অবিরাম গ্রাস করিতে লাগিল।…….ক্রন্দনে হরিধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল……শববাহকের মুখে হরিধ্বনি, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে হরিধ্বনি, দলবদ্ধ লোকের মুখে হরিধ্বনি……কিন্তু হরিঠাকুর ভয়ার্ত্ত জীবিতের আকুল আহ্বানে কর্ণপাতও করিলেন না—

লোক মরিতেই লাগিল।

মহামারী আরম্ভ হইবার সপ্তম দিনে রাণুর পিতা ও মাতা মাত্র বার ঘণ্টার ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।—

রাণুকে দুঃসংবাদটা দিয়া আমরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম।

*   *   *   *

দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি—

ছয়মাসে শ্মশান আবার লোকালয়ের আকার ধারণ করিয়াছে।

বাবা রাণুকে তাহাদের ঘরবাড়ীর একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

রাণু লিখিল,—"বাড়ী বেচিয়া ফেলুন।"

সেইদিন আমিও একখানা পত্র পাইলাম; দেখিয়াই চিনিলাম, ঠিকানা লেখা রাণুর।… লিখিয়াছে—

কানুদা, তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড় দুঃখ।

দু'টি দিনের কথা তোমার মনে পড়ে?……যেদিন রাগ করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া খাবার খাও নাই, আর যেদিন তোমার প্রীতি-উপহারের কাগজ আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিলাম? কারণ কি, তুমি নিশ্চয়ই জান না। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখ, তোমার সে-উল্লাস আমার সহ্য হয় নাই।—তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; আমার প্রণাম গ্রহণ কর। ইতি—রাণু।—

(২)

রাণুর পত্র পড়িয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া আমার দৃষ্টি নিস্পলক হইয়া গিয়াছিল—

অবাক্ মন দিশা পায় নাই। কিন্তু অদৃষ্টে ছিল রাণুর সঙ্গে আবার দেখা হইবে।……

রাণুর স্বামী বদ্‌লি হইয়া আমাদের দেশে রাণুদেরই হস্তান্তরিত বাড়ীতে ভাড়াটে হইয়া আসিল।

রাণু প্রথমটা কান্নাকাটি করিয়া আমার স্ত্রীর সখিত্বে সুস্থির হইলে দেখিলাম, রাণু

ইন্দিরাকে একান্ত সন্নিকটে টানিয়া লইয়া আমাকে তার রাজ্য হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে।......

আশা করিয়াছিলাম, অন্ততঃপক্ষে কানু দা বলিয়া ডাক দিয়া রাণু আমার পায়ের ধূলা লইয়া যাইবে ; কিন্তু সে আসিল না।......

ইন্দিরা বলিল,—রাণুর ছেলেটি বড় সুন্দর হ'য়েছে।

—হবারই ত' কথা ; ওরা দু'জনেই সুন্দর।

—ছেলেটাকে আমায় দেবে বলেছে।

ইন্দিরার পক্ষ হইতে ছেলে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম,—চেয়েছিলে বুঝি ?

—না, না, চাইব কেন ! সে-ই বল্‌লে, বউ, আমার ছেলেটা তুই নে।

—বেশ দয়ালু ত !......

হঠাৎ ইন্দিরা লাল হইয়া উঠিল। তাহার এই চমৎকার লজ্জা দেখিয়াই মনে পড়িয়া গেল, আমার শেষ কথাটার অর্থ বহুদূর যায়।......পুত্রবতী হইবার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া না বসিলে রাণুর দানে দয়ার কথাটা আসে না।......কিন্তু ইন্দিরার বয়স সবে পনর'।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—ছেলের নাম কি ?—

বেণু।

মনে মনে আবৃত্তি করিলাম, কানু......বেণু।........কেন জানি না, ছেলের নাম বেণু রাখা, এবং ব্যাপার বেনামিতে নিষ্পন্ন করিয়া তাহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিবার অসত্য প্রস্তাবের একটা গভীর নিহিত অর্থ ও অভিসন্ধি যেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।.......

হয়তো আমার কল্পনা অমূলক—

হয়তো চিন্তা ও ইচ্ছা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য—

কিন্তু ভ্রান্তির মাঝে জন্মলাভ করিয়াই হর্ষের যে কম্পন প্রাণের উপর দিয়া সির্ সির্ করিয়া বহিয়া গেল তাহা পরম তৃপ্তির সঙ্গেই উপভোগ করিলাম ; সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে কোথাও টান্ পড়িল না।......

বেণুর মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দিরা বলিল—দু'টি দাঁত উঠেছে মুক্তোর মত। নেবে কোলে ?

—দাও। বলিয়া হাত বাড়াইতেই বেণু নির্ব্বিবাদে আমার কোলে আসিল।

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল,—বেশ আলাপী।......

কথাটা কানে গেল, কিন্তু মন তখন অন্যদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে........

তাহারই অঙ্গবিচ্যুত এই শিশু—

তাহারই সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির এই বিগ্রহ—

তাহারই প্রাণের স্পন্দন,—দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্ত, হৃদয়ের আনন্দরস স্থানান্তরিত হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছে।.

মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ইন্দিরা বেণুর দিকে অত্যন্ত লালসার চক্ষে চাহিয়া আছে; আমি চোখ তুলিতেই ইন্দিরা একটু হাসিয়া সরিয়া গেল;—আমারও চক্ষে লালসা ছিল, কিন্তু দু'টিতে এম্‌নি অমিল, যেন হাসি আর কান্না।..........

বেণুর চোখের দিকে চাহিলাম—

ঠিক্ তেম্‌নি চক্ষু দু'টি; কোথায় প্রভেদ কোথায় নয়; মিল অমিলের কোথায় সন্ধিস্থল সে-বিশ্লেষণ নিমেষেই অতিক্রম করিয়া আমার দৃষ্টি সেই দৃষ্টির নীল-পারাবারে ডুবিয়া গেল।......

......সহসা মনে হইল, আমি যেন অপূর্ণ; জীবনের অর্দ্ধাংশ বিচ্ছিন্ন কক্ষচ্যুত হইয়া আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে......সর্ব্বত্রই ঐক্য, শান্তি; কেবল কি হইলে কি হইত ইহারই একটা অস্থির উত্তপ্ত কল্পনা আমার একটা দিক্ যেমন শুষ্ক বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে একটা দুরু দুরু শঙ্কারও শেষ নাই—পাছে এই বেদনা অসাড় হইয়া একদিন মনে নিরাশার লোল স্থবিরত্ব আসিয়া যায়।......

ইন্দিরা আসিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল,—ছেলে কোলে করার রকম ঐ নাকি?

বেণুকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম,—রকম দুরস্ত হ'য়ে আস্‌বে; যতদিন তা' না হয় ততদিন পরের ছেলে একটু অসুবিধা ভোগ কর্‌লই বা।

একটা ধমক্ খাইলাম।—

......আমার অন্তর্গূঢ় সুখের শত্রু হইয়া উঠিল, ঈর্ষা। থাকিয়া থাকিয়া বুক টন্‌টন্ করিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, আমার নিজেরই বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটা ছবি—

রাণু পরস্ত্রী.........

এই জ্ঞানটা অনায়াস সুখ-সমাদরের সঙ্গে মনে মনে লালন করিবার বস্তু নয়—

অনিবার্য্য অঙ্কুশ-তাড়না যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চায়।......

ইন্দিরা একটা নূতন খবর দিল,—রাণুটা একটা পাগল।

—মানে ?

—বলে, আয় বৌ, তুই আর আমি এক হ'য়ে যাই।

—পাগলের লক্ষণই বটে। তুমি কি বল্‌লে ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দিরা কি একটা উত্তরও দিল—

কিন্তু ইন্দিরা তখন তাহার শব্দ স্পর্শ লইয়া আমার সম্মুখ হইতে একেবারে মুছিয়া গেছে······

সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চের কণ্টকোৎসব জাগাইয়া আনন্দের সতীব্র শিখা আমার স্নায়ু-শিরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।……

কতক্ষণ এই উদ্বেলিত আনন্দে মুহ্যমান হইয়া ছিলাম, কি করিয়াছিলাম জানি না।—হুঁস্ ফিরিলে দেখিলাম, ইন্দিরা অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে।.. ...একটু হাসির আম্‌দানী করিয়া বলিলাম,—কি বল্‌ছিলাম যেন ?

ইন্দিরা বলিল,—তুমি কিছু বল্‌ছিলে না, আমিই বল্‌ছিলাম যে—

বলিয়া হঠাৎ থামিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দিরার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—উঠ্‌লে যে ? হঠাৎ রাগ হ'ল কিসে ?

—রাগ হয়নি, কিন্তু তোমার মত অন্যমনস্ক লোকের সঙ্গে কথা বলাই বালাই।

—আচ্ছা, এবারকার মত মাপ কর।······রাণু পাগলের মত কি কথা কয়েছে, তুমি তাতে কি বল্‌লে ?

ইন্দিরা সমগ্র ব্যাপারটা কি-ভাবে গ্রহণ করিল সে-ই জানে; সহজকণ্ঠেই বলিল, আমি বল্‌লাম, পারো হও। কিন্তু একজনকে তা হলে বৌ খোয়াতে হবে।—রাণু বল্‌লে, কানুদাকে জিজ্ঞেস করিস্, সে খোয়াতে রাজি আছে কি না।

—মোটেই না। বলিয়া ইন্দিরাকে আলিঙ্গন করিতে হাত উঠি উঠি করিয়াই থামিয়া গেল। বলিলাম, বসন্তবাবুর সঙ্গে একটা আপোষ করে নিতে পার্‌লে একরকম বন্দোবস্ত করা যায়।....

কিন্তু হঠাৎ ইন্দিরার উৎসাহ যেন নিবিয়া গেল।

• • • • • •

ছ'মাস কাটিয়াছে।

টেলিগ্রামে বসন্তবাবুর বদ্‌লির খবর আসিয়াছে।

রাণুর সঙ্গে এতদিন মুখোমুখী দেখা হয় নাই। আমাদের বাড়ীতে সে আসে নাই···

ইন্দিরাকে বলিয়াছে, বড় ঝামেলা, ভাই; গল্প জমে না। ইন্দিরাকে সে ডাকিয়া লইয়াছে।......

যাইবার আগের দিন রাণু আমাদের বাড়ীতে আসিল।······ছেলেটিকে ইন্দিরার কোলে দিয়া আমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম রাখিয়া কহিল,—কানুদা, কাল আমরা যাব। তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বউটি বড় ভালমানুষ।

আমি বলিলাম,—ভাল মানুষ বৈ কি। বলিয়া রাণুর দিকে চাহিয়া হাসিব কি ইন্দিরার দিকে চাহিয়া হাসিব তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আইনের পুস্তকের দিকে চাহিয়াই একটু হাসিলাম।—

—রাজি ত ?.......

নিজেরই চম্‌কান দেখিয়া বুঝিলাম অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম।

—কিসে ?

ইন্দিরা বলিল,—ঐ রকমই, কথায় কথায় অন্যমনস্ক।

রাণু বলিল,—ঐ যে বল্‌লাম, বৌ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। আর ত দেখা হবে না

কণ্ঠস্বর গাঢ় শুনাইল।—

বলিলাম,—আচ্ছা।

ইন্দিরা বলিল,—যা বলেছি ঠিক্ তাই।

—কি ?

—রাণুটা একটা পাগল।

—আবার কি বল্‌লে !

ইন্দিরা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—কে জান্‌ত······

বলিয়া থামিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইন্দিরার হাসি থামিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কথাটা কি ?

ইন্দিরা বলিল,—যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেলাম।—

ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক্ রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।

আমি স্তব্ধ।—

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

বেণুগীত

কোন্ শরতের স্বচ্ছ-সলিল-শীকর-সিক্ত স্নিগ্ধ বায়
কমল গন্ধ সুরভি, হে কবি লাগিল সেদিন তোমার গায় ?
দূর বন হতে রাখালের দল কি বাঁশী সেদিন বাজায়ে ছিল
অপরূপ তব এই বেণুগীত সুরখানি তার ভরিয়া নিল ?
ময়ূরের পাখা চূড়ায় উড়ায়ে কর্ণে গুঁজিয়া কর্ণিকার
চিরন্তন সে গোপের বালক বাজাল' কি সেই বেণুটি তার ?
সে বাঁশীর রবে উন্মনা তব অন্তরখানি উদাসী হয়ে
গোপীকারই মত বনপথ চাহি এই বেণুগীতে উঠিল গেয়ে ?
"চক্ষের হেন সার্থক ফল এহ'তে বলনা কি আর আছে
প্রিয়েরে যদি সে নয়ন ভরিয়া দেখিবারে পায় নিয়ত কাছে ?
সে প্রিয়ের কাছে যারা সদা আছে নিত্য তাদের কি উৎসব
অচেতন জড় অন্ধ মূঢ় হোক্ তবু তারা ধন্য সব।
বন্ধুরে মোর দেখিতে কুসুম নয়ন মেলিয়া ধরণী চায়
শিশিরের ছলে প্রেমের অশ্রু অঝোরে গো তার ঝরিয়া যায়।
অম্বুদ ঐ বঁধুরে খুঁজিতে শুভ্র আতপ-ত্রাণের মত
রৌদ্রের মাঝে ছায়া রচি তাই চলেছে উদাসী হইয়া নত।
যে বেণু তাহার অধর ছুঁয়েছে বংশ তাহার ধন্য মানি
কুলবৃদ্ধের মত সেই কুল-পাবনেরে দেয় আশীষ-বাণী।
কমলের মালা উপহার গাঁথি হ্রদিনী মোদিনী রয়েছে চেয়ে
হংস সারস তারি ধ্যানে আছে মুনির মতন মৌনী হয়ে।"
তাদেরি প্রিয়ের ধেয়ানে ধরণী উন্মনা হ'য়ে রয়েছে চাহি,
কোন্ শরতের উদাসী দিবসে হেন গান কবি উঠিলে গাহি ?
তারপরে নব কুঙ্কুমারুণ চাঁদের কিরণে বৃন্দাবনে
মল্লিকা যূথী জাতির গন্ধে, মোহন মুরলী মধুর স্বনে
ব্রজবালা সনে বন হতে বনে ফিরাইলে কত শারদ রাতে,
কখনো মিলন হর্ষ-আতুর, কভু বিরহের অশ্রুপাতে।
সে বাঁশীর রবে আকুলা যমুনা দুকূল উছলি হারায়ে কূল
উজানে বহিলা কুলুকুলু রবে আপনার গতি করিয়া ভুল !

বেদ বেদান্ত উপনিষদের শেষে একি কবি গাহিলে গান ?
একি নব ধারা, নব উপাসনা ধরার মানবে করিলে দান !
বৃন্দাবনের নব মহাযোগে দেখালে সর্ব্ব বিজয়ী বেশে
সে মধুর রস লোলুপ নিভৃত 'রসঘন' রূপে যেথায় মেশে।

এই বেণুগীতে আর একদিন আর' একজন উদাসী হয়ে
গোপীকারই মন নব অনুরাগ সখিমুখে যেন শোনালো গেয়ে।
যে মহা দিবসে নিত্যানন্দ মিলিলেন আসি গোরার সনে
হিমালয়-চ্যুতা যমুনা গঙ্গা মিলিলা যেমন আলিঙ্গনে।
ভাব-নিরুদ্ধ দুই বুক হতে নব পরিচয় প্রেমের ধারা
দরদী মরমী মুকুন্দ মুখে এই বেণুগীতে জাগালো সাড়া।
বিগ্রহ ব্রজ গোপিকামূর্ত্তি জীবন্ত গোরা প্রেমের ছবি,
বুঝি আমাদের তোমারি এ দান—হে শ্রীমদ্ ভাগবতের কবি !

শ্রীনিরুপমা দেবী

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের চিঠি

[১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুইৎজর্লণ্ডে অপূর্ব্ব লুগানো সহরে মহামতি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে আমার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ঘটে। ইংলণ্ডের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরের লেখায় আমি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হই ; তাই তাঁর সহিত আলাপ পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্যে আমার সমগ্র অন্তর ভরে গিয়েছিল। কয়দিন এক হোটেলে একত্রে থাকা, একত্রে খাওয়া-দাওয়া, তাঁর বক্তৃতাদি শোনা, একত্রে ভ্রমণ প্রভৃতির সূত্রে এই অমায়িক মহাত্মার সরল তেজস্বী গভীর মনটির পরশ আমাকে পরম তৃপ্তি দিয়েছিল—বিশেষতঃ এইজন্যে যে আমার মতন একজন সামান্য ছাত্রকেও তিনি কখনো অবজ্ঞা করেন নি (ও পরে বরাবরই আমার প্রত্যেক পত্রের বিশদভাবে যথাযথ উত্তর দিয়ে এসেছেন)।

তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার পর আমি তাঁকে এই পরিচয়ের সাহসে একটি দীর্ঘ পত্র লিখি। তাতে আমি যা লিখেছিলাম তার সার মর্ম্ম এই :—

“লুগানোয় আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল যদিও জানি না আপনার আমাকে মনে আছে কি না। কিন্তু তা থাকুক বা না থাকুক আমি আজ আপনাকে একটি বড় চিঠি লিখ্‌বার সঙ্কল্প করে কলম ধরে বসে গেছি। কারণ আপনার গভীর চিন্তারাজি আমাকে এত অনুপ্রাণিত করেছে যে আমার কয়েকটি জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে আপনার মতামত জান্‌বার লোভ আজ আমার দুর্দ্দম্য হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবনের গোড়াকার প্রশ্ন বা valueগুলি সম্বন্ধে যদি সে কারুর কাছে আলো পায় তবে সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ না করেই পারে না।

তাই আপনার সময়ের উপর নানান্ বৃহৎ কর্ম্মের দাবী-দাওয়া থাকা সত্ত্বেও আমি আপনাকে আমার সমস্যা সম্বন্ধে দু'একটি প্রশ্ন করতে উদ্যত হচ্ছি। আমার বিশ্বাস এ-রকম সত্যকার সমস্যায় আপনার মতন গভীর আন্তরিক হৃদয়ের কাছ থেকে যথার্থ সমাধান পাওয়ার দিকে মস্ত সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। কারণ মহত্ত্বের ধর্ম্মই এই যে সে তার স্বভাবজ সহানুভূতির আলোতে আমাদের মতন সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা, আনন্দ বেদনার স্বরূপটি নির্দ্ধারণ করতে সহজেই সক্ষম হয়। যাক্, আমার বক্তব্য ও মূল প্রশ্নটি বলি।

আমি য়ুরোপে এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এখানে এসে নানা কারণে আমি শেষটায় সঙ্গীতের চর্চ্চায়ই আমার জীবন উৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি।

আমার ব্যক্তিগত দিক দিয়ে মনে হয় যে সঙ্গীতের চর্চ্চায় আমার নিজের জীবনে মস্ত সার্থকতা আসবে; কিন্তু জীবনের সন্ধিস্থলে পথ বেছে নেওয়ার সময়ে কি শুধু নিজের সার্থকতাকেই ধ্রুবতারা করা উচিত, না দেশবাসীর দুঃখকষ্টের দিকেও দৃক্‌পাত করা উচিত? সঙ্গীত আমার কাছে এতই প্রিয় যে আমার ভয় হয় পাছে এর চর্চ্চায় আমি শেষটায় স্বার্থপ্রিয় হয়ে পড়ি—পাছে দেশের দুর্দ্দশা ও পরাধীনতার ব্যথা ভুলে যাই। তাই এখনও সময়ে সময়ে মনে হয় নিজের তৃপ্তির দিকে না চেয়ে দেশবাসীর সেবায়ই হয়ত আমার নিজের জীবনকে নিয়োজিত করা শ্রেয়ঃ ছিল। আমি জানি যে হয়ত এর ফলে আমার নিজের জীবনে কাজ করার দিক্ দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না, অর্থাৎ হয়ত আমি সঙ্গীতে যতটা কাজ করতে পারতাম, অন্য কোনও লোকহিতকর কাজে তার সিকি পরিমাণ স্থায়ী কাজও করে যেতে পারব না। কিন্তু এ স্থলে objective দিক্ দিয়ে কাজ করাটাই কি বড়, না subjective দিক্ দিয়ে দেশবাসীর দুঃখ-দৈন্যের অংশ নিয়ে তাদের জন্যে নিজের শিল্প-চর্চ্চা বিলাস ত্যাগ করাই বেশি বাঞ্ছনীয়, যেমন টলষ্টয় ও প্রিন্স ক্রপটকিন করেছিলেন?"

এই চিঠির উত্তরে মহামতি রলাঁ যে চিঠিখানি লিখেছিলেন বোধ হয় আজ তা প্রকাশ করতে পারি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়]

"লুগানোতে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আমার মনে আছে বই কি। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তোমার প্রশ্ন ও সমস্যা আমার মনকে বার বার আলোড়িত করেছে—যার সমাধান খুঁজতে আমাকে জীবনে নিতান্ত কম ঘাত প্রতিঘাত ও উৎকণ্ঠা সহ্য করতে হয় নি।

মোটের উপর, আমি তোমার অবস্থায় পড়লে সঙ্গীত অধ্যাপনার কাজটাই গ্রহণ করতাম, এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমার অবসর সময়ে সমাজ-সেবা বা রাজনীতির চর্চ্চা করতাম। মানুষ যদি তার নিজের নিহিত আসল প্রকৃতিটির উপর খুব বেশি অত্যাচার ক'রে তাকে দাবিয়ে রাখে তা হ'লে খতিয়ে তার দ্বারা বিশেষ কোন সত্যকার কাজ হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি প্রায়ই দেখেছি যে মানুষ যদি কোনো একটা আদর্শের মোহে প'ড়ে তার অন্তরের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দেয় তা হলে তাতে তাকে শুধু নির্ম্মম fanatic-ই করে তোলে; ফলে দাঁড়ায় এই যে, তার দ্বারা সমাজের উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশি। কেউ হয়ত নিজেকে অনন্যসাধারণ বা ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করতে প্রলুব্ধ

হতে পারেন, কিন্তু সেটা খুব সমীচীন নয়। আমার নিজের জীবনে আমি একটা মাঝামাঝি পথ বেছে নিয়েছি। আমার সময়ের অর্দ্ধেকটা আমি সমাজ-সংস্কার, যুদ্ধবিগ্রহ-নিবারণ প্রভৃতি লোকহিতকর প্রসঙ্গের আলোচনা ইত্যাদিতে কাটাই, এবং বাকি সময়টা সূক্ষ্ম ও abstract চিন্তা নিয়ে থাকি—যা আমার প্রকৃতি সত্যি ভালবাসে।

আর একদিক দেয়েও ব্যাপারটা দেখতে পার। মনে কর, কালক্রমে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা পেল; তখন সবাই চাইবে যে ভারতে এমন লোক উঠুক যারা একটা বড় সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু যাঁদের রাজনীতির গণ্ডীর বাইরে অন্য ক্ষেত্রেও কাজ করার ক্ষমতা আছে, তাঁরা যদি ইতিমধ্যে তাঁদের নিহিত সৃষ্টিশক্তিকে অবহেলা করেন তা হ'লে বড় সভ্যতা গড়ে ওঠা অসম্ভব হতে বাধ্য।

সুতরাং, বস্তুতঃ এ প্রশ্নের সমাধান তোমার মূল প্রকৃতিটির প্রবলতার ও তার শক্তির উপরই নির্ভর করছে। সঙ্গীতচর্চ্চায়ই যদি তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রবল অনুরাগ হয় তবে তাই নিয়েই তোমার থাকা উচিত। কিন্তু যদি তুমি মনে কর যে রাজনীতির চর্চ্চা তোমার জীবনকে এমন আচ্ছন্ন ক'রে রাখতে পারে যে তাতে তুমি সঙ্গীতের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে পারবে তা হ'লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। এ প্রশ্নের উত্তর তুমি ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। তবে এ প্রশ্নের যা-ই উত্তর হোক না কেন, আমি শুধু কি ভাবে কাজ করা উচিত তারই একটা আভাস দেওয়া ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারি না।

তুমি তোমার চিঠিতে যে সব কথা তুলেছ তা সবই খুব চিন্তনীয়। কিন্তু মোটের উপর আমার এ সম্পর্কে যা মনে হয় তা আমি এই চিঠিতে প্রকাশ করেছি। ইতি

বার্টরাণ্ড রাসেল ”

দশচক্র

(৯)

খুড়িমার সহিত সেদিনকার কথাবার্ত্তা লইয়া নিশি অনেকবার মনে মনে আলোচনা করিয়াছে। ভাবিয়াছে শিক্ষিত হইলেই কি পরমপুরুষার্থ লাভ হইল্? কলেজে যে সব ছেলেদের সহিত সে পড়ে, তাহাদের ত শিক্ষিত বলিয়া নাম আছে। কিন্তু তাহাদের কয়জনকে সে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে? কয়জনের সহিত একত্র বাস করা যায়? না, একথা সে কিছুতেই মানিবে না যে শিক্ষাই সকলের চেয়ে বড়। শিবাজি ত শিক্ষিত ছিলেন না বলিয়া প্রবাদ আছে। তা বলিয়া তিনি কি এখনকার বি, এ, এম, এ-দের চেয়ে ছোট? এই বর,

গৌরী। সে না হয় কপাল পুড়াইয়া আজ পরের বাড়ীতে দাসত্ব করিতেছে। কিন্তু তার স্বামী যদি আজ জীবিত থাকিতেন তাঁহার কি অসুখী হইবার কোন কারণ ঘটিত,—সে শিক্ষিত নয় বলিয়া ?

কিন্তু সে যে শিক্ষিত নয়, একথা নিশি জানিল কিরূপে ? ঠিক জানিত না। অনুমান করিয়াছিল। পল্লীগ্রামের মেয়ে, পল্লীগ্রামের বধূ—শিক্ষিত হইবার সুযোগ তাহার কোথায় ?

নিশির অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হইতে বেশীদিন লাগিল না। একদিন নিশি শশীকে অনুরোধ করে উপর হইতে তাহার Medical Jurisprudence বইখানা আনিয়া দিতে। শশী বাহিরে যাইতেছিল, বলিল তাহার সময় হইবে না। ইত্যবসরে গৌরী ছুটিয়া গিয়া বই আনিয়া দিল। নিশি বই খুলিয়া দেখিল Medical Jurisprudenceই বটে। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কি ক'রে চিনলে ?'

গৌরী শুধু হাসিল, কোন উত্তর দিল না। নিশি কিন্তু ছাড়িতে চাহিল না। "বল কি ক'রে চিনলে ? তুমি কি পড়্‌তে জান ?"

গৌরী খুব জোর করিয়া বলিল "হাঁ।"

নিশি। তবে পড় না কেন ? আমার কাছে ত অনেক ভাল ভাল বই আছে।

গৌরী। বেশ ত, একটা মাষ্টার রেখে দিন।

নিশি বলিল "আচ্ছা, তাই হবে।" ঠিক করিল নিজেই মাষ্টারী করিবে,—অবসর মত তাহাকে কিছু কিছু পড়াইবে।

পাছে তাহার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া কেহ সন্দেহ করে, এই ভয়ে সে মা, পিসী, মাসী, ও অন্যান্য দু' একজন আত্মীয়াদের সহিত সভা করিয়া গৌরীকে পড়াইতে লাগিল। ইংরাজী পড়াইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সভায় ইংরাজী চলিবে না। মনের মত বাংলা বইও তখনকার দিনে বেশী ছিল না। নিশি অনন্যোপায় হইয়া মেঘনাদ-বধের সম্মুখ সমরে সকলকে আহ্বান করিল।

নিশির এত অবসর ছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে সে বা আর কেহ জানিত না। তাহাকে যে এত পরিশ্রম করিতে হয় সে কথাও তাহার জানা ছিল না। আজকাল নিজের পরিশ্রমের কথা প্রায়ই মনে পড়িত এবং এইটুকু অবসরের জন্য প্রায়ই প্রাণ কাঁদিত।

প্রবীণারা শুইয়া, বসিয়া এবং গৌরী সেলাই, পাখা বা অন্য কোন কাজ লইয়া শুনিয়া যাইত, আর নিশি পড়িত। প্রথমটা শুনাইবার জন্য পড়িত, শেষে কাব্যের ছন্দে নিজেই মাতিয়া উঠিল। পড়িতে পড়িতে তাহার হাতের মুঠা ক্ষণে ক্ষণে শক্ত হইতে লাগিল এবং বার বার 'কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব' খর্ব্ব হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার সংখ্যাও খর্ব্ব হইতে লাগিল।

মেঘনাদবধ যেদিন নবম সর্গের শেষাশেষি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে দিন অবশিষ্ট রহিল শুধু একটী বক্তা ও একটী শ্রোতা এবং ইহারা সম্ভবতঃ তখন সপ্তম সর্গের মাঝখানে।

পুঁথি শেষ করিয়া নিশি প্রশ্ন করিল "কেমন লাগ্‌লো ?"

গৌরী বলিল 'বেশ।'

নিশি বলিল "শুধু বেশ বল্‌লে হবে না। কেন বেশ ? কোথায় কোথায় তোমার ভাল লেগেছে বল।"

গৌরী কথা কহে না। নিশি গৌরীর হাতে বই দিয়া বলিল "কোথায় তোমার ভাল লেগেছে প'ড়ে শোনাও।" ইহাতেও কোন ফল হইল না। শেষে অনেক জেরার পরে জানা গেল, গৌরী বাংলা অক্ষরের প্রায় সব কয়টা এবং ইংরাজীর পাঁচ ছয়টা অক্ষর চিনিতে পারে। নিশি মনে মনে আহত হইয়া বলিল "তবে সেদিন তুমি আমার বই চিন্‌লে কি করে ?"

গৌরী। ও বই ত প্রায় আপনার দরকার হয়।

নিশি। তুমি মিথ্যে ক'রে বল্‌লে কেন লেখাপড়া জান ?

"বলুন ছিনালি কর্‌ছিলুম।" বলিয়া গৌরী বাহির হইয়া গেল।

নিশিকে যেন কে বেত মারিল। ছিনালি। ভদ্রমহিলার মুখে এই কথা। কথাটা কি, কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া ভদ্রগৃহস্থ-ঘরে প্রবেশলাভ করিল, আমরা তাহার যে অর্থ করি তাহাই তাহার প্রকৃত অর্থ কি না, এ সব নিশির জানা ছিল না। জানিবার অবসরও হইল না। Biologyর গজরাজ তাহার বিশাল জঠর নিঃসৃত পাচকরসে Philologyর কপিত্থকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দিল।

নিশি ভাবিল একটা কথায় কি আসিয়া যায় ? সভ্য সমাজে মিশিবার সুযোগ যাহার ঘটে নাই, তাহার মুখ দিয়া দু'একটা অসভ্য কথা ত বাহির হইবেই। ইহাতে তাহার দোষ কি ? এই একটী কথার জন্য কি মানুষটীকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে।—আচ্ছা, গৌরীকে অনেকে অসুন্দর বলে কেন ? তাহাকে পরমাসুন্দরী বলা যায় না সত্য। কিন্তু হাসিতে যখন তাহার মুখ ভরিয়া যায় তখন তাহাকে বেশ সুন্দরই ত দেখায়। না, লোকে বড় বাড়াইয়া বলে,—মিথ্যা বলে। লোকের দোষ নাই। তাহারা ঠিকই বলিয়াছিল। পীচের রং সবুজই। তবে তাহার যে দিকটা সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে, তাহা একটু রক্তাভ। পীচের বর্ণ সম্বন্ধে সূর্য্যদেবের রায় আপীলে না টিঁকিতে পারে।

(১০)

খুব বড় ঘর হইতে নিশির সম্বন্ধ আসিয়াছে। জগত্তারিণী নিজে পাত্রী দেখিয়াছেন। হাঁ, সুন্দরী বটে,—এ—ই চুল। এ—ই চোখ। ইত্যাদি। কন্যার পিতা মধুসূদন হালদার কোম্পানীর আফিসে বড় চাকুরী করিতেন। অনেকদিন চাকুরী করিবার ফলে অনেক

টাকা এবং অনেক বড় বড় সাহেব ইহার মুঠার মধ্যে ছিল। জামাতাকে ইনি বিলাতে পাঠাইবেন, এবং ফিরিয়া আসিলে একটা বড় পদে বাহাল করিয়া দিবেন এরূপ আভাস দিয়াছেন। এই একটা জিনিষ রামময়কেও লুব্ধ করিয়াছিল। তিনি জানিতেন পাত্রী নিশির পছন্দ হইবে না, তাঁহারও পছন্দ নয়। নিশি শিক্ষিত, বয়স্থ কন্যা বিবাহ করিতে চায়। শিক্ষিত ও বয়স্থ কন্যা স্বঘরে সুলভ নাই, এবং জগত্তারিণীর পুত্রকে জোর করিয়া অঘরে বিবাহ দিবার ইচ্ছা ও অধিকার রামের নাই। তিনি জানিতেন নিশির ধনুর্ভঙ্গ পণ টিকিবে না। তাহাকে চ'খ কান বুজিয়া এই রকম একটী পাত্রীকেই গলাধঃকরণ করিতে হইবে। তাহাই যদি করিতে হয়, ত এ পাত্রী অনেক বিষয়ে বাঞ্ছনীয়। এটী সুস্বাদু না হইলেও সুপথ্য। মধুসূদনের ছেলেগুলি উচ্চশিক্ষিত। এমন ঘরের মেয়ে নিতান্ত জংলা না হইতে পারে; তা ছাড়া, বালিকা বধূকে ঘরে আনিয়াও ত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; এ যুক্তিগুলাও ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। সকল দিক চিন্তা করিয়া তিনি এ বিবাহে সম্মতি দিলেন। সব প্রায় ঠিকঠাক হইয়া গেল। নিশিকে কিন্তু কিছুতেই বাগ মানান গেল না। জগত্তারিণী অনেক করিয়া বার বার ছেলেকে বুঝাইলেন, কবে মারা যাইবেন, বধূমুখ দর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন তাঁহার সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়িল গৌরীর উপর। সেই যে নিশির মাথা বিগড়াইয়া দিতেছে এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। নিশির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা অশোভন রকমে বাড়িয়া চলিতেছে ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, গৌরীকে দুএকবার সাবধান করিয়াও দিয়াছেন। তথাপি তাহার ব্যবহারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মেয়েটী তাহারই বুকে বসিয়া তাহারই দাড়ি উপড়াইবে! (পাঠকগণ যেন মনে না করেন যে জগত্তারিণীর দাড়ি ছিল। আমি একটা কথার কথা বলিলাম মাত্র।) একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত তাঁহার নিশির মত ছেলেকে এমন করিয়া কাবু করিবে ইহা তাঁহার গর্ব্বে আঘাত করিল। ইহার পর গৌরী হইল তাঁহার চক্ষুশূল। গৌরী না হইলে তাঁহার চলিত না, প্রতি পদক্ষেপে তাহাকে মনে পড়িত। ইহাতে তাঁহার ক্রোধ দশগুণ বাড়িয়া গেল। জগত্তারিণী ঠিক করিলেন ইহাকে আর ঘরে রাখা নয়। ইহাকে অবিলম্বে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিতে হইবে। তিনি সাপ মারিবার জন্য নেউল পুষিলেন। সে দু'একটা সাপ মারিয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ির মাছ ও খোপের পায়রাও নিঃশেষ করিয়াছে। ইহা কতদিন সহ্য করা যায়?

(১১)

দুর্ভাগ্যের বিষয়, গৌরীর কোন ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে জগত্তারিণী অকস্মাৎ অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি বহুদিন হইতে হাঁফানি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে

খুব বাড়াবাড়ি হইত। তবে দুই তিন দিনেই সুস্থ হইয়া উঠিতেন। এবারে কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আট দশদিন ধরিয়া টান বাড়িয়াই চলিল।

গৌরী দিনরাত পাশে বসিয়া সেবা করিতে লাগিল। তিনি তাহার সেবা লইতেন, কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিতেন না। রোগের বাড়াবাড়ির সময় ছেলেরা অনেক সময়ে কাছে আসিয়া বসিত, এবং এই সময়ে গৌরীর হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া তিনি বাঁচিতেন। গৌরীর দিক হইতে বা ছেলেদের দিক হইতে সেবার ত্রুটি হইল না। কিন্তু কেবল সেবায় ত রোগ সারে না। ঔষধের প্রয়োজন। আজকালকার মত তখন অলিতে গলিতে "হাঁফানির Injection চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত" ডাক্তারের ছড়াছড়ি না থাকিলেও, 'অব্যর্থ চিকিৎসা' পারদর্শী লোকের অভাব ছিল না। শঙ্খচিলের পালক গরুর শিংএ বাঁধিয়া দেওয়া, পাঁটার খুরের ধুলা মাদুলিতে করিয়া নাকে ধারণ করা, প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল ব্যবস্থা তাঁহারা দিয়া গেলেন।

এ ব্যবস্থায় চলিলে একটা কিছু হইত নিশ্চয়। কিন্তু সেরূপ চলা হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলা ডাক্তার ডাকা হইল। ইঁহারা সকালে বিকালে ঔষধ বদলাইতে লাগিলেন। রোগী আর শয্যাশায়ী রহিলেন না। বসিয়াই রাত কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন জগত্তারিণী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন "বাবা! এমন সংসারেও পড়েছিলুম। আমার বাড়ীর পাশে এক সাধু রয়েছেন। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে কত লোকের উৎকট উৎকট রোগ সেরে গেল। আমার কেই বা আছে, কে-ই বা তাঁকে ডাক্‌বে?"

রামময় দেখিলেন সাধুর প্রতি এই বিশ্বাসের জোরে রোগ সারিতেও পারে। তাই তিনি শশীকে বলিলেন "যাও, একবার তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, রামের কথা শেষ হইতে না হইতেই সন্ন্যাসী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রোগীর শয্যায় গিয়া বসিলেন। জগত্তারিণী উঠিবার চেষ্টা করিতেই, তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া, তাঁহার মাথায় ও কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "কৈ তোমার ত কোন রোগ নেই। তুমি ত বেশ সুস্থ হয়েছ, তোমার ত আর কোন রোগ নেই।" বলিতে বলিতে, জগত্তারিণী একটু একটু করিয়া বালিশে ঠেস্ দিলেন, এবং ক্রমে চিৎ হইয়া শুইলেন। তাঁহার নিঃশ্বাসের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল, এবং চ'খের পাতা ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া গেল।

শশী বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল "সত্যইত সেরে গেল, মনে হচ্চে।"

নিশি বলিল "Hypnotism"

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিশির দিকে ফিরিয়া সহাস্যে স্বীকার করিলেন "Hypnotismই। ওঁকে বুঝিয়ে দিলুম এ ব্যাধি ত ওঁর নয়, এ দেহ ত ওঁর নয়,—'ন ঘং

নাহং নায়ং লোকঃ'। তারপর নিজের মনে গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার গানের একটী চরণ যূথভ্রষ্ট মৌমাছির ন্যায় ঘরের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল "তদপি কিমর্থং কুরুতে শোকঃ, তদপি কিমর্থং কুরুতে শোকঃ।"

Hypnotism বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, আজিকার এই ঘটনা সকলকে অভিভূত করিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে রাম একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া হাসিয়া বলিলেন "উঃ! কি dramatic entrance! আর একটু দুর্ব্বলচিত্ত হ'লে এখুনি আস্তিক হয়ে যেতুম।

শশী। হ্যাঁ, একেবারে আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছেন।

নিশি। মা হয়ত আগে থাক্‌তেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই।

জগত্তারিণী ঠিক নিদ্রিত ছিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন "ডেকে পাঠিয়েছিলুমই ত। তোমরা যদি না ডাক ত আমাকে ডাক্‌তে হবে না?"

শশী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল "আঃ! একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে গেল!"

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রেতশাসন

সমাজের বিবর্ত্তন প্রতিদিন প্রতিক্ষণ অবিচ্ছিন্নভাবে চলছে। সাধারণ লোক দৈনিক সাংসারিক কর্ম্মের ব্যস্ততায় তা' বুঝতে পারে না। কিন্তু যাঁরা চিন্তাশীল, চক্ষুষ্মান্ যুগধর্ম্মের লক্ষণ বুঝতে পারেন, তাঁরা সেই ক্রম-বিবর্ত্তন দেখতে পান। লক্ষণগুলির আবির্ভাব যখন ঘন হয় তখন সাধারণ লোকেরও দৃষ্টি তাতে আকৃষ্ট হয় এবং সকলেই তার প্রতিকার চায়। এই প্রতিকার দু'রকমে হ'তে পারে—এক পুরাতনের সংস্কারের দ্বারা, আর এক পুনর্গঠনের দ্বারা। অনেক সময় দুই উপায়ই অবলম্বিত হয়, পুরাতনের যে অংশের সংস্কার করলে চলে তার সংস্কারই হয়, আর যেখানে সংস্কার অচল তাকে ভেঙে গড়াই প্রশস্ত। এইরূপ সংস্কার এবং পুনর্গঠন পুরাতন সমাজে বহুবার হয়েছে। পৃথিবীর একটা নাম জগৎ—যা পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে; আর মানুষের ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে যে সমাজ তার নাম সংসার—যা' সম্যক্‌রূপে সরে সরে যায়। পরিবর্ত্তন প্রকৃতির ধর্ম্ম, তাই পরিবর্ত্তন ক্রমাগতই হচ্ছে। যে সমাজ আপনাকে এই পরিবর্ত্তনের উপযোগী ক'রে নিতে পারে না, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সমাজের এই গতিশীলতা লক্ষ্য করেন নি, কেবল স্থিতিশীলতাই বিশেষ করে দেখেছিলেন। সেইজন্য তাঁদের বিধিব্যবস্থাসকলও এমন করে রচনা করেছিলেন যেন তাঁদের সমসাময়িক সমাজের স্থিতি চিররক্ষিত হয়।

কিন্তু তাঁদের পরবংশীয়েরা বলেন তা' নয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কেবল তাঁদের সমসাময়িক সমাজের স্থিতি-রক্ষার জন্যই বিধিব্যবস্থা করেন নি, ভবিষ্যৎ সমাজের স্থিতি-রক্ষার জন্যও সেই সকল বিধিব্যবস্থার প্রয়োগ হবে এও তাঁদের অভিপ্রায় ছিল। কারণ, দেখে শুনেই তাঁরা সব করেছিলেন এবং তাঁদের দৃষ্টি ছিল ত্রিকালভেদী, তাঁরা ছিলেন দ্রষ্টা বা ঋষি। পূর্ব্বপুরুষের গৌরববৃদ্ধির জন্য পরবংশীয়েরা ঐ সকল গুণাবলীর উপর আরও যোগ করলেন যে প্রাচীনেরা ছিলেন কেবল দ্রষ্টা নয়, অভ্রান্ত দ্রষ্টা।

এখন, ভবিষ্যতে যা' হবে তা' যদি কেউ যথাযথ দেখে থাকেন, তা' হলে বর্ত্তমান কালের লোকের বুদ্ধিতে সে সম্বন্ধে দুটি কথা মনে হয়। প্রথম এই যে, ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি নির্দ্দিষ্ট হ'য়েই আছে এবং অপরিবর্ত্তিতভাবে যথাসময়ে উপস্থিত হবে ; দ্বিতীয়, যদি তা' না হয় তা'হলে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার দৃষ্টিদোষ ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলি যে তাঁদের নির্দ্দেশমত ঘটছে না তা'ত আমরা প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি। কাজেই বর্ত্তমান কালের লোকের পক্ষে শাস্ত্রকর্ত্তারা অভ্রান্ত একথা বলা কিছু কঠিন হয়ে পড়েছে। শাস্ত্রকারেরাও স্বয়ং সে কথা কোথাও বলেন নি, বরং বলেছেন যে কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করে' কর্ত্তব্য নির্ণয় করা উচিত নয়, তার জন্য যুক্তির সাহায্য নেওয়া আবশ্যক ; কারণ, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। আর ধর্ম্ম মানেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিধিপ্রতিষেধ (মেধাতিথি ১।২)। এর দ্বারা অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না যে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সমসাময়িক ঘটনার প্রতিও দৃষ্টি ছিল না। তাঁদের সমসাময়িক ঘটনার প্রতি যে তাঁদের তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল তাতে আর সন্দেহ নাই। অতীত ঘটনাসম্বন্ধেও পরম্পরাগত শ্রুতি ছিল। এবং সেই ভূত ও বর্ত্তমান ঘটনাসম্বন্ধে যথোচিত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করে' ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে মানস দৃষ্টি যত দূর চলে তাও তাঁরা চালিয়েছিলেন। কিন্তু ন্যায়যুক্তির দ্বারা ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে' দেখেছিলেন বলে বোধ হয় না। সুতরাং তাঁদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান রক্ষা ক'রেও একথা বলা যায় যে শাস্ত্র ছিল তাঁদের দেশকালপাত্রোচিত ; এবং জীবিত থাকলে, তাঁদের যা' ভবিষ্যৎ ছিল এবং আমাদের যা বর্ত্তমান হয়েছে, তারও দেশকালপাত্রোচিত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন তাঁরাই করতেন।

আমাদের দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মানব ধর্ম্মশাস্ত্রই বোধ হয় প্রথম এবং প্রধান। এই মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তির কথাটা বিবেচনা করে দেখলে, উপরে যা' বললাম তা বেশ বুঝতে পারা যাবে। ব্রহ্মা বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেছেন। অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁর পুত্র মনু একটি। তিনিও, উত্তরাধিকার কি কি-সূত্রে বলা যায় না, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব দাবী করেন। অন্ততঃ তিনি যে সকল মহর্ষি তাঁর কাছে ধর্ম্মের কথা শুনতে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে এইরূপই বলেছিলেন। বলেছিলেন—

তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্ ।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ॥

মনু বলেন তিনিই প্রজাপতি এবং মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু এক জন। মনু ভৃগুকে প্রথমে এই ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—

ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ ।
বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্ ॥

তারপর একদিন মনু একাগ্রমনে বসে' আছেন, এমন সময় মহর্ষিরা এসে বললেন "ধর্ম্মান্ নো বক্তুমর্হসি," আমাদেকে ধর্ম্মের কথা বলুন। মনু বল্‌লেন—

এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ ।
এতদ্ হি মত্তোঽধিজয়া সর্ব্বমেষোঽখিলং মুনিঃ ॥

এই শাস্ত্র আমি ভৃগুকে বেশ ক'রে শিখিয়ে দিয়েছি। তিনিই আপনাদেকে এই শাস্ত্র শোনাবেন। মনুর এই আদেশ শুনে ভৃগু মহর্ষিদেকে বল্‌লেন—

যয়েদং উক্তবান্ শাস্ত্রং পুরা পৃষ্টো মনুর্ম্ময়া ।
তথেদং যূয়মপ্যদ্য মৎসকাশান্নিবোধত ॥

পূর্ব্বে আমি মনুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি আমাকে সেই শাস্ত্র যেমন বলেছিলেন তেমনি আপনারা আমার কাছ থেকে শুনুন। এই কথা বলে' ভৃগু সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রটা মহর্ষিদের কাছে বলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে কে "শট হ্যাণ্ড" লিপিতে বা অন্য প্রকারে অনুষ্টুপ ছন্দে কথিত ভৃগুক্ত সমস্ত ধর্ম্মের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে নিয়ে' লোকহিতের জন্য পরে প্রকাশ করেছিলেন সে সকল প্রশ্ন এই কলিকালের দুষ্টবুদ্ধি লোকের মনে উদিত হলেও দরিদ্রের মনোরথের মত হৃদয় মধ্যেই লীন হতে হবে; কারণ, উত্তরটা sacrilegious হবারই খুব সম্ভব। যা হ'ক বোঝা গেল এই যে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনগুলি মনু বলেছিলেন ভৃগুকে, ভৃগু বলেছিলেন প্রথমে মরীচ্যাদি মুনিগণকে এবং পরে বলেছিলেন এই ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মহর্ষিগণকে যাঁহাদের নামের উল্লেখ নাই। এই শেষোক্ত মহর্ষিগণের মধ্যেই কেউ আমাদের কল্যাণকামনায় সেগুলিকে codify করে' "মানবকে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াম্" প্রকাশ করেছেন।

এর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, প্রাচীন ন্যায়ের চার রকম প্রমাণের মধ্যে এটি শব্দ প্রমাণের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু শাব্দ প্রমাণ চতুর্থ শ্রেণীর প্রমাণ, তাও যদি "শব্দ"টি বিশিষ্ট ব্যক্তির "শব্দ" অর্থাৎ আপ্ত বাক্য হয়। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধগুলিকে আপ্তবাক্য বলে' স্বীকার করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে কে সেই ঋষি যিনি ভৃগুর কাছে শুনে আমাদের জন্য এই বচনগুলি সংকলিত করেছেন। ভৃগু তার নাম করেন নি, সেই অজ্ঞাতনামা ঋষিও নিজের নাম প্রকাশ করেন নি। সুতরাং ঋষিবাক্য বা আপ্তবাক্য বলেও এর প্রামাণিক মূল্য

খুব বেশী নয়। আধুনিক প্রামাণিকেরা ত একে শোনা-কথা (hearsay) বলেই উড়িয়ে দেবেন। এই সকল কারণেই বোধ হয় মনুর পরে অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি আরও আঠার জন শাস্ত্রকার মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করে' নিজের নিজের স্মৃতি করেছেন। তারপর ভাষ্যকারেরা আছেন। তাঁরা পুরাতন বিধি নিষেধগুলির সময়োপযোগী নূতন অর্থ করে' তাই চালাতে লাগলেন। অনেক স্থলে চল্‌লও তাই। বাঙ্গলাদেশে এর শেষ উদাহরণ বোধ হয় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন। যে বর্ণমূলক জাতিভেদ আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি, সেই জাতিভেদেই তিনি একটা মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী"—এই কলিযুগে জাতি দু'টি মাত্র, ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অস্তিত্বই লোপ করে দিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ যে সমাজ থেকে উঠে গেল তা' নয়; কৃষি শিল্প বাণিজ্যও যে উঠে গেল, তাও নয়; "গুণ কর্ম্ম" যে উঠে গেল তা' নয়; কিন্তু "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" যে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল, তার দুটির অস্তিত্ব তিনি লোপ পাইয়ে দিলেন। এখন যে যুদ্ধ করে সেও শূদ্র, যে কৃষিশিল্পবাণিজ্য করে, সেও শূদ্র। কেন? তারা কি গুণকর্ম্মহীন হয়েছে, ভ্রষ্টাচার হয়েছে বলে? তা' নয়, একজন ব্রাহ্মণ (তিনি ঋষি নন) বলেছেন বলে'; নইলে বৈশ্য স্বধর্ম্মই পালন করছেন, আচারভ্রষ্ট হন নি। অপর পক্ষে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্ম-পালন করেছেন না, আচারভ্রষ্ট হয়েছেন প্রায় সকলেই। তথাপি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকলেন, আর বৈশ্যকে জাতিচ্যুত করে' শূদ্র করে' দেওয়া হল। অন্য দেশে শূদ্র উন্নত হয়ে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে, আর এদেশে বৈশ্য অবনত হয়ে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। শূদ্রত্বের অর্থ দাসত্ব। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজের দাসত্বই শূদ্রের একমাত্র ধর্ম্ম বলে বিহিত হয়েছে। রঘুনন্দন এই দ্বিজের দুটি বর্ণ লোপ করে' দিয়ে একটিমাত্র বর্ণ বা জাতি রেখেছেন, যেটি তাঁর নিজের জাতি—ব্রাহ্মণ। অতএব তাঁর বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণেতর তিন বর্ণের সকলেরই শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হয়ে ব্রাহ্মণদের দাসত্ব করা কর্ত্তব্য। আজ যে আমরা দাসমনোভাবের (slave mentality) কথা শুনি, সে কেবল ইংরেজী শিক্ষার ফল নয়, ব্রাহ্মণশিক্ষাও তার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। ব্রাহ্মণ দেখলেই আর সকলের মাথা তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়বে, এ শিক্ষা ব্রাহ্মণেই দিয়েছেন। আজ আর এক তেজস্বীতর ব্রাহ্মণ এসে পুরানো ব্রাহ্মণকে পুরানো শূদ্রের সঙ্গে এক দাসত্ব-শৃঙ্খলে বেঁধে দু'জনকেই তাঁর শ্বেত চরণতলে মস্তক অবনত করতে আদেশ করছেন এবং শিক্ষা দিচ্ছেন।

কিন্তু কর্ত্তব্য বললেই ত করা হয় না। যা প্রকৃতির বিধানের বিরোধী তা' মানুষের বিধানের শাসন মানে না। প্রকৃতির বিধান উন্নতি; প্রকৃতির বিধানে অচল স্থিতি নাই, আছে কেবল অবিরাম গতি আর অভিব্যক্তি, পরিবর্ত্তন আর বিবর্ত্তন। তাই রঘুনন্দনের নিষেধ-আজ্ঞা সত্ত্বেও শূদ্র বৈশ্যের কাজ করছে, ক্ষত্রিয়ের কাজ করছে এবং ব্রাহ্মণের কাজও করছে।

কিন্তু শূদ্রের এই সকল গুণ কর্ম্ম লাভ করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ তার বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁর ধর্মশাস্ত্রে শূদ্রের উন্নতির কোন ব্যবস্থা নাই। তাকে ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ, অন্য কাজেও তাকে "মতিং ন দদ্যাৎ"। তার উপজীবিকা দ্বিজসেবা, যদি সে উৎকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাকে নির্ধন করে' রাজা দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করবেন।

তং রাজা নির্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ।

শূদ্রের সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে ব্রাহ্মণ এইরূপ বাধা দিয়েছেন। প্রথম তাকে রাজভয় দেখিয়ে অনেক কাজ থেকে নিবৃত্ত করেছেন; তাতেও যখন কিছু হয় নি তখন দৈবভয় দেখিয়েছেন। শূদ্র যখন প্রতিকার প্রার্থনা করে, তখন ব্রাহ্মণ তাকে দয়া করে' বলে' দেন যে, সে জন্মান্তরের দুষ্কৃতির জন্য শূদ্র হয়ে জন্মেছে, এ জন্মে আর তার প্রতিকারের উপায় নাই। যে সমাজে এইরূপ রাজভয়, দৈবভয় এবং জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ভয় সর্ব্বদা লোককে শাসন করে, সে সমাজ থেকে পুরুষকার যে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হবে তাতে আর সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই আজ আমাদের সমাজের যত কিছু দুঃখ কষ্ট আছে সব আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে সহ্য করছি এবং অদৃষ্টের দোষ বলে' মনকে প্রবোধ দিচ্ছি।

একদিকে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এইরূপ নিগ্রহ; অপর দিকে রাজার প্রতি তার অসীম অনুগ্রহ। রাজা এই ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; ইন্দ্রাদি দেবগণের অংশ নিয়ে ব্রহ্মা রাজাকে সৃষ্টি করেছেন; সেই জন্য তেজের দ্বারা রাজা সকলকে অভিভূত করতে পারেন; রাজার অনুগ্রহে শ্রীবৃদ্ধি হয়, রাজার পরাক্রমে জয়লাভ হয়; রাজার ক্রোধে মৃত্যু হয়—

রক্ষার্থ মস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥
ইন্দ্রানিলযমার্কানামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥
যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ ॥

প্রজার মনে এইরূপে রাজভয় অঙ্কিত করে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রজাকে রাজভক্তি শেখালেন। অপর দিকে রাজাকে আদেশ করলেন ব্রাহ্মণের সেবা করতে এবং তাঁদের শাসনে থাকতে—

ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবেদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেৎ তেষাঞ্চ শাসনে ॥

রাজাও তাই মেনে নিলেন এবং ধর্ম্মশক্তি ও রাজশক্তি সম্মিলিত হয়ে দেশ শাসন করতে লাগল। সকল দেশেই রাজশক্তিকে ধর্ম্মযাজকেরা ঈশ্বরদত্ত শক্তি বলে প্রচার করেছেন এবং রাজা ও ধর্ম্মযাজকের মধ্যে পরম্পরের সাহায্য ও সম্প্রীতিও সেই জন্য সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। আর পরম্পরের সাহায্যে ও সহানুভূতিতে বলীয়ান্ হয়ে এই সম্মিলিত শক্তি জনসাধারণের সর্ব্বশক্তি হরণ করবার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে এমন একটা মনোভাব সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে যাতে দ্বিধাশূন্য চিত্তে জনসাধারণ রাজাদেশ পালন করে। এই মনোভাব সৃষ্টির প্রধান উপায় শিক্ষা। তাই যেখানেই একের আধিপত্য সেইখানেই সে একাধিপত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য শিক্ষাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করা হয় এবং ব্যক্তির ও সমাজের চিন্তার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নষ্ট করে' দেওয়াই হয় শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে প্রধান। তার ফলে, রাজা কখন কোন অন্যায় কায করতে পারেন না, এই ধারণা প্রজার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সেইজন্য শিক্ষার ভারও সর্ব্বত্র প্রথমে ধর্ম্মযাজকের হাতেই ছিল। কিন্তু সে ব্যবস্থা চিরকাল থাকতে পারে না। জনসাধারণের হিতৈষীরা জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে শিক্ষার ভার নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করছেন। ধর্ম্মযাজকেরাও জ্ঞানের রাজ্যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি ছেড়ে দেবেন না এ প্রতিজ্ঞা আর রাখতে পারছেন না। জনসাধারণই এ যুদ্ধে ক্রমেই জয় লাভ করছে। এখন বিজ্ঞান জনসাধারণের অধিকারগত হয়ে ধর্ম্মকে স্বাধিকারচ্যুত করতে উদ্যত হয়েছে। ধর্ম্মের প্রধান কায ছিল লোকশিক্ষা। এখন দেখা যাচ্ছে ধর্ম্ম যে শিক্ষা দিয়েছে তাতে মানুষের ভেদবুদ্ধি বেড়ে গিয়েছে, সাম্যের স্থানে বৈষম্যের প্রাদুর্ভাব হয়েছে—অর্থের বৈষম্য, জ্ঞানের বৈষম্য, সুখের বৈষম্য, সকলপ্রকারের বৈষম্য যা আজ মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম যে মনুষ্যত্ব, তাকে লোপ করে দিতে বসেছে। রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তির অসাধু সম্মিলনে মানুষের কল্যাণ হয় নি। তাই আজ বিজ্ঞান,—জীব-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান—আজ সেই অসাধু সম্মেলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের শক্তি হরণ করে' তাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক কারাগার থেকে মানুষের মনকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছে। ধর্ম্মশাস্ত্র মানুষের মনকে তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম মনন করা থেকে ত্রাণ করে' মন্ত্র দিয়েছিল। তার ফল হয়েছে এই যে, মানুষ আর কোন বিষয়েই মনন করে না, আত্মার বাসনাবন্ধন মুক্তির জন্য দেবতার উপাসনাতেও মন্ত্র, পুত্রের রোগমুক্তির জন্য স্বস্ত্যয়নেও মন্ত্র, বৈষয়িক অভ্যুদয় কামনায় দেবতার কাছে প্রার্থনাতেও মন্ত্র, পিতার পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদানেও মন্ত্র, সকল কাজেই মন্ত্র, মনন কোথাও নাই। মন্ত্রও নিজে বলতে হয় না, পুরোহিত যজমানের প্রতিনিধি হয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেকালের দার্শনিক পণ্ডিত থেকে একালের শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত কেউ এই ধর্ম্মশাসনকে অতিক্রম করতে পারেন নি। উচ্চশিক্ষিত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সকলকেই দেখি এই ধর্ম্মশাসনের

কাছে নতমস্তক। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, কর্ম্মকর্ত্তার মনন নাই, আছে পুরোহিতের পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন মন্ত্র। যে মনের মনন নাই, সে মন মৃত।

এখন আমাদের পুরাতন জীর্ণ সমাজ গৃহখানির আমূল সংস্কার করতে হবে; কোন কোন অংশের পুনর্গঠন করতে হবে। পারত্রিক ব্যাপারগুলিকে আপাততঃ মুলতুবি রেখে ঐহিক ব্যাপারের উন্নতির চেষ্টা আগে করতে হবে। পৃথিবীতে যদি অন্যান্য জাতির সমকক্ষতা করতে হয় যে প্রাচীন শাসন ততোধিক প্রাচীন স্থিতিশীল সমাজের রক্ষার জন্য রচিত হয়েছিল, যা' এখন কার্য্যতঃ তাৎকালিক সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃষ্টরূপে গত হয়েছে, সেই প্রেত শাসনের বন্ধন থেকে বর্ত্তমান গতিশীল সমাজকে মুক্ত করে' তার স্থানে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত নূতন শাসনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রাণবান্ নূতন শাসন প্রকৃতির শাসনের অনুগামী হয়ে সমাজের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির বাধা দূর করে' সমাজকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। আমাদের কাম্য চতুর্বর্গের প্রথমটির উন্নতির জন্য আমরা হাজার পাঁচেক বৎসর চেষ্টা করেছি, বিশেষ কিছু করে' উঠতে পারি নি। দেশের আধ্যাত্মিক জীবনের কি উন্নতি হয়েছে তার হিসাবের অঙ্ক পাওয়া যায় না। কিন্তু দেশের আধিভৌতিক জীবনের যে শোচনীয় দুর্গতি হয়েছে তার যথেষ্ট হিসাব তৈরি হয়েছে। সে হিসাব থেকে দেখি যে দেশের অধিকাংশ লোকেরই দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান নাই; শতকরা ৯৩ জন নিরক্ষর; সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার পৃথিবীর সবদেশের চেয়ে বেশী। এখন দ্বিতীয় বর্গটির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। আর্থিক উন্নতি সকল উন্নতির মূল। "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" আমরা বহুকাল শুনে আসছি। এখন এর বৈষয়িক ব্যাখ্যা—Materialistic interpretation—করে বুঝতে হবে যে পারত্রিক ব্যাপারে অর্থ অনর্থজনক হলেও ঐহিকব্যাপারে সর্ব্বস্ব। সেই জন্যই একে চতুর্বর্গের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রথম আবশ্যক শিক্ষা, যে শিক্ষা দ্বারা মনের মননশক্তি জন্মায়, চিন্তার স্বতন্ত্রতা এবং স্বাধীনতা হয়, সকল বিষয়ে সামাজিক যোগ্যতা লাভ হয়, সেই শিক্ষা। শ্রমশিল্প বাণিজ্য শিক্ষা কর্ম্মদক্ষতার সহায়ক। সে শিক্ষাও সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত হবে। এই সমস্ত বিষয় এখন পলিটিক্স্-এর ভিতরই আছে। সেইজন্য এগুলি যথোচিত অগ্রসর হতে পারছে না। এদেকে এখন পলিটিক্স্ থেকে স্বতন্ত্র করে' Syndicalism দ্বারা পরিচালিত করা আবশ্যক। আর আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এপর্য্যন্ত আমাদের দেশে যত কিছু সংস্কার কার্য্য হয়েছে, সবগুলিই হয়েছে আমাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের জন্য; তার ফল হয়েছে এই যে আমরা তথাকথিত "ইতর" লোক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং সেই জন্য দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। নূতন সংস্কার কার্য্যে আবার না সেই ভ্রম হয়।

শ্রীহৃষীকেশ সেন

বড়লোকের স্মৃতি

ঘোড়ার আদর কমিতেছে বাই-ছাইকল্ ও মোটরের বৃদ্ধিতে, আর বুড়ার আদর কমিতেছে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আধিক্যে। সেকালে (হায়রে সেকাল!) ইতিহাস ছিল না, তাই তরুণেরা বুড়াকে ঘিরিয়া বসিয়া প্রাচীনকালের কথা শুনিত; কিন্তু এখন বুড়ার ভাগ্যে তরুণ বয়স্কদের মধুর সংস্পর্শ উঠিয়া যাইতেছে,—তরুণেরা ইতিহাসের জন্য বুড়াকে না খুঁজিয়া লিখিত বিবরণীর পৃষ্ঠা উল্টায়। বুড়ার ভাগ্য প্রসন্ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু একঘরে হইয়াই রহিলাম। আমার ছেলেবেলার জেঠামিটুকু এই বয়সের মুরুব্বিয়ানার মোরব্বায় পাকাইয়া তুলিলাম, কিন্তু সে অরুচির রুচি কেহ ছুঁইল না। এখনও এদেশে হালের অতীতের জ্ঞাতব্য কথা ইতিহাসের দৃষ্টি এড়াইয়া আছে; সেই সুবিধায় একবার আসর জম্‌কাইতে বসিয়াছি।

বাল্যে ও যৌবনে যে সকল দেশ-প্রসিদ্ধ বড়লোক দেখিয়াছি, তাঁহাদের যে সকল শিক্ষাপ্রদ জীবনপ্রদ বাণী এখনও অনেকের কাছে অজ্ঞাত, তাহাই শুনাইব। প্রথমেই মনে পড়িতেছে কৃষ্ণনগরের অমর সাধু রামতনু লাহিড়ীর কথা। কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ির সকল ছেলে-বুড়াই ইঁহার মাহাত্ম্যের কথা বলিত; এই মহাত্মার দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী আমার সহপাঠী ছিলেন,—আমি সেই সুবিধায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া মহাত্মার পরিচয় পাইবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলাম। মহাত্মা রামতনুর জীবনের অনেক ঘটনা আর একজন মহাত্মাকে একবার শুনাইয়াছিলাম; তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎসাময়িক বিবরণ" আমাদের সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ; ঐ গ্রন্থে অনেক বিবরণ থাকিলেও দু-চারিটি কথা এখনও বলা চলে। অনেক দিন ধরিয়া প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি শনিবারে বা রবিবারে অপরাহ্ণে লাহিড়ী মহাশয়ের পাশে জুটিতাম; তিনি ছেলে-বুড়া সকলকে সমানে আদর করিতেন, আর তিনি যে সকলের সংস্পর্শে অনেক শিখিতে পান্—একথা মুহুর্মুহু বলিতেন। এই সময়ে শনিবারের অপরাহ্ণে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে যাঁহারা রীতিমত আসিতেন আর ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন পরলোকগত ব্যক্তির নাম করিব, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও সাধুতা কখনও ভুলিতে পারিব না; তাঁহাদের মধ্যে একজন অম্বিকাচরণ সেন ও আর একজন অশ্বিনীকুমার দত্ত। অম্বিকা চরণ তখন ছিলেন কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ও তাহার পর বিলাত ফিরিয়া আসিয়া Statutory Civil Serviceএ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তখন বি, এল্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন আর তাহার পর দেশ-হিতৈষীবর্গে তাঁহার কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, বলিবার

প্রয়োজন নাই। আমি শনিবারের আলোচনা সভায় হংস মধ্যে চড়ুইএর মত থাকিতাম,—বড় বড় জ্ঞানের দানা ঠোক্রাইয়া তুলিবার ক্ষমতা ছিল না।

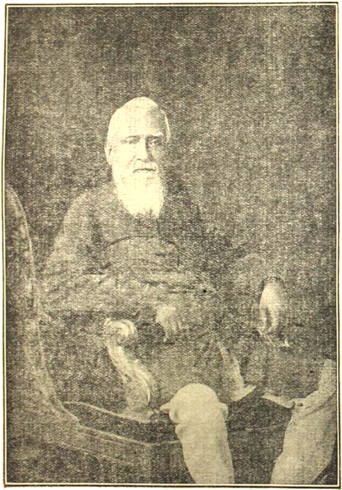

রামতনু লাহিড়ী

সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদিন তাঁহার বাল্যের অতি মধুরকণ্ঠে লাহিড়ী মহাশয়ের সস্নেহ আদেশে গাইতেছিলেন—"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে; আর কেহ নাহি যে বিপদভয় বারে,—এ আঁধারে যে তারে।" গানের ওই মোহড়াটুকু শেষ না হইতেই

রামতনু উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ উচ্ছ্বাসে লাল হইয়া গেল, আর তিনি বলিলেন "থিজু, থিজু, ওইটুকু আর নয়,—ওইটুকু ধরিতে আমার অনেক সময় লাগিবে।" ঐ সরল অকপট সাধুকে কখনও গান শুনিবার জন্য গান শুনিতে দেখি নাই; ভাল কথা ঢোকে-ঢোকে আস্বাদ করিতেন,—কখনও প্রাণের উপরে কথার বোঝা চাপাইতেন না। আলোচনা-সভায় যত লোকে যত কথা কহিতেন, অতি আগ্রহে ও মনোযোগে তাহা শুনিতেন আর নিজে কথা কহিতেন অতি অল্প। অম্বিকাচরণও লাহিড়ী মহাশয়ের মত এ সভায় অল্পভাষী ছিলেন।

এই সময়ে ইংরেজি ১৮৭৮ অব্দের প্রথমে অল্‌কট্ প্রভৃতি চালিত থিয়সফি মণ্ডলীর নাম লাহিড়ী মহাশয় যখন প্রথম শুনিলেন তখন অর্দ্ধোক্তিতে থিয়স্—God, সফস্—wise, উচ্চারণ করিয়া খানিকটা ভাবিয়া বলিলেন—এমনতর জ্ঞানের দাবির নাম নেওয়া বড় মুস্কিলের কথা। খুব সম্ভব অম্বিকাচরণ তখন বলিয়াছিলেন যে ঐ সঙ্ঘটির নামের গায়ে ঈশ্বরের নামের ছাপ থাকিলেও অল্‌কট্ প্রভৃতি ব্যক্তিরা তেমন ঈশ্বর-বিশ্বাসী নন, বরং বিশ্বাসে নিরীশ্বর বৌদ্ধদের মত। অল্‌কটের সময়ে যথার্থই থিয়সফি সমাজ ঐরূপ ছিল ও অলৌকিক ক্ষমতার বলে জীবনের অপর পার দেখাই ঐ সমাজের ব্রত ছিল। লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুগ্ন নবকুমার ঐ নামটির প্রতি ও সঙ্ঘটির প্রতি একটুখানি উপেক্ষার ভাব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে খাঁটি বিবরণ না জানিয়া সঙ্ঘটির প্রতি অবিচার করা হয় এই ভয়ে রামতনু আর একটি কথাও বলেন নাই। এই সাবধানতা ছিল তাঁহার একটি বিশিষ্টতা।

এই বিশেষত্বটুকুর পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। রামতনু কখনও কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সমক্ষে অপরের নিন্দা করিতে দিতেন না,—কাহারও কোন কলঙ্কের কথা কানে তুলিতেন না; নিজে পরের সম্বন্ধে কথা কহিবার সময়ে অতি সাবধানে কথা কহিতেন, কিন্তু পরকে প্রশংসা করিবার বেলায় প্রাণ ভরিয়া শত মুখে পরের প্রশংসা করিতেন। যখন প্রচারিত হইল, যে কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার বড় মেয়েটিকে কুচবেহারের মহারাজার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াছেন, তখন সে প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরে কিছু কিছু আলোচনা ও তর্ক উঠিয়াছিল। একদিন আলোচনা সভায় কথাটি উঠিবামাত্র অম্বিকাচরণ সেন কথাটি চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; রামতনু অতি দৃঢ়তার সঙ্গে কহিলেন—আমি অপরের ঘরের কথার আলোচনা করিব না ও সে কথা শুনিতে চাই না। কলিকাতার আন্দোলনের ঢেউ রামতনুর গৃহের পৈঠায় লাগিয়া প্রতিহত হইল।

রামতনুর দ্বিতীয় বিশিষ্টতা ছিল, ঈশ্বরে ও পরলোকে অবিচলিত বিশ্বাস। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমারের মৃত্যুর প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমি যখন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম তখন তিনি ঘরের বাহিরে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন আর তাঁহার পাশে ঘাসের উপরে

অবনত মুখে বসিয়াছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মেজদাদা দেবেন্দ্র বাবু। আমি দুর্ঘটনাটির কথা জানিতাম না, সোজা বাড়ীর ভিতরের দিকে যাইতেছিলাম। রামতনু আমাকে বাধা দিয়া দুর্ঘটনার কথা বলিলেন,—আমি খানিকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি সে সময়ে দেবেন্দ্রবাবুকে যাহা বলিতেছিলেন, দেবেন্দ্রবাবু তাহা ঠিক শুনিতেছিলেন কি-না সন্দেহ; উঁহার দু চারিটি উক্তি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল আছে। "কষ্ট হইতেছে বৈকি, খুব কষ্ট হইতেছে; নবকুমার যখন ভাগলপুরে থাকিতেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার সংবাদ পাইবার জন্য উতলা হইতাম; এখন তিনি যেলোকে গেলেন সেখানকার সংবাদ মেলে না,—আর আমি যে কতদিনে সে-পারে যাইয়া তাঁহাকে দেখিব, তাহা অনিশ্চিত। তবে এপারে ওপারে সকল স্থানেই আমাদের রক্ষক ঈশ্বর আমরা যেন শোকের সময় তাঁহাকে না দুষি"। এমন তাজা শোকের সময় পরলোকের বিশ্বাসে এত ধীরতা উঁহার পূর্ব্বে ও পরে আর কখনও দেখি নাই।

রামতনু প্রাণ ভরিয়া অপরের প্রশংসা করিতে ভালবাসিতেন, তাহা বলিয়াছি। তিনি যে আনন্দে ও উৎসাহে সহপাঠীদের ও অন্য বন্ধুদের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেন তাহাও ছিল তাঁহার একটি বিশেষত্ব। তাঁহার পরলোকগত বন্ধুদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের কথা নানা প্রসঙ্গে ভাল কথার উদাহরণে বলিতেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার, বারাসতের মনস্বী সাধু কালীকৃষ্ণ মিত্র ও যাঁহার নাম কেবল বিদ্যাসাগর বলিলেই সূচিত হইত ও হইয়া থাকে তাঁহারা জীবিত ছিলেন; প্যারীচরণের মৃত্যু হইয়াছিল ঐ সময়ের অল্পদিনের মধ্যেই, কিন্তু কালীকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর রামতনুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রামতনুর এই বন্ধুদের জীবন কথার প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের আরও কয়েকটি কথা পরে লিখিব।

ক্রমশঃ

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

দায়ী কে?

আঙুর মিঠে কামরাঙা টক নিম তিতো কি তাদের দোষ?
থাক না কোকিল অখিল প্রিয়, কাকের তাতে কি আপশোস?
যার মাটি তার গড়ন, তারই খেয়াল—ছাঁচের ছাপ মারা;
কোনটা কেমন কিসের কারণ তার জবাব কি দেবে তারা?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেষ্টর মা

কাজে-অকাজে গ্রামের শুচিবায়ু-গ্রস্ত গৃহিণীরা পর্য্যন্ত তাহাকে ডাকিতেন;—নাড়ু কুটিতে, খই-মুড়ি ভাজিতে, নারিকেলের তক্তি বানাইতে, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পান সাজিতে, তরকারী কুটিতে এবং সহস্রবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে কেষ্টর মাকে বাদ দিবার উপায় ছিল না। গ্রামের সমস্ত ভদ্র গোষ্ঠীর সেও যেন একজন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজে-কর্ম্মে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস যেন লোকে ইচ্ছা করিয়াই বিস্মৃত হইয়াছিল।

কিন্তু খুব অধিক দিনের কথা নহে, এই সামান্য নারীকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য গ্রামের মহামহিম মোড়লমণ্ডলীর শিখা ও হুঁকা এক সঙ্গে সবেগে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল।—তাহার কথা উঠিলেই সতীসাধ্বী গৃহিণীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মৌখিক শতমুখী প্রহারে বেচারাকে জর্জ্জরিত করিতেন; গ্রামের রসিকা যুবতীরা গোপনে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিত। গাঁয়ের গিন্নীবান্নী বৌ ঝি, সমাজপতি ও ছেলে-ছোক্‌রাদের এই নিন্দা সমালোচনা ও রূঢ়বাক্য যখন পল্লবিত হইয়া কেষ্টর মার কর্ণগোচর হইত, সে তখন যথাসম্ভব আপনার সামান্য কুটির প্রাঙ্গণে আত্মগোপন করিয়া অতীব সঙ্কোচে দিন কাটাইত,—পারৎপক্ষে কখনোই ঘরের বাহির হইত না। কোনো দিক দিয়া কোনো প্রকার বাধা না পাইয়া হতাশ হইয়া নিন্দুকেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা হইল—অন্ততঃ তাহার নিন্দা আর করিত না, তবু এই প্রৌঢ়া 'বিধবা' নারী তাহার অভ্যস্ত সঙ্কোচটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। শুভ্র বসনখানিতে নিরাভরণ দেহখানি যথাসম্ভব আবৃত করিয়া মূর্ত্তিমতী ব্যথার মত সে গ্রামের ঘরে ঘরে নিতান্ত প্রয়োজন সময়ে বিচরণ করিত। কিন্তু তাহার যত জ্বালা ছিল কেষ্টকে লইয়া। সে মাঝে মাঝে অন্তর্দ্ধান হইয়া গোপন গৃহকোণ হইতে এই প্রৌঢ়াকে টানিয়া আনিয়া গ্রামের পথে বাহির করিয়া দিত,—আহারের সময়ে গৃহে না ফিরিয়া এই অসহায়া নারীকে লোকের দ্বারে দ্বারে, ছেলেদের আড্ডায় আড্ডায় খোঁজ করিয়া ফিরিতে বাধ্য করিত। যখন গ্রামে তাহার সম্বন্ধে নিন্দার বান ডাকিত, সমাজপতিরা তাহাকে মাথা মুড়াইয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে যখন প্রত্যহ নূতন করিয়া রায় দিতেন তখনো তাহাকে সঙ্কোচ লইয়া কেষ্টার সম্বন্ধে তদারক করিতে হইয়াছে। কালপ্রবাহে যে নিন্দা সমাজ বিস্মৃত হইল, কেষ্টর মা নিজে তাহা কখনো বিস্মৃত হইতে পারে নাই, আপনার জোরে কোন দিনই সে তাই কিছু অধিকার করিতে পারে নাই; আপনাকে যথাসম্ভব আড়ালে রাখিয়াই সে পরের কাজ করিয়া যাইত।

* * *

এখানে প্রথম ইতিহাস কিছু বলা আবশ্যক। কেষ্টার মা বলিয়া আজ সে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও আসলে সে কেষ্টার মাতা নহে—কেষ্টাই তাহাকে এখন মা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। এই নিঃসহায় বিধবার দুঃখ লজ্জা সঙ্কোচের সব চাইতে বড় কারণও সেখানে।

রাইচরণ মোদকের গৃহিণী জ্ঞানদা যেদিন একমাত্র পুত্রকে স্বামীর পদতলে রাখিয়া চিরদিনের জন্ম চক্ষু বুজিল, তখন রাইচরণ চক্ষে অন্ধকার দেখিল। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথাসম্ভব ধূমধামের সহিত শেষ করিয়া মাতৃহারা অপোগণ্ড রোরুদ্যমান শিশুকে লইয়া সে যখন ঘরের দরজায় আসিয়া বসিল, তখন পাড়ার বৃদ্ধ, বৃদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সমবয়স্ক বন্ধুরা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই তাহাকে দ্বিতীয়বার সংসার করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথোচিত ও অযাচিত উপদেশ দিয়া গেল। রাইচরণ একটিও কথা বলিল না। মৌন থাকিয়া তাহাদের কথায় সম্মতি দিল ভাবিয়া তাহারা প্রত্যেকেই খুসীর ভাব দেখাইয়া আড়ালে বলাবলি করিল, “কি নির্ঘৃনই লোক গো, বউয়ের মরবার তর সয় না—” কিন্তু উপদেশ ও নিন্দার দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া রাইচরণ পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিল না।

রাইচরণ লোকটা ছিল অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারী। বিবাহ না করিবার কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ তাহার ছিল না, বরঞ্চ বিবাহ করিয়া শিশুপুত্রকে লালন-পালন করিবার উপযুক্ত একটি লোক পাইলে সে অনেক যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে ইহাও বিশ্বাস করিত, তবু নানা ঝঞ্ঝাটের ভয়ে সে বিবাহ করিতে পারিল না। যদি এক কোপে বলি দেওয়ার মত সহজেই কাজটা নিষ্পন্ন হইয়া যাইত তাহা হইলে বিবাহ করিতে তাহার বাধিত না, কিন্তু অনেক তোড়জোড় অনেক হাঁক-ডাক করিয়া তবে ‘একটি বিবাহ করিতে পারা যায়, তা সে দ্বিতীয় পক্ষই হউক আর তৃতীয় পক্ষই হউক; লোক-লৌকিকতা পাওনা-দেনা, মন্ত্রতন্ত্র, পুরোহিত-নাপিত—সে অনেক হাঙ্গামা; রাইচরণ বিবাহ করিতে পারিল না, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকেও মানুষ করিতে হইবে। পিতৃকুলে তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না। মাহিনা করিয়া লোক রাখিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে এমন অর্থেরও তাহার অভাব ছিল। তাহাকে খাটিয়া খাইতে হয়। রীতিমত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিলে দু’বেলা অন্ন সংস্থান হওয়াই দুর্ঘট; ছেলেকে লইয়া নিজে যে কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে তাহার সুবিধাও ছিল না, অনভ্যস্ত কাজে অতিরিক্ত যত্ন দেখাইতে গিয়া শিশুর অবিরাম ক্রন্দনে সে দিশেহারা হইয়া পড়িত।

এরূপ ক্ষেত্রে আবাল্য বিধবা শ্যালিকা কুসুমের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিলে তাহার হাতেই সন্তানকে সঁপিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত, এখন থাকিবার মধ্যে এই এক কুসুম আছে। দাদার সংসারে অনেকগুলি সন্তান-পরিবৃত বৌদিদের মন জোগাইয়া চলিতে তাহাকে যথেষ্টই পরিশ্রম করিতে হইত, অধিকন্তু উঠিতে বসিতে

বৌদির গঞ্জনা ও দাদার লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইত। বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিয়া সে যে দাদার সমূহ ক্ষতি করিতেছে এবং একদিন স্বামী ও শ্বশুরকুলের মত এই সংসারের কাহাকেও যে গ্রাস করিবে ইত্যাদি কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহারও বিশ্বাস হইয়াছিল সে দাদার সংসারে ভারস্বরূপই অবস্থান করিতেছে।

শ্যালকের কাছে রাইচরণ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল কুসুমকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, ছেলে একটু বড় হইলেই কুসুম ফিরিতে পারিবে কিন্তু শ্যালক রাজি হইলেও শালাজ প্রথমটা রাজি হইল না। মুখে অন্য কথা বলিলেও অপোগণ্ড সন্তান-পরিবৃত সংসারে কুসুম তাহার যন্ত্রণার কতখানি লাঘব করিত সে তাহা ভালরকমেই জানিত। কুসুম চলিয়া গেলে তাহার দুর্দ্দশার অবধি রহিবে না। শ্যালকের উত্তর শুনিয়া রাইচরণ দমিয়া গেল। এবং একদিন শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গরুর গাড়ী সহযোগে শ্যালকের গৃহে দর্শন দিয়া অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য কুসুমের সহায়তা প্রার্থনা করিল। রাইচরণের বিশ্বাস ছিল যে, তাহার ও শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া শ্যালকের মন গলিবে। শ্যালক ও শ্যালক-পত্নীর মন গলিল কিনা বুঝা গেল না বটে, কিন্তু কুসুম দিদির কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। গরুর গাড়ীর ভিতর হইতে সেই যে সে দিদির অনেক বয়সের অনেক আদরের ও অনেক পূজা মানতের ফল এই কাঁটাটুকুকে কোলে তুলিয়া লইল, আর তাহাকে কোল হইতে নামাইতে পারিল না। তাহার শূন্য মরুময় জীবনে এই শিশুটি যেন অমৃতবর্ষণ করিল। শৈশবে কখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কখন সে নারীর চরম দুর্দ্দশা বৈধব্য বরণ করিয়াছিল, এসব তাহার স্মরণেই ছিল না। তবে তাহার নিরাভরণ দেহ, পাড়হীন বসন ও সিন্দূরহীন সীঁথি, সে অন্য পাঁচজনের অপেক্ষা যে ভিন্ন কিছু, তাহা শৈশব হইতেই তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। তারপর উঠিতে বসিতে শাশুড়ী, মাতা-পিতা ও পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে বৈধব্যের জন্য সে খোঁটা খাইয়াছে, সকলে তাহার পোড়া কপালের দোষ দিয়াছে; সে ইহার প্রত্যুত্তরে কথা খুঁজিয়া পায় নাই। গত জন্মের নিদারুণ পাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন এমনভাবে পাওয়া যাইতেছে তখন তাহার বলিবার আছেই বা কি?

শৈশব ছাড়িয়া কৈশোরে, এবং কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে সে পদার্পণ করিল, কিন্তু তাহার সমস্ত মনে কোনো বিকার আসিতে পারিল না, তাহার মনের কোণে বিন্দুমাত্র রং ধরিল না, সে শিশুই রহিয়া গেল। দাদার সংসারে কাজের চাপে সে নিভৃতে নিজেকে যাচাইয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, আর পাঁচজন তাহার সমবয়সী যে স্বামীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করে সে পারে না, ইহা বিচার করিয়া দেখিবার মত অবসরও সে পায় নাই, মনের পরিণতি না ঘটিলেও দেহে তাহার যৌবনের বান ডাকিয়াছিল, এবং ঘাটের পথে পাড়ার রসিক ছোকরারা সঙ্গীতে ইঙ্গিতে সেটি তাহাকে বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল, কিন্তু

সক্ষম হয় নাই। যৌবনের অপরূপ লাবণ্য হিল্লোল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াও কুসুম শিশু ছিল। দাদার সন্তানদের মানুষ করিবার ভার হাতে পাইয়াও বৌদির অত্যাচারে সে মাতৃত্ব অনুভব করে নাই। দিদির পুত্রটিকে কোলে পাইয়া সে সহসা শৈশব হইতে অনেক ধাপ প্রমোশন পাইয়া একেবারে মা হইয়া বসিল, যে সঙ্কোচ সে এতকাল মনের মধ্যে অহরহ অনুভব করিতেছিল তাহা যেন কোথায় মিলাইয়া গেল, সে দাদা ও বৌদির সাম্নে বিশেষ জোরের সহিত গিয়া বলিল যে ভগিনীপতির সহিত সে যাইবে, বলিয়া দিদির পুত্রটিকে বুকের কাছে লইয়া চুমু খাইল। দাদা বলিল, " বটে, আচ্ছা।" কুসুম চলিয়া যাইতেই তাহার বৌদি তাহার এই অকারণ শিশুপ্রীতি দেখিয়া এমন একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিল যে স্বামীর কাছেই সে ধমক খাইল।

কুসুম রাইচরণের সহিত চলিয়া গেল। সেই যে তেইশ বৎসর বয়সের সময় সে রাইচরণের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, তার পর সে প্রৌঢ়া হইল তবু দাদার গৃহে সে ফিরিতে পারে নাই, রাইচরণের শিশু তাহাকে এমনিভাবে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। পেটে না ধরিলেও সে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আর ভাবিতে পারে নাই যে কেষ্ট তাহারই সন্তান নয়।

কেষ্টর প্রতি স্নেহ ছাড়াও দাদার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে আর একটি প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল, রাইচরণের সহিত তাহার একটা কুৎসিৎ ঘনিষ্ঠতার কথা দিদির শূন্য গৃহে পদার্পণ করিবার অল্পদিনের মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। নিন্দুকেরা যেন ইহার জন্য ওৎ পাতিয়াছিল। সত্য হউক মিথ্যা হউক এতবড় কলঙ্কের কথা শুনিয়াও রাইচরণ বা কুসুম কখনও ইহার প্রতিবাদ করে নাই। রাইচরণ তাহার দোকানের গণ্ডীর মধ্যেই ডুব মারিল এবং কুসুম কেষ্টকে বেশী করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘরের কোণ আশ্রয় করিল, পারৎপক্ষে ঘরের বাহির হইত না।

বস্তুতঃ, নিন্দা উঠিবার এমন সহজ সুযোগ আর কোনো মানুষে দেয় নাই। বিপত্নীক হইলেও রাইচরণের বয়স এমন কিছু বেশী হয় নাই যাহাতে সোমত্ত বয়সী এই বিধবা শ্যালিকার সহিত একত্রবাস লোকে উপেক্ষা করিতে পারে। বাড়ীতে এক কচি শিশু ছাড়া জনপ্রাণী থাকে না,—এমত অবস্থায় অন্যায় কিছু না ঘটাই অন্যায়। লোকে বিশেষ বিশেষ দিন ও ঘটনার উল্লেখ করিতে পর্য্যন্ত ছাড়িল না, কে কি শুনিয়াছে, কে কি দেখিয়াছে রায়দের চণ্ডীমণ্ডপে তাহার শুনানী হইল, সমাজপতিরা আগুন হইলেন। গাঁয়ের গিন্নীবান্নীরা পুকুর ঘাটে যথেষ্ট তোলপাড় সুরু করিলেন, ঘৃত এবং অগ্নিনামক পদার্থের পরস্পর সান্নিধ্য কি ভীষণ কুফলপ্রদ তাহার জ্ঞাত ও শ্রুত অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। এমনি করিয়া কুসুমের আগমন গ্রামের শান্ত জীবন যাত্রায় কিছু রং ধরাইয়াছিল বটে কিন্তু নিন্দা কটূক্তি টিকিবার পক্ষে যে প্রতিবাদ ও ক্রোধ প্রকাশের প্রয়োজন রাইচরণ বা কুসুমের দিক হইতে তাহার একটিও না আসাতে এক হাতে তালির মতই তাহা ক্রমশঃ নিঃশব্দ হইয়া আসিল।

এই নিন্দার প্রথম হিড়িকে রাইচরণ কিছু প্রমাদ গণিয়াছিল এবং কুসুমকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে শ্যালককে অনুরোধ করিয়া পত্রও দিয়াছিল। সে কোনো কারণ দেখায় নাই, কিন্তু এই নিন্দার ঢেউ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌছাইতে বেশী সময়ও লাগে নাই। কুসুমের দাদা অনতিবিলম্বেই ভগিনীর ভ্রষ্ট চরিত্রের কথা শুনিয়া রাগে গরগর করিতে লাগিল। স্ত্রী তাহাকে শুনাইয়া বলিল, কেমন বলিয়াছিলাম কি না। তখন ত ভগ্নীর সতীপনা দেখিয়াছিলে! সুতরাং দাদার গৃহে কুসুমের স্থান হইল না, সে রাইচরণের আশ্রয়েই রহিয়া গেল, সে কোনদিন মুখ ফুটিয়া অন্যত্র যাইবার কথা রাইচরণকে বলে নাই, কারণ কেষ্টকে ছাড়িয়া থাকিতে সে পারিবে না; নিন্দা সহিতে সে বরং প্রস্তুত আছে। রাইচরণও আর বিশেষ কিছু চেষ্টা করিল না। কানে তুলা গুঁজিয়া ও পৃষ্ঠে কুলা বাঁধিয়া সে গ্রামেই রহিয়া গেল। কুসুম চলিয়া গেলে কেষ্টকে মানুষ করিবে কে?

কেষ্ট কুসুমের আদরে যত্নে মানুষ হইতে লাগিল, এবং তাহাকেই মা বলিয়া জানিল। এদিকে গ্রামের নিন্দার বান কমিতে কমিতে রাইচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল।

পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্রকে এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত কুসুমের হাতে সমর্পণ করিয়া রাইচরণ একদা সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার এই অকাল মৃত্যুতে 'আহা' করিবার লোকও ছিল না। কুসুম কেবল স্তব্ধ হইয়া পিতৃ-মাতৃহীন সন্তানকে আঁকড়িয়া ধরিয়া গ্রামের মাতব্বরদের পায়ে ধরিয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করাইল।

কুসুমের দাদা ভগিনী-পতির মৃত্যুর সংবাদ এবং তাহার পরিত্যক্ত নগদ অর্থের সংবাদ একটু অতিরঞ্জিতভাবেই শুনিল, লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

একদিন সে হঠাৎ রাইচরণের গৃহে দেখা দিল। সকলকে বলিল মায়ের পেটের বোনকে সে ফেলিবে কি করিয়া—তা সে যতই কেন ইত্যাদি।

রাইচরণের শ্যালক যাহাই শুনিয়া থাকুক মৃত্যুর সময় রাইচরণ কুসুমের হাতে নগদ পাঁচ শত টাকার কিছু অধিক ধরিয়া দিয়া বলিয়াছিল—কেষ্টকে যেন এই অর্থে সে লেখাপড়া শেখায়। জমিজমা ও দোকান ঘর বিক্রয় করিয়া বিধবার ও শিশুর ভরণ-পোষণ চলিয়া যাইবে—ইহাও সে বলিয়া গিয়াছিল। অশ্রুসজলচক্ষে ভগিনীপতির মৃত্যু-শয্যায় কুসুম বলিয়াছিল যেন মৃত্যুকালে কেষ্টর জন্য সে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে। সে জীবিত থাকিতে কেষ্টকে কোন দুঃখ পাইতে দিবে না, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে। দাদার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার গোপন মতলব বুঝিতে কুসুমের বিলম্ব হইল না। সে দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল যে, রাইচরণের ভিটা ছাড়িয়া সে কোথায়ও এক পা নড়িবে না। অনুনয় বিনয় উপরোধ ক্রোধে কোনো ফল হইল না, অভিশাপ দিতে দিতে দাদা প্রস্থান করিল।

তাহার পর হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুকে লইয়া এই নারী কায়ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছিল। এখানে-ওখানে কাজে-অকাজে সাহায্য করিয়া যাহা জুটিত তাহাতেই কোনো রকমে দুইজনের পেট চলিত, দোকানঘরখানি বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থ হাতে আসিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিয়া এই বিধবাকে সাহায্য করিতে লাগিল। কেষ্টকে লইয়া সুখে দুঃখে কুসুমের দিন যাইতে লাগিল। কেষ্টকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, সমাজপতিদের তরফ হইতে কোনো বাধা আসিল না। কেষ্ট দিনে দিনে বড় হইতে লাগিল। লেখাপড়াতে তাহার খুব মনোযোগ, রাইচরণ ও দিদিকে স্মরণ করিয়া কুসুম মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত।

কিন্তু এক চক্ষু হরিণের নত যে দিক হইতে বিপদের কোনো আশঙ্কা না করিয়া কুসুম নিশ্চিন্ত ছিল বিপদ আসিল সেইদিক হইতেই, কেষ্টর হাতেই কুসুম আঘাত পাইতে লাগিল বেশী। কুসুম গোপনে অশ্রুবিসর্জ্জন করে ও আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, এ কথা কাহাকেও বলিবার নহে।

কেষ্ট কুসুমের আদর-যত্নে বাড়িতে লাগিল, সকল বিষয় বুঝিয়া দেখিবার মত বুদ্ধি তাহার হইল। সে কুসুমকে মা বলিয়াই জানিত ও ভক্তি করিত কিন্তু অকারণে আগুন জ্বালাইবার লোকের অভাব পৃথিবীতে নাই। কে একদিন নির্ম্মমভাবে বালককে বুঝাইয়া দিল যে কুসুম তাহার মাতা নহে, তাহার পিতার রক্ষিতা মাত্র। রক্ষিতা বলিতে কি বুঝায় বালক কেষ্ট তাহা ঠিক না বুঝিলেও মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইল। তাহার মনে হইল কুসুম এতদিন অকারণে তাহাকে ঠকাইয়াছে। একজন দুইজন করিয়া অনেকেই এখন একথা তাহাকে শোনায় এবং অতিরঞ্জিত করিয়াই শোনায়। কুসুমের প্রতি তাহার পিতার অবৈধ প্রীতিই যে তাহার মাতার মৃত্যুর কারণ এমন কথাও কেহ কেহ তাহাকে বুঝাইল। দশ বৎসরের বালক পিতার রক্ষিতার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

ইহার পর হইতে কুসুমের আদর যত্ন কেষ্টর বিষবৎ মনে হইত। তাহার শিশুমনের উপর এই অস্পষ্ট কানাঘুষাগুলি অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। যাহাকে সে মাতৃ-স্থানে ভক্তি করিয়াছে, আদর-আব্দারে যাহার চিত্তকে ভরাইয়া রাখিয়াছে তাহাকেই এখন সে ডাইনী রাক্ষসী ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। কেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে রাইচরণের এই মৃত্যুকালীন বাসনা কুসুম অহরহ স্মরণ করিত; এই লেখাপড়াতেই কেষ্টর শৈথিল্য লক্ষিত হইল। নানাদিকের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার শিশুচিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল।

তাহার সমবয়সীরা তাহাকে সামনে পিছনে উপহাস করে, কুসুমের সম্বন্ধে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে,—কেষ্ট কুসুমের প্রতিই ইহাতে ক্রুদ্ধ হয়। তাহার জন্যই ত তাহার এই অপমান। সেও বন্ধুদের সহিত যোগ দিয়া কুসুমের নিন্দা করে।

যে মাতার কাছে ফিরিবার জন্য আগে আগে কেষ্ট উতলা হইত এখন সেই বাড়ীই তাহার কাছে অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনে হইল, সে বাড়ী হইতে দূরে দূরে ফিরিতে লাগিল, গ্রামের নষ্ট দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সে নানাপ্রকার ছোট কাজ করিতেও আর দ্বিধা করে না। কুসুম কাঁদিয়া আকুল হয়।

কুসুম মুখ ফুটিয়া কেষ্টকে কিছু বলিতে পারে না। আজ এতকাল যে চুপ করিয়া সকল অপবাদ সহ্য করিয়া আসিয়াছে আপনার সন্তানের সহিত সে তাহার কি বিচার করিবে? যাহাকে কোলে লইয়া এই অসহায়া নারী পৃথিবীর সমস্ত অপমান তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে আজ তাহারই অপমান তাহাকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল। নিরুপায় নারী ইহার কোনো প্রতীকারের উপায় কল্পনা করিতে পারিল না।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় কেষ্ট বাড়ী আসে না, কুসুম তাহাকে খুঁজিতে বাহির হয়। কোনো রাস্তায় যদি তাহার সাক্ষাৎ মিলে বন্ধুদের সম্মুখেই কেষ্ট তাহাকে অপমানে জর্জ্জরিত করে। কখনো কখনো দুই একদিনের জন্য কেষ্টর খোঁজ পাওয়া যায় না। কুসুম কাঁদে, নিরাহারে বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

কেষ্টর বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু পড়াশোনায় সেই যে ভাটা পড়িয়াছিল আর জোয়ার আসিল না। রাইচরণের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল। কেষ্ট পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল এবং একদিন কোনো সমবয়সী বন্ধুর প্ররোচনায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হইল। কুসুম চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

অপরিণতবয়স্ক বালক কলিকাতার মত আজব সহরে কি করিয়া দুইবেলা দুই মুঠা অন্ন সংস্থান করিবে। হয় ত না খাইতে পাইয়াই মারা যাইবে ইত্যাদি নানা সম্ভব অসম্ভব কল্পনায় কুসুম পীড়িত হইত,—গাড়ীঘোড়া, গুণ্ডা, পুলিশ, জুয়াচোর কত রকমে লোকের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে। প্রবীণ লোকেরাই নির্ব্বিঘ্নে সেই ভয়ঙ্কর সহর হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না—সেই দুধের ছেলে কি:করিয়া বাঁচিবে? হাতে তাহার একটিও পয়সা নাই। তাহারই পিতার উপার্জ্জিত এবং তাহারই শিক্ষা বাবদ সযত্নে রক্ষিত প্রায় ছয় শত টাকা কুসুমের নিকট রহিয়াছে, অথচ সে কলিকাতার পথে হয়ত অন্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে,—এ চিন্তা কুসুমের অসহ্য হইল।

যে-ছেলেটির সঙ্গে কেষ্ট কলিকাতা গিয়াছিল কুসুম একদিন তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া কেষ্ট প্রভৃতির খবর জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা কোনো সন্ধানই জানে না। হতাশভাবে কুসুম ঘরে ফিরিল।

কলিকাতা প্রত্যাবৃত্ত রায়েদের বড় ছেলের মুখে একদিন কেষ্টর খবর পাওয়া গেল। কলিকাতার কোনো হোটেলে চাকরী লইয়া কেষ্ট নাকি বহুকষ্টে জীবনযাপন করিতেছে। কুসুম

সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া রায়েদের ছেলের সহিত একদিন দেখা করিয়া তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া কেষ্টর সহিত একদিন দেখা করিতে অনুরোধ করিয়া তাহাকে বলিতে বলিল, সে যেন গ্রামে ফিরিয়া তাহার ছয় শত টাকা বুঝিয়া লয় ও তাহা দ্বারা গ্রামেই হউক যেখানেই হউক একটা দোকান দিয়া নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। বাবুটি স্বীকৃত হইলেন।

হায়রে, কুসুমের কত আশাই না ছিল। কেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে, বউ ঘরে আসিবে, তারপর নাতি নাতিনীদের লইয়া তাহার জীবন কিরূপ ভরিয়া উঠিবে এই সব কল্পনা সে প্রায় করিত। এখন কুসুম আকাশ-কুসুম রচনা করিতেও ভরসা পায় না।

একদিন হঠাৎ কেষ্ট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। নিজের বাড়ীতে সে উঠিল না। তাহার সেই বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় লইল, কুসুমের সহিত দেখা করিয়া তাহার পাওনা টাকার দাবী করিল। কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল, তাহার টাকা তাহারই আছে। সে আপনার ঘর সংসার বুঝিয়া লউক, এই বৃদ্ধ বয়সে পরের বোঝা আগলাইতে আর সে পারে না। কেষ্ট সমস্ত বুঝিয়া লইলে সে সেখানে থাকিবে না, যেমন করিয়াই হউক অন্যত্র সে পোড়া পেটের ব্যবস্থা করিবে।

কেষ্ট বলিল, বেশ্যার বাড়ীতে সে থাকিতে পারিবে না। কুসুম শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, এতটা সে প্রত্যাশা করে নাই। গ্রামের সমাজপতি, গৃহিণী বৌঝিয়েরাও যে কথা তাহাকে বলিতে পারে নাই আজ কেষ্ট কি না সেই কুৎসিৎ কথা উচ্চারণ করিল। তাহার চক্ষে অশ্রু শুকাইয়া গেল। সে আর একটিও কথা না বলিয়া বহুদিনের সযত্নরক্ষিত কেষ্টর শিক্ষার খরচ প্রায় ছয় শত টাকা কেষ্টর হাতেই গুণিয়া দিল। কেষ্ট কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

কুসুম এবার কাঁদিতে বসিল, তাহার দিদিকে স্মরণ হইল, রাইচরণের কথা মনে পড়িল। হায়রে অতীত। হায়রে ভবিষ্যৎ। আ-মৃত্যু এই শূন্য কুটিরে সে একেলা কাটাইবে কি করিয়া? স্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে সে পাগল হইয়া যাইবে, যে কেষ্টকে এতকাল বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিল সে তাহাকে চরম অপমানকর কথা বলিতেও দ্বিধা করিল।

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কুসুম মনকে দৃঢ় করিতে পারিল না, কেষ্টর কথা ভাবিয়া সে আকুল হইল। গ্রামের প্রত্যেকের কাজে সে এখন যথাসাধ্য সাহায্য করে, সকলে তাহাকে কেষ্টার মা বলিয়াই খাতির যত্ন করে। তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস কেহ মনে রাখে নাই—শুধু নিঃসঙ্গ রাত্রির অবসরে কেষ্টর সহিত শেষ সাক্ষাতে দিনের কথাগুলি তাহার মনে আগুনের মত জ্বলিতে থাকে। তাহার দুঃখে এখন সকলেই সহানুভূতি দেখায়। পাড়ার প্রবীণা গৃহিণীরা বলেন "আহা ছেলেটা কি পাষাণ গা, মাগীকে এত কষ্টও দেয়।"

কেষ্ট টাকা লইয়া সেই যে গিয়াছে, আর তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, তাহার কোন

খোঁজও কেহ দিতে পারে নাই। কলিকাতায় যাহাদের যাওয়া আসা আছে কুসুম তাহাদের কাছে ঘোরা ফেরা করে, কেহ কোনো সন্ধান দিতে পারে না।

* * * * *

একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল। কেষ্টর সন্ধান পাওয়া গেল না। কুসুম দারুণ রোগে শয্যাশায়ী হইল। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে করিতে সে কেবল কেষ্টর কথা বলিতে লাগিল, তাহাকে দেখিতে চাহিল। গ্রামের ভদ্র ঘরের গৃহিণীরা তাহার রোগের সময় তাহাকে দেখিতে আসেন; প্রত্যেকেই যথাসাধ্য এই নিঃসঙ্গ নারীর সেবা করেন, কিন্তু তাহার হাহাকার কেহ ঘুচাইতে পারিলেন না। কেষ্টর কথা ছাড়া তাহার মুখে অন্য কথা নাই। তাহার একমাত্র কামনা যেন কেষ্ট তাহার মুখাগ্নি করে, সেই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে সকলকে জানায়। কিন্তু রাইচরণের শেষ ইচ্ছার মত তাহারও শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। পাড়া প্রতিবেশিনী পরিবৃত হইয়া কুসুম একদিন প্রাণত্যাগ করিল; কিন্তু কেষ্ট আসিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিল না; সে কোথায় রহিল কেহ জানিতেও পারিল না।

কেষ্টর মার কথা এখন সকলে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। কেষ্টও সেই হইতে আর গ্রামে দর্শন দেয় নাই। শুধু বৃদ্ধা রায়-গৃহিণী এখনও মাঝে মাঝে কেষ্টর মায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে কেষ্ট ফিরিলে তাহাকে দিয়া কুসুমের নামে গয়ায় পিণ্ড দেওয়াইবেন। তাহাতেই হয়ত পরলোকে এই দুর্ভাগিনীর আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভারতী

হে জ্ঞাননিধি !
কতদূর, কতদূর, অনন্ত বারিধি,
তার পরপারে তুমি,
আর এই বেলাভূমি,
কত ব্যবধান।
তুমি নিষ্ঠাবান,
নির্ব্বিকার, ব্রাহ্মণ নন্দন,
আর আমি খ্রীষ্টীয়ান, অস্পৃশ্য যবন।
তুমি ধনী,
আমি কাঙাল রমণী,
তুমি করিয়াছ স্থির
ঘুচাইতে মাতৃ-আঁখিনীর,
সেবিতে তাহায়
নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ কন্যা আনে দিবে পায়,
জানি আমি ;
তবু ফুলশর বিষা-মাখি,
নিশিত সায়ক তার
হানে যেগো অন্তরে আমার !
জানি অসম্ভব,
তবু জ্ঞান, বুদ্ধি মোর লুপ্ত যেন সব।
ওই যে সাগর নীরে
বিক্ষুব্ধ বীচির শিরে
লাবণ্য মোহন
ফেনায় ঝলসি উঠে রবির কিরণ ;
মনে হয় তারা বুঝি
আমারেই খুঁজি খুঁজি

আসিছে হেথায়,
মায়ের সম্মতি তব জানাতে আমায়।
ওই শুন মন্দিরে মন্দিরে
সন্ধ্যার আরতি ধীরে ধীরে
উঠিছে বাজিয়া,
শুনি মোর হিয়া
উঠে আনন্দে নাচিয়া,
যেন মনে হয়
দেবতার, আশীর্ব্বাদ লভিব নিশ্চয়;
না হলে ওই যে হেরি
চৌদিকে আমারে ঘেরি
বনানীর কুঞ্জে কুঞ্জে,
কুসুমের পুঞ্জে পুঞ্জে,
সুষমার রাশি
প্রকৃতির মুখে চোখে উঠিয়াছে হাসি,
সে কি শুধু মোরে উপহাস?
এই যে বহিছে দীর্ঘশ্বাস
মথিয়া হৃদয় মোর,—
সহিতেছি দিবানিশি ঘোর—
বেদনা বিষম
প্রকৃতি কি এতই নির্ম্মম,
হেরিয়া নারীর এই দুখ
হাসিয়া উঠিবে তার মুখ
কৌতুকের লালসায়
আনন্দ ধারায়
স্নাত হবে সর্ব্ব দেহ তার?
একি তবে ছার
চটুল নয়ন কোণে নর্ম্ম ইসারায়।
না, না, কভু নয়
এ যে গো নিশ্চয়
আমার এ বিরহে আশ্বাস,
জননীর মুখে এ যে আনন্দ উচ্ছ্বাস।
হে দয়িত, ভেবেছ কি মনে,
সে কলহ প্রথম দর্শনে.
সংসারের খুঁটিনাটি নিয়া
কি রোষে জলিয়া
লজ্জা, ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন
ঘৃণা হয় স্মরিলে এখন—
মিথ্যা অপবাদে রাজদ্বারে
পিতা মোর অভিযুক্ত করিল তোমারে?
তাঁহারি আদেশে
অনেক চিন্তিয়া শেষে
ভয়ে ভয়ে তাঁর,
বিরুদ্ধে তোমার,—
যদিও কাঁদিল প্রাণ—
মিথ্যা সাক্ষ্য করিনু প্রদান,
হে প্রবাসীবর!
আমার হৃদয়পুরে অতিথিসুন্দর!
এখনো কি ভোলনি সে দোষ,
হৃদয়ের রুদ্ধ তব রোষ
এখনো কি যায় নি মুছিয়া,
এখনো কি চিন নি এ হিয়া,
এখনো কি বোঝ নি এ প্রাণ
প্রণয়-অঞ্জলি নিত্য করিতেছে দান
রাতুল চরণে তব,
নিত্য নিত্য নব নব
কল্পনার কুসুম সম্ভারে,
বেদনার মধু উপহারে?

দেখ মনে করে,
বসন্ত রোগের শয্যাপরে
ভৃত্য তব পড়িয়া যখন
—বিলুপ্ত চেতন
করিত চিৎকার,
কে তারে সেবিল, সখে, মাতৃসম তার।

তুমি ভীত, ব্যাকুল বিপদে,
অক্ষমতা পদে পদে
জানাতে আমায়,
লজ্জায় ঘৃণায়
দূরে সরে থাকিতে চাহিতে।
আদেশের বাক্যে শুধু আমারে ডাকিতে।
এই বিদেশিনী নারীর উপরে
একান্ত নির্ভর ক'রে
প্রভু সম দাবী, জোর করে,
আবার বিনতি স্বরে,
তোমার সে ভৃত্য লাগি
সারানিশি রহিবারে জাগি,
সাধিয়া, কাঁদিয়া,
'ভারতী' 'ভারতী' বলি ডাকিয়া ডাকিয়া,
আমার বিপদ ভুলি
কহিলে যে কথাগুলি,
ওহে উদাসীন,
অনভিজ্ঞ, আত্মজ্ঞান-হীন!
স্পন্দন তাহার
প্রবেশিয়া অন্তরে আমার
হৃদি আলোড়িয়া
কি মধু তরঙ্গ সেথা দিয়াছে তুলিয়া,
একটু কি পারনি বুঝিতে?
একটু কি মৃদু হাওয়া বহেনি ও চিতে?

অসতর্ক মুহূর্তে যখন
তোমার সে 'তুমি' সম্বোধন
আমারে ঘেরিয়া
নূতন সংসার এক তুলিত গড়িয়া,
তুমি আমি হাতে হাত দিয়ে
চলিতাম পথ দিয়ে,
তোমার সে দেহের পরশ
ক'রে দিত আমারে অবশ
মোর শিরায় শিরায়
সহস্র ধারায়
বিদ্যুতের পুলক স্পন্দন
আকুলি বিকুলি মোর মন
উঠিত নাচিয়া
সারা দেহ উঠিত কাঁপিয়া,
ভাবিতাম বিধাতা সদয়,
'মিথ্যা'—বুঝি মিথ্যা হয়
মোর লাগি তাঁহার কৃপায়
আকাশে কুসুম বুঝি ফুটিবে ধরায়।

তুচ্ছ উপহারে মম
দেখিয়াছি প্রিয়তম
কতদিন চাহিয়া চাহিয়া
দুটী কর্ণমূল তব উঠিছে রাঙিয়া।
কতদিন লভি সেবা মোর
ওহে মনচোর!
কৃতজ্ঞের শীতল ভাষায়
পুলকের অমৃত বন্যায়
সরস করিয়া দিতে চিত্তভূমি মোর,
আনন্দে বিভোর
রোপিলাম আশালতা তায়,
উল্লাসে পূরিল মন কানায় কানায়।

কাজে ত্রুটি ধরে,
কতদিন অভিমান ভরে
করিয়াছ মিথ্যা অনুযোগ,
বাড়ায়েছ আমার দুর্ভোগ,
নয়নের আনন্দ আমার!
সে কিগো তোমার
স্বার্থ সাধনার শুধু ভাণ?
সে কি শুধু কৃতজ্ঞতা, শুধু অভিমান?
হে সুহৃদ, সুন্দর, মধুর!
পরদুঃখে বেদনা আতুর!

সে কি এই পিতৃ-মাতৃহীনা,
কৃপাভিখারিণী, দীনা,
অভাগিনী নারীরে ছলনা,
দয়ার যে যোগ্য তারে ক্রূর প্রতারণা ?

সব্যসাচী দাদার উপরে
কটূক্তি বর্ষণ ক'রে
করিলে যে অবিচার,
শুনিয়া আমার
ঘৃণায় ভরিয়া গেল মন,
করিলাম তোমারে ভৎ'সন—
"উন্মাদের নাহি হেথা স্থান,
আমার আলয় হ'তে করুন প্রস্থান।"
লাজে, অপমানে,
রোষে, অভিমানে
তেয়াগি আমারে
মিশে গেলে নিশার আঁধারে।
নিদারুণ ব্যথা বুকে ল'য়ে
প্রতিহিংসা পরবশ হ'য়ে
তাই কি অমন ক'রে
অপমান প্রতিশোধ তরে
ভেঙ্গে দিয়ে সকল বিশ্বাস
সমিতির গুপ্ত কথা করিলে প্রকাশ ?
অকৃতজ্ঞ পাষাণ কঠিন !
ভুলিয়া গিয়াছ কি সে দিন,
দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক
বলি যবে দেশের সেবক
সমিতির সভ্যগণ
গুপ্ত গৃহে করিতে নিধন
তোমারে লইয়া গেল ধরি
সবে ষড়যন্ত্র করি,
কার দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন,
সদয়ের আকুল ক্রন্দন
বাঁচাল হে প্রিয়তম তোমার জীবন ?
তারপরে, যবে তুমি
এই ব্রহ্মভূমি
ছাড়ি দেশে করিবে প্রস্থান,
ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ—
বসিয়া আমার কাছে—
হে বঁধু মনে কি আছে,
আপনার কলঙ্কের কথা,
সেই অত্যাচারের বারতা
অভাগীরে আত্মীয় ভাবিয়া
কত না কহিয়াছিলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ?

যেই মহাপ্রাণ
দিলেন তোমার প্রাণ দান
সকলের মত তুচ্ছ ক'রে
দায়িত্ব লইয়া সব আপনার 'পরে,
কিংবা যার ভীত মুখখানি
বাক্যহীন প্রার্থনার বাণী,
কম্পিত অধর,
লুপ্তজ্ঞান, ব্যথিত অন্তর,
করুণ চাহনি যার
মাগিয়া লইল ভিক্ষা জীবন তোমার,
তাহাদের লাগি
উঠিল না একটুও জাগি
হৃদে তব কৃতজ্ঞতা,
ফুটিল না একটিও কথা
তাহাদের তরে
ঘৃণায় লজ্জায় যাই ম'রে
ভাবিয়া তোমার
সেই ব্যবহার স্বার্থপরতা অপার।
ওরে ভীরু ! ওরে ও দুর্ব্বল !
ওরে মোর জীবন-সম্বল !
তবু হবে ভাবি ওই খল্

আনন্দে নাচিয়া উঠে বুক,
লজ্জায় কাঁপিয়া উঠে হিয়া,
কে নিল লুটিয়া
বুঝি এ রতন
আমার হৃদয় সিন্ধু করিয়া মন্থন।

রুগ্ন যবে জননী তোমার,
প্রবাসের হে বন্ধু আমার,
অসহায়, অপটু অক্ষম !
অন্বেষণে মন
না জানি কি ব্যাকুল অন্তরে
এসেছিলে মোর ঘরে
লয়ে যেতে মোরে
জননীর শুশ্রূষার তরে,
কিসে ভুল হ'ল হতভাগীর
ভাবিলাম তুমি জননীর
অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ ছেলে
রুগ্ন মায়ে দেশে ফেলে
দূর ভ্রমে এসেছ চলিয়া,
তাই সেবা না করিয়া
—হায় অদৃষ্ট আমার—
প্রত্যাখ্যান করিলাম তোমারে আবার।
ছিল কত আকাঙ্ক্ষা আমার
সেবিয়া চরণ দুটী তাঁর
পর হ'য়ে সন্তানের মত
আদেশ পালনে অবিরত
ল'ব তাঁরে আপন করিয়া
ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ দিব ঘুচাইয়া।
পিতৃহীনা, মাতৃহীনা,
এই অসহায় দীনা
দুঃখিনী রমণী
ধন্য হ'বে লভি এক নূতন জননী।
এসেছিল সুযোগ তাহার,
বুঝি অভিশাপে বিধাতার
ঘৃণা অবহেলা ভরে
দিনু তারে দূর ক'রে,
ক্ষণিকের ভুল ধারণায়।
অনুতাপে হৃদি জ্বলে যায়—
ভাবি যবে জননী তোমার
এ ধরায় নাহি আর
হে মহান ! হে উদার !
ক্ষমা করি সে দোষ আমার
এই দুঃখিনীর প্রতি রোষ
স্থান যদি ল'য়েছ এ গেহে,
পূর্ণ কর দুরাকাঙ্ক্ষা মোর
দুঃখ নিশি হ'য়ে যাক ভোর,
বক্ষে মোরে দেহ স্থান
শান্ত হোক দগ্ধ এই প্রাণ
তুমি আমি হে প্রিয় আমার !
চির-সঙ্গী হ'য়ে রচি সুখের সংসার।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

আপন কথা

রাতের অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে সারি সারি পলতোলা থাম তারি ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের তেতালার উত্তর-পূব কোণের ছোট ঘরটা, এক কোণে জ্বলছে মিট্‌মিটে একটা তেলের সেজ, ঘরের তিনটে জানলাই হিমের ভয়ে লাল-খেরুয়ার মোটা পর্দ্দা দিয়ে সম্পূর্ণ জোড়া, ঘর-জোড়া উচু একখানা খাট, তারি উপরে সবুজ রংএর মোটা দিশি মশারি, ঘরে ঢোকবার দরজাটা এতবড় যে তার উপর দিকটাতে বাতির আলো পৌঁছতে পারে নি। এই দরজার এক পাশে একটা লোহার সিন্দুক, আর তারি ঠিক সাম্‌নে কোথা থেকে একটা কাঠের খোঁটা হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে হাত তিনেক উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তো দাঁড়িয়েই আছে। এই খোঁটা,—ঘরের মধ্যে যার দাঁড়িয়ে থাকার কোনো কারণ ছিল না—সেটাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—দেড় হাত প্রমাণ একটা ছেলে। খোঁটার মাথার কাছে এতটুকু কুলুঙ্গির মতো একটা চৌকো গর্ত্ত, তারি মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছিনে কুলুঙ্গিটার। আলোর কাছে বসে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পদ্ম দাসী মস্ত একটা রূপোর ঝিনুক আর গরম দুধের বাটি নিয়ে দুধ জুড়োতে বসেছে—তুলছে আর ঢালছে সে তপ্ত দুধ,—দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠ্‌ছে নাম্‌ছে, নাম্‌ছে উঠ্‌ছে, চারিদিক সুনসান কেবলি দুধের ধারা পড়ার শব্দ শুনছি, আর দাসীর কালো হাতের ওঠাপড়ার দিকে চেয়ে একটা কথা ভাবছি—উচু খাটে উঠতে পারা যাবে কি না?

পর্দ্দার ওপারে অনেক দূরে আস্তাবলের ফটকের কাছে নন্দ ফরাসের ঘর, সেখানে নোটো খোঁড়া বেহালাতে গৎ ধরেছে—এক্ দুই্ তিন্ চার্ এ-হে-হ্, দুহি, তিহিন্, চার! এক দুই তিনচার জানিয়ে দিলে রাত কত হয়েছে তা—অমনি তাড়াতাড়ি খানিক আধ ঠাণ্ডা দুধ কোনো রকমে আমাকে গিলিয়ে খাটের উপরে তিনটে বালিসের মাঝ খানটায় কাত করে ফেলে মনে মনে একটা ঘুম পাড়ানো ছড়া আউড়ে চল্লো আমার দাসী, আর তারি তালে তালে অন্ধকারে তার কালো হাতের রহে রহে ছোঁয়া ঘুমের তলায় আস্তে আস্তে আমাকে নামিয়ে দিতে থাকলো। একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিল আমার দাসী, সে কাছে বসেই ঘুম পাড়াতো, কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকতো সে—দেখতে পেতেম না তাকে, শুধু ছোঁয়া পেতেম থেকে থেকে। কোনো কোনো দিন অনেক রাতে সে জেগে বসে চাল-ভাজা কট্ কট্ চিবোতো আর তালপাতার পাখা নিয়ে মশা তাড়াতো—শুধু শব্দে জানতেম এটা, আমি জেগে আছি জানলে দাসী চুপি চুপি মশারি তুলে একটুখানি নারকেল নাড়ু অন্ধকারে আমার মুখে গুঁজে দিতো, নিত্য খোরাকের উপরি পাওনা ছিল এই নাড়ু।

খাটে উঠ্‌বো কেমন করে এই ভয় হয়েছিল, কাষেই বোধ হচ্ছে উঁচু পালঙ্কে শোয়া সেই আমার প্রথম, জানিনে তার আগে কোথায় কোন ঘরে আমাকে নিয়ে শুইয়ে দিতো কেমন বিছানায় কে। চারিদিকে সবুজ মশারীর আবছায়া ঘেরা মস্ত বিছানাটা ভারি নতুন ঠেকেছিল সেদিন—একটা যেন কোন্‌ দেশে এসেছি যেখানে বালিস গুলোকে দেখাচ্ছে যেন পাহাড় পর্ব্বত, মশারিটা যেন সবুজ কুয়াশা ঢাকা আকাশ—যার ওপারে—এখানে আর মনে করতে হতোনা দেখতে পেতেম,—চিৎপুর রাস্তা থেকে যে সরু গলিটা আমাদের ফটকে এসে ঢুকেছে সেটা একেবারে জনশূন্য, ছ' নম্বর বাড়ির গায়ে তখনকার মিউনিসিপালির দেওয়া একটা মিট্‌মিটে তেলের বাতি জলছে আর সেই আলো আঁধারে পুরোনো শিব মন্দিরটার দরজার সামনে দিয়ে কন্ধকাটা একটা দুই হাত মেলিয়ে শিকার খুঁজতে খুঁজতে চলেছে! কন্ধকাটার বাসাটাও সেই সঙ্গে দেখা দিতো—একটা মাটির নল বেয়ে ছ' নং বাড়ির ময়লা জল পড়ে পড়ে খানিকটা দেওয়ালে সোঁতা আর কালো—ঠিক তারি কাছে আধখানা ভাঙ্গা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকর—দিনেও যার মধ্যে অন্ধকার জমা হয়ে থাকে! সব ভূতের মধ্যে ভীষণ ছিল এই কন্ধকাটা—যার পেট্‌টা থেকে থেকে অন্ধকারে হাঁ করতো আর ঢোক্‌ গিলতো, যার চোখ নেই অথচ মস্ত কাঁকড়ার-দাঁড়ার মতো হাত দুটো যার পরিষ্কার দেখতে পেতো শিকার। আর একটা ভয় আসতো সময়ে সময়ে – কিন্তু আসতো সে অকাতর ঘুমের মধ্যে, সে নামতো বিরাট একটা আগুনের ভাঁটার মতো বাড়ির ছাত ফুঁড়ে আস্তে আস্তে আমার বুকের উপরে—যেন আমাকে চেপে মারবে এই ভাব—নামছে তো নামছেই গোলাটা, আমার দিকে এগিয়ে আসার তার বিরাম নেই, প্রায় বুকের কাছাকাছি এসে গোলাটা আস্তে আস্তে আকাশে উঠে যেতো, আমি হাঁফ ছেড়ে চম্‌কে উঠে দেখতেম সকাল হয়েছে, আর কপাল গরম হয়ে আমার জ্বর এসে গেছে! দশ বারো বছর পর্য্যন্ত এই উপগ্রহটা প্রতিবার জ্বরের অগ্রদূত হয়ে ছাত ফুঁড়ে এসে আমায় ভয় দেখিয়ে যেতো। উপগ্রহকে ঠেকাবার উপায় ছিল না, কিন্তু উপদেবতা সেই কন্ধ-কাটার হাত থেকে বাঁচবার বুদ্ধিটা ছিল আমার তখন – লাল শালুর লেপ তারি উপরে মোড়া থাকতো পাতলা ওয়াড়—আমি তারি মধ্যে এক এক দিন লুকিয়ে পড়তেম এমন, যে দাসী সকালে বিছানায় আমায় না দেখে কোন কোন দিন – ছেলে কোথায় গেল বলে সোরগোল বাধিয়ে দিতো, অবশেষে পদ্ম দাসীর পদ্ম হস্তের গোটা কতক চাপড় খেয়ে—যাদুকরের থলি থেকে গোলার মতো ছিট্‌কে বার হতেম আমি সকালের আলোয়। জীবনের প্রথম কয় বছর—সকালে লেপের ওয়াড়খানা গুটিপোকার খোলস ছাড়ার মতো করে ছেড়ে বার হওয়া আর রাতে আবার গিয়ে লুকোনো লেপের মধ্যে, আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে বাটি ঝিনুক খাট সিন্দুক তেলের সেজ পদ্মদাসী এমনি গোটা কতক জিনিষ, আর শীতের রাতের অন্ধকারে কতকগুলো ভূতের চেহারা দিনের বেলাতেও একরকম অন্ধকারে ঢিল ফেলার মতো

কতকগুলো চমকে দেওয়া শব্দ—চলার শব্দ, দরজা পড়ার শব্দ, চাবির গোছার ঝিন্ ঝিন্ মাত্র আছে—আমার কাছে, আর কিছু নেই কেউ নেই।

১৮৭১ খৃঃ অব্দের জন্মাষ্টমির দিনের বেলা ১২টা ১১ মিনিট থেকে আরম্ভ করে খানিকটা বয়েস পর্য্যন্ত রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের পুঁজি—একদাসী, একখানি ঘরে একটি খাট, এক দুধের বাটি,—এমনি গোটাকতক সামান্য জিনিষের মধ্যে বদ্ধ রয়েছে, শোয়া আর খাওয়া—এ ছাড়া আর কোনো ঘটনার সঙ্গে যোগও নেই আমার; অকস্মাৎ একদিন ঘটনার সামনে পড়ে গেলেম, একলা—ঘটনার প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা সেটা। তখন সকাল দেড় প্রহর হবে. তিন তলার বড় সিঁড়ির উপরের ধাপের কিনারা যেখানটায় খাঁচার গরাদের মতো মোটা মোটা সোজা শিক দিয়ে বন্ধ করা, সেই খানটাতে দাঁড়িয়ে দেখছি—কাঠের সিঁড়ির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধাপগুলো একটা চৌকানা যেন কুয়োকে ঘিরে ঘিরে নেমে গেছে কোন্ পাতালে তার ঠিক নেই, এই ঘুর্ণির মাঝে একটা বড় চাতাল, পশ্চিম দিকের একটা খোলা ঘর দিয়ে চাতালের উপরটায় পড়েছে চওড়া সাদা আলোর একটি মাত্র টান্! ঠিক এই জায়গাতে আমার কালো দাসী আর রসো বলে আর একটা ফরশা মোটা-সোটা চাকরাণী কথা কইছে শুনছি, আমি তো তাদের কথা বুঝিনে কথার মানেও বুঝিনে কেবল স্বরের ঝোঁক আর হাত পা নাড়া দেখে জানছি দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বেধেছে। খাঁচার পাখির মতো গরাদের মধ্যে থেকে বাইরে চেয়ে দেখছি কি হয়—হঠাৎ দেখলেম আমার দাসী একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে দেওয়ালের উপরে পড়লো, আবার তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে কোমর বাঁধতে থাকলো। তখন তার কালো কপাল বেয়ে সিঁদূরের মতো রক্ত পড়ছে, চুলগুলো উস্কো, চেহারা রাগে ভীষণ হয়ে উঠেছে—যেন কালো পাথরের ভৈরবী একটা মূর্ত্তি! আমি চিৎকার করে উঠলেম—মারলে আমার দাসীকে মারলে। লোকজন ছুটে এল ডাক্তার এল একটা সাদা কাপড়ের জলপটী দাসীর কপালে বেঁধে দিয়ে গেল। কিন্তু আমার মনে জেগে রইলো সিঁদূরের মতো সকালেরদেখা রক্তমাখা কালো রূপটাই। সেই আমার শেষ দেখা দাসীর সঙ্গে, তারপর দিন থেকে দেখি দাসী কাছে নেই, কিন্তু ভাবনা রয়েছে তার মনে—দেশ থেকে খেলনা নিয়ে ফিরে আসবে দাসী—সিঁড়ির দরজার ধারে বসে বীরভূমের গালার তৈরি একটা কাছিম নিয়ে খেলি আর রোজই ভাবি দাসী আসবে। কোন গাঁয়ের কোন ঘর ছেড়ে এসেছিল অন্ধকারের মতো কালো আমার পদ্মদাসী। শুনেছি সে ভীষণ কালো ছিল, পদ্ম নামটা তাকে একটুও মানাতো না—সে তার বেমানান নাম নিয়েই এসেছিল এবং এই বাড়িতে বাস করেও গেছে—গল্প বলেছে—ঝগড়া করেছে—কাজ করেছে এবং আমাকে মানুষ করার বখশিস্—সোনার বিছে হার আর রক্তের টিপ পেয়েও চলে গেছে বহুদিন, পৃথিবীর কোনোখানে এক আমার মনে ছাড়া আজ তার কিছুই ধরা নেই, হয়তোবা তাই আপনার কথা বলতে গিয়ে প্রথম সেই নিতান্ত যে পর সব প্রথম তাকেই দেখতে পাচ্ছি—পঞ্চাশ বছরের ওধারে সে বসে বসে দুধ চালছে আর তুলছে রূপোর ঝিনুকে আমার জন্যে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরাতন কাসুন্দি

দেখিতে দেখিতে গত ছয় বৎসরের ভিতর অনেক কিছু হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধির ডমরু ধ্বনি শুনিয়া উকিলেরা ওকালতি ছাড়িলেন, ছেলেরা স্কুল কলেজ ছাড়িল, দুই একজন রায় বাহাদুর রায়-বাহাদুর-গিরিতেও ইস্তফা দিলেন; কিন্তু ভারতের ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগিবার চিহ্ন দেখা গেল না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা রাগ করিয়া আইন-সভা বর্জ্জন করিলেন; অনেকে চরকা কাটিয়া খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিলেন; সভা-সমিতি ও আর্ত্তনাদে দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল; মুসলমান ভ্রাতারা খলিফার দুঃখে কাতর হইয়া চাঁদার খাতা খুলিলেন; বাংলা ভাষায় হরতাল, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি অনেক নূতন কথার আমদানি হইল; কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন যে খুব বেশী টলিয়া উঠিল তাহা মনে করিবার কারণ পাওয়া গেল না। শেষে কথা উঠিল, খুব সন্তর্পণে, বিশুদ্ধ অহিংসভাবে আইন অমান্য কর, আর খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দাও। আধ্যাত্মিক স্বরাজ লাভের কথা যাহাদের কাণে পৌঁছায় নাই, খাজনা ট্যাক্স বন্ধের কথায় তাহারা কাণ খাড়া করিয়া উঠিল। দিনের পর দিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও যাহাদের পেটে অন্ন জুটে না, পরের উদর পূর্ত্তি করিতে করিতে যাহাদের নিজেদের সন্তান সন্ততি অনাহারে মরে, সেই কৃষকের দল খাজানা ট্যাক্স বন্ধের কথায় লাঙ্গল কাঁধে করিয়া দাঁড়াইল। উকিল বাবুদের বক্তৃতায় ও ছেলেদের কোলাহলে যে-সব সরকারী কর্ত্তাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই, খাজনা ট্যাক্স বন্ধের জল্পনা কল্পনায় তাঁহারা দুঃস্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে সরকারী রসদ বন্ধ করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা' তিনি চৌরিচৌরায় আপনার লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া খানকতক বাড়ী ঘর সমেত গোটাকয়েক পুলিস-কর্ম্মচারী গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। স্বরাজ সাধনার মধ্যে অসাত্ত্বিকতার গন্ধ পাইয়া মহাত্মা গান্ধী ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে ক্রুদ্ধ ব্রিটিশ-কেশরী ও তাঁহার পুলিস-শাবকদিগের তর্জ্জন-গর্জ্জনে মা বসুমতী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন। ছেলের দলে সরকারী জেলখানা ভর্ত্তি হইয়া গেল; সাধের চরকায় মাকড়শা সূতা কাটিতে লাগিল; নেতৃবৃন্দ গালে হাত দিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ বলিতে লাগিলেন—'তাই ত! তাই ত!' যে-সব কৃষকেরা অধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া পুলিসের উপর লাঙ্গল চালাইয়া স্বরাজ ফলাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা নেতৃবৃন্দের আধ্যাত্মিকতার ভিতর জমিদারী চালের গন্ধ পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল।

সাজান বাগান কেন শুকাইয়া গেল, বর্জ্জনের গর্জ্জন কেন মূক হইয়া গেল, সে

সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মীরা নেতাদের ভুল ভ্রান্তি বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নেতারা কর্ম্মীদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাফাই গাহিয়াছেন, আর উভয় দল মিলিয়া দেশের জনসাধারণ যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অপ্রস্তুত, সেই কথাটাই নিজেদের মনকে বুঝাইয়া আত্মতুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিবিধ, চতুর্ব্বিধ বা পঞ্চবিধ বর্জ্জনের সব কয়টাই যদি কৃতকার্য্য হইত তাহা হইলেও যে কেমন করিয়া বিদেশী আমলাতন্ত্র কাবু হইয়া পড়িত তাহা বুঝা একটু কঠিন।

ছেলেরা সবাই যদি সরকারী স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দেয় রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া বেড়ায়, উকিল ব্যারিষ্টারেরা যদি আদালত ছাড়িয়া চরকা কাটিতে বসেন, রায় বাহাদুরেরা যদি বাহাদুরী ছাড়িয়া সোজাসুজি ভদ্রলোক হইয়া দাঁড়ান, আইন সভার মুরুব্বীরা যদি আইন সভার বদলে মাঠে ঘাটে বক্তৃতা করিয়া জিহ্বার কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করেন, এমন কি দেশশুদ্ধ সকলেই যদি খাদি-প্রতিষ্ঠানের বা অভয়াশ্রমের আনুচর্য্য স্বীকার করিয়া খদ্দরাচার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ইংরেজ যে কেন দিল্লীর রাজপ্রাসাদের চাবী আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বোম্বায়ে গিয়া জাহাজে চড়িয়া বসিবে, সে কথা সহজ বুদ্ধিতে আসে না। অথচ অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় এই কর্ম্মপন্থাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা অনুসরণ করিলে বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে দেশের ভদ্র সম্প্রদায়ের মন কতকটা তিক্ত হইয়া উঠে, আর বিদেশী ব্যবসাদারদিগের খানিকটা অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হয় —এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সওদাগরী জাহাজের পিছনে যাহাদের রণতরী বর্ত্তমান, বেয়নেটের উপর সাজ পরাইয়া যাহাদের রাজদণ্ড গঠিত, তাহারা কিঞ্চিৎ অর্থ নষ্ট হইলেই হাল ছাড়িয়া দিবে না। যে-ক্ষাত্রশক্তির প্রভাবে তাহারা প্রথমে এদেশে বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছিল, সে-শক্তি যতদিন তাহাদের অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততদিন যে তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেদের অর্থনাশের পথ প্রশস্ত হইতে দিবে না, এ কথা অস্বীকার করিয়া কোনও লাভ নাই। তাহার পর আরও একটা কথা এই, এ দেশের যে ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় এই বর্জ্জন পন্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই আর্থিক স্বার্থ বর্ত্তমান শিক্ষা ও শাসন প্রণালীর সহিত বিশেষভাবে জড়িত। যাঁহারা ইংরাজের আইনের কল্যাণে জমির মালিক সাজিয়াছেন ইংরাজের নিকট ধার করা বিদ্যা বেচিয়া অন্নসংস্থান করেন, ইংরেজের স্থাপিত আদালতে ন্যায়ের লড়াই দেখাইয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, দেশের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর সঙ্গে তাঁহাদের নাড়ীর যোগ খুবই দৃঢ়। ইংরেজের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী দিন ধরিয়া বর্জ্জন করিতে গেলে তাঁহাদিগকে প্রাণে মারা পড়িতে হয়। বড় বড় রুই কাৎলা হয়ত মনের দুঃখে কিছুক্ষণ জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় লাফাইয়া আস্ফালন করিতে পারে, কিন্তু সেখানে তাহাদের বাস করা চলে না। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে যাঁহারা পঞ্চবিধ বর্জ্জন-নীতি লইয়া

আস্ফালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা অনেকটা খাটে। তাঁহাদের বর্জ্জন-নীতির ফলে দিল্লীর সিংহাসন টলিল না দেখিয়া যখন তাঁহারা জনসাধারণকে এই অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিলেন, তখন পাছে ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বার্থও মারা পড়ে, এই ভয়ে তাঁহারা কতকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। পাছে জনসাধারণের ভিতর হইতে রুদ্র দেবতা বাহির হইয়া তাঁহাদের সৌখীন, ভদ্র স্বরাজের "জাত" মারিয়া দেয়, এই ভয়ে অসহযোগের নেতৃবৃন্দ দরিদ্র, নির্য্যাতিত কৃষকদের বুকের উপর অহিংসার রক্ষা-কবচ আঁটিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষকের বর্ম্ম বণিক-নীতির বাঁধ মানিল না। বলরাম যেদিন হলস্কন্ধে করিয়া দাঁড়াইলেন, সেদিন তাঁহার ক্রুদ্ধ নয়ন-কোণ হইতে বিপ্লবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া বণিকের কাল্পনিক স্বরাজ-সৌধ ধ্বংস করিয়া দিল। সেই দিন হইতেই অসহযোগের নেতৃবৃন্দ রটাইতে লাগিলেন—এ পোড়া দেশের লোক তাঁহাদের আধ্যাত্মিক স্বরাজ-সাধনার গূঢ়তত্ব এখনও হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে নাই। আর যতদিন তাহা না পারে ততদিন শান্ত শিষ্ট ভাবে চরকা চালাইয়া সাত্বিকতা অর্জ্জন করা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

কথাটা সকলের মনঃপূত হইল না। যুদ্ধের ক্ষমতা সংঘর্ষ দ্বারাই সৃষ্টি হয়, এবং কর্ম্ম-পন্থার ভিতর হইতে সংঘর্ষের অংশটুকু বাদ দিলে এই নিদ্রালু জাতি আবার হয়ত ঘুমাইয়া পড়িবে—এইরূপ যাঁহাদের মনোভাব, তাঁহারা দেশবন্ধুর পতাকার নীচে আশ্রয় লইয়া স্বরাজ্য-দলের সৃষ্টি করিলেন। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ভদ্র-সম্প্রদায় দ্বারা যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ সম্ভবপর হইবে না, এবং কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাহায্য ভিন্ন যে এ ব্রত উদ্যাপনের সম্ভাবনা নাই সে কথা দেশবন্ধু হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু যে সময় স্বরাজ্যদলের উৎপত্তি হয়, সে সময় তিনি দেখিলেন যে সংঘর্ষ আরম্ভ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যবস্থাপক সভাগুলি। সেইখানে বিরোধ আরম্ভ করিলে পরে সেই বিরোধ ক্রমশঃ দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে, এ আশা তাঁহার ছিল। তিনি আরও আশা করিয়াছিলেন যে ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক সভা স্থাপন করিয়া তিনি সেইগুলিকে বিরোধের কেন্দ্র করিয়া তুলিবেন। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্মীদের উপর তিনি এই শেষোক্ত কর্ম্মের ভার দিবার সংকল্প করেন, অল্পদিনের মধ্যে সরকার বাহাদুর তাঁহাদের অনেককেই বিপ্লববাদী সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। দেশবন্ধুকে যে ব্যবস্থাপক সভার কাজ লইয়াই আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল, ইহা তাহার অন্যতর কারণ বলিয়া মনে হয়। তিনি যে কৃষক ও শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার কোন চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারেন নাই তাহার হয়ত আরও একটী কারণ আছে। ব্যবস্থাপক সভার গঠন প্রণালীই এমন চমৎকার, যে সেখানে গিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিতে গেলে জমিদার ও অন্যান্য বিশেষ স্বার্থদুষ্ট শ্রেণীকে হাতে না রাখিলে চলে না। কাজে

কাজেই জনসাধারণের সহিত যে যে বিষয়ে উহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ, সে-সব বিষয়ে চুপ করিয়াই থাকিতে হয়। দেশবন্ধুকেও স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাহাই করিতে হইয়াছিল। শুধু ব্যবস্থাপক সভায় সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া খুব বেশী ফল যে পাওয়া যাইবে না তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মুখ রক্ষা করিবার মত একটু কিছু না পাইলেও ব্যবস্থাপক সভা ছাড়িয়া বিরোধের অন্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব কার্য্যকৌশল ও অসাধারণ উদ্যম মরুভূমিকে উদ্যানে পরিণত করিবার প্রচেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়া গেল। তাঁহার পরলোক গমনের পর হইতেই দেশব্যাপী বিরাট বিরোধের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার সংকল্প তাঁহার অনুচরগণের মন হইতে অপসারিত হইয়াছে ও তাঁহার গঠিত স্বরাজ্যদল ছিন্নভিন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজনীতির এখন একমাত্র কেন্দ্র ব্যবস্থাপক সভা। জনসাধারণ সে রাজনৈতিক কেন্দ্র হইতে বহুদূর আগেও যেমন পড়িয়াছিল, আজও তেমনি পড়িয়া আছে। আজ ব্যবস্থাপক সভার সিঁড়ি চড়িয়া ধীরে ধীরে গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট মোলায়েম স্বরাজের পথে অগ্রসর হওয়া ও মধ্যে মধ্যে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া আইনসঙ্গতভাবে কিঞ্চিৎ গর্জ্জন করাই স্বরাজ্য-পন্থীদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পর্ব্বের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সে কথা বারান্তরে আলোচনা করাই ভাল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিটে-ফোঁটা

(১)

চাকুরির কাহিনী

লোকে বলে আদালতে ডিগ্রি পাওয়া বরং সোজা, ডিগ্রি জারি করা বড় কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া বড় কঠিন হয় নাই, তবে উহা জারি করিয়া কাজ হাসিল করিতে গোল বাধিল। বসন্তকালটা কাটিয়া গেল জয়ের আনন্দে ও ফুলের গন্ধে, আর গ্রীষ্মও কাটিল মন্দ নয়,—শ্বশুর বাড়ীর আমে ও সন্দেশে। তাহার পর আষাঢ়ের দীর্ঘ বেলা আর কাটে না, কেমন করিয়া কৃতিত্বের বলকে পরীক্ষককে চমকাইয়াছিলাম, সে আষাঢ়ে গল্প প্রতিদিন শোনাইবার শ্রোতা জুটিল না। জগন্নাথের রথের মত আমার রথ টানিবার ভক্ত না জুটিলেও কোন মতে গড়াইয়া গড়াইয়া এক মাস পাড়ি দিলাম। শ্রাবণের প্লাবনের সময় অনেক উপদেষ্টা

মুরুব্বির মন্ত্রণার স্রোতে ভাসিতে লাগিলাম, কূল পাইলাম না। ভাদ্র মাসের পানকৌড়ি যেমন শিকারীকে এড়াইয়া ও শিকার ধরিবার জন্য ডুবিয়া ডুবিয়া বেড়ায়, আমিও সেইরূপ অযাচিত উপদেশ এড়াইয়া অনেক চাকুরি খুঁজিয়া নানা স্থানে গিয়া হয়রান হইলাম। তাহার পর জগদম্বার কৃপায় আশ্বিন মাসটা কাটিয়াছিল ভাল; বহু উপচারের প্রসাদ খাইয়া পুষ্টি পাইলাম।

ভাবিতেছিলাম কি উপায়ে এই পুষ্টিকে ক্ষয়ের হাত হইতে বাঁচাই, এমন সময়ে জগদম্বার উৎসবের চেয়েও উপভোগ্য ভোটের উৎসব আসিল। কপাল ক্রমে আমার একটা ভোট্ ছিল, আমি সেটার সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইলাম। তিন জন ভোট্‌প্রার্থীকেই আশ্বস্ত করিয়া ও তাঁহাদের জন্য খাটিবার ছল করিয়া সুখে ঘুরিলাম অনেক, ও পোলাও সন্দেশ খাইলাম ঢের। তাহার পর ভোটের বিজয়োৎসবের দিন গোলেমালে হরিবোল দিয়া কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া ভরাপেটে ঘরে ফিরিলাম।

ভোটের আদরে বিনা পয়সায় খবরের কাগজ পাইয়াছিলাম; বাড়ী আনিয়া পড়িয়া দেখি আর এক শুভযোগ উপস্থিত। কুম্ভমেলার শুভযোগের জন্য কর্ম্মীর খোঁজ হইতেছিল, আমি নির্ব্বিবাদে জুটিয়া গেলাম। ভোটের উৎসবে হিতৈষণার বক্তৃতার ঢং শিখিয়াছিলাম,— উহা খুব কাজে লাগিল। ভবিষ্যৎ যাত্রীর দুঃখের জন্য কাঁদিলাম ও কাঁদাইলাম, পরে খাইলাম ও খাওয়াইলাম, বিনা পয়সায় অনেক দেশ দেখিলাম ও পথের ঘাটিতে ঘাটিতে অনেক চাকুরির সন্ধান নিলাম। একদিন দলের ভিতর হইতে সট্‌কিয়া একটি বিলাতি খাদ্যের হোটেলে ঢুকিয়া একজন ধনীর উপহারের টাকায় অনেক সুখাদ্য "অখাদ্য" খাইলাম, ও একজন অর্দ্ধ পরিচিতের কাছে অনেক চাকুরির সন্ধান নিলাম। একজন ছদ্মবেশী টিক্‌টিকি সাহেব অদূরে বসিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। আমি যখন আহারের পর গায়ে একখানি গেরুয়া জড়াইয়া সেদিনকার গোরক্ষিণী সভার এক অধিবেশনে গৌ-মাতা ষাঁড়-পিতা বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিতেছিলাম, তখন টিক্‌টিকি সাহেব সেখানে ছিলেন। আমার গোজাতির প্রতি অনুরাগের বিষয়ে সাহেবটির সন্দেহ ছিল না; বক্তৃতার পর তিনি আমাকে গোপনে ডাকিয়া সেদিন ও তাহার পরে অনেক কথা বলিয়া আমাকে টিক্‌টিকির দলে টানিলেন। আবার বসন্ত আসিল; এবার আমার সুখের বসন্ত।

মর্ম্মান্তিক

(২)

আশ মেটে না, পেট ভরে না সবাই ভবে ক্ষুব্ধ;
ভিখারীদের কাঁধের ঝুলি কেউ করে না পূর্ণ।
পাষাণ কেটে তোমায় গড়ি,—তোমায় করি শক্ত;
মাথা কুটে কঠোর পায়ে ঢালি তাজা রক্ত।

জানি না কি খুঁজে মরি, গড়ি কাশী—মক্কা ;
বরাভয়ের খোলা মুঠায় মেলে খালি ফক্কা।
উপোস করে' কোকিয়ে কেঁদে' পুঁজি করি পুণ্য ;
খতিয়ে দেখি খাতার পাতায় আঁকা শুধু শূন্য।

তর্ক জালের সূতায় সূতায় তবু আঁটি যুক্তি,
ভোগের ভাগ্যে যাহাই থাকুক—ক্ষোভে আছে মুক্তি।
হয়ত তুমি ব'লছ—তোমায় মিছাই দোষে মানুষে,
মিষ্ট খেয়ে পেটটা ভরে' শেষটা বলে পান্‌সে।

কেউবা ঢেলে দিলে পাতে, তোলে হাতে,—খায়না ;
পরে আবার খাবার তরে ধরে বিকট বায়না।
সুখে থেকে, ভূতকে ডেকে কেউবা কিল খাচ্ছে ;
কেউবা যেলে নিজের গণ্ডা ভেরেণ্ডাটাই ভাজ্‌ছে।

মুক্তি খুঁজে মরে পুজে' পচা পুঁথির বাক্যি ;
কথার বড়াই, দলের লড়াই আছে তাহার সাক্ষী।
চাও কি তবে লোকে সবে ছেড়ে দিবে ধর্ম্ম ?
তুমি না হয় রুষ্ট রহ, তুষ্ট থাকুক মর্ম্ম।

ধনী ও শ্রমমজ্জী

(৩)

মজ্জী— সকলের তরে দেখ ন্যায়বান ভগবান—
আলোক, বাতাস, বৃষ্টি সমানে করেন দান।
না মান বিধান তার, একি হীন কর্ম্ম।
আমাদের শরীরেও বিরাজেন ব্রহ্ম।

ধনী— ব্রহ্মের প্রিয় তোরা, কথা অতি সাদা সে ;
থাক্ তোরা রোদ্দুরে, বৃষ্টিতে, বাতাসে।
মাটি অতি হীন তাকে পায়ে দলে লোকে ত।
মোরা হীন তাই সেই মাটি রাখি ভোগে ত।

বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য

('বঙ্গবাণীর' দ্বিতীয় বর্ষ নূতন বৎসর হইতে আমরা 'নৈবেদ্য' বিভাগে প্রতিমাসে বিদেশের সাময়িকপত্রাদি হইতে শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত (ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতির সহিত যাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ আছে) মধ্য হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া দিব। নব নব উন্নতিশীল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জাতি সমূহের ভাবধারার সহিত পরিচয় স্থাপন করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য)

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ

চেরী কিয়ার্টন সাহেব একজন পাশ্চাত্য ভূপর্যটক ও জগদ্বিখ্যাত শিকারী। ইনি কিছুকাল পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে কিঞ্চিমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ষ্টেশনগুলিতে লোকের বিষম ভিড়; মানুষগুলি ঠিক যেন পোকার মত গিজ্ গিজ্ করিতেছে; অসংখ্য পাগ্‌ড়িপরা চীৎকার-প্রিয় লোক পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে। ইংলণ্ডের ছুটির দিনের ভিড় ভারতবর্ষের এই সাধারণ ভিড়ের তুলনায় নগণ্য। তবে এই ভিড়ের মধ্যে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। ইহারা আমাদিগকে তফাতে রাখে। সাহেব (sahib) দের ব্যবস্থা এখানে স্বতন্ত্র। তাঁহারা ট্রেণের যে কামরায় উঠেন সে কামরায় কোনও 'কালা আদ্‌মি' উঠিতে আসিলেই গার্ড সাহেব আসিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়। এইটুকু সময়ের মধ্যেই এই সাদাওয়ালা লোকদের দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না, অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই কোটি কোটি লোককে যে প্রতিষ্ঠান পরাধীন, পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কি অদ্ভুত ক্ষমতাই না আছে! এই সব চিন্তা করিতে করিতে গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠিল, এই ভাবিয়া যে আমিও এই ইংরেজ জাতির একজন, আমিও তাহাদেরই একজন আত্মীয় যাহাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতবর্ষে আসিয়া সামান্য এক শতাব্দীর মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের বর্গী মারাঠীদিগকে দূর করিয়া ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।" হায়, ভারতবর্ষ!

ভারতীয় শিল্প

ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পকলার সমালোচনা করিয়া আনন্দ. কে. কুমারস্বামী দেশে বিদেশে সম্মান লাভ করিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ভারতীয় চিত্রকলা কি অবস্থায় ছিল তিনি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে যে সকলন দেওয়া হইল, তাহার অধিকাংশই কুমারস্বামী মহাশয়ের লেখা হইতে সংগৃহীত।

ভারতীয় শিল্পকলা আলোচনা করিতে গেলেই বৌদ্ধ যুগের শিল্পের প্রতি আমাদের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ে। বৌদ্ধযুগের সমসাময়িক যে শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার অসীম প্রাণশক্তি ছিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই চিত্রশিল্প ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণের সহায়তায় তাহা শ্যাম কম্বোজ চীন জাপান প্রভৃতি দেশেও অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও ইহা আফগানিস্থান পারস্য ও আরবের মধ্য দিয়া সুদূর মিশর পর্য্যন্ত আংশিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎকালীন ও তাহার অল্পকাল পরবর্ত্তী চিত্রশিল্পের (প্রস্তর মূর্ত্তি প্রভৃতি ছাড়া) পরিচয় অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি গুহাগাত্রে খোদিত আছে। *

---

* অজন্তা—১৫০ খৃঃ পূঃ অঃ, সিগিরিয়া—৫ম শতাব্দী, পোলোন্নারুয়া (সিংহল) দ্বাদশ শতাব্দী।

এই যুগের পর হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতীয় চিত্রশিল্পের কোনো নিদর্শন আমরা পাই না; তবে এই চিত্রশিল্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লিখিত কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যেও ভারতীয় চিত্রশিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল।[*] সম্রাট্ আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) মন্ত্রী, বন্ধু ও ইতিহাস লেখক মনস্বী আবুল ফজল্ তৎকালীন পারস্য চিত্রশিল্পের সহিত যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন; তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অনেক পারসীক শিল্পী আকবরের দরবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এই পারস্য-শিল্প সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তিনি তৎকালীন হিন্দু চিত্রশিল্পীদের কথা না লিখিয়া পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"ইহাদের (হিন্দু) চিত্রশিল্প আমাদের চরম কল্পনাকেও পরাভূত করে। আমার মনে হয় সমগ্র জগতে ইহাদের সহিত পাল্লা দিতে পারে এরূপ কোনো শিল্পী নাই।"[†] ষোড়শ শতাব্দী হইতে ভারতে চিত্রশিল্পের দুই বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়; প্রথমটি রাজপুত চিত্রশিল্প বলিয়া ও দ্বিতীয়টি মোগল চিত্রশিল্প বলিয়া কথিত হয়। অনেকের ধারণা যে এই দুই শিল্পের ধরণধারণ (Technique) অনেকটা এক, কিন্তু শ্রীযুক্ত কুমারস্বামীর মতে কল্পনা ও রীতিতে ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবে শেষ দিকে মোগল চিত্রশিল্প রাজপুত কলাবিদ্‌গণের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

রাজপুত চিত্রশিল্প ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ এই তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চলে বর্ত্তমান ছিল। এই চিত্রশিল্প অকস্মাৎ গড়িয়া উঠিলেও বিজাতীয় বা নূতন নহে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হইতে যেমন হিন্দী বাংলা প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হইয়াছে অজন্তা বাঘ প্রভৃতি গুহাগাত্রের শিল্পই কাগজে তুলিতে রাজপুত শিল্পে পরিণত হইয়াছে।[‡] সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার চরম উন্নতি ঘটিয়াছিল। উত্তর ভারতবর্ষের তদানীন্তন অনেক কাহিনী, উপকথা, ইতিহাস প্রভৃতি এই চিত্রশিল্পে লিপিবদ্ধ আছে। জাতীয়তার ও সমাজের অনেক ছাপ ইহাতে পাওয়া যায়। মোগল শিল্প সমসাময়িক হইলেও ইহা রাজসভার শিল্প। পারস্যের রাজদরবার হইতে ইহা ভারতের রাজদরবারে আমদানী করা হইয়াছিল। রাজপুত শিল্প ভারতের ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, মোগল শিল্প আভিজাত্য-ব্যঞ্জক, রাজা-বাদশাহের ব্যক্তিগত ইতিহাস মাত্র। রাজপুত চিত্রশিল্পীদের দৃষ্টি থাকিত বক্তব্যকে বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তোলার দিকেই, মোগল-শিল্পীরা চিত্রকে সুন্দর করিবার দিকে ঝোঁক দিত। এক কথায় রাজপুত চিত্রশিল্প প্রাচীন শিল্পের নূতন অভ্যুত্থান, মোগল শিল্প সম্পূর্ণ নূতন। ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পকলা ও জাপানের রঙ্গিন চিত্রের সহিত মোগল শিল্পের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রাজপুত শিল্পীরা মনের আনন্দে কাজ করিতেন, যশ বা নামের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। রাজপুত কোনো চিত্রে কোনো শিল্পীর নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না, মোগল শিল্পের প্রত্যেক চিত্রে শিল্পীর নাম ও পরিচয় আছে। এক বিষয়ে রাজপুত ও মোগল শিল্পীদের সাদৃশ্য দেখা যায়।—উভয় দলের শিল্পীরাই পুঁথি লিখিতে বসিয়া চিত্র আঁকিতেন। হ্যাভেল সাহেব ইহাদিগকে Portfolio paintings নামে অভিহিত করিয়াছেন। চিত্রশিল্প ব্যবহারের তিনটি ধারা লক্ষিত হয়। প্রথমটি—অর্থাৎ পর্ব্বতগাত্রে মন্দিরগাত্রে বা গৃহগাত্রে অঙ্কিত বা খোদিত ছবি—ইহাই সম্ভবতঃ শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ। ইতালী ও ভারতবর্ষে শিল্পকলার এই দিকটির চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় জাপানী শিল্পীদের ধারা অর্থাৎ কাপড়ে বা কাগজে ছবি আঁকিয়া দেওয়ালে টাঙ্গানো, এবং তৃতীয়—পোর্টফোলিও চিত্রকলা। মোগল ও রাজপুত চিত্রশিল্প এই তৃতীয় বিভাগের

---

[*] আনন্দ কে কুমারস্বামী—On Mughal and Rajput Painting.

[†] ব্লকম্যান অনূদিত আইনী আকবরী, ১ম খণ্ড,—১০৭ পৃষ্ঠা।

[‡] কুমার স্বামী—Rajput Paintings page 315.

অন্তর্গত। * দুই শিল্পেই ইহা আপনাআপনি গড়িয়া উঠিয়াছে—তবে বিদেশী পারস্য শিল্প ভারতবর্ষের রাজদরবারে আসিয়া দেশ ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। প্রথম দিকটা শিল্পের বিষয় ছিল রাজরাজড়ার যুদ্ধ, মদ্যপান ও প্রেম। পুঁথির পাতায় পাতায় গাঢ় রঙের ও সোণালির চাকচিক্যে চিত্রগুলি বিশেষভাবে দর্শককে আবিষ্ট করে। পরে, রাজপুত শিল্পের প্রভাবে চিত্রের বিষয় রাজদরবার ছাড়িয়া বাহিরের আবহাওয়ায় কিছু পরিমাণ মুক্তি পাইয়াছিল।

ভারতের রাজনৈতিক আকাশ যখন যুদ্ধবিগ্রহে অন্ধকার তখনও রাজপুত ও মোগল শিল্পীরা নিভৃত চিত্রশালায় আপনাদের কল্পনা ও লিপিকুশলতার পরিচয় দিতেছিল। যখন শিখ মারাঠা মোগল, ঠগী ও ইংরেজ ফরাসী মিলিয়া ভারতের বুকে মানুষের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে তখনও শিল্পীরা শিল্প সাধনা হইতে বিরত হয় নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কেমন করিয়া জানি না, বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত এই শিল্পীদের বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। ভারতীয় শিল্পকলা তখন হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে। শিল্পীদেরও বর্ণ বিভাগ হইয়া যায়, বংশপরম্পরায় তাহারা পূর্ব্বপুরুষদের শিল্পে দাগা বুলাইতে থাকে। ভারতের মহিমার শিল্প পটশিল্পে পরিণত হয়। রাজপুতানায় ও বাঙলাদেশের (কৃষ্ণনগর কালিঘাট প্রভৃতি স্থান) পটোরা কাগজের উপর তুলি বুলাইয়া কোনো রকমে এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখে। এই পটোদের সকলেই যে প্রতিভাশূন্য ও অনুকরণপ্রিয় ছিল এমন কথা বলিলে ভুল হইবে। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহে এমন অনেক পট আছে যাহাতে শিল্পকুশলতায় মুগ্ধ হইতে হয়। প্রবাসী পত্রিকায় কয়েকমাস পূর্ব্বে ইহার কতকগুলি নমুনা ঘোষ মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিদেশী আব্‌হাওয়া ভারতের বুকে বহিতে থাকে। শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞানযুক্ত ক্ষমতা যাঁহাদের ছিল তাঁহারা পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীদের প্রভাবে পড়িয়া তাহাদের অনুকরণেই যত্ন করিতে থাকেন। রাজা রবিবর্ম্মা, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর প্রভৃতি এই শিল্পীদের অগ্রণী। ইয়োরোপের তৈলচিত্রগণকে আদর্শ করিয়া ইহারা রামায়ণ মহাভারত সংক্রান্ত অনেক চিত্র আঁকিয়াছিলেন এবং ইহাদের কয়েকটি খুব উচ্চ দরের তৈলচিত্রের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু ইহা স্বদেশী জিনিষ নহে বলিয়া বেশীদিন খাতির পায় নাই। ইহার অন্য একটি কারণও আছে—আমরা বাজারে রাজা রবিবর্ম্মা প্রভৃতির ছবির যে সস্তা সংস্করণ দেখিয়া থাকি তাহাতে আসলের সামান্য গুণই বর্ত্তমান থাকে।

ইহার পর নানা কারণে স্বদেশী শিল্প ও সাহিত্যের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িল। লোকে বুঝিল যে ভারতের শিল্পকলা অন্তরে বাহিরে খাঁটি ভারতীয় না হইলে চলিবে না; বিদেশের হীন অনুকরণে ভারতের শিল্পকে লাঞ্ছিত করিলে চলিবে না। শিল্পকলার উৎস মানুষের জীবনের মধ্যে, নূতনত্বের প্রভাবে মানুষের জীবনের ধারা যখন পরিবর্ত্তিত হইতে সুরু করিয়াছে, নূতন প্রাণশক্তির উদ্বোধনে দেশের লোকের চিত্ত যখন জাগিয়াছে তখন শিল্পকলারও আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। জাতীয় জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শিল্পকলা বাঁচিতে পারে না, ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প-সাহিত্য আমাদের নূতন জাতীয়তার সহিত অখণ্ড যোগ রাখিয়াই গড়িয়া উঠিবে। শুধু বাহিরে নয় আমরা তখন অন্তরে অন্তরেও বিদেশীদের দ্বারা বিজিত হইতেছিলাম।

---

* কুমারস্বামী—Art and Swadeshi p. 75

সহসা কয়েকজন মনীষীর জাগ্রত চেতনা অনুভব করিল যে আমরা সর্ব্বাংশে নিজেদের বিক্রীত করিয়া ক্রীতদাস হইতে চলিয়াছি। এই অনুভূতি সর্ব্বপ্রথম জাগিল এই বাংলাদেশে। রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে নূতন জীবন দান করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বাঙলা ভাষা অসম্ভাবিত উপায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বাঙলাদেশে প্রাচ্য ভারতীয়-চিত্রকলা-পদ্ধতি (National School of Painting) গড়িয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় নেতা ও মনীষীবৃন্দের একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল ভারতকে ইংলণ্ড করিয়া তোলা। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। স্বদেশের দিকে, জাতীয় শিল্পকলার দিকে ও স্বাধীনতার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। ভারতীয় শাস্ত্রাদিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সকলেই চেষ্টিত হইলেন।

হ্যাভেল সাহেব তখন কলিকাতা গভর্ণমেন্ট আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথের অদ্ভুত প্রতিভা আবিষ্কার করিয়া তিনি তাঁহাকেই ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি নিজেও কলিকাতা আর্টস্কুলের গ্যালারী হইতে ইউরোপীয় চিত্রগুলিকে সরাইয়া তাহার স্থানে ভারতীয় চিত্রশিল্পের নমুনাগুলি সংস্থাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলেন এই নূতন চিত্রশিল্পের জন্মদাতা। তিনি ও তাঁহার প্রতিভাবান শিষ্যমণ্ডলী অতি অল্পকালের মধ্যে অপূর্ব্ব সাধনাবলে যে অঘটন ঘটাইয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

উন্নতিশীল জাপান

টোকিও হইতে প্রকাশিত 'জাপান ম্যাগাজিন' নামক সাময়িক পত্রিকায় 'বাণিজ্য ব্যবসায়ে ১৫ বৎসরে জাপানের দ্রুত উন্নতি' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানেও এই পনের বৎসরের মধ্যে জাপানীরা খাওয়া পরা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নত হইয়াছে, প্রাণ ধারণের ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানের লোকসংখ্যাও শতকরা ২০ জন বাড়িয়াছে। তবে সুখের বিষয়, এই সব কারণে যে খাদ্য-স্বল্পতা হইয়াছে, তাহার প্রতীকার স্বরূপ জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত উন্নত হইতেছে। এই পনর বৎসরের মধ্যেই জাপানে ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ৩১০০০ হইতে ৮৭০০০ হইয়াছে। জাপানের প্রস্তুত দ্রব্য আশ্চর্য্যরকম বৃদ্ধি পাইয়াছে, মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে জাপানের প্রস্তুত জিনিষ শত করা ৭০০ গুণ বাড়িয়াছে। এই উন্নতির গোড়াপত্তন হয় রুশিয়া-জাপান যুদ্ধের পর, তবে গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পরেই ইহার উন্নতি দ্রুততর হইয়াছে।"

জাপান ও ভারতবর্ষ

জাপানের একটি মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ও এই সুদূর প্রাচ্য জাপান দুর্ভাগা ভারতবর্ষকে যে কি চক্ষে দেখে এই লেখা হইতে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সে দৃষ্টি প্রীতি ও সহানুভূতির দৃষ্টি নহে, লোভীর লোলুপ দৃষ্টি।

"বর্ত্তমানে সকলেই বুঝিয়াছেন যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ তাহার ত্রিশকোটীর অধিক লোক এবং উর্ব্বরভূমি লইয়া বাণিজ্যকামী জাতি সমূহের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ জাপানেরও সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার—অর্থাৎ জাপানের জিনিস কাট্‌তির পক্ষে এমন বাজার আর নাই। এই অসীম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে যাহার যত ঘনিষ্ঠতা হইবে তাহারই আর্থিক উন্নতি তত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। জাপান এই ঘনিষ্ঠতা করিলে তাহার যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবে সন্দেহ নাই।

"পৃথিবীর বণিকজাতি সমূহের মধ্যে যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা এই ভারতবর্ষকে লইয়াই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাপানের একটু সুবিধা এই যে, ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে ইহা ভারতবর্ষের সন্নিকটে অবস্থিত এবং ভারতবর্ষের লোকের পছন্দসই জিনিষ প্রস্তুত করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা জাপানের আছে। প্রমাণস্বরূপ,

জাপানের তুলানির্ম্মিত (cotton goods) দ্রব্যের কথা ধরা যাউক। লাঙ্কাশায়ারে প্রস্তুত দ্রব্য অপেক্ষা যে জাপানের দ্রব্য ভারতবর্ষে অধিক আদৃত হইতেছে তাহার প্রমাণ এই যে সম্প্রতি দেখা যাইতেছে এই বিষয়ে লাঙ্কাশায়ার জাপানের অনুকরণ করিতেছে।

"ব্যবসায়সম্পর্কে ভারতবর্ষে যাহা করা সম্ভব তাহার সহিত তুলনায় এতাবৎকাল যাহা করা হইয়াছে তাহা কিছুই নহে। বস্তুতঃ জাপান এখন পর্য্যন্ত কেবল যেন ভারতবর্ষের বাহিরেই কারবার করিতেছে। ভারতবর্ষের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে জাপান হইতে উপযুক্ত লোক ভারতবর্ষে গিয়া সেখানকার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করুন। তাহা হইলে জীবনধারণের জন্য ভারতবর্ষের লোকের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য কি কি তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। জাপানের পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহ ইতিমধ্যেই এই সকল বিষয়ে যে গবেষণা সুরু করিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

"সম্প্রতি জাপানীদ্রব্যসমূহ ভারতবর্ষে চলিতেছে বলিয়াই এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না যে, এই আদর বরাবর থাকিবে। এই আদরকে টিকাইয়া রাখিতে হইলে প্রভূত পরিশ্রম প্রয়োজন। ভারতবর্ষের প্রয়োজন সম্বন্ধে অনুসন্ধানে অবহেলা করিলে অদূর ভবিষ্যতে জাপানের সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে; কারণ এতগুলি জাগ্রত প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ঘুমাইয়া কাজ করিলে যে-কোনো মুহূর্ত্তে অপরে সুবিধা পাইয়া ভারতবর্ষের বাজার অধিকার করিয়া বসিবে, তখন চেষ্টা করিলেও আর সহজে ভারতবর্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করা দুরূহ হইবে।"

উপরি উদ্ধৃত উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ভারতবর্ষ আর জীবিত নাই। মৃতদেহ লইয়া শ্মশানের শৃগাল সারমেয় শকুনি প্রভৃতি মাংসলোলুপ প্রাণীরা যে ভাবে দ্বন্দ্ব করে ভারতবর্ষকে লইয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহ ও জাপান ঠিক তদ্রূপই করিতেছে দেখিতেছি।

মশার সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

আমেরিকার গর্গাস মেমোরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের ডাক্তার মেজর ষ্টোনার যাঁহারা মশার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে কয়েকটি কৌশল বলিয়া দিয়াছেন। সেগুলি নিম্নে লিখিত হইল;—

মশার ডিমের পাখা গজাইবার পূর্ব্বেই সেগুলিকে বিনষ্ট করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে যে ঘরের যতগুলি দরজা জানালা, স্কাইলাইট প্রভৃতি আছে সেগুলির কোনটি যেন ঝুল ইত্যাদি দ্বারা বা অন্য কোনো রকমে বন্ধ না হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ঘরের মধ্যে যেখানে যেখানে জল ফেলিবার ঝাঁঝরি বা জলের পাইপ আছে, সেগুলি যেন রাত্রিতে ঢাকনি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হয়। বাহির হইতে মশা আসিয়া এইগুলির মধ্যে ডিম পাড়িয়া যায়। তিন নম্বর,—খালি ক্যানেস্তারা, হাঁড়িকুড়ি, মুখখোলা বোতল ইত্যাদি যেন বাড়ীর মধ্যে জমা করিয়া না রাখা হয়। চার নম্বর,—উঠানে, কিম্বা কলঘরে, কিম্বা বাড়ীর অন্য কোথায়ও যেন জল জমা হইয়া না থাকে। পাঁচ,—ভাঁড়ার ঘরে যেন প্রত্যহ দুই বেলা রীতিমত ধোঁয়া (ধূপ?) দেওয়া হয়। ছয়,—বাড়ীর উঠানে যেন লম্বা ঘাস একেবারেই না থাকে, ফুলের গাছ প্রভৃতি থাকিলে তাহাতে যেন প্রত্যহ দুই বেলা জল দেওয়া হয়। তাহাতে মশা নিরুপদ্রবে সেখানেও ডিম পাড়িতে পারে না।

পুস্তক পরিচয়

মনের পরশ :—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত,—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—৫৬৫ পৃষ্ঠা,—উৎকৃষ্ট ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই—মূল্য তিন টাকা।

পুস্তকখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস। প্রথম খণ্ডে—কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে—প্যারিস, বার্লিন, রোম ও ভেনিস—এই অধ্যায়গুলি আছে। পুস্তকের নায়ক ইউরোপ-প্রবাসী সমীর ও তাহার দুই বন্ধু—মোহনলাল ও কুসুমকে অবলম্বন করিয়া লেখক তাঁহার নানা অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও বাকী ইউরোপের অভিজ্ঞতা দুইটী বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর উপন্যাস বাঙ্গলা সাহিত্যে আর আছে কিনা জানি না। আগাগোড়াই ইহার মধ্যে একটা নূতনত্ব ও বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। নরেন ও তাহার বন্ধুগণের প্রবাস-বাস উপলক্ষ করিয়া লেখক বাঙ্গালী-ছাত্রের বিলাত-বাসের সুবিধা, অসুবিধা, সাবধানতা প্রভৃতি এবং বিলাতী সমাজ, ছাত্রজীবন ও সাধারণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের যথোচিত পরিচয় দিয়াছেন, এবং স্বদেশী ও বিদেশী সমাজের তুলনামূলক নানা সুপরিচিত ও অপরিচিত সমস্যার উল্লেখ করিয়া সে সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন ও আবশ্যক হইলে বিশেষজ্ঞের অভিমতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। দীর্ঘ প্রবাস-বাসের মধ্যে—তাঁহার নায়ক সমাজের নানা স্তরের পুরুষ ও নারী, ছাত্র ও শিক্ষক, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মনের যে পরিচয় লাভ করিয়াছিল তাহার স্পর্শ তিনি সযত্নে পুস্তক মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বইখানিতে একটি সত্যের বন্যায় স্বতঃই উত্থিত হইতেছে। বইখানির শেষটি বড় মধুর। বুকের রক্ত দিয়া যে সংসারটী দেখিতে শিখিয়াছে তাহার লেখার ভিতরে যে কত ব্যথা, কত আনন্দ সঞ্চিত হইয়া উঠে এ বইখানি পড়িলে তাহা জানা যায়।

ষোল আনা।—একখানি নাতি দীর্ঘ উপন্যাস। প্রণেতা:—সুবিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।—প্রকাশক—বরদা এজেন্সি। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য ১৸০।

প্রচলিত সাধারণ উপন্যাস ২।৪টী পাত্রপাত্রীর পরস্পর-বিজড়িত জীবনের ঘটনা-পরম্পরা লইয়া রচিত হইয়া থাকে—ঔপন্যাসিক তাহাদের চরিত্র ও চরিত চিত্রবহুল সরস ভঙ্গিতে বিবৃত করিয়া থাকেন। এ উপন্যাসখানি সে শ্রেণীর নহে—এ উপন্যাসের পাত্রপাত্রী একটি গ্রামের 'ষোল আনা' লোক—ইহাতে একটি গ্রামের সামাজিক জীবনের অবিকল চিত্র আছে এবং একখানি গোটা গ্রামেরই সংশ্লিষ্ট চরিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আবার গ্রামখানি চরিত্রে চিত্রে ও বৈচিত্র্যে সমগ্র রাঢ় দেশেরই প্রতিনিধি স্বরূপ।

রুশীয় সাহিত্যে এ শ্রেণীর উপন্যাস আছে—তাহাতে গোটা একটা শ্রমিকাকীর্ণ ফ্যাক্টরী কারখানা, গোত্রাশ্রম বা জনপদের সংবদ্ধ জীবনের অবিকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক বিষয়ে বর্ত্তমান রুশীয় উপন্যাসের সহিত ইহার মিল আছে—রুশীয় উপন্যাসের ন্যায় 'ষোল আনায়' অধঃপতিত দরিদ্র ধর্ম্মনীতিহীন অজ্ঞানান্ধ জনপদ জীবনের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। Gorky প্রণীত Creatures that were once Men নামক পুস্তক এই শ্রেণীর।

পুস্তকখানিতে লেখকের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ও পুঙ্খানুপুঙ্খ মানবচরিত্র পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আলেখ্য হিসাবেও গ্রন্থখানি উপভোগ্য হইয়াছে। লেখক সত্য সুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক—গ্রন্থের অঙ্কিতচিত্রে কোথাও অতিরঞ্জন বা মিথ্যার তুলিকাপাত নাই। রাঢ়পল্লীর যে কোন' ব্যক্তিই ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন।

কোন' উদ্দেশ্য লইয়া কলাসাহিত্য রচিত হয় না, গ্রন্থে কোন' সদাপ্রবৃত্ত সচেষ্ট উদ্দেশ্য নাই—তবে যদি কেহ উদ্দেশ্য খুঁজেন তিনি চেষ্টা করিলে পাইতেও পারেন—গৌণ সার্থকতা অবশ্যই একটা আছে বৈকি!

বঙ্গের নবোদ্দীপ্ত নাগরিক জীবনের গণ্ডীর বহির্ভাগে বঙ্গের পল্লীসমাজ এখনো শিক্ষাদীক্ষা নীতি ধর্ম্ম রুচি প্রবৃত্তিতে কি অবস্থায় আছে—এ গ্রন্থের পত্রে পত্রে তাহার বার্ত্তা পাওয়া যায়। শিক্ষিত সংস্কারার্থী পুরবাসিগণের মনে রাখিতে হইবে—ঐ শ্রেণীর অধিকাংশ লোক লইয়াই আমাদের বাঙালী জাতি।

মূঢ়গর্ব্ব জাত্যভিমানে যাঁহারা অন্ধ—'জাতের' খোঁজ লইয়া আজিও যাঁহারা মনুষ্যত্বের বিচার করেন—তাঁহারা যেন মনে রাখেন এ গ্রন্থে যাহাদের শিক্ষাদীক্ষা চরিত্র অবিকল অভ্রান্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহারাই তাঁহাদের অধিকাংশ সবর্ণ সগোত্র ও স্বজাতি।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে ২.১টী কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে করি। লেখক প্রযুক্ত ব্যক্তিগণের মুখে বীরভূমের গ্রাম্য ভাষা বসাইয়াছেন—তাহাতে বৈচিত্র্য ও স্বাভাবিকতা রক্ষিত হইয়াছে—কিন্তু অন্যান্য জেলার পাঠকগণ তাহা ভাল বুঝিতে পারিবে না। উপন্যাসে নানা ভাষাভাষী পাত্র পাত্রী থাকিতে পারে; সকলেই যদি আপন আপন ভাষায় কথা কহে—তাহা হইলে খুব স্বাভাবিক হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে কি প্রাঞ্জলতা ও স্বচ্ছতা

নষ্ট হয় না? পল্লীগ্রামের কৃষকদিগের অশিক্ষিত লোকেরা কথায় কথায় নানা প্রকার গালাগালি দেয়—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সত্য। লেখক ও পাঠকের সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, গালাগালি ও ইতরোক্তি নির্ব্বাচনে লেখনীর সংযমের প্রয়োজন আছে। ইতর লোকের রসনায় ভদ্রকালী বিরাজ করেন না—কিন্তু সুসভ্য লেখকের লেখনীতে ভদ্রকালীর আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায়। ইতর লোকেরা অনেক অশ্লীল শব্দ সর্ব্বদাই প্রয়োগ করে—উহা তাহাদের পক্ষে আরো সত্য আরো স্বাভাবিক—কিন্তু সত্য ও স্বাভাবিকতার খাতিরে সেগুলিকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া যায় না।

ফাল্গুনে

খদ্দর চলিতে পারে কি না—এই সোজা কথায় বিরুদ্ধ বাদ চলিতেই পারে না যে আমাদের পেটের ভাত ও পরণের কাপড়ের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইলে চলে না। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে অনেক কথা লিখিয়াছি; এ বারে কেবল পরণের কাপড়ের কথাই আলোচনা করিব,—যে ভাবে খদ্দর চলিতেছে তাহা চলিতে পারে কিনা তাহার আলোচনা করিব। সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে চরকা ধরা চলে কিনা, সে তর্কও এবারে তুলিব না,—যে চাষা ও শ্রমজীবীদের তুলা পিঁজিবার ও সূতা কাটিবার অবসর আছে ও থাকা উচিত, তাহারাও আপনাদের ব্যবহারের জন্য খদ্দর তৈরি করিতে পারে কিনা, তাহার বিচার করিব। গোড়াতেই কিন্তু এই কথাটা বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে যাহারা খাস তাঁতের ব্যবসা চালাইবে না তাহারা ছাড়া অন্যে তাঁত চালাইয়া কাপড় বুনিতে শিখিতে পারে না। যাহাদের নিজের জন্য খদ্দর চাই তাহারা কেবল সূতা কাটিয়া তাঁতিকে দিয়া কাপড় বুনাইয়া নিতে পারে। এই তুলা পেঁজা ও সূতা কাটা সোজা কথা নয়; উহার জন্য শিক্ষা চাই,—কেবল চরকা হাতে নিয়া নিজে নিজে শিক্ষানবিসি করিতে করিতে পাকা কাজ করিতে শিখিতে পারা যায় না। সে কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদি দেখি যে কি ভাবে খদ্দরের সূতা তৈরি হইতেছে ও খদ্দর হইতেছে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে খদ্দর চলিতে পারিবে কি না।

স্বীকার করিতেই হইবে যে খদ্দর যদি সস্তা না হয় ও টেকসই না হয় তবে একটা ঝোঁকের মাথায় বেশি দিন এ কাজ চালাইতে পারা যাইবে না। প্রত্যেক চাষা যদি নিজের ব্যবহারের কাপড়ের উপযোগী তুলার চাষ করিতে না পারে তবে তাহাকে তুলা কিনিতে হইবে বাজারে; সকলেরই যে পেটের ভাতের সংস্থানের জমিটুকু ছাড়া তুলা চাষ করিবার জায়গা জমি নাই, তাহা আমরা জানি। প্রথমে খদ্দরের জন্য যদি তুলা কিনিতে হয় বাজারে, তবে খদ্দর সস্তা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। একখানি কলের কাপড়ে যত তুলা লাগে, খদ্দরে তাহার চেয়ে ঢের বেশি তুলা লাগে। যাহারা কেবল আপনাদের ব্যবহারের জন্য খদ্দর তৈরি করিবে তাহারা যদি আপনাদের চাষের জমিতে প্রয়োজনের তুলাটুকু না পায় তবে কলের কাপড় কেনার চেয়ে খদ্দরের জন্য খরচ হইবে অনেক বেশি, আর সে খরচ করিয়াও অন্য রকমে কষ্ট ভুগিতে হইবে অনেক। তাহার পর নিজেদের পেঁজা তুলায় যে সূতা কাটা হয় সে সূতা কিছুতেই তেমন আঁতমারা ও মসৃণ সূতা হয় না যেমন কলে কাটিলে হয়। এই কেঁকড়া-তোলা ঢিলা সূতা কত সহজে ছেঁড়ে আর উহা দিয়া কাপড়ের ঠাস বুনান কত কঠিন, তাহা বুঝাইতে হইবে না। বেশি তুলায় ও ঢিলা সূতায় ভারি ওজনের যে খদ্দর হইবে তাহার দাম পড়িবে বেশি, ও ছিঁড়িবে

অল্প সময়ে। অন্যদিকে আবার দেখ, যে সূতা কাটিবে সেই যদি নিজে না তাঁত চালায় তবে এই বেশি খরচের উপর অতিরিক্ত তিনগুণ খরচ চড়িবে। তাঁতের ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যে যে তাঁত রাখিতে পারে না ও বিশেষ করিয়া তাঁত চালান শিখিতে পারে না সেটা অতি স্পষ্ট কথা। যাহারা চাষ প্রভৃতির কাজ করে তাহাদের বাড়ীতে যে তাঁত রাখিবার স্থান করাই অসম্ভব আর তাঁতের ব্যবসায়ী না হইলে যে কেবল অবসর সময়ে তাঁত চালাইবার কাজ শেখা যায় না তাহাও নিশ্চিত। সূতা তাঁতিকেই দিতে হইবে, নহিলে চলিবে না। তাঁতিরা মসৃণ ও আঁট সূতায় কাপড় বুনিয়া দিতে যত পারিশ্রমিক চাহিবে নিদানপক্ষে তাহার দেড়া অধিক পারিশ্রমিক না পাইলে খদ্দরের সূতায় কাপড় বুনিতে কিছুতেই রাজি হইবে না ও হইতেছে না। এই দুর্ম্মূল্য খদ্দর পরিষ্কার রাখা ও ধোলাই করা কি কঠিন তাহাও জানা আবশ্যক। ধোবারা এখন সর্ব্বত্র যে সস্তা সাবান ব্যবহার করে (ও যাহা ব্যবহার না করিলেও চলে না) তাহাতে কষ্টিক্ আলকালি বেশি থাকে, ও উহা খদ্দরের সূতাকে একেবারে জীর্ণ করিয়া দেয়। যাহারা সাবান না দিয়া নিজেদের ঘরে জলকাচা করিয়া কাপড় সাফ্ করিবে, তাহারা এক মাসেই দেখিতে পাইবে যে তাহাদের খদ্দরের সূতা একেবারে পচিয়া উঠিবার মত হইয়াছে। সাবান ছাড়িয়া যে আগেকার মত ধোবারা কলাগাছের বাস্না প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া খার তৈরি করিবে, তাহা এখন বড় বড় পাড়া গাঁয়েও অসম্ভব হইয়াছে। যাহারা বলিবেন—লাগুক বেশি খরচ, হউক অপব্যয় তবুও দেশ রক্ষার জন্য খদ্দর চালাইব, তাঁহাদের সঙ্গে অর্থনীতির জটিল তর্ক না তুলিয়া এই সোজা প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যে কতদিন কত লোকে ঝোঁকের মাথায় টাকা খরচ করিয়া নিজেরা টিকিতে পারে ও খদ্দরকে টেকাইতে পারে। দেশের টাকা দেশে আছে ভাবিলে দরিদ্রের পেট ভরিবে না, ও প্রয়োজনের তাড়নার সময় দরিদ্রেরা টাকা পাইবে না। ব্যবসায়ের হিসাবে ত খদ্দর চলিতেই পারে না, আর যে সকল বাধার কথা বলিয়াছি উহা দূর করিতে না পারিলে লোকসাধারণের পক্ষে নিজের ব্যবহারের জন্যেও খদ্দর প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না। পরিবার কাপড় মানুষের প্রয়োজনের একটা প্রধান সামগ্রি বটে, তবে প্রত্যেক লোকের পক্ষেই অথবা চাষা ও শ্রমীর পক্ষেই উহা তৈরি করা সুবিধাজনক না হইলেও যে করিতেই হইবে, এ ধরণের জিদ ধরিলে চলিবে না। চাষা ও শ্রমীরা অন্য কত উপায়ে তাহাদের আয় বাড়াইতে পারে, আর সেই আয়ে ভাত কাপড়ের অভাব ঘুচাইতে পারে, তাহার স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন; এখনকার অবস্থায় খদ্দর যে চলিতে পারে না, আর উহার জন্য আন্দোলনে যে সময় ও টাকা নষ্ট হইতেছে,—অর্থাৎ ক্ষতি হইতেছে, ইহাই এবারে আলোচিত হইল।

ওড়িশার ভবিষ্যৎ—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ দাস প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, যত স্থানে ওড়িয়া ভাষার চলন আছে, সেই স্থানগুলি এক সঙ্গে এক প্রদেশে ফেলিয়া, একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ওড়িশা প্রদেশ গড়িবার দিকে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ আছে কি না। সদস্যদের মধ্যে অনেকে প্রশ্নটির গুরুত্ব অনুভব করেন নাই, আর বেহারের কেহ কেহ ওড়িশাকে তুচ্ছ মনে করিয়া নিজেদের গৌরবের টানানে উপহাস করিতেও ছাড়েন না। কংগ্রেসের সভায় আমাদের হিতৈষণা বা পোষাকি হিতৈষণা বাড়িতেছে, কিন্তু যাহাকে দায়িত্ব বোধ বলে তাহা তেমন জন্মিতেছে না। হয়ত কাহারও কাহারও মনে তাঁহাদের হিতৈষণার বুদ্ধির তলায় এক শ্রেণীর পর-বিদ্বেষের পাপ আছে, যে পাপে কলুষিত হইলে মানুষের পক্ষে নিজেদের ঘরের অপরকেও প্রীতির চোখে দেখা সম্ভব হয় না। শত্রুতা সাধনের জন্য মনে পাপ পুষিলে সে পাপ

মানুষকে অন্ত সম্পর্কেও শুদ্ধ থাকিতে দেয় না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ যদি সমানে উন্নত হইতে না পারে,—যদি কোন ক্ষুদ্র প্রদেশও উন্নতির পথে বাধা পায়, তবে যে আমাদের সকলের উন্নতির পথ রুদ্ধ, এই চেতনা কি এখনও জাগে নাই ? আমার অভিজ্ঞতায় জোর করিয়া বলিতে পারি যে ওড়িশার ভদ্র লোকেরা বেহারের কোন ভদ্র শ্রেণীর লোক অপেক্ষা মানসিক শক্তিতে হীন নহেন, আর ওড়িশার সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও বেহারের সাধারণ শ্রেণীর লোকের নীচের স্তরে নাই। এই ওড়িশার লোকেরা নূতন নিয়ন্ত্রিত প্রদেশে বেহারীদের চাপে অনেক সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন কিনা ও শিক্ষা পাইবার পথে ব্যবস্থা বিশেষের ফলে গুরুতর বাধা পাইতেছেন কিনা, তাহার বিচার না করিয়া যদি বেহারীরা কল্পিত বড়মানুষী টানানে ওড়িশাকে উপেক্ষা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা কাশী কোশল মিশাইয়া মগধ সাম্রাজ্য গড়িবেন ও ওড়িয়াদের কথা ভাবিবেন না, তবে যত শীঘ্র ওড়িশার লোকেরা বেহারের সম্পর্ক ছাড়েন ততই মঙ্গল।

সম্বলপুর এলাকার পদমপুর তালুক ও উহার কাছেকার যোগিনী গ্রামগুলি সম্পূর্ণ ওড়িয়া হইলেও বিলাসপুর এলাকায় গিয়াছে আর তাহার ফলে ওড়িয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা উঠিয়া গিয়া জোর-জুলুমে হিন্দী চলিতেছে। ফুলঝর এলাকার শতকরা ৫৭ জন লোকের পক্ষেও সেই দুর্গতি ঘটিয়াছে ; ফুলঝর জমিদারিতে যাহারা লরিয়া ভাষায় কথা কয় তাহারা সকলেই ওড়িয়া জানে, আর সম্বলপুর এলাকায় এই লরিয়া-ভাষীরা হিন্দী অপেক্ষা ওড়িয়া শিখিতে বেশি ভালবাসে ; অন্তদিকে ঐ এলাকার ওড়িয়ারা ওড়িয়া ছাড়া কিছু জানে না। এ অবস্থায় রায়পুর ও বিলাসপুর জেলার ব্যবস্থায় হাজার হাজার লোকের মানসিক উন্নতির পথে যে বাধা জন্মিয়াছে তাহা উপেক্ষা করিবার সামগ্রি নয়। পাটনায় নানা দিকের উন্নতির যে সকল ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে ওড়িশার লোকেরা কেন সমানভাবে উপকৃত হইতে পারে না ও কেন ওড়িয়ারা বেহারীদের সমানভাবে উপার্জ্জনের সুবিধা পায়না তাহা জানিয়াও যাঁহারা ওড়িশাকে উপেক্ষা করেন তাঁহাদিগকে যদি এদেশের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র বলিতে হয়, তবে দেশের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হয় না। নিশ্চয় জানি, ওড়িশার কৃতী পুরুষেরা তাঁহাদের উন্নতির পথের বাধা এড়াইতে উৎসাহী ও উদ্যোগী হইবেন।

সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি পরিশিষ্টভুক্ত প্রদেশ—ইংরেজ রাজত্বের প্রথম আমলে সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি কতকগুলি প্রদেশকে সাধারণ আইন-কানুনের বইএর পরিশিষ্টে এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, যে সাধারণ আইন-কানুন দিয়া সেই সেই প্রদেশগুলির শাসন ও বিচার প্রভৃতি চালান হইবে না ; তাহার একমাত্র কারণ ছিল যে, ওই সকল প্রদেশের লোকেরা অনুন্নত ও সেই জন্ত উন্নতদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট বিধান চালাইলে তাহাদের ক্ষতি করা হইবে। এখন সেই বিশেষ বিধি রহিত করিবার অনুকূলে ব্যবস্থাপক সভায় যাহারা প্রস্তাব তুলিয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করি, কিন্তু প্রস্তাবকারীরা ঐ বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য ধরিয়া গবর্ণমেণ্টকে যে, পাপবুদ্ধিতে চালিত বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। ঐ বিধান রচনার দিনে কেন, আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অকপট বিশ্বাস, যে ঐরূপ বেড়া দিয়া রাখিলেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাল ভাবে রক্ষিত হয়। এটা ভ্রান্ত ধারণা ; কিন্তু ইহা যে ভ্রান্ত ধারণা তাহা অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই নৃতত্ত্বের বিচারের দৌলতে সভ্য সমাজের লোকেরা বুঝিয়াছেন। কাহারও গায়ে যদি দাগিয়া দেওয়া যায় সে অনুন্নত, আর তাহার রক্ষার জন্ত যদি সর্ব্বদাই বিশেষ নিয়ম চালান

যায়, তবে সে যে চিরকালের মত উন্নতি হারায় ও মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হয় একথা যদি সদস্যেরা নিজেরাই ভাল করিয়া বুঝিতেন, তবে মুসলমানদের সর্ব্বনাশের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চাহিতেন না ও একটা নির্দ্দিষ্ট শতকরায় তাহাদের চাকুরি দিবার জন্য "পেক্ট" আঁটিতেন না। মনে হয় সদস্যেরা এ সম্পর্কের মৌলিক নীতিটি ষোল আনা বুঝিয়া ও ধরিয়া কাজ করেন নাই,—কোন কোন বিশেষ কারণ লক্ষ্য করিয়াই প্রস্তাবটি তুলিয়াছেন। নহিলে এরূপ প্রস্তাব অতি ক্রোধের ভাষায় আলোচিত হইত না।

সাঁওতাল পরগণা হইতে কন্ধমহল পর্য্যন্ত যাহারা বনে ও পাহাড়ে বাস করে, তাহারা যে, উন্নতি লাভে সুযোগ-সুবিধা পাইলে উন্নতির গর্ব্বে স্ফীতদের অপেক্ষা অনুন্নত থাকিবে না, একথা কয়জন বোঝেন? ইউরোপে ও আমেরিকায় যদি শিক্ষিত মাত্রেই একথা বুঝিতেন, তবে Boaz Zaborowski Finot প্রভৃতিকে বড় বড় বই লিখিয়া ধর্ম্মের ও কর্ত্তব্যের নামে দোহাই পাড়িতে হইত না।

একথা মানি অনেক ইংরেজ গবর্ণমেন্টের লোকেরা আত্মজাতীয়দের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধিতে হয়ত অতর্কিতে ইউরোপীয় মিশনরী দিগকে ও কুলি সংগ্রাহকদিগকে অনুন্নতদের মধ্যে স্বাধীন গতিবিধির ব্যবস্থা দিয়াছেন, ও তাহার ফলে অনুন্নতেরা উন্নতির নামে আপনাদের সমাজনিষ্ঠ অনেক পবিত্রভাব হারাইতেছে। ইহার বিচার করিতে হইলে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এখানে এইটুকুই কেবল বলিব,—যেখানে অনুন্নতেরা খৃষ্টান হইতেছে অথবা আত্মসমাজ হইতে তাড়িত হইতেছে সেখানে বেইন্স প্রমুখ লোকেদের রিপোর্টে এক বিন্দুও আপত্তির কথা দেখা যায় না, আর যেখানেই ঐ অনুন্নতেরা আপনাদের ইচ্ছায় ও প্রাণের টানে এদেশের লোকেদের ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ করিতেছে, অথবা যেখানেই উহারা এদেশের অন্য লোকের সম্পর্কে আসিতেছে, সেখানেই রিপোর্ট-কর্ত্তারা করুণায় গলিয়া লিখিয়া থাকেন যে, অনুন্নতেরা আপনাদের প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব হারাইতে বসিয়াছে। একটি বিষয়ে গবর্ণমেন্টের কাজে ইহাদের প্রতি গুরুতর অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হইতেছে। কেবল জাতীয়দের স্থায়ী সামাজিক প্রথা আছে, তাহারা সকল শুভ অনুষ্ঠানে ও পরিশ্রমের লাঘবের জন্য নিজেদের তৈরি এক রকমের মদ খায়, যাহার প্রাচীন নাম ছিল "বড়েং"। উহা যে বহু পরিমাণে খাদ্য, আর অতি অল্প পরিমাণে মাদক, অনেকে তাহার খবর রাখেন না। উহারা মদে আসক্ত দেখিয়া গবর্ণমেন্ট অতি সস্তায় যেরকমের অধিক নেশার মদ যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাকে কোলেরা "অরখি" বলে; spirit অর্থে মুসলমানী আরক শব্দ হইতে ঐ অরখির উৎপত্তি। অখি খাইয়া অনুন্নতদের সর্ব্বনাশ হইতেছে,—আর এ বিধানও আছে যে উহারা নিজেদের অক্ষতিকর মদ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক প্রস্তুত করিলে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ডের ভয়ে অক্ষতিকরের স্থলে অনিষ্টকর পদার্থের প্রসার বাড়িতেছে। আমার মনে হয় যে, যাঁহারা অনুন্নতদের সহিত পরিচিত তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা গবর্ণমেন্টের কাছে উপযুক্ত ভাবে আইন পরিবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলে ভাল হয়।

Editor : Bejoychandra Majumdar
Printed by Satyakinkar Bandopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Harrison Road [illegible] Calcutta.

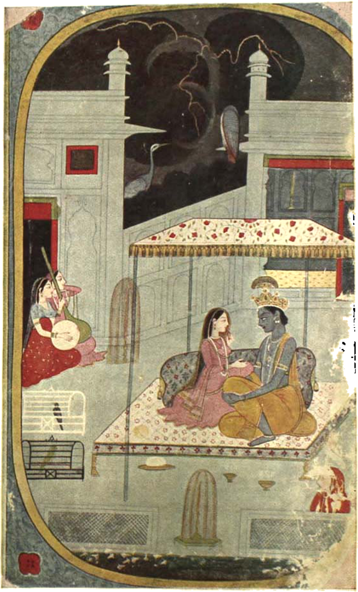

রাধা কৃষ্ণ

(মোলারাম অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে

চিত্রাধিকারী—শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ
মহাশয়ের সৌজন্যে।

THE INDIAN ART SCHOOL

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৩৩৩-'৩৪

চৈত্র

প্রথমার্দ্ধ
২য় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে লিখিত)

(৫)

ওঁ

বোলপুর

বিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের চিঠি পাঠাইতেছি। ইহা হইতে তাঁহার অভিপ্রায় ও তিনি কি কি কাজে কিরূপ ব্যাপৃত আছেন বুঝিবেন। পারিশ্রমিকের কথা পড়িয়া দেখিয়া যদি কিছু বাড়াইতে পারেন ত ভাল নতুবা ব্রাহ্মণ যাহা পাইবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। বইগুলি যদি ইতিমধ্যে আনাইয়া দিতে পারেন তবে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে বিলম্ব হইবে না।

আমিও আমার বিদ্যালয় দেড় মাসের জন্য বন্ধ করিয়া বিশ্রামের চেষ্টায় আছি। ইতিমধ্যে শিক্ষা-পরিষদের জন্য আমার সাহিত্য প্রসঙ্গ চতুর্থ কিস্তি লেখা হইয়াছে—পরিষদের ছুটি ফুরাইলে কোনো একদিন পড়িয়া আসিব—কিন্তু আপনাকে কি সভায় উপস্থিত দেখিতে পাইব? না পাইলে ও আপনার চিরপ্রসন্ন মুখ না দেখিলে আমার পড়িয়া সুখ হইবে না।

রংপুর আমার প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব সুরু করিয়াছেন। আমার সন্দেহ হইতেছে আপনারা এই চক্রান্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। দৈব লক্ষণ কি আপনারা একেবারেই মানেন না? ইংরেজি শিখিয়া কি আপনাদের এই দশা হইল? এই বেলা আপনাদের রংপুরের শাখাটিকে সাবধান করিয়া দিন। দোহাই আপনাদের—আমার ত আর সভাসমিতি এবং টানাটানি সহ্য হয় না। কি উপায় অবলম্বন করিলে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব তাহার একটা উপায় বলিয়া দিবেন।

আশা করি ভাল আছেন ও আনন্দে আছেন। ইতি ১৯শে বৈশাখ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬)

ওঁ (পোষ্টমার্ক বোলপুর)

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন এখানে আসিয়াই তিনি শতপথ ব্রাহ্মণ যেখানে যাহা পাওয়া সম্ভব আনাইয়া লইবেন। তাঁহার আসিতে আর প্রায় দুই সপ্তাহ আছে। তিনি একবার কাজে লাগিলে তাঁহার বিলম্ব বা শৈথিল্য দেখিতে পাইবেন না—এ সকল কাজে তাঁহার নিষ্ঠা আশ্চর্য্য। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭)

ওঁ কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রাংশ আপনাকে পাঠাই যথাবিহিত ব্যবস্থা সত্বর করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি বলেন ত তাঁহাকে আমি এখনি কাজে লাগাইয়া দিব।

আমি এবার বরিশাল ও চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। দুই জায়গাতেই সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা জানিতে চান তাঁহাদের জেলা হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। একটা প্রশ্নের তালিকার মত করিয়া দিলে জেলার নানা স্থান হইতে তাহার উত্তর তাঁহারা আনাইয়া লইতে পারেন। ভিন্ন জেলার উপভাষাগুলির তৌলন ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহারও বিবরণ চান। একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া এই কাজটা সারিয়া ফেলুন। মফস্বলের লোকদিগকে একবার ধরাইয়া দিলেই অতি সহজেই আপনারা সফলকাম হইবেন। দেরি করিবেন না। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ১১ই আষাঢ় ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮)

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় শতপথ সুরু করিয়া দিয়াছেন। এখানে সোসাইটির প্রকাশিত শতপথ তিন ভল্যুম আছে—সেই পর্য্যন্ত শেষ করিতেই অনেক দিন লাগিবে। ইতিমধ্যে বাকি অংশ বাহির হইয়া যাওয়া সম্ভব—অথবা অন্যত্র হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। মোদ্দা কথা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় একবার যখন শতপথ লইয়া পড়িয়াছেন তখন উনি ফিরিবেন না।

আমি দীর্ঘকাল এখানে অনুপস্থিত ছিলাম। এখন যে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আবার কলিকাতা যাতায়াত করিব এমন সম্ভাবনা বিরল। যদি কোনো জরুরি কাজে নাকে দড়ি দিয়া কলিকাতায় টানিয়া লইয়া যায় তবেই রাজধানীতে আমার শুভাগমন হইবে এবং তদুপলক্ষে প্রবন্ধ পাঠ করাও অসম্ভব নহে। আপনি একবার দয়া করিয়া এখানে পদার্পণ করিবেন আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা—সে কি একেবারেই সম্ভাব্যের বাহিরে? এখানে আসিলে মফস্বল পরিষদের সম্বন্ধেও আলোচনা হইতে পারিবে। ইতি ১৭ই আষাঢ় ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯)

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র পড়িয়া দেখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। পণ্ডিত রমেশচন্দ্র বেদান্ত বিশারদ মহাশয়কে আমি জানি। ইনি কাশীতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন—সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অধিকার সাধারণ পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশি। লোকটি অত্যন্ত ভাল। ইঁহার সহিত পরিচয় হইলে আপনি খুসি হইবেন। ইতি ১৩ই শ্রাবণ ১৩১৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মফস্বল সাহিত্য পরিষদের শাখাগুলির জন্য একটা প্রশ্নাবলী তৈরি করার কি হইল?

(১০)

(পোষ্টমার্ক—বোলপুর,
ওঁ ৩রা আগষ্ট, ১৯০৭)

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

হঠাৎ কন্যার পীড়ার সংবাদে বোলপুরে আসিতে হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদের সাহায্য জন্য যে কয়খানি বইয়ের দরকার তাহার তালিকা আপনাকে পাঠাইয়াছি। তাহার একটা ব্যবস্থা করিবেন। তিনি তাঁহার কাজে প্রবৃত্ত আছেন। আদর্শ স্বরূপ আপনার অনুবাদখানি দেখিবার জন্য তিনি উৎসুক আছেন—কবে পাওয়া যাইবে? অনেককাল আপনাদের কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। কেমন আছেন, কি করিতেছেন, কি বুঝিতেছেন, কি পরামর্শ এ সমস্তই মাঝে মাঝে জানিতে ইচ্ছা হয়। ইতি শনিবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১১)

ওঁ শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় শতপথ ব্রাহ্মণের কতকটা অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। ছাপা আরম্ভ করাই তাঁহার ইচ্ছা। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইলে গ্রাহক ও অনুবাদক উভয়েরই উৎসাহ হয়। নতুবা এত বড় বৃহৎ গ্রন্থ সম্পূর্ণ সমাপ্ত করিয়া ছাপিতে দিলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে—সেটা ঠিক সঙ্গত হইবে না বলিয়া বোধ করি। এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আমাকে জানাইবেন। অন্তত আগামী বৈশাখ হইতে যদি প্রকাশ আরম্ভ হয় তবে এখন হইতে গ্রাহকদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিতে পারেন। মাসে মাসে বা প্রতি তিন মাসে বাহির করিবার কোনো বাধা দেখি না।

আপনার শাশুড়ি ঠাকুরাণীর যেরূপ পীড়ার সংবাদ জানিতাম তাহাতে এসময়ে আপনাকে এ পত্র লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। আশা করি আপনারা ভালই আছেন। ইতি ২৬শে পৌষ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১২)

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনি ত বাসা বদল করিয়া বড় মুস্কিলেই ফেলিলেন। নূতন বাসার নাম ও নম্বর এ বয়সে আয়ত্ত করা কঠিন হইবে। যদি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র না পান ত নিশ্চয় জানিবেন আপনাকে ভুলি নাই কিন্তু আপনার বাসা ভুলিয়াছি।

কন্‌ফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানাপক্ষ হইতে গালি-সংযুক্ত এত বেনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি যে কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম কন্‌ফারেন্স মঞ্চে যখন মাথায় কেহ চৌকি ছুঁড়িয়া মারিবে তখন তাহাকে হাত জোড় করিয়া বলিব—বাবা, তুমি কোন্ পক্ষের লোক আমাকে বলিয়া যাও—তাহা হইলে আমি যে কোন্ দলে আছি সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। চৌকি কেহ মারে নাই এবং দুইদলেই আমাকে বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন সুতরাং আজও নিষ্পত্তি হইল না।

"ধ্বনিবিচার" পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এইভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আমি কেবল একটা আভাসমাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে এই পন্থা ধরিয়া আলোচনাটিকে আরো অনেক শাখা প্রশাখায় বাহিত করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে করি। যথা, ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদ্যক্ষর সম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন অন্ত্যাক্ষরেও তাহা বিস্তারিতভাবে খাটাইয়া দেখা কর্ত্তব্য—কচ্‌কচ্ (চ), কট্‌কট্ (ট), কন্‌কন্ (ন), কর্‌কর্ (র), কল্‌কল্ (ল), কস্‌কস্ (স)—এই শব্দগুলির আদ্যক্ষর একই কিন্তু অন্ত্যাক্ষরের পার্থক্যে কেন পৃথক অনুভূতি প্রকাশ হইতেছে তাহা আপনার প্রদর্শিত নিয়মানুসারে ব্যাখ্যা করা এক্ষণে সহজ হইয়াছে। আপনিও যে ইহার আলোচনা করেন নাই তাহা নহে। প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা বিশেষ মূর্ত্তি আছে এবং সেই জন্যই সেই সকল ধ্বনির সমবায়ে অনুভূতিমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দ অন্তত বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে এ তত্ত্বটি আপনার প্রবন্ধে সুন্দর করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

আমি চৈত্রমাসটা এখানে কাটাইয়া তবে কলিকাতার দিকে ফিরিব এইরূপ অভিপ্রায়—বিধাতার অভিপ্রায় কি তাহা জানি না। আমাকে আপনি এখনো নূতন কর্ম্মে জুড়িয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছেন? আমার কি সেই বয়স? আমার বনগমনের কাল প্রায় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

এখন কেবল পাকা দাড়ি নাড়িয়া দূর হইতে পরামর্শ দেওয়াই আমাকে শোভা পাইবে—আর কি কাজ করিতে পারিব ? এমন কি, কলমটাকেও বিসর্জ্জন দিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। যে হতভাগ্য ঠিক জায়গাটাতে থামিতে জানে না সে যে তালকানা—আশা করি আমার এ ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। ইতি ১১ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ক্রমশঃ প্রকাশ্য

জরা-প্রশস্তি

হে বৃদ্ধ, প্রবীণ গুরু, বন্দনীয় তোমারে প্রণাম।
বানপ্রস্থ-তপোবনে তব আজি মোর ক্ষণেক বিশ্রাম।
রেখাশত, শুষ্ক শীর্ণ ওই তব কম্প্র দেহ ভরি
অতীতের ইতিবৃত্ত লোলচর্ম্মে উঠিছে শিহরি
জরাছিন্ন অস্পষ্ট অক্ষরে। সৃষ্টির উদ্বেগ-গ্লানি,
অসম্পূর্ণ জীবনের সিদ্ধিহীন সাধনার বাণী,
অব্যক্তের গুঢ় অপ্রকাশ ওই মৌন মর্ম্মমাঝে
প্রচ্ছন্ন বেদনারূপে ধ্যান-তন্দ্র গাম্ভীর্য্যে বিরাজে।

যেমনি এ বৃদ্ধ অশথ অনন্ত-অনাদিকালে
তপোময় বিশ্বের আশ্রমে। বর্ষাক্ত প্রাবৃষ-ভালে
পড়িয়াছে নবীন কুঙ্কুম, পর্ব্বত-পঞ্জরে যথা
রক্তপুষ্প সঞ্চয়ে নিরত, ধ্বস্ত ছিন্ন শুষ্ক যথা
অরণ্যের শাখে শাখে স্তিমিত নবীনপত্র কাঁপে ;
বক্ষের ভিতরে তার ধ্বনি উঠে আত্মার বিলাপে।
যেথায় নিগূঢ় ধ্যানে জাগে চির মুক্তি-অন্বেষণ,
নিত্য নব আকাঙ্ক্ষা-উন্মেষে তরুণের তূর্ণ মন
গতি-মত্ত নৃত্য করি উঠে ; অসংখ্য ভঙ্গিমা দিয়া
পরম-আনন্দ মূর্ত্তি চাহে প্রকটিতে। ক্ষুব্ধ হিয়া
উঠে কাঁদি কাঁদি, সীমা খুঁজি নাহি পায়, ক্ষুদ্র হতে
বৃহতে ছুটিয়া চলে ; হায়, শুধু দীর্ঘতর পথে
সুদূরের চক্রবালে দীর্ঘ দৃষ্টি ভাসে অশ্রুবানে,
ক্লান্ত শ্রান্ত দেহখানি বার্দ্ধক্যের সন্নিকট শ্মশানে
থমকি দাঁড়ায় আসি। পশ্চাতের পদচিহ্নগুলি
সমার্দ্র করিয়া তোলে সরণির রক্তবর্ণ ধূলি।

হে বৃদ্ধ, স্থবির মুনি, তাই তব পলিত মস্তকে
অপূর্ণ-কামনা-স্রোত: শুভ্রকেশে তুষার-স্তবকে
আছে রুদ্ধ হয়ে। হে প্রশান্ত, তবু তুমি অচঞ্চল
অজ্ঞেয়ের অনিশ্চয়ে দাঁড়ায়েছ ধৈর্য্যে বাঁধি বল।
জ্ঞান-নত যষ্টিখানি অন্ধকারে দিয়াছ বাড়ায়ে,
অপ্রশস্ত পন্থা-রেখা ফিরে পাও হারায়ে হারায়ে।

প্রাচীন আচার্য্য ঋষি, মানবের পিতৃ-পিতামহ,
তোমার তপস্যা-মন্ত্র অনুদ্ভাত আলো অন্বহ
অজ্ঞানের তিমির-গুহায়। তুমি জান নাকি হায়
তোমারি তুষার-পুঞ্জ দ্রব হয়ে সহস্রধারায়
দিকে দিকে চলিয়াছে প্রবাহি, তাহারি উচ্ছল নীরে
মঞ্জরিল জীবন্ত যৌবন ; দুপাশে তাহারি তীরে
চিতা-বহ্নি উঠে জ্বলি। জীবনের তত্ত্ব পরিণাম,
হে বৃদ্ধ, চরণে তব নবীনের সহস্র প্রণাম।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

রূপের মান ও পরিমাণ

রসের আশ্রয় হ'ল রূপ—"আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়" (ভারতচন্দ্র)। হাওয়ার রূপ নেই, কিন্তু আলম্বন ভেদে বাতাসের স্বাদ ও গতির ভেদাভেদ স্থির করে নিই আমরা, যেমন—তাল পাখার হাওয়া, কুলোর বাতাস, ইলেক্‌টীক ফেনের বাতাস, চামরের বাতাস, আঁচলের বাতাস, বিলেতের হাওয়া, মালেরিয়ার হাওয়া, উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম হাওয়া! রস-শাস্ত্রকার তাঁরা এই আশ্রয়-ভেদ নিয়ে রসের ভেদ স্থির ক'রে বল্লেন আদি করুণ ভয়ানক বীভৎস—এই প্রকার নয় রস। এই সব নানা রসের পাত্র তারা নানা রূপ এবং তাদের গড়ার বাঁধাধরা মাপ-যোগ শিল্প-শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়, অঙ্কশাস্ত্রেও চতুষ্কোণ ত্রিকোণ দীর্ঘ হ্রস্ব বৃত্ত এমনি নানা রূপের সঠিক মাপ পাই আমরা। শাস্ত্রমতে রূপের আকার ও প্রকার হ'ল ষোল রকম—রূপন্তু ষোড়শ বিধম্—যথাঃ—হ্রস্ব দীর্ঘ স্থূল চতুরস্র ইত্যাদি ইত্যাদি হ'ল আকারের মাপ-যোগ নিয়ে, আকার রংয়ের মান পরিমাণ নিয়ে প্রকার ভেদ হ'ল আকার হয়তো রইলো ঠিক, যথা—রক্ত আরক্ত, পীত পাণ্ডু, কৃষ্ণ নীলারুণ, শুক্ল রক্ত, —তারপরে আবার বস্তুটির গুণাগুণ নিয়ে ভেদ হ'ল—দারুণ পিচ্ছিল চিক্কণ মৃদু ইত্যাদি ইত্যাদি।

একখান লাল বনাতে একখান লাল মখমলে সমান হলনা স্পর্শে, একপাট সাদা খদ্দরে একপাট সাদা সিল্কে সমান হলনা লাবণ্যে ও স্পর্শে। একটা তালগাছে আর একগাছা আখের ছড়ে সমান নয়, ডৌলে মাপে যদিও দুইই দীর্ঘ। একই আকাশ, কিন্তু দিনের আকাশে রাতের আকাশে সমান হল না, রূপে গুণে রংএ ও স্পর্শে বিষম ভেদ রইলো এতে ওতে। রূপের বহিরঙ্গীণ অংশের মাপ ডৌল থেকে স্থির করা গেল এবং দেখা গেল সেখানে দুটো এক মাপের ডৌল নেই—বর ও কন্যা রূপে গুণে দুই জনে আলাদা আলাদা, এর ডৌলে ওর ডৌলে কোন মিল নেই! স্বভাবের নিয়মে সবাই আলাদা মান আলাদা ডৌল পেলেম আমরা, বিয়ের মন্ত্র নিয়েও দুহাত এক করা গেল না, দক্ষিণ ও বাম যে আলাদা সেই আলাদাই রইলো।

সমান ডৌল সে সমপরিমাণ না হলে হয় না। স্বভাবের নিয়মে সমান সমপরিমাণ দুটো গাছ নেই। জগতে দুটো মানুষ সমান নয়, এমন কি হাত পা চোখ কান সেখানেও সমান মাপ দেখা যায় না! স্বভাবের গড়ন সমস্ত হ'ল অসম বিষম ছন্দে প্রস্তুত—সবার স্বতন্ত্র মাপ! বিশ্বশিল্পির রূপ-শৃষ্টির ধারা চলো অসম বিষম ছন্দে ও তালে! রূপের বৈচিত্র্য রসের বৈচিত্র্য এই লক্ষ্য ধরে গড়লেন বিশ্বকর্ম্মা, একের সমান আরেক নেই, নিজস্ব মানপরিমাণ নিয়ে সবাই সেখানে রূপবান এবং পরস্পর প্রমাণ ধরে সবাই সেখানে কেউ ছোট, কেউ বড়, কেউ দূর, কেউ নিকট, এমনি নানা আকারে প্রকারের হ'ল। কাছের বন সবুজ, দূরের বন নীল রূপ। কাছের তালগাছ দেখায় বড়, দূরের তালগাছ দেখতে ছোট। মানুষের পাশে কুকুরটি ছোট কিন্তু খরগোশের পাশে সে মস্ত বড় —পরস্পর প্রমাণ ব'লে। কেবল যা প্রতিবিম্ব প্রতিচ্ছবি সে ডৌলে মাপে সমানের নিয়ম ধরলে, কিন্তু

সেখানেও ভেদ রইলো দুয়ে—জলে পড়লো প্রতিবিম্ব ফুলের, সব দিক দিয়ে দুটো এক হ'য়েও হ'লনা—সত্য ফুলকে তোলা গেল ফুলের প্রতিবিম্বটি তোলা গেল না, ফুলে রইলো সৌরভ, প্রতিবিম্বে রইলো—না মধু না সৌরভ।

God created man in his own image! বিশ্বরূপ যিনি, বিশ্বরূপের কর্তা বিশ্বকর্ম্মা যিনি, তিনি—"স্বয়ং রূপ দর্পণে ধ'রে, মানব-রূপ সৃষ্টি করেছে" (লালন ফকির), "রূপাদর্শে তথাত্মনি"। বিশ্বকর্ম্মা তিনি স্বয়ং রূপ, তাঁর কৃত যা-কিছু তাদেরও স্বয়ং রূপ দিলেন তিনি! রূপ সাধকের মনের দর্পণে ঠিক ঠিক প্রতিবিম্বিত হয় রূপ এটা সুনিশ্চিত, কিন্তু সেই রূপই বাইরে প্রকাশ করলেন যখন সাধক তখন যেমনটি তেমনিটি ক'রে দেওয়া সম্ভব হলনা তাঁর পক্ষে। কাচের দর্পণ তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে কিন্তু সেই সে রূপের ভোগ নেই দর্পণের। আত্মার দর্পণে রূপের ভোগ হচ্ছে; ক্রিয়া চলেছে আত্মার। জলের ক্রিয়া আরম্ভ হওয়া মাত্রে স্থির চন্দ্রবিম্ব যেমন ভেঙ্গে হয় চাঁদমালা, তেমনি স্বয়ং রূপ সমস্ত প্রতিবিম্ব ফেলে আত্মার দর্পণে, আমার আত্মার ক্রিয়া তাদের দিলে স্বতন্ত্র ডৌল মাপ। যেমন পাই ভিজে কাদায় পায়ের ছাপ, তেমনি ক্যামেরায় সমানকে পেলেম—কতকটা সঠিক স্বয়ং রূপের পুনরাবৃত্তি, পেলেম একের মতো আর এক কিন্তু তবু সেটিকে স্বয়ং রূপ বলা গেল না, কারণ, অনেক দিক থেকে অনুকৃতি সে মিল্লো আসলের সঙ্গে আবার অনেক দিক থেকে মিল্লোও না—আসল সাপ দংশন করে কুণ্ডলী পাকায় চলে ফেরে মরেও, ফটোর সাপ তা করে না, আসল ফুল ফোটে গন্ধ বিলায় শুষ্ক হয় ঝরে যায়, ফটোর ফুল তা করে না। কাযেই এ ভাবের প্রতিবিম্ব সে খাটোই রইলো, স্বয়ং রূপের সমান হ'তে পারলে না, অনুরূপ কিন্তু স্বয়ং রূপ নয় মোটেই! ফটোটা ঠিক মানুষটি মান পরিমাণ ধ'রে ছাপানো গেল রংও করা গেল কিন্তু তবু দেখি মানুষটির স্বয়ং রূপের সঙ্গে অনেক খাটো রইলো সে! ফটো এই কারণে প্রমাণ করতে পারলে না যে সে একটি স্বয়ং রূপ!—স্বয়ং রূপ সে তার নিজস্ব মান পরিমাণ ও পরস্ব মান পরিমাণ নিয়ে সলীল গতিশীল সশ্বাস সনিমেষ জগৎ রূপের সঙ্গে স্বতন্ত্র এবং একও বটে, সে কারু সমান নয় কারু প্রতিধ্বনি প্রতিরূপ প্রতিবিম্বও নয়! ঠিক এরি উল্টো হলো ফটোগ্রাফ—সে একের অনুরূপ ও সমান। স্থির জলে উড়ন্ত পাখির প্রতিবিম্ব—সত্যি পাখির মতো সে উড়লো চল্লো বটে কিন্তু পাখি গাইলো কই! কলের পাখি সে চল্লে বল্লে কিন্তু খাঁচা খুলে দিলে পালালো না ধান ছড়ালে খেয়ে গেলনা! •

সমানের আদর আছে কাযের জগতে—একটা টাকা আর একটি টাকার সমান না হলে কায চলে না! স্বভাবের নিয়মে সমান দুটো কিছুই নেই কিন্তু দোকানে আফিসে স্কুলে সমান চেয়ার বেঞ্চ আলমারি দেখি। সমানের মাপ কাটি যেটা কাযের জগতে খাটিয়ে চলেছি আমরা তাতে করে শিল্পজগতে কলেচ'টা একরকমের জিনিষ অনেক গুলো এসেছে দেখি। রেল গাড়ির চাকা, রেল লাইন কাচের বর্ত্তন, টেলিগ্রাফের তার, দ্বাদশ মন্দির তার ঘাটের ধাপ ইত্যাদি একটার পরে একটার সমান!

অসমানের কৌশল রইলো স্বভাবের হাতে আর রইলো রূপদক্ষের হাতে। দর্জ্জির হাতে দোকানির হাতে কর্ম্মকারের স্বর্ণকারের হাতে। এমনি যারা রূপের ব্যবসাদার তারা সমপরিমাণ ও সমান মাপে গড়ে চল্লো রূপ, কেননা একটা জিনিষের সমান-হাজারটা না হলে ব্যবসা চলে না এদের। মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট একটা ইউনিফারম মাপ দিয়ে দিলে দর্জ্জির হাতে এবং রিক্রুট অফিসার সেও এই সমানের মাপ ধরে বেছে চল্লো সেপাইগুলি; ইউনিফারম মাপে ঢুকলো সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে! ফৌজের জন্যে টোটা বন্দুক যারা প্রস্তুত করছে তাদের হাতে রয়েছে নানা ধাতু নানা পদার্থের সমান মাপ-যোগ-ভাগ বাটোয়ারা। দপ্তরীর হাতে আছে সমান মাপ দেবার রুল ও ছুরি, চোখ বুজে দপ্তরি এমন সমান করে কেটে চলে পাতা যে অনেক সময়ে ছাপার লেখার উপর দিয়ে চলে যায় সমানের টান!

সমান মাপ-যোপ নিয়ে কাযের প্রতিরূপতার সৃষ্টি হল—একটা দশ নম্বরের বুট আর একটা দশ নম্বরের বুটের প্রতিরূপ হ'ল, একটা চন্দ্রহার আর একটা চন্দ্রহারের সমান হ'ল, একটি সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্ত্তি অন্য একটি সিদ্ধিদাতার অনুরূপ হ'চ্ছে। রূপ-সৃষ্টি করছে যে সে একটা রূপকে দুটো করার দিকেই যাচ্ছে না কিন্তু তার দেওয়া একটা রূপ আর একটা রূপের সমকক্ষতা এবং প্রতিপক্ষতা একই সঙ্গে করছে এমন চমৎকার মান পরিমাণ দিয়ে গড়ছে সব রূপ রূপদক্ষ! এক-রূপকে অন্য রূপের সমকক্ষ করার কৌশল ছাঁটে সমানের কৌশলে নয়—অগাধ জলের তলা থেকে উঠলো পদ্মে মৃণালে শতদল মেলিয়ে ধরলে আলোয়—বৃহৎ মান পরিমাণ নিয়ে, অনেক মধু অনেক সৌরভ নিয়ে—এই যে পদ্ম ফুল এর কাছে এতটুকু একটি ঘাসের ফুল খাটো সব দিকে একথা বলা চল্লোনা, ঘাসের ফুল সে সমকক্ষ সে প্রতিপক্ষ হল পদ্মের! মাপে খাটো নিশ্চয়ই একটা তারার কাছে খদ্যোৎ, কিন্তু তারার অনুরূপ নয় বলেই খদ্যোৎ সে হ'ল রূপে সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ তারার, কাযেই কবির মনে রস জাগালে খদ্যোৎও।

রূপজগতে দুটো মাপ রয়েছে দেখি একটা রূপের বহিরঙ্গীণ মাপ আর একটা রূপের আভ্যন্তরীণ মাপ। ভাব নিয়ে যখন আলোচনা তখন এই আভ্যন্তরীণ মাপের কথা ওঠে। অন্তর বাহির দুই মিলিয়ে স্বয়ং রূপটি সম্পূর্ণতা পায়। রূপসাগরের উপরের বিস্তার ও তলার রহস্য দুইই মেপে তবে পাই পরিপূর্ণ রূপটি সুতরাং নিজস্ব পরস্ব, বহিরঙ্গীণ ও আভ্যন্তরীণ এই চার প্রকার মাপ হল।

সব মানুষই তাহার নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ, মানুষের নিজের মুখমণ্ডল তারি নিজের এক বিঘৎ, এমনি কতকগুলি রয়েছে প্রমাণসই মানুষের মান পরিমাণ যা সব মানুষের পক্ষেই সাধারণ মাপ, এছাড়া দেখা যায় যে মানবশিশুর বেলায় মাপ কিন্তু একটু আধটু তফাৎ হল—ছেলের মাথাটা ছেলের এক বিঘতের খানিক বেশি। এর উপর রোগা মোটা নানা মান পরিমাণ দিয়ে দেহের বৈচিত্র-সাধন হ'ল স্বভাবের নিয়মে।

জাতিগত আর একটা মাপ আছে যেমন চীনেম্যানে ও আন্দামানে, আফ্রিকায় ও আসিয়ায়, এই ইণ্ডিয়ানে ও রেড ইণ্ডিয়ানে! একই জাতের আমগাছ কিন্তু অবস্থার গতিকে দুটো সমান বিস্তার সমান খাড়াই পেলে না ডৌলও পেলে না এক রকম! যখন বীজ অবস্থায় তখন ডৌল মাপ ওজন ভার একজাতীয় বীজে আর একটি সেই জাতীয় বীজে প্রায় সমান, চারা অবস্থাতেও কতকটা মাপে যোপে সমান তারা কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে গাছেদের চেহারা ডৌল বিভিন্ন মাপ ধরলে! আবার নারকেল গাছ তালগাছ ধানের ছড় আখের গোছা—এরা সব বয়সের অসমান নিয়ম থেকে ছাড়া পেয়ে সমানের নিয়মে বদ্ধ হ'ল! ইতর জীব—যেমন হাঁসের ছানা মুরগীর ছানা শৈশবে সমান বড় হলেও ডৌল থাকে প্রায় সমান, শুধু রংএর ভেদ এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে স্বতন্ত্র রূপও পায়- তারা। কাক কোকিল ময়ূর কাকাতুয়া টিয়ে এমনি আরো অনেক জন্তু তারা বয়সে এক ডৌল একবর্ণ, শৈশবেও তাই—দুটো কাকের ও কাকের ছানার মধ্যে, দুটো এক জাতির বাঘের ও বাচ্ছার মধ্যে বদল ভেঙ্গে নেওয়া শক্ত। সদ্য ফোটা দুটি শিউলী ফুল—তারি শক্ত দুয়ের কোথায় অমিল সেটা ধরা। দুটো মুরগীর ডিম সমান মাপে ডৌলে, দুটি চোখ প্রায়- তাই, কিন্তু কাকের ডিমে হাঁসের ডিমে মুরগীর ডিমের মাপে ও বর্ণে পার্থক্য সুস্পষ্ট! বাঘের চোখে হরিণের চোখে সমান নয় কিন্তু বেড়ালের চোখে বাঘের চোখে ডৌলের মিল আছে যদিও মাপে ওটা বড় একটা ছোট। হাতির কানে ঘোড়ার কানে সমান করলে ছবিতে ভুল হয়ে যায়—কিন্তু গাধার কান ঘোড়াতে একেবারে বেমানান যে হয় তা নয়।

নানা ঢংএর মাপ যোপ নানা রংএর ওজন এমনি সব ব্যাপার নিয়ে উল্টে পাল্টে খেলে চলেছেন যেন কোন যাদুকর—নানা রং নানা ভাব নানা ডৌলের সংমিশ্রণে বিচিত্র হ'য়ে উঠেছে রূপ জগৎ। বাঁধাবাঁধি ও স্থিরতা নেই বলেই হয় স্বভাবের মাপ যোপে—কি বর্ণের কি ডৌলের কিবা ভাবের দিক দিয়ে সব দিকে আলগা! তেলাপোকার বেলায় দেখলেম এক জাতি এক ডৌল এক মান পরিমাণ পেয়ে সবাই একরূপ এক রং! প্রজাপতিতে দেখলেম নিয়ম উল্টে গেল—এক জাতীয় অথচ বর্ণে ডৌলে ভেদ, মাপেও ভেদ। হনুমানের বেলায় হল সব হনুমানই সমান মুখপোড়া, মানুষের বেলায় নিয়ম একেবারে যতদূর ওল্টাতে পারে—সাধারণ মাপ সমান রইলো, জাতি ধরে ও ব্যক্তি ধরে মানুষের মান পরিমাণ বয়সে-বয়সে হল অসমান। এক কাঠবেরালী পালালে রাতারাতি আর একটাকে খাঁচায় ভরে বুড়োকেও ঠকিয়ে দেওয়া চল্লো, কিন্তু এক মানুষ চেয়ার ছেড়ে সরে পড়লে সেই যে চেয়ারে অন্য একটি মানুষ এনে বসিয়ে আগের মানুষ বলে বালককেও ঠকানো গেল না—পোষা কুকুর বেরাল তারাও ধরে ফেলে মাপের পার্থক্য মানুষে মানুষে। রামের এক ডৌল একমাপ এক ভাব,—এখন রামও দুই হাত দুই পা এক মাথায় মানুষ শ্যামও তাই.-এই মিলটুকুর জোরে অযোধ্যার সিংহাসনে বসেও শ্যাম বলতে পারে না আমি রাম,—রামের পরিমাপ সে রামেই, শ্যামের পরিমাপ সে শ্যামেই নিঃশেষভাবে রইলো, রামের গুণ যদি পেলেন শ্যাম তো বহিরঙ্গীণ মাপ-যোপের কথাই উঠলোনা প্রজারা বল্লে রাম রাজত্বেই বাস করছি।

গুণের সমতা নিয়ে অন্যের সঙ্গে মিলে যাওয়া এবং ভাবের সমতা নিয়ে অন্যের সঙ্গে সমান হওয়া—এর প্রমাণ রূপ-সৃষ্টির অনেক জিনিষেই দিচ্ছে। চাঁদে আর চন্দ্রবদনে বা চন্দ্রহারে, খদ্যোতে প্রদীপে তারায়, নীলজলে পদ্মের মালায় আর নীল আকাশে দোদুল বলাকায় যে ভাবে সমান—নিজস্ব মান বজায় রেখে সমান বলি কিন্তু দুটো দেয়াশলায়ের কাঠি ঠিক সে ভাবে সমান নয় এরা।

দর্পণে আমার প্রতিবিম্ব পড়লো—আমারি সবই তাতে আছে অথচ আমার কিছুই তাতে নেই, সমান বলতে পারলেম না স্বয়ং রূপে আর তার প্রতিবিম্বে। আমারি তেল রং করা প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি—আমার সব রইলো তাতে—ডৌল বর্ণ মান পরিমাণ, হলও ছবিটা জীবন্তবৎ—যেন বসে লেকচার দিচ্ছি কিন্তু যে বস্তুটি বলছে আমার স্বয়ং রূপের অন্তরে থেকে "রইবোনা বসে আমি চলবো বাহিরে" সেই সত্য ও নিত্য বস্তু টুকুই বাদ গেল প্রতিকৃতিতে, কাজেই ভেদ রইলো স্বয়ং রূপে আর প্রতিবিম্বে। রঙ্গীন প্রজাপতিতে আর তার তিনরঙ্গা ছবিতে আকাশ-পাতাল অসমান রূপ রংএর সমতা পেয়েও, গোলাপ ফুলে আর গোলাপি আতরে কিন্তু প্রায় সমান সব দিক দিয়ে অসমান হয়েও। রূপে সমান কৃষ্ণনগরের ও লক্ষ্ণৌয়ের মাটির আমটি আতাটি কলাটি কিন্তু মাটির স্বাদ আছে ফলের রস ফলের সুস্বাদ নেই, আসল ফল মাটিতে পড়লে ফেটে পড়ে রস, মাটির ফল সেও ভাঙ্গে মাটিতে পড়লে—ছেলের মনে করুণ রস জাগায়, বুড়োর মনে রাগ পৌঁছে দেয়, কিন্তু এত করেও সমান বলা গেল না, মাটির ফলে পিপড়ে লাগেনা পোকা পড়ে না, পাখি ঠোকরায় যদি বা কিন্তু ঠোকর দিয়েই বোঝে মাটি!

রূপের অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অপরোক্ষ, নিজস্ব পরস্ব, সমান ও অসমানের নিয়ম প্রমাণ দিচ্ছে—রূপ সকল প্রতিরূপ নয়, প্রতিবিম্ব নয়, তারা প্রত্যেকেই স্বয়ংরূপ। কায়ার ছায়ায় মিলে আছে অথচ যেমন মিলে নেইও তেমনি রূপের বাইরের সঙ্গে মিলছে রূপকারির কায অথচ মিলছেও না।

রূপের বেলায় বহুবচন, প্রমাণের বেলাতেও বহুবচন রূপশাস্ত্রকার প্রয়োগ করে বল্লেন—"রূপভেদা প্রমাণানি"—রূপের বহুভেদ যেমন, প্রমাণেরও তেমন বহুভেদ—রূপের বহিরঙ্গীণ অংশ ও তার মান পরিমাণ রূপের আভ্যন্তরীণ অংশ ও তার মান পরিমাণ এবং ভিতর বাহির ইত্যাদি মিলিয়ে স্বপ্রমাণিত রূপসকল এই হল তাবৎ রূপ রচনার মূল কথা। নির্দ্দিষ্ট মান পরিমাণ আর অনির্দ্দিষ্ট মান পরিমাণ ধরে দুই প্রকারের রূপ। বিধাতার দেওয়া রূপ সমস্ত আর আর্টিষ্টের দেওয়া রূপ সমস্ত—দুয়ের স্বতন্ত্র মান পরিমাণ। আর্টিষ্টের মানস যেখানে আপন রাস্তা ধরলে—সেখানে চোখে দেখার অপেক্ষা নেই; মনোমত মান পরিমাণ ধরে রূপের গঠন হ'ল সেখানে, স্থিরতা নেই রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের সাদৃশ্যের বর্ণের হিসাবে, প্রবল ভেদনীতি ধরে বিধাতার সৃষ্টির সমকক্ষ সমতুল্য হ'তে চল্লো সেখানে রসসৃষ্টি মানুষের।

দাঁড়ি ও মাঝি দুজন রূপেগুণে অসমান। নৌকাটি চালাবার ভার কিন্তু দুজনের উপর, দাঁড়ি মাঝি সমান নয় দুজনে—তরি চল্লো দুয়ের ক্রিয়ার বৈপরীত্য লক্ষ্যের একত্ব ধরলে—দাঁড়ি চল্লো দাঁড়টেনে ঝুপ ঝাপ্, মাঝি রইলো হাল ধরে চুপ্ চাপ্, কিন্তু পার ঘাটের দিকে মন রাখলে দুজনেই সমানভাবে। খালে-বিলে যে মাঝি সেই দাঁড়ি একই লোক সমানে অসমানে মিলিয়ে ডিঙ্গি বেয়ে গেল ফাঁকি দিয়ে! প্রতি নায়ক প্রতি নায়িকা অনুকূল প্রতিকূল ভাব ও রসের স্রোত এসব মিলে একটা নাটক যেমন সম্পূর্ণ রূপটি পায়, বাদী বিবাদী সম্বাদী এমনি নানা সমান অসমানকে নিয়ে যেমন রাগরাগিণী রূপ পায় কবিতায় ছবিতে মূর্ত্তিতেও তেমনি নানা অসমানি একত্র হয়ে রূপ-রচনা মানানসই হয়ে উঠে।

অলঙ্কার শাস্ত্রে তিন জাতীয় নায়ক নায়িকার কথা বলা হ'ল—দিব্য অদিব্য এবং দিব্যাদিব্য। এই তিন রূপের কথা শিল্প-শাস্ত্রেও কথা—দেবতা মানুষ এবং দেবতা ও মানুষে মিলিত রূপ। দেবলোক মর্ত্ত্যলোক এবং গন্ধর্ব্বলোক এই তিন লোকের রূপ নিয়ে হল কথা এবং মান পরিমাণ ও লক্ষণ দেওয়া হ'ল শিল্পশাস্ত্রে কিন্তু কাজের বেলায় দিব্যাদিব্য রূপের মান পরিমাণ এবং অদিব্য মান পরিমাণই কাজে এল—রূপ হ'ল অদিব্য, রস হল দিব্য, অদিব্য পাত্রে পরিবেষিত হল দিব্য রস! সব-দেশের প্রতিমা শিল্পের দৌড় এই পর্য্যন্ত হ'ল—অসমানের মিলন, নিত্য অনিত্যে মিলন, মর্ত্ত্যরূপের সঙ্গে মিলে গেল দিব্য রস ও ভাব, মাটির পাত্রে স্বর্গ-সুধা এই সীমা ধরে রইলো মানুষের আর্ট রচনা।

শিল্প শাস্ত্রের প্রতিমা লক্ষণে যে মান পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে দেবতা ও দেবতাদের বাহনাদির জন্য তা এই গোচর রূপ সমস্তেরই মাপ কমিয়ে বাড়িয়ে স্থির করা হয়েছে, যথা—নবতাল দশতাল কৌমার বামনি রাক্ষসী ইত্যাদি—মানব দেহের বিরাটত্ব ও বৈরূপ্য নিয়ে হ'ল রাক্ষসী মূর্ত্তি, বরাহ আর মানুষের মান পরিমাণ বড় করে নিয়ে হল বরাহ অবতার, পাখি আর মানুষে মিলে কিন্নর, মানুষের মাপের বিরাটত্ব ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাহুল্য এই নিয়ে হ'ল দেব দেবীদের মূর্ত্তি সমস্ত—কেউ চার হাত কেউ দশহাত কেউ চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ দশমুণ্ড গজানন, নরসিংহ নরনারায়ণ হরিহর হরপার্ব্বতী এমনি কত কি! পাখি আর চোখে মিলে দিলে খঞ্জন চোখ যখন তখন বল্লেম দুই অসমানে হল সমান, হরিণ চোখ, সেখানে কিন্তু দুই চোখে চোখে মিলে হল এক—এখানে বলতে পারি সমানে সমানে মিলন। পাখিতে মানুষে মিলে হল কিন্নরী, এই ভাবে সারা জীবজগতে অসমান মান পরিমাণ এক করে নিয়ে বিশ্বরূপ গড়ে নিলে প্রতিমা-কারক। তারপরে আবার গাছ পালা ফুল পাতা নিয়ে—কল্পতরু পারিজাত এমনি নানা রূপের সৃষ্টি চল্লো, তারপর জড় জগৎ—সেখানে শালগ্রাম শিবলিঙ্গ ইত্যাদি পাই—এরা সবাই ধর্ম্ম প্রচারের কাজে এসে গেল। এই যে প্রতিমা গড়ার-মান পরিমাণ এর ভিত্তি হ'ল মর্ত্ত্যরূপের ব্যতিক্রমের উপরে। মর্ত্ত্যরূপ তাদের সুনির্দ্দিষ্ট ও নিজস্ব ও পরস্ব মান পরিমাণ ডৌল ইত্যাদি স্বভাবের দেওয়া—সেখানে নর সে নর—বানরও নয় দেবতাও নয়, মাদার গাছ সেখানে মাদার গাছই—আম নয় জাম নয় স্বর্গের মন্দারও

নয়! হিন্দু ধর্ম্ম চাইলে দিব্য মূর্ত্তি কিন্তু যে মূর্ত্তি গড়বে না তার কাছে, যে প্রতিমা লক্ষণ লিখবে না তার কাছে দিব্য রূপটি আপনার মান পরিমাণ নিয়ে বর্ত্তমান রয়েছে কাজেই অদিব্য মান পরিমাণ ভেঙ্গে গড়া চলতি হল।

প্রতিমা দেওয়ার বেলায় শাস্ত্রকার বল্লেন "প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ, যথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু।" প্রত্যক্ষ রূপ ও তার মান পরিমাণ আদি একেবারে বর্জ্জন করা কেমন করে হয় মানুষের দ্বারায়? লিখলেন বটে শাস্ত্রকার "নান্যেন মার্গেণ" কিন্তু শুধু ধ্যান ধরে আপনাতে আপনি ডুবে থাকা চল্লো কই! অরূপের অব্যক্তের ধ্যান, অলৌকিক আধ্যাত্মিকের ধ্যান সন্ন্যাসী সে করতে করতে একটা তুরীয় অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছে আনন্দে ভোঁ হয়ে বসে থাকে কিন্তু সেই রকম ধ্যানের পথ ধরে রূপ রচনা অসম্ভব কোনো কিছুর! সকালে উঠে প্রাতঃসূর্য্যের ধ্যান সুরু করলেন স্থির হয়ে চোখ বুজে,—পাঠশালের ছেলেরা পড়তে যেতে দেখলে—ঋষি মশায় বসেন ধ্যানে, কিন্তু ঋষি আফিংএর গুলির ধ্যান করছেন, না আলোর গোলার ধ্যান করছেন, না মাখম মিছরীর ধ্যান করছেন—কেউ কিছু বুঝলেনা যতক্ষণ না ঋষি ধ্যানকে ভাষা দিলেন—"জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয় মহাদ্যুতিং" কিম্বা ভৈরবীতে ঋষি তান ধরলেন সূর্য্যস্তবের, কিম্বা তুলি ধরলেন ঋষি লিখলেন জবাফুলে সূর্য্যে মিলিয়ে দিব্যাদিব্য মূর্ত্তি। এই ভাবে একের ধ্যান সপ্রমাণ করলে আপনাকে অন্যের কাছে। প্রতিমা সে প্রতিম হ'ল আর্টিষ্টের ধ্যানের গোচর রূপের উপরে নির্ভর করে তবে পেলেম অরূপের রূপ! এখানে দুই অসমান—রূপ ও অরূপ মিলে হল এক।

কল দিতে পারে একটার প্রতিরূপ ঠিক আর একটি তেমনি, আর্টিস্ট তা দিতে পারে না, আর্টিষ্টের প্রতিমা,—অপরিমেয় রসকে পরিমিতির মধ্যে ধরে দিচ্ছে রসরূপ একটি একটি। রসকে ধরতে হলে রসের আলম্বনটির মান পরিমাণ কেমনটি হওয়া চাই তা আর্টিস্টেরই ভাববার বিষয়, যেমন প্রাতঃকালের বর্ণন দিতে হলে বড় ছন্দে বা ছোট ছন্দে লিখবো কি কি কথা কেমন করে কোথায় বসাবো এ সবের হিসাব কবির হাতে ছেড়ে দেওয়া রইলো। আর্টিস্টের মনোগত তাকে রূপ দিতে হলে আর্টিষ্টের মনোগত মান পরিমাণ প্রয়োগ করা চাই। এই ভাবে অনেকগুলো মনোমত মান পরিমাণ দিয়ে মনোগত অনেক যখন সৃষ্টি করলেন রূপসাধকেরা—তখন সে গুলো বিচার করে পরীক্ষা করে হল শিল্পশাস্ত্রের প্রতিমা-লক্ষণ মান পরিমাণ ইত্যাদি লেখা।

আর্টিষ্টের মনোগত জনে জনে বিভিন্ন সুতরাং মনোগত মান পরিমাণ সেও ব্যক্তিগত এবং বিভিন্ন হতে বাধ্য। স্থির প্রতিমা নিয়ে ধর্ম্মের কারবার, মান পরিমাণের অস্থিরতা রাখলে সেখানে কাষ চলেই না সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবের উপরে প্রতিমা-লক্ষণ ছেড়ে রাখা চল্লো না এই মাপ এই মাপ এই মাপ এই লক্ষণ এই দেবতা এমনি বাঁধাবাঁধির কথা উঠলো এবং শাসন হল 'নান্যেন মার্গেণ'! এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাপ-যোগ তার সঙ্গে রীতিমতো শাস্ত্রীয় শাসন যা প্রতিমার চোখের তারা

ঠোটের হাসি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি ইত্যাদিতে একটু এদিক হতে দিলে না তাতে করে চুল তফাৎ হলনা মূর্ত্তিটি প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় এবং পর পর তার অসংখ্য সংস্করণে এতে করে পুজুরীর কায ঠিক মতো হল কিন্তু আর্টের কাযে ব্যাঘাৎ এল। শাসনের জোরে মানুষের ক্রিয়া হয়ে উঠলো কল ভরে চল্লো যেমন যুদ্ধের কায, তেমনি ধর্ম্মটা প্রচার করিতে শিল্পজগতে কতগুলি আর্টিষ্ট ফৌজ সৃষ্টি করলেন শিল্পশাস্ত্রকার! বন্দুকের টোটা একটার মতো যেমন দশ হাজারটা ঠিক তেমনিভাবে একটি প্রতিমার দশহাজার রকম নয় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করলে কী গ্রীস কী ভারত কীবা চীন কীবা ইজীপ্তের কারিগরেরা যতদিন তারা শাস্ত্র-মানে প্রতিমা গঠন করলে, এর অন্যথা হল বুদ্ধমূর্ত্তি গঠনের বেলা যিশুর ছবি আঁকার বেলায়। এমনি থেকে থেকে শাস্ত্রছাড়া প্রতিমা ও মান পরিমাণ আবিষ্কার করতে হল এক এক আর্টিষ্টকে তখন সেই মূর্ত্তি হল আদর্শ এবং তাই থেকে এল, আবার শাস্ত্রীয় মাপ বুদ্ধের যিশুর রানেসিস্এর! এই সব দেখেই শিল্প-শাস্ত্রকার বলেছেন যে পূজার জন্য যে সব মূর্ত্তি তারি কেবল লক্ষণ ও মাপ লেখা গেল, অন্য সকল মূর্ত্তি তা যথেচ্ছা গড়তে পারেন শিল্পি মনোমত মাপ যোগ দিয়ে।

এই যথেচ্ছা গড়ার ছাড়পত্র নিয়ে মান পরিমাণ ডৌল বর্ণ ইত্যাদি নিয়ে যথেচ্ছাচার করা যে চল্লো তা নয়। শাস্ত্রের মতানুযায়ী মান পরিমাণ ধরে চলতে না চাই তো প্রকৃতিগত স্বাভাবিক মান পরিমাণ এবং নিজের মনোগত মান পরিমাণ ধরে চলতেই হ'ল। পরিমাণকে অতিক্রম করে যদি একটা মনুমেণ্ট খাড়া করি—বস্তুর ভার ও ডৌলের সামঞ্জস্য রক্ষা না করে—তবে পরিশ্রম ব্যর্থ হয় এবং কীর্ত্তিস্তম্ভটি উঠতে উঠতে ভেঙ্গে পড়ে আপনার ভারে আপনি। প্রমাণকে না মেনে ক্রোশব্যাপী একখানা ছাত চারখানা দেওয়ালে চাপলো চল্লোই না, প্রথমেই ঠেকলো কড়ি বরগার মাপে যোগে—যত বড় ছাত তত বড় কড়ির জন্য কাঠ পাওয়া দুষ্কর হ'ল, ছাতের ভরাণ দিতে মাপে কুলোয় না কাঠ বাঁশ কোনোটা, এই ভাবে স্বভাবের কাছ থেকে নানা বাধা তারপর ছাতটার কাছ থেকেই বাধা এল, ছাত বলতে থাকলো—আরো চারশোখানা এত খাড়াই এত মোটা দেওয়ালের ঠেকো দাও নচেৎ রক্ষে নেই। শাস্ত্রমতো না গড়লেও বস্তুগত সহজ মান পরিমাণ ছেড়ে গড়া সম্ভব হ'ল না।

যে রেখা দিয়ে ছবিতে রূপ বাঁধি তার যথেচ্ছা ব্যবহার করা চল্লো না! বাঁকা সোজা সরু-মোটা রেখা সমস্ত তাদের কেউ এর সঙ্গে মেলে কেউ ওর সঙ্গে মেলে না, কেউ জানায় সে ভারি, কেউ জানায় সে হাল্কা, এদের নিয়ে প্রমাণসই-ভাবে সাজালেম তবেই তো হল গড়া রূপটি পাকা, না হ'লে হ'ল হিজিবিজি ব্যাপার। রেখা সমস্তের সামঞ্জস্য এই মান পরিমাণের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট হয় তবে ফোটে রূপটি পরিষ্কার। এই সব অলিখিত মান পরিমাণ যদি না থাকে আর্টিষ্টের কাছে তবে ভুল হয় তার প্রতি পদে।

আমাদের প্রায়ই হুকুম হয় ক্রেতার দিকে থেকে—মুখটা একটু হাসি হাসি কর! এই যে হাসির পরিমাণ সে হাসা ঘোড়ার হাসি থেকে মুচ্‌কি হাসি চাপাহাসি পর্য্যন্ত রয়েছে, কি পরিমাণ হাসি কোন

ডৌলের মুখে মানাবে তা না ভেবে যদি কায সুরু করি তো হয়তো ঘোড়ার হাসি দিয়ে বসলেম নদীয়ার গোরার মুখে! হাসির ধ্যান হ'লো ওষ্ঠ-বিস্তার ও দন্ত বিকাশ, কিন্তু কি পরিমাণ বিস্তার ওষ্ঠের ও কতখানি বিকাশ দন্তের এ বার মান পরিমাণ ও সৌসামঞ্জস্য জ্ঞান আছে কেবল তাকে দিয়েই হয়।

কিমাকৃতি যখন দিচ্ছি রূপে তখন বসাচ্ছি মানুষের মুখে ঘোড়ার হাসি কিন্তু সেই ঘোড়া-হাসির সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির নাক মুখ চোখ এবং সারা মুখমণ্ডলের রেখাগুলো আপনাদের মান পরিমাণ মিলিয়ে হবে হয় কিমাকার একটা রাক্ষুসে চেহারা! যেমন যখন কিন্‌পুরুষ দিতে হল তখন মানুষ আর পাখির মান পরিমাণ মেলাতে হ'ল সৌষ্ঠব দিয়ে যাতে করে কখন মানুষের মাথার মাপে পাখির দেহের মাপ কখন এর উল্টোটা হ'ল, ও সেই সঙ্গে কমলো বাড়লো বাঁকলো চুরলো ডৌল রেখা ইত্যাদি সবই!

এখন লক্ষ্মী সরস্বতী কিম্বা উমা দেবী—কিমাকৃতির মান পরিমাণ হিসেব কেতাব কিছুই খাটলোনা এখানে, মানুষের স্বাভাবিক মান পরিমাণও ধরা চল্লোনা অবশ্য! ভাটের বর্ণনায় বলা গেল বর্দ্ধমানের বিদ্যাকে "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী;" হিন্দু মতে ঘরের গিন্নীকে গৃহলক্ষ্মী বলাও চল্লো, কিন্তু এদের একটি একটি প্রমাণসই মর্ম্মর মূর্ত্তি কি ফটো প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করার কায চালানো গেলনা। দেবীপ্রতিম মানুষ হলে হল'না দোষের কিন্তু মানুষপ্রতিম দেবতা হলেই গোল বাধলো কাযের বেলায়। রামায়ণের হনুমান সাধারণ মুখপোড়ার মাপে গড়লে ভুল হয়——অসাধারণ মাপ চাই অনন্যসাধারণ হনুমানের জন্যেও! করকমলেষু চরণকমলেষু এই হাত এই পা-কেই বলা চল্লো চিঠিতে, কিন্তু আঁকার বেলায় গড়ার বেলায় সাধারণ হস্ত ও পায়ের মাপটাতে অদল বদল ঘটাতেই হ'ল, না হ'লে ঠিক রূপ পেলে না ঐ দুটি জিনিষ! এই ভাবে পেলেম কলে ছাঁটা রূপের বেলায় শাস্ত্রমতো সমান মাপ-যোপ যা ধরে এককে হাজারবার আবৃত্তি করা চল্লো। আর্টের জিনিষের বেলায় সরল মাপ ও তরল মাপ যা ধরে সাধারণ ও অসাধারণ রূপ সৃষ্টি করা হ'ল।

শাস্ত্রলিখিত রাক্ষসী-প্রতিমার মান পরিমাণ সেটি ধরে কৌমার কি বামন মূর্ত্তি গড়া চল্লোনা, এইজন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোটাকতক মাপ রইলো—দশতাল দ্বাদশতাল নবতাল অষ্টতাল প্রভৃতি—যেমন কবিতার ত্রিপদী চৌপদী ইত্যাদি নানা ছাঁদ, যেমন সঙ্গীতে একতালা চৌতালা তেতালা নানা ঠেকা, এরা রূপ-সমস্তকে ঠেকিয়ে রাখলে সুনির্দ্দিষ্টতার মধ্যে বাড়তে দিলে না কমতে দিলেনা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কোনো দিকেই!

দ্বাদশতাল মানুষের পক্ষে অসাধারণ, কিন্তু যে রাক্ষসের কল্পনা করছি তার পক্ষে দ্বাদশ কিম্বা তার বেশিও খাটে মাপ। সাধারণ মানুষ স্বভাবের নিয়মে একটা ছোট মাপ পেলে—অষ্টতাল সপ্ততাল নবতালের মাঝামাঝি একটা মাপ—একে অতিক্রম করা মানে অস্বাভাবিক করা—একটা পাহাড়-প্রমাণ পাথরেই গড়ি বা এগারো ইঞ্চি ইটেতেই গড়ি মানুষের স্বাভাবিক তালটি বজায় না রাখলে

বেতালা মানুষ করা হল। এই তাল বেতালকে মানিয়ে গড়তে পারলে যে সে হ'ল রসিক ও আর্টিষ্ট এবং এই জন্যই রসরূপটিকে বলা হল নিয়তিকৃত নিয়মরহিত হ্লাদময় ইত্যাদি।

স্বভাবের নিয়ম—সেখানে নিয়মে একপক্ষে বাঁধা এক পক্ষে ছাড়া সব রূপই—একটি গাছ বৃক্ষরূপের কঠোর নিয়মে বাঁধা কিন্তু স্বয়ং রূপের দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ ছাড়া দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়তে কমতে। মানবরূপ সেও এক হিসেবে বাঁধা কিন্তু অন্য হিসেবে প্রত্যেকে মানুষ স্বতন্ত্ররূপ।

শাস্ত্রের নিয়ম সে নিয়তির চেয়ে কঠোর নিয়ম, তার চারিদিক এমুখ ওমুখ সেমুখ শক্ত করে বাঁধা—ধ্যান লক্ষণ মুদ্রা মান পরিমাণ সব দিয়ে—না হ'লে পুরুত ঠাকুরের কাষ চলে না, লক্ষ্মীতে আর গৃহলক্ষ্মীতে সব দিয়ে স্বতন্ত্র করে রাখা ছাড়া উপায় নেই!

পুতুল ওয়ালা যে খেলনা গড়ছে সে না মানলে নিয়তি, না মানলে শাস্ত্র, অথচ অদ্ভুত কৌশলে সে রূপ সমস্ত নিয়ে চল্লো! রসের অনির্ব্বচনীয়তাকে স্বীকার করে রূপ পেলে পুতুলওয়ালার হাতের পুতুল! রূপদেবার দক্ষতা হিসেবে দেখতে গেলে পুতুলওয়ালাকে তারিফ দিতেই হয়, কেননা তার সৃষ্টিতে অপরিমেয়তা গুণটি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান!

এক আত্মা থেকে আর একটি আত্মার রস পৌঁছে দেওয়া শাস্ত্রমান ধরে চল্লোনা—আমাদের কাছে যা দেবতা সাহেবদের কাছে তা দৈত্য হয়ে রইলো, স্বাভাবিক মান পরিমাণ ধরেও একাব চল্লো না—আমার কাছে যার চেহারা ঠেকলো রূপে লক্ষ্মী তুমি তাকে বল্লে লক্ষ্মী পেঁচাটি। আমার মানুষ তোমার ঘরে তার মর্ম্মর মূর্ত্তির স্থান দিতে ব্যস্ত হওনা কেউ কিন্তু পুতুলের বেলা স্বতন্ত্র কথা—মেলার পুতুল সোনার খেলনা সর্ব্বদেশে সব ঘরেই তার স্থান হল—বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনে পুতুল, খেলাঘরের কুলুঙ্গীতে পুতুল, হাটে পুতুল, ঘাটে পুতুল—যেখানে রাখ তাকে সব জায়গাতেই তার আদর আছে দেখবে। পুত্তলিকা শিল্প,—শিল্পের মূল সেখানে রসের মধ্যে শিকড় গাড়লে, প্রতিমা শিল্প,—ধর্ম্মের মধ্যে শিকড় তার, তথাকথিত স্বভাব শিল্প,—প্রতিবিম্বকে আঁকড়ে ধরতে চলেছে তার শিকড়। বিশ্বকর্ম্মার মানস মান পরিমাণ দিলে বিশ্বরূপ সমস্তের- খেলনাওয়ালার মানস মান পরিমাণ দিলে খেলাঘরের রূপ সমস্তকে এই দিক দিয়ে এ ওর হ'ল সমান এবং অসমানও!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃপ্তি

(২৬)

এক ঘণ্টা করিয়া মিনতির বাক্স ও দেরাজ ঘাঁটিয়া দিলীপ সব কাগজ-পত্র টানিয়া বাহির করিল। একখানা একখানা করিয়া সব পড়িল।

কয়েকখানা বাক্সে চিঠিপত্রের পর বাহির হইল দিলীপের উদ্দেশ্যে লিখিত একখানা ছাপা বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন মিনতি কাগজে ছাপাইয়াছিল। দিলীপ তাহা দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল। কি কপটী এই নারী!

তারপর একখানা কবিতার খাতা। কবিতাগুলির পাতা উল্টাইয়া গেল। অনেকগুলি পাতায় নিজের নাম দেখিয়া সে আকৃষ্ট হইল। সে কবিতাগুলি তাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা, উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহ, লাঞ্ছিত স্নেহের ব্যথা ও আকুল আবেগে সেগুলি বোঝাই। প্রথমে দিলীপ সেগুলি মনে মনে ভেঙ্গাইতে লাগিল, কিন্তু কবিতাগুলি এত সুন্দর ও সরস – এত প্রাণপূর্ণ, যে দিলীপ ক্রমে তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। তার মনে ধোকা লাগিয়া গেল। এ সবই কি কপট উচ্ছ্বাস, অর্থশূন্য অভিনয়?

তারপর সে কয়েকখানা চিঠি পাইল। চিঠি সুমতি, বিনোদ, বড় বউ প্রভৃতির লেখা। তার ভিতর যাহা দেখিল তাহাতে সে আরও স্তব্ধ হইয়া গেল।

সুমতি এক পত্রে লিখিয়াছে,—“তোর ছেলে পেযে তোর এত আনন্দ দেখে আমার আনন্দও হ’চ্ছে দুঃখও হ’চ্ছে। যার থেকে তোর জীবনটা নষ্ট হ’তে ব’সেছে তাকে তুই এত ভালবাসিস—এতে আনন্দ হ’চ্ছে। কিন্তু যার জন্য তোর ছেলের উপর এত দরদ, সে ত একবার চেয়েও দেখছে না। এ দুঃখ রাখবার ঠাঁই নাই।”

বিনোদ এক চিঠিতে লিখিয়াছে, “তুমি লিখেছ দিলীপ তোমার ছেলে বই অন্য কিছুই তুমি ভাবতে পার না। তাকে যে তুমি ভালবাস সে তার বাপের জন্য নয়, তারই জন্য। শুনে বড় সুখী হ’লাম। এমন মা হ’য়ে তুমি জন্মেছ কিন্তু ভগবান তোমার মাতৃত্ব যাতে পরিপূর্ণরূপে চরিতার্থ হ’বে তার সুযোগে তোমায় বঞ্চিত ক’রেছেন।”

আর এক পত্রে লিখিয়াছে, “আমার ভুল হ’য়েছিল মিনু, তুই যে এত বড় তা’ আমি বুঝতে পারি নি। তুই লিখেছিস, তোকে যে ভগবান পেটের ছেলে দেন নি সে জন্য তুই তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছিস, কেন না তা’ হ’লে হয়তো তুই এমন ক’রে দিলীপকে ভালবাসতে পারতিস না। এত বড় কথা ক’জন মেয়ে মানুষ বলতে পারে।”

এমনি রাশি রাশি পত্র সে পড়িতে লাগিল। পড়িয়া দিলীপের মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেকক্ষণ সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে আরও কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। আরও পত্র পাইল। শেষে তোতারামের পত্রখানা পাইল।

তোতারাম পত্রখানা লিখিয়াছিল মিনতির পত্রের পৃষ্ঠে। দিলীপ মিনতির পত্র আগে পড়িল। মিনতি লিখিয়াছে,

"বাবা,

"তোমাকে বড় লাঞ্ছনা পেয়ে আমার বাড়ী থেকে বিদায় হ'তে হ'য়েছে। আমি যে নিজের বুদ্ধির ভুলে তোমার এমন লাঞ্ছনার হেতু হ'য়েছি একথা ভাবতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

"তোমাকে নিঃসম্বল অবস্থায় রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছি। তখন আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। আহ্লাদীর হাতে তোমাকে ২২৫৲ টাকা পাঠালাম। এ টাকা কটা নিও। অপমান লাঞ্ছনা আমি তোমার মতই ক'রে থাকি, তুমিই তো যাবার আগে বলেছ আমি তোমার মা। টাকা কটা না নিয়ে মায়ের বুকে শেল মেরো না। এই টাকা নিয়ে তুমি বৃন্দাবনে গুরু মহারাজের কাছে যেতে পারবে।

"তোমাকে আমার ছেলে ব'লে ভুল ক'রে আমি ভালবেসেছি। এখন জানছি তুমি আমার ছেলে নও। কিন্তু ছয় বৎসর যে তোমাকে স্নেহ ক'রেছি তা তো জীবনে ভুলতে পারবো না। অভাগিনী মা ব'লে আমাকে তুমি এখনও মনে রাখবে কি ?

"মনে রাখবার যোগ্য আমি নই। ধর্ম্মাত্মা তুমি, তোমার ধর্ম্মের সাধন পথ থেকে আমি কেড়ে এনেছিলাম। তার পর—নিদারুণ অপমান—যার চেয়ে বড় কলঙ্ক সন্ন্যাসীর হ'তে পারে না সেই মিথ্যা কলঙ্কে তোমাকে লিপ্ত ক'রেছি আমি। শেষে আমার ছেলে তোমাকে অপমান ক'রেছে, প্রহার ক'রেছে। আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নেই। তবু, বাবা, তুমি আমাকে দুঃখিনী মা ব'লে ক্ষমা ক'রে মনে রেখো।

"যে লাঞ্ছনা তোমার হ'য়েছে তার জন্য কোনও গ্লানি তোমার মনে রেখো না। এ তো সবই সেই লীলাময়ের লীলাচক্রের গতি—তবে দুঃখ কি বাপ ?

"তোমার অভাগিনী মা

মিনতি"

পড়িতে পড়িতে দিলীপের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে পাতা উল্টাইয়া তোতারামের উত্তর পড়িল। তারপর চিঠিখানা তার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া পড়িল।

তারপর সে ছুটিয়া শিশিরের ঘরে গেল। শিশির তখনও ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়াছিল। দিলীপ তার কাছে চিঠিগুলি লইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবা, আমাদের বড় অপরাধ হ'য়ে গেছে। এই দেখুন মা'র সে পত্র।"

শিশির চিঠিটা পড়িল। তার মন হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল। তারপর সে অন্য চিঠিগুলি পড়িয়া গেল। সে উৎফুল্ল-চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিনতি তখন সে ঘরে ছিল না। দিলীপ তাহাকে এঘর ওঘর খুঁজিল। আহ্লাদী সামনে ছিল, সে বলিল, "মা নীচে গেছেন।"

দিলীপ বুঝিল মিনতি রান্নাঘরে সংসারের কাজ করিতে গিয়াছে। সেখানে গিয়া চাকর-বাকরদের সামনে তাকে কোনও কথা বলিতে সঙ্কোচ হইল। দিলীপ আহ্লাদীকে বলিল, "মাকে একবার উপরে আসতে বল, খুব জরুরী দরকার।" দিলীপ পিতার কাছে গেল।

একটা কিছু না করিলে তার মনটা শান্ত হইতেছিল না। সে তাই তড়্‌বড়্‌ করিয়া বাঁধা বিছানা খুলিয়া ফেলিল, তোরঙ্গ খুলিয়া জিনিষপত্রগুলি বাহির করিয়া ফেলিল। তার মায়ের ছবিখানি যথাস্থানে টাঙ্গাইল।

মিনতির আসিতে দেরী দেখিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। নীচে ছুটিয়া গেল। সিঁড়ির পাশে আহ্লাদী দাঁড়াইয়াছিল, দিলীপকে দেখিয়া তাহার মুখখানা সাদা হইয়া গেল, সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

আহ্লাদী নীচে গিয়া শুনিতে পাইয়াছিল মিনতি বাড়ী নাই। সে রামধারীর সঙ্গে একখানা গাড়ী ডাকাইয়া একসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। আহ্লাদী দিলীপকে মিনতির ঘরে খানাতল্লাসী করিতে দেখিয়াছিল। সে সহজে সিদ্ধান্ত করিল যে মিনতি ধরা পড়িয়া এখন একেবারে সন্ন্যাসীর কাছে উধাও হইয়া গিয়াছে। ভাবিতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ধন্যি মেয়েমানুষ বাপু! ভর দিনের বেলায় সোয়ামী পুত্তুরের সম্মুখ দিয়া এমনি করিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই বার্ত্তা দিলীপের কাছে বহন করিয়া লইতে তার সাহস হইল না। শুনিয়া কি জানি যদি রাগের মাথায় দিলীপ তাকে বুটশুদ্ধ পদাঘাত করিয়াই বসে। সে লাথি একটা খাইলে আর আহ্লাদীর ধড়ে প্রাণ থাকিবে না। তাই সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ দিলীপ নামিয়া আসিতে সে একবারে ভড়কাইয়া গেল।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল, "কই, মা কোথায় ঝি?"

কাঁপিতে কাঁপিতে আহ্লাদী বলিল, "তিনি নেই।"

"নেই কি? কোথায় গেছেন।"

আহ্লাদী কাঁদিয়া ফেলিল। ভেউ ভেউ করিয়া বলিল, "বেরিয়ে গেছে দাদাবাবু—গাড়ী ক'রে চলে গেছে, তোমাদের মুখে কালি দিয়ে"—

"চুপরও হারামজাদী" বলিয়া দিলীপ তাড়া দিতেই আহ্লাদী, "ওরে বাবারে, মেরে ফেলে রে" —বলিয়া চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল।

দিলীপ ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরে গিয়া শুনিতে পাইল মিনতি গাড়ী করিয়া চুঁচুড়া ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন।

সে একটা বাইসিকেল সংগ্রহ করিয়া ছুটিল।

* * * *

দিলীপ যখন তার ঘর খানাতল্লাসী করিতে গেল তখন অপমানে মর্ম্মপীড়ায় মরিয়া গিয়া মিনতি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল।

তার সেই অবস্থা দেখিয়া রামধারী কাছে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

মিনতি তখন মাথা খাড়া দিয়া উঠিয়া বলিল, "চল রামধারী।"

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রামধারীও পিছু পিছু চলিল। তার আর মুখে কথা ছিল না।

বাহিরে আসিয়া মিনতি বলিল, "রামধারী আমি তোমার মেয়ে—তুমি আমার বাপের কাজ কর। আমাকে এ অপমান থেকে রক্ষা কর। একখানা গাড়ী ক'রে আমাকে বাপের বাড়ী রেখে এসো।"

রামধারীরও ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, "তাই ভাল মা, চলুন।"

তার পর তারা নীচে চলিয়া গেল। রামধারী গাড়ী ডাকিয়া আনিল। মিনতি বলিল, "আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারবে, বাবা?"

রামধারী তার কোমর হইতে বটুয়া খুলিয়া পাঁচটা টাকা বাহির করিল। মিনতি বলিল "থাক, তোমার কাছেই থাক এখন। চল!"

তার পর তারা গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দিলীপ যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন ট্রেন আসিয়াছে, মিনতি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে। তখন সেই ষ্টেশনভরা লোকের সম্মুখে দিলীপ তার সব মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া মিনতির পা জড়াইয়া ধরিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

দিলীপ বলিল "মা, আমি তোমার কাছে যে অপরাধ ক'রেছি তার শাস্তি নেই। তবু মা তোমার ছেলে আমি—আমাকে ক্ষমা কর।"

মিনতির দুই চক্ষু ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে দুই হাত দিয়া দিলীপকে জোর করিয়া উঠাইয়া বলিল, "ওঠ বাবা, তোমার উপর আমার এক ফোঁটাও রাগ নেই।"

দিলীপ তখন দুই হাতে মিনতির পথ আগলাইয়া বলিল, "তবে মা বাড়ী ফিরে চল— আমাকে এখন আর ফেলে যেতে পারবে না।"

মিনতি দৃঢ়ভাবে বলিল, "ওই অনুরোধটা আমাকে আর ক[illegible] আমি যেতে পারবো না।"

দিলীপ আর কিছুক্ষণ ব্যর্থ সাধ্য-সাধনা করিয়া শেষে ভাবিল যে ইতিমধ্যেই চারিদিকে লোক জড় হইয়া গিয়াছে। এখানে একটা হট্টগোল করা কিছুই নয়। তাই সে রামধারীকে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও রামধারী। বাবাকে বলগে আমি মাকে পৌঁছাতে গেলাম, কালই ফিরবো।" বলিয়া সে মিনতির পিছু পিছু গাড়ীতে উঠিল।

মিনতির পিত্রালয়ে পৌঁছিয়াই সে মিনতিকে বলিল, "মাগো, আমার অপরাধে বাবার তোমার দুজনেরই জীবন অর্দ্ধেক নষ্ট হ'য়েছে। এর পর যদি আমারই অপরাধে তুমি আমাদের ছেড়ে এসো তবে আমার সে দুঃখ ম'রলেও যাবে না। তুমি আমাকে আর যে শাস্তি দেও মাথা পেতে নেব মা, শুধু এই শাস্তি আমায় দিও না।"

মিনতি দিলীপের মাথায় হাত দিয়া বলিল, "শাস্তি তোকে কি দেব বাবা, তোকে দুঃখ দিলে যে সে দুঃখ আমারই বুকে বাজবে। কিন্তু তুই তো আমার ছেলে, তুইই বল যেখানে তোর মায়ের এমন অপমান হয়ে গেছে সেইখানে তাকে আবার কি বলে আর ফিরতে বলিস্! আর অপমান তো শুধু আমার নয়, তোতারাম আমার জন্ম সেখানে অপমান স'য়েছে, দুঃখ পেয়েছে। তুমিও আমার যেমন ছেলে সেও তেমনি! আমি যদি আজ সেখানে ফিরে যাই তবে আমি তার মা হ'বার যোগ্য হ'ব না।"

দিলীপ আর কথা কহিল না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক বুদ্ধি স্থির করিল। সে পোষ্টাফিসে গিয়া একখানা টেলিগ্রাম করিয়া ফিরিয়া আসিল। পরের দিন সকালে দিলীপ মিনতির পায়ের ধুলা লইয়া চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিল।

দিলীপের কাছে মিনতি শুনিয়াছিল যে তার এবং শিশিরের সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। তারা যে মিনতির কাছে নিদারুণ অপরাধে অপরাধী একথা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে। একথা শুনিয়া মিনতির মনে ভারি তৃপ্তি বোধ হইল। এতদিনে ভগবান তার শান্তির যোগ্য পুরস্কার দিয়াছেন। সে আজ জয়ী হইয়াছে। সে তার নারীত্বের মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়া পাইয়াছে আর পাইয়াছে তার স্বাধীনতা। তা ছাড়া সে দিলীপকে সত্য সত্যই পুত্ররূপে পাইয়াছে। সে নারায়ণকে মনে মনে শতকোটি প্রণাম করিল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় বিনোদ ও সুমতি মিনতির সঙ্গে দেখা করিতে আসিল।

মিনতি বলিল, "মুখুজ্জে ম'শায়, এইবার আমার একটা রোজগারের উপায় করে দিন। আমার একটা কিছু ক'রে খেতে হ'বে তো।"

"ক'রে খেতে হ'বে কেন মিনতি? শিশিরের সম্পত্তি থেকে খোরপোষের তোমার আইন-সঙ্গত অধিকার আছে—তা' তুমি নেবে না কেন?"

জিভ কাটিয়া মিনতি বলিল—"ছি, এতটা খাটো আমায় মনে ক'রবেন না মুখুজ্জে ম'শায়।"

তারপর শ্যালী ভগ্নীপতিতে অনেক কথা কাটাকাটির পর বিনোদ দেখিল যে মিনতির সঙ্কল্প টলিবার নয়। সে তখন বলিল, "আচ্ছা সে পরে হ'বে। তুই এখন তবে আবার পড়তে আরম্ভ কর। এম. এ. পাশ না ক'রলে ভাল একটা রোজগারের উপায় কিই বা হ'বে?"

তাই স্থির হইল। পরের দিন প্রত্যূষে মিনতি বইপত্র গুছাইয়া পড়াশুনার আয়োজন করিল। দশটার সময় হঠাৎ তোতারাম আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন আর তার সন্ন্যাসী বেশ নাই। দেখিয়া মিনতির মন খুসী হইয়া উঠিল।

তোতারাম বলিল, "আমি হুগলী থেকে আসছি মা, এখনি আপনার যেতে হবে।"

"হুগলী থেকে? তুমি সেই খানেই ছিলে?"

"না মা, আমি বাড়ী গিয়েছিলাম, দিলীপ আমায় টেলিগ্রাম ক'রে আনিয়েছে।"

"সে কেমন করে তোমার ঠিকানা জানলে?"

"আপনার চিঠিতে আমি যে ঠিকানা দিয়েছিলাম তা সে দেখেছিল।"

"ও! সে নিজে আমাকে নিতে পারলে না দেখে বুঝি তোমার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সে হ'বে না বাবা, সে বাড়ীতে আমি ফিরবো না। ঐ অনুরোধটা ক'রো না।"

"না মা এখন আর রাগ করে থাকবার সময় নাই। বাবা এখন বোধ হয় মৃত্যু-শয্যায়। তাঁর জ্ঞান থাকতে থাকতে আপনি তাঁকে প্রসন্ন মনে একবার আপনার ক্ষমা ভিক্ষা দিতে যাবেন না?"

"আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায়? বল কি? কি হ'য়েছে তাঁর?"

"কাল হঠাৎ তাঁর এপোপ্লেক্সী হ'য়ে অচেতন হয়ে প'ড়েছেন। আজ সকালে আমি দেশ থেকে এসে দেখলাম তাঁর সেই অবস্থা—দিলীপ অস্থির হ'য়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমাকে দেখেই দিলীপ আমার পা জড়িয়ে ধ'রে বল্লে, দাদা তুমি যাও মাকে নিয়ে এসো। আমি অমনি ছুটে এলাম।"

মিনতি তৎক্ষণাৎ একখানা ট্যাক্সি আনিতে পাঠাইয়া বলিল, "এখন কেমন আছেন? জ্ঞান হ'য়েছে কি?"

"আমি যখন আসি তখন পর্য্যন্ত হয় নি।"

মিনতির ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে তার কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল। সে অনেকক্ষণ পর বলিল, "ডাক্তারেরা কি বলেন?"

"তাঁরা বলছেন এখনো কিছুই বলা যায় না। হয় তো আর জ্ঞান নাও হ'তে পারে।"

তার পর আর কিছুক্ষণ বাদে মিনতি বলিল, "হাঁ বাবা, আমার জন্যে কি—আমি কি তাঁর এ দশা ক'রেছি?" মিনতির চক্ষে জল আসিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তোতারাম বলিল, "ডাক্তাররা সেই রকম অনুমান করেন। আপনি চ'লে আসাতে তিনি একেবারে মুশড়ে প'ড়েছিলেন। সেই shock থেকে এমনি হওয়া সম্ভব।"

মিনতি মনে মনে ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিয়া তাঁহার কাছে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

ট্যাক্সি আসিবামাত্র তাহারা উঠিয়া বসিল। প্রথমে তারা কলিকাতার দুইজন বড় ডাক্তারের কাছে গিয়া তাঁহাদের হুগলী যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া ষ্টেশনে গেল।

(২৭)

সে যাত্রা শিশির অনেক চেষ্টায় রক্ষা পাইয়া গেল। কিন্তু পক্ষাঘাতে তার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গেল।

তোতারাম ও দিলীপ অক্লান্ত চেষ্টায় শুশ্রূষা করিল। মিনতি স্বামীর শিয়র ছাড়িয়া একদণ্ডও নড়িল না। আহার নিদ্রা এমন পরিপূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া এমন প্রশান্ত একান্ত সেবা যে কেহ করিতে পারে তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না।

শিশির এখন তার চেয়ারে পড়িয়া থাকে রামধারী তাহাকে ঠেলিয়া বেড়ায়। মিনতি সর্ব্বদা পাশে বসিয়া তার সঙ্গে গল্প করে, গান করে, বই পড়ে, ধর্ম্মালোচনা করে।

রোজ একবার তাকে লইয়া মিনতি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যায়। মিনতির আর কোনও কাজ নাই—দিন রাত সে শিশিরকে লইয়াই আছে।

তোতারাম একদিন আসিয়া বলিল, "বরাহনগরে গঙ্গার উপর একখানা বাড়ী কিনেছি মা। প্রকাণ্ড বাগান আছে—আর বারান্দায় ব'সলেই গঙ্গার হাওয়া পাবেন। আপনারা সেইখানে চলুন।"

শিশির বলিল, "কোন বাড়ী ?"

তোতারাম সে বাড়ীর পরিচয় দিল। শিশির বলিল, "সে যে প্রকাণ্ড বাড়ী, একবার তার পঁচাত্তর হাজার দাম চেয়েছিল।"

"না এখন তার চেয়ে সস্তা হ'য়েছে। আমি পঞ্চাশ হাজারে পেয়েছি।"

মিনতি অবাক্ হইয়া বলিল, "পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ী কিনেছ ? তোমার এত টাকা আছে ?"

দিলীপ বলিল, "তবে কি ?—ঐ যে ঠিকানা দিয়েছিলে তুমি, কুমার নৃপতিনাথ চৌধুরী—তিনি তোমার কি হন ?"

হাসিয়া তোতারাম বলিল, "বেদান্তে বলে সব জীবই এক ব্রহ্ম—মানুষে মানুষে কি ভিন্ন কিছু আছে ? তিনি ও আমি এক আত্মা বললেই হয়।"

"অ্যাঁ ! তুমি কুমার নৃপতিনাথ !"

তোতারাম হাসিতে লাগিল।

সকলে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল।

শিশির বলিল, "জগদীশপুরের জমীদার—তোমার তো অন্ততঃ লাখ তিনেক টাকা আয় হ'বে।"

"হাঁ ঐ রকম হ'বে।"

মিনতির মুখ মলিন হইয়া গেল। সে বলিল, "না জেনে তোমার বড় অমর্য্যাদা ক'রেছি"—

ম্লানমুখে নৃপতিনাথ বলিল, "মা, ঐ কটা টাকার কথা শুনে আপনি আমাকে এখন পর ভাবছেন ?"

লজ্জিত হইয়া মিনতি বলিল, "না বাবা! কিন্তু তবু—কত কষ্ট না জানি হ'য়েছে তোমার।"

"মা, বাড়ী থেকে পাগল হ'য়ে বেরিয়েছিলাম স্নেহের অভাবে। বাবা ম'রে গেলে ছেলে বয়সে বিমাতার হাতে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছিলাম। সংসারে ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিল। আপনার কাছে সেই স্নেহ পেয়েছি। সংসারে থেকে যে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ হ'তে পারে তা' আপনার কাছে শিখেছি। তাই মা যখন দেখলাম আপনার বিপদ, তখন ঘরে ফিরে গেলাম—যদি আমার ধন দৌলত দিয়ে আপনার কোনও কাজে লাগি। আমার জীবনটা ভেসে যাচ্ছিল একটা কুটোর মত, আপনি তাকে উদ্ধার ক'রেছেন। আপনি এ কথা বলবেন না, মা।"

সজলনয়নে নৃপতি মিনতির পায়ের ধূলা লইল।

বরাহনগরে তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। দিলীপ কিছুদিন পরে নৃপতিনাথের সঙ্গে মিলিয়া একটা জাহাজ মেরামতির কারবার আরম্ভ করিল। মিনতি শিশিরকে লইয়া পড়িয়া রহিল।

একদিন গঙ্গার ধারে বারান্দায় বসিয়া মিনতি শিশিরকে একখানা বই পড়িয়া শুনাইতেছিল। পড়িতে পড়িতে যখন মুখ তুলিয়া সে স্বামীর দিকে চাহিল তখন দেখিল শিশির তার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে—তার দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে।

মিনতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বসিল, সস্নেহে তার চক্ষু মুছাইয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে তোমার ? কাঁদছো কেন ? বল।"

শিশির বলিল, "ভাবছি মিনতি, তোমার জীবনটার মাঝখানে আমি পড়ে কি ছারখারটাই ক'রে দিলাম। জীবনে একটি দিন সুখ পেলে না। যৌবনটা তোমার একেবারে ব'য়ে গেল। তোমার এই বয়স এ যৌবন কি বিধাতা দিয়েছিলেন শুধু একটা বৃদ্ধ পঙ্গুর সেবা ক'রতে ?"

মিনতি ভারী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া শিশিরের বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, "এমন কথা তুমি কি ক'রে বলছো ? আমার না আছে কি ? এমন স্বামী, এমন ছেলে, আমার দুঃখ কিসের ?"

"দুঃখ তোমার নেই মিনতি সে আমি জানি। যত বড় ব্যথা তোমার বুকে ঘা দিয়ে লাঞ্ছনা পেয়ে গেছে তাতে যে কোনও মেয়ে মুসড়ে যেত। তাই তো মনে হয় যে আমি যদি এই দেবদুর্লভ রত্নের লোভে পড়ে' ছোঁ না মারতাম, তবে হয়তো তুমি এমন লোকের হাতে প'ড়তে যার কাছে তোমার জীবন যৌবন পরিপূর্ণরূপে সার্থক হ'ত।"

মিনতি বলিল, "কিসে কার জীবন সার্থক্ হয় তা' অন্য লোকে কি বুঝবে? আমার জীবন এ ছাড়া কিছুতেই এত সার্থক হ'ত না। আমাকে নারায়ণ যে সেবা করবার অবসর দিয়েছেন সে আমার পরম সৌভাগ্য। সেবাতেই আমার জীবন সার্থক হ'চ্ছে। আর সুখ তাঁর কাছে চাই না। শুধু যদি দিলীপ আর নৃপতির দুটি মনের মত বউ আনতে পারি, আর তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি, তবেই আমার জীবন পরিপূর্ণরূপে সার্থক হ'বে।"

শিশির কথা কহিল না। মুগ্ধ গদ্গদ দৃষ্টিতে মিনতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিনতি উঠিয়া বলিল, "নেও আর ও সব দুষ্টুমী ক'রতে হ'বে না। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত বই শোন" বলিয়া স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল তারপর তার গালখানা তার গালের উপর রাখিয়া চুপ করিয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিল।

শিশির মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে চুম্বন করিল। মিনতির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সমাপ্ত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

আমরা এবং তাঁহারা

(দ্বিতীয় স্তবক—গানের কথা)

আমার বন্ধুরা এ বৎসর আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। তাঁহারা আর অতটা আমাকে দূরে পরিহার করেন না। আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ঘন ঘনই হচ্ছে। ঘনিষ্টতার ফল কি হবে জানি না—তবে, 'মা ফলেষু কদাচন' মনে করেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। এ কথা ঠিক যে সহরের সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কোরলে, গণ্ডীর ভেতর থেকে থেকে মন বড়ই অনুদার হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অধ্যাপকদের মনে মনে যে পাণ্ডিত্য এবং পয়সার অভিমান আশ্রয় করেছে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাই বোলে যে সহরের সাধারণ মনোভাবের সাহায্য এবং লেখাপড়া ও কুড়েমী বাদ দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক কোন বিপ্লব সাধিত হবে তাও মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও Snobbishness এবং বাইরেও তাই, তফাৎ এই টুকু যে প্রথমটি কু-শিক্ষার দাম্ভিকতা এবং অন্যটি অ-শিক্ষার হিংসা। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে কুড়েমী যে মহাপাপ তা অধ্যাপকেরাও স্বীকার কোরে নিয়েছেন—তাঁরা সব বই লিখতে ও বই পড়াতেই ব্যস্ত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি সুবিধা এই,—সেখানে গণেশ ঠাকুরের স্থান নেই। বোধ হয়, স্থান থাকা উচিতও নয়, কেন না গণেশ ঠাকুরকে আমরা

অন্ততঃ মনে মনে শ্রদ্ধা করি না। ও ঠাকুরটি সাক্ষাৎ ভগবান নয়, তবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাক্ষাৎ ভগবান বোলে পূজা করি, কাঁসর, ঘণ্টা বাজাই, ধূপ ধুনা জ্বালাই, বলি দিই। সেই বাজনার আওয়াজে কান কালা হয়ে যায়, চোখ ধাঁদিয়ে যায়। আমাদের মধ্যে চালাক যে সেই পূজারী হয়, যে বোকা সেই মন্দির ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। আমি পূজারী হতে চাই না, পূজা দিতেও চাই না। আমি চাই মন্দিরের পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং মজা দেখতে। আমার কাছেও দেবতা মিথ্যা, তবে জগতে বোধ হয় মিথ্যার অনেক প্রয়োজন আছে। জয় Jerome Coignard!

যা মিথ্যা বোলে জানি তা নিয়ে মারামারি হয় না, কিন্তু যে মিথ্যাকে সত্যের আকার দিয়েছি তাই নিয়ে ঝগড়া, মনকষাকষি, মারামারি। যখন সত্যের আকারকে সত্য বোলে মনে করি তখন অন্যে যদি সেই আকারকে পূজা না করে তখন আমরা ব্যক্তিগতভাবেই আহত হই। কিন্তু মিথ্যা-ঠাকুরের সেবকবৃন্দ যে নিজের মনটি হারিয়ে ফেলেছেন তা কারুর মনেও থাকে না। থাকবেই বা কি ক'রে? মন বোলে পদার্থটিই যে বলি দিয়েছি! এই হচ্ছে আমার 'আমাদের এবং তাঁহাদের' বিপক্ষে আপত্তি। আমার অন্ততঃ মনকে বাঁচাবার বড় দরকার হ'য়েছে। মনকে জীবন্ত রাখবার চেষ্টার ফলে আমি কোন নৌকায় পা দিতে পারি না। শেষকালে মাঝ দরিয়ায় প্রাণ খোয়াতে হবে দেখছি!

* * * * *

সন্ধ্যার সময় বন্ধুরা এসে উপস্থিত। বেহারা এসে চা দিয়ে গেল। চা পানের সঙ্গে-সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চল্‌ল।

তাঁহারা। আচ্ছা চায়ের সঙ্গে আপনারা এত কম চিনি খান কেন? আমরা চা মানে অন্ততঃ ৪ চামচ চিনি বুঝি।

আমি। এই যে সে-দিন আপনারা বলেছিলেন না প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নিজস্ব ভাষা আছে---সেটা আমরা অধ্যাপকেরা সর্ব্বদাই নষ্ট করতে চেষ্টা করি—ঠিক ঐ কারণেই। চায়ের লিকারের সঙ্গে দুধ চিনি মেশালে সেটি আর চা রইল না। প্রত্যেক পদার্থের শুদ্ধ সত্ত্বা মানতে চেষ্টা করছি।

তাঁহারা। তা হোক মশাই, আরও একটু দুধ ও চিনি নিলুম--কিছু মনে করবেন না।

আমি। নিশ্চয়ই নেবেন। মানুষ তর্কের খাতিরে যা বলে তাই কি সত্যি! কিন্তু তা হলেও আমি অন্ততঃ মনে করি যে, "বে-চিনি চা ভাল গাইয়ের মুখে হিন্দুস্থানী খেয়াল কিম্বা ধ্রুপদ শোনার মতন।

তাঁহারা। আর চিনি-দুধ-মেশান চা হচ্ছে বাংলা দেশের কীর্ত্তন।

আমি। আজ্ঞে হাঁ, অন্ততঃ আমি যে রকম কীর্ত্তন শুনেছি। তবে খগেন মিত্র মহাশয় লিখেছেন যে, কীর্ত্তন অনেক পাকা সুরে গাওয়া হ'ত, এবং এখনও হ'তে পারে। তবে এখন বেশীর ভাগ লোকে যা কীর্ত্তন গায়, তাতে কথা এবং ভক্তির প্রাধান্যই বেশী—অর্থাৎ কেবল দুধ চিনি। যাক ও সব কথা, এখনি আবার তর্ক উঠবে, আজকাল তর্ককে বড় ভয় করি।

তাঁহারা। এ রকম মতিগতি হ'ল কবে থেকে ?

আমি। যেদিন থেকে পণ্ডিত ভাতখাণ্ডেজীর সঙ্গে মেশবার সুবিধা পেয়েছি, সেই দিন থেকে আর গান সম্বন্ধে তর্ক করি না, যে দিন থেকে শ্রীকৃষ্ণের গান শুনছি, সেই দিন থেকে গান গাওয়া পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি।

তাঁহারা। কিছু মনে ক'রবেন না—আমাদের মনে হয় যে দুই তিন মাসের পূর্ব্বে উত্তরার এক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সান্যালের প্রবন্ধ আপনার মুখ বন্ধ কোরে দিয়েছে।

আমি। অন্ততঃ এক হিসাবে। কেন না আমি লিখলুম এক কথা, জবাব হ'ল তার অন্য কথা। শ্রীকৃষ্ণের গানের প্রভাব শ্রোতার মনের ওপর কি আকার নেয় ব্যক্ত কোরতে গিয়ে আমি মাত্র এই কথা বোলেছিলাম যে দিলীপ কুমারের মুখে হালকা সুর শুনে যে রকম প্রীতিলাভ করি, সেই রকম প্রীতিলাভই কোরেছিলাম শ্রীকৃষ্ণের মুখে হিন্দুস্থানী ভাষায় ওস্তাদী সঙ্গীতে। আমার আর একটা দোষ হ'য়েছিল এই যে, অনেক তথাকথিত ওস্তাদের পর দিলীপের ভজন এবং পিলু ভাল লাগা স্বীকার করা। এই দুটি মন্তব্যের প্রতিবাদ হ'ল এই যে, আমি দিলীপকুমারকে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ বলাতে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছি। অতএব এ প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নয়। আমার শুধু এই টুকু বলবার আছে যে, আমার সঙ্গীত সম্বন্ধে অজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি খুবই সচেতন, তার কারণ আমি ভাতখাণ্ডেজীর সঙ্গে মিশেছি। মানুষের অর্থাৎ আমার এবং অন্যান্য মানুষের জানবার সীমা আছে, কিন্তু না জানবার সীমা নেই। যাক্ সে কথা, দ্বিজেন্দ্রলাল সান্যাল মহাশয় আমার বন্ধু, তিনি গান সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন এবং শুধু তাই নয় তিনি নিজে গান গেয়ে থাকেন এবং অতি সুন্দর তবলা বাজাচ্ছেন। আমি কেবল গান সম্বন্ধে.ভেবেই গেলাম, জীবনে তাঁর মতন করিৎকর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌বো এ দুরাশা আমার নেই। যে নিজে হাতে কিছু কোরেছে তার সে সম্বন্ধে বলবার অধিকার আমাদের মতন শুধু তার্কিকের চেয়ে অনেক বেশী স্বীকার করি।

তাঁহারা। কিন্তু তাঁর লেখাতে বাংলা গানের ওপর অভিমতটি আমাদের ভাল লাগে নি।

আমি। আশ্চর্য্যের কথা! তিনি ব্যবহারিক জগতে এত democrat অথচ সুরের জগতে এত aristocratic হলেন কি কোরে আমিও বুঝতে পারি নি।

তাঁহারা। কি জানি মশাই, আমরা মূর্খ মানুষ গানের সম্বন্ধে, তবে এই টুকু নিজেদের মনের কথা আপনাকে বোলতে পারি যে গানের যদি কথাই না বুঝতে পারি তা হ'লে গান হ'ল না, হয়ত সুর হ'ল, কিন্তু সে সুরে চিঁড়ে ভেজে না, প্রাণে আরাম পাই না।

আমি। ভাল কথা। এতে আর তর্ক কোথায় হচ্ছে? আপনার শুধু সুর ভাল লাগে না, কারুর ভাল লাগে, বাস। আমার সবই ভাল লাগে, গাইতে পারলে। আপনাদের কি গান ভাল লাগে?

তাঁহারা। ভাল লাগে কীর্ত্তন, বাউল, সেন মশাইয়ের গান, রজনী সেনের গান, রবি বাবুর গান, এমন কি আপনাকে বোলতে আর লজ্জা কি—থিয়েটারের গান পর্য্যন্ত, তবে ঐ ওস্তাদী গান কিছুতেই নয়।

আমি। আমার কাছে যে নির্লজ্জভাবে কথা কইলেন এর জন্য ধন্যবাদ। বাকী সব গান আপনাদের ভাল লাগে বুঝতে পারি, ওস্তাদী ভাল লাগে না বুঝতে পারি, কিন্তু রবি বাবুর গান ভাল লাগে স্বীকার করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কথা বোলে মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস রবি বাবুর গান যাদের আপনারা cultured snobs বলেন, কেবল তাঁদেরই ভাল লাগতে পারে—এই ধরুন যাঁরা পর্দ্দা মানেন না, যাঁদের মোটর আছে, যাঁরা মেয়েলী ভাবে কথা কন্ এবং সুর সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নি।

তাঁহারা। দেখুন, ঠাট্টা জিনিষটা তর্ক নয়।

আমি। তর্ক নয় সে কথা মানি, কিন্তু গালাগালির অপেক্ষা ঠাট্টার সাহায্যে তর্ক বেশী সহজে জেতা যায়।

তাঁহারা। সে যাই হোক্—আমাদের মনে হয় যে গানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতাকে ফুটিয়ে তোলা। এই যেমন 'সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই' যদি আপনি অত্যন্ত চীৎকার ক'রে গান তাহ'লে আমাদের কখনও ভাল লাগবে না। রজনীকান্তের 'ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে' গাইবার সময় বোমা ফাটার আওয়াজ কানে আপনারই কি ভাল লাগে, তা সুর যতই শুদ্ধ হোক না? আবার দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' গানটি বেশ জোরে তেজের সহিত গাইতে হবে—তা না গেয়ে, যদি কবিতার অন্তর্নিহিত রস কিম্বা ভাবটিকে অগ্রাহ্য কোরে কেবল সুরের কেরদানী দেখান, তা হ'লে আমাদের মর্ম্মস্পর্শ ত কোরবেই না; উচ্চ সঙ্গীতও হবে না। আমরা সাধারণ লোক, আপনার সঙ্গে গানের আলোচনা কোরতে ভয় হয়।

আমি। লজ্জা, ভয়—এ দুটই হয়! বাকীটা পড়ে থাকে কেন? ঘৃণাটাও প্রকাশ করুন না, তা হ'লেই ষোল কলা পূর্ণ হবে। যাই হোক, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—এ তিন থাকতে নয়, অতএব সেগুলি অবহেলে দূরে ফেলে আসুন, যুক্তির সাহায্যে তর্ক করা যাক। যতক্ষণ আমার 'ভাল লাগে' এবং 'আপনার ভাল লাগে না' সঙ্গীতের কষ্টিপাথর হবে, ততক্ষণ কোন মীমাংসাই

হ'তে পারে না। কেন না আমার ভাল লাগে অতএব সেটি ভাল বলবার দাম্ভিকতা আমার নেই এবং কেবল আপনাদের ভাল লাগে বোলেই যে আমার আদরের সামগ্রী হবে এ রকম বিনয় আমার ধাতে নেই। তর্কবুদ্ধি দিয়ে উপভোগ করা যায় না জানি, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই কোনটি ভাল লাগা উচিত এবং কেন ভাল লাগল ঠিক করা যাবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবশ্য আমরা মানুষ র'য়েছি—তার পর যদি থিয়সফিষ্টদের আশা অনুযায়ী সকলেই অতিমানুষ হ'য়ে যাই, তখন না হয় intuitionএর সাহায্য নেওয়া যাবে। কি বলেন ?

তাঁহারা। এক হিসাবে আপনি ঠিক কথাই বোলেছেন, কিন্তু গান শোনবার সময় তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলি ভুলেই যাবো। এখন যেকালে আপনি গান গাইছেন না, তখন তর্কই করা যাক,—সময় কাটান চাই ত !

আমি। বেশ। গোলমাল বাধে সুর এবং কথা নিয়ে। ওস্তাদেরা বলেন, সুর প্রধান, আপনারা বলেন কথা প্রধান। অর্থাৎ খাঁ সাহেবদের মতে কথা সুরের দাসীগিরি কোরবে, এবং আপনাদের মতে সুরই কবিতার দাসীগিরি কোরবে। প্রথমে আপনাদের মতই আলোচনা করা যাক্। এই মতের সপক্ষে আপনারা আর কি বলেন শুনি ?

তাঁহারা। আমাদের গানে সুরও রয়েছে, কথাও রয়েছে, অতএব যে গানে শুধু সুর আছে তার চেয়ে আমাদের গানে একটি বেশী অলঙ্কার রয়েছে, যার দ্বারা আমরা গানের ভাবকে বেশী উপলব্ধি কোরতে পারি।

আমি। এ দেখছি বরকর্ত্তার কথা। একটি বেশী গহনা দিলে কি আপনাদের পুত্রবধূটি 'সুন্দরতরী' হ'য়ে উঠবে ? যদি গহনাটি বে-মানান হয় ?

তাঁহারা। সেত পূর্ব্বেই বোলেছি—গহনাটি মানানসই হওয়া চাই।

আমি। আর যদি কচি মেয়েটি শুধু গহনা না পরতে চায় ?

তাঁহারা। কোন্ মেয়ে শুধু গহনা চায় না দেখিয়ে দিন ?

আমি। এই যাঁরা গহনার সঙ্গে বেনারসী চান্। উপমা ছেড়ে দিলেই বুঝতে পারবেন যে কবিতার গায়ে সুরের গহনা খাপ খাওয়ান বড় জহরীর কায। কেননা সাহিত্যের রস সুরের রস হ'তে বিভিন্ন, সাহিত্যের বিষয় বিভিন্ন, সাহিত্যের পদ্ধতি বিভিন্ন।

তাঁহারা। বুঝলাম না।

আমি। না বুঝে বড় আনন্দ দিলেন। গানও ভাষা, কবিতাও ভাষা, তবে গান রাগ লোভ, মোহ, প্রেম প্রভৃতি মনোভাবকে প্রকাশ কোরতে ব্যস্ত নয়। সাহিত্যের কারবার ঐ সব নিয়ে। সুর অত্যন্ত অ-বাস্তব জিনিষ, সুরের রাজত্বে 'মন হার মেনে যে কেঁদে'। মন সেখানে একটি ইন্দ্রিয় মাত্র, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরই মতন। ওস্তাদেরা চোখ বুজে, কানে আঙ্গুল দিয়ে গান গেয়ে থাকেন, দেখেন নি কি ? সাহিত্য কিন্তু মনোভাবের পর্য্যায়েই নিয়ে আসছে, সেই জন্য

সাহিত্য কিম্বা কবিতা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যও যে অ-বাস্তব নয় তা বলছি না, তবে সাহিত্যের স্তর সুরের স্তর হতে ভিন্ন।

তাঁহারা। গান শুনে আলেকজান্দারের মনে কত রকম ভাব উদয় হয়েছিল বি,এ, ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি।

আমি। আমারও পড়তে হয়েছিল, কিন্তু সে কবিতার লেখক ড্রাইডেন, যাঁর কবিতা লেখা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না, কবিত্বই তাঁর একমাত্র ব্যবসা ছিল। যাক্, আমি ত Sir Oracle এর মতন বিভিন্নতার কথা কেবল জোর কোরে, ঘন গলায় বোলেই গেলাম—এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ধরুন লক্ষৌএর এক টঙ্গাওয়ালা 'যায়াঁ বেচ্‌নে যাতি দহিরি' গান গাইতে গাইতে এই শীতের রাত্রে টঙ্গা হাঁকাচ্ছে। অস্থার্থ এই যে গোয়ালিনী দই বেচতে যাচ্ছেন, কান্‌হাইয়ে তাঁর ওড়না ধরেছেন, কিছুতেই ছাড়বেন না, শেষ কালে গোয়ালিনী শ্যামের গালে একটি ছোট্ট অথচ জোরাল ঠোনা মেরে দই বেচতে গেলেন। শ্যাম-পিয়ারীর মনে কি কি ভাবনা উঠেছিল আপনারা সকলেই বুঝতে পারেন। এবং টঙ্গাওয়ালাও বুঝতে পেরেছিল—সেই জন্য সে কখনও ত্রস্ত, ভীত, শঙ্কিত, কখনও রাগান্বিত, কম্পিত, কখনও অনুশোচনাপূর্ণ হৃদয়ে গানটি গাইছে। অন্ততঃ আমার তাই মনে হচ্ছে।

তাঁহারা। লক্ষৌএর টঙ্গাওয়ালার মধ্যে এখনও ভাল গাইয়ে আছে।

আমি। নিশ্চয়—শুনুন তার পর কি হ'ল। হঠাৎ সে 'দহিরি' কথাটির ইকারের ওপর তান ধরল। তখন আর তার গলায় ওসব ভাব পাচ্ছি না, যা পাচ্ছি তার নাম জানি না, সেটি একটি গতি মাত্র, অথচ আপনাতে আপনি পূর্ণ, একটি সাবলীল ক্রীড়া যার রীতি নীতি বাইরের জগতের নয়, নিজের জগতের, যেখানে স্বার্থের লেশ মাত্র নেই।

তাঁহারা। স্বার্থ কেন আসবে ?

আমি। এইত এতক্ষণ ছিল, দইএর হাঁড়ি বাজারে নিয়ে না বেচতে পারলে গোয়ালিনী বাড়ীতে এসে মুখ দেখাবে কি কোরে ? সেই জন্যই ত কানাহিয়াকে ঠোনা মেরে চলে যেতে চেয়েছিল, হঠাৎ টঙ্গাওয়ালা তান তুললে তাই না সে থেমে গেল ?

তাঁহারা। তার পর।

আমি। তার পর আর কি ? তান ফুরিয়ে এল, টঙ্গাওয়ালা কবিতার জগতে ফিরে এলেন—এবং ঠোনা খাওয়ার প্রতিশোধ নিলেন, ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিয়ে। গানও থেমে গেল, কবিতাও চুকে গেল, টঙ্গাওয়ালা পিয়ারীর মতনই নিজের কাযে গেলেন—অর্থাৎ সোয়ারী খুঁজতে।

তাঁহারা। এর থেকে কি প্রমাণ হ'ল ?

আমি। প্রমাণ আর আর কি হবে ? আর্টিষ্ট ব্যবহারিক জগতের ধার ধারে না, সাহিত্যিক একথা জেনেও জানেন না, কেন না তাকে বই বেচে খেতে হবে, সেই জন্য ব্যবহারিক জগতকে

একটু খোসামোদ কোরতে হয়, আর গায়ক—সে জানেও না যে জগৎ আছে কি না, বোধ হয় জগৎ তাকে বড় অবহেলা কোরেছে, এই জন্যই সে জগতের কথা ভুলে গিয়েছে। সে যাই হোক এঁরা দুজনেই আর্টিস্ট, আমাদের পৃথিবীতে তাঁরা অন্য লোক থেকে Ambassador হয়ে এসেছেন—সেই জন্য তাঁদের বাসস্থান আমাদের জমীতে হলেও তাঁদের নিয়ম কানুন সবই আলাদা। আইন অনুসারে তাঁদের কার্য্যাবলীর ওপর আমাদের কোন হাত নেই। চাই কি আমরা কেউ কেউ তাঁদের চাকরী নিয়ে, রাস্তায় অন্য লোককে খুন কোরে, তাঁদের আশ্রয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারি। যেমন আমি করছি। ও সব কথা ছেড়ে দিন—প্রত্যেক আর্টিস্টই এই ব্যবহারিক জগতের মানসিক অবস্থাকে Spring-boardএর ব্যবহার করে—তাকে ঠেলে জয় মা বোলে আকাশে ঝাঁপ দেয়। সাহিত্যিক বেশীক্ষণ আকাশে থাকতে না পেরে জলে পড়ে যান—ধরণীর সঙ্গে তাঁর নাড়ার যোগ কিঞ্চিৎ বেশী, এবং গায়ক আকাশের স্বাধীনতা পেয়ে আরো উড়তে যান। তাঁর পাখাতেও মোম আছে—তাঁকেও পড়তে হয়। পাখীরা উড়তে পারে—আমি মানুষ—আমি কেন পারব না? এরকম ন্যায় সঙ্গ করা যায় এক প্রকার অবস্থায়। সেই জন্যই বোধ হয় সুর এবং সুরার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তাঁহারা। সেই জন্য অন্ততঃ সুর গাওয়া উচিৎ নয়।

আমি। ঠিক বোলেছেন। পুসিফুট ও-কথা বোলতে পারতেন।

তাঁহারা। দেখুন, মাথায় গোটা কয়েক আপত্তি গজ গজ কোরছে। বোলে ফেলি, গ্যাস বার করাই ভাল, কি বলেন? আপনি বোল্লেন সুর নিজের নীতিতে চলবে—অর্থাৎ আমরা যাকে বলি নিজের খেয়ালে, বেশ, তাহলে সুরে ব্যক্তির স্থান কোথায়? সুরের কি তাহলে expression থাকবে না? এবং আপনি যাই বলুন ওসব বড় চালিয়াতী কথা বোলে মনে হচ্ছে।

আমি। প্রথম দুটি প্রশ্ন একই আপত্তির দুইরূপ—আমি তার জবাব পরে দিচ্ছি। শেষ আপত্তিটা বড় মজার। একটু বিশদ কোরে বলুন।

তাঁহারা। যখন কোন আর্টিস্ট বলেন আমাদের জগৎ বিভিন্ন, তোমরা আমাদের মনের খোঁজ পাবে না তখন কি আমরা তাঁকে এই উত্তর দিতে পারি না, 'বাপুহে, তা হলে তোমার আর্টেরই দোষ'? আর্ট মানে কোন গুপ্ত মন্ত্র নয় যে অন্যে বুঝতে পারলেই তার শক্তি লোপ পাবে। কিন্তু এই আর্টিস্টরাই এবং আপনার মতন সমালোচকবৃন্দই আর্টকে একটি esoteric ব্যাপার কোরে তুলেছেন—যে গুপ্ত মন্ত্রের দ্রষ্টা আপনারাই, সাধক আপনারাই। আপনিই কতবার গণপূজার বিপক্ষে আপত্তি তুলেছেন এই বোলে যে হট্টমন একটি মিথ্যা মন্ত্র, এবং সেই মিথ্যা মন্ত্রের প্রচার করেন তারাই যাঁরা এই মন্ত্রের ওপর একটি cult খাড়া কোরে নিজেদের কায গুছিয়ে নিতে চান। যদি গুপ্ত মন্ত্রের বিপক্ষে হন, তাহলে এই রকম গুপ্ত cultএর বিপক্ষেও অস্ত্র ধরুন।

আমি। কিন্তু আর্টের কার্য্যকলাপ গুপ্ত কে বোলে? নিজে আর্টিষ্ট হয়ে দেখুন না, তখন বুঝবেন যে আর্টের প্রকৃতি অত্যন্ত সরল, সহজ এবং প্রকাশ্য।

তাঁহারা। তাই যদি হয় তাহলে ছবিতে লম্বা আঙ্গুল কেন হয় বুঝি না কেন, সুরের ওস্তাদি বুঝি না কেন, আপনার কাছে impressionist, expressionist প্রভৃতি কত দলের ছবি রয়েছে তার মধ্যে একটাও ভাল লাগে না কেন?

আমি। কারণ অবশ্য রয়েছে, তবে যদি আহত না হন তা হলে বলি। আপনারা ভয় পান বোলে। বেশ সহানুভূতি দিয়ে বুঝুন দেখি, পারেন কি না? ভয়ে ঈর্ষা আসে।

তাঁহারা। এখানে ঈর্ষা কোথায় এল?

আমি। ঈর্ষা এল যখন আপনাদের political আত্মমর্য্যাদায় ঘা পড়ল। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে মানুষ বড় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে, যদি কেউ বলে 'তুমি আমার চেয়ে ছোট' সে কথাটা না তলিয়ে দেখেই তার নাকে ঘুঁসি মারবে, তার পর প্রশ্ন তুলবে 'আমি তোমার চেয়ে কিসে কম? আমিও ভালবাসি, আমিও ইংরাজি জানি, গ্রেজুয়েট, আমিও বার্ক, মিল পড়েছি, আমারও ভোট আছে--আমি কিসে কম'? মণ্টেগু সাহেব এদেশে আসবার পর থেকে কেউ যে আমাদের চেয়ে বড়, এমন কি ভিন্ন, তা ইঙ্গিত দেবার অপেক্ষা পর্য্যন্ত আমরা করি না, ঘুঁসি তুলেই আছি। কোন লোক দেখলেই আমরা তাকে এই বোলে প্রথম সম্ভাষণ করি 'দেখবেন যেন চাল দেবেন না তাহলে ঘুঁষি মারব'। আমি বলি এ রকম অবস্থা সুস্থ মনের চিহ্ন নয়। আর্টিষ্ট বেচারীরাও ত প্রাণপণে আপনাদেরই সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা কোরছে। যখন ওস্তাদকে বাড়ীতে মুজরা দেন, তখন সেকি প্রাণপণে আপনাকে সন্তুষ্ট কোরতে চেষ্টা করেনা? তবে তার সন্তোষ দানের বিধানটি আপনার কাছে কটু ঠেকতে পারে। একবার ওস্তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখবেন, দেখতে পাবেন সে বেচারী কত প্রাণপণে চেষ্টা কোরছে বাহবা নেবার জন্য, একটু হেসেছেন ত বেচারী সেলাম কোরতে কোরতে অস্থির, একটু অন্যমনস্ক হয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প কোরেছেন কি বেচারী বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে। অনবরতঃ এই রকম অপমান সহ্য কোরলে তারাও যে দাম্ভিক হবে না এ রকম আশা করাই অন্যায়। ওস্তাদ যখন গায় তখন সে থাকে নিজের রাজত্বে, সেটি আপনার নয় আমার নয়, সে আপনাকে অনুনয় কোরছে, নিজেকে ব্যক্ত কোরছে তার সুরের ভাষায়, যতদূর সে পারে ততদূর, আপনি এই ব্যবহারিক জগতে রইলেন, সে যে অন্য জগতের ভাষায় কথা কচ্ছে তা জানলেন না, সে ভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা দূরে থাক তার কাছে প্রত্যাশা কোরলেন যে, অন্য জগতের খবর দিক আপনাদের বোধগম্য ভাষায়, এমন কি তার কাছে চেয়ে বোসলেন একটা রাজকন্যা, অর্দ্ধেক রাজত্ব। সে বেচারী আপনার এই প্রকার সদিচ্ছা পালন কোরতে পারল না, তার ক্ষমতা নেই বোলেই। আপনাদের আবদার মেটাতে পারলে না বোলেই না তাকে দাম্ভিক বোলছেন? আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন—কেন তার কাছে এই সব চেয়েছিলেন?

পৃথিবীতে আপনার গণ্ডীই কি একমাত্র গণ্ডী? আপনাদের আপত্তি এক কথায় আর্ট-সংক্রান্তই নয় পলিটিক্স সংক্রান্ত। ডিমক্রাসীই আপনাদের সর্ব্বনাশ কোরেছে। ঐ জিনিসটা আমাদের সাম্য শিখিয়ে দাম্ভিক কোরেছে, ঈর্ষাপরায়ণ কোরেছে। যে আর্টিষ্ট সে দেবতার বাচ্ছা।

তাঁহারা। আপনার বক্তৃতা শুনে বড়ই উপকৃত হলাম। আপনার বিনয়ের সীমা নেই। আমরা জানি আপনি একজন ওদেরই দলের।

আমি। বাপ তোলেন কেন মশাই? আমার বাবা মানুষ ছিলেন এবং নেহাৎ ভাল মানুষটি ছিলেন না। আমি আর্টিষ্ট নই artistic—

তাঁহারা। আপনি যাই হোন তর্কটা অন্য পথে নিয়ে যাবার আপনার কোন অধিকার নেই।

আমি। আজ্ঞে হাঁ আছে—একটি জন্মগত অধিকার আছে, বাপ দাদা দেবতা নন, সব উকীল। যাই হোক এবার সেই মৌলিকতা, expression সংক্রান্ত আপত্তির জবাব দেবো। একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে—বক্তৃতা দিতে বেড়ে লাগছে, আপনারা এই রকম মাঝে মাঝে আসবেন। হাঁ মৌলিকতা আর expression একই জিনিষ।

তাঁহারা। রাবণের দশটা মাথাকে একটা কোরলে রামের পক্ষে সুবিধা হয় কিন্তু রাবণের তাতে হয়ত অসুবিধা হতে পারে।

আমি। যতটা অসুবিধা ভাবছেন ততটা নয়, দশটা মাথা নিয়ে শীতের রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফেরার কথা মনে করুন। আপনাদের এবং আমাদের সকলেরই ধারণা এই যে, আমাদের সুরে যেকালে পর্দ্দা বাঁধা তখন একমাত্র ব্যক্তিগত মৌলিকত্বের স্থান expressionএ অর্থাৎ নয় মুখ-ভঙ্গীতে, নয় গলার আওয়াজে। যেমন, রজনী সেনের 'ফুটিতে পারিত গো' গানটিতে একটি পদ আছে 'দুদিন ভেসেছিল সুখ বিলাসে।' সেই সময় গলার আওয়াজটি ভাসিয়ে দিতে হবে, মুখটি করুণ কোরতে হবে, তবেই আপনারা বুঝবেন যে প্রাণ দিয়ে গাইছে, তবেই সুরে expression খুঁজে পাবেন। বেশ কথা, তাহলে গানের অন্য পদেও প্রাণ প্রত্যাশা করুন, যেমন 'দুদিন ভেসেছিল, দুদিন কেঁদেছিল' গাইবার সময় গায়কের একবার হো হো করে হাসা উচিৎ, একবার ভেউ ভেউ কোরে কাঁদা উচিৎ। একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম—

তাঁহারা। জানি সে গল্প, রিজিয়া প্লে হচ্ছিল ত?

আমি। আজ্ঞা, আর একবার হালিসহরে ঐ রকম ঘটনা হয়েছিল। একটি ধোপার ছেলে প্রফুল্ল সেজেছিল। ছোট ছেলেটি—গোপাল বুঝি তার নাম—তার মরবার সময় প্রফুল্ল এমন মড়া কান্না তুললে যে লোকেরা হেসে অস্থির। আমি সাজ ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলাম যে প্রফুল্ল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, লোকে তার মাথায় জল দিচ্ছে, তবু তার কান্না থামে না। অবশ্য ও রকম expression আপনারা চান না, অত বাড়াবাড়ি নয়, তবে ঐ ধরণের একটা কিছু।

অর্থাৎ গান গাইবার সময় গাইয়েকে ভাও বাতাতে বলেন, নাচতে বলেন, অ্যাকটিং কোরতে বলেন। সে বেচারী অত কায এক সঙ্গে পারবে কেন? সে যে সুর নিয়েই ব্যস্ত।

তাঁহারা। তা হ'লে গাইয়ে শুধু তোতাপাখীর মতন স্বরসাধন কোরে যাবে—শুধুই সার্গম গেয়ে যাবে? expression এবং individuality আপনি মানেন না?

আমি। লাখ বার মানি। মানি বোলেই ত যার-তার গান ভাল লাগে না। প্রথমে কি মানি না তাই বলি। expression হচ্ছে বিলাতী বুলি। ক্রোচে সাহেব এই কথাটা আজ কালকার বাজারে চালিয়েছেন। তাঁর ভাবের ঘরে কোথায় চুরি তা Ogden, Richards প্রভৃতি সমালোচকেরা ধরে দিয়েছেন। Expression মানে ভাবের অভিব্যক্তি নয়, কেননা কোন ভাবের অভিব্যক্তি একটি কমা, ফুলস্টপেও থোলে। তা হলে এক আর্টের সঙ্গে অন্য আর্টের পার্থক্য কোথায়? প্রত্যেক আর্টের বিষয় বিভিন্ন, উপায় বিভিন্ন, যে ভাব ব্যক্ত করছে তার স্বরূপ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন এবং প্রকাশের রীতিও ভিন্ন। Expression বোলতে প্রত্যেক আর্টের যে ল, সা, গু বোঝা যায় তা হচ্ছে ওজন-জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। কতটা প্রকাশ কোরলে, কথার, রংএর, লাইনের, স্বরের, পাথরের আঁশের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি প্রকাশিত হবে এই বুঝতে পারলেই আর্টিস্ট হওয়া যায়। এই প্রকাশ করার নামই ওজন-জ্ঞান, যে প্রকাশ কোরতে পারে সেই ব্যক্তিই individual original এবং তারই expression আছে, অন্যের নেই। যাকে feeling for the medium বলে তার নামই expression। আমি একটি ব্যক্তি, অতএব আমার অভিজ্ঞতা এক প্রকার, তুমি আর একটি ব্যক্তি অতএব তোমরা অভিজ্ঞতা অন্য প্রকার, অতএব আমার কানাড়া তোমার কানাড়া থেকে বিভিন্ন হতে বাধ্য, তা নয়। যে কানাড়ায় কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত ও কোমল নিখাদের মজা দেখাতে পারে, যে রেখাবের মহিমা বোঝাতে পারে, যে মধ্যমকে আদর কোরে ঘোমটা তুলে দেখাতে পারে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ আর্টিষ্ট। আর্টে আবার এ ছাড়া ব্যক্তিত্ব কোথায়? আমি সঙ্গীত-স্রষ্টা অর্থাৎ composerদের কথা বলছিনা, কিম্বা দিলীপ কুমারের কথা বলছিনা—তাঁরা নিজেদের style গড়ে তুলেছেন সেখানে ব্যক্তিত্ব বজায় রয়েছে। কিন্তু সাধারণ গায়কের পক্ষে প্রত্যেক noteএর শক্তি (potentiality) দেখানই উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। সেই জন্য নাছিনারা কেরাণীর মতন ভাল ভাল গান মুখস্থ করা উচিৎ, ভাল আর্টিস্টের কাছ থেকে। যখন সুরের স্বরূপ বুঝব তখন্ সৃষ্টি কোরতে পারব এ বাঁধা ধরা নিয়মের ভিতরেও।

তাঁহারা। এ একটা কাযের কথা বোল্লেন এতক্ষণের পর, কিন্তু আর্টিস্ট কই?

আমি। দেখুন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে,—সেইজন্য বোধ হয় চোখ জুড়ে আসছে। এখুনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পঁহুতে পারছি না, কাল গেলে হবে না? আশা করি অত তাড়াতাড়ি নেই।

তাঁহারা। অত ঠাট্টা কোরবেন না। বুঝেছি, আপনার খাবার দেরী হয়েছে। আচ্ছা আসছে শনিবার এসে আপনার মুখে রবিবাবুর গান সম্বন্ধে মন্তব্য শোনা যাবে। রবিবাবুর গান আপনার মতে না স্বর, না কবিতা অর্থাৎ সঙ্গীত। কোথায় সঙ্গীতকে বসান দেখা যাবে।

আমি। মাথার ওপর মশাই, মাথার ওপর। এই যেখানে আপনাদের বসাতে ইচ্ছা করে।

তাঁহারা। তা হলে হৃদয়ে নয়।

আমি। Two things cannot occupy the same space, কি কোরব ইয়ুক্লিডের দোষ !

* * *

বন্ধুরা বিদায় নিলেন। এ সব কি কথা হল ? তর্ক কোরতে গিয়ে বুদ্ধিতে শান পড়ে কিন্তু অন্যকে শানের পাথর ভাবাও ত ভাল লাগে না। মনকে বাঁচাতে গিয়ে হৃদয়কে হারাতে হয়। বুদ্ধি দিয়ে রসভাগ হয়, রসভোগের জন্য আর একটা আস্ত বড় জিনিসের দরকার—সেটা বুদ্ধিরও বড়, প্রাণেরও বড়। এমন কি উপভোগ করবার ইচ্ছা শক্তির চেয়ে বড়, অথচ সব মিলিয়ে একটা। সেটা আমার মধ্যে রয়েছে, অথচ আমাকে নিয়েও রয়েছে। তার নাম কি Personality ?

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দশচক্র

(১২)

শশী বলিয়াছিল 'একটা ফাঁড়া কেটে গেল'। ফাঁড়া কি এত সহজে কাটে ? একজন এঞ্জিনের তলায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। আমরা বলিলাম তাহার ফাঁড়া কাটিল। কিন্তু সংবাদ লইলে হয়ত জানিতে পারিব, এ লোকটা পূর্ব্বে ভয় ও বিরক্তির নাম জানিত না, আজ কিন্তু কথায় কথায় ইহার বুক ধড়কড় করে, কথায় কথায় ইহাকে অসহিষ্ণু হইতে দেখা যায়। ইহার দেহ শতখণ্ড হয় নাই, কিন্তু ভিতরের মানুষটা উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। ইহার ফাঁড়া কি কাটিয়াছে ? যদি কাটিয়া থাকে ত রামনয়েরও কাটিয়াছে।

সন্ন্যাসীকে ডাকা হইয়াছিল বলিয়া আসিয়াছিলেন, hypnotic suggestion করিয়াছিলেন বলিয়া রোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। সোজা কথা। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই। তবু রামের

মনে একটা 'কিন্তু' আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকল সমস্তার শেষে তিনি নাস্তিকতার যে দাঁড়ি টানিয়াছিলেন, 'কিন্তু'র চাপে বাঁকিয়া তাহা একটা প্রকাণ্ড note of interrogationএ পরিণত হইয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে 'ভুল করি নাই ত'? যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, বুঝিতেছি তাহার পশ্চাতে আরও কি কিছু সত্তা আছে? ইচ্ছা বলিয়া একটা পদার্থকে সংক্রমিত করা যায় নাকি—একজন হইতে আর এক জনে, এক লোক হইতে আর এক লোকে, এক কাল হইতে আর এক কালে, এবং দেশকালের অতীত কোন ইচ্ছাশক্তিস্বরূপ হইতে অনন্ত দেশকালে?

রামের মনের এই অবস্থায় একদিন যোগেন্দ্র আসিয়া বলিলেন "চল, একবার সাধুদর্শন ক'রে আসি। শুন্‌তে পাই তোমার এ সন্ন্যাসীটী যেমন জ্ঞানী তেমনি সাধক।"

রাম বলিলেন "বেশ ত, তাতে আমার কি?"

যোগেন্দ্র। আহা ভয় পাচ্ছ কেন? তিনি ত জোর ক'রে তোমাকে ধার্ম্মিক ক'র্‌বেন না।

যোগেন্দ্র বুঝিয়া সুঝিয়া রামের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া গদা ছুড়িলেন, রামও হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পাছে সত্যভীরু বলিয়া পরিচিত হন এই ভয়ে যোগেন্দ্রের অনুগমন করিলেন।

সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যোগেন্দ্র বলিলেন "বাবা, আপনার কাছে একজন নাস্তিক ধ'রে এনেছি।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন "নাস্তিক কেন বল্‌চেন? উনি কি সত্যই বুঝেছেন, কিছু নাস্তি? তা ত নয়। ওঁর মনে সংশয় হয়েছে কিছু অস্তি কি না।

রাম। হাঁ, আমি সংশয়ী।

সন্ন্যাসী মাথায় হাত ঠেকাইয়া রামকে নমস্কার করিলেন। এবং বলিলেন, "সংশয় যে বিধাতার প্রসাদ। যার মনের চক্‌মকিতে সংশয়ের ঘা পড়েছে, তার মনে আলো জ্বল্‌লো ব'লে।"

রাম। হাঁ, নূতন আলো পাবার জন্য আমি সব সময়েই প্রস্তুত আছি—

সন্ন্যাসী। থাক্‌তেই হবে। সংশয়ী যে। সংশয়ীর মন, এ যে চষা জমি,—বীজ গ্রহণের জন্য উন্মুখ। যার মনে সংশয় নেই, নিশ্চয় এসে গেছে, সে ত মৃত। তার মন পাথরের মত জমাট হয়ে গেছে। তাতে আর কিছু গজাবে না।

যোগেন্দ্র। তা আপনি দিন কিছু বীজ। চষা জমি প'ড়ে থাক্‌বে এই রকম?

সন্ন্যাসী। আমি দোবো? আমার কি আছে? চিরদরিদ্র! একেবারে রিক্তহস্তে এসেছি, একেবারে রিক্তহস্তে ফিরে যাবো।

যোগেন্দ্র। আপনি যদি দরিদ্র হন ত আমরা কোথায় যাব? ভাল বীজ পাব কোথায়?

সন্ন্যাসী। পাবেন কোথায়? বসুন্ধরা এত বীজ পেলে কোথা থেকে? তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিবিধ তরু গুল্মের বীজ বপন ক'রে গেছে কে,—যুগ যুগান্তর আগে?

যোগেন্দ্র। আপনি বল্‌চেন ভগবান্ দেবেন। সেই ভগবানেই যে ওঁর বিশ্বাস নেই।

সন্ন্যাসী। বিশ্বাসের কি প্রয়োজন? জলের মধ্যে মাছ আছে। সে দেখ্‌চে উপরকার temperature কমচে, আর সেই ঠাণ্ডা জল এসে তলায় জমছে। নীচেকার temperature উপরের চেয়ে কেবলি কম হয়ে যাচ্চে। তার বিশ্বাস এই রকম করে এক সময়ে সমস্ত জলটা জমে যাবে, নীচে থেকে সুরু ক'রে উপর পর্য্যন্ত। অনাদি কাল থেকে সে এই বিশ্বাস ক'রে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। আজও কিন্তু জল জম্‌লো না।

যোগেন্দ্র। কিন্তু আমি যে আন্‌লুম্ ওঁর মনে ভগবানে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য।

সন্ন্যাসী। বিশ্বাস জন্মাবার ত কথা নয়। তিনি ত চান না আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি। তা যদি চাইতেন তাহ'লে কি নিজেকে আমাদের বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় কর্‌তেন না? করেন নি কেন?

রাম। আপনি বল্‌চেন ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় ন'ন, অতএব অবিশ্বাস্য। অথচ এমনি ভাবে কথা কইচেন, যেন তিনি আছেন।

সন্ন্যাসী। অন্ধ বল্‌চে "আমি আলো দেখ্‌তে পাই না।"

রাম। অন্ধের কাছে আলো নেই। সে শুধু আলো শব্দটা মুখস্থ করে রেখেছে।

সন্ন্যাসী। আমরাও মুখস্থ ক'রে রেখেছি যে ঈশ্বর ব'লে একজন আছেন, এবং তিনি আমাদের বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অতীত।

রাম। মুখস্থ ক'রে রেখেছি ব'লেই যে তা সত্য হবে এমন কোন কথা নেই।

সন্ন্যা। সত্য ত নয়। আমি আছি বোদ্ধা, আর তিনি আছেন বোধ্য, এ দুটা সত্য হতে পারে না। হয় আমি আছি, নয় তিনি আছেন। হয় চক্ষু আছে, আলো নেই। নয় আলো আছে, চক্ষু নেই।

রাম। কিন্তু আমি আছি এটা আমার কাছে সত্য।

সন্ন্যা। আপনি আছেন। আপনি দ্রষ্টা বলে রূপ আছে, শ্রোতা ব'লে শব্দ আছে। আপনার রূপরসাদি বোধশক্তি আছে ব'লে রূপরসাদি আছে, রূপরসাদিমৎ এই জগৎ-প্রপঞ্চ আছে।

রাম। আপনি বল্‌ছেন এ জগতের অস্তিত্ব আমার ওপর নির্ভর করবে। আমি কিন্তু এটা স্বীকার করি না।

সন্ন্যা। হ'তে পারে আমারই ভুল। আচ্ছা, আমার হাতেএকটা পাতা আছে। এর রং কি? আপনি বলবেন সবুজ। আর আমরা যাকে colour blind বলি সে বল্‌বে লাল। পাতার সত্যি রং কি?

রাম। আমি বলবো পাতা ব'লে একটা বস্তু আছে। তার থেকে আলো পরিচালিত হচ্ছে। এবং সেই আলো নানা চোখে নানা রকম উপলব্ধি জাগাচ্ছে।

সন্ন্যা। বেশ! এর আকার কি রকম? আপনি বলবেন তাঁরের ফলার মত। আমি আমি বলবো, না। এই পাতার গায়ে অসংখ্য কাঁটা রয়েছে। তাদের প্রত্যেকটা তিন ইঞ্চি ক'রে লম্বা। এই কাঁটাগুলো সূর্য্যরশ্মির সব কটা rays absorb ক'রে শুধু infra-red rays reflect করুচে। তাই আমরা দেখতে পাই না, photographic plateএও ধরা যায় না। কাঁটাগুলি ভীষণ বেগে নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে এবং তার থেকে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ বেরুচ্ছে। কিন্তু স্পন্দনের rate 45000 এর ওপর বলে কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি না। এবং তাদের character consistency and arrangement এ রকম যে আপনাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ে কোন সাড়া জাগায় না। মশা গায়ের ওপর বস্‌লে তার কটা পা কোথায় কি ভাবে আছে যেমন প্রায় টের পাই না, সেই রকম। এখন আমাদের বল্‌তে হবে, যে এই পাতার একটা আকার আছে, কিন্তু আকার কি রকম ঠিক জানি না, এ খানিকটা স্থান জুড়ে বসে আছে, কিন্তু কতটা স্থান জুড়েছে ঠিক জানি না। বাস্তবিক পাতা সম্বন্ধে objectively আমার বিশেষ কিছু জানা নেই।

রাম। কিছু জানি। পাতা ব'লে একটা পদার্থ আছে জানি। সে আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে আমার উপলব্ধির বিষয় হচ্ছে জানি। তবে তার স্বরূপ সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়ত কোন কোন অংশে ভ্রমাত্মক।

সন্ন্যা। এখন মনে করা যাক্ যে এই পাতার character and consistency উপরকার সেই কাল্পনিক কাঁটার মত। তা হ'লে পাতা আছে এ জ্ঞানও আপনার থাক্‌তো না। অর্থাৎ পাতার পাতাত্ব, পাতা সম্বন্ধে আপনার perceptionএর উপর নির্ভর করুচে। এই একই পাতা আপনার কাছে এক রকম, আর এক জনের কাছে আর এক রকম।

রাম। তা ত নিশ্চয়।

সন্ন্যা। আমি সেই কথাই বলতে চাই—আপনি আছেন এই টুকু শুধু আপনার জানা, বাকীটা আপনার কল্পনা। আপনি আছেন তাই জগৎ আছে। তাকে চতুষ্কোণ বলেন ত সে চতুষ্কোণ, গোলাকার বলেন ত গোলাকার। আপনি আছেন তাই জগদতীত এক ঈশ্বরও থাকতে পারেন। তাঁর সগুণত্ব নির্গুণত্ব আপনার উপর নির্ভর করুচে। এ সমস্তই আপনার সৃষ্টি। একমাত্র আপনিই আছেন। ত্বমসি তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো।

সন্ন্যাসীর এই কথাগুলি বেলাচলবাতিকরাকুলিত সিন্ধুতরঙ্গের মত রামময়কে ত্রস্ত-বিপর্য্যস্ত করিয়া ফিরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া রাম বলিলেন "হাঁ এ রকম ভাবা যেতে পারে যে, আমরা জগতের স্বপ্ন দেখছি।"

সন্ন্যা। স্বপ্নই দেখছেন—[illegible]।

রাম। কিন্তু না কখনও প্রত্যক্ষ করি নি তা ত স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না।

সন্ন্যা। কে বল্লে? সহরে গরু বাঘ দেখে ভয় পায়। অথচ সে পূর্ব্বে কখনও ব্যাঘ্রের হিংস্রত্ব প্রত্যক্ষ করে নি।

রাম। সে করে নি, তার পূর্ব্বপুরুষ কেউ ক'রেছিল। এবং তার দেহযন্ত্রে সেই পূর্ব্বপুরুষের যে অংশ আছে তাতে সেই ভয়ের ছাপ আছে।

সন্ন্যা। দেহযন্ত্র বল্লে আপনার বোঝবার সুবিধে হয়?

রাম। হাঁ। আমি এটাকে যন্ত্র ব'লেই জানি।

সন্ন্যা। কিন্তু ভস্মীভূত দেহযন্ত্র মৃত্যুর পর এসে দেখা দেয় কি ক'রে? আপনি বলবেন মিথ্যা কথা। কারণ ওটা আপনার all matter theoryর সঙ্গে মেলে না। একটা কি সংশয়ীর কথা হ'ল? এ যে নস্ত গোড়ার কথা। আপনি বল্‌বেন, আত্মা বল্লে কিছু বুঝি না। Matterটাই বুঝি। Matter দিয়ে যা বোঝা যায় না, তা বুঝতে পারি না।

রাম। হাঁ তাই।

সন্ন্যাসী। কিন্তু matter কি আপনি বোঝেন? One volume of gas at −273°C has no volume, has no extension, is no matter. কিন্তু আর এক ডিগ্রী temperature বাড়ালেই সে matter হয়ে পড়্‌বে এটা আপনি বুঝেছেন? আপনাদের matter space occupy করে বসে আছে। আর সেই matter ফুঁড়ে ফুঁড়ে, সেই space occupy করে আর একটা পদার্থ রয়েছে, Ether,—an immaterial matter এই immaterial matter বা hypothetical substance এর wave হচ্ছে আলো। এটা কি আপনি Mind এর চেয়ে ভাল বোঝেন? আমার সামনে আপনি বসে আছেন, mind না matter?

রাম। আমি বল্‌বো, matter.

সন্ন্যাসী। কিন্তু এ matter আমার দৃষ্টিকে প্রতিহত করছে না ত। আমি যে আপনার দেহের ভিতর দিয়ে, আপনার পশ্চাতে একটা কৃষ্ণ সর্পকে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি।

রাম ও যোগেন্দ্র দুই জনে এক সঙ্গে পিছনের দিকে চাহিলেন, এবং এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে সত্যই একটা কৃষ্ণবর্ণ সর্প ছিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন 'ভয় করবেন না। আপনার দেহের মত এ সর্পও আপনার মায়া।'

বাস্তবিক, দেখিতে দেখিতে সর্পটী কোথায় পলাইয়া গেল কি মিলাইয়া গেল ভাল বোঝা গেল না। রামময় বলিলেন "আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আপনি এমন দৃষ্টিশক্তি কি করে পেলেন?"

সন্ন্যাসী। দৃষ্টিশক্তি ত সকলেরই আছে। কেবল চোখ খুলে দেখার ওয়াস্তা।

যোগেন্দ্র। আমাদের চোখ কি খুল্‌বে না কখনো?

সন্ন্যাসী। খুল্বে। সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পেলেই খুল্বে। তিনিই খুলে দেবেন। ঋষিরা সত্যি ছেলেখেলা করে যান নি।

তখন যোগেন্দ্র সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন "বাবা, আপনি আমাদের মুনি ঋষি। আপনি আমাদের উদ্ধার করুন,—আমরা মহাপাতকী।"

রামময়েরও ইচ্ছা হইয়াছিল, এমনি করিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইতে। কিন্তু পারিলেন না, লজ্জা হইল। কেবল বলিলেন "আমাকেও পায়ের ধূলো দিন। আপনার কাছে আজ আমি বড় ঋণী। এত রত্ন আপনার আছে, অথচ কোন আড়ম্বর নেই। গায়ে ছাইভস্মের মত তাকে বহন করছেন।

সন্ন্যাসী। ছাইভস্ম বলেই কোন দরদ নেই।

রাম। ছাইভস্ম!

সন্ন্যাসী। ছাইভস্মই। যা' দ্রষ্টব্য তাকে দেখ্তে পারায় গর্ব্বের কি আছে?

যোগেন্দ্র। বাবা, আমাকে পায়ে স্থান দিতে হবে। আমি অতি অধম,—

রাম। আমাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।

সন্ন্যাসী। শাসন করবার অধিকার ত আমার নেই।

রাম। অমন করে পালালে চল্বে না। আমি আপনাকে ছাড়্বো না।

সন্ন্যাসী। জগদীশো বিজয়তে। কলাগাছের ভেলা করে মানুষ যদি নদী পার হতে চায় হোক্। ভেলার আপত্তি নেই।

তখন রাম ও যোগেন্দ্র দুইজনেই ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন 'আশীর্ব্বাদ করুন',—

সন্ন্যাসী। শিবমস্তু।

রাম। আশীর্ব্বাদ করুন যেন সত্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারি।

সন্ন্যাসী। আশীর্ব্বাদ করি,—অশ্মাভব, পরশুর্ভব।

রাম। তাই বলুন যেন পাথরের মত দৃঢ় হতে পারি, যেন পরশুর মত বাধা ছেদন করে বেরুতে পারে।

সন্ন্যাসী। অশ্মা ভব পরশুর্ভব।

তারপর, দুইজনে যখন বিদায় লইয়া চলিয়া আসিতেছেন, তখন সন্ন্যাসী তাঁহাদের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন আপনার জলদমধুর কণ্ঠের উপদেশবাণী:—

"ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং, কুশলান্ন প্রমদিতব্যং, সত্যান্ন প্রমদিতব্যং"

এই কথাগুলি, ঠিক এই সুরে ইহার পূর্ব্বে তিনি অনেকবার আবৃত্তি করিয়াছেন। আজ কিন্তু ইহাতে একটা নূতন অর্থ দেখিতে পাইলেন। সকাল বিকাল যে আগুন লইয়া খেলা করিয়াছেন আজ তাহারই একটা স্ফুলিঙ্গ আচম্বিতে তাঁহার অতীত জীবনের শুষ্ক চালায় গিয়া

পড়িল। সবটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, এবং এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ভস্মসাৎ, ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন "কি মোহ! ত্যাগের সাধনা করলুম, ভোগের আশায়? পদব্রজে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে এলুম, বনে জঙ্গলে পড়ে রাত কাটালুম, শীতাতপ-সহিষ্ণু দেহ,—অনশন অর্দ্ধাশনে ভ্রূক্ষেপ করিনি। এ সব করেছি কি টাকার জন্য, আর মানের জন্য? কি অভিশাপ! কি অভিশাপ!—সত্যান্ন প্রমদিতব্যং। হায় হায়! আমাকে প্রমত্ত করিল কিসে?" তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মাল্য, কবচ, গেরুয়া কম্বলের সমস্ত আভরণ ও আবরণ ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া ধূমবিনির্মুক্ত বহ্নিশিখার মত দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং নবদীক্ষিত শিষ্যদিগের উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন "মশায়, মশায়, শুনুন।" কোনও সাড়া না পাইয়া পথে ছুটিয়া বাহির হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে রাম ও যোগেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে বলিলেন "আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনাদের প্রবঞ্চনা করেছি।"

ইহাতে দুইজনের ভক্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা পায়ে পড়িতে উদ্যত হইতেই সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিলেন 'পায়ে পড়বেন না। আপনারা আমাকে চেনেননি। আমি সাধু নই, জুয়াচোর। ভোগের আশায় এই রকম ছলনা করে বেড়াই।'

রাম বলিলেন "প্রভু আমাদের আর ছলনা করবেন না।"

রামের ব্যবহারে সন্ন্যাসী প্রায় ক্ষেপিয়া গেলেন। উদ্যত মুষ্টিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "মূঢ়! ভেল্কি দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়,—তুমি সংশয়ী?"

রাম। প্রভু সংশয়ী ছিলুম। আজ আমার সংশয় কেটেছে।

সন্ন্যাসী দেখিলেন ভেড়ার মত ইহাদিগকে যতবারই পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে ততবার ইহারা ঘাড়ের উপর আসিয়া লাফাইয়া পড়িবে। তখন অসহ্য ঘৃণায় শুধু একবার 'যাও' বলিয়া তাঁহাদের বিদায় দিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

একজন শিষ্য সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, এমন করে সব ফাঁস করে দিলেন কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন 'আর ফাঁস নয়, ভাই, আর ফাঁস নয়। আজ আমার বাঁধন কেটেছে। আজ আমার মুক্তি।'

তারপর?

ফেনিলোচ্ছল-তরঙ্গ-বিভীষণ বিশাল ব্রহ্মপুত্র আজ ভারত মহাসাগরে মিলাইয়া গেল। এখন হইতে আর তাহার 'তার পর' নাই।

(১৩)

সন্ন্যাসীর কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া জগত্তারিণীর বিশ্বাস হইয়াছে যে সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। খুব সম্ভব আর তাঁহাকে পরের সেবার প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হইবে না। কাজেই এখন নির্ভাবনায় গৌরীকে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।

জগত্তারিণীকে অকৃতজ্ঞ বলিতে পারি না। গৌরীর স্মৃতি এখনও তাঁহার মনে মাধুর্য্যের সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু মিষ্ট বলিয়া sugar of leadকে কে ঘরময় ছড়াইয়া রাখে? সে দূরে কোথাও থাকুক। ইনি না হয় মাসে মাসে তাহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিবেন। তাহাকে কাছে রাখিয়া সংসারটা ছারেখারে দিবেন কোন সাহসে? গৌরী সম্বন্ধে রামের এতটা দুর্ভাবনা ছিল না। তবু গৃহিণীর প্ররোচনায় দু একখানা চিঠি যাদবকে লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন সাড়া পান নাই।

এদিকে গৌরীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার প্রতি এ বাড়ীর অনেকেরই একটা হিংস্রভাব ছিল। কেবল জগত্তারিণীর আড়ালে আসিয়া সে আত্মরক্ষা করিত। সেই জগত্তারিণীও তাহার সহিত কথা বন্ধ করিয়াছেন। সে বেশ বুঝিল এ বাড়ীতে তাহাকে আর কেহ চাহে না। অথচ ইহাদেরই করুণার ভিখারী হইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে, ইহাদেরই ঘাড়ে চাপিয়া। এই লজ্জায় সে মরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এই লজ্জার প্রাণঘাতক সেঁকোবিষ সে শিশুকাল হইতে অনেক পরিপাক করিয়াছে।—ইহাতে আর সে মরিবে না।

শশী মাঝে মাঝে গৌরীর কথা ভাবিয়া অকারণে উতলা হইয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, ইহার প্রাণের অন্তঃস্থলে কোথায় একটা অগ্নিকুণ্ড যেন অনির্ব্বাণ তেজে অহর্নিশি জ্বলিতেছে। কিন্তু যখনি সে কাছে আসিয়াছে গৌরীর হাসিমুখ দেখিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ফিরিয়া গিয়াছে। এই শুভ্রফেনহাস্যের নীচে কতটা মন্থন চলিতেছে, বেচারা তাহা বুঝিত না।

নিশি হাসি দেখিয়া অত সহজে ভুলিত না। সে গৌরীর দুঃখ ঠিক বুঝিয়াছিল। এবং সে নিজে যে এই দুঃখের মূল ইহাও সে জানিত। কিন্তু কি করিবে?

কি করিবে? এমন প্রশ্নও তাঁহার মনে উদয় হইল, সে ত ইচ্ছা করিলেই ইহার দুঃখ দূর করিতে পারে। এতদিন করে নাই কেন? তাহার ধর্ম্ম নাই, পরকাল নাই। সে কোন্ স্বর্গের কোন্ অপ্সরার আশায় এই অভাগিনীকে নরকের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে? কাপুরুষতার আত্মগ্লানি তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল গৌরীকে বিবাহ করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ইতিপূর্ব্বে কয়েকটা বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা এরূপ বিবাহ করিয়াছেন, নিশির মত কয়েক জনের কাছে তাঁহাদের সৎসাহসী বলিয়া খ্যাতি ছিল। নিশি আজ আপনাকে মনে মনে ইঁহাদের দলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিল।

নিশি জানিত মাতাকে কিছুতেই সম্মত করা যাইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেকগুলি শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়াছেন, বটে, কিন্তু বেদানার বীজের মত বাংলাদেশের মাটীতে সেগুলি নিষ্ফল

হইয়াছে। মাতার অমতে, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত পৃথক্ হইয়া এ বিবাহ করিতে হইবে। তবে তাহার একটা সান্ত্বনা ছিল, পিতার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ হইতে সে বঞ্চিত হইবে না। তাহার পিতার হৃদয় যে কত বড়, ও কত উদার, একদিনের আলাপ হইতে সে বুঝিয়াছিল। সে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "বাবা মনে কর তোমার যদি মেয়ে থাকতো, এবং অবিবাহিত অবস্থায় বা বিধবা অবস্থায় তার গর্ভে যদি সন্তান হ'ত, তা হ'লে তোমার কেমন লাগ্‌তো ?"

রামময় বলিয়াছিলেন "ভাল লাগতো না।"

নিশি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তা হলে কি করতে ?"

ইহার উত্তরে রামময় বলেন "কি করতুম ? শশী যদি আজ ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে প'ড়ে পা ভাঙে ত কি করি ? পা ভাঙলে আমার ভাল লাগে না কিন্তু করবো কি ? আমি জানি ছেলেদের মনে ঘুড়ি ওড়াবার সখ থাকে, অনেকে ঘুড়ি ওড়ায়, দু' এক জন পড়েও যায়, এবং এদের মধ্যে কারুর কারুর পা ভাঙে।"

যিনি পতিতাকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে প্রধান যে আপত্তি তাহা তাঁহার দিক হইতে আসিতে পারে না। আর অন্য সব আপত্তি নিশি অনায়াসেই খণ্ডন করিতে পারিবে, তাহার বিশ্বাস।

এইখানে সে একটু হিসাবে ভুল করিয়াছিল। রামময় ইতিমধ্যে ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াছেন। এটাকে সে জমা ওয়াশীলের কোন ঘরেই ফেলে নাই। কিন্তু ধর্ম্ম ত এত উপেক্ষার বস্তু নয়। "আমি যাহা বুঝি না তাহাই সত্য।" —ইহাই হইতেছে ধর্ম্মের মূল কথা। "আমার বুদ্ধিতে গলদ থাকিতে পারে। অতএব নিজের বুদ্ধিতে না চলিয়া হরি-নরির বুদ্ধি লইয়া চলিব" এ কথা যে না বলিতে পারে তাহার মনে ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না। এ কথা যে বলিতে পারে সে যে কি না বলিতে পারে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সাধারণ লোকে যুক্তি হইতে মীমাংসায় উপনীত হয়, আর ধার্ম্মিকেরা মীমাংসা হইতে যুক্তিতে অবতরণ করেন। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে রামময়ের মনে বিধবা বিবাহের অনৌচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আসিয়া গিয়াছে। অনৌচিত্যের পক্ষের যুক্তিগুলা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। তিনি তর্কাতর্কির দিকে না গিয়া বলিলেন "আমার ভয় হয়, গৌরী এ বিবাহে সম্মত হবে না। হিঁদুর ঘরের মেয়ে ত।"

এটী রামের ভয় নয়। এইখানেই তাঁহার একমাত্র ভরসা। তিনি জানিতেন নিশির এখনকার মনোবেগ গৌরীর অশিক্ষা, অসভ্যতা প্রভৃতি সকল বাধাকেই অতিক্রম করিয়া চলিবে। গৌরীর নিজের অসম্মতি ছাড়া আর কেহ ইহাকে বাধা দিতে পারিবে না।

(১৪)

বিকালবেলায় গৌরী ছাদ হইতে শুকান কাপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল

নিশি ডাকিল 'গৌরি !"

গৌরী একখানা কাপড় কুঁচাইতে কুঁচাইতে কাছে আসিল।

নিশি বলিল 'গৌরি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?—তোমার এ জীবন কি তোমার ভাল লাগে ?'

গৌরী সবিস্ময়ে নিশির মুখের দিকে চাহিল।

নিশি বলিল 'এ্যঁ—আমি বল্‌ছি,—এই মনে কর, যদি এমন হয় যে তোমার সংসার আছে, স্বামী আছে,—'

গৌরী খুব হাসিল। বলিল "ও, তাহলে মানুষটাকে দিয়ে একবার মাথার জট ছাড়িয়ে নিই।"

নিশি। আমি ঠাট্টা করছি না, গৌরি। সত্যই মনে কর—

গৌরী। কেন পাত্র দেখচেন নাকি ? দেখবেন তার মাথায় টাক থাকে না যেন।

নিশি খপ্ করিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিল। বলিল "আচ্ছা, আমি যদি তোমার স্বামী হতুম"—

এবার গৌরী হাসিতে ভুলিয়া গেল। নিশি আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু গৌরী হাত ছাড়াইয়া নীচে চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে একটা রেকাবীতে কয়েকখানা পাঁপর ভাজা লইয়া হাজির হইল। বলিল 'খান।'

নিশি মন্ত্রমুগ্ধের মত রেকাবী লইয়া বলিল, "কিন্তু তুমি আমার কথার উত্তর দাওনি।"

গৌরী একখানার পর একখানা কাপড় কোঁচাইয়া ফিরিতে লাগিল ; এবং নিশির দিকে না চাহিয়াই বলিল "ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, খেয়ে নিন।" নিশি কর্ত্তব্য বোধে এক টুকরা মুখে দিল। কিন্তু আহারে তাহার রুচি ছিল না। সে কথাটা শেষ করিয়া লইতে চায়। বলিল "আজকাল ত অনেক বিধবা মেয়ে বিয়ে করচে।"

"মরণ আর কি ?" বলিয়া গৌরী কোঁচান কাপড়গুলা কাঁধে ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

নিশি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাতের পাঁপর কখন ঝরিয়া পড়িল, খেয়াল ছিল না। তাহার কাণে কেবল একটা শব্দ বাজিতে লাগিল 'মরণ আর কি ?' একটা কথার ঝাঁকানিতে জগতের Kaleidoscopeএ pattern বদলাইয়া গেল। হায়, হায়! নিশি কাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল। এ যে উদ্ধারকে অভিশাপ মনে করে। সে অকারণে কত বড় স্বার্থত্যাগটাই করিতে যাইতেছিল। একটা কাল, কুৎসিৎ, অশিক্ষিত, অসভ্য নারীকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিতে যাইতেছিল। আজ ঐ একটা কথায় তাহার মোহ কাটিয়া গেল। সে বড় জোর গলায় হাঁফ ছাড়িয়া বলিল 'আঃ বাঁচলুম !" কিন্তু কৈ ? পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস যখন কোঁপলের মত বাহিরে আসিয়া ফণা তুলিল, তাহার বহু পূর্ব্বেই অন্তরের সমস্ত রস যে শুখাইয়া

কাঠ হইয়া গেছে। সে মস্ত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা এড়াইল, সত্য। কিন্তু সমুদ্রগর্ভ হইতে ত্বরিতোত্থিত ডুবরির ন্যায় এই আকস্মিক ভার লাঘবে তাহার চ'খ ফাটিয়া রক্ত ঝরিবার মত অবস্থা হইল।

নিশি আর দাঁড়াইল না। কোন কথা চিন্তা করিল না। তড়্ তড়্ করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া মাতাকে বলিল সে মধুসূদন বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, ভদ্রলোক, চারিদিকে সংস্পর্শ এড়াইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে, হঠাৎ হাত চিমটাইয়া গেলে, যেমন আশপাশের নোংরা লোক ও লগেজের মধ্যে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে, আজিকার মর্ম্মপীড়ায় নিশি তেমনি ধপ করিয়া তাহার চিরবিদ্বিষ্ট দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল।

আর গৌরী? তাহার হৃদয়ের কথা কেমন করিয়া জানিব? তবে তাহার বাহিরের খবর বলিতে পারি। তাহার প্রতি নিশির মনোভাব প্রকাশ হইবার পর আর একদিনও তাহাকে এ বাড়ীতে রাখা উচিত নয়,—একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন। রামময় লোক পাঠাইয়া মাদনকে ধরিয়া আনাইলেন; এবং গৌরীকে তাহার হস্তে গচ্ছিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

গৌরী যখন গাড়ীতে উঠিয়াছে, তখন শশী আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিল, আর বলিল "চলে যাচ্ছ কেন, গৌরি দি?"

গৌরী হাসিয়া বলিল, "আমি বাড়ী যাচ্ছি ভাই। অনেক দিন যে যাইনি।—মাকে বোলো তাঁর চ্যবনপ্রাশ টিনের বাক্সে আছে। চাবি তাঁর রিং-এ রেখে এসেছি।—আর দেরাজের ভেতর তোমার পশমী কোটটা আছে, কাচ্‌তে দিও।—আর—"—

শশী "আচ্ছা, আচ্ছা", করিয়া কোন রকমে কথা শেষ করিয়া চলিয়া আসিল। সে বড় হইয়াছে। দাড়িতে ইতিমধ্যে দুচারবার ক্ষুর দেওয়াও হইয়াছে। আজ গলার ভিতর হইতে কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়া, তাহার কামান বিজ্ঞ মুখকে পাছে সর্ব্বসমক্ষে বিকৃত করিয়া দেয়, এই ভয়ে সে পলাইয়া আসিয়াছে।

প্রায় দুই বৎসর পরে গৌরী দ্বিতীয়বার তাহার শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিল। উৎখাত দাঁত তাহার পুরাণ Socket এ ফিরিয়া গেল! শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

হৃদয়-নদীয়া

শুধু—ভক্তের হিয়া নদীটি বহিয়া
নদীয়ার প্রেম বহিছে আজ,
দোলে—প্রীতি-হিল্লোলে লীলা-হিল্লোলে
গোরা-শতদল তাহারি মাঝ,
ধ্যান-ধারণায় কর মন ধীর,
অন্তরে হের শচী-মন্দির,
আর—শুচি কর মন দেখিবে তখন
শ্রীবাসাঙ্গন করে বিরাজ,
যদি—রাখ এ নদীয়া হৃদয়ে ধরিয়া
সফল তোমার সকল কাজ।

হেথা—নিশি দিনমান কীর্ত্তন-গান,
অন্তরে তা'র উঠিছে রোল,
দিবা—রিণি ঝিনি ঝিনি বাজে কিঙ্কিণী
দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি বা'জিছে খোল,
শচীর দুলাল নাচে ফিরি ফিরি'
অবধূত ভক্ত নাচে তারে ঘিরি'
সাথে—নাচে মুকুন্দ, জগদানন্দ,
প্রেম পারাবারে কি কল্লোল,
উঠে—'হরি হরি' বোল, ভক্ত বিভোল,
জীবে ভগবান দিবেন কোল।

কেনো—শচীমায়ই হেরে ভকত-হৃদয়
ভরা জননীর কোমলতায়,
সদা—ভাঁটা ও উজানে গোর-প্রেম টানে
জীবন-তটিনী বহিয়া যায়,
ব্যথা-মাখা মুখ বিষ্ণুপ্রিয়ার
পরতে পরতে আঁকা এ হিয়ার
তাই—আপনার ছোট সুখ, দুখ তার
কল্লিনাক আর গণনা তায়,
নিজ—তুচ্ছ বিরহে চিত্ত না দহে
ছবি রহে যদি এ নদীয়ায়।

হায়—কেবনা হেথায় মাধুরী বিলায়
পুরী, দামোদর আর মুরারি,
গোরা—বলে' হরিদাস, শ্রীধর, শ্রীবাস,
গদাধর সদা ফিরে ফুকারি'
হাতে লয়ে' হেথা কলসীর কাণা
জগাই, মাধাই পথে দেয় হানা,

হেথা—কনক-কামিনী—কামনা নাগিনী
চালে হলাহল ফণি উথাড়ি,
আর—কাম-করী হায়, পায়ে দলে' যায়
প্রেম-অঙ্কুর বলে উপাড়ি'।

সদা—চিত্ত-উপবন করিতে দহন
কত দাবানল হেথা যে জ্বলে,
সোজা—পথে যেতে যেতে মোহ-মদে মেতে
কত না চরণ বিপথে চলে,
কত না ঝঞ্ঝা, কত ঝঞ্ঝাট,
সঙ্কটভরা কান্তার মাঠ,
হেথা—সুখের আশায় সাপের মাথায়
কত না উজল মাণিক জ্বলে,
আর—দারুণ তৃষায় মরীচিকা, হায়,
তৃষিতে ভুলায় জলের ছলে!

তবু—এ ঘোর বিপদে শচীসুত পদে
অর্পণ করি' হৃদয় প্রাণ,
শুধু—তুলি সংসার ডাক একবার
"গোরা ভগবান কর হে ত্রাণ."
মাভৈঃ মাভৈঃ, আর ভয় নাই
আসিছেন ঐ দয়াল নিতাই,
সাথে—আসেন শান্তিপুরের গোঁসাই
বিপদে শান্তি করিতে দান,
আর—বক্ষ পাতিয়া দেন হরিদাস
রক্ষা করিতে ভকত মান।

হায়—এমন প্রেমের নদীয়া কবে বা
হৃদয়ে সবার হ'বে উদয়,
আর—কবে অবিরাম জপি' হরিনাম
পাপ-সংসার যাইবে ক্ষয়,
দ্বিজে চণ্ডালে মুছে যাবে ভেদ,
উচ্চ-নীচের ঘুচে যাবে খেদ,
সেই—নবীন যুগের কে রচিবে বেদ,
প্রেম মৈত্রীর ঘোষিয়া জয়,
কবে—হৃদয়ে উদিয়া নদীয়ার চাঁদ
জ্যোৎস্না ছড়া'বে ভুবনময়!

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপের সমাজ-বিপ্লব

[ইউরোপ এখন কতকটা পৃথিবীর অধীশ্বর। ইউরোপের এই কৃতিত্বে মনে হয় সেখানকার সমাজ পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তিকে বড় পাকা মনে করিলেও চিন্তাশীলেরা সর্ব্বদাই উহার দোষগুণ পরীক্ষা করিতেছেন; ইহাই ইউরোপের আশার মূল। চিন্তাশীলদের মধ্যে Bertrand Russell খুব প্রসিদ্ধ। ইনি ইউরোপীয় সমাজ-নীতিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা আমাদের জানা উচিত; এই উদ্দেশ্যে উক্ত লেখকের কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ কথায় কথায় তর্জমা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে এই প্রথম প্রবন্ধ। বঃ সঃ]

(১)

মানব-সমাজ কালচক্র অবলম্বন করিয়া অনন্তের মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইহা যেমন এক দিকে একই কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে বারবার আবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনি আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াও চলিয়াছে। এ ঠিক যেন একই রাগকে বারম্বার আলাপ করা হইতেছে এবং প্রতিবারেই তার অস্থায়ী-উচ্চ হতে উচ্চতর সপ্তকে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে। ইহার মধ্যে মন্দ্র, মধ্য ও তারা স্বরগ্রামের এই তিন সপ্তকই পর্য্যায়ক্রমে লীলায়িত হইতেছে। যখনি ইহার সুর উচ্চতম সপ্তকে উপস্থিত হইতেছে তখনি ইহার মধ্যে আপনি বিরাম আসিয়া পড়িতেছে এবং সেই ক্ষণিক বিরামের পর ইহার সুর অবরোহণ-গতি অবলম্বন করিয়া আবার অস্থায়ীতে অর্থাৎ আরম্ভে ফিরিয়া আসিতেছে। আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতাও সম্প্রতি এইরূপ চরম-অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। অতঃপর ইহার অবনতি অনিবার্য্য।

এই আলাপের এক একটীকে স্বতন্ত্র-ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় ইহার কোনও উদ্দেশ্য নাই—ইহার শেষ যেন শূন্যে আসিয়া বিলীন হইতেছে; কিন্তু ইহার একটীর সঙ্গে আর একটীকে মিলাইয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি ইহা যে শুধু আপনাকেই প্রদক্ষিণ করিয়া শূন্যতার মধ্যে শেষ হইয়া যাইতেছে, তা নয়; ইহা যুগের পর যুগ পার হইয়া বিস্তারের মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিয়াছে।

সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনাক্রমে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, Egypt ও Babyloniaর প্রাচীন সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের দ্বারা, পারস্য-সাম্রাজ্য Macedonian সাম্রাজ্যের দ্বারা এবং Macedonian সাম্রাজ্য Roman সাম্রাজ্যের দ্বারা যথাক্রমে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। তারপর Romanরা Teutons ও আরবদিগের কাছে পরাভূত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক পর্ব্বে ইহাই দেখিতে পাই যে যখন কোন একটী সভ্যতা তার উন্নতির শীর্ষে গিয়া উপস্থিত হয় তখনি সে জরাগ্রস্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং আর একটী অভিনব সভ্যতা তাহাকে ধ্বংস করিয়া তাহারই ভগ্নাবশেষের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসে। এইরূপ যুগ-সন্ধিক্ষণে দণ্ডনীতির তিরোভাব-বশতঃ অনেক সময় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সঞ্চার হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা সাময়িক মাত্র। এই অভিনব শক্তি যখনি কালক্রমে নিজের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করিয়া তুলে তখনি দণ্ডনীতির প্রাদুর্ভাবে

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতাও আজ তার উন্নতির শীর্ষদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছে, এইবার তার চারদিকেই জরার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তার অন্তিম যে আসন্ন একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তা বেশ বুঝিতে পারা যায়; ইহার মধ্যে আমরা ইতিহাসের চক্রগতিরই লীলা দেখিতে পাইতেছি। জীবগণ যেমন কাল প্রেরিত হইয়া জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু পরম্পরার মধ্যে চক্রের ন্যায় জন্মজন্মান্তর আবর্ত্তিত হইতেছে এই মানব-সভ্যতাও ঠিক সেইরূপ আরম্ভ, উন্নতি, অবনতি ও অবসানের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে আবর্ত্তিত হইতেছে। শুধু এইটুকু মাত্র দেখিয়া বিরত হইলে আমাদের দেখা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং এই বিশ্ব-ব্যাপার আমাদের কাছে অর্থহীন বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু যদি আমরা একটী সভ্যতার সহিত তার পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার তুলনা করিয়া দেখি তাহলে দেখিতে পাইব যে ভূতাদি কালত্রয়ে জন্ম-বৃদ্ধি-জরা মৃত্যুর মধ্যে শুধু যে ইহারা নিরর্থক-ভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে তা নয়; ইহারা চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতে হইতে পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া বিস্তারের মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই অগ্রসর-গতির প্রকাশ আমরা প্রথম দেখিতে পাই জ্ঞানের বিস্তারে; তারপর দেখিতে পাই সাম্রাজ্যের আয়তনের প্রসারণে। এই জ্ঞান ও সাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে অতীত যুগে লোক-যাত্রার মধ্যে যে সব কীর্ত্তি ও কল্যাণের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা দেখিয়া ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আশান্বিত না হইয়া থাকা যায় না।

জ্ঞানের বিস্তার এবং সাম্রাজ্যের আয়তনের বৃদ্ধি—ইহারা উভয়েই যুগপৎ মঙ্গল ও অমঙ্গলের হেতু। বিজ্ঞানের প্রভাবেই আজ যুদ্ধ অধিকতর লোকক্ষয়কর হইয়া উঠিয়াছে এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপকতার দ্বারাতেই উহা এইরূপ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। যদিও ইহারা এইরূপ ক্ষতিকর তথাপি ইহাদের পরিহার করাও যায় না; কেননা উহাদের আশ্রয় ভিন্ন উন্নতিই হইতে পারে না। জ্ঞানের বিস্তার যে মঙ্গলের কারণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং আজ বিশ্বে যে অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহার প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করিতে গেলেই সাম্রাজ্যের বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ করিতে হইলে এমনি একটী সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহা জগতের বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে ভেদ-নির্দ্দেশ, উৎকৃষ্ট নীতি প্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত দণ্ডের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সঞ্জাত বিরোধের বিধানানুসারে মীমাংসা করিয়া দিবে। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে যে তাহার এক অংশে যাহা ঘটিবে তাহার সম্বন্ধে তাহার কোন অংশই উদাসীন থাকিতে পারিবে না, অমনই এইরূপ সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা প্রায় সেই অবস্থাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ বন্ধন ছিল না। Columbusএর আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে আমেরিকা সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট ছিল, তাহার সঙ্গে ইউরোপের কোনই সংযোগ

না সম্পর্ক ছিল না। Peter the Greatএর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সহিত Russian-দেরও কোনও সম্বন্ধই ছিল না। গত মহাযুদ্ধে সংহারের বিশ্ব-ব্যাপকতাই আজ মানুষের সহিত মানুষের সম-দুঃখ-ভাগিতাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

Industrialism (অর্থাৎ শ্রমী-শিল্পীদের প্রতিষ্ঠার নীতি) এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বিবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার থেকেই মানুষের সহিত মানুষের এই বিশ্ব-সঞ্চারিণী সমদুঃখ-ভাগিতার সঞ্চার হইয়াছে। ঐ Industrialism ও যন্ত্রের কল-কৌশলে ব্যবহার্য্যের উৎপাদন—ইহাদের উভয়েই বৈজ্ঞানিক-কর্ম্মপদ্ধতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহ হইতে আমাদের বর্ত্তমান যুগকে বিশেষত্ব দান করিয়াছে। এই বিজ্ঞান আপাততঃ যতই ক্ষতিকর হৌক পরিণামে যে ইহার প্রভাবে মানুষ উত্তরোত্তর অধিকতর সুখ ও সৌভাগ্যশালী হইবে তাহার সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে এইরূপই আশা হয় যে বর্ত্তমান অশান্তি পরিণামে মঙ্গলের মধ্যেই উত্তীর্ণ হইবে ; কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। ইতিমধ্যে যে সঙ্কট উপস্থিত তাহা বাস্তবিকই লোমহর্ষণকর এবং ইহা যে অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘোরতর হইবে তাহা আশঙ্কা করারও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুর্যোগে বিষয়-বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে, এই সংহার ব্যাপারকে যথা-সম্ভব ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইলে এবং নূতন সৃষ্টির কাজকে দ্রুত-সঞ্চারী ও বদ্ধমূল করিতে হইলে আমাদিগকে বর্ত্তমানের সমস্ত বাধা এবং ভবিষ্যতের সমস্ত বিপদের বিভীষিকার সম্মুখীন হইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে। এখন আমাদের জাতি, দেশ এবং অবস্থাগত সমুদায় মতবাদ ও সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়া নিরপেক্ষভাবে এই অবস্থার নিদান নির্ণয় করিতে হইবে। এই কাযে আমাদের বুদ্ধিকে নির্ম্মল ও চিত্তস্থ করিয়া বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট নীতি-সমূহের অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। আমাদের এই কাজ যাহাদের স্বার্থের বিরোধী হইবে তাহারা ইহার প্রতিকূলতাচরণ করিবেই করিবে এবং সেই সব প্রতিকূল পক্ষের শক্তিও নিতান্ত হেয় নয়। তাই বলিয়া অভিভূত হইলে চলিবে না। তাহারা আমাদের পথে যে সব ব্যাঘাতের সঞ্চার করিবে তাহা প্রতিহত করিবার জন্য আমাদের পুরুষকার অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

ধৈর্য্যশালী পুরুষকার কখনও ব্যর্থ হয় না। তারপর আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে এই যে লোকবলই শক্তির আকর। সম্প্রতি অশিক্ষা-বশেই মানুষ অশিব-শক্তির সেবা করিতেছে। মঙ্গলের কাজে লোক-সংগ্রহ করিতে হইলে লোক-শিক্ষাই তাহার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই শিক্ষার বিস্তারের পথে বাধা অনেক। তাহার মধ্যে প্রধান বাধা আমাদের অভ্যাস। আমরা যে আমাদের অভ্যাসকে মঙ্গলের অপেক্ষা বেশী ভালবাসি তাহার প্রমাণ আমরা পদে পদে

পাইয়া থাকি। ইহারই প্রভাবে আচার-বিচারকে পদচ্যুত করিয়াছে। আমাদের এই কাজে যত বাধা আছে তার মধ্যে এই অভ্যাসের বাধাই দুস্তর; কিন্তু তাই বলিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না; কেন না ইহা ভিন্ন উদ্ধারের আর গতি নাই। যে সকল মতবাদ এবং আচার এতদিন যুক্তিহীন শাস্ত্রবাক্যের উপর অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের উপর এখন মানুষের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা শিথিল হইয়া গিয়াছে। অতএব সমাজে এখন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। স্পর্শ-নিষেধ, ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং সামাজিক আচার ইত্যাদি সংস্কারের দ্বারাই অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রথমে নীতি ও শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন হয়। যে পর্য্যন্ত না কোনও সংশয়ী অবতীর্ণ হইয়া সেই সংস্কারসমূহের অসারতা ও অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করে, ততদিন তাহাদের আশ্রয়েই সমাজে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। Athensএর রাষ্ট্রনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক অভ্যুদয় সময়ে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল এবং তাহারই ফলে Athens ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে Italyতেও ইহাই ঘটিয়াছিল, এবং সেই ঘটনাবশেই সমস্ত Italy ধর্ম্মোন্মত্ত Spaniardদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল, আজও ইহাই সমগ্র সভ্য জগতকে অভিভূত করিয়াছে। যুদ্ধের প্রভাবে সমাজের সংস্কারগত বন্ধন সকল একে একে শ্লথ ও স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। এককালে পূর্ব্ব পিতামহদের দ্বারা আচরিত হইত বলিয়া এ যুগে কোনও প্রথা অথবা আচারগত ধর্ম্মানুশাসন আর প্রতিপালিত হয় না। এখন যুক্তি ও কারণ না দেখাইতে পারিলে শাস্ত্রের অনুশাসন কেহই আর মানিতে চাহে না। যুক্তি-বিরুদ্ধ ব্যাপারকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে হইলেই হেত্বাভাসের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই সকল অনুশাসন যাহাদের স্বার্থের অনুকূল তাহারা অগত্যা নানা মিথ্যা ও অলীক কথার সাহায্যে তাহাদের সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু পরিণামে এই সব প্রয়াস সার্থক হইবে বলিয়া অনুমান হয় না। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের উপর যে সব অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে, স্ত্রীলোকেরা এখন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিজিত জাতিরা বিজেতাদের প্রভুত্বের অধিকার সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হইয়াছে এবং শ্রমজীবীরা ধর্ম্মজীবীদের আধিপত্য ও অধিকার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থা যে বিপদসঙ্কুল এ কথা বলাই বাহুল্য; তবে ইহার মধ্যেও আশা করিবার অনেক আছে। যদি এই সংঘর্ষে নির্য্যাতিতেরা অনতিকালব্যাপী সংগ্রামের দ্বারা জয়যুক্ত হয় এবং তাহারা যদি এইরূপ জয়লাভ করিবার পর সমাজের ব্যবস্থা ও দণ্ডনীতিকে সুবিহিত করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে তাহা হইতে কল্যাণের উদ্ভব হইবেই হইবে।

যে সব শক্তিপুঞ্জের সংঘর্ষে এই অশান্তির আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের স্বরূপ কি এবং তাহাদের কাহার কতটুকু বল এবং জয়লাভের সম্ভাবনা কাহার কিরূপ, অতঃপর আমি তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কতকগুলি অভ্যুদয়শালী, তাহারা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আর কতকগুলি জরাক্রান্ত, তাহারা দিন দিন খর্ব্ব হইতেছে। এই শেষোক্তদের মধ্যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যাহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে বীর্য্যহীন হইয়া পড়ে নাই; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের অভ্যুদয়ের কাল তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারা দিন দিন খর্ব্ব ও হীন হইতেই থাকিবে। আর অভ্যুদয়শালী শক্তি সমূহের মধ্যে Capitalism অর্থাৎ ধনিকতা এবং Nationalism অর্থাৎ জাতীয়তা এখন অগ্রগণ্য। ইহাদের উভয়েরই পশ্চাতে বিজ্ঞান বিরাজ করিতেছে। এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোনও লিপ্ততা নাই বটে কিন্তু পরোক্ষভাবে ইহাদের কার্য্যকলাপকে সেই প্রভাবিত করিতেছে।

ধনিকতা ও জাতীয়তা ইহাদের উভয়েরই দুইটা রূপ আছে। যাহাদের হাতে ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে তাহারা ইহাকে একরূপে দেখে, আর যাহারা ক্ষমতাহীন তাহারা ইহাকে আর একরূপে দেখে। Capitalism অর্থাৎ ধনতন্ত্র এবং Socialism অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ইহারা Industrialism অর্থাৎ শিল্পতন্ত্রের দুই মূর্ত্তি। Imperialism অর্থাৎ সাম্রাজ্যতন্ত্র এবং Self-determination অর্থাৎ আত্ম-প্রতিষ্ঠা নীতি ইহারা Natonalism অর্থাৎ জাতীয়তার দুই প্রকাশ।

এই যুদ্ধে যাঁহারা জয়ী হইয়াছেন, তাঁহারা এই আত্মপ্রতিষ্ঠা নীতিকে শুধু শত্রুদের পক্ষেই প্রযোজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের যাহারা অধীনস্থ তাহাদের যে স্বাতন্ত্র্যের অথবা আত্ম-প্রতিষ্ঠার কোনও অধিকার আছে একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না Russianরা এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার নীতিকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের শত্রুদের অধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে ইহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে Socialisim অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের অঙ্গীভূত করিয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে যে ভাব-সঙ্করের উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে এই মিলন স্থায়ী হইতেই পারে না। Karl Marxএর যে নীতি তাহা বিশ্ব-সঞ্চারিণী এবং জাতীয়তার অতীত; সুতরাং এই Self determination অর্থাৎ আত্ম-প্রতিষ্ঠা নীতির সহিত তাহার মিলন হইতেই পারে না। ইহাদের সন্নিপাতে কেবল বিকারই বাড়িয়া চলিবে।

বিশ্বে এখন চারটী শক্তি প্রবল। Industrialism অর্থাৎ শিল্প-তন্ত্রের দুই রূপ, যথা:— Capitalism অর্থাৎ ধন-তন্ত্র এবং Socialism অর্থাৎ সমাজ-তন্ত্র এবং Nationalism অর্থাৎ জাতীয়তারও দুইটী রূপ, যথা, Imperialism অর্থাৎ সাম্রাজ্য-তন্ত্র এবং self-determination অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠা-তন্ত্র। Imperialism এবং capitalism একপক্ষে আর socialism এবং self-determination অন্য পক্ষে। এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ থেকেই বর্ত্তমান যুগের অশান্তির উদ্ভব।

শ্রী অমূল্যরতন প্রামাণিক

আকবর

হে সম্রাট, বসে আছি আজি তব সমাধির পাশে
একান্ত বিজন,
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার হতে ভেসে আসে
বিহগ-কূজন।
নীরব মধ্যাহ্ন বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন,—
কেহ কোথা নাই,
অকস্মাৎ মর্ম্মরিলে তরুশাখে মন্থর পবন
চমকিয়া চাই !

জীবনের গতি হেথা আসিয়াছে মন্দ হয়ে ধীরে
নাহিক স্পন্দন,
বন্দী হয়ে কেঁদে ফিরে সমাধির পাষাণ-প্রাচীরে
স্মৃতির ক্রন্দন !
কত দিবসের ব্যথা, জীবনের আবেগ উত্তাল
গিয়াছে নিভিয়া,
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দির অন্ধকার-জাল
ওঠে শিহরিয়া !

হে সম্রাট আজি তব সমাধির পরে নীলাকাশ
হাসে স্মিত হাসি,
প্রভাতের মুক্ত আলো তারে ঘেরি করিছে উচ্ছ্বাস
ঢাল' সুধারাশি।
শরতের পূর্ণরাতে তোমার আকাশ চন্দ্রাতপ
কিরণ উজ্জ্বল,
উন্মুক্ত অম্বরতলে সুগম্ভীর উঠিতেছে রব
মানব-মঙ্গল !

তোমার হৃদয় ভরি জেগেছিল যে মহা স্বপন
এ ভারত-ভূমি
এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন
বেঁধে দিবে তুমি !

সমাজ-আচার-ভেদ ধর্ম্মভেদ ভুলে যাবে সবে
রহিবে স্মরণ,
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন এক সাথে হবে
জীবন মরণ!

বিজিত-বিজেতা-ভেদ ভুলেছিলে হে মহৎ-প্রাণ
হিংসা ভুলেছিলে,
তোমার মহৎ প্রেমে দূর করি সর্ব্ব অসম্মান
কোলে টেনে নিলে!
হিন্দু-মোসলেমের দ্বেষ, রাজপুত-পাঠান-মোগল
সংঘাত জিনিয়া
মহাভারতের স্বপ্ন মেলি' স্থির আঁখি অচপল
দেখেছিল হিয়া।

হে সম্রাট জানে নাই ভয় কভু তোমার হৃদয়,
নিয়ত সম্মুখে
সন্দেহ সংশয়-চিন্তা জয় করি চলেছে নির্ভয়
সব সুখে দুখে।
বিপদের দিনে বন্ধু দাঁড়াইল সরি' পার্শ্ব হ'তে
একান্ত একাকী
আপন জীবন-ব্রত সাধিবারে চলিয়াছ পথে
লক্ষ্য স্থির রাখি!

কে এল তোমার সাথে, কে তোমারে ছেড়ে গেল চলে'
চাহ নাই ফিরে',
আপন প্রাণের স্বপ্নে সকল জীবন তব জ্বলে
বিদারি তিমিরে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পলে পলে আঁকিয়াছ ছবি
যে মহাভারত
আজিও সম্ভ্রম-ভরে দেখে শুধু, হে সম্রাট-কবি!
বিস্মিত জগৎ।

—"মোগল-পারশী-শিখ ভেদাভেদ রহিল না আর,
ঘুচিল কলহ,
নিখিল ভারত ভরি শিহরিয়া উঠিল আবার,—
দ্বন্দ্ব অহরহ
নিশান্তের স্বপ্নসম অতীতের স্মৃতি শুধু আজি
মিলাইছে মনে,
নবীন প্রীতির মন্ত্র মুখরিয়া উঠিতেছে আজি'
সকল জীবনে।"——

হায় স্বপ্ন টুটে যায় কঠিন ধরার ধূলা লাগি
দেখি আঁখি মেলি'
ক্রুর সর্প-সম হিংসা হিয়াতলে রহিয়াছে জাগি,
উঠিছে উদ্বেলি,
বিদ্বেষ সমুদ্র সম আস্ফালিয়া করিয়া গর্জ্জন
ছাইয়া হৃদয়
নীরব আকাশ তলে প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন
রক্তধারা বয়।

ধরণীর শ্যাম শোভা ক্লিষ্ট আজি রক্তের ধারায়.
ভায়ের শোণিতে
আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙে যায়
সংগ্রাম-ধ্বনিতে!
স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগে, রক্ত ঝরি পড়ে অহর্নিশি.
ওঠে শূন্য পানে
ক্রন্দন-গর্জ্জন-রোল-অভিশাপ-হাহাকার মিশি
কাহার সন্ধানে?

তোমার সমাধি পাশে বসি আজি পড়ে মোর মনে
তোমার কীরিতি,
নিখিল ভারত ভরি উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি।

আপন বিজয় গর্ব্ব ডালি দিলে একতার লাগি'
ভুলিলে গৌরব,
তোমার সমাধি পাশে বসি আজি আমি লব মাগি
স্মৃতির সৌরভ !

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে !
কল্যাণের পথ মোরা হারাইয়া আঁধারের মাঝে
ঘুরি দিশাহারা,
আমাদের দেশ তাই চণ্ডালেরে অপমানে লাজে
আমাদের কারা।

দেশের মহৎ স্বার্থ আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি
দিনু বিসর্জ্জন
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব মাঝে অন্ধকার পথে আছে জাগি'
অনন্ত মরণ।
ধর্ম্মের কলহ গানে আমরা ধর্ম্মের করি গ্লানি
নাহি জানি পথ
অন্ধকার মায়াজাল মুখরি উঠুক তব বাণী
মঙ্গল শাশ্বত।

হে মহৎ তব বাণী নিখিল ভারত ভরি আজি
জাগুক আবার,
উঠুক মিলন-মন্ত্র সাম্যবাদে কম্বুকণ্ঠে বাজি
টুটিয়া আঁধার।
হিংসা-দ্বেষ মন্ত্র শান্ত—ভুজঙ্গের মত শঙ্কাভরে—
হোক্ শান্ত হোক্
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্ আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক।

শ্রীহুমায়ুন কবির

পিছনের বল

"স'রে যা পাষণ্ড, কি করলি বল দেখি! তোর ছায়া মাড়িয়ে ফেললুম যে।" উত্তরে এই কথা বলিয়া দীনেশ ঠাকুর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পতিত যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন এবং কণ্ঠাগত ভীষণ অভিশাপবাণী উচ্চারণ করিবার নিমিত্ত পৈতার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভুবনের মুখখানা ক্ষণেকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল। বহুদিনের সঞ্চিত ঘৃণা ও অপমানের পুঞ্জীভূত জ্বালায় যেন তাহার সমস্ত অন্তরটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই প্রাণপণ বলে আপনাকে সম্বরণ করিয়া অতি উচ্চকণ্ঠে সে শ্লেষের হাসি হাসিয়া উঠিয়া বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "ফাঁকি দিয়েছি ঠাকুর মশাই, ফাঁকি দিয়েছি আপনাদের, আজ আর ঘৃণার কি পেয়ারের এক কাণা কড়ি ধারও ধারি না।" তারপর আরও একচোট হাসিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমার ছায়া মাড়িয়ে আপনার জাত যাবার আর কোন ভয় নেই। জানো ঠাকুর আজ আমি মুসলমান হয়েছি!"—বলিয়া সে স্ফীতবক্ষ আরও ফুলাইয়া ঠাকুর মশায়ের মুখপানে চাহিল।

দীনেশ ঠাকুর প্রথমে স্তম্ভিতের মত ভুবনের দিকে চাহিয়া রহিলেন! একটু পরে যেন স্বস্তিভরেই ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, "আপদ গেছে! কম জ্বালা তোদের নিয়ে আমাদের। রাস্তায় পর্য্যন্ত বেরুবার যো নেই, খালি ভয়, কখন ছুঁয়ে ফেলবি! তোদের সকলেই তোর মত বেরিয়ে যাক্ একে একে আমাদের দল থেকে, ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে আমরা শুদ্ধ হয়ে নেব।"

ভুবন তীব্রকণ্ঠে বলিল "তাই যাব ঠাকুর মশাই!—অনেকে গেছে অনেকে যাচ্ছে, সকলেই যাবে। আপনাদের জাত আর বড়াই নিয়ে আপনারা পড়ে থাকুন এক পাশে!" ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ভুবনের মনে বুঝি একটা কিছুর খোঁচা এখনও বিঁধিতেছিল। তাই সে যেন শক্তিসঞ্চয় করিয়া সেটা উড়াইয়া দিবার জন্য হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "কিসের গর্ব্ব তোমাদের ঠাকুর যে পিছনের দিকে একবারও ফিরে তাকাতে নেই। এতই গণ্ডির মায়া! ঠাকুর মশাই, আজ স্পষ্ট গলায় তোমার কাছে বলব, তুমিও যে মানুষ আমিও সেই মানুষ—কিন্তু পশুর চেয়েও হীন আমরা তোমাদের কাছে। তাই আত্মার সম্মান আজ যেখানে পেয়েছি—মাথা পেতে নিয়েছি সেই ধর্ম্ম—পিছনের সংস্কার ও হাজার যুগের অন্ধ মায়া-মমতা সবলে ছিন্ন ক'রে। কথাটা আপনাদের জানানো দরকার ছিল বলেই জানালাম।" বলিয়া ভুবন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

গ্রামের জমিদারের মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আজ বিদায় ছিল। ঠাকুর মশাই সেই দিকেই চলিয়াছিলেন। পথের মাঝে ভুবনের সহিত দেখাটা বুঝি বড় অশুভ ক্ষণেই হইল। ভুবনের কথাগুলি ঠাকুর মশায়ের গব্যঘৃতপুষ্ট মস্তিষ্কে অনেকগুলি চিন্তার সঞ্চার করিল। চাদরটি একটু কাঁধের উপর তুলিয়া তিনি ধীরে ধীরে জমিদার বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

নমঃশূদ্র ও ব্রাহ্মণ পাড়ার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। এই দুই পল্লীর অগণিত গৃহস্থের ধন, প্রাণ ও ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য ভুবন একটি শক্তিশালী দল গঠন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পাড়ায় তাহাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল বটে কিন্তু সেই নরদেবতাদের রক্ষা করিতে তাহাদের সতত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইত। আধ্যাত্মিক বলপ্রদায়ক মন্ত্রাবলী তাঁহাদের পারত্রিক মুক্তি বিষয়ে যতটাই অনুকূল হউক না কেন, সাধারণ জীবন সংগ্রামে তাহা এক বিদায় ভিন্ন অন্য কোন কাজেই সাহায্যকারী হইত না। এ দায়িত্বটা তাঁহারা বুঝি বলপূর্ব্বক চালাইয়াছিলেন অশিক্ষিত একদল পতিত যুবকদের হাতে। সে দায়িত্ব তাহারাও অস্বীকার করে নাই—প্রাণ দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। উপার্জ্জনহীন কত নিঃস্ব ব্রাহ্মণের সংসার চালাইবার জন্য তাহারা বছরের পর বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াছে, নিজ ক্ষেত্রজাত ফসল তাঁহাদের ঘরে ঢালিয়া দিয়া নিজেরা সানন্দে অভাব বরণ করিয়া লইয়াছে,—কিন্তু ইহার বিনিময়ে তাহারা পাইয়াছে—চির অপমান, চিরলাঞ্ছনা, আত্মার প্রতি নিদারুণ নিগ্রহ—এই স্বার্থ বিসর্জ্জনের জন্য কেহ তাহাদের প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা পর্য্যন্ত প্রকাশ করে নাই। পতিতের দত্ত অর্থগ্রহণে, ফসল ভক্ষণে জাতি যায় না। তাহাদের স্পর্শ করিলেই কিন্তু মহাপাপের সম্ভাবনা। তিলে তিলে দুইটি সমাজ এমন করিয়াই মরিতেছিল। একটা মরিতেছিল উচ্চদের অন্যায় অবিচারে, বেদনার চাপে। অপরটা মরিতেছিল পিছনের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া। কি সাধ্য সে সমাজের যে এই অগণিত পতিতাপা তাহার সহধর্ম্মী মানুষকে পিছনে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। মরণের শেষ ধাপে দাঁড়াইয়া বড় শুভক্ষণেই বুঝি পতিতদের আত্মসম্মান জাগিল। বাহিরের অবস্থার সহিত যাচাই করিয়া তাহারা তাহাদের ভিতরের মানুষটাকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব করিল না। সেই দিনই তাহারা সমকণ্ঠে বলিল--একটা মীমাংসা চাই। তাহারা তাহাদের সমাজের শক্তি ও অধিকারের দাবী করিতে লাগিল। তাহাদের প্রতিবাসীরা ইহার প্রতি ত মোটেই কান দিলেন না, অধিকন্তু এই নরকের কীটদের শাসন করিবার জন্য মহা মহা ঋষির ব্যবস্থিত মহা মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই দিন হইতেই সমাজে ভাঙ্গন ধরিল। এতদিন প্রবল প্রচার সত্ত্বেও অন্য ধর্ম্মের পাণ্ডারা যাহা সম্ভব করিতে পারে নাই, তাহা ক্রমে আপনিই সহজ হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময়েই একদিন নিজ দলস্থ তিনশত অনুগত পতিত যুবকের সহিত ভুবন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

* * *

কষ্টের আর শেষ নাই। আজকাল আর বড় একটা কেহ ব্রাহ্মণদের পদধূলি গ্রহণ এবং তদ্‌বিনিময়ে বিপুল অর্থ ও স্বার্থত্যাগকে পরম পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করিতেছে না। অধিকন্তু সকলেই তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার খোলস-ঢাকা স্বরূপটা চিনিয়া লইয়াছে। পথে ঘাটে তাঁহাদের সম্মান করিবার লোক নাই, তাই সে সম্মানও নাই। প্রতিদিন তাঁহাদের ঘরে আর নৈবেদ্য আসিতেছে না। গরমের দিনে পুকুরের জল কমিয়া আসিলে মাছগুলি যেমন আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া

এক জায়গায় কিলবিল করিতে থাকে, এই সব ঘটনায় চির-পরমুখাপেক্ষী ব্রাহ্মণ সমাজের ঠিক সেই দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইল। শিব মন্দিরে, চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহাদের সভা বসিতে লাগিল।

এই সময় একদিন একবেলা অনাহারে কাটাইয়া দীনেশ ঠাকুর উঠানের একপ্রান্তে কুশাসনে বসিয়া অনেক কথাই ভাবিতেছিলেন। দান-দাক্ষিণাও আজকাল একেবারে নাই। নমঃশূদ্রদের স্বেচ্ছাদত্ত দান ভুবনের প্ররোচনায় ও চেষ্টায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফল অনেকের কাছেই প্রকট হইয়াছে। তাঁহার কাছেও ক্রমশঃ হইয়া উঠিতেছে আজ এই একবেলা অনাহারে। একজন বৃদ্ধা পথ দিয়া এই সময় তাঁহার আটচালার দিকেই আসিতেছিল। তৃষিত নয়নে দীনেশ ঠাকুর তাহার গতির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহার হাতে একটা নূতন গামছার পুঁটুলি ছিল। আস্তে আস্তে উঠিয়া তিনি দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। পৈতাটা একবার আঙ্গুলে জড়াইয়া মনে মনে বলিলেন—"তুমি কি আমাদের অনাহারে রাখ্‌তে পার ঠাকুর! আমরা যে তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তান—।"

এই সময় পিছন হইতে কে আসিয়া বুড়ির লাঠিশুদ্ধ একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। রূঢ়কণ্ঠে কহিল "কোথায় যাচ্ছিস খুড়ি মা, এই বামুন পাড়ায়?"

বুড়ি ক্ষীণস্বরে বলিল "কে বাবা, ভুবন!—নতুন চাল এসেছে, ঠাকুরের পায়ে তাই চাট্টি নিবেদন করতে আস্‌ছিনু।"

বৃদ্ধার অপর হাত হইতে চাউল শুদ্ধ নূতন গামছাখানা ছিনাইয়া লইয়া ভুবন কঠিনকণ্ঠে বলিল, "তোমার ঠাকুর তোমার কাছেই আছে খুড়ি মা!—বাইরের ঠাকুরের পূজো দিয়ে আবার তাদের আস্কারা বাড়িয়ে দিতে চলেছ?—আমরা ত আর হিন্দু নই! ওরা আমাদের কিসের দেবতা?"

বৃদ্ধা কিছু বলিতে পারিল না। একবার মুখ তুলিয়া দীনেশ ঠাকুরের আটচালার দিকে চাহিল। দরজার অন্তরাল হইতে ঠাকুর দেখিলেন তাহার দুই চোখের কোণ বহিয়া জল ঝরিতেছে। ভুবন তাহার খুড়িমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। আজ দীনেশ ঠাকুরের মুখে কোন অভিশপ্ত বাণী আসিল না। অন্তরে অগ্নি-দেবতা সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে ফিরিয়া পূর্ব্ব আসনে বসিলেন!

সন্ধ্যাবেলা কন্যা অপর্ণা তাঁহার সামনে কোসাকুসি রাখিয়া বলিল "সন্ধ্যে সেরে নাও বাবা। রান্না হয়ে' গেছে। ওবেলা থেকে কিছু খাওনি ত!"

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। ম্লান আলোকের মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসুভাবে দীনেশ ঠাকুর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন।

মৃদু হাসিয়া অপর্ণা বলিল "জোগাড় আমি করে এনেছি! তুমি আচমন কর।"

শাস্ত্রীয় বিধিমতে আজ সন্ধ্যা হইল না। কোনরূপে মন্ত্রকটা আওড়াইয়া লইয়া দীনেশ ঠাকুর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে দেখিতে পাইলেন একখানা নূতন গামছা। জড়সড় করিয়া সেটা ঘরের

কোণে রাখা হইয়াছে। সেইটার দিকে চাহিয়া তিনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িলেন!—ফিরিয়া অপর্ণা পিতাকে দেখিল, বলিল "খেতে বস বাবা!—গামছায় ক'রে চাল ভুবনই পাঠিয়ে দিয়েছে বটে। কিন্তু—নিজের হাতে নয়।"

নিশ্বাস ফেলিয়া দীনেশ ঠাকুর বলিলেন, "যাক্ গে তুই ভাত দে অপর্ণা" বলিয়া তিনি একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে অপর্ণা তাহার দৈনন্দিন শিবপূজা করিবার জন্ত ফুলের ডালা হাতে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিল। দাওয়ার উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দীনেশ ঠাকুর কন্যার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বিকৃতভাবে কহিলেন "যাস্‌নে অপর্ণা মন্দিরের মাঝে —"

চমকিয়া অপর্ণা পিতার মুখের পানে চাহিল। কহিল "কেন বাবা

"মুসলমানের অন্ন খেয়েছি। তাদের কাছেই আত্মবিক্রয় করেছি! দেবসেবায় ত আমাদের আর কোন অধিকার নেই।" বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ বহিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কন্যাকে অবলম্বন করিয়া তিনি কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অপর্ণা কোন কথা বলিল না। ফুলের ডালা মাটির উপর নামাইয়া পিতাকে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

* * * *

গ্রামে একটা নূতন মসজিদ গাঁথা হইতেছিল। মুসলমানদের চাঁই করিম ভুবনকে বলিয়াছিল মসজিদটা প্রধানতঃ নবদীক্ষিত ভুবনের দলের জন্তই হইতেছে। খানিকটা গাঁথা হইয়া অর্থাভাবে তাহার কাজ বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় একদিন করিম ভুবনকে ডাকিয়া পাঠাইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ চলিল। অবশ্য তাহা অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধেই। সেই দিন রাত্রে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভুবন তাহার দলবল সহ গ্রামের জমিদারের বাড়ী ডাকাতি করিল। করিম ভুবনকে বুঝাইয়া দিল, ধর্ম্মের জন্ত জীবন অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে' সে কি এই সামান্ত দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে না!—পরদিন রাত থাকিতে দশ হাজার একটা প্রকাণ্ড তোড়া করিমের হাতে দিয়া ভুবন ছোট্ট দু'একটি কথায় বলিল, "মসজিদটা যেন শীঘ্র শেষ হ'য়ে যায়।"

করিম তার পিঠে দু'চারিটা চাপড় দিয়া বলিল, "এত মন-মরা হ'লে কেন ভাই? মসজিদ—সে ত তুমিও যেমন দেখ্‌বে, আমিও তেমনি দেখ্‌ব। এস চল, একটা পরামর্শ ক'রে ফেলা যাক্।……এস, দাঁড়িয়ে রইলে যে! ধর্ম্মের জন্ত টাকা এনে মনটা খারাপ হ'ল নাকি?"

ভুবন ধীরে ধীরে বলিল, "যে জন্তই হ'ক, মনটা খারাপ হয়েছেই—কিছুতেই মনটাকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে পারছিনা।……ডাকাতি করে ধর্ম্মের সেবা কি করা যায়?—কি জানি কেন মনের ভিতর এই কথাটাই জেগে জেগে উঠ্‌ছে। মনে যেন বল পাচ্ছি না।" করিম তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল "লোকে ধর্ম্মের জন্ত নিজের প্রাণ দেয়—ডাকাতি ত তুচ্ছ কথা; কোরাণ যখন পড়বে—"

ভুবন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কোরাণ তুমি আবার কবে পড়লে করিম?"

করিম ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে শুনিছি ত।"

ভুবন বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ সে কথা, আমার ভাল লাগছে না সেই তান—আমি এখন চল্লাম, পুলিশ আমার সন্ধান নেবেই—দিন কতক একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকি!"

* * * *

জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভুবনের দিন কাটিতে লাগিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত—তবু তারই মধ্যে মনে ভাসিয়া উঠে,—ধর্ম্মের জন্য চুরি, আর নিজের জন্য চুরিতে তফাত কি? —কখনও তাহার মনে হয়—ধর্ম্মান্তর লইয়া কি লাভ করিলাম—এই যে আমি ধর্ম্মের জন্য, আমার নূতন বন্ধুদের জন্য, এত বড় একটা কাজ করিলাম—কই কেউ ত আমার দোষের কি গুণের ভাগী হইল না। আবার কখনও সে ভাবে—বাহিরের আকাশের প্রলোভনে নীড়টুকু ভাঙ্গিয়া যখন পাখী বাহিরে চলিয়া আসে তখন সে ভাবিয়াও দেখে না, যে অধিকারটুকু সে ত্যাগ করিয়া আসিল ঠিক ততটুকু সে বাহিরে পাইবে কি না!—নীড় ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিলাম কিন্তু কই নিজেদের নীড়ের একটি পার্শ্বেও ত কেহ আমাকে এতটুকু জায়গা দিতে চাহে না! আজ আমি অজানিত অভিশাপ বহিয়া বন হ'তে বনান্তরে ছুটে ছুটেই ফিরছি। এ কিসের অভিশাপ!—এইরূপে পাগলের মত সে ঘুরিতে লাগিল।

এই সময় একদিন সে একটা ভীষণ কথা শুনিতে পাইল। একজন আসিয়া খবর দিয়া গেল মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া আসিয়া দীনেশ ঠাকুরের কন্যা অপর্ণাকে লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাদের দলের অনেকেও ইহাতে সাহায্য করিয়াছে। কথাটা শুনিয়া ভুবন যেন সহসা স্থবির হইয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। এতদূর শেষে ঘটিয়া গেল!—ইহা যে তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। ঘটনাটা অবশ্য নূতন নহে। কিন্তু বামুনের মেয়ের গায় হাত দিতে ত কেহ কখন সাহস করে নাই! এ কি হইল!—এ ঘটনাটা কিরূপে সম্ভব হইয়া উঠিল!—ভুবনের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলন্ত আগুনে দহিয়া যাইতে লাগিল। এ অপরাধটা যে সম্পূর্ণ তাহাদেরই। কি ক্ষমতা দস্যুদের যে তাহাদেরই গ্রামের মধ্য দিয়া এতবড় একটা পাপের কাজ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে করিয়া যাইতে পারে! ধর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া এতবড় ফাঁকিটাই তাহারা কি আজ বরণ করিয়া লইবে! মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া যে তাহারা একদিন মুসলমান হইয়াছে, আজ সে মনুষ্যত্বের মূল্য রহিল কোথায়! মনুষ্যত্ব বুঝি সব নিজের নিজেরই কাছে;—উত্তেজনাভরে ভুবন লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল!—উন্মাদের মত উচ্চকণ্ঠে বলিল "এখনো ফেরবার সময় আছে!—ঠাকুররা কি আজও আমাদের পায়ের কাঁট বলে ভাববেন!—কখনো না, আজ তাঁরা নিজেদের চিনেছেন, আমরাও আমাদের চিনেছি। আমাদের মিলনের সূত্র এইখানেই দৃঢ় হয়ে গেছে। আমরা ফিরে যাবো আমাদের পুরোণো ঘরে!—তাঁরা কি ফিরিয়ে নেবেন না!" প্রাণপণ বেগে ভুবন নদীর ধার দিয়া দৌড়াইতে লাগিল!

* * * *

সমস্ত দিনেও চোখের জল ফুরায় নাই। এত অশ্রু এই কঠিন বুকখানার ভিতর কোথায় ছিল দীনেশ ঠাকুর মাঝে মাঝে তাহাই ভাবিতেছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল। শঙ্খ বাজিল না—কেহ ঘরে দীপ দেখাইল না!—দীনেশ ঠাকুরের অশ্রুবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অপর্ণা এখন কোথায়!—কে তাহা জানিবে, কে তাহার উদ্ধার করিবে!—ঝড়ের মত এই সময় ভুবন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল!—সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে দীনেশ ঠাকুর তাহাকে চিনিলেন, কিন্তু একটী কথাও বলিলেন না!—স্থাণুর মত বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের জল মুহূর্ত্তে রুদ্ধ হইয়া গেল। একদণ্ড আগে যে সন্দেহটা তাঁহার মনে জাগিতেছিল তাহার মূল যেন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। আবেগে ভুবনের গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। করুণকণ্ঠে কহিল, "যে শাস্তি আজ আমাকে দিতে চান ঠাকুর মশাই মাথা পেতে তাই নিতে এসেছি!—নতুন ক'রে আর কি সাজা দেবেন ঠাকুর, যথেষ্ট সাজা হয়ে গেছে আমাদের এই ক' মাসে!—একদণ্ডের কলমা পড়্‌লেই কি এই হাজার যুগের বাপ পিতামহের ধর্ম্ম আর জাত যায় ঠাকুর!—আজও কি আপনাদের চোখ খোলেনি!—আমরা দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি!—প্রায়শ্চিত্ত করে' আমাদের ফিরিয়ে নিন্ ঠাকুর!—আমাদেরও শক্তি আজ আপনাদের শক্তির সঙ্গে মিশে যাক্!—" বলিতে বলিতে ভুবন প্রাণপণ বলে দীনেশ ঠাকুরের পা দুইটা আঁকড়িয়া ধরিল।

একে একে দুয়ে দুয়ে তিন শত যুবক আসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বাহিরের পথে সম্মিলিত হইতেছিল। তাহাদের মুখে একটীও কথা নাই। সকলে চাহিয়াছিল এক দৃষ্টে ঠাকুর মহাশয়ের আটচালার দিকে!—সমস্ত বামুন পাড়াটা ক্রমে অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। কোন ঘর হইতে একটুকুও শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। অনেকে ভয়ে পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। দুই চার জন মাত্র আছেন!—একখণ্ড কাল মেঘ একটু একটু করিয়া বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত আকাশটা ক্রমে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল!—উত্তর দিক হইতে একটা দম্‌কা ঝড়ের বাতাস আসিয়া সমস্ত আটচালাটীকে কাঁপাইয়া দিয়া গেল!—পায়ের কাছ হইতে ভুবনের দুইটী হাত ধরিয়া দীনেশ ঠাকুর তাহাকে মাটী হইতে তুলিয়া কহিলেন—"না, না তোদের পিছনে ফেলে রেখে আমরা আর মরতে চাইনে ভুবন!—তোদের ফিরিয়ে নোব, একান্ত আপন করেই নোব। পিছনের বলকে অবহেলা করে আজ আমরা নিজেরাই ত আত্মহত্যা করতে বসেছি!—তোদের সবাইকে আজ আমি বুক দিয়ে আলিঙ্গন করব!—কোথায় নিয়ে যাবি চল!—" ভীষণ শব্দে মেঘ ডাকিয়া এই সময় আকাশ-ভাঙা জল নামিল!—বাহিরে কেহ মাটী হইতে উঠিয়া একটুকুও নড়িল না!—নিবিড় অন্ধকারে ধরণী ও আকাশে এক হইয়া গিয়াছে। ভুবনের হাত ধরিয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে দীনেশ ঠাকুর তাহার মধ্য দিয়া, দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন!

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি কবি

আমি কবি, ভাই, গান গেয়ে যাই বিশ্বের রাজপথে
দিবস রজনী ওঠে জয়ধ্বনি ধূলায় ধরণী হ'তে।
ভবন ভুবন আকাশ পবন নদী গিরি বন ব্যেপে
পথিক-কবির অগ্নিবীণায় সুর ওঠে কেঁপে কেঁপে
উত্তাল সিন্ধু ছন্দ-মাতাল অন্তর আলোড়িয়া
আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায় লহরীর তাল দিয়া
গিরি-গহ্বর কাঁপে থরথর হুঙ্কার প্রান্তরে
গুরুগম্ভীর, ক্ষণে বা অথির নেচে ওঠে বায়ুভরে
কবি গেয়ে যায় অনল শিখায় মূর্চ্ছনা ওঠে জ্বলে,
তালে তালে তা'র পর্ব্বতভার উঠিতেছে ট'লে ট'লে
নয়ন হইতে ঠিকরিয়া পড়ে হোমের অনল শিখা
ললাটে আমার জ্বলজ্বল করে শুভযাত্রার টিকা
দেবতা মানব মানে পরাভব মম দ্বৈরথ রণে
মম ভাগ্যের সূর্য্য উঠেছে শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণে।

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনায় যখন রজনীগন্ধা-বনে
যুগযুগান্ত যবনিকা খোলে নিমেষে কবির মনে
বিদ্যুৎ হাঁকে বুক চিরে ডাকে, ঝরে যে অশ্রুধার
নিভৃত হৃদয়ে ঘনাইয়া ওঠে সুর মেঘমল্লার।
বিরহী যক্ষ রামগিরি শিরে মেঘেরে মিনতি করি'
প্রোষিত প্রিয়ায় বার্ত্তা পাঠায় জলসম্ভার ভরি'—
ধারাবরিষণ মেঘগর্জ্জন বিজন আঁধার রাতি
অভিসারিকার নির্জ্জন কুটীরে জ্বলে না সাঁঝের বাতি;
সেই দুর্য্যোগ, আঁধার আলোক মরণ-দোলায় দোলে
বিরহ মিলন দোঁহা পাশাপাশি চিরজীবনের কোলে,
আমি কবি সেথা সদাজাগ্রত জন্মমৃত্যুহীন
প্রেমের স্বর্গ রচে যাই গানে অনাহত মোর বীণ।

নব বসন্ত আনে অনন্ত রংবাহারের মেলা
প্রজাপতি আর টুনটুনি পাখী ক'রে খুনসড়ি খেলা ;
দখিণা পবন করিছে গোপন নিয়ত যাহার কথা
আমি জানি তার অন্তরমাঝে মিলনের ব্যাকুলতা ।
কিশলয় দল পরশ-বিভল সে লজ্জাবতী লতা
সন্ধ্যামণির দলে দলে ফোটে ফুলের মর্ম্মকথা
গন্ধ মধুর সে যে বহুদূর বিলাবার হাতছানি
রসের ফোয়ারা ফলে ফলে ফোটে আমি কবি তাহা জানি ।
ইন্দ্রধনুর সাতরঙে রচা বিলাস কুঞ্জবন
আপনার ঘরে বন্দী করে যে আনমনা যৌবন,
ফুলে ফুলে কচি লতায় পাতায় বাসকশয্যা পাতি
বিরহী পরাণ কাটাইতে চায় মিলনের সারা রাতি ।
ধূপ দহি তার গন্ধ বিলায়, প্রসাধন চন্দনে
মালতী মালার মধু ঝরে পড়ে আরতির বন্দনে ।
নয়নের আলো সকল ভুলালো দেহের পরশ দিয়া
অধরে অধর কাঁপে থরথর যেথা বিরহিণী প্রিয়া
দেহের সঙ্গে দেহের মিলন প্রাণে প্রাণ যায় গ'লে
বসন্তসখা বিজয়-মালিকা যেথা পরাইল গলে
তারই পাশে বসি' কবি-মালাকর, অনাদিকালের পথে
মালা গেঁথে যায় ফাগুন বনের ফুল্ল কুসুম হ'তে ।
ওগো আমি কবি, নিখিল মনের বাসনার জ্বালা জানি
পিপাসাকাতর তৃপ্তিহীনের দুর্ব্বহ ভার টানি ।
আমার বুকের পরতে পরতে পুত্রহীনার ব্যথা
পলকে পলকে গুমরিয়া কাঁদে অনন্ত আকুলতা
বন্ধ্যা নারীর অবুঝ অধীর সে কি দুঃসহ জ্বালা
ক্ষুদ্র শিশুর স্নেহলোভাতুর, হায় অভাগিনী বালা
তোমার মনের অরূপ মাধুরী আমার ছন্দে জাগে
রহস্যময়ী নারী জীবনের অপরূপ অনুরাগে !
দেহ বেচে করে রূপের ব্যাসাতি হাসি দিয়ে যারা কাঁদে
হৃদয়ে রাখিয়া চির উপবাসী, মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে

বাঁধিয়া লক্ষ প্রণয়-পাগল নয়ন-বহ্নি হানে,
আর যারা ঢালে বুকের শোণিত রূপসীর জয়গানে
তারা হৃদয়ের অজ্ঞাতে রহি' করে পুতুলের খেলা
লালসায় পূজা মানুষের মাঝে দেবতারে অবহেলা
সেথা কবি আমি করুণাকাতর নয়নের জল ঢালি
লালসা-পঙ্ক ধুয়ে মুছে দিই, ঘুচায়ে মনের কালি।
মানুষেরে আমি বড় বলে' জানি রূপের আড়ালে নারী
মহামহিমায় কঠিন ধরায় তৃষার স্নিগ্ধ-বারি ;
অন্তরে জ্বলে নির্ব্বাণহীন শোধনবহ্নি শিখা
ধরণী মায়ের স্নেহের দুলালী কন্যা সে ললাটিকা।
সতী রমণীর সিঁথির সিঁদুর প্রিয়-প্রেম-অনুরাগে
শত সূর্য্যের উজ্জল প্রভায় যেথায় নিত্য জাগে
সুন্দরী ওগো কল্যাণময়ী নিখিলে সর্ব্বসহা
দু'হাতে তোমার বিলাও পুণ্য সে যে আনন্দ মহা।
আমি কবি, দেবি, ছন্দে গাথায় তব বন্দনা করি
লেখনী ধন্য পূজার অর্ঘ্যে যুগযুগান্ত ধরি'।
লহ মাতা মোর স্বস্তিবাচন নিখিল শিশুর তরে
নন্দন তব আনে আনন্দ তৃষিত বক্ষ 'পরে ;
আমি কবি-শিশু করি যে নৃত্য শিশুর চরণতালে
চিরশিশুটির ঠিকুজি বিধাতা লিখেছে আমার ভালে।
ধরণী রাণীর উৎসব সভা আমি তার সভাকবি
উদয় অস্তে চিরভাস্বর মম গৌরব-রবি।
অত্যাচারীর শাণিত কৃপাণ উদ্যত হেরি মাথে
পথ বাহি তবু চলিয়াছে কবি মরণ-পাথেয় সাথে ;
শাস্ত্রী হাঁকায় কাঁদে উভরায় পথের কাঙাল শত
স্ফীত উদরের পরিধি বাড়াতে নিল অনশন ব্রত
পাঁজরের হাড় হাতে গোণা যার অন্ধ নয়নধারে
ধুঁকে মরে যেন হন্যে কুকুর দয়া মমতার দ্বারে,
আমি কবি তার ব্যথার মাণিক আঁধারে জ্বালায়ে ধরি
দুঃখেরে দিই রাজার মুকুট দীনের লজ্জা হরি'

দৈন্যে করিয়া জীবন ধন্য অবহেলি' পরমাদে-
ছিন্ন কাঁথায় সোণার স্বপন বুনে যাই আহ্লাদে
পরভোজী পথকুকুরের দল দন্তে কাটিতে চায়
অন্তরে মোর কাঙাল ঠাকুর হাসিমুখে ফিরে চায়।
দুর্গম পথে পায়ের আঘাতে পথের নিশানা জাগে
দুর্যোগ রাতে শীতের প্রভাতে চেয়ে দেখি পুরোভাগে
মানবমনের কল্পনাপূত পূজিবার বিগ্রহ
তাই দেখে হায় কবি সহে যায় মানুষের নিগ্রহ
সবল বাহুর কঠিন পীড়নে কবির কণ্ঠ রুধি'
মানুষ কেবল ফেনাইয়া তোলে হলাহল অম্বুধি,
যত জোরে তারে টানিয়া ধরিছে আপনার বাহুতলে
দুষ্কৃতি তত ছাপায়ে উঠিছে জনতার কোলাহলে।
উদ্ধত যা'র দু'হাতে দণ্ড, সে দেখে কবির হাতে
লীলাকমলের দলগুলি আহা ফুটেছে নিঠুরাঘাতে
দক্ষিণ হাতে অমর লেখনী বাঁ হাতে কমল মালা
বিশ্বারে ছার করিয়া জ্বলিছে নয়নে বহ্নিজ্বালা।
আমি কবি আমি মানুষেরি কবি করি তারি জয়গান
চিরজাগ্রত আমার কণ্ঠে সত্যের ভগবান।
আমি নির্ভয় জয় তব জয় হে মোর মানুষ ভাই
তোমার পূজার মন্দির তলে মিলেছে আমার ঠাঁই।
পূজা পুষ্পের কণ্টকঘায়ে হাতের রক্তরেখা
আমি কবি মোর চিরসাধনায় লিখেছে ভাগ্যলেখা।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মধু-স্মৃতি

বাণীর বরপুত্র কাব্য-সাহিত্যের সম্রাট, উপমাছন্দের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি, বঙ্গের গৌরবরবি মধুসূদনের স্মৃতি-পূজার পৌরোহিত্য করা আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আপনারা আমার এই কথা নিরর্থক বিনয়প্রকাশক বলিয়া মনে করিবেন না। আপনারা আমাকে স্নেহ করেন ও তজ্জন্য আমাকে প্রায়ই এবম্বিধ সভাসমিতিতে সভাপতির আসনে আহ্বান করেন। কিন্তু পুনরায় বলি একার্য্যে আমার সামর্থ্য কোথায়? ন্যূনাধিক অর্দ্ধ শতাব্দি ধরিয়া যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জ্ঞানময়, ভাবময়, রসময় ভাষার অপূর্ব্ব ঝঙ্কার—বায়ু-বিতাড়িত কুসুমসুবাসের ন্যায় গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, সমগ্র বঙ্গে, বিশাল ভারতবর্ষে, সুদূর প্রতীচ্য ভূমে সঞ্চারিত হইতেছে, সেই অভিনব ভাষা ও ভাবের প্রবর্ত্তক মহাকবির স্মৃতি-বাসরের প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করিতে পারি না, এবং "পঞ্চবটি বনচর মধু নিরবধি"র ন্যায় যে মধুস্মৃতি বিংশতি কোটী অধিবাসিবৃন্দের অন্তরে চিরবিরাজমান তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার বা উপাদান আমার নাই তাহা আমি জানি। তত্রাচ আজ শুধু আপনাদের সাদর আহ্বানে আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়া—"রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" সেইরূপে এই কর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হইতেছি। আজ যে আমি সর্ব্বতোভাবে অনুপযুক্ত হইয়াও আপনাদের স্নেহদত্ত গৌরবময় পদ গ্রহণ করিয়াছি তাহার কারণ এই যে প্রকৃতই আমি এ সভাকে স্মৃতিসভা বলিয়া মনে করি না। কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য সভার আবশ্যক হয় না। বহুদিন হইতে বর্ষে বর্ষে দেশবাসিগণ শুভবাসন্তী পঞ্চমীতে একত্র হইয়া স্বর্গবাসী কবিবরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার সাধ এই স্মৃতি-সভা করিয়া পূর্ণ করেন। বাগ্‌দেবীর এই পুরশ্রীমণ্ডপে প্রাণাধিক দেশবাসীর সহস্র কণ্ঠের সহিত আমার ক্ষীণকণ্ঠটুকু মিলাইয়া মহাপুরুষের যশোগান করিব, ইহা আমার অন্তরের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্য অযোগ্য হইয়াও এই গৌরবময় আসনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি। আমার সানুনয় নিবেদন আপনারা আমাকে আপনাদেরই একজন বলিয়া মনে করিয়া—পৃথক আসনে বসিয়াছি বলিয়া পৃথক্ না ভাবিয়া—আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ত্রুটী ত হইবেই—সর্ব্বাপেক্ষা অমার্জ্জনীয় ত্রুটী এই যে যদিও এই সম্মিলনী খিদিরপুরবাসী মধুসূদনপ্রমুখ কবিগণের স্মৃতিকল্পে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তত্রাচ সময়ের স্বল্পতা হেতু হেমচন্দ্র-রঙ্গলাল-প্রমুখ কবিগণ—যাঁহাদের অবস্থানে এই খিদিরপুর পবিত্র হইয়াছে—যাঁহাদের বীণাবিনিন্দিস্বরে বঙ্গদেশ আজিও বিভোর হইয়া আছে—তাঁহাদের কথা আলোচনা করিতে পারিলাম না। কেবল মধুসূদনের সামান্য কিছু গুণগান করিয়াই কৃতার্থ হইব।

শৈশবে মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম হইলেও যাঁহার ভাষার মোহন সুরে আকৃষ্ট হইয়া শুধু আবৃত্তি শুনিয়াই স্তম্ভিত হইতাম, যৌবনে যাঁহার রচনার বিভিন্নমুখী প্রতিভার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া হর্ষ-বিস্ময়ে যুগপৎ আপ্লুত হইয়া "আনন্দে করেছি পান সুধা নিরবধি", এখন জীবনের প্রান্ত-সীমায় আসিয়া যাঁহার কাব্যামৃত পান করিতে করিতে আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া শুধু এই কথাই ভাবি যে নিষ্ঠুর নিয়তি নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়ন করিয়াও যে হৃদয়ের কবিত্বস্রোত রুদ্ধ করিতে পারে নাই—সে হৃদয় কত উচ্চ—কত মহান্—কি বিরাট—কি বিশাল ! সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির এক নিভৃত অংশে পল্লীজননীর চিরস্নিগ্ধ শ্যাম-অঞ্চলচ্ছায়ায় বীচিবিক্ষেপচঞ্চলা কপোতাক্ষীর হেমকান্তি কূলে বসিয়া যে ধনীর দুলাল শিশুকবির চিত্ত সম্মুখবাহিনী সাগরাভিমুখী লীলাময়ী তটিনীর ন্যায় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, ভবিষ্যতে বিধাতার বিধানে রোগ-শোকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট স্বজন-পরিত্যক্ত প্রবাসী হইয়াও যে ভাবপ্রতিভা হীনপ্রভ বা রুদ্ধ না হইয়া দিব্যালোকে উদ্ভাসিত ও পরিস্ফুট হইয়াছিল, সেই মহাশক্তিমান্ মহাকবির আবির্ভাবে সোণার বাঙ্গালা পবিত্র হইয়াছে। সে মহাপ্রাণ মহাকবি আমাদের মধুসূদন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মধুসূদনের এমন দিন আসিয়াছিল যখন উত্তমর্ণগণ অর্থের জন্য তাঁহাকে পীড়ন করিতেছে, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে, রোগে শোকে তিনি মুহ্যমান, জানি না এই ভীষণ দুর্দ্দিনে কোন ঐশীশক্তির প্রেরণায় তিনি মেঘনাদ, তিলোত্তমার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কোন সাধনার বলে মধুরতুলিকা-সম্পাতে সুবর্ণপুরী অশোককাননের চিত্র আঁকিয়াছেন। এই অতিমানুষ শক্তির কাব্য দেখিলে মনে হয় দুঃখ দৈন্য অভাব অনাটন রোগ শোক বুঝি সে কবিচিত্তের পাষাণ-দ্বারে প্রতিহত হইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। বিশ্ববিশ্রুত মহাকবির জীবনী ও কাব্য কবিতাদির আলোচনা কালে আমি সেই মহাপুরুষের ভিতরে এক মহাযোগীকে দেখিতে পাই,—যে মহাযোগী মানুষ হইয়াও মানুষ হইতে স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার, সুখ দুঃখে সমজ্ঞান—ত্রিতাপতাপিত জীবকে অশ্রুতপূর্ব্ব শুনাইবার জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব দেখাইবার জন্য ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন। সে মহাযোগী মনোরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট—সে যোগীর কল্পনার বিস্তার পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—"পরধর্ম্মাশ্রিত, সমাজচ্যুত, "পরসমাজভুক্ত মাইকেল সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন পরিধির বহির্ভূত হইয়াও কোন্ "গুণে কোন্ অধিকারে, কিসের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে "লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দুসমাজ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় "স্বধর্ম্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—মাইকেল মধুসূদন কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত "হইয়া সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গরুড়ের মত সমগ্র জাতির "প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন !" সাহিত্যানুরাগ ও স্বদেশানুরাগই ইহার কারণ। যিনি স্বদেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, তিনি কি স্বদেশবাসীকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন ? আর ভাল-

বাসার প্রতিষ্ঠান আছেই আছে। বিধর্ম্মী হইলেও বিদ্বেষ তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। স্বদেশপ্রেমে হৃদয়ের অমৃতভাণ্ড পূর্ণ করিয়া প্রেমিক কবি সোণার বাঙ্গালার ধূলিকণাটিতে পর্য্যন্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গালির ভাষা—বাঙ্গালির আশা—তিনি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করিতেন। বাঙ্গলা হইতে বিদায় লইতে গিয়া তিনি গাহিলেন :—

"রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।"

কবিতা লিখিয়াই তিনি বাঙ্গালীকে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিলেন,—

"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

সুদূর ফরাসীদেশে অবস্থানকালেও তিনি তাঁহার সাধের কপোতাক্ষকে ভুলিতে পারেন নাই ;—লিখিলেন—

"—সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

ফরাসী ভাষায় ফরাসী রমণীকে পত্র লিখিতেছেন,—তাহাতেও বাঙ্গালার, স্বদেশের, জননী জন্মভূমির কথা—

'যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে।"

ধন্য স্বদেশপ্রীতি, ধন্য একনিষ্ঠ মাতৃভক্তি। ভাষায়, ভাবে, বাক্যে, মনে, কার্য্যে, কলাপে, সাহিত্যে, সাধনায়, দেশভক্ত কবিশ্রেষ্ঠ মধুসূদন স্বদেশ বাৎসল্যের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই—সমকক্ষ নাই—কখনও হইবে কি না জানি না।

মাত্র ২৩ বৎসরে যে বাঙ্গালী যুবক ইংরাজী ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন যে 'Captive Lady' ও 'Visions of the Past' শীর্ষক অদ্ভুত সৌন্দর্য্যশালী ভাবগরিমা-মণ্ডিত

ইংরাজী-কাব্য রচনা করিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে মোহিত করিলেন—সেই কবির রসময় লেখনীতেই পরে আক্ষেপোক্তি ফুটিয়া উঠিল—

> "হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
> তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
> পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ •
> পর-দেশে ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি ভিন্ন ভাষার রচনাতেও যে কবি যশোমালা গলে পরিলেন, তিনিই পরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন—

> "কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।

মাতৃভাষাকে এমনভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ভালবাসিতে কয়জন পারিয়াছে ? কয়জন এমন আশ্চর্য্য সাফল্যের সহিত পরভাষা মন্থন করিয়াও মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—

> " • • • পাইলাম কালে
> মাতৃভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।"

Italyর স্বদেশ-প্রেমিক কবি Filicaia দেশমাতৃকার দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিচলিত হইয়া গাহিয়াছিলেন—

> "ইটালিয়া ! বিধাতার বিধানে মা তুমি
> দুঃখ জনয়িত্রী মোর দীনা-জন্মভূমি !"

এ কথা শুনিয়া হয়ত অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না, কিন্তু মাতৃভূমির জন্য মধুসূদনের বিলাপ কি আপনারা বিস্মৃত হইয়াছেন !

> "হায়গো ভারত ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
> ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি !"

আমরা Dante, Homer, Keats, Byron, Schiller, Shakespeare, Wordsworth প্রভৃতি বিদেশীয় কবির রচনা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাই—তাঁহাদের স্বদেশ-প্রীতি সন্দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়ি, তাঁহারা যে রোমের প্রত্যেক ভগ্নস্তূপে ইষ্টকখণ্ডে, লণ্ডনের প্রত্যেক বিপণিতে, সৌধ-চূড়ে, ফ্রান্সের প্রত্যেক মর্ম্মর মূর্ত্তিতে, ইউরোপের প্রত্যেক ব্যক্তিতে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন তৎপাঠে আমরা বিভোর হইয়া যাই,—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন ও চিন্তাস্রোত বিদেশী হইয়া পড়ে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি মধুসূদন কি সোণার বাঙ্গলার প্রতি ধূলিকণাটিতে বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই ? Byronএর Rome শীর্ষক কবিতাটী পাঠ করিয়া আমরা সকলেই অতি সুন্দর বলি, কিন্তু মধুসূদনের "ভারতভূমি" পড়িয়া আমরা কয়জন তাহার ভাব ও

গরিমা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। অনেকেই ইংরাজীতে 'Dante' 'To Homer' 'On Shakespeare' 'Milton' নামক কবিতাগুলি পড়িয়া বিভোর হইয়া পড়েন, কিন্তু মধুসূদনের 'কাশীদাস' 'কৃত্তিবাস' 'কালিদাস' 'জয়দেব' 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' নামক কবিতাগুলির আমরা কতটুকু সমাদর করি। আমি বসন্তে কোকিলের ডাক শুনিয়া বাঙ্গালীর ছেলেকে বলিতে শুনিয়াছি—

"Hail beauteous stranger of the grove
Thou messenger of the spring !"

কিন্তু মধুসূদনের 'বৌকথা কও' আপনাদের কয়জনের মনে আছে? আমরা 'Daffodils' পড়িয়া মোহিত হই, কিন্তু মধুসূদনের 'বটবৃক্ষের' সৌন্দর্য্য দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কি? আমরা 'Helen' এর দুঃখে বিগলিত হইয়া যাই, কিন্তু সেই কবির 'সীতাদেবী' 'সীতার বনবাস' ইত্যাদির করুণ চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি কি? Byron এর Isles of Greeceএর পর মধুসূদনের 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' 'দ্বাদশ শিবমন্দির' আমাদের ঘরের অনুপম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছি কি? মধুসূদনের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যে এই রচনাগুলি যেন ইংরাজী-শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীদের প্রতি ভীষণ ভ্রুকুটিভঙ্গ। হায়, তথাপি শুনি যে মধুসূদন নাকি খাঁটি বাঙ্গালী কবি নহেন। আমরা Danteর Inferno পড়িয়া স্তম্ভিত হই। কিন্তু মেঘনাদ বধে নরকের বিভীষিকাময় বর্ণনা পাঠে আমাদের হৃদয় কি অধিকতর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে না। কিন্তু মৃগনাভি অনুসন্ধিৎসু মৃগের মত বাঙ্গালী আমরা নিজের ঘরের জিনিষ দেখিতে পাই না। হিন্দু, তুমি ত্রিবেণী-সঙ্গমে যাও পুণ্য সলিলে অবগাহন করিতে, পবিত্র হইতে, কিন্তু তোমার সাহিত্যে যে ত্রিবেণীর ত্রিধারা মিলিত হইয়াছে তাহার সন্ধান রাখ কি? মেঘনাদবধ কাব্যই তোমার সেই ত্রিবেণী সঙ্গম। একবার দেখিয়া যাও—তোমার মহাপুরাণ 'মহাভারত'—তোমার তপস্বাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ নিদান 'রামায়ণ'—তোমার মুক্তি মোক্ষের 'ভাগবত' কেমন একাধারে মিলিত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে একখানি 'মহাভারত একখানি রামায়ণ বা একখানি ভাগবতের সন্ধান পাওয়া স্বপ্নেরও বহির্ভূত।" আর এই তিনের একাধারে সম্মেলন ও সংযোজন করিল কে? মধুসূদন।

মধুসূদন খাঁটি বাঙ্গালী কবি নহেন: এমন লোকও আছেন যাঁহারা একথা বলেন। আজ দেখিলাম—আগে একথা আমি জানিতাম না—যে এমন লোকও আছেন যাঁহারা গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতির তুলনাপ্রসঙ্গে মধুসূদনকে মধুহীন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আরও দেখিলাম কেহ কেহ আবার খাঁটি বাঙ্গালী কবির প্রতি কটাক্ষ করিয়া বেশ দু'কথা বলিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে বাঙ্গালী কবির তিরোধান ঘটিয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কবিবর হেমচন্দ্র কি লিখিয়াছেন? "* * * কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ বা লেখার

চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্তপ্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। * * * কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সমস্ত গুণ অতি সামান্যই ছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'অন্নদামঙ্গল' ভারতচন্দ্র-রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য; কিন্তু যাহাতে অন্তর্দ্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কৈ? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছলিত তরঙ্গবেগ কৈ? বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটা কোথায়?"

তারপর দেখুন স্বয়ং মধুসূদন পাঁচটি বাঙ্গালী কবি সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

"তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি-অন্নদা-মঙ্গল
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃত চন্দ্রের মণ্ডলে।"

কাশীরাম প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ভাষাপথ খননি স্ববলে
ভারত-রসের স্রোত আনিয়াছ তুমি,
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান
হে কাশি, কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান।"

কৃত্তিবাসের কথায় লিখিয়াছেন :—

জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা!— কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে!"

ইহার পরেও যদি কেহ পুনরুক্তি করিয়া বলেন—"অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনা ধৃষ্টতা," "মাইকেলের উপমা ও উপমিত বিষয় প্রশংসার্হ নহে" তবে আমার উত্তর কিছুই দিবার নাই। আমি শুধু মধুসূদনের কথাই তাঁহাকে শুনাইব—

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা! পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলে উঠে রাগে
ছিল না কি ভাবধন কহ লো ললনে!"

[illegible] বাঙ্গালা যে মধুসূদনের বলে বলীয়ান হইয়াই রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ কবি অসমসাহসে নিগড় ভাঙ্গিয়া কাব্যে ও কবিতায় অমৃতের প্রবাহ ছুটাইয়াছেন।

তাহাকে আমি আরও একটা উত্তর দিতে প্রয়াস পাইব। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় মৃত ভাষা নহে, জীবন্ত ভাষা। ইহাতে গঙ্গোদকের ন্যায় জোয়ার ভাঁটা খেলে। ইংরাজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইল কিরূপে? ইংরাজী ভাষায় কি অন্য জাতির ভাষাকৌশল প্রবেশ করে নাই? উহারও একদিন বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় দুর্দ্দিন আসিয়াছিল। তাই Lord Chesterfield (Article on Johnson's Dictionary) বলিয়াছেন "It must be owned that our language is in a state of anarchy * * * during our free and open trade many words and expressions have been imported, adopted and naturalised from other languages." তত্রাচ কি ইংরাজেরা সুবিখ্যাত ইংরাজি কবিদিগকে খাঁটি ইংরাজি কবি বলিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? অপরন্তু Lord Chesterfield সদর্পে বলিয়াছেন: —"Let it still preserve what real strength and beauty it may have borrowed from others." French, Latin, Irish সকল ভাষাতেই অন্য ভাষার, অন্য সাহিত্যের, অন্য কাব্যের সংমিশ্রণ আছেই আছে, ইহাতে তাহার খাঁটিত্ব যায় নাই বরং লাভই হইয়াছে। জীবন্ত ভাষা উন্নতিশীল, তাহার অঙ্গে নানা দেশীয় চাকচিক্যময় মূল্যবান অলঙ্কার শোভা পাইবেই পাইবে। সুতরাং মাতৃভাষার যিনিই এরূপ শোভাসম্পাদন করিবেন তাহাকেই আমরা গৌরবময় আসনে বসাইতে বাধ্য। নতমস্তকে স্বীকার করি ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় এই উন্নতির পথপ্রদর্শক, কিন্তু উন্নতিও ত চাই, সেই উন্নতির মূলে মহাকবি মধুসূদন।

মধুসূদনের চিন্তাশক্তি মৌলিক—মনীষা-অসাধারণ-ভাষা লইয়া তিনি ভোজবাজি খেলাইয়া গিয়াছেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রতি পত্রে তিনি যে নূতন ভাবের খেলা খেলিয়াছেন—মহাকবিদিগের অভাব ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা গুলিকে ফুটাইয়া দিয়াছেন তাহা একটু যত্নের সহিত দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। আমরা আজ "কাব্যের উপেক্ষিতা"র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে অতুলনীয় কবিপ্রতিভার সন্ধান পাই তাহারও মূলে সেই মধুসূদন। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহারই কথায় বলিতে হয়

'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

তারপর নাট্যকার রূপে দেখিলাম এই অমর কবিবরকে। আজ বঙ্গীয় নাট্যকলা যে টুকু উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহা এই মনীষিরই জন্য। যখন বঙ্গভাষায় উপযুক্ত নাটকের অভাবে অভিনয় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল তখন কবিবর মধুসূদনই সে অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন একদিকে 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী', 'পদ্মাবতী'র সৃষ্টি করিলেন—অপর দিকে ব্যঙ্গনাট্যের অভাবপূরণের জন্য "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", "একেই কি বলে-সভ্যতা" ইত্যাদির ভিতর দিয়া দেশকে শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। এহেন পুরুষরত্নকে—এ-হেন মাতৃ-

তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধককে পরধর্ম্মাশ্রিত দেখিয়া কি পরের মত দূরে ফেলিয়া রাখিতে পারি? তিনি কি আমাদের জন্য কাঁদিতেন না। এখনও তাঁহার কথা কাণে বাজিতেছে,

> "I wept! a prodigal once weeping sought
> His father's breast—and found love unforgot."

এ ক্রন্দন আমাদের জন্য অশ্রুমোচনের ছায়া মাত্র।

> "ভ্রান্ত যদি—
> কাঁদে হাহারবে আকুল বিষাদে
> তিতি অশ্রুনীরে"

—কে তাঁহাকে তাহার ভ্রান্তির জন্য পর করিয়া দিতে পারে? তাঁহার জন্য আমাদের স্নেহের উৎস কি শুষ্ক হইয়া যাওয়া সম্ভবপর? ব্রজাঙ্গনা কাব্যে যে কবি কদম্বমূলে মুরলীধরের সঙ্গীতে তন্ময় – রাধিকারমণের অপরূপ নৃত্য দর্শনে আত্মহারা—ব্রজবিহারীর রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ—শ্যামের বিরহানলে ব্যাকুল—তাঁহাকে যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ভ্রমে পূজিতে বাসনা হয় স্নেহনীরে তাঁহার স্মৃতিবাসরের আঙ্গিনা ধৌত করিতে উদ্গ্রীব হইয়া উঠি।

একদিক মাত্র দেখিলাম—অপর দিকে যে তেজস্বী চরিত্রের ছবি বর্ত্তমান তাহার আলোচনায় আর প্রবৃত্ত হইব না। সুখের বাসরে বিষাদের সুর আর তুলিব না। সে আলোচনা প্রসঙ্গে বড় ক্ষোভ দুঃখের কথা আসিয়া পড়িবে, এই উৎসবের সভাতল হাহাকার করিয়া কাঁদিবে। যে যশের মন্দিরে প্রবেশ করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা সংকোচের সহিত "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে"—পোষণ করিয়াছিলেন, আজ সে আকাঙ্ক্ষায় মহাকবি পূর্ণ-মনোরথ। যশের সুবর্ণ মন্দিরে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত। আসুন, সকলে মিলিয়া আমাদের সেই নিতান্ত আপনার হইতেও আপনার ঘরের কবিকে বুকে রাখিয়া, স্মৃতির মন্দিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার চির ঈপ্সিত বহু আকাঙ্ক্ষিত অমরতা লাভোৎসবে যোগদান করিয়া হর্ষে গর্ব্বে, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বলি:—

> "এ মধুমিলনে গাও আনন্দে মিলিত কণ্ঠে মধুর গান।
> মর্ম্ম-নিহিত পুণ্যস্মৃতি ছন্দে কণ্ঠে লভুক প্রাণ॥
> (আজি) নন্দনবনবিহারী পবন
> করিছে তোমারে বন্দনা
> কুসুমে কুসুমে বিতরি সুরভি
> তব পদে করে অর্চ্চনা,
> নির্ম্মল নীল অম্বর ভরে
> তারকার সারি শোভে থরে থরে

যশের কিরীটি, সবার উপরে, বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ দান।
গাও আনন্দে মধুর ছন্দে, মিলিত কণ্ঠে তুলিয়া তান॥

সে মধুর মধুপানে মত্ত, মন্ত্রমুগ্ধ বঙ্গদেশ।
শুনি সে মুরলী, উঠিল কাকলী, মল্লার মেঘে তুলিয়া রেশ।
নহেক সুপ্ত সে মধুর বীণা
লুপ্ত নহেক অতীত গরিমা,
গম্ভীর গুরুগর্জনে ঘন ছন্দে গাহিছে মধুর নাম।
অখিলে নিখিলে অনলে অনিলে উজলি উড়িছে
স্মৃতি নিশান।"

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

ছিটে ফোঁটা।

(১)

জমিদার ও প্রজা

নজরের এই টাকা গণি ওঠে তাহে ঐ যে ধ্বনি
প্রজাবর্গ আছে সুখে, আছে খাসা স্বাস্থ্য।
"ভেভে রবে বাঘে বোঝে—ভেড়া আছে আস্ত।"
কত মধুর প্রজার বাণী, শুনি এসে তালুকে।
আক খায় শূয়রেরা, মধু খায় ভালুকে।

(২)

মানে কি

অগন্তি ওই তারার পুঞ্জ শূন্য পথে এক যেয়ে—
চরকি কলে ঘুরে চলে, ডিগ বাজি খাই পৃথিবী।
দূর্বিনে তার স্বরূপ ধরিস্? যত পারিস্ দেখ্ চেয়ে;
গতির তত্ব ধুনে ধুনে "কেন"র মানে কি দিবি?
তবে কুশল জ্ঞানের মুষল বাড়িয়ে চলে কচ্‌কচি,—
শব্দ-ইঁটের সুরকি কোটে সূক্ষ্ম ঢেঁকি দর্শনের।
কান পাতিনে ঢেঁকির পাড়ে, পদ্যপাঠের পদ রচি;
সইতে নারি ঘরঘরানি তর্ক-চাকার ঘর্ষণের।

দুঃখ-শোকের ধূলা ওড়ে রাস্তা জুড়ে মেঘপানা,
কোন মতে পথের পথিক, রথের গতি থামে না ;
দৃষ্টিপারের ভবিষ্যতের পানে ছোটে একটানা,
জানে না তার মানে কিবা, তবুও মাথা ঘামে না।
প্রাণের তাপে ভাবের ধোঁয়া শিখা বাঁধে মটকাতে,
ঠাণ্ডা পেয়ে আবার গায়ে পড়ে শিশির বিন্দুতে।
প্রশ্ন যাহা জবাব তাহাই ; বুদ্ধি ধোঁকে খটকাতে ;
পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে কথার মানে কিন্তুতে।
জুটতে হবে, ছুটতে হবে চলার শক্তি রাখ্ তাজা ;
ঘুরনি ভোঁ-ভোঁ,—যাত্রা শুভ ; পথের খবর খুঁজিস্‌নে।
মিলে সবে মহোৎসবে চড়ক তলায় ঢাক বাজা ;
মিছে ভাবিস্—কেন মাতিস্, কিছুই যদি বুঝিস্‌নে ?
শূন্যে বোঁ-বোঁ,—মাথায় ভোঁ-ভোঁ ? হেথায় অন্য বাদ্য নাই ;
ওরে হাঁদা-কোকিয়ে কাঁদায় বিশ্ব-ধাঁধা টোটে না।
চলার আগে আরও আগে উল্টে চলার সাধ্য নাই।
খাতার সাথে বাদ-বিবাদে নিগূঢ় মানে ফোটে না।
প্রশ্ন কিসের ? ছোট্ রে হেসে যতই থাকুক অন্ধকার
নিগূঢ় টানের গভীর মানে কি পাবি তুই, কি দিবি ?
চল্ বলবান্, জয় ভগবান—গেয়ে গীতি বন্দনার,
যতই জোরে যাক্‌না দূরে শূন্যে ঘুরে পৃথিবী।

রাজা রামমোহন ও বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

রাজা রামমোহন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বাঙ্গলাদেশে বসিয়া পৃথিবীর অনেক গুলি প্রাচীন সভ্যতার, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, রংপুরে গভর্ণমেণ্টের দেওয়ানী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ১৮১৪ খৃঃ কলিকাতা আসিয়া তিনি এই সংস্কার-কার্য্যে বিধিমত হস্তক্ষেপ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪২ কি ৪৩ বৎসর হইবে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, এই তিনটি সভ্যতার সংস্কারই রাজার অভিপ্রেত ছিল। রাজার গ্রন্থাদি হইতে আমরা ইহার পরিচয় পাই। অনেকের বিশ্বাস এক অতি উদার বিশ্বজনীন মানব-সভ্যতাই রাজার আদর্শ ছিল, এবং প্রত্যেক প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সভ্যতাকে—এই এক সার্ব্বভৌমিক মানব-সভ্যতার সমীপবর্ত্তী করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রাচীন সভ্যতাকে, তাহার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন

মানব-সভ্যতা—সার্ব্বভৌমিক ও বিশেষ।

পথে চলিতে হইলে, জাতীয় ভাব পরিত্যাগ না করিয়াও কি করিয়া সার্ব্বভৌমিক আদর্শের দিকে চালিত করা যায়, সেদিকেও রাজার খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এক হিন্দু সভ্যতাই, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহুমুখী ধারায় ইতিহাসের পথে ধাবিত হইয়াছে। সভ্যতার এই বহুমুখী ধারা-হিন্দুত্বে এক হইলেও প্রাদেশিকত্বে বিভিন্ন ও বিচিত্র। বাঙ্গলাদেশে ইতিহাসের স্মরণীয় কাল হইতে যে হিন্দু-সভ্যতার বিকাশ,—ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-সভ্যতা হইতে—তাহা কোন কোন দিকে বিচিত্র ও পৃথক। আবার এই বাঙ্গালী হিন্দু-সভ্যতাও ইতিহাসের পথে গতিমুখে একদিকে চলে নাই; মূলে এক বা অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও—বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। বিকাশের পথে এই বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন স্তরও আছে।

জাতীয় হিন্দু-সভ্যতা প্রাদেশিকত্বে বিচিত্র ও বিভিন্ন।

উন্নতির স্তরভেদেও বিভিন্ন।

রাজা রামমোহন বর্ত্তমান যুগে মানব-সভ্যতার এক ইতিহাস-বরেণ্য সংস্কারক। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে বাঙ্গালী-সভ্যতার যে সকল বিশেষ বিশেষ দিকে কৃতিত্ব আছে, যে সকল গৌরবময় বিশেষত্ব আছে, বাঙ্গালী রামমোহন পৃথিবীর মানব-সভ্যতার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের জাতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিবর্ত্তনমুখে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, না ধ্বংস করিবার পরামর্শ দিয়াছেন? বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই একটি আলোচনার সূত্রপাত করা হইবে।

মানব-সভ্যতার সংস্কারক রাজা রামমোহন, বাঙ্গালী-সভ্যতার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা কি ধ্বংস করিয়াছেন?

প্রথমে দেখিতে হইবে রাজার সময়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে, বাঙ্গালী-সভ্যতার কিরূপ অবস্থা ছিল, এবং এই সভ্যতার কোন কোন দিকে, কি কি বিশেষ পরিবর্ত্তন তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মোটামুটি ইহার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে, আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিব যে, বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি রাজার অভিপ্রেত সংস্কারে সংরক্ষিত হইয়াছে, কি ধ্বংসের দিকে গিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালী-সভ্যতার একটা অবসাদের সময়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সভ্যতার যেসমস্ত বিভাগে বাঙ্গালী-প্রতিভার একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, সেই সমস্ত বিভাগই নিস্তেজ, প্রাণহীন। তা' ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতার যা কিছু প্রাণহীন, এবং বর্ত্তমান যুগের যথেষ্ট অনুপযোগী বৈশিষ্ট্য, তাহার অনেকগুলিরই উদ্ভব হইয়াছিল—ষোড়শ শতাব্দীতে। তিন শতাব্দীর কালস্রোত বাঙ্গালীর জাতীয় সভ্যতার গতিমুখে, নানাদিক হইতে নানা রকমের আবর্জ্জনা আনিয়া জড় করিয়াছিল। বিশেষতঃ এই সভ্যতা প্রাচীন বলিয়া ইহার গতি খুব দ্রুত হইবে, এমনও আশা করা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশঙ্কার বিষয় হইয়াছিল—যে এই অবসাদগ্রস্ত সভ্যতার বহুমুখী ধারা—একে অন্য হইতে, এবং প্রত্যেকে—মূল কেন্দ্র হিন্দুত্ব হইতে এমন সাংঘাতিক রকমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল যে সভ্যতার

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালী-সভ্যতার চিত্র।

প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে যে ঐক্য, যে প্রাণশক্তি ছিল, তাহার উদ্ধার করে মনোযোগী না হইলে, এই সভ্যতার মৃত্যুও আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। ইতিহাস সভ্যতার মৃত্যুর কথাও আমাদিগকে বলে।

প্রাণী-শরীরের সহিত সভ্যতার তুলনা।

কোন একটা সভ্যতার কথা, তাহার জন্ম ও মৃত্যুর কথা, তাহার জীবনের—ইতিহাস পথে তাহার বিকাশের কথা ভাবিতে গেলেই মনে হয় সভ্যতা বস্তুটি কি? ইহা কি একটা প্রাণী বিশেষ? ইহা জীবন্ত—ইহার জীবন আছে, সত্য, কিন্তু কোন জন্তু বা প্রাণীর সহিত ইহার সকল বিষয়ে মিল নাই। প্রাণী-শরীরে মস্তিষ্কে ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন প্রভেদ, সভ্যতার তাহা নহে। বহু মানব মনের একত্র সমবায়ে যে সভ্যতা ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট আকার লইয়া ধাবিত হইয়াছে, সেই প্রত্যেকটি মানব মন একই সময়ে সেই সভ্যতার অঙ্গ-বিশেষ অথচ মস্তিষ্ক—এ দুয়েরই অন্তর্ভুক্ত। প্রাণী-শরীর এরূপ নহে। প্রত্যেক বিশেষ সভ্যতার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা গভীর ঐক্য বিদ্যমান। এই ঐক্যই সেই সভ্যতার প্রাণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহনের আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি বা বাঙ্গালী সভ্যতার এই প্রাণ আর বাঁচে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার উৎপত্তিকাল ষোড়শ শতাব্দী।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

রাজা রামমোহনের সময়ে বাঙ্গালী সভ্যতার যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসাদগ্রস্ত এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দেখা গিয়াছিল,—তাহার উৎপত্তিকাল ষোড়শ শতাব্দী। এই শতাব্দীতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করে। দর্শন বিভাগে মৈথিলি ন্যায়ের প্রভুত্ব অতিক্রম করিয়া রঘুমণি "নব্য ন্যায়ের" উদ্ভাবন করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া "বৃহৎ তন্ত্রসার" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং নূতন কতকগুলি মূর্ত্তিপূজা প্রচলন করেন। মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের এক বিরাট প্লাবন দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত করেন। বাঙ্গালীর স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি যাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামমোহন শিথিল ও বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার সমস্তই ষোড়শ শতাব্দীতে উদ্ভব হইয়াছিল। বাঙ্গালী সভ্যতার বিভিন্ন বিভাগে স্মৃতি, দর্শন, এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে বাঙ্গালী-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ষোড়শ শতাব্দীতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং সভ্যতার এই বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য গভীর ঐক্য তখন বিদ্যমান ছিল। এই ঐক্যই বাঙ্গালী সভ্যতার প্রাণশক্তি। এই ঐক্যই বাঙ্গালী-সভ্যতাকে ইতিহাসে একটা পৃথক্ সভ্যতা—একটা জাতীয় সভ্যতা বলিয়া স্থান দিয়াছে এবং দিতেছে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের কথা রামমোহন বহুস্থানে উল্লেখ করিয়া সমাজ-জীবনের যে একটা গতিশক্তি আছে, তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজ যে একই

রামমোহন ও সমাজ-বিজ্ঞান।

অবস্থায় পঙ্গুর মত একস্থানে বসিয়া নাই, গতিমুখে সমাজ-জীবনের পরিবর্ত্তন যে অবশ্যম্ভাবী এবং সমাজস্থ ব্যক্তিগণ, যাহাদের "সৎ অসৎ বিবেচনা শক্তি আছে" তাহারা যে "কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করিয়া" সমাজ-জীবনের গতিকে "লোক শ্রেয়ঃ"র আদর্শে অর্থাৎ লোকের যাহাতে ভাল হয় তাহার দিকে পরিচালিত করিবেন—ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে রামমোহনের গবেষণা তাঁহাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের অগ্রণী করিয়া সম্মানিত করিতেছে।

রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থের আচার-ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্তের যে অনুশাসন তাহা দ্বারাই বাঙ্গালী হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আচারসম্পর্কে রঘুনন্দনের যে ব্যবস্থা তাহা নিশ্চয়ই কর্ম্মকাণ্ড এবং সকাম কর্ম্ম। কিন্তু পরিশেষে, নিষ্কাম কর্ম্মের প্রসঙ্গও আছে। নিবৃত্তিমার্গের অবতারণায়—ইহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় আছে।

স্মৃতির অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার এই আদর্শের সহিত বাঙ্গালীর দর্শন নব্যন্যায়ের একটা যোগসূত্র আছে। বাঙ্গালীর স্মৃতি যেমন বাঙ্গালীর নিজস্ব, বাঙ্গালীর দর্শনও তাই এবং ইহারা পরস্পর এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ। কেননা, ইহারা একই অখণ্ড সভ্যতার দুইটি পৃথক অঙ্গ। সুতরাং রঘুনন্দনের কর্ম্মকাণ্ডের সমর্থক যে দর্শন তাহা জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা নহে—তাহা রঘুমণির নব্যন্যায়। নব্যন্যায় ঈশ্বরকে স্বীকার করেন। এবং বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর পূজার নিমিত্ত সকাম কর্ম্মেরও সমর্থন করেন। কিন্তু পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানের বিশ্বাসকে চরম পরিণতি নির্দ্দেশ করিয়া রাগ, দ্বেষ, মোহপ্রযুক্ত মিথ্যা জ্ঞানকে ও তজ্জনিত এই মিথ্যার সংসারে জন্মান্তরের দুঃখকে পরিহার করিতে বলেন।

রঘুনন্দনের স্মৃতির সহিত রঘুমণির নব্যন্যায়ের সম্পর্ক

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের আদর্শ স্মৃতিশাস্ত্রেও কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সমন্বয় আছে—এবং এই স্মৃতির সমর্থক দর্শনশাস্ত্রে ও নব্যন্যায়েও কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্য আছে।

বাঙ্গালীর স্মৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্মৃতি হইতে পৃথক। স্মৃতির ব্যবহার বিভাগ দায়ভাগ অন্যান্য প্রদেশের মিতাক্ষরা হইতে পৃথক। আচারও অনেকাংশে পৃথক্। এক হিন্দু-সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইলেও বাঙ্গালীর সমাজ অন্যান্য প্রদেশের সমাজ হইতে আচারে ও ব্যবহারে বিলক্ষণ পৃথক্। এই পার্থক্যের উপরেই এই বিভাগে বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

বড়লোকের স্মৃতি

কালীকৃষ্ণ মিত্র

বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ চালাইবার উদ্যোগ করেন, আর প্যারীচরণ সরকার ইংরেজি শিক্ষিতদের অসংযম দূর করিবার জন্য Well-wisher পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, সে সময়ে তাঁহাদের প্রধান সহায়, উপদেষ্টা ও সমকর্ম্মী ছিলেন কালীকৃষ্ণ মিত্র। এ হইল প্রায় ৬৫-৬৬ বৎসর আগেকার কথা। আমি এই মহাপুরুষের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলাম ১৮৮৩-১৮৯১ অব্দ পর্য্যন্ত। কাছে থাকিয়া নিজে যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিবার আগে সেকালের কৃতী পুরুষেরা এই মহাত্মার কথা যাহা বলিয়াছেন তাহার অল্প একটু উল্লেখ করিব।

স্যর উইলিয়ম্ হন্টর তাঁহার সিবিল্ সর্বিস্ চাকুরির প্রথম ভাগে যখন এদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইতেছিলেন তখন প্যারীচরণ সরকারের মুখে কালীকৃষ্ণ মিত্রের কথা শুনিয়া বারাসতে তাঁহাকে দেখিতে যান। কালীকৃষ্ণ তাঁহার বাগান-বাড়ীতে অথবা তপোবনে একখানি খুরপাই হাতে করিয়া বেড়ার ধারের ঘাস নিড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে হন্টর সাহেব বাগানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কালীকৃষ্ণের তখন গায়ে চাদর ছিল না, পায়ে জুতা ছিল না, তবুও তাঁহার প্রতিভায় দীপ্তিভরা মুখখানি দেখিয়া হন্টর সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে এ ব্যক্তি মালী নয়—মালিক। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সহাস্য-মুখে কালীকৃষ্ণের কাছে আসিয়া ইংরেজি ভাষায় তাঁহার পরিচয় দিলেন। কালীকৃষ্ণ ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন আর হন্টর সাহেব তাঁহার করস্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। কালীকৃষ্ণ হাত গুটাইয়া বলিলেন—তাঁহার হাতে ধূলা-মাটী; হন্টর বলিলেন—আমি এমন পবিত্র হাত আর কোথায় পাইব! কালীকৃষ্ণের আশ্রমে আসবাবের মধ্যে ছিল খান কতক মাদুর পাতা, আর তাহার উপর গোটা দুই তাকিয়া; বাড়ীতে একখানা চেয়ার ছিল বটে, তবে সেখানি তোষকে-বালিসে ভরা ছিল। কালীকৃষ্ণ বালিসের বোঝা নামাইয়া চেয়ার আনিতে চেষ্টা করিলেন, আর হন্টর তাঁহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া মাদুরে বসাইলেন ও নিজে বসিলেন। হন্টর সাহেব তাঁহার আড়াই ঘণ্টা কথোপকথনের মধ্যে দেখিয়া নিয়াছিলেন যে সেই মাদুরের ফরাসের উপরে স্থানে স্থানে পত্রাঙ্ক গোঁজা যে কয়েকখানি বই ছিল সেগুলি Platoর দর্শন শাস্ত্রের তর্জ্জমা, দুখানি মোটা মোটা হোমিওপ্যাথিকের বই, কাশীর ছাপা একখানি মোটা সংস্কৃত গ্রন্থ, আর বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি হইতে আনা ভাল সংস্করণের Shellyর কবিতা। হন্টর সাহেব তাঁহার তীর্থযাত্রার সমস্ত গল্পটা প্যারীচরণ সরকার ও বিদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন, যে এদেশে যখন কালীকৃষ্ণের মত নিষ্কাম কর্ম্মী দশটাও জন্মিতে পারে,

সর্ববিদ্যায় পারদর্শী অত বড় পণ্ডিত জন্মিতে পারে, তখন ভারত পরাধীন হইলেও তাহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সময়ে ছিলেন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ; তিনি কালীকৃষ্ণকে জ্ঞানের হিসাবে গুরু বলিয়া মানিতেন, আর চিকিৎসা বিষয়েও সময়ে সময়ে তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।

মদ্যপান নিবারণী Well-wisher পত্রের সম্পাদক ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রোফেসর প্যারীচরণের উপর কালীকৃষ্ণের প্রভাব যে প্রসারিত ছিল, তাহা তখনকার দিনে অনেকেই জানিতেন। প্যারীচরণ তাঁহার একজন মদ্যপায়ী বন্ধুর বাড়ীতে (ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার নাম করিলাম না) বড় এক বাটি পাঁটার মাংস ও রুটি খাইতেছিলেন, আর তাঁহার বন্ধু নিজের আহারের পথ্যরূপে একটা গেলাসে কিছু মদ ঢালিয়া নিয়াছিলেন। বন্ধুটি পরিহাস করিয়া প্যারীচরণকে তাঁহার পথ্যের এক ঢোক্ খাইতে বলিলেন ; প্যারীচরণ তাঁহাকে তিরস্কার করায় তাহার বন্ধু প্যারীচরণের মাংসের বাটির দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আমি কালীকৃষ্ণকে বলিয়া দিব—you are giving preference to flesh over spirit." এই হাসির গল্পটি প্যারীচরণের বন্ধু-সমাজে অনেকের কাছে শুনিয়াছি ; আমি প্যারীচরণকে চোখে দেখি নাই।

কালীকৃষ্ণ কলিকাতায় বাসের সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার নবীনকৃষ্ণের জামাতা কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতেন ; কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র যদুনাথ আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন বলিয়া আমি অতি দীর্ঘ সময় সেই বাড়ীতে কাটাইতাম ও অনেক সময় রাত্রে সেই বাড়ীতেই শুইতাম। একদিন আমাতে ও যদুতে দাবা খেলিতে বসিয়াছি, আর আমি প্রায় হারিবার মত হইয়া একটা ভুল চাল দিতে যাইতেছি, এমন সময় পিছন হইতে মনীষী কালীকৃষ্ণ বলিলেন—"বিজয়, বোড়ে ঠেল না, তোমার ঘোড়া মারা যাবে।" কখন যে তিনি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, জানিতাম না, কেন না তাঁহার সামনে বসিয়া আমার দাবা খেলার সাহস ছিল না। তিনি ছিলেন আমাদের কাছে দেবতা, কিন্তু তাঁহাকে পাইতাম সখারূপে।

যে কেহ অসঙ্কোচে কালীকৃষ্ণের কাছে ঘেঁসিতে পারিত ও যাহা খুসি বকিতে পারিত। একদিন লর্ড সাহেবের গির্জ্জার (এখন উহার নাম St. Paul's Cathedral) হাতার একটি দেশী খৃষ্টান যুবক কালীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছিল যে miracle সম্ভবপর। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া ঘরে ঢুকিবার মুখেই miracleএর কথা শুনিতে পাইয়া যুবকটিকে বলিলেন—"কালীকৃষ্ণ বুঝিবে না, আমি ঠিক miracle মানি ; এই দেখ একজন লোক জন্মমাত্রে মামা হইতে পারে কাকা হইতে পারে, এমন কি সম্পর্কে ঠাকুর দাদা পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে সে জন্মিবামাত্রে একটি সম্পর্কের ছোট ভাইয়েরও ছেলের জ্যেঠা হয় ;

তুমি সে অঘটন ঘটাইয়া আকণ্ঠ জোঠা হইয়াছ,—এটা প্রকাণ্ড miracle।" শ্রোতারা হাসির চোট সামলাইতে পারিল না, আর যুবক খৃষ্টানটি সে আসর ছাড়িয়া পলাইয়া বাঁচিল।

একদিন বারাসতের বাগান হইতে আমাদের কলিকাতা ফিরিবার সময় কালীকৃষ্ণ আমাদের হাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য খানিকটা আচার পাঠাইয়া যে ছোট চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহার একটি অক্ষরও কখন ভুলিতে পারিবনা। চিঠি বা চিরকুটখানিতে লেখা ছিল—"বিদ্যাসাগর, তোমার জন্য কিছু আম-তেঁতুলের আচার দিতেছি; দেখিবে, এ দেশের সকল আচারই মন্দ নয়।"

মনীষী কালীকৃষ্ণ ইংরেজি ও বাঙ্গলায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোনটাতে তাঁহার নাম দেন নাই ও অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার লেখা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এল, ভি, মিত্রের নামে লালবিহারী মিত্রের চিকিৎসালয় হইতে তাঁহার লেখা অনেক হোমিওপেথিক চিকিৎসার বাঙ্গলা বই প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু লালবিহারী কখনও কালীকৃষ্ণের নাম প্রকাশ করিতে অনুমতি পান নাই। বহু লোক বহু চেষ্টা করিয়া কালীকৃষ্ণের ফটোগ্রাফ তুলিতে পারেন নাই। একদিন আমি সাহসে ভর করিয়া মহাপুরুষকে ইহার কারণ জিজ্ঞা করিয়াছিলাম; যাহা উত্তর পাইয়াছিলাম তাহা এই: "সাবধানে থাকিলেও মানুষেরা পাপের হাত এড়াইতে পারে না; অলক্ষ্যে অহঙ্কার ও যশের লোভ জন্মান বিচিত্র নয়।" এই কথা কয়টি কহিবার পর কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"মানুষে আপনাদের নাম রাখিবার জন্য এত ব্যস্ত হয় কেন? যে কারিগরেরা মিশরের পিরামিড গড়িয়াছিল তাহাদের নাম কি কেহ জানে, না জানিতে পারে?" ভাবের নূতন তরঙ্গের আঘাতে আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। মনীষীর মৃত্যুর পর ১৮৯১ অব্দের শ্রাবণ মাসে মৃত্যুশয্যায় শায়িত কালীকৃষ্ণের ফটোগ্রাফ তুলা হইয়াছিল; সেখানি নিশ্চয়ই ৬৫ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে রক্ষিত আছে। প্যারীচরণ সরকারের জীবনচরিত লেখক নবকৃষ্ণ বসু মহাশয় ঐ ছবির একটি প্রতিলিপি নিয়াছিলেন ও কালীকৃষ্ণের জীবনী নামে অতি ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকায় উহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

কালীকৃষ্ণ যে ভাবে প্রতি বৎসর কলিকাতায় পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধ করিতেন, সে বিবরণ বড় শিক্ষাপ্রদ। রাত্রে ৩।৪টার সময় উঠিয়া প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত যোগাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন ও তাহার পর কয়েক হাঁড়ি ভাত, ডাল ও তরকারী রাঁধাইয়া নিজে বাহির হইয়া অনেক দরিদ্রকে ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ের মেথরদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রোজ নামচায় ঐ দিনটি লেখা থাকিত, কারণ তিনি সেদিন একবার আসিতেনই আসিতেন ও সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগ শেষ হইয়াছে কি না।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের আর একটি কথা বলিব। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন ব্রাহ্মণ্যঅভিমানী বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীর নীচের তলায় কয়েকজন পরিচিত

কায়স্থের প্রণাম না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা জানাইয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণ-গৌরবের কথায় বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা ভারতের কত উপকার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ, স্বয়ং বিষ্ণু বরাহ অবতার হইয়াছিলেন বলিয়াই ডোমপাড়ার সকল শুয়ারকে কেহ পূজা করে না।" আর একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছিলেন যে কালীকৃষ্ণের মত কায়স্থ যাঁহাদের নমস্ত নন, বাঙ্গালায় এমন ব্রাহ্মণ কয়জন আছেন ?

কালীকৃষ্ণ কখন ধর্ম্মের নামে অথবা ধর্ম্ম-সাধনার নামে চীৎকার ও উত্তেজনা সহিতে পারিতেন না। কেহ ধর্ম্মের নামে গেরুয়া কাপড় পরিলে মনে করিতেন, সে ধর্ম্মের বিজ্ঞাপন দিয়া বেড়াইতেছে। একদিন তাঁহার মুখে স্পষ্ট শুনিয়াছি—"টিকি ও ফোঁটাও যা, গেরুয়াও তাই।" একদিন ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবের সময়ে মন্দিরের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তনের কোলাহল শুনিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। নগর-সঙ্কীর্ত্তনের সময় নিরর্থক এক-একটা শব্দ অনেকবার উচ্চারণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনকারীরা নাচিয়া নাচিয়া নেশা ধরায় ও ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে ভ্রষ্ট হয়, একথা তিনি আমার সমক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন।

এই জ্ঞানী ও সাধু, ও তাঁহার বন্ধু বিদ্যাসাগর ১৮৯৯ অব্দের বর্ষাকালে ইহলোক ত্যাগ করেন আর তাঁহাদের দুই জনের অন্তরঙ্গ বন্ধু রামতনু লাহিড়ী আরও সাত বৎসর তাঁহাদের স্মৃতি বহিয়া জীবিত ছিলেন।

কালীকৃষ্ণ এখন এযুগে বিস্মৃত : এই দেশময় চীৎকার ও কোলাহলের যুগে দেশের নেতারা একবার কালীকৃষ্ণের জীবন-চরিত আলোচনা করিলে ধন্য হইবেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

স্মৃতি দূর দেশে—

স্মৃতি দূর দেশে ছিলে তুমি,
আজ জুড়ে সব মনোভূমি
তোমারি প্রভাব,
একি স্বপ্ন লাভ ?

তোমারে হলোনা কোনো ক্ষতি ;
এ জীবনে পড়িল যে যতি ;
যে মাত্রার আজিকে সূচনা,
কাছে কি সুদূরে, জানে কোন্ জনা ?

সেই সব যেন দৃষ্টি খানি,
হিয়ার কহিছে কত বাণী ;
কত না আলোকে ;
ভরিল দু'চোখে ;

পুরাতন নূতনের বেশে,
সমুখে দাঁড়াল ফিরে এসে,
বিলুপ্ত ছিল যা অন্ধকারে,
শোভায় ভরিল ধরা একাকারে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

দেউসির দিনে

পাহাড়ীর দেশে গিয়ে প্রথম আমার নজর পড়েছিল—চিরকালের বিস্ময় হিমালয়ের উপুর ; তার পরেই যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে হোমরা চোমরা কেউ নয়—একটা সাঁওতালী ছেলে। বয়স আর তার কতই বা হবে ? কুড়ি বাইশ বছর হতে পারে।

সে ছিল আমার ঠেলা-ওয়ালা অর্থাৎ আমার ট্রলির (Trolly) ড্রাইভারদের মধ্যে একজন। মাথায় তার বড় বড় কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ আর চোখের তার অতলস্পর্শ গভীর চাহনি কেমন একটা রহস্যের জাল তার চারিদিকে বুনে দিয়েছিল। কালো পাহাড়ের ঊর্দ্ধ সীমায় যখন কালো মেঘেরা মিশে কালোটাকে আরও গাঢ় করে তুলত, তখনই আমার মনে হত—ঐ সাঁওতালীটার কালো চোখের দৃষ্টি বুঝি নিবিড় হয়ে উঠছে।

সে মোটেই কথা বলতনা ; নীরবে সমস্ত কাজ সাগ্রহে করে যেত। আমার এতদিনকার চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে তার মত নিরলস কর্ত্তব্যপরায়ণ চাকরের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। সব সময়েই সে যেন হুকুমের প্রতীক্ষায় বসে আছে।

তার এই কর্ম্মনিষ্ঠা দেখে আমার মনে হত—বুঝি সে এই কাজের নেশার মধ্যে তার কোনও বড় দুঃখ, বড় দুর্ব্বলতাকে ডুবিয়ে দিতে চায়। এই নির্ব্বাক সংযমী যুবকটির মধ্যে একটা যেন বিশেষ কি ছিল যাতে তাকে সাধারণ মনে করা সোজা হত না।

একদিন জানতে পেলাম—মাসের মধ্যে অনেকদিনই তার ভাল খাওয়া হয়না ; মধ্যে মধ্যে উপবাসও সে করে থাকে। এর কারণ অর্থাভাব নয় কারণ সে মাসে ত্রিশ টাকা করে মাইনে পেত। এর কারণ শুনলাম তার রেঁধে দেবার লোক নেই। সে সরকারী নকুরী নিয়েছে বলে লোকে তাকে ঘৃণা করে। তাই স্বজাতি-সমাজে সমাজচ্যুত না হলেও সে সমাজচ্যুতের মতই বাস করত। সম্মানের দাবী সে কারু কাছ থেকেই করত না। একলা খাপছাড়া হয়েই বেড়ে উঠেছিল সে।

একদিন বিকালে শুনলাম সে উপোষ করে আছে। ডেকে প্রশ্ন করলাম—'খাসনি কেন'?

"সুবিধে হলনা হুজুর।"

"কেন ?"

তার সেই স্বপ্নপুরের রহস্যময় চোখ দুটো একবার বিস্তৃত হয়ে চক্ চক্ করে উঠল ; সে আর কোনও উত্তর দিতে পারল না।

অনেক কথা-কাটাকাটির পর স্বীকার করালাম যে অসুবিধায় পড়লেই সে আমার বাড়ীতে খাবে। সে স্বীকার করল বটে কিন্তু সারা বছরের মধ্যে একদিনও আমার বাড়ীতে খেতে এলনা।

আমি কাজে অকাজে এই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে দেখতাম। তার অটুট গাম্ভীর্য্য গ্রীষ্মে,

বর্ষায়, হেমন্তে, শীতে, শরতে সমভাবেই তাকে ঘিরে থাকত। প্রকৃতি তার এই খেয়ালী ছেলেটির উপর কোনও স্থায়ী চিহ্নই এঁকে যেতে পারেন নি।

সেবার বর্ষার আড়ম্বরটা একটু বেশীই দেখা গেল। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম—নবীন বর্ষার নিবিড় সমারোহের মধ্যে তার আঁখির পাতা হঠাৎ যেন ভারী হয়ে পড়েছে, তার ব্যথিত নীরব দৃষ্টি দূর আকাশে উধাও হয়ে গেছে।

পূজা এল, পূজা গেল। বাংলার বাইরে আমার প্রবাস জীবনের কোনও ব্যাপারেই সে দূর করল না; অধিকন্তু তাকে নিবিড় করেই রেখে গেল। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন আকাশ আলোয় ভরে গেল। দূরে ঘন-নিবদ্ধ পাহাড়ের রাজত্ব যেন অবুঝ রহস্যভরা প্রহেলিকা। চোখের সামনে সে যেন মায়াপুরীর যবনিকা তুলে ধরেছে। ঝর্ণার জলের উপলখণ্ডগুলিও সোণার মত জ্বলছে।

সে রাতটা আমার জেগেই কাটল। আরও একটা লোক যে সারারাত জেগে কাটিয়েছে সেটা পরের দিনে টের পেলাম। সে হচ্ছে ঐ সাঁওতাল যুবকটি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লক্ষ্মীপূজার পর দিন থেকে সে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। তার চাঞ্চল্য প্রকাশের ধরণ সাধারণ ছিলনা, কাজেই সেটা সকলের চোখে পড়েনি। বাইরে সে নীরব গম্ভীরই ছিল; কিন্তু তার চোখ দুটো দিয়ে কেমন একটা অধীর আবেগ মাঝে মাঝে ফুটে বেরুত, যেটাকে ধরা খুব কঠিন ছিলনা। এই সময়ে সে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হতে লাগল, কাজে কর্ম্মেও তার উৎসাহ যেন একটু শিথিল হয়ে পড়ল।

সেদিন কালীপূজার বিজয়া। ঘরে চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ দেখি সেই ছেলেটি এসে আমার স্ত্রীর নিকট থেকে ভাত চেয়ে খেতে বসল। আমি বিস্মিত হলাম বটে কিন্তু খুসী হলাম তার চেয়েও বেশী।

বৈকালে আমার অন্যান্য ঠেলা-ওয়ালারা এসে নানান ওজর দেখিয়ে ছুটি চাইতে সুরু করল। কারুর জরুর অসুখ, কারুর ভায়ের বেমার, কারুর শিরে দরদ, কারুর হাত দুঃখাতা। ওজরগুলোর সবকটা মিথ্যে জেনেও দেওয়ালী উৎসবের জন্য তাদের ছুটি দিলাম। তখনও সেই সাঁওতাল ছেলেটি ছুটি নেয়নি। সে ভাত খেয়ে বিশেষ রকমের বেশভূষা করে' যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল তখন বেলা প্রায় ২টা।

সে ছুটির জন্য কারুর বেমার প্রভৃতির ওজর দেখালনা, শুধু জানাল—সে দিনটা তাদের স্ফূর্ত্তির দিন; সে স্ফূর্ত্তি করতে চায়।

ছুটি পেতেই সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে চঞ্চল মৃগ-শিশুর মতই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছুট দিল। কিন্তু খানিক পরেই আবার সে ফিরে এল। আমি তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বল্‌ল—"হুজুর টাকা নিতে ভুল হয়েছে। টাকাটা দিন।"

আমার কাছে তার সারা বছরের টাকাটাই গচ্ছিত ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'সব চাই ?'

"হাঁ হুজুর, সব।"

"এত টাকা নিয়ে কি করবি ? বাড়ী যাবি ? মা বাপকে দিবি ?"

আমি জানতাম তার আত্মীয়তার কোন বালাই নেই। তবু সে সব টাকা চায় দেখে এ প্রশ্ন করলাম।

উত্তরে সে সেলাম দিয়ে বলল—"স্ফূর্ত্তি করেগা হুজুর।" সে টাকা নিয়ে চলে গেল।

৩৬০৲ টাকা গুণে দিতে আমার মনে কেমন সন্দেহ হল। তাইত ! ত্রিশ টাকা হিসাবে বারো মাসে ৩৬০৲ টাকাই ত হয়। প্রতি মাসের মাহিনা হতে এক পয়সাও ত সে ব্যয় করেনা। তার মাঝে মাঝে উপবাসের কারণ বুঝলাম। আরও বুঝলাম—যেদিন সে উপবাস করেনা, সেদিনও সে বনজাত ফলমূল বা অযত্ন-সংগৃহীত দুধ ছাড়া আর কিছু খেতে পায়না।

সন্ধ্যার পর দলে দলে কুলীর দল, কুলীস্ত্রীগণের দল 'দেওসী' করতে এল। কিন্তু তাদের কারুর দলেই সেই সাঁওতালটাকে দেখতে পেলাম না। 'দেউসীটা' অবশ্য পাহাড়ী জাতের প্রথা। কালীপূজার বিজয়ার দিন তারা দল বেঁধে সব বড় বড় লোকদের বাড়ী গান গেয়ে কিছু কিছু আদায় করে ও তাই দিয়ে মদটদ কিনে খায়। এদের সকল দলের গানেরই বিশেষত্ব এই যে, সিকি লাইনের এক একটা কথা এক একজন বানিয়ে বলে, অবশিষ্ট সকলে ধুয়া ধরে 'দেওসি' অর্থাৎ 'দিনচ' কিনা দান করুন। এ যেন আমাদের বাংলা দেশের ফসলের দিনের 'হোল-বোল' গাওয়া।

একে একে অনেক দল এল গেল। তাদের জ্বালায় সারারাতটা প্রায় জেগে কাটল।

পরদিন সকাল বেলাতেই লাইন দেখার দরকার ছিল। কিন্তু উৎসবের পরদিন সকালে যে আমার টালিওয়ালারা ফিরবেন, সে আশা বড় ছিলনা। তাই ভাবছিলাম কি করি। এর মধ্যেই দেখি সেই সাঁওতাল যুবকটি এসে সেলাম দিচ্ছে। তার মুখের উপর সর্ব্বস্বহারার কি গভীর দুঃখের ছাপই না মারা রয়েছে। তবু তার ভেতর থেকে মাঝে ফুটে বেরুচ্ছিল যেন একটা জয়গর্ব্বের দীপ্তশ্রী, আত্মপ্রসাদের সলজ্জ মধুর হাসি।

আমি প্রশ্ন করলাম—'তুই দেওসি করিসনি।'

'করেছি বৈ কি হুজুর।'

'কই আমার এখানে ত আসিস নি।'

'না হুজুর, আমি সাঁওতাল। আমার দেউসি আলাদা। নেবার নয়, দেবার।'

হঠাৎ মনে পড়ল টাকার কথা ! তাইত ! অতগুলো টাকা সে কি করল ? বললাম-'সে টাকাটার মধ্যে কত ফিরল রে ?'

'কিছুই না : সবই খরচ হয়েছে হুজুর।'

'এক রাতে ?'

'হাঁ হুজুর।'

'তুই কি খুব মদ খেতে পারিস ? কাল বেঁহুস হয়ে পড়েছিলি বোধ হয়, তাই টাকা কেউ চুরি করে নিয়েছে, না ?'

'না হুজুর কেউ চুরি করেনি। আমি বেঁহুস হয়েছিলাম ঠিক তবে হুজুর টাকা কেউ নিতে পারেনি। টাকা আমিই খরচ করেছিলাম।'

কিছু বুঝলাম না। যার ত্রিসংসারে কেউ নেই, সে এত টাকা এক রাতে খরচ করে কেমন করে ? বিশেষতঃ সাঁওতালের অভাব খুবই সামান্য। টাকা তারা বড় চোখে দেখেনা, দেখতে চায়ও না।

আমার অন্য কুলীদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তারা নতুন আর কিছুই বলতে পারলনা। শুধু বললে—এটা ও নতুন কিছু করছে না : বরাবর এই রকমই করে। সারা বছরের আয় সে জমিয়ে রাখে, আর তা খরচ করে এই দেওসির রাতে। কিন্তু কি করে যে করে তা কেউ জানে না। তবে এটুকু তারা জানে, সে সৎ ও মহৎ। গাঁয়ে তার এখনও যা আছে, তাতে তার নকুরী করার দরকার হয় না। তবু কেন যে সে এই নকুরী নেওয়ার অপমান স্বীকার করল, সেটা কিন্তু কেউ বলতে পারেনা। তাদের বংশের মধ্যে সেই প্রথম 'নোকর।'

সেই সাঁওতাল ছেলেটা ক্রমশঃ গম্ভীর হতে গম্ভীরতর হতে লাগল। সে যে একদিনের জন্যও চঞ্চল হয়েছিল বা হতে পারে, তার বর্ত্তমান অবস্থা দেখলে একথা কেউ বলতে পারতনা। সে যেন একটি যন্ত্রবিশেষ। মুখে কথা নেই, কাজে আলস্য নেই, আবার শ্রমশেষে স্ফূর্ত্তিও নেই।

আবার বছর ঘুরে এল—দুর্গাপূজা শেষ হয়ে গেল। আবার দেখি হঠাৎ তার চঞ্চলতা সুরু হয়েছে ! তার অধীরতা লক্ষ্মীপূজার পর একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্ল। সে মাঝে মাঝে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগ্ল।

গত বছরের মতই দেউসির দিনে সে আমার স্ত্রীর কাছে ভাত চেয়ে খেল, আমার কাছ থেকে তার বছরের সঞ্চিত ৩৬০৲ টাকা নিল ও বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পোষাক পরে ছুটি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠ্ল। একখানা সাইকেলে উঠে আমি একটু দূরে দূরে তাকে অনুসরণ করলাম। সূর্য্য ক্রমে ডুবে গেল, আকাশে তারা ফুটে উঠ্ল, পাহাড়ের কন্‌কনে উত্তরে হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিতে লাগ্ল, তবুও সে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আনমনে চলেছে।

রাত্রি যখন অনুমান ১২টা, তখন সে ডিমা নদীর পুলের কাছে একবার থাম্ল, তারপরে পুলের নীচে নদীর বালুময় চরের উপর গিয়ে দাঁড়াল। আমিও সাইকেল থেকে নেমে পড়্লাম,

কিন্তু ভয় করতে লাগ্‌ল। এই নদীর আশে পাশে জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, সাপের ত অভাব নেই। বুনো হাতীর ভয়টাই আরো বেশী। তবু তাকে অকুতোভয় দেখে আমারও সাহস একটু বেড়ে গেল।

সে খানিকক্ষণ পাহাড়ী নদীর ধারাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বালি আর পাথরের উপর ঘুরে বেড়াল; তারপরে পুলের একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে নদীগর্ভেই বসে থাক্‌ল।

হিম-গিরির শীতল বাতাস ঝর্ণাধারায় স্নান করে, একেবারে হাড় কাঁপিয়ে ফির্‌তে লাগ্‌ল, তার কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে দিব্য আরামেই বসে থাক্‌ল; যেন সে শীতের দিনে বসে বসে আগুন পোহাচ্ছে। এমনি সহজ আরামেই সে বসে ছিল।

হঠাৎ একটু শব্দে সজাগ হয়ে দেখি, একটি পাহাড়ী বালিকা তার পাশে এসে বস্‌ল। তারপরে তারা দুজনেই দুজনের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মহারা হয়ে কয়েক মিনিট থাক্‌ল, শেষে বালিকাটি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—"বিদায়, বিদায়!"

তার সেই করুণ সুর সেই নিস্তব্ধ গভীর রাতের অন্ধকারের মধ্যে গুমরে গুমরে মরতে লাগ্‌ল।

সেই সাঁওতাল যুবকটি তার ললাটে ও কপোলে বিদায়-চুম্বন এঁকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার সযত্ন-রক্ষিত বৎসরের সঞ্চয় সমর্পণ ক'রে খুসীতে বিহ্বল হ'য়ে পড়্‌ল। মেয়েটি চ'লে যাওয়ার পর সে প্রায় ভোর পর্য্যন্ত সেই নীরব নদীতটে একলা বসে শিস্ দিতে দিতে গান করল, কে [illegible] গান—সুখের কি শোকের।

তার পরদিন আবার তার সেই পুরাণো ভাব, তার সেই অটুট গাম্ভীর্য্য, যন্ত্রের মত প্রাণহীন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ফিরে এল।

আমি অনেক অনুসন্ধানের পরে ব্যাপারটা জেনেছিলাম। এই সাঁওতাল বালকটার সঙ্গে, সেই পাহাড়ী মেয়েটার বন্ধুত্ব ঘটে। শেষে বন্ধুত্ব যখন প্রেমে গিয়ে দাঁড়াল, তখন হঠাৎ সেই পাহাড়ী মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল এক পাহাড়ী সর্দ্দারের সঙ্গে। সাঁওতালের সঙ্গে পাহাড়ীর বিয়ে হয় না; হ'লে সমাজে পতিত হ'তে হয়। তাই তাদের বিয়ে হ'ল না।

মনের দুঃখে বালকটি প্রথমে চ'লে যায়। পরে একদিন শুনতে পায় যে, তার সেই পাহাড়ীপ্রিয়ার পাহাড়ীপতির আরও ৪।৫ জন পত্নী আছে। উপরন্তু সেই পাহাড়ীটা অত্যন্ত মাতাল। তার যে-বৌ মদ খাওয়ার টাকা জুটিয়ে দিতে পারে, সেই তার প্রিয় হয়। তার ফলে আদর আপ্যায়ন সে নতুন কিছু পায় কিনা বলা যায় না তবে নিত্যকার নিয়মিত প্রহারের হাতটা এড়িয়ে যায়।

সেই পাহাড়ী মেয়েটার বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর আর বিশেষ সম্বল না থাকায়, টাকা দিতে না পারায়, একদিন যখন সে অত্যন্ত মার খাচ্ছিল, তখন এই সাঁওতাল ছেলেটা তাকে দেখে ও

অসহ্য ক্রোধে তার পাহাড়ী পতিকে আক্রমণ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তার প্রিয়তমা বাল্য-সহচরীর অনুরোধে, তাকে আর কিছু না ব'লেই ব্যাপারটা বুঝে ফিরে আসে।

এরই ফলে তার উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, বন্য, স্বাধীন জীবনের পরাধীনতার নাগপাশগ্রহণ আর এই একটি দিনের জন্য বর্ষব্যাপী নীরব সাধনা। দেওসির দিনের একটা রাতই মাত্র পাহাড়ী স্ত্রীরা স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করার অবাধ অধিকার পায়, আর এই একটি রাতের একটি নিমেষের জন্য এই নীরব প্রেমিক প্রতীক্ষা ক'রে থাকে—প্রেয়সীর বাঞ্ছিত ললাটে একটি আশীষ চুম্বন এঁকে দেওয়ার জন্য।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জাতিভেদ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত *

আজ যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি, সে সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে দশ বার দিন নানাদিক হইতে বলিলেও তাহার সম্যক্ আলোচনা শেষ হয় না। জাতিভেদ রূপ মহাপাপ ভারতবর্ষকে অধঃপতনের পথে কিরূপে চালিত করিয়াছে তাহার আলোচনা নানাদিক্ হইতে করা যাইতে পারে। আমি এস্থলে তাহার মাত্র দুই একটি দিক্ সম্বন্ধে কিছু বলিব। সম্প্রতি ভারতবর্ষে অন্যূন ৫০ হাজার মাইল (প্রায় পৃথিবীর পরিধির দ্বিগুণ) আমাকে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে, নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত অনেক কার্য্যে—দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক প্রকার অনুষ্ঠানে—যাইয়া অনেক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে হইয়াছে। তাহার ফলে যেটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে জাতিভেদ দেশের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আর্য্যেরা যখন এদেশে আসিয়াছিলেন সেই বেদের যুগে জাতিভেদের অস্তিত্বও এদেশে ছিল না। জাতিভেদের কথা সংস্কৃতে নাই। ইহা Caste system-এর বাংলা তর্জ্জমা। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণভেদ, বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি কথা আছে বটে। আদিশূরের সময়ে বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ লোপ হওয়ায়, তিনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বাঙ্গলাদেশে আনয়ন করেন, এই রূপ প্রবাদ আছে। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বর্ত্তমান কুলীন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বলা বাহুল্য যে, সেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পত্নীগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা নাই। তৎপরে বল্লালসেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া বঙ্গের তথাকথিত উচ্চজাতিগুলির মধ্যেও উপজাতির সৃষ্টি করেন এবং তখন আমাদের দেশে জাতিভেদের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। এখন আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার "জাতি" দেখিতে পাই, বাঙালাদেশের ৩৬ জাতির কথা সকলেই অভিজ্ঞাত। কিন্তু

---

* ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, পি এইচ. ডি ও প্রফুল্ল কুমার বসু, এম্ এস. সি কর্ত্তৃক অনূদিত।

হিসাব করিয়া দেখিলে এই সংখ্যা ৬০।৭০ এরও অধিক। অথচ এতগুলি জাতির মধ্যে জাতি ও বর্ণ অনুসারে কোন বৈষম্য নাই। নৃতত্ত্বের দিক্‌ (ethnologically) দিয়া দেখিতে গেলে একজন নমঃশূদ্র ও একজন ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে না। এক সময়ে বাঙলাদেশে বৌদ্ধমত অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল—প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে বৌদ্ধ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তৎকালে জাতিভেদের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ আবার তাহার সমস্ত কঠোরতা লইয়া ফিরিয়া আসে।

বর্ত্তমানে বাঙলাদেশে শতকরা ৫০ জনেরও অধিক মুসলমান। অথচ এই মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন লোকের শরীরে হিন্দুর রক্ত। আজ যে বাংলাদেশের এই শতকরা ৫০ জনেরও অধিক মুসলমান—ইহার কারণ হিন্দু সমাজের কঠোরতা। জাতিভেদের কঠোর বন্ধনে, হিন্দু সমাজকে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ করিতে যাইয়া তাহাকে কেবল পঙ্গুই করিয়াছি। এই শতকরা ৯৯ জন মুসলমান—যাহাদের রক্ত হিন্দু ও ভাষা বাংলা—তাহারা আমাদেরই অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া ইসলামের উদার বক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। মুসলমান সমাজ মানুষকে চিরদিনই মানুষ বলিয়া স্বীকার করে। যেদিন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করা গেল সেইদিন বাদ্‌শাহ, ফকীর এক মস্‌জিদে উপাসনা করিতে অধিকারী হইল। হেয়, অবজ্ঞাত হইয়া কাহাকেও থাকিতে হয় না। সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ফকীরের পুত্রের ওম্‌রাহের দুহিতার পাণিগ্রহণেও কোন বাধা নাই। আমাদের দেশে গ্রামের পর গ্রাম ইসলামের এই উদার আহ্বানে ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছিল। ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেব ধর্ম্মজগতে নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। প্রেম ও ভক্তির যে বার্ত্তা লইয়া তিনি আসিলেন, তাহাতে কোন ভেদের কথা ছিল না। “চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ”। তাই দলে দলে লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলে, বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই তথাকথিত নিম্নজাতিরা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব। চৈতন্য যদি আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই ২৬ লক্ষ বাদে বোধ হয় সমস্ত দেশই মুসলমান হইয়া যাইত। *এতবড় হিন্দু সমাজের এই ২৬ লক্ষ কতটুকু অংশ ? হিন্দু সমাজের এই বৃহত্তর অবজ্ঞাত অংশ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আমরা বেশী খ্যাতনামা ব্যক্তি যে দেখিতে পাই না, তাহার কারণ কোন সুযোগ বা সুবিধা ইহাদিগকে আমরা কখনো দিই নাই। ৺কৃষ্ণদাস পাল ও মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ২।১ জন স্মরণীয় ব্যক্তির অবশ্য নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সমগ্র সমাজের তুলনায় ইহা ধর্ত্তব্যই নহে। হিন্দু সমাজ এই নিম্নশ্রেণীর উন্নতির পথ বন্ধ করিয়াই রাখিয়াছে—ফলে সমাজের বৃহৎ অংশই আজ সমস্ত জাতিকে পিছনে টানিয়া রাখিয়াছে। জাতীয় আন্দোলন আজ দেশের প্রধান আন্দোলন, কিন্তু এই আন্দোলনের সীমা কতটুকু পৌঁছিয়াছে ? আমাদের দেশে জাতীয়তা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই জাগরণের প্রবাহে অনুন্নত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কোথায় ? শিক্ষার অভাবে তাহারা ইহার প্রকৃত স্বরূপটি কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

শিক্ষিত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সহিত তাহাদের সামাজিক বা হৃদয়ের কোন যোগাযোগ না থাকায় জাতীয় আন্দোলনে আমরা তাহাদের সহানুভূতি পাইতেছি না। শিক্ষা ও দীক্ষা (Culture) মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ—ইহার বিস্তার না হইলে এইরূপ জাতীয় আন্দোলনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে লোকে কৃতী ও বিত্তশালী হইলে তাহাদের আয়ের একটি অংশ দেশের ও দশের কাজে নিয়োজিত করেন। এই প্রকার দান করা এখন সর্ব্বসাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতি কাগজে Wills & Bequests নামে একটি স্তম্ভ থাকে, তাহাতে এই প্রকার মৃত্যুকালীন দান উল্লিখিত হয়। যদি কোন অর্থবান মৃত্যুকালে বা জীবদ্দশায় তাঁহার অর্থের কিয়দংশ দেশের কাজের জন্য না দান করিয়া যান তাহা হইলে জনসাধারণে তাহাকে হেয় জ্ঞান করে। কাজেই সামাজিক কল্যাণকর অনুষ্ঠান বিলাতে সাধিত করিবার জন্য কখনো অর্থাভাব হয় না। Guy's Hospital প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, সমাজসেবা, দেশসেবা প্রভৃতির নানা আয়োজন এই প্রকার লব্ধ অর্থের দ্বারা চালিত। দেশে সমস্ত স্তরের লোকের মধ্যে এক অঙ্গাঙ্গীভূত যোগই এইপ্রকার দানশীলতাকে অনুপ্রেরিত করে। আর এদেশে? আমাদের মাত্র শতকরা ৬।৭ জন শিক্ষিত অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট। কোন প্রকারে নাম দস্তখত করিতে পারিলেই আদম সুমারীর হিসাবে শিক্ষিত বলিয়া ধরা হয়। ভারতবাসী অশিক্ষায় ও কুসংস্কারে মগ্ন। দেশ ম্যালেরিয়া, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ দুর্ভাগ্যে পীড়িত। তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই চাকুরীজীবী। জমিদারবর্গ প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া সহরে বাস এবং অর্থের অপব্যয় করেন। দান করিবার মতো অর্থ তাঁহাদের কাছেই নাই, অনুন্নত শ্রেণীর নিকট হইতে দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। জাতিভেদের প্রায়শ্চিত্তই এইখানে। আর শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ আমাদের, Shakespeare Milton মুখস্থ করা Culture (কর্ষণ) মাড়োয়ারীর আড়তে বা সদাগরী আফিসে কেবল কলমপেশাতেই পর্য্যবসিত হয়। দান করিবার মতো অর্থ আমাদের কোথায়? পূর্ব্ববঙ্গে অনেক সাহা ও তিলি-জাতীয় ধনী ব্যবসায়ীর বাস। আমাদের চিরকাল তাহাদের একদিকে কোণঠাসা করিয়া রাখিবার ফল এই হইয়াছে যে, তাহাদের আমাদের কোন চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে আমাদেরই কয়জন Research Scholar অর্থাৎ গবেষণারত ছাত্র কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইঁহারা নগ্নপদে ২০।২৫ মাইল পর্য্যটন করিয়াও ধনীব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ৫৲ টাকাও সাহায্য পান না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত ধনী ব্যক্তিরই নিকট যদি কোন বাবাজীর শুভাগমন হয়, তখন সেই ব্যক্তি প্রভুর আদেশে গললগ্নীকৃতবাসে "একসের গাঁজা মাখাইতে ও হাজার লোক খিলাইতে" কোন প্রকার দ্বিধা করে না।

দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতিতে মাড়োয়ারীদের নিকট হইতে তবুও কিছু সহানুভূতি পাওয়া যায়।

কেননা জীবে দয়া তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপৎপাত ভিন্ন যখন দেশের Constructive (গঠনশীল) কোন কাজ করিবার দরকার হয় তখন আর কোন উৎসাহ আসে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাগপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান উপলক্ষে গমন করিয়া স্যর বিপিনকৃষ্ণের নিকট শুনিয়াছিলাম তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া কোন ফললাভ করা যায় নাই। অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই- অনতিদূরে এক ধনী মাড়োয়ারী এক মর্ম্মরনির্ম্মিত পান্থশালা বা ধর্ম্মশালার স্থাপনা করিতেছেন। ব্যয় অন্যূন ৮।১০ লক্ষ হইবে! পূর্ব্বে যখন রেল পথের সৃষ্টি হয় নাই তখন না হয় এই প্রকার পান্থনিবাসের সার্থকতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহার সেরূপ প্রয়োজনীয়তা কোথায়? পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ তিলিজাতীয় ধনীর গৃহে অর্থ সংগ্রহে গমন করিয়াছিলেন। অনেক কথা ও সময় ব্যয়ের পর সেই কোটীপতি দেশসেবায় ১০৲ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন! ইহা কি আমাদেরই পাপের ফলে নহে? জাতিকে নানা দিক দিয়া উঠিতে হইবে। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন দিকেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না।

জাতিভেদের লৌহশৃঙ্খল আমাদিগকে পাষাণ-মন্দিরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বাল্যকালে দেখিয়াছি যেখানে এখন কৃষ্ণদাস পালের মূর্তি সেইখানে পাদোদক-পিয়াসিগণ ভিড় করিতেন। এই শতকরা ৯৫ জনকে পায়ের নীচে রাখিয়া ব্রাহ্মণই আজ অধঃপতিত হইয়াছেন। নিজেদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য অন্যের বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা নষ্ট করিয়া যে দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহারই ফল আজ সমস্ত দেশকে ভোগ করিতে হইতেছে।

আজ বাঙালীর অর্থ মাড়োয়ারী লইতেছে। যদিচ এই মাড়োয়ারীগণ ৩।৪ পুরুষ এদেশে বাস করিতেছে তথাপি তাঁহারা মাড়োয়ারীই রহিয়া যাইতেছে। আমাদের সমাজের সঙ্গে মিশ্রিত হইবার কোন উপায় নাই। কাজেই বাঙলাদেশের কোন লাভ হইতেছে না। ইংলণ্ডে বিদেশের লোক আসিয়া ইতিহাসের নানা সময়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। দু'এক পুরুষ পরে এই সমস্ত বিদেশীই ইংরাজ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা বিক্রমপুর যাইয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন; ব্রাহ্মণেরা কুলীন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইলেন, কিন্তু কায়স্থেরা হইলেন বঙ্গজ। তাঁহাদের সঙ্গে রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদান-প্রদান বন্ধ হইল। আর ওদিকে ইটালী হইতে নির্য্যাতিত হইয়া ফ্রান্স হইতে নিপীড়িত Huguenotগণ ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। Lombard Streetএ বিখ্যাত Bank-গুলি এইরূপ ঔপনিবেশিক বিদেশিগণ দ্বারাই স্থাপিত হইল। পশমের (Wool) কাজে পারদর্শী কারিগরগণ আসিয়া ইংলণ্ডে উলের ব্যবসার সূত্রপাত করিলেন। বিভিন্ন দেশের লোকদিগকে আশ্রয় দিয়া ও নিজের অঙ্গে টানিয়া লইয়া ইংরাজ আজ এত বড় সমৃদ্ধিশালী জাতি। তাহার নানা ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইয়াছে এইরূপ ভিন্নদেশীয়দের দ্বারা। আজ সমগ্র ইংলণ্ডবাসী এক বিরাট পরিবার। নানাদেশের লোকের নানাগুণ ইংরাজ চরিত্রে তাই স্থানলাভ করিতে পারিয়াছে।

আমাদের দেশে যে সকল উত্তমা অ-বাঙ্গালী আসিতেছেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করিয়াও অ-বাঙ্গালীই রহিয়া যাইতেছেন। সুতরাং আমাদের racial type কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত বা উন্নত হইতেছে না।

আমাদের ভরসাস্থল ২৯ লক্ষ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য বলিতে সকলেই শিক্ষিত এরূপ বোঝা উচিত নহে। ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কত রকম আছে। কেহ ভিখারী, কেহ পূজারি, কেহ রাঁধুনি গলদেশে উপবীত ও হস্তে একটি শিতলা বা ঐরূপ কিছু থাকিলেই যখন উদরান্নের সংস্থান হয়, তখন অনেক যে গণ্ডমূর্খ জুটিবে তাহার আর বিচিত্র কি! প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বের একটি উদ্ভট শ্লোক হইতে বোঝা যাইবে এ অবস্থা যে শুধু আজ হইয়াছে তাহা নয়। পুরোহিত বাক্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে পুরীষস্য—'পু', রোষস্য—'রো', হিংসয়োঃ—'হি', তস্করস্য—'ত'।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "জাতিভেদই শ্রদ্ধানন্দের হত্যার জন্য মুখ্য ও গৌণভাবে দায়ী" —কোন কোন সংবাদপত্রে এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। যাহারা একটু চিন্তা করিবেন, দেখিবেন ইহা কতদূর সত্য। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের রক্তে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্যক্‌রূপে কি হইবে?

জাতিবিভাগ অনুসারে মানুষের গুণ ও কর্ম্মবিভাগ করা যায় না। কারণ গুণ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না তাহা হইলে "গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ"—এ উক্তির সার্থকতা কোথায়? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই। Defoe কসাইপুত্র ছিলেন। Bunyan স্বয়ং পিতল-কাঁসার ঝালাই করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। William Carey এদেশে সেকালের একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি এদেশে আসেন "মিশনারী" হইয়া। বিদেশী ও বিজাতি হইয়া তিনি হইলেন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অগ্রদূত। বাল্যকালে তিনি পাদুকা-মেরামতের কার্য্য করিতেন। একবার Fort William Collegeএ dinnerএ তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কেহ Lord Wellesleyর কানে কানে বলেন "Carey! was he not a shoe-maker?" Carey ইহা শুনিতে পাইয়া বলেন "Sir, you do injustice to me, I was not a shoe-maker ,but a cobbler" অর্থাৎ আমি "জুতি-সেলাই" ছিলাম।

Duke, Robert of Normandy একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া এক স্রোতস্বতীর তীরে চাষার কন্যা Priscillaকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহারই গর্ভে William the Conquerorএর জন্ম হয়। জগদ্বরেণ্য রাসায়নিক জীবাণু-বিদ্যার জন্মদাতা Pasteur ছিলেন চর্ম্মকারের পুত্র। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক Carlyle ("Master of terse vigorous style) রাজমিস্ত্রি-পুত্র ছিলেন। ইঁহার পিতা শেষ জীবনে কৃষিকার্য্য করিতেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Michael Faraday, ইঁহার সম্বন্ধে বলা হয় "Faraday is electricity and electricity is Faraday"—Dynamo, বর্ত্তমান সভ্যতার একটি স্তম্ভ বিশেষ, ইঁহারই আবিষ্কার। ইঁহার পিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবসায়ে কর্ম্মকার ছিলেন। Napoleonএর সহিত যুদ্ধের

সময় লণ্ডনে খুব অন্নকষ্ট হয়, কারণ, বাহির হইতে কোন খাদ্যের আমদানী হইতে পারিত না। উপরন্তু তাঁহার পিতা বড় দরিদ্র ছিলেন। সপ্তাহে ভিক্ষাস্বরূপ (dole) একখণ্ড রুটি ও জল ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই আহারের জুটিত না। বাল্যকালে তাঁহাকে এক দপ্তরীর দোকানে কর্ম্ম করিতে হয়।

Smiles এর "Lives of British Engineers" গ্রন্থে দেখা যায় Metcalf, Telford, প্রভৃতি England এর প্রসিদ্ধ Engineerগণ অনেকেই দরিদ্রের সন্তান। তাঁহারা, আরো আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রায় সকলেই পল্লীবাসী,—অথচ অধ্যবসায়বলে উত্তরকালে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা সে দেশে সম্ভব, কেননা সমাজ ব্যক্তিত্বের উপর পাষাণ চাপাইয়া মনের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশকে পঙ্গু করেনা। আমাদের দেশের ন্যায় সেখানে শূদ্রের বেদ উচ্চারণে "জিহ্বাচ্ছেদন" বা শ্রবণে তপ্ত তৈল কর্ণবিবরে প্রদান করিবার কোন বিধি নাই।

আমরা স্বেচ্ছানির্ম্মিত নিগড়ে নিজেরাই আবদ্ধ হইয়াছি। হিন্দু সমাজ এক বিশাল সাগর বিশেষ;—ইহার প্রত্যেকটি জাতি এক একটি দ্বীপ, একের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর আন্তরিকতার একান্ত অভাব। ব্রাহ্মণই শুধু দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে অধিকারী, কায়স্থ প্রাঙ্গণ হইতে দর্শন করিবে, শূদ্র ও অস্পৃশ্যকে মন্দিরের শতহস্ত দূর হইতেই দেবতার কৃপা লাভ করিতে হইবে! অথচ আমরাই বলি সর্ব্বভূতেষু নারায়ণঃ! উচ্চশিক্ষিত যাঁহারা, তাঁহারাও কি এ সমস্ত বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না? মানুষ মানুষে এই প্রকার ভেদের প্রাচীর তুলিলে আন্তরিকতা কোথা হইতে আসিবে?

বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্যা অতি দারুণ। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কেবলই দেশের চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সমস্যা দেখিতে পাইব। সুনিবিড়ভাবে দেশাত্মবোধ কিছুতেই জাগ্রত হইতে পারিবে না।

জাতিভেদের পাপের ফলে হিন্দু আজ মরণোন্মুখ। বাংলায় সমস্যা উঠিয়াছে—হিন্দু বাঁচিবে না মরিবে? একটি জাতি কতদূর অধঃপতিত হইলে তাহার মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন উঠে? হিন্দু সমাজের ললাটে যে মৃত্যুর কাল ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে ইহা তো আমাদের বহুযুগসঞ্চিত পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল। মানবের আত্মাকে অপমান করিয়া আজ ভারত অপমানিত। তাই

"হে ভারত—যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাদের সমান।"

আমরা আজ সমাজের এই বৃহৎ অংশকে অস্পৃশ্য করিয়া নিজেরাই জগতের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া বিরাট মানব-সমাজের দরবারে উন্নতমস্তকে আমাদের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বার্টরাণ্ড রাসেল মহোদয় 'বাৎসরিক হিন্দু পত্রিকার' নূতন সংখ্যায় এশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। সে গুলিকে এশিয়ার সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণীও বলা চলে। তাঁহার চমৎকার লেখাটির চুম্বক দেওয়া কঠিন; তবু স্থানাভাববশতঃ সমস্তটি দিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষ বিষয়ক-স্থানগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

"এশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও মানসিক (cultural) উন্নতি-অবনতি—এই তিন বিষয় লইয়া করা যাইতে পারে।

"অর্থ নৈতিক—ভারতবর্ষ বাণিজ্য-শিল্পে ইতিমধ্যেই বিশেষ উন্নতি করিয়াছে, এবং যত দূর মনে হয় একমাত্র অন্তর্বিপ্লব ঘটিলেই এই উন্নতির পথ বন্ধ হইবে।" যদি স্বাধীনতা অধিকার করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ ও জাতি নিজেদের ভিতর মারামারি কাটাকাটি সুরু করে, তাহা হইলে অর্থ নৈতিক বিষয়ে ভারতবর্ষ আবার প্রাচীনপন্থী হইয়া পড়িবে। তবে এই অবস্থাও বেশীদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ যদি একটি সুনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে কোনো বিদেশী শক্তি অবিলম্বে ভারতবর্ষ দখল করিয়া স্বশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে। আজকাল জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে বাণিজ্যশিল্পের অবহেলা করিলে চলিবে না। কারণ বিদেশে উন্নত বাণিজ্য-শিল্পের প্রভাবে সামরিক প্রতিরোধ সম্ভবপর নহে, এবং জাতীয় স্বাধীনতা যেখানে নাই সেখানে বিদেশীরাই নূতন অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রবর্তন করিবে। সুতরাং আমরা চাই আর না চাই এই সকল আধুনিক অর্থনৈতিক বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কাহারো নাই।

"রাষ্ট্র নৈতিক—অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শ্বেতকায় জাতিদের যে প্রভুত্ব এশিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা চিরকাল থাকিবার নহে। ইহা যে ইতিমধ্যেই শেষ হইতে বসিয়াছে তাহার প্রচুর লক্ষণ দেখা দিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধই সর্ব্ব প্রথম এই যুক্তির সূচনা আনিয়াছে বটে কিন্তু গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে ইহা প্রকট হইয়াছে; ভবিষ্যতে যত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিবে এশিয়া ততই স্বাধীন হইতে থাকিবে।

"ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিদিন সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিতেছে এবং গ্রেটব্রিটেন যদি পুনরায়, বড়রকমের একটা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসান হইতে পারে।……………………… আমি সম্পূর্ণ আশা করি যে এশিয়ার অধিকাংশ দেশই ইয়োরোপীয়দের প্রভুত্ব হইতে স্বাধীন হইবে এবং আজ যাহারা যুবক তাহারাই এই স্বাধীনতা চোখে দেখিয়া যাইবে।

"মানসিক উৎকর্ষের দিক দিয়া ভারতবর্ষ ও চীন জাপানের মতই ক্রমশঃ সকল ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানের যথা শক্তি, যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান ও প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব ক্ষমতার লোভে নিউটন ও গ্যালিলিও প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে।"

যুদ্ধ বনাম রোগ

পণ্ডিতেরা বলেন যে মানুষের সংখ্যা যখন অত্যধিক রকম বাড়িয়া যায় তখনই ভূভার লাঘবের জন্য ভগবান যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটাইয়া থাকেন। কিন্তু আসলে, বৃহত্তম যুদ্ধক্ষেত্রে যে পরিমাণ প্রাণ নষ্ট হয়, রোগশয্যায় মৃত

লোকের তুলনায় তাহা যৎসামান্য। রেডক্রস সোসাইটি হইতে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে বিগত ১৯১৪ সাল (যে বৎসর ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়) হইতে এতাবৎকাল যতলোক যুদ্ধে মরিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী রোগে প্রাণ হারাইয়াছে। অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ লোকের প্রাণ গত মহাযুদ্ধে নষ্ট হয় কিন্তু সংক্রামক রোগে মারা যায় ৪ কোটি, দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ, ভূমিকম্পে ২০ লক্ষ। রোগে ও দুর্ভিক্ষে যত লোক প্রাণ হারায় তাহার অনেক গুলিই এই দুর্ভাগা ভারতবর্ষের লোক।

যীশুখৃষ্ট কি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন?

নিউইয়র্কের একটি কাগজে মন্তব্য করা হইয়াছে যে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক রোয়েরিচ মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কার-অভিযানকালে তিব্বতের একটি বুদ্ধমঠে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অনুশীলনার্থ যীশুখৃষ্টের ভারতবর্ষে আগমনের বর্ণনা সম্বলিত অনেক পাণ্ডুলিপি পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যীশুখৃষ্ট ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া উনত্রিশ বৎসর বয়সে জেরুসালেমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। খৃষ্টধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল ইহা আজকাল অনেক পণ্ডিতেই বিশ্বাস করেন। অধ্যাপক রোয়েরিচ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি হইতে সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্ত নিঃশেষে প্রমাণিত হইবে।

ম্যালেরিয়া কি দূর হইবে?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ম্যালেরিয়ার মত মানুষের আর শত্রু নাই। এবং এই ম্যালেরিয়াই পৃথিবীর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত করিয়াছে এবং আমরা যদি ইতিমধ্যেই অবহিত না হই তাহা হইলে অচির ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস পুরাতত্ত্বের বিষয় হইয়া উঠিবে। এই ভীষণ রোগ শুধু রোগীকে একটু কষ্ট দিয়াই ছাড়ে না, সাবধান না হইলে ইহাতে মৃত্যু অনিবার্য্য। একা ভারতবর্ষেই প্রতিবৎসরে দশ লক্ষের অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় নষ্ট হয়। আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার অবস্থাও সাংঘাতিক।

স্যার রোনাল্ড্ রস ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধে বহুকাল প্রবৃত্ত আছেন, ইনি ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "এক অতি সূক্ষ্ম জীবাণু রক্তের মধ্যে বাস করিয়া এই অসুখ ঘটায়। ১৮৮০ সালে ডাক্তার এ, লাভেরান প্রথম এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সৌভাগ্যের বিষয় কুইনিন এই জীবাণুর বিশেষ শত্রু এবং কুইনিন প্রয়োগে এই জীবাণুগুলি অতিসহজে বিনষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের রোগীরা এই রোগটি সমূলে বিনষ্ট হইতে যত সময় লাগা উচিত ততদিন রীতিমত কুইনিন সেবন করেন না বলিয়া পুনরায় আক্রান্ত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইয়া পড়েন; অধিকন্তু স্থানীয় মশারা স্বচ্ছন্দে রোগীর দেহ হইতে এই জীবাণু সুস্থদেহে চালান করে। এই কথাগুলি বক্তৃতায় সাময়িক পত্রিকায় ও অন্যান্যভাবে এতবার বলা হইয়াছে যে পুনরায় ইহা বলা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে হইতে পারে। লোকে সত্যকে জানিয়াও যখন তাহাকে অবহেলা করে তখন এক কথার বারবার উল্লেখ করা ছাড়া অন্য কি গতি আছে?

"মশারা যে রোগীর দেহ হইতে সুস্থদেহে এই রোগ সংক্রামিত করে ইহা ১৮৯৮ সালে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়া গেছে এবং আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনো উপায়ে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয় বলিয়া জানা যায় নাই। কারণ যখন নির্দ্ধারিত হইয়াছে তখন ইহার প্রতীকারও কল্পিত হইয়াছে। রবার্ট রস্ প্রচার করেন যে কোনো একটা স্থানে

যত ম্যালেরিয়া রোগী দৃষ্ট হইবে তাহাদের সকলকেই নির্দ্দিষ্ট কাল কুইনিন প্রয়োগে সুস্থ করিয়া তোলা হউক; তাহা হইলেই মশারা আর ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়াইতে পারিবে না। তারের বেড়া দিয়া বাড়ী ঘেরিয়া রাখার কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। আমার মতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার একমাত্র উপায় মশক বংশের ধ্বংস সাধন করা; আমি এই কথা সর্ব্বত্রই প্রচার করিয়াছি এবং আজিও প্রচার করিতে ছাড়িনা। মশক ধ্বংস করিবার অনেক উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ ডোবা, পুকুর, কূপ ইত্যাদি জলাভূমিতে ডিম পাড়ে এবং এই ডিম্বাবস্থায় ইহাদিগকে নষ্ট করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। মশা নষ্ট করিতে যদি প্রচুর অর্থব্যয়ও করিতে হয় তাহাও করা উচিত। কারণ, একবার এই সাংঘাতিক শত্রুকে বিনষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে মানুষ অনেক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।”

গতবারের বঙ্গবাণীর এই বিভাগে আমরা মশা নষ্ট করিবার কয়েকটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি।

নেপালে দাসত্ব প্রথা রদ সম্বন্ধে আমেরিকান মতামত

নেপালের সুযোগ্য মন্ত্রী-সম্রাট মহারাজা চন্দ্রশমসের জঙ্গ কিছুদিন পূর্ব্বে নেপালের বহুকাল প্রচলিত দাসত্ব প্রথা রদ করিয়া দিয়াছেন। যেখানে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ লোক ক্রীতদাসরূপে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিত সেখানে আজ একটিও ক্রীতদাস নাই। মহারাজ চন্দ্র শমসের জঙ্গ হয়ত আপনার হৃদয়ের মহান্ উদারতা বশতঃই এতবড় একটা সৎকার্য্য করিয়াছেন কিন্তু পাশ্চাত্য দেশবাসীরা এই মহৎ কার্য্যকে নিজেদের কৃতিত্ব কল্পনা করিয়া উল্লম্ফন করিতেছে। ইতিপূর্ব্বেই এই বিষয়ে সাময়িক পত্রাদিতে অল্পবিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। লীগ্ অব নেশন্স এই সৎকার্য্যের জন্য প্রশংসা চাহিতেছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাতে গৌরব অনুভব করিতেছেন। সম্প্রতি সমগ্র খ্রীষ্টজগৎ এই কার্য্য খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে হইয়াছে স্থির করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা যাহাতে আরও প্রচারিত হয় তৎসম্বন্ধে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাল্টিমোর হইতে প্রকাশিত ‘আমেরিকান’ নামক একটি পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে—

“এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল এবং আরও বহুকাল হয়ত চলিত কিন্তু শুভক্ষণে এক নূতন আলোক—খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক—মহারাজা সার চন্দ্রশমসের চিত্তে প্রবেশলাভ করিল। তিনি নব্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন ও তৎপরে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে বাহির হন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের আওতায় পড়িয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রচারকগণের সহিত যতই আলোচনা হইতে থাকে, ততই তাঁহার হৃদয়ে এই দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তিনি রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হন।”

উপরোক্ত পত্রিকার মতে এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে মহারাজকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই টাকা ক্রীতদাসদের প্রভুদের দিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা ক্রয় করা হয়। এবিষয়ে নাকি মিস মেরী স্কট নামক একজন খৃষ্টীয় মহিলা প্রচারক মহারাজকে উৎসাহিত করেন।

নেপালে দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ সম্বন্ধে আমরা এপর্য্যন্ত অনেক প্রকারের সত্যমিথ্যা সংবাদ শুনিলাম। আসলে কি করিয়া ইহা ঘটিল তাহা জানিবার জন্য আমাদের ঔৎসুক্য আছে। নেপাল সরকারের তরফ হইতে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইলে ভাল হয়।

ভারতবর্ষে সংবাদ সরবরাহ

গত জানুয়ারী মাসের 'এশিয়াটিক রিভিউ' পত্রিকায় স্যার জিওফ্রে ক্লার্কের ভারতবর্ষের ডাকবিভাগ ও টেলিগ্রাফ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই ডাক-সরবরাহের ইতিহাস সম্পূর্ণ এক। কোনদেশে কোন একটি রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই রাষ্ট্র-পরিচালকেরা সর্ব্বপ্রথমে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে সহজে সংবাদ প্রেরণ ও সরকারী ইস্তাহারাদি জারী করিবার সহজ পন্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইতেন। এইভাবে সর্ব্বত্রই ডাকবিভাগ গড়িয়া উঠে এবং সরকারের সুবিধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইলেও ক্রমশঃ ইহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

"ভারতবর্ষেও এইভাবে ডাকবিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আবু বাটুতা নামক আরব পর্য্যটকের লিখিত বিবরণে লিখিত আছে মহম্মদ তোগলকের সময়ে ভারতবর্ষে যে উপায়ে ডাক সরবরাহ হইত তাহা রোমান সাম্রাজ্যের ডাকবিভাগের সম্পূর্ণ অনুরূপ। কর্ণেল উইল্‌স্ তাঁহার দক্ষিণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্যে ডাক সরবরাহ কার্য্য যথোচিত শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইত এবং ইহার সাহায্যেই হাইদার আলী মহীশূরে একচ্ছত্র অধিকার রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মোগলসম্রাটদের ডাকব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে শেরশাহের সমাপ্ত ৫ বৎসরের রাজত্বের মধ্যেই (১৫৪১-১৫৪৫) ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর বড় বড় রাজপথের ১০ মাইল ব্যবধানে ডাকঘর স্থাপন করিয়াছিলেন ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে অশ্বারোহী কর্ম্মচারীরা ডাক বহন করিত। ইংরাজেরা প্রথমটা ইহা হইতে নূতন কিছু করিতে পারেন নাই। ১০০ মাইলের অধিক দূরে চিঠি পাঠাইতে হইলে তাঁহাদিগকেও বেগ পাইতে হইত। ১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইভ ডাক সরবরাহ সুশৃঙ্খলিত ও নিরাপদ করিবার চেষ্টা করেন ও যে যে রাজ্যের মধ্য দিয়া ডাক বাহকেরা যাতায়াত করিতে সেই সেই রাজ্যের রাজাদের ডাকবাহকের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বাঙ্গালাদেশে ডাকের সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার সময়েই একজন পোষ্টমাষ্টার জেনেরাল নিযুক্ত হন ও বেসরকারী চিঠির জন্য পয়সা লওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ১৮২১ সালে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ও ডাকবিভাগের উন্নতি করিবার চেষ্টা হয়। ১৮৩৭ সালে এবিষয়ে আইন করা হয়। পূর্ব্বে স্থানের দূরত্ব অনুযায়ী মূল্য দিতে হইত। কলিকাতা হইতে আগ্রায় চিঠি পাঠাইতে হইলে খরচ লাগিত ৮০ কিম্বা বোম্বে পর্য্যন্ত পাঠাইতে হইলে এক টাকা খরচ লাগিত। প্রত্যেক পোষ্টাফিসেই তখন দূরত্বের হিসাবে মূল্য নির্দ্ধারণের লম্বা লম্বা তালিকা থাকিত। কিন্তু এই ১৮৩৭ সালের আইনের জন্য অনেক স্থানে গোলমালের সৃষ্টি হয়, কারণ ইহাতে বেসরকারী ডাকবিভাগগুলি উঠিয়া যায় অথচ সরকার সর্ব্বত্র ডাকসরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে অক্ষম হয়। ইহার প্রতীকারের জন্য প্রত্যেক জিলায় আলাদা আলাদা ডাক বসান হয় ও স্থানীয় জমিদারকে এইজন্য কর দিতে বাধ্য করা হয়। পরে সর্ব্বত্র সরকারী ডাকবিভাগ প্রসার লাভ করিলে এইসকল অর্দ্ধসরকারী ডাকঘর একে একে নষ্ট হয় ও ১৯০৪ সালে একেবারেই এই প্রথার উচ্ছেদ হয়। ভারতবর্ষে ডাকসরবরাহের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় ১৮৫৪ সালে। এই সময়ে সস্তা ডাক-টিকিটের প্রচলন সুরু হয়। ইহাও স্থির হয় যে দূরত্ব অনুযায়ী টিকিটের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। অনেকে তখন এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। সে সময়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিটি স্থাপিত হয় তাহার রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে 'এই সহজ সুবিধাটুকু সাধারণকে প্রদত্ত হইলে এই ডাক বিভাগই অচিরাৎ সর্ব্বত্রই জ্ঞান-প্রসার, ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও এদেশের লোকের

সামাজিক ও মানসিক বিবিধ উন্নতি সাধন করিবে। অন্য কোন উপায়েই এত সহজে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নহে।' ভারতবর্ষের ডাকবিভাগ ক্রমশঃ উন্নততর হইতেছে। আজ কাল ডাকসরবরাহের জন্য ৩৭৫০০ মাইল রেলওয়ে, ১০ হাজার মাইল গোযান ও অশ্বযান পথ ও ৪০০০ মাইল মোটরপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীতও প্রায় ৯০ হাজার মাইল স্থানে কেবল মাত্র ডাকহরকরা কর্ত্তৃক ডাকের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সকল বিশ্বাসী নিরীহ লোকেরাই ভারতবর্ষের ডাকবিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকে।

"কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার—এই ত্রিশ মাইল ব্যাপিয়া সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ ও' শনেসী সর্ব্বপ্রথম এইজন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই প্রচেষ্টার সফলতা লক্ষ্য করিয়া লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র টেলিগ্রাফ বসাইবার জন্য চেষ্টিত হন। বস্তুত ১৮৫৭ সালের পূর্ব্বে বহুস্থলে টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া সিপাহি-বিদ্রোহ অত সহজে দমন করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৮৮৩সালে ডাকঘরের সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ যোগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব হয়। ১৮২৫ সালে ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত ৩৫৫৫ টি ডাকঘরে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হইয়াছে।"

ভারতে ইংরেজী শিক্ষা

স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল লিখিয়াছেন—

"ভারতে উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী হইবে কি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষা হইবে ইহা লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ইংরেজীর দিকে যে সকল বিদেশীয় মত দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একজন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ মেকলে ও অন্যজন ধর্ম্মপ্রচারক ডাফ্। ইঁহাদের দুইজন যদি পুনরায় ভারতে আসিয়া ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করিবার সুবিধা পান তাহা হইলে কে অধিকতর হতবুদ্ধি হইবেন জানিতে ইচ্ছা হয়। আমার মনে হয়, মেকলেই দুঃখিত হইবেন বেশী। কারণ, তিনিই তখন প্রাচ্য সাহিত্য ও বহু শতাব্দীব্যাপী ভারতবর্ষের গভীর সামাজিক ও ধর্ম্মবিবর্ত্তন সম্বন্ধে অন্ধ গর্ব্ববশতঃ সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই (তখনকার দিনের পক্ষেও এ দোষ সামান্য নয়!)—পাশ্চাত্য সভ্যতার ও জ্ঞানের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করিতে দ্বিধা করেন নাই এবং এমনও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয়েরা পাশ্চাত্য ভাব ও সভ্যতার মোহে এমন ভাবে আত্মবিস্মৃত হইবে যে দুই পুরুষ গত হইতে না হইতেই একজন শিক্ষিত ভারতবাসীর সহিত একজন ইংরেজের পার্থক্য কেবলমাত্র রঙের দ্বারাই নির্দ্দেশিত হইবে। আজ তিনি উপস্থিত থাকিলে দেখিতেন যে, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ ভারতবাসী পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেনই না, বরঞ্চ পাশ্চাত্য সব কিছুর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহভাব পোষণ করিয়া অতীত ভারতীয় সভ্যতাকে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বহু ঊর্দ্ধে আসন দান করেন। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহাদের মধ্যে বহু মনস্বী ব্যক্তিও আছেন। পক্ষান্তরে আলেক্‌জাণ্ডার ডাফ্ মানসিক উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মাত্র ভারতবাসীকে ধর্ম্মের পথে উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং কল্পনা করিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষে নিঃসন্দেহে খৃষ্টরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি আজ ভারতবর্ষে থাকিলে ইহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেন যে উচ্চ-শিক্ষিতেরাই এখন খৃষ্টের পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।"

ভারতবর্ষে ইংরেজীশিক্ষার এই অদ্ভুত ফল দেখিয়া স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল অবাক হইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশের সহিত মনে মনে ভারতবর্ষের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আসলে কে-

দেশে খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টভাব ও ইয়োরোপীয় ভাষা অতি সহজেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সেই সব দেশের নিজস্ব ধর্ম্মরাষ্ট্র অথবা সভ্যতা ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা অজ্ঞান তিমির বিনষ্ট হইতেই ভারতবর্ষ আপনার স্বরূপ চিনিতে পারিয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মেকী মা

(১)

বিপিনের বিয়ে হ'ল খুব ধুমধাম করে ম্যাট্রিক পাশ করবার পরেই। খুব সুন্দরী বউ। সবাই একবাক্যে বল্লে 'হাঁ, সুন্দরী বটে'!

কলেজে ভর্ত্তি হ'ল না,—বেশী পড়াশুনা করে লাভ কি এই বলে। বাড়ীর বাইরে আর তাকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না। পাড়ায় সকালবেলায় বোসেদের বাড়ীর সিঁড়ির ধাপে বসে খবরের কাগজ পড়ার আড্ডা, সন্ধ্যাবেলার তাসের আড্ডা,—সব বন্ধ করে দিলে। বায়স্কোপের খুব নেশা ছিল,—সেটা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে! সকলে বলাবলি করলে, 'বিপিনটার হল কি? বিয়ে ত রাজ্যের লোকের হচ্ছে, সুন্দরী বউও অনেকের হয়। কিন্তু এমনটা আর কে দেখেছে? এক নম্বর স্ত্রৈণ।' বিপিনকে কখনও রাস্তায় দেখতে পেলে ঠাট্টা তামাসা করতে ছাড়ত না। —'বিপিন এমন সময়ে বাড়ীর বাইরে? প্রিয়া একলা আছেন হয় ত? যাও শীগ্গির বাড়ী ফিরে যাও—, কি দিন কাল পড়েছে জান ত? সেদিন রংপুরে একটা বউ চুরির মামলা হয়ে গেল। এখনও জের মেটে নি।' সবাই হো হো করে হাসত। বিপিন কোনও জবাব না দিয়ে চলে যেত।

(২)

বিয়ের বোধ হয় বছর দুই পরে হবে একদিন সকালে বিপিন কোথায় চলেছে,—মুখ শুখ্‌নো, উস্কোখুস্কো চুল, শুধু পা। পাড়ার ছেলেরা রুটীনমত বোসেদের বাড়ীর সিঁড়ির উপর আড্ডা জমিয়েছিল। বিপিনকে দেখে একজন উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'বিপিন ব্যাপার কি বল ত? কি হয়েছে কি?' বিপিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, 'ভাই, আমার স্ত্রীর ছেলে হবে। আজ ভোর রাত্রি থেকে ব্যথা ধ'রেছে। একটা ধাত্রী অনেকক্ষণ এনেছি—কিন্তু সাহস হচ্ছে না—এই পাড়ার ঐ লেডি ডাক্তারকে ডাক্‌তে যাচ্ছি।' খানিক চুপ্ করে রইল তারপর আবার বল্লে,—এবারে স্বরটা তার অন্য রকমের—'ভাবনায় পাগলের মত হয়ে আছি। বউ না বাঁচলে আমি একদিনও বাঁচব না।'

তা'র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কথা বলবার ভঙ্গী দেখে সবাই পরস্পরকে টেপাটিপি কর্‌ছিল। ও-দলের ত কারও বিয়ে হয় নাই, বউএর মর্ম্ম বুঝবে কি? রমেনটা বড্ড ঠোঁট-কাটা। সে আর চুপ করে থাক্‌তে পারলে না,—বিদ্রূপ-মাখানো সুরে সে বল্‌লে "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! বউ না-বাঁচার মত এমন কি হ'য়েছে? সব মেয়েরই ত ছেলে হবার আগে ব্যথা হয়। ব্যস্ত হবার এতে কি আছে? আর এ বেলেই বা যাচ্ছ কেন?" বিপিন কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

বিপিন চলে যাওয়ার পর সবাই রমেনকে বক্‌তে লাগ্‌ল।—"তোর সব তাতে পাকামি। এতগুলো এখানে রয়েছি, কেউ কিছু বল্লে না—তোরই বা এত কথা বলবার দরকার কি?" অপ্রস্তুত হবার ছেলে রমেন নয়। সে জবাব দিলে, "এই যে তোরা ভাল মানুষের মত শুনে গেলি বিপিনের ঢংএর কথাগুলো,—'বউ মরে গেলে একদিনও বাঁচব না'—কেমন সত্যি কথা তোরা দেখিস্! ওর বউ মরে যাক্ একথা বল্‌তে চাই না, তবে বউ যদি কখনও মরে ত আমি গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি যে তিন মাস যেতে হবে না, ঠিক বিয়ে করে বস্‌বে।" সবাই সমস্বরে "থাম্ থাম্" বলে থামিয়ে দিলে।

(৩)

তারপর আরও তিন বছর পরের কথা। বিপিনের সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা হয় না। কবে কলকাতায় থাকে, কবে থাকে না—তারও ঠিক নাই। আজ মধুপুর, কাল গিরিডি, পরশু হাজারিবাগ—এখান ওখান বউকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাপ পয়সা রেখে গিয়েছেন ছেলে খরচ করবে বলেই ত? পাড়ার কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে "হাহে বিপিনের খবর কি?" যাকে জিজ্ঞাসা করে, সে জবাব দেয়, "আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর জানব কি করে, বল?"

জ্যৈষ্ঠ মাসের তারিখটা মনে নাই,—একটা ছুটীর দিন। কাজকর্ম্ম নাই, ঘরের ভিতর আড্ডা জমেছে সন্ধ্যা হ'ব হ'ব এমনি সময়ে। বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। মোহনবাগানের শিল্ড নেওয়ার 'চান্স' নিয়ে খুব তর্ক চল্‌ছে,—এমন সময় আওয়াজ এল "বল হরি, হরিবোল।" জানালায় উঠে এল সবাই। লালপেড়ে শাড়ী-পরা, মাথায় রাজ্যের সিঁদুর ঢালা, পায়ে আলতা-পরা, ফুলে-ঢাকা বিপিনের বউকে নিয়ে চলেচে! সেই বিয়ের রাত্রে দেখা অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি বেরিয়ে আছে—সে লাবণ্য আর তাতে নাই। বিপিন পিছনে পিছনে চলেছে, পাগলের মত তা'র চেহারা। দুজনে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

সবাই বল্‌লে "একপাড়ায় থাকি উপকারে লাগা চুলোয় যাক্, একটা খবর পর্য্যন্ত পেলাম না। কোনও দিন ডাক্তার বদ্যি আস্‌তে দেখিনি যে জানতে পারব কারও অসুখ করেছে।"

(৪)

বিপিনের বউ মারা যাবার সপ্তাহ-খানেক পর থেকে রোজই সে তার মাতৃহীন তিন বছরের মেয়ে শান্তিকে নিয়ে সকাল বিকেল এদিক ওদিক বেড়াতে লাগল। পাড়ার কোনও লোকজন দেখ্‌লে পাশ

কাটিয়ে চলে যায়। কেউ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে 'হাঁ' 'না' ছাড়া বড় একটা জবাব দেয় না।

* * * * * * *

শ্রাবণের গোড়াতেই একটা রবিবার সকালে দেখা গেল বিপিন কোঁচান কাপড় পরে, মটকার পাঞ্জাবীর উপর সাদা কোঁচান চাদর ফেলে কোথায় যাচ্ছে। পাড়ার সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে মুখ ঘুরিয়ে বসল ট্যাক্সির ভিতরে। ট্যাক্সি চলে গেল!

সে কোথায় যাচ্ছে এমন বেশভূষা করে তা' নিয়ে বেশ কল্পনা আরম্ভ হয়ে গেল। রমেন বললে 'বিপিন কনে দেখ্‌তে যাচ্ছে।' বিপিনের বাবা অনেকদিন আগে মারা গিয়েছিলেন। নিকট আত্মীয়ও আছে বলে কেউ কখনও শোনে নাই। মেয়ে দেখ্‌তে হলে সেই বিপিনকেই যেতে হবে—এ কথাটা ঠিক। তবু রমেনের কথাগুলো কারও পছন্দ হল না।—"থাম্‌ রমেন, তুই একটা সবজান্তা। বিয়ে করে ত তার অনেক দেরী আছে, অন্ততঃ এক বছরের আগে নয়।" রমেন জবাব দিলে, "কালস্য কুটিলা গতিঃ।" ভবিষ্যৎই জানে আমার কথা ঠিক কিনা।

রমেনের কথা ফলে গেল। তার পরের রবিবার কতকগুলো লোক এসে বিপিনকে আশীর্ব্বাদ করে গেল। বিপিনের বাড়ীতে মিস্ত্রীর ধূমধাম পড়ে গেল, দুয়ার জান্‌লা রং হ'ল, বাড়ীর বাইরেটার রং ফিরুনো হ'ল। ছাদের উপর হোগ্‌লার ছাউনী উঠল। আত্মীয় কুটুম্ব সব কোথা থেকে এসে জুটলেন। মহা ধূমধাম। বিপিনের আর কাজের সীমা নাই, ট্যাক্সি করে এখানে-ওখানে যাচ্ছে, আসছে। পাড়ার কাউকে আর নিজে এসে নেমন্তন্ন করবার সময় করে উঠতে পারলে না। এক আত্মীয় এসে কাজটা করে গেলেন।

বিয়ের তারিখটা বেশ মনে আছে। শ্রাবণের শেষ দিন। মোটর এল, বাস্‌ এল, বরযাত্রীতে বাড়ী ভরে গেল! পাড়ার আর কেউ বিয়েতে গেল না। সবারই আপত্তি—এক কথা, "ও ভণ্ডটার বিয়েতে আর যায় না।" কিন্তু কি হচ্ছে দেখবার লোভটাও ত্যাগ করা শক্ত। সামনের বাড়ীর ছাদ থেকে ব্যাপারটা সকলে দেখতে লাগল। বর গাড়ীতে উঠতে যাবে এমন সময় বিপিনের মেয়ে শান্তি দৌড়ে এল, বললে "বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাব।" বাবা জবাব দিলেন, "দূর পাগলী, আমরা যাচ্ছি বায়স্কোপ দেখ্‌তে। তুই কোথায় যাবি?" বিপিনের বাপের আমলের বুড়ো চাকরটা তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

তার পরের দিন বেলা ন'টা দশটার সময় বর কনেকে নিয়ে ফিরে এল। কনেকে বরণ করবার মহা ধূম পড়ে গেল। মেয়েটা কোথায় খেলছিল, গোলমালের আওয়াজ পেয়ে উলঙ্গ হয়ে ছুটে এল "আমার মা এসেছে, আমার মা এসেছে" বলে। কেউ তাকে নিশ্চয় 'মা এসেছে,' একথাটা বলে দিয়েছে। চাকরটা এসে শান্তিকে কোলে তুলে নিলে। কিন্তু কিছুতেই সে সেখান থেকে সরবে

না। অনেকক্ষণ মোটরের ভিতরটা সে তাকিয়ে দেখলে, তারপর কেঁদে উঠল "ও আমার মা নয়।" কি সে কান্না। বিপিন বিরক্ত হয়ে বললে, "সরিয়ে নিয়ে যা ওটাকে।" তাকে নিয়ে চলে গেল।

কনে বরণের শাঁকের আওয়াজ, উলু দেওয়ার গোলমাল সব চলতে লাগ্‌ল। কিন্তু সব ছাপিয়ে কানে এল সেই কান্না "ও আমার মা নয়!" সমস্ত হাওয়াটা সেই কান্নায় বিষিয়ে উঠল।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লীর সাহিত্য-সম্মিলন

আজ দু'মাস হয়ে গেল দিল্লীর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন শেষ হয়েছে অর্থাৎ তার বাইরের রূপটার অবসান হয়েছে। সুতরাং এখন এ সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বললে হয়ত সেটা হুজুগের কথা হবে না।

সম্মিলন বা এই ধরণের সমস্ত ঘটনা প্রাণের পরিচায়ক। প্রাণশক্তি যেখানে সতেজ এবং পর্য্যাপ্ত সেখানেই মানুষ এই সব উপদ্রব বরদাস্ত করতে পারে। উপদ্রব বল্‌চি তার কারণ এগুলো দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অন্তর্গত নয়। কেবলমাত্র শরীরকে বাঁচিয়ে চলাই যাঁদের ধর্ম্ম তাঁদের পক্ষে এ একান্ত নয়, কেন না সম্মিলন যদি কোন খাদ্য আহরণ করতে পারে, তবে সে খাদ্য শরীরের নয়। সে যাই হোক, দিল্লীতে এই পর্য্যাপ্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পেয়েছিলুম এক বছর আগে যখন সেখানে রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" অভিনীত হয়েছিল। সেই দিনই দিল্লী-সাহিত্য-সম্মিলন অধিবেশনের সূচনা হয়েছিল একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের এটি পঞ্চম অধিবেশন। চারবার প্রবাসের বিভিন্ন জায়গায় এর চারিটি অধিবেশন হয়ে গেছে। দিল্লীতে কয়েকটি বিষয়ে পূর্ব্বের অধিবেশনের সঙ্গে এর পার্থক্য হয়েছে। সেগুলি এই:—(১) আগেকার কয় বৎসর সম্মিলনের অধিবেশন Easterএর ছুটিতে হয়েছে। কিন্তু সে অবকাশের পরিমাণ অল্প বলে দিল্লীতে স্থির হয় যে Easterএর বদলে Xmasএর ছুটিতে সম্মিলন বসলে আরো ভাল জমবে। এই সময় বদ্‌লানো ব্যাপারে এঁদের দুটি বিষয় ভাব্‌তে হয়েছিল—প্রথম, দিল্লীর দুরন্ত শীতের বিষয়, অতিথিদের যথোচিত আতিথ্যের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হবে কি না। দ্বিতীয়, বড়দিনের ছুটিটা কংগ্রেসেরও সময়—সুতরাং ওদিকে যাবার টানে কেউ সম্মিলনে যোগ দিতে অপারক হবেন কি না। তেবে দেখা গেল যুগপৎ সাহিত্যিক আর রাজনীতিজ্ঞ (politician). প্রবাসে এরকম লোকের সংখ্যা বেশি নয়। আর আতিথ্যের বিষয়ে দিল্লীওয়ালারা অতিথিদের নিজ গুণের উপর নির্ভর করলেন। (২) এ কয় বছর এক মূল সভাপতি ছাড়া শাখা-সভাপতির সৃষ্টি হয় নি। দিল্লীতে ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শন এই চারটি শাখা হয়েছিল। সমস্ত শাখায় প্রবন্ধও এসেছিল। সঙ্গীত-শাখাও বস্‌বার কথা ছিল কিন্তু

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হতে না পারায় সেটি হয় নি। (৩) সাহিত্য-সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা শাখার অধিবেশনও এইবার দিল্লীতে প্রথম হয়েছে। উদ্যান-সম্মিলন (Garden party), সেখানে open airএ ফাল্গুনীর গীতিভূমিকার অভিনয়, ব্যাণ্ডের পরিকল্পনা, এগুলিও দিল্লী অধিবেশনের বিশিষ্টতা।

উপরে যে বিশিষ্টতাগুলির উল্লেখ করলুম তার উদ্দেশ্য এ নয় যে দিল্লী যেন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার করেছেন। পৃথিবীতে আশ্চর্য্য ব্যাপার করা সম্ভব নয়। তবে সেগুলি এই সত্যের প্রমাণ যে সেখানে মামুলী মন কাজ করে নি। ছেলেবেলা থেকে যে রকম শিক্ষা, দীক্ষা, অত্যাচারের ভেতর দিয়ে আমরা বড় হয়ে উঠি তাতে করে এই মামুলীত্বের হাত এড়ান যে কি শক্ত ব্যাপার তা আমরা প্রত্যেকে হাড়ে হাড়ে অনুভব করে থাকি। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি যে because of the *training of generations* we are brought up in unthinking conformity to customs in the smallest details of life. দিল্লীর মনের উপর এই training of generations যে সত্যই ব্যর্থ হয়েছে তার প্রমাণ নীচের ঘটনাগুলি থেকেও বোঝা যাবে।

সাহিত্য-সমাজে বীরবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক হলেও তিনি যে জনপ্রিয় নন এ কথা সকলেই জানেন। তার কারণ মোটামুটি এই যে, তিনি লিখিত-সাহিত্যে চলতি ভাষার আমদানি করেছেন, তাঁর অভিভাষণে যাকে তিনি সাহিত্যের ভাষার মোড়-ফেরানো নাম দিয়েছেন। নতুনত্বের বিদ্বেষী যাঁরা তাঁদের কাছে এ অপরাধ সোজা নয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি না লিখেছেন কবিতা, না রচনা করেছেন উপন্যাস। সুতরাং সাহিত্যিকের উচ্চ পংক্তিতে তাঁর বসবার অধিকার হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ বর্ত্তমান। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও যখন বীরবল ভোটের দ্বারা দিল্লীতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন তখন এর থেকে কি প্রমাণ পাই? প্রমাণ পাই এই যে, সেখানকার মন যুগসঞ্চিত সংস্কারের ভারে প্রপীড়িত হয়ে পড়ে নি—তাঁরা নিজেরাই ভাব্‌তে শিখেছেন। এই সূত্রে আরো দুটি কথা বলি, পাঠক শুন্‌লে সুখী হবেন। প্রথম, সভাপতির জন্য আর কোন নামই প্রস্তাবিত হয় নি। দ্বিতীয়, একজন লোকও বীরবলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন নি।

আরও একটা প্রমাণ দিই। গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, প্রভৃতি গ্রন্থকারের জনপ্রিয় নাটক থাক্‌তেও সেখানে রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর” অভিনীত হয়েছিল। ইংরাজিতে looking ahead বলে একটা কথা আছে। দিল্লীর বাঙ্গালীদের চলার ধরণটা যেন ঐ রকমের।

এই সম্মিলনের সম্পর্কে আরো একটা কথা আমার কাণে এসেছে—সম্মিলন লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্চে কিনা। কারোর কারোর মনে সন্দেহ হয়েছে যে দিল্লীতে আদর-আপ্যায়ন, আলাপ-পরিচয়, ফটো নেওয়া, থিয়েটার, গান প্রভৃতি বাইরেকার ব্যাপারে এত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে যে আসল কাজ অর্থাৎ সাহিত্য-চর্চ্চা, প্রস্তাব (Resolutions) করা প্রভৃতি ব্যাপার গৌণ হয়ে তলিয়ে পড়ে গেছে। লক্ষ্য কি না জানলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া সম্বন্ধে জোর করে কথা বলা চলে না। যখন এই সাহিত্য সম্মিলন প্রথম স্থাপিত হয় তখন কি কি উদ্দেশ্য নিয়ে হয়েছিল তা' অবিশ্যি আমার জানা নাই।

কিন্তু তা না জানলেও এটুকু নিশ্চয় করেই বলা যায় যে পরস্পর আলাপ-পরিচয় এর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলই। সম্মিলন হচ্চে means to an end, end নয়। end হল সুবৃহৎ প্রবাসী-বাঙ্গালী-গোষ্ঠীর মধ্যে একটি পরিব্যাপ্ত মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপনা। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এই কাজটি করার চেষ্টা হচ্চে। বৎসরান্তে এই সম্মিলন তারই প্রতিরূপ মাত্র। কিন্তু এর থেকে যদি এই অনুমান করা যায় যে যাঁরা সম্মিলনে যোগ দেবেন তাঁরা কেবলমাত্র সাহিত্য-বিশ্লেষণ করে দিন কাটাবেন, আর তা না করলে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ব্যর্থ হবে, তবে আমার মনে হয় সে অনুমান অভ্রান্ত হবে না। একান্তচিত্তে সাহিত্য-সেবা ব্যক্তিমাত্রেরই নিজস্ব—নির্জ্জনতাই তার জন্যে অনুকূল—তার জন্যে সম্মিলনের প্রয়োজন নেই। সম্মিলনের প্রয়োজন শুধু সেই corporate life গড়ে তুলতে সাহিত্য যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করবে।

দিল্লীর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যের কথা পূর্ব্বে বলেচি। সেই প্রাণশক্তি যখন অনুভব করে যে তার দ্বারদেশে অতিথি অভ্যাগত সমাগত, তখন তার চাঞ্চল্য, আর আলোড়ন অবশ্যম্ভাবী। আদর-অপ্যায়ন, ফটো নেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার তার বাইরেকার অভিব্যক্তি মাত্র। এটার অভাব হলেই যেন বেমানান হ'ত।

আর একটা কথা বলবার আছে। ছোট বেলায় আমাদের গানের ধুয়া ছিল, "ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল," না হয়ত, "ঘোড়দড়ি চড়বড়ি কোথা তুমি যাওরে, সময়ে চলিনু আমি হায়ে না ফিরাওরে।" গত বছর থেকে দিল্লীতে ছেলেদের গানের ধুয়া হয়েচে, "আমরা খুঁজি খেলার সাথী," "গানের সুরের আসন খানি পাতি পথের ধারে" ইত্যাদি। সুতরাং এই ছেলের দল যে refinement-এর মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেচে এতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

মীরাট .
১৮ ফাল্গুন ১৩৩৩

শ্রীঅবনীনাথ রায়

দেওঘর

বাংলা-সীমা ছাড়িয়ে এলাম কাঁকুরে দেওঘরে,
হেথায় হোথায় দূর অদূরে পাহাড় থরে থরে।
ত্রিকূট-পাহাড় তিনটি মাথা, পূব্‌ দিকেতে রাজে,
তবুও যেন যেদিক্ তাকাই সেই দিকে সে আছে।
কাঁকর-ভাঙা রাস্তা শাদা, মাঝখানে পাটকিলে,
কোথাও আবার লাল মাটীতে রাস্তা রেঙে দিলে।
মাঠের পাশে চরকী পাহাড়, পাথর মাথা তোলে—
মৌন ধরার শক্তি গোপন কঠোর হ'য়ে ফোলে।

মানব-গৃহে একটি দুটি শিশুরি হাট লাগে,
ধরার বুকে তেম্নি হেথায় ছোট্ট পাহাড় জাগে।
কেউ তুলেছে থ্যাব্ড়া-মাথা, কার মাথা বা সরু,
কেউ বা দাঁড়ায় পাহারওলা—ঠ্যাসান দিয়ে তরু।
এই এখানে একটা জাগে, আবার দু'হাত দূরে,
আবার হেথায় দশটা পাথর উঠ্ছে ধরা ফুঁড়ে।
পাহাড় শিশুর জন্ম দেখে স্তব্ধ হ'য়ে রই,
বিপুল বিস্ময় আমার কেমন ক'রে কই ?
রে প্রাণবান পাহাড়-শিশু, মানব-শিশুর মত
সবল উদ্দাম ওরে জীবন-জাগ্রত,
মৌনা মাতা ধরণী তোর আছে খেয়াল-ঘোরে,
আপন দেহ অটুট ক'রে গড়্ছে ধীরে তোরে।
দুর্ব্বার বসনা তারি আকাশ ছোঁবার আশা
তোর ঐ রূপে মূর্ত্ত যেন—প্রবল কঠোর ভাষা।
কোথাও হরিৎ ক্ষেত্র শোভে পাহাড় কোলে কোলে,
কঠোর গিরির গা বেয়ে বা ঝরণা-দড়ী ঝোলে।
শস্যমাতা কোমল ধরা পাহাড় গ'ড়ে গ'ড়
আপন নিদয়তায় স্মরি' ঝরণা রূপে ঝরে।
ঝরণা-নদী যায় ছুটে যায় বালিরি পথ কেটে,
পাথর-স্তূপের তলে তলে টুটে কোথাও ফেটে।
মাঠের গায়ে সেই ধারাতে করাত দিয়ে গেছে,
লাল কাঁকর আর শাদা কাঁকর জড়িয়ে দোঁহে আছে।

* * *

তপোবনের বুনো পাহাড় লক্ষ গাছে পোষে,
বহুল পাথর-খণ্ড বিরাট্ পাশে পাশে ব'সে।
গুহায় কোথায় বোনের ঝোপে লুকিয়ে আছে বাঘ,
গন্ধ তারি আস্ছে নাকে, আস্ছে কানে ডাক,—
শঙ্কিত প্রাণ, হাঁপিয়ে ক্লেশে উঠি পাহাড়-মাথা,
যেথায় পাথর আঁকড়ে দাঁড়ায় অশথ, নোনা, আতা।

সেথান থেকে দেখ্‌ছি ধরা নিম্নে নীরব শুয়ে,
অসংখ্য গাছ, তৃণ, পুকুর যত্নে বুকে থুয়ে,
ধানের ক্ষেতের সবুজ ছবি বাঁধা আলের ফ্রেমে,
লোহিত মাটীর পথখানি যায় উঠে আবার নেমে।
বিচিত্র এ ধরার মূর্ত্তি কোথাও শাদা, লাল,
কোথাও উঁচু কোথাও নীচু, কোথাও কাটা খাল।
মানুষ চলে, চর্‌ছে গরু যেন বকের সারি!
ঐ ধারেতে দুঃখ পীড়ন আছে মহামারী?
ঐ ধারেতে যুদ্ধ বাধে?—রাগ ও লাঠালাঠি?
একটু মাটী, কড়ির তরে মাথার ফাটাফাটি?
দশটি জনের পোষণ তরে একটি প্রাণী খাটে?
দুঃসহ-ক্লেশ-আরাব সাথে বক্ষ কোমল ফাটে?
হেথায় মরে একটি কি নর দশটি শিশু রেখে,
তাদের প্রবল আর্ত্তনাদ কি বাতাস চলে মেখে?
ঐ কি ধরা দুঃখভরা, কলকলোচ্ছ্বাসা?
ঐ কি ধরা খেল্‌ছে যেথায় হর্ষ, কাঁদন, আশা?
পাহাড়-চূড়ায় ব'সে ভাবি কিছুই যেন নাই,
মানুষ যেন শিষ্ট অতি, শান্ত সর্ব্বদাই।
আজ মনে হয় পাহাড়-চূড়ায় শান্তি-বায়ু ধ'রে
পাখীর মত যাই উড়ে যাই মানব-ঘরে-ঘরে;
বলি সবার কানে কানে—ঝগড়া কেন মিছে,
কেন ছুটিস্ পরের কড়ি নেবার আশার পিছে?
ঊর্দ্ধে হোথায় শোন্ ধ্বনিছে শান্তি-উদারতা,
সেই বায়ুরই আভাস নিয়ে কর্ বেদনাগতা।
উচ্চ হতে কোন্ বাণী পাই উচ্চ করে হিয়া,
পার্‌ব নিতে ঐ বাণী কি দুঃখে প্রলাপ দিয়া?

* * *

নেমে আসি মাটীর বুকে, মা ধরা কল্যাণী,
তোমার বুকে কতই পেষণ করছে মানব প্রাণী।

কাট্‌ছে তোমার বক্ষে কত, শস্য তবু দাও,
করছে দাপাদাপি দলন, শান্ত মুখে চাও।
উচ্চ হ'তে হেরে তোমায় বুঝ্‌মু তোমার আমি,
তোমার মাটী তোমারি জল আমার সর্ব্বস্বামী।
মাগো আমার পৃথ্বী ধাত্রী, তোমার আমি ছেলে,
লোটাতে চাই তোমার বুকে আপন বক্ষ মেলে।
কাঁকর, পাথর, ধূলি সবি আমারি আত্মীয়,
তৃণ ও গাছ যেমন, আমি তেম্‌নি তোমার প্রিয়।
পাহাড়-কোলে লুকিয়ে বসি—রাজিছে স্তব্ধতা,
সর্ব্ব-জগৎ এম্‌নি যেন শান্তি-সুপ্তি-নতা!
একটি ঘুঘু ডাক্‌ছে শুধু পাতার ঝোপে ব'সে;
চম্‌কে শুনি—বটের পাতা একটি পড়ে খ'সে!
শরৎ-মেঘের সিঁড়ি দিয়ে সূর্য্য নেমে চলে,
সোনালি তার উত্তরীয় ছড়িয়ে স্বলগ্নে!
অস্ত ত নয়, অস্তগিরির শিরে রবির বিয়ে
চেলীপরা সন্ধ্যা সাথে, সিঁদূর ও ফাগ দিয়ে।
রবি ও সাঁঝ—বর ও বধূ লুটায় আলিঙ্গনে,
রাত্রি তাদের ঘটায় মিলন কৃষ্ণ আবরণে।

* * *

চৌদিকে চাই দেওঘরেরি—বৃক্ষেরি মেখলা,
পাশে পাশে দাঁড়ায় পাহাড় পাঁচতলা সাততলা।
লম্বা সারি ইউক্যালিপ্‌টাস্ উঁচিয়ে দাঁড়ায় মাথা,
গোলাপ, জবা, চামেলিদের সহাস দোলন মা'ত্তা
বাড়ীর দ্বারে ঢুকতে গেলেই গোলাপ হেসে ডাকে,
চামেলি সে অতিথিরে অর্ঘ্য বিলায় নাকে।
এই কাঁকুরে এই পাথুরে মাটীর একি খেলা,
গড়্‌ছে পাথর, ফোটাচ্ছে ফুল—অবাক্-করা মেলা!
কাঁকর পানে তাকিয়ে ভাবি—তুইও মাটীর গড়া,
ফুলের পানে তাকিয়ে ভাবি—তোরেও ফোটায় ধরা!

প্রগাঢ় বিস্ময়ে আমার চিত্ত ভ'রে আসে ;
বিচিত্র এ কতই ধরা—দেওঘরে আভাসে।
খণ্ড মেঘে ঘুরে বেড়ায় থমকে দাঁড়ায় কোথা,
ভোরের বেলা ত্রিকূট-শিরে ঝলছে সোনা হোথা !
ত্রিকূট গিরি তিনটি মাথায় কুয়াশ-টুপি আঁটে ;
কুয়াশা কি পায়নি শরণ হারিয়ে আকাশ-বাটে ?
চাঁদের আলো গিরির গায়ে, তরুর শিরে, পথে
উপ্‌চে পড়ে, আকাশ নারে ধরতে কোন মতে !
টুক্‌রো আঁধার তৃণের পরে ঘুমোয় গাছের তলে ;
চাঁদের আলোয় লজ্জা পেয়ে জোনাক মৃদু জ্বলে।

* * *

পাহাড়, কাঁকর, গোলাপ ভরা দেওঘরেরি ছবি
চিত্তপটে রাখ্‌ল এঁকে বাংলা গাঁয়ের কবি।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

পুস্তক-পরিচয়

সন্ধ্যামণি—কবিতার বই—উৎকৃষ্ট ছাপা কাগজ ও বাঁধাই। ৩২৭ পৃষ্ঠা—মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী প্রণীত।

হরিশবাবুকে গত শতাব্দীর কবি বলা যাইতে পারে—ইনি হেম-নবীনের যুগের শেষ কবি। কাব্য-সাহিত্যে ইনি গত শতাব্দীর রচনাভঙ্গিই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। এই ভঙ্গি আজকালকার কবিতাবিলাসী পাঠকের রুচিরোচন নয়—সে জন্য আশঙ্কা হয় আজকালকার কবিতা-পাঠকেরা হয়ত এ গ্রন্থখানির সমাদর করিবেন না—কেবলমাত্র রচনাভঙ্গি বর্ত্তমান যুগোপযোগী নহে বলিয়াই হয়ত তাঁহারা পংক্তিগুলির কুহরে কুহরে যে মাধুর্য্য নিহিত আছে—তাহার প্রতিও উদাসীন হইবেন। আমরাও বর্ত্তমান রচনাভঙ্গির বিশেষ অনুরাগী—তাই বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রচনাভঙ্গির প্রতি বিতৃষ্ণ নহি—কাব্য-সাহিত্যের সর্ব্ববিধ রচনাভঙ্গির প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধা আছে। হরিশবাবুর রচনাভঙ্গিও আমাদের ভালই লাগিয়াছে। বর্ত্তমানযুগের রচনাভঙ্গির সহিত এ ভঙ্গির তুলনা করিতে চাহিনা। বর্ত্তমান যুগের কোন' কবির সহিতও হরিশবাবুর তোলনা বা তুলনা চলে না।

রচনাভঙ্গির কথা ছাড়িয়া দিলে কবিত্বের অন্যান্য উপাদান ও উপকরণে হরিশ বাবুর 'সন্ধ্যামণি' নিঃস্ব নহে। সন্ধ্যামণিতে ভাষার ঐশ্বর্য্য আছে, বর্ণনা-চাতুর্য্য আছে, ভাবুকতা আছে, সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা আছে, গভীর অনুভূতি ও নিবিড় রস-মাধুর্য্য আছে। সন্ধ্যামণির 'পতিহীনা,' 'স্মৃতি-অর্ঘ্য, 'পরিত্যক্তপল্লী', 'অশ্রুজল', 'অশ্রুঅর্ঘ্য' ইত্যাদি কবিতা সরল অনাবিল করুণো মর্ম্মস্পর্শী। কবি যে সকল প্রিয়জনকে অকালে হারাইয়াছেন—তাঁহাদের

কথাই বহু কবিতাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কবির ব্যথা কাল্পনিক নহে—ইহা নির্মম সত্য। সত্যের অভিব্যক্তি বলিয়াই সর্বত্র গভীর আন্তরিকতা প্রকাশের সকল দৈন্য ও অনবধানকে অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেক কবিতা কবি আপন বুকের রক্ত দিয়াই লিখিয়াছেন। বধিরা ও উষা ইত্যাদি কবিতায় নিসর্গশ্রী বেশ ফুটিয়াছে। কবি পদ-বিন্যাসের চাতুর্য্যে মাঝে মাঝে বেশ চিত্র-মাধুর্য্য ফুটাইয়াছেন। যথা—

"ঝাঁপি মুখ উপাধানে
উপপ্লুত চন্দ্রমুখ বিমলিন মান রাগে ;
অরবিন্দ রুচি আঁখি,
সজল নীহারে মগ্ন দুই চুম্বনের দাগে,
বন্ধবেণী চূর্ণীকৃত কটি পৃষ্ঠে বিসারিত
পতিত পর্য্যঙ্ক তলে পাশাপাশি নিপীড়নে
ছিন্নকণ্ঠ ফুলমালা লুণ্ঠিত বসন সনে।'

স্থলে স্থলে বর্ণচ্ছটায় চিত্রগুলি স্বর্ণোজ্জ্বল, যেমন—

দেখেছিনু কমনীয় কণ্ঠ সুকুমার
সুললিত কুন্তলশ্রী চিক্কণো উজ্জ্বল,
ফুলহার বলয়িত কুণ্ডলের ভার,
অলকান্তে সিন্দূরের রেখা নিরমল।
অলক্ত রঞ্জন রাশি করেছে রাতুল কিবা চরণযুগল
বিচিত্র বরণ বাসে আবরিত মনোহর তনু সুকোমল।

'পরিত্যক্ত পল্লীর' শ্রীভ্রষ্টতা কবি গৈরিক রঙে আঁকিয়াছেন। কবিতাটি Gray's Elegy'র অনুকরণে লিখিত—কবি ইংরাজ কবির প্রতিফলিত চিত্রটিকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া স্বতন্ত্র নিজস্বতা দান করিয়াছেন।

বিজন বিপিনে বন কুসুমের প্রায়
কত শত মহামতি জন্মিল এখানে
হ'লনা বিকাশ, কিন্তু ধীরে ধীরে হায়
হলো ভস্মে পরিণত কৃতান্ত কৃপাণে।

এই শ্রেণীর ২।৩টি পংক্তি কেবল 'গ্রে'র বিশ্ববিখ্যাত কবিতার অমর পংক্তিগুলিকে স্মরণ করায়। সন্ধ্যামণির 'অনুতপ্তা' একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আপনার উদার অন্তরের দরদ দিয়া একটি পতিতার অনুতাপদগ্ধ অকালজীর্ণ জীবনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কবি এ কবিতায় একটি বিরাট সত্যকে সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন, ফলে সত্য ও সুন্দরের মিলনে যে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা পতিতার অশ্রুকুণ্ডের মুখে আত্মগাথার মত বিরাজ করিতেছে—আমাদের কল্যাণীগণও এ কল্যাণ-মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে পারেন। 'জীবনাঞ্জলিতে' একাধারে দেশভক্তি ও রাজভক্তির সমন্বয়। ওজস্বী আবেগোচ্ছ্বাসে 'উন্মাদিনী'তে Sappho

সুন্দরীর প্রেমের উন্মাদনা চমৎকার ফুটিয়াছে। বাঙ্গালীর কবি 'মিশরেশ্বরীর' গর্ব্বোজ্জ্বল রাজশ্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

সমালোচনা করিতে গেলেই দোষ-ত্রুটী ধরিয়া উপদেশ দেওয়ার প্রথা আছে। গ্রন্থে যে দোষ-ত্রুটীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে হরিশ বাবুর মত বয়ঃ-প্রবীণ কবির ত্রুটী দেখাইয়া উপদেশ দেওয়ার বয়স আমার এখনো হয় নাই—হরিশ বাবুরও সে প্রকার উপদেশ শুনিয়া উপকৃত হইবার বয়স আর নাই—অতএব এইখানেই—ইতি।

পল্লী-প্রতিভা—শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার এম-এ প্রণীত, ২১৭পৃষ্ঠা—মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

নীরস অর্থনীতির শিক্ষক অক্ষয় বাবুর হাত হইতে এই সরস উপন্যাসখানি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি এবং তাঁহার ছাত্রগণের জন্য মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। বাস্তবিক, অক্ষয় বাবুর এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহার এই পল্লীচিত্র তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং লিখন ভঙ্গীতে তাঁহার কতকগুলি চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে যেখানে পল্লীর ঘরের কথার বর্ণনা আছে, সেখানেই বাস্তবতঃ পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু অন্য দু'এক স্থান অস্বাভাবিকতা দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

লালটুপী—শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী প্রণীত, ২ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে এস, এম, রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ২৬ পৃষ্ঠা—মূল্য আট আনা মাত্র।

ইহা একখানি ছেলেদের বই। লালটুপী, বুড়ো আঙুল, পুসীর কীর্ত্তি ও পরী—এই চারিটি গল্প ইহাতে আছে। গোলাপী কাগজে সুন্দর ছাপা,—ছয়খানি রঙীণ ছবিতে আরও চিত্তরঞ্জক—শিশুগণের চক্ষের ও মনের আনন্দ বর্দ্ধনে সমর্থ।

টোট্‌কা চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পল্লীমঙ্গল-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত; অষ্টম সংস্করণ—মূল্য পাঁচ আনা।

এমন দিন ছিল যখন আমাদের ঘরের প্রাচীনারা টোট্‌কার সাহায্যে বাড়ীর কঠিন ও অকঠিন অনেক ব্যাধিই আরাম করিতেন। এখনও টোট্‌কার উপকারিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ঠাকুমা দিদিমার সে ঝাঁপি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজী শিক্ষার ঝোঁকে সে ঝাঁপি আমরা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে নানা কারণে সে ঝাঁপি খুঁজিয়া বাহির করিবার আবশ্যকতা হইয়াছে। পল্লীমঙ্গল-সমিতি সেই নিক্ষিপ্ত ঝাঁপির উৎক্ষিপ্ত টোট্‌কাগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তক মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার যে আবশ্যকতা আছে এবং ইহার যে দেশের মঙ্গল করিতেছে ইহার ৮ম সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

মণিমুক্তা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম, এ, প্রণীত। ৬৪ পৃষ্ঠার মূল্য ॥০ আট আনা।

পাঠশালার নির্দ্দিষ্ট বই পড়া ছাড়াও শিশু ছাত্রেরা তাহাদের আনন্দের জন্য অন্য ভাল লেখা পড়িতে পারে, ইহার ব্যবস্থায় একালে অনেক রকমে ছড়া, কবিতা, গল্প ও হাসি-তামাসার বই রচিত হইতেছে। এই কবিতার বইখানিও সেই শ্রেণীর। লেখকের রচনা সরস, সরল ও শিশুদের সুশিক্ষার উপযোগী। বইখানির ছাপা ও বাঁধা ভাল।

বিবিধ বিধান—রায় বাহাদুর শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী প্রণীত। ৫২৬ পৃঃ, ভাল বাঁধা ও ছাপা, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যে শিক্ষা পাইলে বিদ্যালয় পরিচালনায় পটু হইতে পারেন, ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের কৌতূহল বাড়াইয়া সুশিক্ষা দিতে পারেন তাহা অতি যোগ্যতায় ও দক্ষতায় বিস্তৃতভাবে এই বইখানিতে দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রদের শিক্ষণীয় যত বিষয় আছে সে সকল গুলি যে পদ্ধতিতে শিখাইলে ও যে কৌশলে শিখাইলে ফল ভাল হয়, তাহা বহু দৃষ্টান্তে বুঝাইয়া দেওয়া আছে। লেখক সারা জীবন শিক্ষকতা ও শিক্ষা পরিদর্শনের কাজ করিয়াছেন; তাঁহার অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও সুবিবেচনা বইখানির প্রতি অধ্যায়েই লক্ষিত হয়। শিক্ষাবিধানের এমন ভাল বড় বই খুব সম্ভব আমাদের সাহিত্যে আর নাই। এখানি শিক্ষক-সমাজে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে মনে হইল, কেন না, ইহার ষষ্ঠ সংস্করণ হইয়াছে দেখিতেছি।

পরিহাস—শ্রীরসময় লাহা প্রণীত। ৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৵৹ বার আনা।

জীবনের প্রফুল্লতা সূচিত হয় হাসিতে, সরলতার পরিচয়ও হাসিতে। বিশুদ্ধ হাসি ও পরিহাস বিষয়ে পদ্য রচনায় গ্রন্থকারের দক্ষতা আছে; এই বই পড়িয়া পাঠকেরা আনন্দ উপভোগ করিবেন। এ গ্রন্থে যে ৬৩টি পদ্য রচনা আছে তাহার দুই-তিনটি বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত (১) **চীন যাত্রী** (১৮৭ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা)। (২) **শেষ খেয়া** (গল্পের বই, ১৭৯ পৃঃ মূল্য দেড় টাকা)—দুইখানি বইয়েরই বাঁধা ও ছাপা ভাল।

বইখানি এমন সুরচিত, এত উপভোগ্য, এতখানি স্থায়ী আনন্দের উৎস, যে দু-এক কথায় সমালোচনা শেষ করিলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করা হয়; তবুও সংক্ষিপ্ত সমালোচনাতেই উভয়ের পরিচয় দিতে বাধ্য হইতেছি। হাস্যরসের সৃষ্টিতে "চীনযাত্রী" বইখানি এত মনোরম হইয়াছে যে এক আসনে বসিয়াই প্রায় দুশ পৃষ্ঠার বইখানি শেষ করিতে ইচ্ছা হয়। এমন শ্রেণীর লোক নাই যিনি এই চিত্ত-বিনোদের বইখানি পড়িয়া সুখী হইবেন না।

গল্পের বইখানিতে অর্থাৎ "শেষ খেয়া"তে কয়েকটী নিপুণ চিত্র (sketch) আছে ও এখানিও সরস রচনা-ভঙ্গিতে মনোহর হইয়াছে। হাস্যরস সৃষ্টিতে গ্রন্থকারের ক্ষমতা প্রচুর, কিন্তু এই গল্পের গ্রন্থে হাস্যরস ছাড়াও প্রাণ ভিজান কোমল করুণ রস আছে। একদিন 'কাশীর কিঞ্চিৎ' পড়িয়া যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সার্থক হইয়াছে,—গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আসন পাইয়াছেন।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা (১৩৩৪ সাল):—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত;—মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

আমরা এই নূতন ধরণের সুবৃহৎ নূতন পঞ্জিকাখানি পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহার সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় পারলৌকিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান জন্য যেমন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সুব্যবস্থা প্রকাশিত করিয়াছেন, তেমনি দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী একটা অখণ্ড জাতির উন্নতির পক্ষে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহার প্রায় সমস্ত কথাই ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, প্রত্যেকেই পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকে যেমন ধর্ম্মকর্ম্মের সমস্ত উপদেশ ইহার মধ্যে পাইবেন, নিজের ও নিজের জাতির উন্নতিবিধায়ক কর্ত্তব্যকর্ম্মের যথাযথ উপদেশও ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইহা একাধারে ধর্ম্মসাধনের উপদেষ্টা, প্রত্নতাত্ত্বিকের পরম সহায়, ঐতিহাসিকের অবলম্বন, জাতির ও জাতীয় নেতৃগণের পথ-প্রদর্শক। ইহাতে জাতির উন্নতি সম্পর্কীয় যে-সমস্ত মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে-কোন উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকার গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারে,—ইহার সংবাদ-কোষ অমূল্য—অবসর সময়ে চক্ষু বুলাইলেই বাংলার লোক-সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব, নগর ও পল্লীর সংখ্যা, বিভিন্ন বয়সের বিপত্নীক ও বিধবার সংখ্যা, অন্ধ, কালা ও আতুরের সংখ্যা, দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা, শিক্ষার অবস্থা, কলিকাতা ও কলিকাতা কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাযথ ধারণা অনায়াসেই জন্মিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পঞ্জিকায় পোষ্ট-আফিস্, টাক্স, লাইসেন্স ও ষ্টাম্প বিষয়ক যে-সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, ইহাতে তাহার কোনই অপ্রতুলতা নাই। ইহার হর-পার্ব্বতী-

সংবাদ গতানুগতিক রাজফল, মন্ত্রীফল, বায়ুফল, মেঘফল প্রভৃতির বিফল ফলবিচার নহে। ইহাতে পার্বতী হরের নিকট জানিতে চাহিতেছেন,

> হেরি ভারতীয় লোক ধর্ম অনুষ্ঠানে,
> হয় রত অতিথির নিত্য আরাধনে।
> পোষ্য ও আশ্রিত লোক পালে সযতনে
> কভু নহে পরাঙ্মুখ দেব-আরাধনে।
> ধর্ম সাধুকর্মে রত ধার্মিক আস্তিক ;—
> তবে কেন পায় এত যন্ত্রণা অধিক ?
> ইহাদের দেহ জীর্ণ, অভাব সংসারে
> অকালে মরণ ঘটে হতাশ অন্তরে !
> সর্বজ্ঞ তুমিহে নাথ, কারণ ইহার
> ব্যক্ত করি' কহ মোরে, ওহে কৃপাধার।

ইহার উত্তরে হর যাহা বলিতেছেন তাহা প্রত্যেকে বাঙ্গালীর পঠিতব্য, শ্রোতব্য ও সর্বথা স্মর্তব্য। ইহার "চিত্র-বীথি" অংশে ১৩৩৩ সালের বহু স্মরণীয় ঘটনা ও "শিশুপালনের ক্রম-কথা" চিত্রাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। মোট কথা ইহাকে প্রকৃত "গৃহ পঞ্জিকা" করিবার পক্ষে যত্ন ও চেষ্টার কোন ক্রটিই আমরা দেখিতে পাইলাম না।

ঘরে বাইরে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে নূতন প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ—৩৪১ পৃঃ—মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা।

গল্পগুচ্ছ—(তৃতীয় খণ্ড)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির প্রকাশের তারিখের ক্রমানুসারে যে সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে ইহা তাহারই তৃতীয় খণ্ড—ইহাতে ১৬টি গল্প আছে,—মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

কথা ও কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—নবম সংস্করণ—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত—১১২+৩১ পৃঃ;—মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

রক্তকরবী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—প্রথম সংস্করণ,—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত—১০৩ পৃঃ—মূল্য ১৸০ এক টাকা বারো আনা।

সমাজ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ৮টি প্রবন্ধ—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ—১৩১ পৃঃ—মূল্য ৸৴০ চৌদ্দ আনা।

হরণ ও বন্ধন

কাল পাশের বাড়িতে একটা মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। একটু বেশি বয়সেই বিবাহ হইল। এতদিন ধরিয়া সে বাপ মায়ের কাছেই লালিত-পালিত হইতেছিল। সাধারণত বিবাহের বয়স পার হইয়া যাওয়ায় অত বড়সড় হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে বড় সঙ্কোচেই থাকিতে হইয়াছিল। দিনরাত সংসারের কাজে বাপ মায়ের সেবাতে সে নিজেকে নিয়োজিত রাখিত। সকলের বড় আপন হইয়াই উঠিয়াছিল। তবুও এতদিন পর যখন তাহার বিবাহ স্থির হইল তখন ঠাৎ কাল সন্ধ্যাবেলা বর আসিয়া রাতে বিবাহ করিয়া আজ সকালেই তাহাকে বাপমায়ের নিকট হইতে কোন সুদূরে লইয়া প্রস্থান করিল।

তাহার বাপ মা এখন আর কেউ নয়! তাহার এতদিনের স্নেহ মমতার স্থান সব ছাড়িয়া তাহাকে নীরবে চলিয়া যাইতে হইল, কোন এক অপরিচিতের সঙ্গে। সেই আজ তাহার সর্ব্বময় স্বামী প্রভু হইয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল। এই ব্যাপারটাতে মনের একটা করুণ তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। ভাবিলাম সংসারের কি নিয়ম! বিবাহেই স্ত্রীপুরুষের মিলনেই সংসার পরিচালিত এবং সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হইলেও,এই অপরিচিত সঙ্গই শেষে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত ও অন্তরাত্মার একমাত্র ঈপ্সীত সঙ্গ হইলেও ইহাকেই অবলম্বন করিয়া জীবনের শতদল পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিলেও, বিবাহের এই নিদারুণ প্রথাটা কোথা হইতে আসিল? এ-ত প্রকাণ্ড একটা অপহরণ বইত নয়! সেকালে সমাজের সেই প্রথম ছায়াময় প্রভাতে যে রাক্ষস বিবাহের কথা শুনিতে পাই এও কি তাই? কেবল দেশ কাল পাত্র ভেদে সভ্যতার ক্রমবিকাশে তাহার রূপান্তর মাত্র? সে ছিল—হঠাৎ এক অপরিচিত বলশালী পুরুষ তাহার দলবলসহ আক্রমণ করিয়া নারীর আত্মীয়-স্বজনের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে হরণ করিয়া আপন-গৃহে লইয়া যাইত। নারী আহত হইয়াও অথবা যাইবার অনিচ্ছায় মাথা ঠুকিয়া যাওয়ায় তাহার ললাট হইতে রক্ত ক্ষরিতেছে, পরিধেয় বস্ত্র এবং শরীর রক্তাক্ত হইয়াছে তবু তাহাকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া পুরুষ সুন্দর রত্ন লাভ করিয়া বিজয়োল্লাসে সমারোহে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। এই ত দেখিতে পাই শাস্ত্রে পুরাকালের বিবাহের প্রথম পদ্ধতি। বিবাহ অর্থে যদি বিশেষ করিয়া বন্ধন হয় তবে এই অপহরণের মধ্য দিয়াই কি সে বন্ধনের সূত্রপাত?

মানুষ ছিল তখন ইন্দ্রিয়ের পাশবিক উপাসক। প্রবৃত্তির বাস্তব লীলা-খেলায় কত রক্তারক্তি কত জয়-পরাজয়ই সমাজের বক্ষকে নিত্য বিক্ষোভিত করিত। মানুষ এখনও সেই ইন্দ্রিয়ের এবং প্রবৃত্তির দাস থাকিলেও সময়ের আবর্ত্তনে তাহার আচার-ব্যবহারে কার্য্যকরণে কত আবরণ পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে কত অভিজ্ঞতা কত উচ্চতর বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষ ক্রমশই পূর্ণ ইহাতে পূর্ণতর হইয়া কত ঢাকাঢুকির মধ্য দিয়া চলিতে শিখিয়াছে। সভ্যতা ও সামাজিক জীবনে সুবিধা-অসুবিধায় জ্ঞানবৃদ্ধি এবং নানা-নিয়ম ও আইন প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রথম-পদ্ধতিগুলিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া গিয়া তাহা এখন গান্ধর্ব প্রাজাপত্য আর্ষ প্রভৃতি প্রণালীতে গিয়া উপনীত হইয়াছে। প্রথমে যাহা শুধু পাশবিক বলের দ্বারা সম্পন্ন হইত, আজ তাহা সে বলবিক্রমের অভাবেও বটে আর সমাজ ও সভ্যতার নিত্য পরিবর্ত্তনেও বটে পরস্পরের সম্মতিক্রমে অন্য প্রকারে সিদ্ধ হইতেছে এবং মানুষের সমুদয় কার্য্য-কলাপ সমাজ এখন মন্ত্রপূত করিয়া লইয়াছে। তাহার ফলে বিবাহে এক্ষণে কন্যার পিতা অথবা অন্য নিকট আত্মীয় কন্যাকে দানস্বরূপে সম্প্রদান করিতেছে। সংগ্রামকারী সৈন্যের দলের পরিবর্ত্তে ভদ্রবেশী বরযাত্রীর দল বরানুগমন করিতেছে। তাহা হইলেও দেখিতে পাই এই দানের মধ্যে আজিও সেই বলপূর্ব্বক হরণের অনেক নিদর্শনই উঁকি মারিতেছে। সমাজ নানারূপে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিবাহকে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য নানা মন্ত্রের বাঁধন দিয়া ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেও তাহার প্রথম জীবনের বলপূর্ব্বক হরণের ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি এখনও যেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। কন্যার তিলক-চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে বিন্যাসকৃত অলকগুচ্ছ মধ্যে ঐ যে উজ্জ্বল

সিন্দূর রেখা বরের হাত দিয়া অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়, যাহা তাহার বিবাহিত জীবনের জয়পতাকা ও রঞ্জিত নিদর্শনস্বরূপ স্বামীর জীবনাবধি মস্তকে দীপ্তি পাইতে থাকে তাহা কি পুরাকালের সেই হৃত-আহত নারীর ললাটক্ষরিত রুধির বিন্দুরই একমাত্র লোহিতোজ্জ্বল স্মারক চিহ্ন নয়? আর নারীর এয়োস্ত্রীর সুলক্ষণস্বরূপে হস্তে যে ঐ লৌহ বলয় ধারণ করা হয়—অধুনা হউক না কেন তাহা স্বর্ণমণ্ডিত তাহাও কি পুরাকালে নারীকে যে বলপূর্ব্বক লৌহবলয়াবদ্ধ করিয়া আনিয়া বিবাহ করা হইত, তাহারই রূপান্তরিত নিদর্শনাবশিষ্ট নহে? তাহার রক্তাক্ত পরিধেয়-বস্ত্র হয় ত কালে লাল চেলির রূপ ধরিয়া রুচির পরিশুদ্ধতার সঙ্গে এক্ষণে নানা রংএর পট্ট বস্ত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জানি না এ সকলের মূলে আর কোন তথ্য নিহিত আছে কি না। পূর্ব্বে বলবিক্রমে সমরদৃপ্ত মুকুটধারী বীরপুরুষ বিজয়োল্লাসে নারীকে গৃহে লইয়া আসিত, এখনও সেই টোপর-মুকুটধারী পুরুষ বিজয়োল্লাসে উৎসব বাজনার সমারোহে নারীকে গাঁটছড়া বন্ধনে গৃহে লইয়া আসেন।

নারী এইরূপে সম্প্রদত্তা অথবা হৃতা হইয়া যে নূতন গৃহে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার ভাগ্যক্রমে সে গৃহের আবহাওয়া যদি স্নেহ ভালবাসার ও শিক্ষার উদারতায় সম্পূর্ণ প্রসারিত না হইয়া একটু অন্যরূপ হইল তবেই তাহাকে একেবারে বন্দিনী হইয়া পড়িতে হইল। এদিকে চেও না—আকাশ দেখো না—অমনিকরে হেঁটো না—উহার সহিত কথা বলো না—এইরূপ নানা নিষেধের গণ্ডির মধ্যে তাহার অবরুদ্ধ প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। দুদিন পূর্ব্বেও যে বনের হরিণীর ন্যায় অবাধ গতিতে পিতৃগৃহে চলাফেরা করিয়া ফিরিয়াছে আজ তাহার অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাগুলি স্বামী-গৃহের অনুজ্ঞার পেষণে আর উন্মুখ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। সর্ব্ববিষয় বিকাশ লাভ করিবার স্বল্পাবসরে তাহার প্রাণের পাখিটা কেবল খাঁচার মধ্যে পাখা ঝাঁপটাইয়া অবশেষে এই বন্ধন-গৃহের সকল অবস্থাতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে ও জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি অগত্যা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র তাহাকেই সে আপন করিয়া লয়। তাহার শরীর ও মনে বন্ধনের শত ছাপ লইয়াও সে স্মিতমুখে পরের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং একমাত্র তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার জীবনের নূতন নাট্যাঙ্ক গড়িয়া তুলে। এই স্থানেই তাহার মহত্ব ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

কিন্তু সংসারের পরিচর্য্যায় সে যতই মহত্ব এবং হৃদয়ের শক্তি ও সামর্থ্য দেখাক না কেন, তাহাকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া তাহাকে যত বড়ই করি না কেন, যত ভালই বাসি না কেন, তাহার বন্ধনের বেষ্টন ত তাহার অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়ে না। সংসারে খাটিতে খাটিতে তাহার প্রাণটি যখন বারেকের তরে বাহিরের মুক্ত বাতাসের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে—বর্ত্তমানের শিক্ষা ও সমাজের নানা আকর্ষণ যখন তাহার প্রাণের ইচ্ছার মুখে ইন্ধন যোগাইতে থাকে, কই এখনও ত তাহার সে বাঁধাবাঁধির আঁটাআঁটির মধ্য হইতে তাহার বাহিরে আসিবার অবসর দেখি না। তাহার প্রভু পুরুষ আজিও যে তাহাকে সে মুক্তি প্রদান করে নাই। তাহাকে বন্দিনী হইয়াই গৃহের কর্ত্রী হইতে হইতেছে। স্বামীর পরিশ্রমলব্ধ অর্থ উপচার লইয়া একমাত্র গৃহকোণে বসিয়াই সংসারের অভ্যন্তরকে সে সরস সুন্দর করিয়া তুলিতেছে এবং ছাড়িয়া দিলেও আর সে পিঞ্জরের বাহিরে আসিতে চাহে না, একমাত্র তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আর তাহাকে যে বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না, সেও তাহারই মঙ্গলের জন্য

হইতেছে। কিন্তু সত্য সত্যই কি সে আর পিঞ্জরের বাহিরে আসিতে চাহে না? পাশ্চাত্য সমাজের নারী যে পুরুষত্ব লাভে বিশ্বকে ভয়ার্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে, আমরা তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেও এবং আমাদিগের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রকৃতি ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহিত কখনও খাপ না খাইলেও, সেও যখন তীর্থ অথবা বায়ু পরিবর্ত্তনের স্থানে গিয়া তাহার দুদিনের স্বাধীনতাকে কত সাগ্রহে আলিঙ্গন করিয়া লয়, তাহাতেই ত দেখা যায় তাহারও মনপ্রাণ একটু অবাধ চলাফেরার মুক্তির জন্য কত ব্যাকুল, কত উৎসুক। আর এই কালের ভাঙ্গা গড়ার নিত্য নূতন অবিশ্রান্ত গতির দিনে একবার বাহিরের সংস্রবে থাকিলে কি তাহার গৃহকোণে প্রাণের বিকাশের ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির বাস্তবিকই কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা,—না, তাহাতে তাহার দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রসারতা আরও বাড়িয়া যাইবারই কথা। হে চিরবন্দিনি! বাহিরের মুক্ত আকাশ আজ তোমায় ডাকিতেছে, বাহিরের বাতাস আজ তোমার জন্য নূতন স্বপ্ন লইয়া ফিরিতেছে, তোমারই জন্য প্রকৃতি তাহার অম্লান সৌন্দর্য্য দিকে দিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছে। এস, তোমার সংসারের শত কার্য্যের মধ্যেও দিনান্তে একবার বাহিরের মুক্ত বাতাসের নিঃশ্বাস লইয়া প্রকৃতির গন্ধ বরণের দৃশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া আবার গিয়া তোমার গৃহাভ্যন্তর উজ্জ্বল কর। নারী হইলেও তোমারও যে একটা মনুষ্যত্ব আছে, বাহিরের সংস্পর্শে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহারও একটা আত্মপ্রতিষ্ঠা হউক। দেশের ভবিষ্যতের ভাগ্যলক্ষ্মীর বন্ধন এমনি করিয়া উন্মোচিত হউক।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

চৈত্রে

অসাধ্য সমস্যা—চীনদেশের বিপ্লবের প্রসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পথের একটি দুর্জ্জয় বাধার কথা বলিব। ইংরেজের বিশ্বাস নাই যে আমাদের হাতে তাঁহাদের স্বার্থ বজায় থাকিতে পারে; তাই আমরা মানুষ মাত্রের প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে বঞ্চিত থাকি। চীনদেশে ইংরেজের অধিকৃত রাজ্য ছাড়া কয়েকটি উপনিবেশ আছে যে সকল স্থানে আপনাদের স্থিতি রক্ষা করিতে না পারিলে ইংরেজদের বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটে, অর্থের দিকে অত্যন্ত অধিক ক্ষতি হয়, ও দশটা বড় জাতির মধ্যে মাথা উঁচু রাখা অসম্ভব হয়। চীনের বিপ্লবে যখন ঐ উপনিবেশগুলিতেই ইংরেজদের স্থিতিতে বাধা ঘটিল তখন আপনাদের রক্ষার সকল্পে (এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিবার জন্য) এদেশ হইতে সৈন্য পাঠাইবার প্রয়োজন হইল। এই তাড়াতাড়ির কালে ব্যবস্থাপক সভার অনুমতি না নেওয়ার বিষয়ে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল তাহার একটা উত্তর পাওয়া কঠিন কথা নয়; কিন্তু সদস্যেরা যখন বলিলেন যে তাঁহারা এসিয়ার জাতিবিশেষের বিরুদ্ধে লড়াই বাধিবার সম্ভাবনার স্থলে ভারতের সৈন্য পাঠাইতে নারাজ, সেইখানেই রাষ্ট্রনীতিতে বিষম সমস্যা উঠিল। ধর্ম্মের বিচারে ইংরেজের পক্ষে চীনে বাসা বাঁধা উচিত কি না—এ তর্কের ঠিক এই সময় নয়; শান্তির সময়ে বিনা উপদ্রবে ইংরেজ আপনার পাততাড়ি গুটাইয়া চীন ছাড়িতে পারেন কি না—সে কথা এখন উঠিতে পারেনা। কিন্তু এখন যদি আমরা বলি যে আমরা পৃথিবীতে ইংরেজের স্থিতির স্বার্থ দেখিব না, আর তাহার উপরে যদি বলি যে আমরা লড়িতে পারিলেও এসিয়ার কোন জাতির বিরুদ্ধে লড়িব না,—কেবল

লড়িতে পারি অন্যের বিরুদ্ধে, তাহা হইলে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বিষম সমস্যা ওঠে যাহা পূরণ করা অসাধ্য। ইংরেজ আপনার স্বার্থের জন্য,—আপনার স্থিতির জন্য প্রাণপণ করিতে ছাড়িবেন না, আর যাঁহারা সে লক্ষ্যের বিরোধী তাঁহাদিগকে দাবাইয়া-না রাখিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে সকল রাষ্ট্রীয় অধিকারে তাঁহাদিগকে ভূষিত করিবেন না। এটা নিশ্চিত কথা; আর এই কথা প্রকাশ্যে আলোচিত না হইলেও আলোচিত হইতেছে। আমরা এই অসাধ্য সমস্যা সাধ্য করিতে পারিব না,—এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল অথবা করা যাইতে পারে তাহা বলিতে পারিব না, তবে এটা যে অতি গভীর বিবেচনার বিষয় তাহা এই দেশহিতৈষীদের কাছে বলিতেছি। অন্য রকমের রাষ্ট্রীয় কোলাহলে এই অতিবড় প্রয়োজনের সমস্যাটি উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

বিলাতি পাউণ্ডের দেশী মূল্য—বিলাতের এক পাউণ্ডের বা সোনার, মোহরের মূল্য কুড়ি শিলিঙ্; ঐ সোনার মোহরের আদর্শে আমাদের রূপার টাকার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল দেড় শিলিঙ্ হিসাবে; অর্থাৎ কুড়ি শিলিঙের মূল্য হইল তের টাকা পাঁচ আনা চার পাই। বহুদিন ধরিয়া এক পাউণ্ডের মূল্য ছিল ১৫৲ টাকা, কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ মূল্য নানা সময়ে বিভিন্ন বাজার দরে নিরূপিত হইত। এই বিধানে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার অর্থ ইহা নয় যে আমরা ১৫ টাকার গিনি মোহর বিলাতের মত এদেশে চালাইব ও ব্যবহারে পাইব; দাঁড়াইল এই যে, বিলাতি জিনিস এখন হইতে এদেশে কম দামে কিনিতে পারা যাইবে। বিলাতের শিল্পীরা ও মহাজনেরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনের নানা পদার্থ যেরূপ সস্তায় তৈরি করিতে পারেন আমরা তাহা পারি না; আর তাঁহাদের মাল যেরূপ ভাড়ায় তাঁহাদের জাহাজে বোঝাই হইয়া এদেশে আমদানি হয়, তাহাতে তাঁহারা ঢের লাভ রাখিয়া সস্তায় বেচিতে পারেন। এ অবস্থায় পাউণ্ডের দাম যদি একটু আক্রা থাকিত তাহা হইলে ভারতের তৈরি মাল অপেক্ষা সস্তা দরে বিলাতের মাল বিক্রি হইতে পারিত না, কাজেই এ ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে। এ দেশে মাল চালানের রেলের ভাড়া অধিক থাকার দরুণ এক প্রদেশের তৈরি মাল অন্য প্রদেশে পাঠাইয়া বেচিবার সুবিধা আগে হইতেই ছিল না; এখন আবার অন্যরকমের বিলাতি মাল সস্তায় বিক্রি হইবার সুবিধা হইল। এই বঙ্গদেশ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত মাল চালান করিতে যত ভাড়া লাগে সুদূর বিলাত হইতে জাহাজে বোম্বাইয়ে ও কলিকাতায় মাল আমদানি করিতে তাহার প্রায় এক-তৃতীয় অংশ খরচ পড়ে। এ সম্পর্কে একটি ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোচিন হইতে বাঙ্গালায় নারিকেলের তেল সস্তায় রেলপথে আমদানি করা একেবারে অসম্ভব; বিদেশের জাহাজে লঙ্কা ঘুরাইয়া বাঙ্গালায় আমদানি করিতে গেলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচ পড়ে বটে কিন্তু, তাহাতেও তেলের দাম খুব চড়া না করিলে চলে না,—অর্থাৎ এখনকার দামের চারগুণ অধিক বাড়াইতে হয়। এই জন্য ঐ তেলে অতিরিক্ত ভেজাল না দিলে মহাজনেরা ব্যবসা করিতে পারে না,—অর্থাৎ এখন যে দামে বিক্রি হইতেছে সে দামে বিক্রি হইতে পারে না। ব্যবসায় বাণিজ্যের এই ক্ষতির দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে কল্পিতভাবে সোনা সস্তা করায় আমাদের লাভ হইল না। আমাদের দেশের অনেক প্রয়োজনের জিনিসেই ভেজাল কম পড়িত ও অনেক স্থলে খাঁটি মাল পাওয়া যাইতে পারিত, যদি রেলকোম্পানিগুলি বিলাতি জাহাজের ভাড়ার অনুপাত মনে রাখিয়া মাল চালানের রেলের ভাড়া অতি মাত্রায় চড়া না রাখিতেন; কিন্তু তাহা হয়ত হইবার নয়। বিলাতের মহাজনেরা এদেশের কড়ি কুড়াইয়া সোনার এমারৎ গড়িবেন আর আমরা সস্তা সোনায় বস্তা-ভরা ছাই পুঁজি করিব; তবে একথা বলিয়া রাখা উচিত যে লাভবান মহাজনদের লাভের কড়ির কিয়দংশে

ভারতগবর্ণমেণ্টের হাতে অনেক কাজ চালাইবার টাকা কিছু অধিক থাকিবে। সে টাকায় রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি অনেক কাজের উন্নতি হইবে, তবে কি খাইয়া পরিয়া আমরা সে রাস্তায় চলিব ও ঘাটে স্নান করিব, তাহাই হইল আমাদের সমস্যা। নিজের পণ্য বেচিয়া শিল্পে অগ্রগণ্য হইতে পারিব না; তবে বিলাতের হাটে কৃষিজাত খাদ্য পদার্থ বেচিয়া বিলাতি পণ্যে সভ্যতা আমদানি করিয়া ধন্য হইব।

জমিদারির আয়ে টেক্স ধরা চলে কি না—জমিদারি এলাকা হইতে গবর্ণমেণ্ট কত রাজস্ব পাইবেন তাহা ১৭৯৩ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট যে অবস্থায় পড়িয়া রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য সেই আইন করিয়াছিলেন সেই ইতিহাস ধরিয়া বিচার করিলে গবর্ণমেণ্ট এখন আইন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন কি না অথবা পরিবর্ত্তন করা উচিত কি না, তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয় নাই; এবিষয়ের বিচারও বড়-কঠিন। এখন যে আইন আছে তাহা অনুসরণ করিয়া হাইকোর্টে এই বিষয়ের বিচার হইয়াছে যে, জমিদারি এলাকার হাটের আয় ও জলকরের আয় হইতে গবর্ণমেণ্ট টেক্স নিতে পারেন কি না। হাট-বাজারের আয়কে জমিদারির আয় বলা চলে না, কারণ জমিদারিতে প্রভুতা থাকার সুবিধায় জমিদার যে অন্য দশ রকমের আয় করিতে পারেন অথবা জমিদারির টাকায় যে মহাজনি করিতে পারেন তাহা খাঁটি জমিদারির আয়ের মধ্যে কিছুতেই পড়ে না। তবে জমিদারি এলাকায় যেমন চাষের জমি আছে সেরূপ জলাভূমিও আছে; সকল রকমের জলস্থল ধরিয়াই জমিদারি এলাকা। কেবল চাষের জমির আয়কেই জমিদারির আয় বলা চলে না। এ অবস্থায় আমাদের মনে হয় যে জলাভূমিতে সেওলা, ঝিনুক, মাছ প্রভৃতির বন্দোবস্ত দিয়া জমিদার যে টাকা পান তাহা তাঁহার জমিদারির আয়, ও কাজেই তাহার উপর টেক্স ধরা চলে না।

প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানে প্রজারা নিজের ইচ্ছায় শস্যাদি চাষের জমিকে জলায় বা বাগানে পরিণত করিতে পারে না, কিন্তু জমিদারের পক্ষে জমিদারিতে আয় বৃদ্ধির জন্য এরূপ কাজে নিষেধ নাই। আমরা অগ্রে যে কয়েকটি কথার আলোচনা করিলাম তাহাতে মনে হয় যে জলকর প্রভৃতির আয় খাঁটি জমিদারির আয়; কাজেই তাহার উপর টেক্স ধরা চলে না। সম্প্রতি হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে এ বিষয়ে যে বিচার হইয়াছে তাহাতে দুইজন জজ আমাদের মন্তব্যের অনুকূলে রায় দিয়াছেন ও সেই রায় লিখিয়াছেন জষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। অন্য তিন জন বিচারকের মতে জমিদারের জলকরের আয় টেক্সযোগ্য; এই বিচারের রায় লিখিয়াছেন,—জষ্টিস্ চারুচন্দ্র ঘোষ। খুব সম্ভব এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হইবে। আপিল যদি না হয় তবে জষ্টিস্ ঘোষের রায় প্রবল রহিবে ও জলকর প্রভৃতির আয়ের উপর টেক্স ধরা আইনসঙ্গত হইবে। আমরা জমিদারির আইন যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, যদি চাষের উপার্জ্জনকে টেক্সযোগ্য করা হয় তাহা হইলেও ১৭৯৩ অব্দের আইনের সর্ত্তে জমিদারকে জমিদারির আয়ের উপরে টেক্স দিতে বাধ্য হইতে হয় না। জমিদারি এলাকায় গবর্ণমেণ্ট রাস্তা-ঘাট করিলে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের উপকারের জন্য কাজ করেন ও তাহার সঙ্গে জমিদারি সর্ত্তের কোন সম্পর্ক নাই; সেরূপ উপকারে জমিদার ও প্রজা সকলেই উপকৃত ও সেজন্য সকলেই সেস্ বা টেক্স দিতে বাধ্য। এরূপ সেস্ বা টেক্সের সঙ্গে ১৭৯৩ অব্দের আইনের কোন সম্পর্ক নাই। জমিদার যে জমিতে চাষার কাছে তিন টাকা কর পাইতে পারেন সে জমি কোন কলওয়ালা ব্যবসায়ীকে দিলে তিন হাজার টাকা কর পাইতে পারেন; কিন্তু জমিদার যখন ব্যবসায়ী ন'ন, তখন তাঁহার এই

অতিরিক্ত আয়কেও খাঁটি জমিদারির আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। আমাদের এই শেষ মন্তব্যটির অনুকূলে হাইকোর্টের একটি নিষ্পত্তিও আছে।

আমাদের স্বরাজ্যের বিলাতি ব্যবস্থা—ভারত গেজেটিয়ারের প্রথম ভাগে যিনি এদেশের ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন সেই হলাণ্ড্ মহাশয় সম্প্রতি আমাদের জাতীয় অবস্থার আলোচনায় বই লিখিয়াছেন। তাঁহার মোটামুটি বক্তব্য এই, আমরা কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ধর্ম্মওয়ালা। তাহার অর্থ এই—আমরা ধর্ম্মের আরাধনায় মনুষ্যত্বহীন, নিষ্কর্ম্মা, নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন সাংসারিক, আর সকলে মিলিয়া লাগিয়া আছি পরস্পরের গলা কাটাকাটির কাজে। কি করিলে এ জাতি রাষ্ট্রীয় উন্নতি করিতে পারে তাহাও ঐ বইএ আছে, আর তাহার বিচার আমরা ভবিষ্যতে করিব। অন্যদিকে লর্ড বার্কেনহেড বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা তখনই চাটি-বাটি তুলিয়া ভারতকে স্বরাজ্য দিয়া বিদায় হইবে যেদিন হিন্দু মুসলমান তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া সরকারের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে থাকিবে। এ আশার বাণী শুনিলে মনে এমন অবস্থা হয়, যাহা মরুভূমির তেপান্তরে পড়িয়াও নিরাশ্রয় তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মনেও জাগে না। এ যুগে কোন দেশেই বিবাদ, বিপ্লব প্রভৃতি পোড়াইয়া দেওয়া যায় না,—ইংলণ্ডেও নয়; তবুও যদি সেই অসাধ্য সাধন আমরা করিতে পারি তাহাতেও ইংরেজ এদেশের মায়া ও স্নেহ মমতা কাটাইতে পারিবেন কিনা, সেই প্রশ্ন তুলিতে ইচ্ছা হয়। চীন দেশের যে-যে অংশে ইংরেজদের বাসা বা বাস তেমন পাকা নয়, অর্থাৎ যেখানে তাঁহারা প্রভু ন'ন্, সে সকল স্থান বজায় রাখিবার জন্য যখন বহুকোটি টাকা ব্যয় করিয়া জাহাজ ও সৈন্য রাখিতে হইতেছে, তখন আফ্রিকা ও এসিয়ার চারিদিকে সুবিধায় সৈন্য পাঠাইবার কেন্দ্র এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষ ইংরেজেরা কখনও ছাড়িতে পারেন—এ কল্পনা মনে আনা আমাদের সাধ্যের অতীত। আসল কথা এই, ইংরেজেরা প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে আমাদের প্রতি বিশ্বাস হারাইতেছেন ও ভারতে আপনাদের স্থিতির উৎকৃষ্টতর উপায় ভাবিতেছেন; তাই নানা ব্যবস্থায় ও নানা বচনে সময় কাটান হইতেছে। যাঁহারা রয়েল কমিশনের মায়ায় মুগ্ধ তাঁহাদের জ্ঞানের নাড়ীতে কি কিছুতেই টনক পড়িবেনা? যাঁহারা শাসন-সংস্কারের সূতায় স্বরাজ বাঁধিতে চান্ তাঁহারা কি অসার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ছাড়িয়া একবার ভারতের সকল জাতির মধ্যে স্থিরপ্রাণতা ও উন্নতি-লিপ্সা বাড়াইতে উদ্যোগী হইবেন না? হিতৈষণার কোলাহলের হাটে এসকল কথায় কেহ কান পাতিবে কি?

যোগ্য ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন—আমরা এই সংবাদে আনন্দিত হইলাম যে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভ্যেরা লর্ড সিংহকে, স্যার্ জগদীশচন্দ্রকে, ডাঃ রবীন্দ্রনাথকে ও স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে আহ্বান করিয়া অভিনন্দন দিবেন। আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁহারা লর্ড সিংহের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারাও অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার কৃতিত্ব ও গৌরব স্বীকার করিবেন। সার্ জগদীশচন্দ্র, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ও স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতিত্ব ও গৌরবের সহিত এদেশের সকলেই পরিচিত। যথার্থ সম্মানের পাত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে ইঁহারা চারি জনেই আমাদের দেশের ও সমাজের অলঙ্কার।

Editor Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road, Calcutta.

THE ... REVIEW OFFICE CALCUTTA UNIVERSITY

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৩৩৩-'৩৪

বৈশাখ

প্রথমার্দ্ধ
৩য় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে লিখিত)

(১৩)

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু*

এখানে আসিয়া অবধি বিদ্যালয়ের কাজে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি   সময় কিছুই পাই না—শীঘ্র পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। দুই একটা ক্লাস আমাকে লইতে হইয়াছে।

তা ছাড়া আমি কোনোমতেই আজকাল লেখায় মন দিতে পারি না—লোকালয়ের যে সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি এখন তাহার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি—এখন আমাকে অবসর লইতেই হইবে—আমাকে এখন আসরে ডাকিলে আর যে পাইবে সে আশা নাই। মনে করিয়া লও সেই প্রবন্ধ-লেখক লোকটার মৃত্যু হইয়াছে—তাহার সংকার শেষ করিয়া পবিত্র বিস্মৃতির জলে তাহার খ্যাতির ভস্ম তোমরা নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলে তাহার একটা জীবনের লীলা সাঙ্গ হয়—তাহার একটা বোঝা চোকে। যাই হোক্ আমাকে তোমরা বাদ দিয়া রাখ—ভূমিকা লেখাই বল, অভিভাষণ বল, সমালোচনাই বল, আমার দ্বারা আর ঘটিবে না। বয়সের গতিকে যখন শক্তির

---

* এই চিঠিখানি ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্রাবলীর মধ্যে ছিল, এখানি তাঁহাকে লিখিত নয়

অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য আর থাকে না তখন তাহাকে নানাদিকে ছড়াইয়া দেওয়া চলে না—তখন ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া শক্তিকে সংহত করিতে হয়—আমার সেই সময় আসিয়াছে অতএব একটা দিকে দাঁড়ি টানিয়া ইতি লিখিয়া বসিয়া আছি। ত্রিবেদী মহাশয়কে আমার সানুনয় নমস্কার জানাইয়া আমার প্রতি দয়া রাখিতে বলিবে—কাজের বাহির হইয়াছি বলিয়াই একেবারে আবর্জ্জনার মত বর্জ্জন না করেন—যদি করেন তবুও আমার উপায় নাই—বস্তুত যে কাজের শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে সেই কার্য্যক্ষেত্র হইতে সর্ব্বতোভাবে সরিয়া যাওয়াই শ্রেয়—সেখানে দেহত্যাগ করিয়াও প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়ানো কল্যাণকর নহে। অতএব নমস্কার। ইতি ৬ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৪)

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আপনার মন হইতে কি দয়ামায়া সমস্ত দূর হইয়া গিয়াছে? আমার আপীল সম্পূর্ণ নামঞ্জুর—with cost? আপনি জানেন আমি আত্মরক্ষার জন্য যতদূরেই পলায়নের চেষ্টা করি না কেন, আপনারা ডাক দিলে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারি না—সেই জন্যই আপনাদের দয়া প্রার্থনা করি। যেখানকার কাজ শেষ করিয়াছি সেখানে আপনারা আবার ফিরিয়া ডাকিলে আমি রক্ষা পাইব কি করিয়া? কর্ম্মফলও ত এক জায়গায় আসিয়া নিঃশেষিত হয় অন্তত তাহা এক পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে নূতনরূপে নূতন ক্রিয়া আরম্ভ করে। আমার কর্ম্মও তাহার ক্ষেত্রের লীলা শেষ করিয়া কি গোলাবাড়ির ইতিহাস সুরু করিতে পাইবে না? কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক করিব না—বিবাদ ত নয়ই। অনুরোধ রাখিবার চেষ্টা করিব—অর্থাৎ বাহিরের ব্যাঘাত যদি গুরুতর হইয়া না উঠে তবে বর্ত্তমান অবস্থায় আমার যেরূপ সাধ্য আছে সেইরূপই সাধন করিব। কিন্তু একটা ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া আছে। এক ভদ্রলোক হুঙ্কার নাম দিয়া কতকগুলি উগ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন; আমার অনুমতি না লইয়াই তাহা আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি খুলনা ন্যাশনাল স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেছিলেন সেখানে রাজদূতে তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে ধরিয়াছে। এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে খুলনায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে পুলিসের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি—সেখানকার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের পত্রও দেখিয়াছি। হয় ত শীঘ্রই ডাক পড়িবে। এই টানাটানি আমার পক্ষে নিদারুণ—এদিকে আমার শরীরও এখন একেবারেই অপটু—যদি বোলপুর হইতে খুলনায় নাড়াচাড়া ঘটে তবে আমি যে সম্পূর্ণ আস্ত থাকিতে পারিব এমন আশা করিতে পারি না। এ অবস্থায় আমাকে আপনাদের জবাব দিতেই হইবে—নতুবা ডাক্তার কবিরাজে জবাব দিবে। সব কথাই ত শুনিয়া রাখিলেন—আমি ছোটখাট কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব কিন্তু যত্নে কৃতে যদি না ঘটিয়া উঠে তবে ক্ষমা করিবেন। সাহিত্য পরিষদের প্রতি আমার

অন্তরের শ্রদ্ধা আছে অতএব যদি কখনো সেবায় ত্রুটি ঘটে তবে তাহা ক্ষমতার অভাবে—তাহাতে সেবকের অপরাধ লইবেন না। ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৫)

ওঁ

(পোস্টমার্ক বোলপুর)

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

যাহা বলিয়াছিলাম লিখিয়া দিবার চেষ্টা করিব। রিপোর্টে ছাপিয়া বাহির করিবার মত কোনো কথা বলি নাই তবে রিপোর্ট সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে, যতটুকু মনে পড়ে লিখিয়া দিব।

কতকগুলি পুঁথি আছে—কবে নিশ্চিন্ত মনে সেগুলি পরিষদের হাতে দেওয়া যাইতে পারে ?

আমার পিতৃদেবের ছবিখানি যদি আমার বাড়িতে পাঠাইয়া দেন তবে মন সুস্থির হয়। ইতি ১লা পৌষ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৬)

ওঁ

কালকা

C/o U. Ganguly Esq.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শব্দতত্ত্ব এবং অন্য গদ্যগ্রন্থগুলি যথাসময়ে আপনার করকমলে গিয়া পৌঁছিবে। আমার প্রকাশকবর্গ যে আপনাকে ভুলিয়া আছেন ইহা আমি মনে করি নাই আজই তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া দিলাম।

আমার শরীর বিশেষ একটু অসুস্থ হওয়ায় এই গ্রীষ্মের দিনে দূর পথ অতিবাহন করিয়া আজ কালকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। যদি ভাল থাকি তবে কিছু দিন এখানে যাপন করিব।

অনেকদিন আপনাকে দেখি নাই। আরো দীর্ঘকাল হয় ত দেখা হইবে না। স্মরণে রাখিবেন।

লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যদি পাঠাইয়া দেন তবে বড় উপকৃত হইব। এ সম্বন্ধে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই।

ঈশ্বর আপনাকে নিরাময় করুন। ইতি ২৬শে বৈশাখ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৭)

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

চিঠিখানি পড়িয়া যাহা ভাল বুঝেন করিবেন। আমার খনিতে যত গভীর করিয়াই খনন করুন খনিজ পদার্থ তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন না—আমার কাব্যে কেবল একটিমাত্র দুর্ভাগা কবিতায় খনিজ বস্তুর সংস্রব আছে—সে ঐ সোনার তরী—কিন্তু সে ত মগ্নপ্রায়। অতএব পত্রলেখকটিকে আপনাদের বৈজ্ঞানিক বাণীভাণ্ডাগারে ডাকিয়া লইবেন।

সম্প্রতি পদ্মায় বেড়াইতে আসিয়াছি। অনেকদিন আপনার কোনো সন্ধান পাই নাই। আপনাকে আমার বইগুলি পাঠাইবার জন্য প্রকাশককে তাগিদ দিয়াছিলাম—তাহাতে কোনো ফল হইয়াছে কি না সংবাদ পাই নাই। আপনার শরীর মাঝে খারাপ হইয়াছিল। এখন ভাল আছেন ত? ইতি ৩০শে আষাঢ় ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিকানার নম্বর সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আছে। যেখানে সংখ্যার কোন সংস্রব আছে সেখানে আমি বৈদান্তিক বলিলেই হয়—অর্থাৎ একের উর্দ্ধেই আমার কাছে অবিদ্যা।

(১৮)

(পোষ্টমার্কে—কলিকাতা)

ওঁ

১৭. ৯.'০৯

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

বিশেষ বিঘ্ন না ঘটিলে নিশ্চয় সাহিত্য পরিষদে আপনার প্রবন্ধ শুনিতে যাইব। অপরাহ্ণ বলিতে অনেকটা সময় বুঝায়—ঘণ্টাটা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ইতি শুক্রবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৯)

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

লালগোলার রাজাবাহাদুর আমার গৃহে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হইতেছে। তাঁহার প্রতি আমার সুগভীর শ্রদ্ধা আছে এবং আমার ঘরে তাঁহার শুভাগমনকে

আমি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করি। এবারে যে সুযোগ হারাইলাম বারান্তরে তাহা লাভ করিবার আশা মনে রহিল।

সাহিত্য পরিষদের মুখপাত্র হইয়া বগোদায় যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নহে কিন্তু পাত্রটি যদি একেবারে বাণীশূন্য হয় তবে পাত্রের মুখরক্ষা হইবে কিসের জোরে। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা এ পর্য্যন্ত আমাকে দূরে রাখিয়াই চলিয়াছেন—প্রবাসে সভাসঙ্কটে কে আমাকে রক্ষা করিবে? যদি চাণক্যের পরামর্শ অনুসারে চুপ করিয়া থাকা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে লম্বশাটপটের আয়োজন করিয়া যাত্রা করিতে পারি কিন্তু তেমন অবিচলিত নিঃশব্দতার সহিত আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করিলে আপনারা কি নিঃশব্দে তাহা সহ্য করিতে পারিবেন? নিশ্চয়ই সেখানকার যন্ত্রকর্ত্তারা সাহিত্য পরিষদের ইতিবৃত্ত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবেন তখন কিরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা আমি আমার মূঢ়তা গোপন করিব সে পরামর্শ আমাকে দিবেন। যদি আপনারা কেহ সাহিত্য পরিষদের বক্তব্য আমাকে লিখিয়া দেন তবে সজীব গ্রামোফোনের মত আমি তাহা আবৃত্তি করিয়া আসিবার ভার লইতে পারি। আপনি বা হীরেন্দ্রবাবু যদি যান তবে আমি আপনাদের পশ্চাতে থাকিয়া কেবলমাত্র হাত পা নাড়িয়া কাজ চালাইবার ভরসা রাখি। ইতি ২৭শে আশ্বিন ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নপত্র" বাঙালীর ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিয়াছে। কবির বিভিন্ন সময়ে লেখা বহুসংখ্যক পত্র একত্র চয়ন করিলে সাহিত্যের দিক্ হইতে তাহা যে বিশেষ উপাদেয় হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মনে করিয়া সকলের কাছে আজ আমাদের অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথের কোন চিঠির সংগ্রহ যাঁহার কাছে আছে তিনি যেন তাহা যথাযথ নকল করিয়া তারিখশুদ্ধ আমাদের পাঠাইয়া দেন বা কোনো মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত করেন।

মূল পত্রগুলি কেহ পাঠাইলে তাহা ফেরৎ দিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব; এবং আপত্তি না থাকিলে পত্রগুলি যাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত যথাস্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ থাকিবে।

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন।

ছন্দের কথা

(২য় পর্ব্ব)

১ম পর্ব্বে ২৮ মাত্রার যে গীতি ছন্দের কথা আলোচনা করিয়াছি তাহাকে নানা কবি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন, আমি উহাকে **‘জয়দেবী’** ছন্দ বলিব। এ প্রবন্ধে ঐ ছন্দের চারিটি পর্ব্বের প্রতি পর্ব্বে,—বিশেষতঃ চতুর্থ পর্ব্বে মাত্রাসংখ্যা বাড়াইলে বা কমাইলে ছন্দের কি বৈচিত্র্য ঘটে তাহাই কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইব।

২৮ মাত্রার জয়দেবী ছন্দের চতুর্থ পর্ব্বে মাত্রা বাড়িলেও ছন্দোহিল্লোল রক্ষা সম্বন্ধে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। সমস্ত স্বরগুলি দীর্ঘ হইলেও চলিবে না—তাহার বদলে দ্বিগুণসংখ্যক হ্রস্বস্বর ব্যবহার করিলেও চলিবে না—উভয়বিধ স্বরের সংখ্যা-সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে ছন্দের হিল্লোলময়ী মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। চতুর্থ পর্ব্বে মাত্রা বাড়াইয়া সব স্বরগুলি দীর্ঘ করিলে দাঁড়ায়—

৮+৮+৮+৮ মাত্রা বিশ্বাসানঃ | লোলান্ ভোগান্ | মুক্ত্বা মুক্তো | স্বাং কুর্বাণঃ।
ধাম্নোৎপন্নঃ | নিঃশামাঙ্গঃ | সৌখ্যং ভোক্ষ্যং | হস্তাকাঙ্ক্ষেৎ।
৮+৮+৮+৮ মাত্রা বিষ্ণু নামা | বস্তা লোকা | পাপ কন্না | চায়ো লোলা।
ভেদং ক্রমং | চাষী পাত্ম | ভক্তো পক্তো | বিষ্ণু রাম্না।

অথবা—

২+৮+৮+৮+৬ মাত্রা উন্ | নতা ভোলা | উট্টে কোহা | উম্পা উম্পী | বৃন্তা
যে | নকা স্বম্বা | নাহে দম্বা | অম্পা অম্পী | বৃন্তত্তা।
দা | বত্তা সত্তা | ছিন্না কণ্ঠা | যথা পিঠ্ঠী | সেব্যত্তা।
সং | মগ্গা ডগ্গা | যাএ অগ্গা | লুত্তা উত্তা | হেরত্তা।

উপরের ছন্দটি বিদ্যুন্মালা। নীচের ছন্দটি ব্রহ্মরূপক,—(অতিপর্ব্ব দুই মাত্রা বাদ দিলে হয়, সারঙ্গিকা) এদুটীতে বিদ্যুদ্দ্যুতি বা ব্রহ্মরূপ থাকিতে পারে—জয়দেবীর ‘ললিত লবঙ্গলতার’—লালিত্য-সৌরভ ও নমনীয়তা নাই। আবার সবগুলি হ্রস্বস্বরে পর্য্যবসিত করিলে :—

৮+৮+৭+৬ মাত্রা ঘন পরিমল-মিল | দলিকুল মুখরিত | নিখিল কমল ম | লয় প বনে।
৭+৮+৮+৬ মাত্রা জনয়তি মনসি | শশিমুখি মুখ মতি | শরবিহ মম মধু | রসমধুনা।

এছন্দ গীত্যার্য্যা শ্রেণীর “চূলিকা”। ইহাতে জয়দেবীর ‘ললিত লবঙ্গলতার’ লালিত্য আছে, লতাধর্ম্মও আছে। কিন্তু ইহা অম্বুদ্যাতিনী ভূমিতে যেন লতাইয়া চলিয়াছে—কণ্ঠতরুর শাখায় শাখায় উঠিয়া নামিয়া হিল্লোলশ্রী লাভ করিতেছে না। বাংলা ভাষায় দীর্ঘমাত্রার প্রতিপত্তি নাই—বাংলায় সেজন্য এছন্দ সহজেই অনুকৃত হইয়াছে।

এক পংক্তির সমস্ত মাত্রা দীর্ঘ, অন্য পংক্তিতে সবগুলি হ্রস্ব মাত্রা ব্যবহার করিয়া পিঙ্গল **"গীত্যার্য্যা"** শ্রেণীর ছন্দের উদাহরণ দিয়াছেন যথা—

৮+৮+৮+৮ মাত্রা

(ক) যদি সুখমনুপম | মদনমতিমনসি | পরিহর যুবতিম্ | রতিমতি শমবিহ।
আত্মজ্যোতির্ | যোগাভ্যাসাদ্ | দৃষ্ট্বা ক্লেশ- | ছেদং কুর্য্যাঃ॥
(খ) সৌম্যাং দৃষ্টিং | দেহি স্নেহাদ্ | স্নেহেহস্মাকং | মানং মুঞ্চ।
শশধরমুখি সুখ | মুপনয় মম হৃদি | মনসিজ-কৃতমপ | হর। লঘুতরমিহ॥

ছন্দের নাম **শিখা**। ১মটির উপনাম **জ্যোতিঃ**—২য়টির উপনাম **সৌম্যা**। 'কড়ি কোমলে'—'কঠোর ললিতে' মিলন সত্ত্বেও জয়দেবীর ছন্দঃস্পন্দ ইহাতে নাই।

৪র্থ পর্ব্বে মাত্রাসংখ্যার বৃদ্ধিতে ছন্দঃস্পন্দ হ্রাস না পাইয়া যে বরং বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহার উদাহরণ প্রাকৃত পিঙ্গল হইতে উদ্ধৃত করি—

৮+৮+৮+৬ মাত্রা যে ধণি মত্ত-ম | অংগঅ পাবিবি | অংচল লোঅণি চংদমুহী
চংচল জুব্বণ | জাত ণ আণহি | ছৈল সমপ্পই | কাঁই ণহী॥

জয়দেবীর এ-রূপের নাম **চউব্বোলা**। প্রত্যেক পর্ব্বের ১ম ও ৪র্থ অক্ষরে দীর্ঘমাত্রা যোজনায় কিন্তু কুত্রাপি ব্যতিক্রম নাই। এই ব্যবস্থা বৈচিত্র্যের সহিত ছন্দোহিল্লোলকে সুনিয়মিত করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছে।

৮+৮+৮+৮ মাত্রা। সেআনন্দা | উগ্‌গে চন্দা | ধবল চমরসম | সিঅকর বিন্দা।
উগ্‌গে তারা | তেআ হারা | বিঅসই কমলবণ | পরিমলকন্দা॥
ভালা ভাসা | লদ্ধা আসা | মহুর পঢ়ই লহু | লহিঅ করন্তা।
হংসঃ সদ্দ | ফুল্লা বন্ধু | সরঅসমঅ সহি | হিঅঅ হরন্তা॥

ছন্দের নাম **হংসী**। হংসীর নৃত্যের সহিত তালে তালে চলিয়াছে। পংক্তির পূর্ব্বার্দ্ধ দীর্ঘ মাত্রাময়—উত্তরার্দ্ধ (শেষাক্ষর ছাড়া) হ্রস্বমাত্রাময়। স্বরসংস্থানে ব্যতিক্রমও নাই। 'শিখার' তুলনায় ইহার ছন্দোহিল্লোল অনেক বেশী।

৮+৮+৮+৬ মাত্রা। মাধবমাসি বি- | কসিত-কেশর | পুষ্পরসম্মদি | রামুদিতৈঃ
ভ্রমরকুলৈরুপ | গীত বনে বন | মালিনমালি ক- | দা নিলয়ং।
কুঞ্জগৃহোদর | পল্লব কল্পিত | তল্প মনল্প ম | নোজ—রসং
তং ভজ মাধবি | কা পুন নর্ত্তন | যামুন বাত ক্ল | মোপশমা॥

ছন্দের বিশিষ্ট নাম **মদিরা**। স্বরযোজনার নিয়মে ব্যতিক্রম না থাকায় ছন্দোহিল্লোল সুনিয়মিত। প্রাকৃত 'চউবোলা' ছন্দের সহিত ইহার প্রভেদ কেবল অমিত্রাক্ষরে।

৮+৮+৮+৮ মাত্রা। মাধব মুদৈ | র্মধুকর বিরুতৈঃ | কোকিল কূজিত | মলয়সমীরৈঃ
কলয়মুপেতা | মলয়জ-সলিলৈঃ | প্লাবন তেহপাধি | শতত্যু-দাহা।
পদ্ম-পলাশৈ | র্বিরচিত শয়নে | দেহজ সংজ্বর | ভর পরিদূনৈ
নিবসতী সা | মুহুরতিশঙ্কঃ | ধ্যানলয়ে তব | নিবসতি তন্বী॥

ছন্দের নাম **তন্বী**। লঘু মাত্রার আদর্শে গণনায় ১ম পর্ব্বে ১ম+২য়—৫ম+৬ষ্ঠ—৭ম+৮ম মাত্রা, ২য় পর্ব্বে ৭ম+৮ম মাত্রা, ৩য় পর্ব্বে ১ম+২য়—৫ম+৬ষ্ঠ মাত্রা এবং ৪র্থ পর্ব্বে ৫ম+৬ষ্ঠ—৭ম+৮ম মাত্রা দীর্ঘমাত্রার দ্বারা নিষ্পন্ন। সুতরাং হিল্লোল সুনিয়মিত।

৮+৮+৮+৮ মাঃ— ক্রৌঞ্চ-পদালী | চিত্রিততীরা | মত্তকল-খগকুল | কলকলরুচিরা
ফুল্ল সরোজ- | শ্রেণিবিলাসা | মধুমুদিত মধুপ | রব রভসকরী।
ফেনবিলাসঃ •| প্রোজ্জ্বল-হাসা | ললিত লহরি ভর | পুলকিত সুতনুঃ
পশ্য হরেহসৌ | কস্য ন চেতো | হরতি তরল গতি | রহিম-কিরণভা॥

ছন্দের নাম **ক্রৌঞ্চপদী**। ১ম ও ২য় পর্ব্বে ১ম+২য়—৫ম+৬ষ্ঠ—৭ম+৮ম মাত্রা ও ৪র্থ পর্ব্বে ৭ম+৮ম মাত্রা দীর্ঘস্বরের দ্বারা বা যুক্তাক্ষরের দ্বারা নিষ্পন্ন। লঘুমাত্রার সংখ্যাধিক্য বশতঃ ছন্দে যথেষ্ট লালিত্য আছে। শেষ পর্ব্বে ৪ মাত্রার পর অর্দ্ধযতি দিয়া পড়িলেই হিল্লোলের মাধুর্য্য অনুভূত হইবে। বাংলায় এ ছন্দের অনুকরণ কঠিন নয়।

(২)+৮+৮+৮+৬ মাঃ—

বং | ফুল্ল কমলবণ | বহই লহু পবণ | ভমই ভমর কুল | দিসিবিদিসং
ঝং | কাত্র পলই বণ | রবই কুইলগণ | বিরহিঅ গণহিঅ | হুইবিরসং।
অং | নন্দিঅ মুঅজণ | উলস্থ রঅলখণ | সরস-ণলিণিদল | কিঅ-সঅণা
পল্ | লট্ট শিশির রিউ | দিবস দিঘর ভউ | কুসুম সমঅ অব | অবিঅরণা॥

ছন্দের নাম **শার্দ্দূল**। দুটী করিয়া মাত্র পর্ব্বাতিরিক্ত বা অতিপর্ব্ব (Hypermetrical) প্রথমেই। ১ম দুই পর্ব্বান্তে মিল আছে।—পংক্তিশেষেত আছেই। অতিপর্ব্ব ছাড়া প্রথম দুই লঘু মাত্রার বদলে একটি দীর্ঘ।—বাকী সকল মাত্রা হ্রস্বস্বরে নিষ্পন্ন হইলেও **গীত্যার্য্যার চুলিকা** হইতে ইহা উক্ত কারণগুলির জন্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে এবং ছন্দোহিল্লোল হইতে একেবারে বঞ্চিত নয়। চুলিকার মত ইহা বাংলায় রূপান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

২+৮+৮+৮+৬ মাঃ—

জিনি | বেঅ ধরিজ্জে | মহিঅল লিজ্জে | পিট্ঠিহি দন্তহি | ঠাই ধরা
রিউ | বচ্ছ বিআরে | ছলতনুধারে | বন্ধিঅ সত্তু প | আল ধরা।
কুল | খত্তিঅ কম্পে | দহমুহ কট্টে | কৈটভ কেশি-বি | ণাস করা
করু | ণে পঅলে মেচ্ছ | হই বিঅলে সো | দেই ণরাঅণ্ | তুম্হ বরা।

২+৮+৮+৬ মাত্রা—

ছন্দের বিশিষ্ট নাম **সুন্দরী**। অতিপর্ব্ব মাত্রা দুটী লঘু। মাঝে মাঝে মিল আছে। ১ম পর্ব্বের ১মে ও শেষে, ২য় পর্ব্বের শেষে, ৩য় পর্ব্বের পর্ব্বার্দ্ধদ্বয়ের প্রারম্ভে ও ৪র্থের ১মে ও শেষে দীর্ঘস্বর মাত্রার ধ্রুব নির্দ্দেশ ছন্দটিকে অতিমাত্রায় হিল্লোলিত করিয়াছে। শ্লোকটি দশাবতারের স্তব। ছন্দ স্তবেরই উপযুক্ত।

পঅ | দিব্বিজ্জিঅ বচ্ছজ | দক্খিঅ টোঅঙ্ক | কমঢ বাহ কি | বীউ দিত্রে
পহি কঢ্ঢহি কুড়েল | নৃবইমণ্ডেল | টাবিজ্জ হাল ধু | রঅ উরে।
পই | অঙ্গুলি মুক্কহি | ছোরহি মুক্কত্তি | কক্কন বিন্দু স্যু | মণ্ডতনূ
তন্ন | তূনউ সুন্দর | বিজ্জণ মজ্জেত্র | তাবহ বাণহ | সেসধনূ।।

ছন্দের নাম **দুর্ম্মিলা**। দুর্ম্মিলা না হইয়া দূর-মিলা হইলেই ভাল হইত—কারণ পর্ব্বে পর্ব্বে মিল নাই—একে বারে পংক্তি শেষে মিল। ছন্দের বিশেষত্ব—প্রতি পর্ব্বার্দ্ধের প্রারম্ভে দীর্ঘমাত্রা ছন্দের তরঙ্গকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তালে তালে নাচাইতেছে। দুইটি অতিপর্ব্ব লঘু মাত্রাই ইহাকে প্রাকৃতের **চউবোলা** ও সংস্কৃতের **মদিরা** হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে।

৮+৮+৮+৮ মাত্রা—

গজ্জে মেহা | নীলাকারউ | সদ্দে মোরউ | উচ্চারাবা
ঠামা ঠামা | বিজ্জু রেহউ | পিঙ্গা দেহউ | কিজ্জে হারা।
ফুল্লা নীবা | বোল্লে ভম্মরু | দক্খা মারউ | বীঅন্তাএ
হক্কে হক্কে | কাহে কিজ্জউ | আহ্ন পাউস | কীলংতাএ।।

ছন্দ,—**মঞ্জীরা**। পাউস (প্রাবৃট) আসিয়াছে—তাহার আগমনবার্ত্তার উপযুক্ত ছন্দ বটে—কিন্তু ফুল্লনীবা (নীপ), ভম্মরু (ভ্রমর), দক্খা মারউ (দক্ষিণ মারুত) এ ছন্দের 'মেহগজ্জে'র মধ্যে পড়িয়া বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘমাত্রা বাহুল্যের জন্য এ ছন্দ **ব্রহ্মরূপকের** ও **বিদ্যুন্মালার** কাছাকাছি। ২য় ও ৩য় পর্ব্বে দুইটি করিয়া লঘুস্বর দীর্ঘ উচ্চারণ-শ্রান্ত স্বরযন্ত্রকে বিশ্রাম দিয়া ঈষৎ তরঙ্গায়িত করিতেছে। সবর্ণ সগোত্র সপিণ্ড হইলেও 'প্রাবৃটের' এ ছন্দোরূপ জয়দেবীর 'বসন্তের' 'ললিত লবঙ্গলতাকে' স্মরণ করায় না।

৮+৮+২+৮+৬

মুগ্ধোন্নীণন্ | মত্তাক্রীড়ং | মধু | সময় মুলভ মধু | র মধুরসং
পানে পানে | কিঙ্কিংনাদং | পদ | মকলনয়ন | যুগ | ন সরসিজং।
মানোন্মাদ- | ক্রীড়ং বন্ধ | রম | মুরতি বলয় রচি | ত কুঙ্করণং
সান্দ্রানন্দং | বৃন্দারণ্যে | রাম | ত হরি-মনন পদ | পরিচয়ম ॥

ছন্দ,—**মন্দাক্রীড়ং**। দীর্ঘমাত্রা ও হ্রস্বমাত্রা প্রায় সমান সমান—কিন্তু মাত্রাগুলি ওতপ্রোত ভাবে অনুসৃত নহে। দীর্ঘগুলি একদিকে—হ্রস্বগুলি অন্যদিকে। সে জন্য ছন্দে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিল্লোল উঠে নাই,—তবে বড় বড় তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ২য় পর্ব্বের পর 'অতিপর্ব্ব' মাত্রা দুটী তরঙ্গগুলিকে ক্ষণিক বিশ্রাম দিয়া নিয়মিত করিতেছে। ইহাকে ৮+৮+৮+৮ মাত্রায়ও ভাগ করা যায় অতিপর্ব্বকে পর্ব্বমধ্যে ধরিয়া।

৮+৮+০+৬মাত্রা—পীন বিলেপ বি | ভাগহ মন্তহ | — |দেবি সহী
পাচউ তরঙ্গন | পাস পঅাসিঅ | — | এরি সহী।

ছন্দের নাম লীলা বা অশ্বগতি। ইহাতে একটি পর্ব্বই নাই। অশ্বগতি যেন একটি পর্ব্বকে উল্লম্ফনে উল্লঙ্ঘন করিয়াই চলিয়াছে।

২+৮+৮+৮+৬ মাঃ—অব | লোকনাং তন | মুক্তহর্ষং হন | মন্তো মুকুন্দং | সংবৃত্তং
ফণি | অং অরে ধরি | হন্তো দিক্কহ | কূর্মপৃষ্ঠং | সংবৃত্তং।

ছন্দের নাম শম্ভু। প্রায় ব্রহ্মরূপক বা স্যারঙ্গিকারই মত দীর্ঘমাত্রাবহুল। ঘনস্পন্দের জন্য লালিত্যের অভাব,—গতি দ্রুত। রৌদ্ররসের রচনা ইহাতে বেশ জমে। যেমন—

সিঅ—বিট্টী কিজ্জিঅ | গৌরা লিজ্জিঅ | বালা বুড্‌ঢা | কম্পত্তা
বহ—পচ্ছা বাঅহ | লগ্‌গে কাঅহ | সব্বা দীসা | ঝম্পত্তা।
ভব—অন্ধা হোসই | চিন্তা হো লই | অগ্‌গী পিট্টী | থক্কিআ
কহ—পাআ সংতরি | সিজ্জে ভিত্তরি | অগ্গা অগ্গী লুক্কিআ।

৮+৮+৮+৮
ঠবহ ন্থাইঁ তি সকগণাতহ | সর বিসজ্জহ | বেবি তহাপর।
গেউর সক ভূ অং তহ গেউর | এ পরিধারহ | ভব্ব গণাকর।

ছন্দের নাম কিরীট। দুর্ম্মিলায় দুইমাত্রা ১মে অতিপর্ব্ব,--কিরীটে সেই দুইমাত্রা চতুর্থ পর্ব্বের শেষে আশ্রয় করিয়াছে- ইহা ছাড়া দুর্ম্মিলার সহিত কিরীটের আর কোন গরমিল নাই। কিরীটের কোন কোন পংক্তিতে ৭+৯+৭+৯ মাত্রাতেও ভাগ করা যায়—

বপ্‌পহি চড্ডি | দিয়ে জিনি লিজ্জিঅ | রজ্জ বিসজ্জি | চলে বিহু সোঅর। *

---

* বাংলায় যাহাতে সহজে অনুকৃত হইতে পারে সে জন্য সংস্কৃতের আরো অনেক ছন্দকে জয়দেবীর ধরণে পর্ব্ববিভাগ করিয়া দেখান যাইতে পারে। এ সকল ছন্দে অবশ্য দীর্ঘমাত্রার বদলে ২টী হ্রস্ব মাত্রা ব্যবহার করিলে ছন্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে না। যুক্তাক্ষরের সাহায্যেই হউক, আর যে সকল শব্দে দীর্ঘমাত্রার উচ্চারণ অস্বাভাবিক লাগে না, তাহাদের সাহায্যেই হউক, অথবা সত্যেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত মুহুর্মুহুঃ হসন্ত-প্রয়োগ-প্রণালীতেই হউক, দীর্ঘমাত্রাগুলিকে যথাস্থানে রক্ষা করিতে হইবে। দীর্ঘমাত্রার ওজনকে হ্রস্বমাত্রার দ্বিগুণ ধরিলে যে ছন্দগুলি সুরে, বেগে, গতি ও আয়তনে জয়দেবীর সগোত্র ও সবর্ণ নিয়ে সেইগুলির পর্ব্ববিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ৮+৮+৮+৬ ও ২+৮+৮+৬+৬—শিখরা

অতিমত্তবকুল কু- | সুম-ঘন-পরিমল | মিলমলি-মুখরিত | হরিতি মধৌ
সচ | চরমলয় পবন | সর তরলিত সর | সিত রুচ্য সূচিত | রবি বিততে।

২+৮+৮+৮+৬ মাত্রা

সির | কিরিটজ পঙ্কং | গোরি অম্বরং | হরিঅভ-অংসং | পুরহরঃ
কিম | ফণি বট চারং | তিম্ব অণ সারং | বিমিষ স্মারং | ত্রিউমহনং।
সুর | সেবিত চরণং | মুনি অন সরণং | হউ ভজ শরণং | শূলহরং
সা | পল্লিম বন্ধণং | সুন্দর গন্ধণং | সিদ্ধিবর সঙ্গণং | পমত হরং।

ছন্দের নাম ত্রিভঙ্গী। ছন্দটি ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গিমায় নর্ত্তনশীল। প্রারম্ভের অতিপর্ব্ব মাত্রা দুইটী শিখিচূড়ার মত বিলোলায়িত। শ্লোকটি হরের স্তব। দ্বিভুজ মুরলীধর হরি যেন নাচিয়া

বিকসিত বিবিধ কু | সুম সুলভ সুরভি | শরমদন নিহিত | সকল জনে
জন | রতি মম হৃদয়ম | বিরত মিহ সুতনু! | তব বিরহ দহন | বিষম শিখা॥

২+৮+৮+৮+৬—মহতী।

শুচি | শশি মণ্ডসি বিবৃত | সরসিরুহি মুদিত | মধুলিহি বিমলিত | বরণিতাপে।

৮+৮+৮+৮+৩ মাঃ—পুষ্পিতাগ্রা।

সমসিত দশনা | মৃগশাবাক্ষী | স্মিত সুভগা প্রিয় | বন্দিনী বি- | মদা
অপহরতি নৃপাং | মনাংসি রামা | ভ্রমরকুলানি চ | দেব পুষ্পি- তাগ্রা।

৮+৮+৮+৭ মাঃ—পণব।

মীমাংসারস মমৃতং পীত্বা শাস্ত্রোক্তিঃ পটু | বিতরা ভাতি
এবং সাংসদি | বিদুষাং মধ্যে | জল্পাখো জয় | পণবস্বনাৎ।

৮+৮+৮+৮ মাঃ—মত্তা।

স্বৈরোল্লাপৈঃ | ক্ষতিপুট পেটৈর | শীতক্রীড়া | সুরত বিশেষৈঃ
বাসাগারে | কৃতসুরতানাং | মত্তা নারী | রমযতি চেতঃ

৮+৮+৮+৮ মাঃ—সঙ্কৃতি।

চন্দ্রমুখী সুত- | নুর বন কদনা | কুন্দ সমান শি- | খর দশনাগ্রঃ
নিস্বন বীণা | প্রতি মুখ বচনা | মত্ত কুরঙ্গ-ত | রল-নয়নান্তা।
নির্ম্মল পীনোর্ | নত কুচ কলশা | মত্ত গজেন্দ্রল- | লিত গতিভাবা
নির্ভর লীলা | নিধুবন বিষয়ে | মুগ্ধ নরেন্দ্র! ভ- | বতু তব তন্বী॥

৮+৮+৮+৮ বা ৭ মাঃ—ভ্রমর বিলসিতা।

কিংতে বক্ত্রং | চলদল চকিতং | কিংবা পদ্মং | ভ্রমর বিলসিতং
ইত্যেবং মে | জনয়তি মনসি- | ভ্রান্তিং কান্তে | পরিসর সরসি।

৮+৬+৮+৬ মাঃ রুক্মা।

ঋব শুক পরিভব | কাতী যো* * | নরপতি রতি ধন | লুব্ধাস্তা
এব মিহ নিপততি | পাপেহ সৌ* * | জলমিব পবন হ | তং বৃক্ষাৎ।

২+৮+৮+৮+৬—মাঃ তোটক

তাজ | তোটক মর্দ্দিনি | যোগ কবং প্রম | থাধিকৃতং বাস- | মোপহতং
ত্রিপ | ধাতিরতৃষম | তিং সচিবং নম | নায়ক ভীরুক | নাবুধিকং॥

নাচিয়া হরের স্তব করিতেছে। প্রত্যেক পংক্তির ১ম তিন পর্ব্বান্তের মিল আছে। হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর সন্নিবেশের ধ্রুব নির্দ্দেশ নাই। মোটের উপর প্রতি পর্ব্বে আট মাত্রা থাকিলেই হইল। ইহা খাঁটী 'জয়দেবী'—কেবল মাত্রাধিক্য-জনিত ঈষৎ বিচিত্রায়িত। পর্ব্বে পূর্ব্ব দীর্ঘ মাত্রায় মিলের জন্য ছন্দের চমৎকারিতা বাড়িয়া গিয়াছে। জয়দেবও যেখানে মিল দিয়াছেন—দীর্ঘমাত্রা দ্বারাই দিয়াছেন।

৮+৮+৮+৮—জলোদ্ধতগতি

ভনক্তি সমরে | বহূনপি রিপূন্ | হরিঃ প্রভুবশৌ | ভুজোর্জ্জিতবলঃ
জলোদ্ধত গতি | র্বিধেব মকর- | গুরুগ্র নিকরং | করেণ পরিতঃ ॥

৮+৮+৮+৮—কুসুম-বিচিত্রা।

বিগলিতভারা | সকুসুমমালাঃ | সচরণলাক্ষা | বলয়মুলক্ষা।
বিরচিতবেশং সুরতবিশেষং | কথয়তি শয্যা | কুসুমবিচিত্রা ॥

৮+৮+০+১ মাঃ—জলধর মালা।

ধত্তে শোভাং | কুবলয় দাম্নঃ | — শ্যামঃ
শৈলোৎসঙ্গে | জলধর মালা | — | লীনা।
বিদ্যুল্লেখা | কনককৃতাঙ্গ | — | কান্তা
ক্রীড়ন্ত্যস্যা | যুবতিবিবাহে | — | পত্যুঃ ॥

(১ দীঃ মাঃ = দুঃ মাঃ ধরিলে, প্রলয়পয়োধি-জ । লে ধৃতবানসি । বেদ—ইত্যাদি পংক্তি ইহার অনুরূপ)

৮+৮+৮+৮—ললনা।

যা কুচগুর্ব্বী | মৃগশিশু নয়না | পীন নিতম্বা | মদ-করিগমনা।
কিন্নরকণ্ঠী | সুরুচির-বদনা | সা তব সৌখ্যং | বিতরতু ললনা।

৭+৯+৭+৯—চন্দ্রাবর্ত্তা।

পটুতর পবন | চলিত জল লহরী | তরলিত বিহগ | নিচয় রব মুখরঃ।

৮+৫+৫—অপরাজিতা ফণিপতি বলয়ং | জটামুকু— | টোজ্জ্বলং
মনসিজমথনং | ত্রিশূল বি— | ভূষিতং।

৮+৭+৮+৭—গৌরী

বিজিত সরসিরুহ | নয়নপদ্মা * | ভবতু সকল মিহ | জগতি গৌরী।

৮+৮+৮+৮—দোধক

যা ন যযৌ প্রিয় | মনাববৃত্তাঃ | সা রত আগম | নারত মানং
তেন সহেহ বি | ভর্ত্তি রহঃ শ্রী | সারত আগম | নারত মানং।

পরে **পজ্ঝটিকা** ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এ শ্রেণীর অন্যান্য ছন্দগুলিকে এই নিয়মে পর্ব্ববিভাগ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব—এগুলি বাংলা ভাষায় সহজে রূপান্তরিত হইতে পারে কি না। **জয়দেবী** বাংলায় বেশ চলিয়াছে—সে জন্য উপরের ছন্দগুলিকে জয়দেবী ঢংএ সাজাইলাম—ছন্দোরসিকগণের বাংলায় রূপান্তরিত করিতে কিছু সহায়তা হইতে পারে।

২+৮+৮+৮+৬ মাত্রা।

ধর | লগ্গই অগ্গি জ | লই ধহধহ কই | দহ পহ দিগমগ | অণলভরে
সব | দেশ পসরি পা | ইক লুলই ধনি | থণহর জহণ দি | আব করে।
ভঅ | লুক্কিঅ থক্কিঅ | বৈরিত রুণিগণ | ভৈরব ভেরিঅ | সদ্দ পলে
মহি | লোট্টই পট্টই | রিউসির টুট্টই | জক্খণ বীর 'হ | মীর' চলে।

ছন্দের নাম লীলাবতী। ভাষা-চয়নের চাতুর্য্যে 'ত্রিভঙ্গীর' লাস্য, 'লীলাবতীর' তাণ্ডবে পরিণত হইয়া বীর হমীর রাণার যুদ্ধযাত্রার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। ত্রিভঙ্গীর সহিত লীলাবতীর তফাৎ মাত্র দুই বিষয়ে। (১) লীলাবতীর পর্ব্বান্তে দীর্ঘ মাত্রা রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় না। (২) এবং পর্ব্বে পর্ব্বে মিল নাই।

২+৮ বা ৯+৮+৮+৬

জা | অহং ভগ্গং তা- | দিঅ লগ্গংতা | পরি হরি হর অ সম | ধর ধরিণী
সো | বহিং ভক্ক গরবক | রুমউ অরু অরক | লোট্টই পিট্টই | তণুধরণী।
পহু | উট্টই সংভলি | কর ণড়ংগুলি | বালতনয় কয় | চহল করে
জা | সীসং গা স্সা | লেওল্ ক্কা কা | কপ্পময়ঃ পুণ্ | রক্খি ধরে।

ছন্দের নাম দণ্ডকলা। পর্ব্বান্তে হ্রস্বদীর্ঘস্বর সন্নিবেশ সম্বন্ধে কোন সতর্কতা দৃষ্ট হয় না। পর্ব্বে পর্ব্বে মিল আছে। তবে কোন কোন পর্ব্বে ৯ মাত্রা আছে—ইহাই যা কিছু বিশেষত্ব। অন্যভাবে সাজাইলে,—

জা অহং ভগ্‌গং | তাদিঅ লগ্‌গং | তা পরিহরি হর | সম ধর ধরিণী | (ক)
জা অহং ভগ্‌গং | তাদিঅ লগ্‌গং | তা- | পরিহরি হর সম | ধর ধরিণী | (খ)

২+৮+৮+৬ মাত্রা

ভঅ | ভজ্জিঅ বংগা | ভংগু কলিংগা | তেলংগা রণ | মুক্কি চলে
মর হট্টা ধিট্টা | লগ্গিঅ কট্টা | সোরট্ঠা ভঅ | পাঅ পলে।
চং | পারণ কম্পা | পব্বঅ ঝম্পা | উত্থি-উত্থী | জীব হরে
কা | সীসর রাণা | কিঅউ পআণা | বিজ্জা হর ভণ | মংতি বরে।

ছন্দের নাম পদ্মাবতী (পউমাবত্তী)। রাণা কাসীসর এ ছন্দে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-ত্রৈলঙ্গ যতই জয় করুন, ত্রিভঙ্গীর সহিত ইহার বিশেষ অঙ্গগত পার্থক্য নাই। কেবল যুক্তাক্ষর বহুল 'গালভরা' শব্দের সমবায়ে ত্রিভঙ্গীর নৃত্যভঙ্গীকে রণযাত্রার উপযোগী পৌরুষপদবিক্রম দেওয়া হইয়াছে। 'ত্রিভঙ্গীতে তিনটী পর্ব্বেই মিল আছে—ইহার কেবল দুটী পর্ব্বে মিল। ত্রিভঙ্গীতে কেবল পর্ব্বান্তে দীর্ঘ মাত্রা রক্ষার চেষ্টা—আর ইহাতে পূর্ব্বের আদ্যন্তে দীর্ঘমাত্রা রক্ষা সম্বন্ধে সাবধানতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু কবি হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রাসংস্থানে পূর্ব্বোল্লিখিত তন্বী চউবোলা মদিরা ইত্যাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়মের অধীন নহেন।

অতিপর্ব্ব অংশ বাদ দিয়া, দীর্ঘ হ্রস্ব স্বর সম্বন্ধে কোন ধ্রুব নির্দ্দেশ না মানিলে এ সকল অতিমাত্রিক ছন্দের যে রূপ হয়—তাহাই জয়দেবীর সম্পূর্ণ অনুগামী এবং তাহাই বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বহুল পরিমাণে চলিয়াছে। পিঙ্গল উহার নাম দিয়াছেন সবৈয়া—

৮+৮+৮+৬ ছন্দহ মত্তহ | পঢ়মহি বিন্দম | মত্ত এমন্তিল | পাঅ পাঅ
সোলহ পক্খ | চহি চই কিজ্জহ | অন্তর অন্তর | ঠাএ ঠাই
চোবীসা দা.| মত্ত ভণিজ্জই | পিঙ্গল জম্পই | জম্পহু সার
অণ্ডহ লহুদ | লহু অদিক্কহ | ণাম সবৈআ | ছন্দ অপার।

পর্ব্বে পর্ব্বে মিল দেওয়া ইচ্ছাধীন। সবৈয়ার পংক্তি লঘু মাত্রান্ত—বঙ্গীয় কবিগণ শেষে লঘুমাত্রার পক্ষপাতী নহেন।

যে সকল ছন্দকে আটটি লঘুমাত্রার পর্ব্বে ভাগ করা যায় সেই সকল ছন্দের উদাহরণ দিলাম—ইহার সকলগুলি গীত্যার্য্যা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। যেগুলিতে হ্রস্বদীর্ঘ স্বর মাত্রার ধ্রুব সন্নিবেশ আছে সেগুলিকে মাত্রাসমক ও বলা যায় না। কিন্তু জয়দেবীকে সামান্য (Genus) ধরিয়া ও-গুলিকে বিশেষ (Species) ধরিলেই অনায়াসে চলে। জয়দেবীতে যে স্বর-সন্নিবেশের স্বাধীনতা আছে, তাহাকে হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের ধ্রুবসন্নিবেশগত সুনিয়মে শৃঙ্খলিত করিয়াই ঐ ছন্দগুলি জন্মিয়াছে ইহাই আমার প্রতিপাদ্য।

শেষ পর্ব্বে ৪ মাত্রার স্থলে ৬।৭।৮ মাত্রার প্রয়োগই অধিকাংশ জয়দেবীর অনুগত ছন্দে দেখা গেল। শেষ পর্ব্বে ৫ মাত্রারও উদাহরণ পাওয়া যায় যেমন—

২+৮+৮+৮+৫ দণ | বক্খ বক্খ হণু | ভিন্ন কুম্ভমত্থ | অধ কংপ খবি | পাম কর
সে | রক্খউ সাকক | অদ্ভুত হুঙ্কর | গোরি পারি অদ্ | ধংগ ধর।

ছন্দের নাম ধত্তা। দুই মাত্রা 'অতিপর্ব্ব'। ১ম দুই পর্ব্বে মিলও আছে। অন্যান্য পর্ব্বে মাত্রাধিক্য বা মাত্রাল্পতার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। প্রথম পর্ব্বে ৭ মাত্রা ২য়পর্ব্বে ৯ মাত্রার উদাহরণ গতবার **স্রগ্ধরা** **মন্দাক্রান্তা** ছন্দ হইতে দিয়াছি। **চুলিআলা** ছন্দে ১ম পর্ব্বে ৮ মাত্রা ২য় পর্ব্বে ৯ মাত্রা থাকে যথা—

৮+৯+৮+৪ রাআ লুদ্ধ স | মাজ খল বহু কলি | হারি পি সেবক | ধুত্তই
জীবন চাহহি | সুক্খ ধাই পরি হর | ধর জই বড্ডণ | হুত্তই।

৮+৫+৮+৩ বি প্প দপণ পম | বেবি পণ • • • | আত কিলম্মহি | হার
পন্না হেরি ক | টন্ত কর • • • | সোলহ কল পথ ধার।

ছন্দের নাম সিংহাবলোক। ইহার ২য় পর্ব্বে ৩ মাত্রা ও শেষ পর্ব্বে একমাত্রা কম। ইহাকে উল্লালাও বলে।* দোহাও ঠিক এইরূপ।

---

* উল্লালার উদাহরণ তিন্নি তুরঙ্গম | তিঅল তই • • • | চক্কচউতিঅ তই | অংত
ইঁমি উল্লাল | উট্ট বহু • • • | বিহুদল ছপ্প ন | মংত।

আবার দ্বিতীয় পর্ব্বে ২ মাত্রা কম অর্থাৎ ৬ মাত্রা—শেষ পর্ব্বে মাত্র দুই মাত্রা। এ ছন্দকে বলে অমৃতধ্বনি।

৮+৬+৮+২—যেক্ক মন্তক বস | সিদ্ধি বুদ্ধি ● ● | করঅনু করণা | অন্ত
ধবল মনউ ধুম | কণউ কিসনু ● ● | বংজেনু মেণো | অন্ত।
পিঙ্ক পঙ্কউ দলি | সুধমর ● ● | পবহংগ মণো | হক্ক
গন্ধপু :সপু নক্ক | চৌক্ক তবক্ক ● ● | সেহক্ক কুম্বুনা | অক্ক।

২য় পর্ব্বে ৬, ৩য় পর্ব্বে ৪, ৪র্থ পর্ব্বে ৬ মাত্রা ধরিয়া পড়িলে বোধ হয় সুশ্রাব্য শুনাইবে।

৮+৬+৪+৬

যেক্ক মন্তক বস | সিদ্ধি বুদ্ধি ● ● | ● ● ● কর অনু | করণা অন্ত।

তারপর কুণ্ডলিকা—১ম পর্ব্বে ৮ মাত্রা, ২য় পর্ব্বে ৩, ৩য় পর্ব্বে ৯ মাত্রা—চতুর্থে ৪।

৮+৩+৯+৪　চলিঅ বীর হম্ | মীর ● ● ● ● ● ● | পাঅ ভর মেইনি | কম্পই
দিগ মগ ণহ অং | ধার ● ● ● ● ● | ধূলি সুর রহ ঝাং | ঝপই
দিগমগ ণহ অং | ধার ● ● ● ● ● ● | আণ খুরসাণক উল্লা
দলমলি দমসি বি | পক্খ ● ● ● ● ● | মারু ঢিল্লী মই | ঢোল্লা।

৮+৬+৬+৪ মাত্রার পর্ব্ববিভাগ করিলেও চলে—

যথা—চলিঅ বীর হম্ | মীর পাঅ ● ● | ভর মেইনি | কম্পই।

গগনাঙ্গ ছন্দে ১ম পর্ব্বে ৭ মাত্রা—২য়ে ৫, ৩য়ে ৮, ৪র্থে ৫ মাত্রা।

৭+৫+৮+৫　ভংজিঅ মলঅ ● | চোল বই ● ● ● | ণিবলিঅ গংজিঅ | গুজ্জরা,
মালব রাঅ ● | মলঅ গিরি ● ● ● | লুক্কিঅ পরিহরি | কুংজরা।

অথবা

৮+৫+৭+৫　খুর সানা খুহি | অ রণ মহঁ ● ● ● | লংঘিঅ অহিঅ | সাঅরা
হম্মীর চলিঅ | হারব ণ ● ● ● | লিঅ রিউ গণহ | কাঅরা।

৪র্থ পর্ব্ব একেবারে বাদ দিয়া তৃতীয় পর্ব্বে দুই মাত্রা কমাইলে যে ছন্দ পাওয়া যায় তার নাম ঝাল্লা। এ ছন্দ দীর্ঘস্বর বহুল এবং ইহার স্বরসংস্থানে ধ্রুবনির্দ্দেশ আছে।

৮+৮+৬+০

কণ্ণা কুণ্ণা | চামর সরা | ঘুগলা জং।—।
বীণা বীণা | গন্ধ অঙ্গুলীগা | প অ লাডং —।
অন্তে কণ্ণা | চামর হারা | দুই কা আ।—।
ব'এলা মং | তা গণ জুত্ত—ভণু মা আ —।

এ অথীরা | দেক্খু সরীরা | ঘর জায়া।—।
বিত্তা পুত্তা | সোঅর মিত্তা | সব মায়া।—
কাহে লাগী | বব্বর বোলা | বসি মুজ্ঝে।—
এক্কা কিত্তী | কিজ্জহি জুত্তী | জই সুঝে।—।

জয়দেব তাঁহার চিরকান্ত ছন্দে মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিতে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহার "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল" সঙ্গীতটিকে একাধিকভাবে পর্ব্ববিভাগ করা যায়।

৪+৮+৬+৮+৩ দিনমণি— | মণ্ডল মণ্ডন | ভব খণ্ডন ● ● | মুনিজনমানস | হংস
কালিয়— | বিষধরগঞ্জন | জনরঞ্জন ● ● | যদুকুল-নলিন-দি | নেশ।

১ম ৪-মাত্রাকে অতিপর্ব্ব মনে করিয়া মূল ছন্দের মতই পড়া যায়,—কেবল ২য় পর্ব্বে ২টী মাত্রা কম আছে—এবং দুই পর্ব্বে মিল আছে—তাহাতে ছন্দের বৈচিত্র্যের সহিত মাধুর্য্য বাড়িয়া গিয়াছে। ২য় পর্ব্বটি, তরঙ্গায়িত ছন্দের ১ম-পর্ব্বের উপ-তরঙ্গের মত তৃতীয় পর্ব্বের কূলের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে— মূলতরঙ্গের উপ-তরঙ্গ বলিয়া ইহা একটু ছোট। ছন্দের পংক্তিতে যে তরঙ্গলীলা জন্মিতেছে—পংক্তিশেষেও সে তরঙ্গের লাস্য-পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে না—তাই আবার পংক্তিশেষে অনুতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে—কবিকে প্রতি পংক্তিশেষে যোগ দিতে হইয়াছে

"জয় জয় দেব হরে।"

জয়দেব চতুর্থপর্ব্বে একমাত্রা বাড়াইয়াও একপ্রকার ঈষৎ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন—যেমন

৮+৮+৮+৫ মাত্রা অলিকুলগঞ্জন | মঞ্জনকং রতি নায়ক শায়ক | মোচনে।
ত্বদধর চুম্বন | লম্বিত কজ্জল | মুজ্জ্বলয় প্রিয় | লোচনে।

আবার চতুর্থ পর্ব্বে একমাত্রা কমাইয়াছেন—তাহাতে পর্ব্ববিভাগে সতর্কতার প্রয়োজন আছে, নতুবা শ্রুতিমধুর হইবে না।

সমুদিত মদনে | রমণীবদনে | চুম্বন বলি ● ● | তাধরে
মৃগমদ তিলকং | লিখতি সপুলকং | মৃগমিব রজ | নী-করে।

শেষাক্ষরদ্বয়ের তিন মাত্রা যদি শেষাক্ষরের দীর্ঘ মাত্রার বদলে তৎপূর্ব্বের অক্ষরের দীর্ঘ মাত্রার দ্বারা নিষ্পন্ন হইত তাহা হইলে উল্লিখিতরূপ পর্ব্ববিভাগের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু—
৮+৮+৮+৩— সমুদিতমদনে। রমণীবদনে। চুম্বনবলিতা। ধরে। সুশ্রাব্য নয়।

মিল পর্ব্ববিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে—মিলের জন্য নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয়ে পর্ব্ববিভাগে সতর্ক হইতে হইয়াছে—

৮+(৬+২)+৮+৪ মাত্রা কিসলয় শয়ন নি | বেশিতয়া চির | মুরসি মমৈব শ | য়ানঃ
কৃতপরি রম্ভণ | চুম্বনয়া পরি | রভ্য কৃতাধর | পানঃ।

ইহার ২য় পর্ব্বে ৬ মাত্রা রাখিয়া—পরে ২ মাত্রাকে অতিপর্ব্ব রূপে—গ্রহণ করিয়া সাজাইলে মিলের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইবে।

কিসলয় শয়ন নি | বেশিতয়া ● ●। কৃতপরিরম্ভণ | চুম্বনয়া ● ●।
চির—মুরসি মমৈব শ | য়ানঃ পরি—রভ্য কৃতাধর | পানঃ।

অর্থাৎ—ইহা অনেকটা প্রাকৃতের অন্ত্যাদি বা দোহার মত শুনাইবে। জয়দেব ১৬ মাত্রায় (২টী পর্ব্বে) এক একটি পংক্তি রচনা করিয়া মিত্রাক্ষরময় যুগ্মক গঠন করিয়াছেন—যেমন

৮+৮+০+০ মাত্রা

(ক) স্মর-সমরোচিত | বিরচিত-বেশা | } (খ) রাসে হরি মিহ | বিহিত বিলাসং।
গলিত কুসুম দর | বিলুলিত কেশা | } স্মরতি মনোমম | কৃতপরিহাসং॥

আবার—১৬মাত্রার বদলে ১৫ মাত্রাও প্রয়োগ করিয়াছেন—

৮+৭ মাত্রা অনিল তরল কুব। লয়-নয়নেন ০। তপতি ন সা কিস। লয় শয়নেন ০।

ছন্দঃ শিল্পীরা ইহাকে পৃথক ছন্দ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন পজ্ঝাটিকা ও অন্যান্য পাদাকুলক শ্রেণীর ছন্দঃ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার সবিস্তার বিবৃতি সম্ভব হইবে। জয়দেব চতুর্থ পর্ব্বে ৫ মাত্রার বেশী আর বাড়ান নাই। তবে ২।১টী পংক্তি এমন পাওয়া যায় যাহার শেষ পর্ব্বে ৮ মাত্রা ও আছে। যেমন

৭+৭+৮+৮ হরি হরি যাহি ০ |—মাধব যাহি ০ | কেশব মা বদ | কৈতব বাদং।

শেষ পর্ব্বে ৮ মাত্রা আছে বটে কিন্তু ১ম ২-পর্ব্বে একটি করিয়া মাত্রা কম। তাহাতে পংক্তিতে বেশ মধুর বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। এ পংক্তি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছন্দের আদর্শ বা নিদর্শন।

হিন্দী কবিরা শেষপর্ব্বে মাত্রা বাড়াইয়া প্রাকৃত কবিদের বেশ সফল অনুকরণ করিয়াছেন। অধিকাংশ হিন্দী ছন্দই প্রাকৃত ছন্দের অনুসৃতি। মিল দেওয়ার ভঙ্গিটি অনেকটা ফার্সী ধরণের।

৮+৮+৮+৮ মাত্রা

ঝূলন দে অব | ঠৈম্ কদম্বন | ঝূলন যৌবন ছাবন দে রী—
রী মধুমত্ত ন | ধূপন পুঞ্জন | কুঞ্জন সোর ম চাবন দে রী—
ক্যোং নহি হৈ মুকু- | মারি কিশোর অ- | লী কল কোকিল | গাবন দে রী—
আবত হী বনি | চৈ ধর কন্তহিং | বীর বসন্তহি | আবন দে রী।

অথবা—ভোর ভয়ে নব | কুঞ্জ সদন তে | আবত লাল গো- | বর্দ্ধন ধারী—
লটপট পাগ ব | রগজী মালা | শিথিল অঙ্গ ডগ | মগ গতি ন্যারী।

৮+৮+৮+৭ মাত্রা

মোর পখা শির | উপর সোহৈ | অধর মুরলিয়া | রাজত বায়
গায় বজায় ন | চাবে অঁখিয়ন | কটিয়া কমরী | সাজত বায়।
থাল লিয়ে সং | বাট বাট মেং | ছুরা ছুহ মোয় | তাকত বায়
হায় ননদিয়া | কা করিহোং মৈং | কহত বাত জিয় | লাজত বায়॥

৭+৮+৯+৭ ব্যাকুল কাম | ন ভাবত মোঁহি | পিয়া বিন নীক ন | লাগত কোই
৮+৭+৯+৭ প্রীতম সোঁ সপ | নে ডই ভেংট | জগী বিধি সোঁ সপ | টহটৈ সোই।

ইহাই প্রাকৃতের সবৈস্বা।

৮+৮ পর্ব্ব বিভাগ না করিয়া যেখানে যেখানে ৭+৯ মাত্রায় পর্ব্ব বিভাগ করিলে ভাল শোনায়

—সেখানে সেখানে ৭+৯ বিভাগই করা যাইতে পারে, হিন্দী কবিগণ ও বৈষ্ণব কবিগণ একই রচনায় দুই প্রকার পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন, এসম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

৮+৮+৮+৬ মাত্রা।

তলফ তলফ কে | বহু দিন বীতে | পড়ী বিরহ কো | ফাঁসড়িয়াঁ
নৈন দুখী দর | সন কো তিরসে | নাভি ন বৈঠে | সাঁসড়িয়াঁ।
রাত দিবস যহ | আরত মেরে | কব হরি রাখে | পাসড়িয়াঁ
'মীরা' কে প্রভু | গিরিধর নাগর | পূরো মনকো | আসড়িয়াঁ।

৮+৮+৮+৫ মাত্রা

নখতেথ 'শবানা | নিলকো নারী | অকবর গাহক | বট মবট
চৌহট্টে তিন | ভাবর চৌতাড়া | বেচৈ কিম রূপ- | পূত বট
বোলয়িত্রী ত- | নৈং নব রোচৈ | ভেদ মূলা-ং | ভোজন
ছিলু নব দি- | লোচে চাটে | পত্তো ন ধরচৈ | ফত্রোপণ।

শেষে স্বরান্ত অক্ষর না থাকায় তেমন শ্রুতিমধুর নহে। শেষে স্বরান্ত মাত্রার একটি উদাহরণ দেই—

মেরা—চিত্ত চকোর হোয় | মাতোয়ারা বব | তেরা নাম সুধা | পান করে
অমৃত সরোবর | নাম হুদ তেরা | তৃষ্ণ পোহাল | দুঃখ হরে।

৪র্থ পর্ব্বে একমাত্রা কম, ৮+৮+৮+৩ ও ৭+৯+৮+৩ দুই রকমই হিন্দী কবির কাব্যে পাওয়া যায়, সুরদাস হইতে উদাহরণ দিই।

৮+৮+৮+৩ লাগ পিয়ারে | প্রাণ হমারে | রহে অধর পর | আয়
সুর দাস প্রভু | কুঞ্জ বিহারী | মিলত নহীং ক্যোং | ধায়।

৭+৯+৮+৩ উরবে সখ | অঙ্গ অঙ্গ প্রতি | বিরহ বেলি কী | নাই
মুকুলিত কুসুম | নৈন নিদ্রা তজি | রূপসুধা সিয় | রাই।
অতি আধীন | হীন অতি ব্যাকুল | কহাঁ লোং কহৌব | নাই
ঐসী প্রীতি | করী রচনা পর | সুরদাস বলি | জাই।

৮+৮+৮+২ মাত্রার পংক্তিও দৃষ্ট হয়।

শোভপরল সির | রবত পনাগী | পিয় সীমন্ত ঠ | নী
ভ্রকুটি কাম কো | দণ্ড নৈন সর | কজ্জল রেখ অ | নী।
ভাল তিলক তা | টঙ্ক গণ্ড পর | নাসা জলজ ম | নী
দশন কুন্দ সর | অধর পল্লব | পীতম মন সম | নী।

ইহার পর্ব্ববিভাগ নিম্নলিখিতরূপও হইতে পারে।

দশন কুন্দ সর | অধর পল্লব | পীতম... , মন সমনী।

দ্বিতীয় পর্ব্বে ৮ মাত্রার বদলে ছয় মাত্রাও আছে।

সেবক ভইয়ে মু | তৌন তৌন • • | কছু সমৈন বুঝে।
স্বামী ভয়ে মু | কৌন কৌন • • | সেবা নহিঁ বুঝে।

ইহাকে হিন্দী ছপ্পয় ছন্দ বলে। ৩য় পর্ব্বে ছয় মাত্রা লইয়া ৪ পর্ব্বে ভাগ করাও চলে।

সেবক ভইয়ে মু | তৌন তৌন • •। কছু সমৈ ন • • | বুঝে।

একেবারে শেষ পর্ব্ব বাদ দেওয়ারও উদাহরণ আছে।

৮+৮+৮ কমল লোচন শ্রী | বল মঁজীর কল | ধৌত কলণ হর
উচ্চ মিলন অতি | কঠিন দমক বহ | শ্যাম নীলধর।
সম্বর শরবর | হৈম মেরু কৈ- | লাশ প্রকাশন
নিশি বাসর ভজ | বরহিঁ কাঁস কুন্ | দন দৃঢ় আসন।

শেষে দীর্ঘস্বর না থাকায় শেষটা যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—শেষে দীর্ঘস্বর প্রয়োগেরও উদাহরণ আছে। যথা—জিহি সুমরন ধরি | হাম কছু দগ সুগম ন কীনো।••

জিহি সুমরন ধরি | হাম কছু পর | কাজো ন কীনে

২য় পর্ব্বে ৫ মাত্রা শেষ পর্ব্বে ৫ মাত্রা প্রয়োগ করিলে সংস্কৃত ছন্দের মতই মধুর শুনায়।

পাপ মোহ হর | আপ মম— | কোঃ ছুড়ায় নহিঁ | মু পাবৈ
আ- | নন্দ কন্দ ব্রজ | চন্দ্র জব... | করুণা নিধি কিয় পাঃ করৈ।

'আ' এখানে অতিপর্ব্ব। ২য় পর্ব্বে ৫ মাত্রা শেষ পর্ব্বে ৩ মাত্রার ছন্দের উদাহরণ।

রতনা কর দা | নিত্য সদা • • • | পরমানন্দ দি | দীন
অমল কমল কর | নীর রুর • • • | রমা কি নাথ প্র | দাপ।
রাম প্রবীণ কি | সারদা • • • | শুচি রুচি রাজত | অঙ্গ
বীণাপুস্তক | ধারিণী • • • | রাজহংস সুত | সংগ।

৮+৫+৮+৩ প্রেম ধুতা রস | রূপিনী • • • | উপজাবত সুখ | পুঞ্জ
সুন্দর শ্যাম বি | লাসিনী • • • | নববৃন্দাবন | কুঞ্জ

উপরের পংক্তিকে অন্যভাবেও সাজান যায়, যেমন—

৮+৭+৬+৩ প্রেম সুতা রস | রূপিনী উপ | জাবত সুখ | পুঞ্জ
সুন্দর শ্যাম বি | লাসিনী নব | বৃন্দাবন | কুঞ্জ।

আবার ২য় পর্ব্বে ৩ মাত্রা রাখিয়া চতুর্থ পর্ব্বে ৫ মাত্রাপ্রয়োগের উদাহরণও পাওয়া যায় যেমন—
৮+৩+৮+৫

উদয় অদ্রি দ্রু | বপু | আস্থ সুধ চিত্র | ভানু ইবি
ধূমধ্বজ জল | যোনি | বিভাবসু নীতি | গোত্র ঊর্মি

ভাং দেব স্তুত | ঝাণি | নিশিচর তুল | তুল্য মদ
কালী ছ ক্রব | চণ্ড | বাহু প্রাণচ- | ক্রোধানল।

৮ মাত্রার তিনটি পর্ব্বেও সাজান যায়—কিন্তু শুনিতে সুশ্রাব্য হইবে না।

৮+৩+৮+৪ মাত্রাও দেখা যায় —

মাতুর মধুপ স | মান ... | রূপ তাতা জিমি | জ্ঞানৈ
শত্রু চোর নিজ | দাস ... | লোকে আজ্ঞা সব | মানৈ
সিংধু চোর জল | বিন্দু | ইন্দু সম চোর | দিবাকর
অনল করে শো | শূন | তুল সম চোর ধরাধর

এখানে 'জ্ঞানৈ-মানৈ'র মত 'দিবাকর' 'ধরাধর,—৪ মাত্রা।

ইহাকে হিন্দীতে **কুণ্ডলিকা** ছন্দ বলে, প্রাকৃতের কুণ্ডলিকার হিন্দীরূপ। ২য় পর্ব্বে ৫ মাত্রা যুক্ত এই ছন্দকেই প্রাকৃতে **সিংহাবলোক** বা **উল্লালা** বলে। **দোহার ছন্দের** পর্ব্ব বিভাগ করিলেও এমনিই দাঁড়ায় -তবে উচ্চারণের গুণে ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটে -প্রাকৃতের দোহার উদাহরণ-

৮+৫+৮+৩ কবহুঁ নহো | শোভিনী | চাঁদ সেনি তত | ভক্ত
বাঘ চেন তু- | লংক পিছ | সত্ত বধু নিদ | কংধ।

হিন্দীতে—

দুখ মেং সুমিরন | সব করৈ | সুখ মেং করৈ ন কোয়
জো সুখ মেং সুমির | ন করৈ | তো দুখ কাহে | হোয়:

মাত্রাবিভাগে সিংহাবলোকের সহিত ইহার প্রভেদ নাই--কিন্তু সিংহাবলোক বা উল্লালা ছন্দের আবৃত্তি মন্থর এবং হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের পার্থক্য রাখিয়া চলে। দোহার আবৃত্তি দ্রুত বা জলদ—হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের প্রতি সর্ব্বত্র দৃষ্টি রাখেনা এবং দ্রুত আবৃত্তিতে অকারান্ত শব্দগুলি হসন্ত হইয়া উচ্চারিত হয়—ছন্দের তরঙ্গ তাহাতে ঘন ঘন উত্থিত হয়। ফলে বাংলার ছড়ার ছন্দের ন্যায় syllablic বা স্বরবৃত্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাকে নিম্নলিখিত রূপ ভাগ করা যায়।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
ইক্—দিন্—ঐ—সা | হো—য়—গা—* | কোউ—কা—হূ—কা | না—হি
ঘর্—কী—না—রী | কো—ক—হৈ * | তন্ — কী—না—রী | জাঁ—হি

উচ্চারণ কালে ১।৩।৫।৭।৯।১১।১৩ পদকে স্বরোদ্ঘাত (accent) দিয়া পড়িতে হইবে—বাংলা ছড়ার ছন্দের সহিত তফাৎ এইখানে। বাংলা ছড়ার ছন্দে স্বরোদ্ঘাত তেমন স্পষ্ট বা নিয়মিত নহে—তা ছাড়া ছড়ার ছন্দে ২য় পর্ব্বেও ৪টী পদক থাকে—ইহাতে সাধারণতঃ তিনটী। দোহা ছন্দে ১ম ও ৩য় পর্ব্বে পদক সংখ্যা ৪টীর বেশীও থাকে দ্রুত উচ্চারণে সে ত্রুটী সারিয়া যায় যেমন—

১　২　৩　৪　৫　৬　৭　৮　৯　১০　১১　১২　১৩　১৪　১৫
অব্—ল—গি—ভক্—তি | স—কাম—হৈ—০ | তব্—ল—গি—নিষ্—ফল্ | সেব
১　২　৩　৪　৫　৬　৭　৮　৯　১০　১১　১২　১৩　১৪　১৫
ক—হ—ক—বীর্—ব—হ | কোাং—মি—লে—০ | নিঃ—কা—মো—নিজ্ | দেব।

অথচ ইহাকে মাত্রিক ছন্দোনুযায়ী মাত্রা বিভাগ করিলে এবং হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ বৈষম্য রক্ষা করিয়া বিলম্বিত ভাবে পড়িলে, ইহার অন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন নিয়মটী ধরা পড়িবে।

৮+৫+৮+৩

অব লগি ভক্তি স | কাম হৈ • • • | তব লগি নিষ্ফল | সেব
কহ কবীর বহ | কোাং মিলে • • | নিঃ কামো নিজ | দেব।

২য় পর্ব্বে মাত্রা যথাক্রমে ১।২।৩।৪।৫ মাত্রা কমাইয়া দিলে ছন্দের বৈচিত্র্যের সহিত তাহার গতির হিল্লোল বাড়িয়া যায় এবং দ্রুত আবৃত্তিকে প্রবর্ত্তিত করে। এই বৈচিত্র্যটুকু হিন্দীকবিগণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাই অধিকাংশ হিন্দী কবি কুণ্ডলিকা ও দোহা ছন্দে তাঁহাদের কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। দ্রুত ও বিলম্বিত দুই ভাবেই পড়া যায় বলিয়া দোহা ছন্দেই বিবিধ বিষয়ের ও নানারসের কবিতা রচনাও সম্ভব হইয়াছে। কবীরের দোহাগুলির সহিত বাঙ্গালী পাঠকগণ বিশেষ পরিচিত। মাত্রা গণনায় যাহা ২৭।২৮ মাত্রার পাঁচটা জয়দেবী তাহাতে অকারান্ত অক্ষর গুলিকে হসন্তান্ত করিয়া দ্রুত পড়িলে দোহার মতনই শুনাইবে।

৮+৮+৮+৩

বারহিঁ বার- | প্রণাম কর্ক অব | হর সোক সমু | দাই
বালপনে তে | মীরা কীন্হীং | গিরিধর লাল মি তাই।

মাত্রা গণনায় পাঁচটা জয়দেবী অথচ ইহাকে দ্রুত পড়িলে

বার্—হিঁ—বার্—প্র | ণাম্—ক—র্ক—অব্ | হ—রো—শোক্—সমু, দাই
বাল্—প্—নে—তে | মী—রা—কীন্—হীং | গির—ধর্—লাল্—মি | তাই

গুজরাতীতে জয়দেবী ছন্দের যে অনুকরণ পাওয়া যায় তাহাকেও দ্রুত ও বিলম্বিত দুই ভাবেই পড়া যায়—গতিবৈষম্যে দুই প্রকার ছন্দের মত শোনায়।

বিলম্বিত ৮+৮+৮+৫ মাত্রা

মগ্যা বে হু:- | না নে কাছে | লিবৈ জোৎ। নে হূঁ | পালে নক্কঁ
পীর পাসে দিন | দুহেলা চালে | ঘড়ী ঘনশী সেই | কেব এক।

দ্রুত ৪+৪+৪+৪ পদক।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

স্বা — রা—রে — হ্বা | ল া—নে—কা—জে | রি—দৈ—জো—বা—নে | হঁ —ধ্যান্—ধ—রুঁ
পীব্—পা—খে—দিন | হু—হে—না—জা—য়ে | ঘ — ড়ী—বর্ —সাঁ | সৌং —কেম্—ভ—রুঁ

জয়দেবীর একটি পর্ব্বকে গোটাই বাদ দিয়া তুলসীদাস ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

৮+৮+২ বা ৩

নব সুবরণ সুদ— মংকের প্রথর ন শিব মুখ সবদ ক— মন ভিমি কেমি কহি
বোর। ন্যায়।
বীর অংগ নদি কোবন কনক ক— নিশি মলীন বহ নিশি দিন বড় বিপ—
ঠোর। লায়।

এ যেন জয়দেবের 'দশাবতার' স্তোত্রের পংক্তি বিশেষের কতকটা অনুসরণ :—

প্রলয়পয়োধি-জ- | লে ধৃতবানসি বেদং | বসতি দশন শিখ | রে ধরণী তব | লগ্না। ইত্যাদি।

হিন্দীতে ইহাকে বলে—ঝুলনা ছন্দ।

অতিপর্ব্ব মাত্রাযোগে যে ছন্দের মাধুর্য্য বাড়ে তাহা হিন্দী কবিগণ লক্ষ্য করিতেন। প্রাকৃতের দুর্ম্মিলার অনুকরণে কবি রঘুরাজ সিংহ প্রতি পর্ব্বার্দ্ধ দীর্ঘ মাত্রায় আরম্ভ করিয়া সুনিয়মিত ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। চউবোলা ও দুর্ম্মিলার সহিত মিলাইয়া পড়িলেই অভিন্নতা বুঝা যাইবে।

২+৮+৮+৮+৬ মাঃ—

মুখ—দেখতঃ মন | মোহন কো অতি | শোহন জোহন | লাগি রহৈ
নহি—নৈন হিলৈ নহি | বৈন চলৈ নহি | বায় মিলৈ নহি | শীশ নহৈ।
ব্রজ—বালন চাল ন- | থো অব লাল উ- | তান কিয়ো উর | আন ভবৈ
রঘু—রাজ বিলাস মেং | চাল হুলাস সোং | পূরণচৈক থির | আন সবৈ ॥

অথবা ঐশ্বরী প্রতাপের—

মোহ কো জান | পসার চহুঁ • • ।
দিশি—সংতত খেলত | কাল অহেরো।
ছোড়ি সবৈ ভ্রম | জান নিরং • •
তব—জীবন মেং রস | হে মন মেরো।

প্রথম পর্ব্বে ৮ ২য়ে ও ৩য়ে ৬ এবং ৪র্থে ৪ কিংবা ৩ মাত্রা যোগে একপ্রকার দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের সৃষ্টি হয়। ইহাতে ২য় ৩য় পর্ব্বে সুর নামিয়া চতুর্থ পর্ব্বে উঠিয়া শেষ হয়, যেমন,—

ঠৌর ঠৌর লখি | ঠৌর রহত • • | মন মথ লো ভারী—
বিহরত বিবিধ বি | হার ভরী • • | গিরি পর গি রি • • | ধারী—।

অন্তভাবেও সাজান যায়—

ঠৌর ঠৌর লখি | ঠৌর রহত মন | মথ লো ভারী।

অথবা— ঠৌর ঠৌর লখি | ঠৌর রহত মন | মথ লো• • • • | ভারী।
জীতি যোগ কর | তোপ জীতি বহ | যোগ ব— | ড়াবৈ
জীতি কবে—উৎ | যোগ জীতি বৈ | কৈব ক— | রাবৈ।

বৈতাল কবি ২য় পর্ব্বে ৭ মাত্রা রাখিয়া শেষপর্ব্বে একমাত্রা বাড়াইয়া অর্থাৎ ৫ মাত্রা প্রয়োগে ছন্দের ঈষৎ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

জক হৈ নিজান | রাজা মরৈ • | সবৈ নীরব ভরি | সোইহৈ
বেতাল কহৈ | বিক্রম সুনো • | এতে মরে ন | রোইহৈ।

অথবা চন্দবরদাইএ—

তব চলন বেহ | গুঞ্জর গগন • | সকুল বংর দিশ | অপ্‌ন বন
আনন্দ উচ্চাচ | সমুদ্র সিখর • | বজ্জ নক নী | নাল ঘন।

হিন্দী কবিগণ অধিকাংশ কবিতা খাঁটী জয়দেবীতে হ্রস্বায়িত বা দীর্ঘায়িত জয়দেবী পর্ব্ববন্ধে অথবা দোহা ছন্দেই রচনা করিয়াছেন। জয়দেবী ও দোহার নির্দ্দিষ্ট মাত্রা গণনা ঠিক রাখিয়াছেন বলিয়াই এ প্রসঙ্গে তাঁহাদের ছন্দ আলোচিত হইল। ঐ ছন্দগুলিকে দ্রুত পড়িলে ছন্দোহিল্লোলের পার্থক্য জন্মে—এবং ঘন ঘন হসন্ত প্রয়োগে সে হিল্লোল এমন চঞ্চল হইয়া উঠে যে পৃথক ছন্দ বলিয়া মনে হয়। হিন্দীতে উচ্চারণ চাঞ্চল্যে জয়দেবীর যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে—বর্ত্তমান বাংলা কাব্যে হসন্তবহুল শব্দপ্রয়োগে ঠিক সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—এ কথা প্রবন্ধান্তরে দেখান হইবে। বৈষ্ণব কবিগণ এ-ছন্দে কি প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্বিষয়ের আলোচনায় পরবর্ত্তী প্রবন্ধের কথারম্ভ হইবে।

শ্রীকালিদাস রায়।

মল্লিক-পুকুর

এবার অনেকদিন পরে মফঃস্বলে যাইতে হইল। মোকদ্দমাটা জটিল, তদারক করিতে অনেক সময় লাগিবে।

বেলা বারটায় গ্রামে পৌঁছিলাম। দু'ধারে ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ-লতা, মধ্যে মধ্যে এক একটা ডোবা-পুকুর অতি সঙ্কুচিত হইয়া তাহাদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে, এবং তাহাদেরই আশ-পাশ দিয়া আমার পাল্কী-বাহকেরা শব্দ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। সঙ্গে আমার ভৃত্য রাখাল। গ্রামটা নাকি তাহার জন্মস্থান। তাই সে মহা উৎসাহ সহকারে আসিয়াছে।

জনহীন ছায়া-শীতল এই গ্রাম্যপথ আমাদের অকস্মাৎ আবির্ভাবে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুই পাশের বৃক্ষশ্রেণী তাহাদের সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিয়া নির্নিমেষ-নেত্রে আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। কয়েকটা শৃগাল দিবাভ্রমণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে সরিয়া গেল।

প্রান্ত ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে পৌঁছিলাম। এইবার আরও নূতন দৃশ্য আমাদের চোখে পড়িতে লাগিল। বিচিত্র বন-জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীনত্বের ধ্বজা মস্তকে লইয়া বড় বড় বাড়ী ধ্যানমগ্ন যোগীর মত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীগুলোকে দেখিয়া গল্প-কাহিনীর নিদ্রিতপুরীর কথা মনে পড়িল। কত যুগ হইতে ইহারা নিদ্রিত হইয়া আছে, কে জানে! এক কালে প্রতি গৃহ হইতে অশ্রান্ত কলকণ্ঠ বাতায়ন-পথ দিয়া ভাসিয়া আসিয়া পথিকের দৃষ্টি আহ্বান করিত,—কিন্তু আজ পথে পথিকও নাই, গৃহে কণ্ঠস্বরও নাই।

বাঁশের খুঁটির উপর মাচা প্রস্তুত করিয়া একটা দোকান বসানো হইয়াছে,—একটা বড় সিগারেটের বাক্সে এক গাদা বিড়ি ও এক গোছ পান সম্মুখে লইয়া একটা লোক আপাদ-মস্তক কাপড় মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। শুধু তাহার চোখ দু'টো দেখা যাইতেছে। একান্ত বিস্মিত-দৃষ্টিতে সে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

বোধ হয় লোকালয় আরম্ভ হইল। দু'এক জন করিয়া লোক আমার পাল্কীর পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া, একবার পানিয়া দেখিয়া লইল। গ্রামটা যে বড়, সে-বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

একটা চার মহল সুবৃহৎ বাড়ী দেখিলাম। বাহিরের সুদীর্ঘ থামগুলোর চূণ বালি খসিয়া ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ফটকটা ভাঙ্গিয়া গিয়া এক কোণে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া আছে। বাহিরের আদি-অন্ত-হীন প্রাঙ্গণে স্থানে স্থানে ভগ্নমূর্ত্তি ও ফোয়ারার ভগ্ন আবরণ দেখিয়া মনে হইল, এক সময়ে এই স্থানে কোন ধনী বিলাসীর রমণীয় পুষ্পোদ্যান ছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এইটে রাজবাড়ী। রাজবংশে কেহই আর জীবিত নাই। এক দূর আত্মীয় প্রতি বৎসরে খাজনা আদায় করিবার সময় একবার করিয়া এখানে পদার্পণ করেন, এবং সেই সময়েই যা গৃহটার একটু-আধটু সংস্কার হয়।

থানায় নামিলাম। একটি দারোগা ও গুটি কয়েক চৌকিদার,—এই লইয়া থানা। এই খানেই কার্য্য আরম্ভ হইল। আমার আগমন-সংবাদ ইতিমধ্যেই পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহারা আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, তাহারাও ধীরে সুস্থে আসিতেছে। পুলিশ-স্পর্শ হইতে যতদূর সম্ভব আত্মরক্ষা করিয়া একটু দূরে দূরে থাকিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে অস্ফুটস্বরে গুঞ্জন করিতে লাগিল।

গাছ-পালার মধ্য দিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। সেদিনের মত আমার কাজ শেষ হইল। দারোগা বাবু আমাকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া চলিলেন।

একটা পরিত্যক্ত গৃহ যতটুকু সম্ভব সংস্কৃত হইয়া আমার বাসস্থান হইয়াছে। এটা আগে গ্রাম্য স্কুল ছিল, ইদানীং ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায়, এবং অর্থের অভাবে স্কুল তুলিয়া দিয়া বাজারের মধ্যে আটচালায় মাইনর স্কুলের প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে। অল্পদিনের পরিত্যক্ত বলিয়া গৃহের অবস্থা ভালই আছে। থানা হইতে একটা টেবিল ও একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার আনা হইয়াছে। ক্যাম্প-খাট আনিয়াছিলাম, রাখাল তাহা বিছাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিল পুলিশ থানা হইতে কালি-পড়া দু'টো লণ্ঠন আনিয়া দিল। দারোগা বাবু সবিনয়ে জানাইলেন, উচ্চ বংশের জনৈক পাচক দ্বারা আমার খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে, অবিলম্বে লইয়া আসিবে। ইহা ছাড়া অন্য কিছুর আবশ্যক হইলে জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিবেন। আমি ধন্যবাদ জানাইয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম।

দারোগা চলিয়া গেলে প্রকোষ্ঠের চারিদিকটা দেখিয়া লইলাম। কড়িকাঠে পক্ষীবিশেষের অসংখ্য বাসার চিহ্ন রহিয়াছে। আমার আগমন উপলক্ষে সম্ভবতঃ আজই বেচারাদের বাসস্থানগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোণের দিকে একটা বোলতার চাক—পুলিশ-পুঙ্গব বোধহয় সেটায় হস্তার্পণ করিতে সাহস করে নাই। জানালায় উই-মাটির অল্প অল্প দাগ রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকের জানালাটা বন্ধ ছিল, আমি জোর করিয়া খুলিয়া দিতেই ক্যাঁচ করিয়া একটা শব্দ করিয়া মরিচাধরা দু'টো কব্জা ভাঙ্গিয়া গিয়া একপাটি জানালা ঝুলিয়া পড়িল। জানালার নীচেকার ঝোপ হইতে একটা ঘন গন্ধ ভাসিয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম এই দিকটায় অত্যন্ত জঙ্গল। ও-পাশে একটা পুকুর। পুকুরটা বেশ বড়,—অর্দ্ধেকটা পানা ও পাতায় ভরিয়া আছে। পাড় দেখা যায় না, নিবিড় ঝোপে ঢাকিয়া আছে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারের সহিত পুষ্করিণীর জল মিশিয়া গিয়া গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সেই কৃষ্ণতার চতুষ্পার্শে কলমি-লতা ও ঝোপগুলো অন্ধকারেও বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টি আর একটু অগ্রসর করিয়া দেখিলাম পুকুরের অপর পার্শ্বে একটা অট্টালিকার কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। জঙ্গলের ফাঁক দিয়া যেটুকুও বা দেখিলাম, অন্ধকারে তাহাও অস্পষ্ট ঠেকিল। সহসা এক ঝলক শীতল বাতাস বহিয়া গেল। জানালা হইতে সরিয়া আসিলাম।

রাখাল কিজন্য বাহিরে গিয়াছিল। ঘরে আসিতে বলিলাম, হ্যাঁরে রাত্রে সাপ ঢুকবে না ত ?

রাখাল পূর্ব্বদিকের জানালাটা খোলা দেখিয়া বলিল, ওদিকটায় বড় জঙ্গল, বাবু, বন্ধ করে দিই।

বলিলাম, জানালার কব্জা ভেঙ্গে গেছে, বন্ধ হবে না।

রাখাল অনেক চেষ্টার পর এক দিকটা বন্ধ করিল, এক দিকটা তেমনি খুলিয়া রহিল। তাহার পরও সে কিছুক্ষণ জানালা দিয়া বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিলাম বহুকাল পরে জন্মস্থানে আসিয়া তাহার ভাবান্তর হইয়াছে। বলিলাম, হাঁরে তোদের বাড়ীটা কোন্ জায়গায়?

রাখাল বলিল, থানার আরও পশ্চিমে, গয়লা-পাড়ায়। সে বাড়ীর কি আর এখন কোন চিহ্ন আছে বাবু!

পুনরায় বলিলাম, গ্রামে তোর জানাশুনো লোকের সঙ্গে দেখা করলি না?

রাখাল বলিল, জানাশুনো লোক কি আর গ্রামে আছে বাবু? আমার ছ'বছর বয়সে আমাকে নিয়ে বাবা গ্রাম ছাড়া হয়। সে-সময়কার লোকেরা সব মরে গেছে, নয় গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। যদি কেউ থাকে কাল খোঁজ ক'রে দেখবো।

রাখালের কণ্ঠস্বরে অনুরাগ বা বিষাদের লক্ষণমাত্রও পাইলাম না। সে জানালা হইতে সরিয়া দোরের পাশটা কাপড় দিয়া ঝাড়িতে লাগিল, বোধহয় এইখানেই তাহার শয্যা হইবে।

অকস্মাৎ মনুষ্যগাত্রের গন্ধ পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসিয়া আমাদের ও আলোকের চতুষ্পার্শে নৃত্য এবং সঙ্গীত করিতে লাগিল। চারিদিকে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। তাহার পরই এক গভীর নীরবতায় সমস্ত গ্রামখানি ডুবিয়া গেল। চতুর্দ্দিক হইতে ঝিল্লিরব ভাসিয়া আসিয়া সেই নীরবতাকে যেন আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল।

বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অন্ধকারে সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। রাখালকে বলিলাম, একটা চৌকিদারকে রাত্রে এখানে থাকতে বললি না কেন?

রাখাল বলিল, দারোগা বাবু নিজে হইতেই সে ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিয়াছেন। মনে মনে দারোগা বাবুর দূরদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না।

আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। অসংখ্য মশককুল পরিবেষ্টিত হইয়া হাতলভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া, টেবিলের উপর কাগজপত্র খুলিয়া আমি কাজে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম।

আহারাদির পর শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার মশারিটা চারিপাশে ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া রাখাল মাটিতে নিজের জন্য বিছানা প্রস্তুত করিল, তার পর আলোটা কমাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

অনেক চেষ্টা করিলাম, ঘুম আসিল না। রাখালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। থানা হইতে কখন চৌকিদার আসিয়া বাহিরের বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছে, জাগিয়া থাকিয়া তাহার খুটখাট শব্দ শুনিতে লাগিলাম।

একবার শব্দ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। রাখাল বলিয়া উঠিল, বাবু ঘুমোন নি?

একজন সঙ্গী পাইলাম জানিয়া বিশেষ আনন্দ হইল। কিন্তু কেমন একটু লজ্জাবোধও হইল। বলিলাম, ঘুম আসছিল, হঠাৎ ভেঙ্গে গেল।

রাখাল বলিল, নতুন জায়গা কিনা।

কথাটা ঠিক নয়। কারণ আরও অনেক নূতন স্থানে গিয়াছি—সেখানে সুনিদ্রার মোটেই অভাব হয় নাই। তথাপি প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিল না।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা অপেক্ষা কথা বলা ভাল। কি কথা আরম্ভ করিব ভাবিতে গিয়া ভাঙ্গা জানালাটায় নজর পড়িতে বলিলাম, রাখাল!

রাখাল তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, আজ্ঞে!

ও-পাশের পুকুরটা ত খুব বড়! ওটা কাদের রে?

রাখাল বলিল, ঐ জানলার দিকের? ওটা মল্লিক পুকুর। পুকুরের ওপারে একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়ী, কাল সকালে দেখতে পাবেন, সেইটে ছিল মল্লিকদের বাড়ী। পুকুরটাও ছিল ওদেরই।

বলিলাম, বাড়ীটা দেখেছি। মল্লিকদের কেউ বেঁচে নেই বুঝি?

রাখাল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না বাবু, বংশে বাতি দেবার কেউ নেই

একটু দুঃখ অনুভব করিলাম। কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী দুঃখ হইল, কথা শেষ হইয়া গেল বলিয়া।

একটু পরে রাখাল বলিল, এই পুকুরের পাড় খুঁড়লে অন্ততঃ পাঁচ শ' মাথা পাওয়া যাবে, বাবু।

এত বড় কথাটা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে কি রে

রাখাল বলিল, হ্যাঁ বাবু! আমার ঠাকুরদাদার মাথাও বোধ হয় এইখানেই কোথাও পোঁতা আছে।

রাখালের স্বরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল ঘরের অন্ধকার নিঃশব্দে কান পাতিয়া রাখালের কথা শুনিতেছিল। সেও যেন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। চকিতে আমার দৃষ্টি জানালার দিকে পড়িল। তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া লইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমার আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মনে পড়িল, আমি প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ-রাজের স্থূল বেতন ভোগী রাজ-কর্ম্মচারী। আমার হুকুম তামিল করিবার জন্য এ গ্রামে লোকের অভাব নাই। যেন কিছুই নয়, এরূপ ভাব করিয়া বলিলাম, এতগুলো মাথাকে এই পুকুর পাড়ে আশ্রয় দেবার জন্যে কার এত মাথাব্যথা হ'ল? কোন বড় দরের ডাকাতের বুঝি?

রাখাল একটু থামিয়া বলিল, বড় দরের ডাকাত বৈকি বাবু! ঐ যে মল্লিকদের বাড়ীটা দেখেছেন, ওই এক ডাকাত, আর ওই রাজবাড়ীর রাজা আর এক ডাকাত।

ডাকাত আবার রাজা হয় কিরূপে, কিরূপেই বা গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া, দীর্ঘিকা খনন করিয়া পুত্রকলত্রাদি লইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে, কিছুই বুঝিলাম না। ভাবিলাম, হয়ত সেকালের আইন বাঁচাইয়া ইহারা ডাকাতি করিত, এবং সেই লুণ্ঠিত ধনরাশি লইয়া রাজা হইয়া বসিয়াছিল। এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান-লাভ করিবার পূর্ব্বেই রাখাল পুনরায় বলিল, এত বড় দুই বংশে আর কেউ বেঁচে নেই, বাবু। একেবারে নির্ব্বংশ। কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, এমনিই হয় বটে!

আমার কৌতূহল পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠিল। বলিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধটা হ'ল কেন?

সে বাবু অনেক কথা! বলিয়া রাখাল শয্যায় উঠিয়া বসিল। ঘুম আসিতেছিল না, সহসা একটি গল্প শুনিবার আশা দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলাম। বাহিরে পাহারাওয়ালার খুট-খাট শব্দ থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে মশক-সঙ্গীত দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার সহিত বাহিরের ঝিল্লি-রব মিশিয়া এক বিচিত্র সুরের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষণকাল পরে রাখাল তাহার তস্কর-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।—

* * * * *

রাজবাড়ী এবং মল্লিকবাড়ীর বংশপরম্পরাগত বিবাদটা যে ঠিক কোন পুরুষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কেহই জানে না। তখনকার দিনে গ্রামের অতিবৃদ্ধদের মুখে শুনা যাইত, কোন জমিদখল লইয়া উভয় পরিবারের বিবাদের সূত্রপাত হয়। তাহার পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে এত অন্তরঙ্গতা ছিল যে, লোকে ইহাদের এক পরিবার বলিয়াই ভাবিত।

বিবাদের সূত্র যেখানেই থাকুক, বৎসরের পর বৎসর উভয়ের শত্রুতা যে বাড়িয়াই চলিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শেষে ব্যাপারটা এমনি দাঁড়াইল যে একপক্ষের লাঠিয়াল অন্যপক্ষের লাঠিয়ালের সহিত রাস্তায়-ঘাটে সাক্ষাৎ পাইলে, একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান না করিয়া ছাড়িত না। এবং যে-পক্ষ জয়লাভ করিত, সে-পক্ষের মনিব তাঁহার ভৃত্যকে সবিশেষরূপে পুরস্কৃত করিতেন।

রাজকুমারের জমিদারীর নাকি আদি-অন্ত ছিল না। তাঁহার সুবৃহৎ রাজবাড়ীর বাহির মহলে প্রত্যহ শতাধিক রাজ-কর্ম্মচারী কাজ করিতেন। জমি রক্ষার জন্য তিনি দেশ বিদেশ হইতে বাছা বাছা লাঠিয়াল আনাইয়া টাকা দিয়া তাহাদের নিজের জমিদারীর মধ্যে রাখিয়া দিতেন। এই সকল বিদেশী জীবগুলির হস্তে প্রজাগণের জীবন পদ্মপত্রে নীরের মত টলমল করিত। কিন্তু শোনা যায়, রাজকুমারের হৃদয়ে দয়া নামক একটি পদার্থ ছিল, যাহার গুণে, তিনি প্রজাদিগকে যেমন শাসন করিতেন, তেমনি তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিলে তাহা মোচন করিতে মুক্তহস্তে দানও করিতেন। পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রজারা তাঁহাকে যেমন ভয় করিত, তেমনি ঘৃণাও করিত; এবং শেষোক্ত কারণে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। স্বর্গ-পথে রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, প্রজাগণের মনোপথে রাজা রাজকুমারের ঠিক সেই অবস্থা ঘটিল।

মল্লিক পরিবার রাজসূচক বিশেষণে বিশিষ্ট না হইলেও, কার্য্যতঃ গ্রামের মধ্যে দ্বিতীয় রাজগৃহ ছিল। এ বাড়ীর কর্ত্তা মল্লিক মহাশয়ের জমি-জমা খুব বেশী ছিল না বটে, কিন্তু তাহার শোক তিনি নগদ টাকায় মিটাইয়াছিলেন। মল্লিক বাড়ীতে অনেকগুলি গুপ্ত-ঘর ছিল। তাহারই একটা নাকি স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিল। কিম্বদন্তী আছে, মল্লিক-মহাশয়ের কোন পূর্ব্বপুরুষ ডাকাতদলের সর্দ্দার ছিলেন, এবং তাঁহারই লুণ্ঠন-প্রাপ্ত অর্থ মল্লিক-পরিবার বংশের পর বংশ ভোগ করিয়া আসিতেছে।

মল্লিক-মহাশয় এবং রাজকুমারের আমলেই উভয় পক্ষের বিবাদটা একেবারে চরম-সীমায় গিয়া পৌঁছায়। উভয়েই অনন্যকর্ম্মা হইয়া লাঠিয়াল-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। রাজকুমার বিদেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইতে লাগিলেন। মল্লিক মহাশয় সে-সকল কিছুই করিলেন না। গ্রামের গোয়ালাপাড়ার সমস্ত লাঠিয়ালরা তাঁহার পক্ষে ছিল। তা ছাড়া গ্রামের অন্যান্য লাঠিয়ালরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকলেই তাঁহার পক্ষে ছিল। তিনি তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া ভবিষ্যতের ঝটিকার জন্য প্রস্তুত হইতে ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন।

এই মল্লিক মহাশয়ের এমনি একটা ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে সমস্ত অনুচররা প্রাণ দিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হইত না। তাঁহার ক্রোধ এবং হৃদয়হীনতা অতি বিখ্যাত ছিল। শিশু-বালকেরা যেমন কচু নামক উদ্ভিদবিশেষকে কর্ত্তন করিতে আনন্দ পায়, তিনিও শত্রুর বা শত্রু পক্ষীয়ের ধড় হইতে মস্তক বিচ্যুত করিতে তেমনি আনন্দলাভ করিতেন। তাঁহার একটা বিশেষ গুণ ছিল, শরণাগতের কোন অনিষ্ট হইতে দিতেন না। যদি কেহ খুন করিয়া রক্তাক্ত-বস্ত্রে তাঁহার নিকট আসিয়া আশ্রয়-ভিক্ষা করিত, তিনি তাহাকে সমস্ত শক্তি দিয়া আশ্রয় দিতেন, এবং রক্ষা করিতেন। এইরূপে তাঁহার এলাকার মধ্যে শত শত খুনী ও পলাতক আসামীরা স্বচ্ছন্দচিত্তে বিচরণ করিয়া বেড়াইত; এবং হত্যা গৃহদাহ প্রভৃতি বড় বড় গোপনীয় কার্য্যে মল্লিক মহাশয় একমাত্র তাহাদেরই বিশ্বাস করিতেন। এইরূপে বর্গী সম্বন্ধীয় প্রবাদ-বাক্য হইতে বর্গীনামটি উঠিয়া গিয়া মল্লিক-নামটি সেখানে স্থায়ী আসন লাভ করিতেছিল।

মল্লিক মহাশয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্রটি মারা যায়। তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের সম্মুখে কন্যাটি নিজের বিপুলতর রূপ লইয়া স্বর্গস্থিত চন্দ্রের মত যুবক-হৃদয়ে বাস করিতে লাগিল। একটি একটি করিয়া ষোলটি বৎসর চলিয়া গেল, কন্যার সর্ব্বাঙ্গ যৌবনের অনাহত সুষমায় ভরিয়া উঠিল,—মল্লিক মহাশয় কিন্তু পাত্রই খুঁজিয়া পাইলেন না। এমনি সময়ে কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

এক বারুণীযোগে নদীতে স্নান করিয়া মল্লিক মহাশয়ের কন্যা বহু বিচিত্রিত পাল্কী করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে অন্য পাল্কীতে সঙ্গিনীগণ, এবং এই উভয় পাল্কীর অগ্রে ও পশ্চাতে লাঠিয়ালগণ।

অন্তপথ দিয়া রাজকুমার হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া বহু অনুচর অগ্রে ও পশ্চাতে লইয়া রাজোচিত মিছিল করিয়া আসিতেছিলেন। উভয় পথের সঙ্গমে এই উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল। রাজা অগ্রে যাইবেন, অথবা মল্লিক দুহিতা অগ্রে যাইবেন, এই লইয়া মুহূর্ত্তকালের বচসা হইল এবং চক্ষুর পলক না পড়িতেই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিল। এত ত্বরিতে ব্যাপারটা ঘটিল যে, পাল্কী-মধ্যে মল্লিক-কন্যা অথবা হস্তিপৃষ্ঠে রাজকুমার একটি কথা বলিবারও অবকাশ পাইলেন না। রাজপক্ষের দল ভারি ছিল, কাজেই দেখিতে দেখিতে মল্লিকপক্ষের কয়েকজন লাঠিয়াল ধরাশায়ী হইল।

রাজকুমার যখন বুঝিলেন, পাল্কী মধ্যে নারী আছেন এবং ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াইলে তাঁহারও বিপদগ্রস্ত হওয়া বিচিত্র নহে, তখন তিনি নিজের দলকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন। হঠাৎ রাজপক্ষ সরিয়া দাঁড়াইতে মল্লিকপক্ষ একটু বিস্মিত হইল, এবং আর একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেই পরম বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের মনিব-কন্যা কখন পাল্কী হইতে নামিয়া পড়িয়া তাহাদের মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। উদ্যত দণ্ড হাতেই রহিল, তাহারা তটস্থ হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

মল্লিক কন্যা নিতান্ত নির্ভীক ও গর্ব্বিত চরণে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। রাজপক্ষের দল মন্ত্রমুগ্ধের মত পথ ছাড়িয়া দিল। রাজহস্তীর চালক হস্তীর মুখ ফিরাইয়া দিল। তাঁহার দেখাদেখি অন্য পাল্কী হইতে সঙ্গিনীগণও নামিয়া হাঁটিয়া দুইদল পার হইয়া গেল। তাহার পশ্চাতে শূন্য পাল্কী, এবং তৎপশ্চাতে লাঠিয়ালেরা বিজয়-গর্ব্বে ও-পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে-স্থান ভীষণ সংঘর্ষ-কোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল, মুহূর্ত্তে তদপেক্ষা ভীষণ এক স্তব্ধতায় সে স্থান ভরিয়া উঠিল।

রাজকুমার এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে শত্রুকন্যার প্রদীপ্ত ভঙ্গীমার প্রতি চাহিয়াছিলেন। কন্যা যখন পুনরায় পাল্কী আরোহণ করিল, তখন তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া আসিয়া পাল্কীর নিকট আসিলেন। পাল্কী মধ্যস্থিত আরোহিনীকে অনুচ্চস্বরে কি যে বলিলেন, কেহই শুনিতে পাইল না! কিন্তু তাঁহার অতি-বিনীত ভঙ্গী, এবং অতি-বিনত দৃষ্টি দেখিয়া শত্রু মিত্র সকলেই বুঝিল, এই দুর্ঘটনার জন্য কোনপ্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। স্বপক্ষের লোকেরা মাথা নত করিল, বিপক্ষীয়েরা উল্লসিত হইয়া উঠিল।

মল্লিকবাড়ীর দল চলিয়া গেল। রাজকুমারও নিজের পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুখ এক অস্বাভাবিকভাবে আলোকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাঁহার অনুচরগণের মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখাইয়া দিল।

হতাহতগণকে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য উভয় পক্ষের কয়েকজন লোক রহিয়া গেল।

কথাটা মল্লিক মহাশয়ের কানে উঠিল, অতিরঞ্জিত হইয়া। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন,

হত এবং আহতের সংখ্যা তাঁহার দিকেই অধিক হইয়াছে, এবং আরও ভাবিয়া দেখিলেন, অবস্থান্তরে পড়িয়া কন্যাকে হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছিল। তাঁহার কলঙ্ক এবং রাজকুমারের অযাচিত সৌজন্য,—এই উভয়ের যতদিন না তিনি উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহাকে শান্তিতে বাস করিতে দিবে না। যতই ভাবিতে লাগিলেন, নিষ্ফল ক্রোধে ততই অধৈর্য্য হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দ্বিগুণতর উৎসাহে অনুগত ও অনুচরদের প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

প্রতিশোধ-লিপ্সায় তিনি যখন বাহিরের কাজে ব্যস্ত, যখন ভিতর হইতে আর এক অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ আসিয়া তাঁহার জীবন চিরকালের জন্য কালিমাচ্ছন্ন করিয়া দিল। খবর আসিল, তাঁহার একটিমাত্র কন্যা কাল রাত্রি হইতে নিরুদ্দিষ্ট। অন্য কোথাও আছে, মনে করিয়া রাত্রে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই, কিন্তু সকালেও কোনখানে খুঁজিয়া না পাওয়ায় তাহাকে জানান হইয়াছে।

বিশেষ অনুসন্ধানও করিতে হইল না। খবর আসিল, তাঁহার কন্যা রাজপুরীতে কাল সন্ধ্যার পর হইতে নির্বিঘ্নে বাস করিতেছেন। এবং সম্ভবতঃ অতি শীঘ্রই রাজকুমারের সহিত শুভ-পরিণয় হইবে।

রাজকুমার অতি অল্পবয়সে রাজ্যভার হস্তে পাইয়া বিবাহ করিবার অবসর পান নাই। এইবার বোধ হয় বিবাহ এবং শত্রুপাত—দুই কাজই একসঙ্গে সারিবেন।

সংবাদ শুনিয়া মল্লিক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত লাঠিয়ালদের উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে লাঠি এবং মানুষে বাহিরের প্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিল।

শত্রু-কবলাশ্রিত কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কাতেই হউক, বা অন্য কোন ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা-চরিতার্থ করিবার পন্থার কথা মনে আসিবার জন্যই হউক, তিনি স্বপক্ষীয় লোকদের এখন নিরস্ত থাকিতে আদেশ দিলেন। তাহারা একটু বিস্মিত, এবং যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই ফিরিয়া গেল।

কন্যাকে যে শত্রু চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে মল্লিকের কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এত প্রহরীর মধ্য হইতে কাজটা কি করিয়া সম্ভব হইল, প্রথমে তিনি তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, কন্যার সহিত রাজকুমারের পূর্ব্ব হইতেই পত্রের আদান-প্রদান চলিতেছিল। পরে একদিন সুযোগ বুঝিয়া রাজকুমারের লোক তাঁহার কন্যাকে লইয়া পলাইয়া যায়। কন্যার মাতা এই পলায়নে বিধিমতে সাহায্য করেন।

মল্লিক দেখিলেন, ঘরের মধ্যেই শতশত্রু তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে নির্বিঘ্নে বাস করিতেছে। প্রথমেই তিনি প্রিয়তমা পত্নীর অশ্রুজল কাকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন! তবে এইটুকু অনুগ্রহ করিয়া জানাইলেন, কন্যা ঘরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে মুক্ত করা হইবে।

এদিকে চরের সংবাদ অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। একদিন রাজবাড়ীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সংবাদ আসিল, গায়ে হলুদ। পরদিন রাজবাড়ী হইতে লোক আসিয়া মল্লিককে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। মল্লিক অতি অভ্যর্থনা করিয়া লোকদের বসাইলেন, এবং এতদিনের বিবাদের এত

সহজে নিষ্পত্তি হইয়া গেল দেখিয়া প্রচুর সন্তোষলাভ করিলেন। এমন কি, ভাবী জামাতার এবম্বিধ বুদ্ধি এবং সাহস লইয়া পরিহাসও করিলেন।

বিবাহের দিন মল্লিক উদর পুরিয়া আহার করিলেন এবং কন্যা-জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তবে পাত্র-গৃহে বিবাহ হইল বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বিবাদের যখন আর 'ব'ও রহিল না, তখন প্রচলিত রীতি-মত হইলেই চলিত!

ইহার পর উভয় পরিবারের ভাব দেখিয়া গ্রামের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু দুঃখিত হইল গ্রামের গোয়ালপাড়া।

মল্লিক কন্যা-জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজকুমার কি ভাবিয়া একটি অঙ্গ-রক্ষীও সঙ্গে লইলেন না। শুধু স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন।

মল্লিক মহা-সমারোহে নবদম্পতীর অভ্যর্থনা করিলেন। স্ত্রীকে সেই দণ্ড মুক্ত করিলেন। সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব চলিল। রাত্রেও উৎসবের শেষ হয় না! গ্রামের গোয়ালপাড়াও উৎসবে যোগ দিয়া রাত্রটা মল্লিকবাড়ীতেই কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে কন্যা শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিল, পার্শ্বে স্বামীর শয়ন-স্থল শূন্য। হঠাৎ এক অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বাড়ীর চারিদিকে অনুসন্ধান করিল, কোথাও স্বামীকে দেখিতে পাইল না। মা'কে জিজ্ঞাসা করিল, তিনিও বলিতে পারিলেন না। কন্যা বুঝিল তাহার অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে। হয় ত' তাহার স্বামীকে অতি অসহায় পাইয়া পিতা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন।

মল্লিকমহাশয় শয্যার উপর বসিয়াছিলেন, কন্যা গিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কন্যাকে বলিলেন, জামাতার বিশেষ কোন অনিষ্ট তিনি করেন নাই, তাহাকে গুপ্তগৃহে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। অনাহারে মরিবার ভয় নাই, কারণ প্রায় মাস-কাল চালাইবার মত খাদ্য সেখানে মজুত আছে। ইহার পরে হয় ত' ছাড়িয়া দিতেও পারেন।

কন্যা চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, স্বামীর যেখানে স্থান, তারও সেইখানেই স্থান। সুতরাং সেও সেই-গৃহে বন্ধ হইতে চায়।

মল্লিকমহাশয় বলিলেন, বেশ!

কন্যার চোখ বাঁধিয়া তাহাকে স্বামীর নিকট রাখিয়া আসিলেন। এই গুপ্ত-গৃহের কথা বাড়ীর সকলেই শুনিয়াছে, কিন্তু পথ এক কর্ত্তা ছাড়া আর কেহই জানে না। জানিবার চেষ্টাও কেহ করে নাই। কারণ কোনকালে এ-ঘর যে ব্যবহারে লাগিবে, স্বয়ং কর্ত্তাও বোধ হয় কোনদিন ভাবেন নাই।

অনালোকিত বন্দীগৃহে দুই নব দম্পতির দাম্পত্যসুখের সূচনা হইল। স্ত্রীর অশ্রুজল মল্লিক মহাশয়ের মন ভিজাইতে পারিল না।

পরদিন রাজবাড়ী হইতে রাজকুমারের সংবাদ লইবার জন্য লোক আসিল, কিন্তু সে আর ফিরিয়া গেল না। তখন আর কিছুই চাপা রহিল না। রাজবাড়ীর লোকেরা প্রভুর উদ্ধার-সাধনের জন্য মল্লিকবাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু গোয়ালাদের লাঠির কাছে তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না।

রাজ-বাড়ী রাজা-হীন হইল। মল্লিক-বাড়ীতে প্রত্যহই নহবৎ বাজিতে লাগিল।

পাঁচ দিন পরে মল্লিকমহাশয় কন্যা-জামাতার বন্দীগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কন্যার আর সে রূপ নাই, পাঁচ দিনের মধ্যে যেন আর তাহাকে চেনা যায় না কন্যা পিতার পদতলে পড়িয়া মুক্তি ভিক্ষা করিল।

পিতা বলিলেন, বেশ এসো।

রাজকুমারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে দুই কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু দিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। তিনি হয় ত' উভয়কেই মুক্তি দিতেন, প্রতিশোধ যাহা লইবার লইয়াছেন। কিন্তু জামাতার উদ্ধত দৃষ্টি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে কঠোর করিয়া তুলিল। কন্যার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। পাঁচ দিনের বন্দী-যন্ত্রণার পর আজ আর সে স্বামীর ভাগ্য-ভাগিনী হইতে চাহিল না। বাহিরে আসিয়া পিতা কন্যার চোখ বাঁধিয়া দিলেন। ঘরের মধ্যে আনিয়া তাহা খুলিয়া দিলেন।

ঘরের আলোক দেখিয়া কন্যা বুঝিল, সময়টা রাত্র এবং এটা বন্দীঘর নয়, শয়নঘর।

রাজবাড়ীর লোকেরা যে আর-একটা আক্রমণের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। পাঁচদিন দিবারাত্র সতর্ক পাহারার পর গোয়ালপাড়ার লোক জন অনেকে ঘরে ফিরিয়া গেল, অনেকে মল্লিকবাড়ীতে তখনও রহিয়া গেল। সকলেই ভাবিয়াছিল রাজ-পক্ষের পরাজয়ের পর এই বারে মল্লিক মহাশয় রাজকুমারকে মুক্তি দিয়া একটা স্থায়ী শান্তির বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু ঘটিল অন্যরূপ। এক গভীর রাত্রে রাজবাড়ীর লোকেরা মল্লিক-বাড়ী আক্রমণ করিল।

কেহই প্রস্তুত ছিল না; এবং আক্রমণটাও খুব কৌশলে করা হইয়াছিল। লাঠিয়ালেরা লাঠি ধরিতে অবসর পাইল না। শত্রুপক্ষ ভীষণ বিক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিল। মল্লিক মহাশয় এত বড় বিপদের সম্মুখীন হইয়াও নত হইলেন না। নিজে অসি-হস্তে শত শত্রুর সহিত যুদ্ধে নামিলেন। এবং যুদ্ধেই প্রাণ দিলেন।

দুর্জ্জয় ক্রোধে শত্রু-সৈন্য যাহাকে পারিল বধ করিল, জখম করিল, বা তাহার উপর অত্যাচার করিল, মল্লিক-পত্নী ভয়ে তিনমহল হইতে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেহ খোঁজও করিল না। প্রাণে মরিল না, বা অবমানিত হইল না, কেবল মল্লিক কন্যা। লাঠিয়ালেরা তাহাদের প্রভু-পত্নীকে অভিবাদন জানাইয়া প্রভুর সংবাদ জানিতে চাহিল। কিন্তু প্রভু-পত্নীর তখন কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই।

ওদিকে গোয়ালাপাড়া হইতে লোক জন ছুটিয়া আসিল। কিন্তু রাজ-পক্ষ পূর্ব্ব হইতেই সেজন্য প্রস্তুত ছিল। পথপার্শ্বে একদল লোক লুকাইয়াছিল, তাহারা গোয়ালাপাড়ার লাঠিয়ালদের একই সঙ্গে সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রমণ করিল। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের বেগ তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। অধিকাংশ হত, বাকী আহত হইল, এবং অতি অল্পসংখ্যক পলাইয়া বাঁচিল।

রাজকুমারের বন্দীগৃহের পথ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। ঘর, বাহির সকল স্থানে খোঁড়া হইল, কিন্তু অতি-প্রার্থিত একটী বন্দীগৃহের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

এক সপ্তাহ অক্লান্ত অনুসন্ধানের পর সকলে হাল ছাড়িয়া ছিল। এত দিন মৃত্তিকা-গর্ভে কোন মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না। যাহার উদ্ধারের জন্য এত বড় প্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, তাহাকেই পাওয়া গেল না

রাজ্যভার গ্রহণ করিবার আর কেহই রহিল না। রাজবাড়ী হইতে লোকেরা তাহাদের রাণীমা'কে লইতে আসিল, কিন্তু তাহাদের রাণীমা' এই পরিত্যক্ত, লুণ্ঠিত, ও অভিশপ্ত গৃহেই রহিলেন।

রাজকুমারের আশা সকলেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিল, ফেলিল না কেবল এই পতি-হারা, স্বজন-হারা মেয়েটি। আস্তে আস্তে গ্রাম-গর্ভের এতবড় অগ্ন্যুৎপাত মিলাইয়া গেল। পূর্ব্বের মত কাজ-কর্ম্ম চলিতে লাগিল। দিনের পর রাত্রি আসে, গভীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় সমস্ত ঢাকিয়া যায়। এক বিরাট সুপ্তিতে গ্রামখানি ঢলিয়া পড়ে। তখন এই শোকাচ্ছন্ন নারী গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া পতির অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। গৃহের প্রতি ভগ্ন ইটটী হইতে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইতে থাকে। ছাদের উপর চাহিয়া দেখে, সেখানে যেন মা দাঁড়াইয়া থাকিয়া অঙ্গুলানির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইয়া দেয়। নির্দ্দেশমত সে অনুসন্ধান করে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পায় না। পুকুর পাড়ে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে বহু হত দেহ পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছে। পুকুরের শীতল বাতাসে কাহাদের ক্রন্দন যেন ভাসিয়া আসে।

এক শুক্লপক্ষের রাত্রে এই পতি-বিরহিনী নারী এমনি স্বপ্ন-ভ্রমণ করিতে করিতে পুকুর পাড়ে উপস্থিত হইল। আজ আর অন্ধকার নাই। মৃত্যুর মত সব নিশ্চল, এবং তাহার উপর অবারিত জ্যোৎস্না-কিরণ। এই মৃত্যু-সৌন্দর্য্যের প্রতি চাহিয়া এত দিন পরে সে আজ হাসিয়া উঠিল। সহসা তাহার মনে পড়িল, স্বামীর বন্দীঘর এই পুষ্করিণীর নীচে অবস্থিত। পথ চাপা পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু জল-নিম্নে ঘর চাপা পড়ে নাই। এতদিনে সে মাতার এইদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশের অর্থ বুঝিল।

এক অস্বাভাবিক তীব্র আনন্দে তাহার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সে দেখিতে লাগিল, স্বামী তাহার অপেক্ষায় সেই আলোকহীন বন্দীগৃহে বসিয়া আছেন।

দিবা-রাত্র কাটিয়া যাইতেছে,—কিছুই বুঝিতেছেন না। কতদিন গত হইল, তাহারও হিসাব নাই। কি ঘটিল, তাহার ইঙ্গিতমাত্রও তাঁহার কাছে পৌঁছায় নাই। ক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে তিনি অতি একান্ত প্রাণে স্ত্রীর আগমন অপেক্ষা করিতেছেন। সে গেলেই যেন এই অন্ধকার গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে,—স্বামীর নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে।

চোখের উপর সে সেই মিলনদৃশ্য দেখিতে লাগিল। একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। স্বামীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাহার ইন্দ্রিয় পার হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া মহাশূন্যে অনন্তপথে কোথায় চলিয়া গেল। তার সর্ব্ব-শরীর থর থর কাঁপিয়া উঠিল। এক পা' এক পা' করিয়া অগ্রসর হইয়া জলে নামিল।

অচঞ্চল জলরাশি চঞ্চল হইয়া উঠিল। পাড়ে অতি-মৃদু ছল ছল শব্দ হইতে লাগিল। পাশের আমগাছ হইতে দু'একটা পাতা ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু কোনদিকে সে লক্ষ্য করিল না। জলের শীতল স্পর্শেও তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল না। অতল জলে ডুবিয়া সে স্বামীর নিকট চলিয়া গেল।

* * * * * *

রাখাল গল্প শেষ করিল কিন্তু আমার মনে শেষ হইল না। জলমধ্যে নিমজ্জমানার আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টা কল্পনা-চক্ষুতে দেখিতে লাগিলাম। হয় ত' বা' তাহার একটা আর্ত্তধ্বনিও কানে আসিল। আমার চক্ষু জানালা পার হইয়া পুকুরটার দিকে পড়িল। অন্ধকারে জলের চিহ্নও দেখা গেল না। গাঢ়তর অন্ধকার মাখিয়া বড় বড় গাছ গুলো নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের ঘেরিয়া অজস্র জোনাকি জ্বলিতেছে, ও নিবিতেছে।

বাকী রাত্রটুকু আর ঘুম হইল না। বার বার স্বপ্ন দেখিয়া তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। একটু তন্দ্রা আসে আর দেখি, ওপারের আম বাগানের মধ্যে কে একজন সাদা সাড়ী পরিয়া আঁচলে প্রদীপ ঢাকিয়া কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পুকুর-পাড়ে আসিতেই দীপ নিবিয়া গেল। আমারও তন্দ্রা টুটিয়া গেল।

পরদিন থানাতেই শয়নের ব্যবস্থা করিলাম।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ভাঙ্গা"

ভাঙ্গারে করিছ কেন ভয় ?
বিশ্ব-যোড়া ভাঙ্গা গড়া,
সদা বিশ্বে বাঁচা মরা,
যাঁর বিধি সৃষ্টি স্থিতি, তাঁরি বিধি লয় ;
অম্বুধির বক্ষঃ ফুটে
জগত হাসিয়া উঠে,
রুদ্রের বিষাণ বাজে ঘটায় প্রলয়।
বাষ্প হয়ে বারি রাশি
অন্তরীক্ষে ভেসে আসি,
মেঘরূপে আপনার দেয় পরিচয়,
সুধাংশুর অংশু লুটি
করে কত ছুটাছুটি,
দিনে দিনে মাসে মাসে দেহ উপচয় ;
বিশ্বের মঙ্গল তরে
সেও ত ঝরিয়া পড়ে
প্রকৃতির ডাক্ শুনি, আসিলে সময় ;
বারিদের দেহ পাতে
এ ধরা আনন্দে মাতে
আনন্দে আনন্দ নাদ সারা বিশ্বময়।
কত যুগ যুগ ধরি
উঠে এক রাজ্য গড়ি,
হেরিয়া নিখিল বিশ্ব গাহে জয় জয়,
অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁর
নিমেষেতে চুরমার,
পাপের পশরা যবে পূর্ণ তার হয়।
তার চিতাভস্ম মাঝে
আবার মঙ্গল সাজে
আর এক রাজ্যের হয় নব অভ্যুদয়,
একই শৃঙ্খল মাঝে
উত্থান পতন রাজে
অক্ষরের মূলমন্ত্র পদে পদে ক্ষয়।

ভগ্ন খণ্ড শিলারাশি
লয়ে নর গড়ে হাসি
বিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গ চীনের প্রাচীর,
ক্ষুদ্র ছিদ্র ক্ষুণে গাঁথা
রন্ধ্রেতে পড়েছে বাধা
মহাবল মহাকায় উন্মত্ত অধীর।

পাষাণের গাত্র বাহি
কল কল রবে গাহি
পড়িতে তুষার-ভাঙ্গা ঝরণার জল,
কানন প্রান্তর মাঝে
ছুটিয়া বিচিত্র সাজে
অনন্ত সাগরে লভে শান্তি নিরমল।

বালিকা খেলার ঘর
ভাঙ্গি হয় অগ্রসর
সত্য জীবনের পথে আসিলে যৌবন,
স্বপ্ন যবে ভেঙ্গে যায়
ভুলিয়া সে কল্পনায়
মানব বাস্তবে করে আত্ম সমর্পণ।

ছোটে নর যশ তরে,
নিমেষে তা ভেঙ্গে পড়ে,
থমকে কাহার ডাকে, চমকে পরাণ,
আশা তার ভেঙ্গে যায়
নিরাশায়, নিরাশায়
মানব দেবতা. লভি আলোর সন্ধান।

ভাঙ্গাই বিশ্বের উক্তি,
ভাঙ্গায় বিশ্বের মুক্তি,
ভাঙ্গাইত গড়নের প্রথম সোপান,
পূর্ণ সে ত ভেঙ্গে গিয়ে
আপনারে হারাইয়ে
মহা পূর্ণতার মাঝে লভে নব প্রাণ।

ভব খেলা সাঙ্গ করে
আত্মা যবে যাবে সরে,
অমনে মরণ বুঝি গড়িবে জীবন,
চেতনে কি অচেতনে,
কি জীবনে, কি মরণে
ভাঙ্গা মাঝে লুকাইয়া রয়েছে গড়ন;

গৃহস্থের গৃহ কত,
শস্য ক্ষেত্র শত শত
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া উঠে সুরম্য নগর;
হের এই বিশ্বজোড়া
যেখানেই ভাঙ্গা চোরা
সেখানে শক্তির খেলা খেলে কি সুন্দর!

এক শক্তি অবিরত
ভাঙ্গিছে ঝড়ের মত
চুরমার করি সব নিমেষের মাঝে,
ওই এক শক্তি আর
লয়ে ধূলিকণা তার
গড়িয়া তুলিছে চিত্র কি বিচিত্র সাজে।

ধ্বংস লয়ে এক করে,
আর করে সৃষ্টি ধ'রে
বিশ্বের বিরাট শক্তি আছে দাঁড়াইয়া,
পদতল ঘুরে তার
হের কিবা অনিবার
কালের প্রবাহ ছুটে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।

সত্য যবে ভেঙ্গে পড়ে
মিথ্যা সত্যরূপ ধ'রে
আপনার জয়স্তম্ভ আকাশে উঠায়,
তার সে মোহন রূপে
ডুবিয়া পাপের কূপে
জীবন, সমাজ, জাতি মৃত্যু পথে ধায়;

সে মিথ্যার আবরণ
ভেঙ্গে কোন মহাজন
সত্যের প্রকৃত রূপ উন্মুক্ত করিয়া
আবার তুলিয়া ধরে
জাতির মঙ্গল তরে,
নূতন আলোকে উঠে সমাজ হাসিয়া।

সত্য অবহেলা করি
পদে পদে ভেঙ্গে পড়ি,
বিপদের ছায়াপাতে শিহরে পরাণ,
লহরে সত্যেরে জানি,
শোনরে সত্যের বাণী,
নিত্য সদা গড়ে শুধু অখণ্ড কল্যাণ।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত

আমরা ও তাঁহারা

(তৃতীয় স্তবক—সঙ্গীতের কথা)

এক সপ্তাহ না যেতে যেতে তাঁহারা এসে উপস্থিত। আমাদের দেশের লোক যখন গানের আলোচনা কোরতে নদী পার হ'য়ে আমাদের মতন snobsদের বাড়ী অত ঘন ঘন আসতে পারেন তখন তাঁদের অন্ততঃ সঙ্গীতপ্রিয় না বোলে থাকতেই পারা যায় না। আমি যদি গাইতে পারতাম তা হলে তাঁরা সাগর পর্য্যন্ত পার হতে দ্বিধা কোরতেন না। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় একটি ব্যবহারে কিম্বা একটি কথায় দেশের মনোভাব বোঝা যায় না। বীক্‌হাম সাহেব বলেন যে ইংরাজ জাতি গান বাজনা ভালই বাসেন না এবং তাঁরা, তাঁদের মেয়েরা পর্য্যন্ত, পলিটিক্‌স্ আলোচনা বেশী পসন্দ করেন, তাই তিনি অভিমানভরে আমেরিকা (?) চলে যাবেন। ফরাসী দেশে যাঁরাই গিয়েছেন তাঁরাই বলেন যে ফরাসীজাতি অত্যন্ত সুরপ্রিয় এবং প্যারিস সব বড় ওস্তাদেরই মক্কা। আনাতোল ফ্রান্‌স একজন ফরাসী এবং তাঁর চেয়ে অন্য কেউ প্যারিস ভালবাসেনা কিম্বা চেনে না, তিনি নিজে লিখেছেন, "We French are not a musical nation and do not readily sing"—সোজা কথা এই যে কোন্ জাতি কি-প্রিয় বলা সাহিত্যের কথা —অর্থাৎ বাজে কথা। সমাজতত্ত্ববিদ্ অবশ্য জাতীয় ভাবধারা নির্দ্দেশ কোরতে লোকের মাথা গুণতে উপদেশ দেবেন। তিন প্রকারের মিথ্যা কথা আছে 'Lies damned lies, and statistics'—মাথা গুণে দেশের জন্মমৃত্যুর তালিকা, আমদানী রপ্তানীর হার, মুসলমান এবং অ-মুসলমানদের সংখ্যা ঠিক করা যেতে পারে কিন্তু একটা গোটা জাতির মনের গতি কি তা বলা যায় না। বলা যাবে না কেন ? ভুল হবে এই মাত্র। অবশ্য ভুল বিশ্বাস সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সকলে যদি সত্য খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে তা হলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, জগৎ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, দেবদ্বিজ-সম্প্রদায়—অর্থাৎ যাঁরা সমাজের রক্ষক, তাঁদের খানাপিনা মারা যায়। আমি ব্রাহ্মণ, বাড়ী আমার ভট্টপল্লীর কাছে, ব্রত আমার অধ্যাপনা, সাধনা আমার অধ্যয়ন, অতএব সত্যানুসন্ধান আমারই ধর্ম্ম। আমার ধর্ম্ম আমাকে বোলছে এই, যেকালে বর্ত্তমানে রবিবাবু এবং অতুলপ্রসাদ বেঁচে রয়েছেন তখন বাঙ্গালী, সুর ভালবাসুক আর না বাসুক, কবিতাকে ঘৃণা করুক, আর না করুক সঙ্গীত ভালবাসে। পিপড়ের যেমন শুঁড়, জাতির তেমন প্রতিভা।

* * *

তাঁহারা। আজ আপনার মুখে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে এসেছি। সেদিন সুর থেকে সঙ্গীত পৃথক কোরেছিলেন মনে রাখবেন।

আমি। বেশী পৃথক থাকার পক্ষপাতী আমি কখনও নই, জোর একমাস—তার মধ্যে চারটি মধু শনিবার। সে যাই হোক—আলোচনা শোনে না, বক্তৃতা শোনে এবং আলোচনা করে।

তাঁহারা। সাধারণতঃ, যখন দুটি বিরোধী মতে কিছু সত্য আছে লোকে স্বীকার করে, তখনই লোকে আলোচনা করে। আমরা রবি বাবুর গান—বিশেষতঃ তাঁর পুরাতন গান—এই যেমন 'যামিনী না যেতে, অলি বারবার ফিরে আসে, সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি'—অত্যন্ত ভালবাসি, অতুলপ্রসাদের সব গানই আমাদের প্রাণস্পর্শী। কিন্তু রবি বাবুর অনেক গান, বিশেষতঃ তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার পর রচিত গানগুলি আমাদের মোটেই ভাল লাগে না, তার চেয়ে থিয়েটারের গান ভাল লাগে, রজনীসেনের গান ভাল লাগে। রবি বাবু বড় কবি, তাঁর দেওয়া সুর ভাল লাগে অথচ ভাল লাগে না। আপনি কিভাবে বলেন রবি বাবু সুরের রাজ্যেও মহারাজা ?

আমি। মহারাজা নন্ কেবল, রাজচক্রবর্ত্তী, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান একেবারে।

তাঁহারা। আপনি দেখছি Sun-struck by রবি বাবু। আপনি মশায় অত্যন্ত গোঁড়া।

আমি। গোঁড়ামী অনেক সময় দৃঢ় বিশ্বাসের লক্ষণ। ভট্টপল্লীতে এখনও দুএকটি দৃঢ় মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যেটি সহরে পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ অ-সহযোগ আন্দোলনের পর।

তাঁহারা। গোঁড়ামী ভাল কি মন্দ তর্ক কোরতে আসিনি, তবে যা বুঝছি তা এই যে, ঐ রকম অন্ধ বিশ্বাস এবং গোঁড়ামী নিয়ে তর্ক হয় না, আলোচনা হয় না, সাধু বক্তৃতা হয়। আপনি মঞ্চে উঠুন, আমরা হাঁ কোরে শুনি।

আমরা। বক্তৃতা দেওয়া আমার ভাল লাগে। যারা কথা কইতে জানে না তারা যখন Art of conversation সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখে তখনই জিহ্বার চেয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর ঝোঁক পড়ে। এই সব বোবার দলই বলে যে ভাল কইয়ে হতে গেলে মধ্যে মধ্যে চুপ কোরে অন্যের কথা শুনতে হয়। আরে মশাই, সারারাতই ত চুপ কোরে শুনি, তার ক্ষতিপূরণ কোরব না ? আর যদি দাম্ভিক না ভাবেন তাহলে বলি, আমি যত আমার বক্তব্য বিষয়ে ভেবেছি, অন্যে কি তা ভেবেছে ? ঐ সব হিংসুটে বোবাদের পরামর্শ নিতে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথাই কওয়া যায় না। আপনারা যেকালে বন্ধু, অন্য কিছু নন্, তখন অবশ্য আপনাদের মধ্যে মধ্যে চুপ কোরে থাকতেই হবে। আপনারা যদি তর্কই করেন, তাহলে বক্তব্যটি বিপথগামী হয়ে পড়বে। বক্তৃতার সুবিধা দেখুন, হাতে রইল নোট, মাথায় রইল পয়েণ্ট, পয়েণ্ট ঠিক থাকলে বক্তব্যটি নিজের লাইন ধরে ষ্টেশনে এসে পৌছবে, রাস্তায় মালগাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগবে না। সত্য কথা বোলতে কি, তর্ক জিনিষটা বড়ই তামসিক, বুদ্ধির অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই জন্যই স্ত্রীজাতি, যে জাতি অত আত্মবিস্মৃত, অত পরার্থপর, অত

ভক্তিমতী, অত– অর্থাৎ যে জাতি অত সাত্বিক—সেই জাতি কখনও তর্ক করেন না, সাধু বক্তৃতা দেন, এবং পুরুষ জাতি কেবলই নিজেদের মধ্যে এবং স্ত্রীজাতির সঙ্গে তর্কই করেন। এই দম্ভের জন্যই পুরুষের আজ পতন হয়েছে—কেউ পরীক্ষায় প্রথম হতে পাচ্ছে না। আরো দেখুন—

তাঁহারা। দেখছি যা তা অনেক আগেই বুঝেছি—সিদ্ধান্তের পক্ষে তর্ক ও বক্তৃতা দুইই সমান।

আমি। না, না, তা কেন? বক্তৃতাতে একটু বিশ্বাস দরকার। বক্তার নিজের ওপর আস্থা থাকবে এবং শ্রোতা বক্তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেন, তবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। আমার সিদ্ধান্তটি মেনে নিলেই সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা—থুড়ী, বক্তৃতা সুরু করি। সেটি এই যে প্রকৃত কথোপকথন হচ্ছে সেই দলেই সম্ভব যেখানে একজন মাত্র বক্তা, অন্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ, বিশ্বাসপূর্ণ, অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত শ্রোতা। গোছান কথা শুনতে না ভাল লাগে, বক্তুর সঙ্গে দেখা কোরবেন না। তবে সেজন্য শুদ্ধচিত্ত হওয়া চাই।

তাঁহারা। শুদ্ধচিত্ত কেন?

আমি। শুদ্ধচিত্ত মানে tabula rasa—মনটি পরিষ্কার শ্লেটের মতন হওয়া চাই। অর্থাৎ বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্ব থেকে কোন মতামত থাকবে না, মনে থাকবে শুধু বক্তার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। চিত্তশুদ্ধির পক্ষে ওগুলি একান্ত আবশ্যক, শাস্ত্রেও লিখেছে।

তাঁহারা। তা হলে কি বোলতে চান যে, রবি বাবুর গান সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার ও ধারণাগুলি ধুয়ে ফেললেই আপনার বক্তব্য অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে অসাধারণ কৃতিত্বটি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম কোরতে সক্ষম হব?

আমি। ঠিক্ কথা। তবে অত সহজে পূর্ব্ব ধারণাগুলিকে দূর করা যায় না, নিজেকে সংস্কৃত করা বড় শক্ত।

তাঁহারা। অর্থাৎ আমাদের সংস্কারের জন্য আপনার বক্তৃতা দরকার। এত ভণিতাও আপনি জানেন! বাজে কথা ক'য়ে রাত কাটালেন! প্রমাণ হল কি? না, কাউকে শ্রদ্ধা কোরতে হলে তাকে শ্রদ্ধা কোরতে হবে! একেবারে Begging the question!

আমি। এই অন্নক্লিষ্ট, বুভুক্ষু জাতি—যার,—Digby পড়েছেন? রাধাকমলের দরিদ্রনারায়ণ পড়েছেন?—পড়বেন মশায় বইখানা—ওটা তাঁর দরিদ্র অবস্থারই লেখা—এক কথায় এই ভিখারী জাতি, যার সর্দ্দারগুলিও ভিখারী, তার একটি নগণ্য ব্যক্তি, যদি স্বরাজ্য কিম্বা অন্ন ভিক্ষা না করে, সামান্য একটি প্রশ্ন ভিক্ষা করে তা হলে কি জাতির মানহানি হয়? ধরতে গেলে আমি প্রশ্ন ভিক্ষা করছি না, রবি বাবুর, সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ব্ব হতেই মতামত পোষণ করে

আপনারা যা প্রশ্ন ভিক্ষা কোরে থলা ভরিয়েছেন, সেই থলি উজাড় কোরে দিন, তবেই থলির ভেতর সোনাদানা পাবেন।

তাঁহারা। আমাদের অত কৃপণ ভাববেন না। আমরা প্রস্তুত, কেননা এতক্ষণ পরে বিষয়টি পরিষ্কার হল। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। মুখপত্র কোরতে আপনি আপনার গুরু, অর্থাৎ বীরবলের মতনই কালক্ষেপণ করেন। গুরু-নিন্দা শুনে রাগ কোরবেন না—আপনার উত্তর আমরা জানি, প্রথমে তর্কের বিষয় সম্বন্ধে মনোভাব ঠিক কোরে নেওয়াই ভাল, এবং সেই মনোভাব পরিষ্কৃত হলে সব গোলমালই চুকে যায়। তার পর আপনার বক্তৃতা সুরু করুন।

আমি। আপনারা ধন্য ! একটু ইতিহাস শুনতে হবে।

তাঁহারা। ইতিহাসের জন্যই বিজ্ঞানের ছাত্র হলুম, আবার সেই ইতিহাস ! বাড়ীতে জননী বলেন 'আগে লক্ষ্মীমন্ত ছিলাম, ঘরে লক্ষ্মী এসে লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি' পুস্তকেও সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 'আগে সোনার ভারত ছিল, এখন লোহার ভারত হয়েছে' ! যাই হোক্, বলুন শুনি, 'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে' !

আমি। আমি ওরকম ভাবপ্রবণ ইতিহাস শোনাব না। আপনারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, আপনাদের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসই শোনাব, এবং মোগলাই ইতিহাস খানা দিতে পারব না। আমার বর্ণিত ইতিহাস শুনে কিন্তু মনে হবে না 'হা ভগবান ! ভারতবর্ষের কি ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নেই !' শুনুন, আমি ধার্ম্মিক—

তাঁহারা। তাতে ভারতবর্ষের কি আসে যায়?

আমি। তাতে সবই আসে যায়। ভারতবর্ষের যাক্ আর না যাক সব কলা-বিদ্যারই গোড়ায় আছে একটি ধর্ম্ম। গোড়াতে ধর্ম্ম-জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এক, জ্ঞান মানে আমি প্রবৃত্তিমূলক উপলব্ধি বলছি। ধর্ম্মেই সব আর্টের বীজ নিহিত রয়েছে, প্রত্যেক ধর্ম্ম মানুষের মনকে স্বাধীন কোরে দেয়, প্রথম অবস্থায়। যখন ধর্ম্ম 'ধম্মে' পর্য্যবসিত হয়, তখন 'শূন্য' আঁকা আর ভাবা ছাড়া মানুষের অন্য কিছু কর্ত্তব্য থাকে না। দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম শূন্যবাদে এসে উপস্থিত হল, তখন অজন্তার চিত্রকর গুহা ছেড়ে মা কালীর শরণাপন্ন হলেন, ছুটে কালীঘাটে উপস্থিত, পট আঁকতে আরম্ভ করলেন। প্রমাণ এই যে হাতের কাছেই রয়েছে—Indian Art and Letters Vol II, no 2.—অজিত ঘোষের প্রবন্ধটি পড়ে দেখবেন, খাসা লেখা। আর্টের গোড়ায় ধর্ম্ম এ কথার প্রমাণ নাস্তিকেও গ্রাহ্য করে—Clive Bell হচ্ছেন সাহেব এবং Osvald Siren হচ্ছেন সুইডিস—আপনাদের ইবসেনের জাত। তাঁরাও—

তাঁহারা। দয়া কোরে পাণ্ডিত্য দেখাবেন না, আপনি যা বোলবেন বিশ্বাস কোরব। আপনার অনুরোধ সত্বেও যখন ঐ সব কেতাব পড়ছি না, তখন ঐ কেতাবে কি কি আছে আপনি যা বোলবেন তাই শিরোধার্য্য কোরে নেবো।

আমি। ভাল কথা, আপনাদের বিশ্বাসকে ধন্যবাদ। এখন শূন্য যেমন ফাঁকা, শূন্যবাদও ফাঁকা। Nature abhors vacuum, অর্থাৎ প্রথম পক্ষ মারা গেলেই দ্বিতীয় পক্ষের আবশ্যক। সেইজন্য শূন্যস্থানে কেষ্ট, বিষ্টু, রামচন্দ্র প্রভৃতি জ্যান্ত নরনারায়ণ এসে অধিষ্ঠিত হলেন। দখিন দেশে আলোয়ার এবং ভক্ত সম্প্রদায় তামিল গান গেয়ে লোক খেপাতে লাগল—দশম শতাব্দী থেকে মাদ্রাজী খেপল, উত্তর ভারতে এই ভক্তির বাণ এসে হাজির হ'ল প্রায় তিন শ বছর পরে। বাণের পর যে পলিমাটি পড়ে তাইতে জমি উর্ব্বর হয়,—সেই জন্য শিখ, দাদুপন্থী, রাধাবল্লভী (যাদের নাম নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কৃতজ্ঞতা-ভরে স্মরণ করি), বল্লভাচারী, চরণদাসী সম্প্রদায় দেশ ছেয়ে ফেললে। বাংলা দেশে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চৈতন্য, চণ্ডীদাস এবং তাঁদের দাসানুদাস. সকলে মিলে সাহিত্য-সৃষ্টি কোরলেন, নানক পঞ্জাবে, কবীর এই দেশে, নর্সী মেটা গুজরাটে, মীরাবাই রাজপুতনায়, তুকারাম মারহাট্টায় সব ভক্তিরসাত্মক গান রচনা সুরু কোরে দিলেন। শুধু রচনা নয়, সেই গান সকলে মিলে তারস্বরে গাইতে লাগল। সেই সব গানের সুর ছিল দেশী, মার্গ নয়, অর্থাৎ বাঙ্গালী গাইতেন কীর্ত্তন, বাউল, এ দেশের লোকেরা গাইতেন ভজন, মারহাট্টারা গাইতেন আভঙ্গ। অন্য ধারে আমীর খসরু হিন্দু মার্গ সঙ্গীতের জাত মেরে দিলেন, ফার্সী 'মাক্বাম' দিয়ে। প্রবন্ধ সঙ্গীত খাপ খেয়ে গেল ফার্সী গোরার Camp song এর সঙ্গে। একধারে নেড়ানেড়ী, অন্য ধারে—যবনের স্পর্শ, মাগ-সঙ্গীত একেবারে জগন্নাথের খিচুড়ী ভোগ হয়ে গেল। এমন সময় জন্মালেন রাজা মান তানোয়ার, গোয়ালিয়র নগরে—তিনি ঐ সহরের রাজা, অর্থাৎ কিল্লাদার হলেন ১৪৮৬ সালে। Willard সাহেব, আবুল ফজল, অধ্যাপক যোশী, Ouseley, ভাতখাণ্ডেজী এঁকেই ধ্রুপদের জন্মদাতা বোলেছেন। এঁর স্ত্রী একজন গুর্জ্জরী রাজপুত্রী। দেখতে পরী, এই টানা টানা চোখ, আবার সেই চোখের কাল পাতা যেন দেবী চৌধুরাণীর বজরার দাঁড়, ঝপ্ ঝপ্ কোরে পড়ে, ভুরু দুটি উড়ন্ত চিল, গালে টোল, ঠোঁট টুকটুকে লাল—যেন ফাগে ছোপান ডবল্ ব্র্যাকেট, আর কপালের চুল যেন ছোট ছোট গোখরো সাপ ফণা তুলে রয়েছে, গোয়ালিয়রের গরম, কপালে এবং কপোলে স্বেদ বিন্দু—

তাঁহারা। মশাই—

আমি। চুপ্। নাম আবার মৃগনয়নী—একেবারে রাজযোটক, রূপের সঙ্গে নামের চটক! রাজা হ'য়ে পড়লেন স্ত্রৈণ, রাজাও ত মানুষ! রাজা মান্ একমাত্র স্ত্রীকে ভালবেসে-সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়লেন—দেশী ও মার্গ সঙ্গীতের মিশ্রিত সঙ্কীর্ণ সুর তারিফ কোরতে লাগলেন। একমাত্র স্ত্রী কখনও শুদ্ধ সুরে গান গান্ না। কানিংহাম সাহেব বোলেছেন যে, রাণী রচনাও কোরতেন গানও গাইতেন, আর একজন বোলেছেন যে তিনি শুধু রচনা কোরতেন। সে যাই হোক রাজা রাণীর নামে সঙ্কীর্ণ সুরের নাম বসালেন, বাহুল গুজরী, মাল্ গুজরী, মঙ্গল গুজরী প্রভৃতি। কানিংহাম সাহেবের মত গ্রাহ্য কোরতে বলছি না।

তাঁহারা। তাঁর মত নিশ্চয়ই গ্রাহ্য কোরব। মশাই, আর যে থাকতে পারছি না। আপনি শুধু তর্কের খাতিরে ইতিহাসের মধ্যে এক সুন্দরী রমণীকে অবতারণা কোরলেন, ইতিহাসে তাঁর চেহারা কি রকম ছিল লেখা নেই, আর যদি তাঁকে আনলেনই, তাঁকে গান গাইতে দিলেন না, অমন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। কানিংহাম সাহেব মেয়েদের খাতির জানতেন, মৃগনয়নী নিশ্চয়ই কোকিলকণ্ঠী ছিলেন। আপনি অত্যন্ত অভদ্র ও নিষ্ঠুর।

আমি। নিষ্ঠুর আমি না সাহেব? ঐ সুন্দরী যদি আমার গান রচনা করা ছাড়া গান গাইতেন, তাহলে আপনাদের কি দশা হত ভাবুন দেখি! অবশ্য ইতিহাসে তাঁর কোন রূপ বর্ণনা নেই। কিন্তু ইতিহাসে কি সুন্দরী রমণীর স্থান থাকবেনা, তাঁদের স্থান কি কেবল আপনাদের বাড়ীতেই! এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা! তাঁরা ব্যতীত ইংলণ্ডের ইতিহাস কেবল Wars of the Roses, ক্রমওয়েলের যুগ, আর রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব, না আছে দ্বিতীয় চার্লস, না আছে চতুর্থ জর্জ! আচ্ছা, এবার থেকে কেবল বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বোলে যাব।

তাঁহারা। না, না, তা কেন? যখন সৌন্দর্য্য ঐতিহাসিক ঘটনা, আর বিজ্ঞান ঘটনাকে গ্রাহ্য কোরতে বাধ্য, তখন অবশ্য মৃগনয়নীকে শ্রদ্ধা কোরতে হবে।

আমি। বেশ হেলেনের বয়স ১০৮ বছর হয়েছিল প্রমাণিত হয়েছে, ঠিক যে সময় প্যারিস ঐ কাণ্ড কোরলেন। তাজমহল রচিত হবার পূর্ব্বে তাঁদের ১৪।১৫ টি সন্তান হয়েছিল এবং তিনি সূতিকা ঘরে মারা যান। Duchus du Barry খাঁদা ছিলেন, Madame Maintenon অত্যন্ত মোটা ছিলেন, ক্লিওপ্যাট্রার রং তামাটে এবং আন্টনীর সঙ্গে দেখা হবার সময় বয়স হয়েছিল অন্ততঃ ৩৫। এ সব বৈজ্ঞানিক সত্য অর্থাৎ ঘটনা।

তাঁহারা। ধুৎ তোর বিজ্ঞান, ধুৎ তোর ঘটনা। তারপর কি হল বলুন?

আমি। রাণী মৃগনয়নীর নয়ন মুদ্রিত হবার পর রাজা মান দেখলেন কিছু কাজ চাই। তিনি বুঝলেন যে একধারে ফার্সী সুর এবং অন্য ধারে দেশী ভক্তিরসাত্মক সুরের আক্রমণে মার্গ সঙ্গীত কৌলিন্য, মায় জাত হারিয়ে ফেলেছে। রাজা নিজে ছিলেন মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ সুরের ভক্ত, তাই এক সভা ডাকলেন। সেই সভায় ঐ প্রকার মিশ্র সুরের রীতিনীতি ঠিক করা হল। রাজা তবু হাতে কায পান না। রাণী বেঁচে থাকতে যে কার্য্য কোরতে ইচ্ছা হয় নি, এবং ইচ্ছা হলেও মন বসেনি, সময় পান নি, আজ তাই কোরবেন মনঃস্থ কোরলেন। তিনি একটা আস্ত বই লিখে ফেললেন। ভগবানের কৃপায়, এই বই খানির ফার্সী তর্জ্জমা রামপুরের নবাব সাহেবের লাইব্রেরীতে আছে—কেউ দেখতে পায় না! রাজা মান বই লিখেই মারা গেলেন। ঠিক এই সময় বড় বড় গাইয়ে দেশে জন্ম নিলেন। সকলেই গোয়ালিয়র থাকতে চান—নায়ক বক্সু, মাপু, ভান্নু, সরমু, ভগবান, ধোন্দি, ডালু। প্রথম দুজন ওস্তাদ গুজরাটে সুলতান বাহাদুরের কাছে আশ্রয় নিলেন। এধারে অল্পদিন পরে সূর বংশ বাদসা হয়ে বোসলেন—সেই বংশের ইসলাম সা গান

শুনতে গোয়ালিয়রে রাজধানী তুলে নিয়ে গেলেন। আদিল সাহের সময় সুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল—নিজে বড় ওস্তাদ, তিনি বাজ্ বাহাদুর, সেই বিখ্যাত গায়িকা রূপমতির বাজ বাহাদুর, এবং তানসেনকে গান শিখিয়েছিলেন, তিনি একটি ছোট ছেলের মধুর গলা শুনে দশ হাজারী মনসবদার কোরে দেন—অনবরত শিষ্যের বাজখাঁই গলা শুনে বোধ হয়। আদিল সূরের ছিল সুরেলা দিল, তাই ওয়াজিদ আলির মত রাজ্য হারালেন। রামদাস, সুরদাস, বৈজু, এমন কি তানসেন পর্য্যন্ত এই সময়ের লোক। তাঁরা সব ধ্রুপদ গাইতেন, অর্থাৎ গোয়ালিয়রের চালে সঙ্কীর্ণ সুর গাইতেন যে সুর দেশী এবং যবনস্পর্শ দোষে দুষ্ট। রাজা মান যে চাল বেঁধে দিয়ে গেলেন এবং আদিল সা এবং সমসাময়িক ওস্তাদরা যে চালকে প্রচলিত কোরলেন—তারই নাম ধ্রুপদ।

তাঁহারা। কি প্রমাণিত হল?

আমি। সবই প্রমাণ হল। প্রথম ধ্রুপদ নারদের মুখ থেকে বাহির হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় যে সঙ্কীর্ণ সুরকে নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছিল তারই নাম ধ্রুপদ, যে ধ্রুপদ এখন শুদ্ধ সুরের খনি মনে করা হয় এবং যে ধ্রুপদের দোহাই দিয়ে রবি বাবুর গানকে অশুদ্ধ বলা হয়। চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে ভক্তি অর্থাৎ বৈষ্ণবী ভাব সকলের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার কোরেছিল, ধ্রুপদ সেই ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত রচনা, এবং সেই 'সঙ্গীত' সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই 'গীত' হইত। আবুল ফজল সাহেব ধ্রুপদকে 'Suited to popular tastes' বোলেছেন। এই সময়কার সব ধ্রুপদ রচনাই ভক্তিরসাত্মক। তারপর যখন রাজা রাজোয়াড়া, সা বাদসার দরবারে ধ্রুপদের চলন হল, তখন রাজা, বাদসাই কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠলেন। তখন ভগবানের কাছে পেট্রনের, অর্থাৎ রাজা বাদসার 'ক্রোর বছর' পরমায়ু এবং যোজনব্যাপী রাজত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি ভিক্ষা করাই কিম্বা সুরের লক্ষণ নিরূপণ করাই ধ্রুপদের রচনার বিষয় হল।

তাঁহারা। তা হলে মোগলদের আমলে কি কি হল?

আমি। তাঁদের সময় ফার্সী সুর, দেশী ও মার্গ সুরের মিশ্রণে এক নতুন ঢং সৃষ্ট হল। গোটা কয়েক মল্লার, গোটা কয়েক টোড়ী, এক আধটা সারং, এক আধটা কানাড়া তৈরী হল। দরবারী টোড়ী, কিম্বা দরবারী কানাড়া নয়, সেগুলি শুদ্ধ টোড়ী এবং শুদ্ধ কানাড়া, অর্থাৎ সনাতনী টোড়ী এবং কানাড়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুরের ক্ষেত্রে এক কথায় কোমল গান্ধারের ওপর ঝোঁক দেওয়া হল। তখনও সুরের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল—এক এক মিঁঞা সাহেব গলার জোরে স্বকৃতভঙ্গ সুর চালাতে লাগলেন—যেমন বিলাস খাঁ চালালেন বিলাস খানী টোড়ী, তীব্র মধ্যমের ওপর কোমল মধ্যম চাপিয়ে একটু মালকোষের খোঁচ দিয়ে। মার্গ অর্থাৎ পুরাতন দেবতাদের সুর দক্ষিণে আটক পড়ল এবং উত্তর ভারতে ধ্রুপদের সঙ্গে অন্য চালও চলতে লাগল, তবে ধ্রুপদ হল primus inter pares,—রাজাদের মধ্যে বল রাজা। আবুল ফজল সাহেব এই

কয়টি প্রচলিত চালের উল্লেখ কোরেছেন, সব মনে নেই, তবে ধ্রুপদ আগ্রা গোয়ালিয়রে, সিন্ধু সিন্ধু দেশে, ধ্রুব তেলিঙ্গানায়, বাঙ্গালী বাংলা দেশে, জৌনপুরে চুতকলা, বিষ্ণুপদ মথুরায়, লচ্ছারী দ্বারভাঙ্গায়। গান্ধারী উত্তর পশ্চিমে, সৌরাষ্ট্রী সুরাটে, মারোঁয়া, মন্দ রাজপুতনায় এবং গুর্জ্জরী গুজরাটে ত আগে থাকতেই ছিল। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না, যেমন জাতিতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, যে যখন মানবের একটি কোন জীবন-ধারা লুপ্ত হতে বসে, তখন বিদেশী কিম্বা দেশের মাটির শক্তি এসে সেই সনাতন ধারাকে প্রাণবন্ত করে? এখন যে ধ্রুপদকে আমরা শুদ্ধ সঙ্গীত বলি সেটা একটি দেশী সুর, গোয়ালিয়র, আগ্রা অঞ্চলের, না হয়, বিদেশী ফার্সী এবং দেশী মাটির সুরের সঙ্গে মিশ্রণের ফল, কাঠামো হয়ত মার্গ সঙ্গীত, তাও নয় মার্গ সঙ্গীতের কনকাঙ্গী ঠাট এই সময় কাফী ঠাটে বদলে গিয়েছিল। আগেকারের ওস্তাদরা যে দেশী সুরকে ঘৃণা কোরতেন না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে দুপুর বেলায় 'দেশী' সুরের ধ্রুপদ এখনও গাওয়া হয় এবং দেশী টোড়ীতে আমি অনেক পাকা ধ্রুপদ শুনেছি। ঠাটের পরিবর্ত্তন ছাড়া মোগলদের আমলে সময় অনুসারে সুরের ভাগ হল এবং প্রত্যেক রাগ রাগিণীর ছবি তৈরী আরম্ভ হল। পুণ্ডরীক নামে এক দক্ষিণী পণ্ডিত কালভেদে সুর ভেদ কোরলেন। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে তাঁর পূর্ব্ব হতেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন সুর গাইত। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে মোগল আমলের পণ্ডিতেরা কেউ শ্রুতি মানতেন না, কেবল বারটি স্বরই স্বীকার কোরতেন।

তাঁহারা। মোগলদের পর কি হল?

আমি। পরবর্ত্তী সঙ্গীতের ইতিহাস, উত্তর ভারতে অবশ্য, একেবারেই যবনদুষ্ট। ধ্রুপদের পূর্ব্ব হতেই খেয়ালের আদর ছিল। প্রমথ চৌধুরীর 'খেয়ালের জন্ম' ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু মহম্মদ সা রঙ্গিলের সময়ই সদারঙ্গ এবং অদারঙ্গই খেয়ালকে রাজদরবারে এনে হাজির কোরলেন। সেই খেয়াল দুই রকম হয়ে গেল, যেমন এ দেশে এবং বিলাতে লিবারেল পন্থীদের অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, কেউ হচ্ছেন পুরাতন-পন্থী, আর কেউ চরম-পন্থী বিপ্লববাদী —অর্থাৎ এক রকম খেয়াল ধ্রুপদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন কোরলে, যেমন হস্সু এবং হদ্দু খাঁ, তাজ খাঁ, আলি বক্সের ঘরোয়ানা—বেহালার বামাচরণ বাবু যেমনভাবে খেয়াল গান, অন্য রকম খেয়াল টপ্পা, ঠুংরীতে পরিণত হল, এই যেমন সুরেন মজুমদারের গান। টপ্পা পঞ্জাবে এবং ঠুংরী লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে প্রচলিত হল। তার পর ঠাট পর্য্যন্ত বদলে গিয়েছে। কাফিঠাট এখন বেলাওল ঠাটে এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ সবই শুদ্ধ স্বর এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মূলঠাট হিসাবে। এই হল উত্তর ভারতীয় সুরের ধারা। এখন যদি শুদ্ধ সুরে গাইতে হয়, তা হলে ধ্রুপদ খেয়ালকে বর্জ্জন কোরতে হবে, শ্রুতির ব্যবহার কোরতে হবে, শুদ্ধ স্বর পরিত্যাগ কোরতে হবে এবং মাদ্রাজীদের মতন কনকাঙ্গী কিম্বা কাফী ঠাটেই গাইতে হবে।

তাঁহারা। মশাই, হিসাব বিভাগে মাদ্রাজীদের পাল্লায় পড়ে উত্যক্ত হয়েছি। গান শুনে একটু আনন্দ পাই, তাও মাদ্রাজী ওস্তাদ এনে আমাদের আনন্দ নষ্ট কোরতে চান না কি ? গান, সুর হতে পারে, সঙ্গীত হতে পারে, কবিতা হতে পারে, কিন্তু কান্না নয় আমরা হলফ্ কোরে বোলতে পারি। মাদ্রাজী ঠাট শুদ্ধ হোক আর না হোক, আমরা বাঙ্গালী, আমাদের অশুদ্ধ ঠাটেই কাজ চলবে। শুনেছি জাতি হিসেবেও আমরা খিচুড়ী, না হয় সুরেও জংলা হলুম !

আমি। লক্ষ্মী ছেলেটির মতন এই কথা মেনে নিলেই হত।

তাঁহারা। তা হলে বক্তৃতা দিতেন কি নিয়ে ?

আমি। আমার কাছে বক্তৃতা দেবার অনেক বিষয় আছে। এই বার আমার বক্তব্য শেষ করি। রাজা মানের সময় থেকে সাজাহানের সময় পর্য্যন্ত, দু'শ আড়াই শ বছর ধরে সুরে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, এবং তার পর গত দু'শ বছর ধরে যেমন সুরের ধারা জাতীয় নিরানন্দের মধ্যে আত্মগোপন কোরেছিল, সেই ধারা আজ গত কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলা দেশে স্রোতস্বিনী হয়ে উঠেছে। ওয়াজিদ আলি সাহ মেটেবুরুজে যখন গেলেন তখন লক্ষ্ণৌএর প্রজা হাহাকার কোরেছিল, কিন্তু বাঙ্গালী তাঁকে বুকে কোরে নিলে। তাঁর পূর্ব্বেও বিষ্ণুপুর, বেথিয়া, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, মুর্শীদাবাদ, ঢাকা অঞ্চলে গানের আদর ছিল বটে, কিন্তু মেটেবুরুজ থেকেই বর্ত্তমান বাংলা দেশের হিন্দুস্থানী চাল প্রচলিত হয়। বিষ্ণুপুরী চাল ঠিক মুসলমানী চাল নয়, ও চালটি বেহারের। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর নিজের বাড়ীতে বড় বড় মুসলমান ও হিন্দু গাইয়ে বাজিয়ে এনে পুষলেন। ক্ষেত্র গোস্বামী, যদু ভট্ট, মুলো গোপাল, কালী প্রসন্ন—এঁরা প্রত্যেকেই সাজ্জাদ মহম্মদ, মৌলা বক্সের কাছে ঋণী। রাধিকা গোস্বামী, অঘোর চক্রবর্ত্তীও ঠিক বিষ্ণুপুরী চালে গাইতেন না। এখন রবি বাবু যখন ছেলে মানুষ তখন বাংলা দেশে কেবল ধ্রুপদ এবং তাজ খাঁনী খেয়াল কিম্বা আলীবক্সী খেয়াল গাওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরী ঘরেরও আদর ছিল। এই সব ঘরোয়ানা সুর ভেঙ্গে কিম্বা হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত, থিয়েটারী ও যাত্রা-সঙ্গীত গাওয়া হত। পাখোয়াজে গোলাম আব্বাসের ঘরের শিষ্য ছিলেন নিতাই ও নিমাই চক্রবর্ত্তী, তাঁদের শিষ্য হলেন মুরারী গুপ্ত ও সার রমেশ মিত্রের ভাই কেশব মিত্র। একধারে ধ্রুপদ অন্য ধারে পাখোয়াজ, অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের এবং রবি বাবুর বাল্যকালে ধ্রুপদ-প্রীতি খুবই স্বাভাবিক। দ্বিজু বাবুর কথা ছেড়ে দিচ্ছি। রবি বাবু ছেলে বেলা যদুভট্টের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন জানেন বোধ হয়, তার পর গোসাঁই জী আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক নিযুক্ত হলেন। এঁরা দুজনেই বিষ্ণুপুরী, গোপেশ্বর বাবুর পিতা ৺অনন্তনারায়ণের সমসাময়িক। রবি বাবুর গানে মুসলমানী ছোঁয়াচ নেই বোল্লেই হয়।

অথচ অতুলপ্রসাদের গানে খুব বেশী, কারণ ছেলে বেলায় তিনি ঢাকায় ছিলেন, সেখানে মুসলমান গায়কই বেশী ছিল, পাখোয়াজের চেয়ে তবলার আদরই বেশী ছিল। আগ্রার অধিবাসী 'কত কাল পরে বল ভারত রে' প্রভৃতি ঠুংরী গানের রচয়িতা, গোবিন্দ রায় এবং তাঁর পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রদের মুখ থেকে ভাল মুসলমানী চালের গান, বিশেষ কোরে ঠুংরী গান, শুনে অতুলপ্রসাদ ছেলেবেলা থেকেই ঠুংরী গানের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। রবিবাবু যেমন গ্রামে গ্রামে বাউল কীর্ত্তন শুনতেন, অতুলপ্রসাদও ছেলেবেলায় বাউল, ভাটিয়ালী ও কীর্ত্তন শুনতেন ও ভালবাসতেন। তার পর অতুল প্রসাদের লক্ষৌ-প্রবাস আজ বিশ বছর অতিক্রম কোরেছে। দ্বিজেন্দ্র লাল—

তাঁহারা। আজ ওঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবল রবিবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে বলুন।

আমি। মোদ্দা কথা এই যে রবিবাবুর গানে তিন চারটি স্তর আছে। প্রথম ব্রাহ্ম সঙ্গীতের যুগ, এখন যদু ভট্ট, রাধিকা বাবুর মুখে ভাল ধ্রুপদ শুনে হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাংলা কথা বসানই তাঁর কায, যেমন 'গতবার আলো নিভাতে চাই' 'মন্দিরে মম কে' গানগুলি হিন্দুস্থানী সুরের তর্জ্জমা। দ্বিতীয় যুগে তিনি কথায় ভাল ভাল সুর বসাচ্ছেন, যেমন 'ঝর ঝর বরিষে বারি ধারা,' 'রিম, ঝিম, ঘন ঘনরে' প্রভৃতি গান এখন তিনি 'হিন্দুস্থানী সুরের কাঠামোটি বজায় রেখে experiment কোরছেন, সুর গুলি মিশ্র হয়ে যাচ্ছে, এই সময়ের গান গুলি সকলেরই ভাল লাগে। তৃতীয় যুগে তিনি সঙ্গীত রচনা কোরলেন, এই সময় আপনাদের মতে বেখাপ্পা মিশ্র জংলা সুর তৈরী হল, বাহারের সঙ্গে মল্লার মিশল, ভৈরবীর সঙ্গে খাম্বাজ, বেহাগের সঙ্গে কেদারা মিশল। এর পরের যুগ এখনও চলছে, সেই বাউল কীর্ত্তনের যুগ, এর প্রথম স্তরে শুধু বাউল ও দ্বিতীয় স্তরে মুসলমানী কাটামোর ভিতর বাউলের প্রাণ প্রতিষ্ঠান, এই যুগে একেবারে নতুন সৃষ্টি! মিশ্রণকে আপনারা যদি পাপ বিবেচনা না করেন অর্থাৎ ইতিহাসকে যদি খাতির করেন, তা হলে এই শেষ যুগের সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ কোরতেই হবে। মিশ্রণই হচ্ছে সঙ্গীতের ধারা, কেন না Genius compresses the accomplishment of years into an hour glass—। রবি বাবুর সঙ্গীত-প্রতিভা না মানলেও তাঁকে মানুষ বোলেও যদি ধরেন তা হলেও জীবতত্বের বচন অনুসারে Onto genesis হচ্ছে phylogenesis এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অর্থাৎ বানর থেকে মানুষের ইতিহাসও যা, বীজ হতে ব্যক্তির ইতিহাসও তা, তবে অল্পকালের মধ্যে। অবশ্য গান দেহের কথা নয় মানি, কিন্তু দেহতত্বের তুলনা দিলাম মনস্তত্বের সুবিধার জন্য। একটা জড় কিম্বা প্রাণময় জগতের তথ্য, অন্যটি আনন্দময় জগতের সৃষ্টির বর্ণনা।

তাঁহারা। মিশ্রণ হয় মানি, রবিবাবুর প্রতিভা স্বীকার করি, আমরা ওস্তাদ নই তাও জানি, কিন্তু যা হচ্ছে তাই হওয়া উচিত বলি কি কোরে ?

আমি। আপনাদের কে বোলতে অনুরোধ কোরছে? যা হচ্ছে তাই হওয়া উচিত মানতে গেলে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জগৎ এবং একটি মৎলব-বাজ ভগবান মানতে হয়। পৃথিবীটা দাবার ছক নয়, আবার কেবল মাত্র জীবনীশক্তির অবাধ গতিও নয় যে ভগবানের মৎলবে কিম্বা জীবনীশক্তির দুর্ব্বার গতির জোরে যা হচ্ছে তাই হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মানতে হবে। মৎলব আপনার আমার, প্রত্যেকের, এবং অন্ধ জীবনীশক্তিকে পরিচালিত করি সচেতন করি আপনি ও আমি, প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি। অতএব মিশ্রণ হওয়া উচিত কি না, কিম্বা কতটা মিশ্রণ হলে আমাদের ভাল লাগবে ও ভাল লাগা উচিত, এসব ঠিক কোরবে আপনার আমার কান। সেই কান সুরে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

তাঁহারা। শিক্ষিত মানে কি?

আমি। দশ বছর ওস্তাদী গান শুনলে শিক্ষিত হতেও পারে নাও পারে। গোড়া থেকে মনকে সজাগ ও সচেতন না রাখলে যেমন শিক্ষা Pedantry হয়ে যায়, তেমনি গান শোনবার সময় কর্ণযুগলকেও সজাগ রাখতে হয়। দিলীপ যাই বলুক না কেন, প্রাণ কান দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে না, আর শাস্ত্রে যাই লিখুক না কেন, কান দিয়ে প্রাণ উড়েও পালায় না। কানের শিক্ষা প্রাণের শিক্ষা নয়, প্রাণের আবার শিক্ষা কি?

তাঁহারা। তা হলে—!

আমি। তা হলে আবার কি? সে দিন ত দরদ কথাটির মানে যা বুঝি তা বলেছি। রবিবাবুর সঙ্গীতের কৃতিত্ব এ নয় যে, সে সঙ্গীতে দরদ আছে, দরদ দেখাবেন গায়ক। তিনি স্বরের মালা গেঁথে সুর সৃষ্টি কোরবেন। সুর সৃষ্টির তরফে তাঁর বিপক্ষে আপত্তি এই যে, তিনি সুরকে বিকৃত কোরেছেন বাদী স্বরকে না শ্রদ্ধা কোরে, অনুবাদীকে বাদী কোরে এবং বিবাদী স্বরকে প্রকট কোরে, এই যেমন ভৈরবীতে তিনি শুদ্ধ রে ও কোমল রে দুইই ব্যবহার করেন, কোমল গান্ধার শুদ্ধ গান্ধার, কোমল ও শুদ্ধ ধৈবত, কোমল ও শুদ্ধ নিখাদ সবই লাগান। এতে আপত্তি কি? ঠুংরীতে সবই লাগে, অনেক ওস্তাদও তানের সময় সব কার্য্যই করে থাকেন। ও আপত্তি হচ্ছে Begging the question মাত্র। রবিবাবু ভৈরবীতে ঐ সব বেপর্দ্দা ব্যবহার কোরছেন বলবার কি অধিকার আছে আপনাদের? তিনি কি গানের মাথায় স্বাক্ষর কোরে লিখে দিয়েছেন 'ভৈরবী'? আর যদি দিতেনও, তা হলে প্রমাণ হত যে তিনি সুরের নাম জানেন না—সে ভুলে সঙ্গীতের কি ক্ষতি হত? তবে যদি আপনারা বলেন," 'ঐ সুরে ভৈরবীর ছায়া রয়েছে, অতএব ভৈরবীর কায়াকে প্রত্যাশা করছিলাম,' তার উত্তর আমি দেব—'আমাদের অনেক সুরেই অন্য সুরের ছায়া পড়ে, মেঘমঞ্জরী শুনেছেন—বুঝতেই পারবেন না, ললিত, কি বসন্ত কি বাঙ্গালী। আপনারা কোরবেন ভুল প্রত্যাশা আর সেটি না পূরণ হলেই আর্টিস্টের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন। আপনারা যদি রাজ-কন্যা চেয়ে বসেন? এ

রকম আবদার ছাত্র-বয়সেই শোভা পায়, এই যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে বড় অফিসের বড় চাকরী, নেহাৎ না হয় বড়লোক শ্বশুর চাওয়া! পরিচিত কিম্বা প্রত্যাশিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া দূতীর কায হতে পারে আর্টিষ্টের নয়, গানে Realism হয় না, যদি হত তা হলে পাখীর ডাক এবং সমুদ্র-গর্জ্জনের অনুকরণই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হত। রবিবাবুর গানের বিপক্ষে সুর হিসাবে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, তিনি সঞ্চারীতে Surprise note বসান, যেটি এমন একটি সুরের বাদী কিম্বা অনুবাদী স্বর যার সঙ্গে আস্থায়ীর সুরের মিল খায় না—এই যেমন 'একলা ঘরে বসে বসে কি সুর বাজালে' গানটির কেদারা সুর, হঠাৎ দ্বিতীয় পদে তিনি বাউল এনে ফেলেন, 'তুমি কোন পথে যে এলে' গানটি বাউল, হঠাৎ আভোগীতে কোমল ধৈবত এল। 'কবে তুমি আসবে গানটিও বাউল। 'শুকনো ফুলের পাতা দুটি পড়তেছে খসে' লাইনটিতে পঞ্চম ও কোমল ধৈবতের মজা রয়েছে, তারপর 'আ···আ···র সময় নাহিরে' লাইনটি বাউল রইল না, হয়ে গেল কালাংড়া কিম্বা রামকেলী, অর্থাৎ ভৈরোর মা পা ধ্ব, মা গা মা ঋ ধ্ব পা—কি মজা হল ভাবুন দেখি। 'ধীরে বন্ধু ধীরে' গানটিতে প্রায় ১২টি স্বরই লাগছে—ওস্তাদের ভাষায় সুরটি মূলতান ও টোড়ী মেশান, মূলতানের কোমল রে, কোমল গান্ধার, তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবত, তার ওপর আবার টোড়ীর কোমল নিখাদ। হায় হায়, কি কাণ্ড হল ভাবুন! ফাল্গুনীতে যদি কবির মুখে ঐ গানটি শুনে থাকেন, নিদান পক্ষে দিল্লীতে মন্মথ সেনের মুখেও যদি গানটি শুনে থাকেন, তা হলে মিশ্র সুরটিকে ভক্তি না কোরে থাকতেই পারবেন না। শুদ্ধ টোড়ীর সঙ্গে মালকোষ কিম্বা ললিতের শুদ্ধ মধ্যম মিশিয়ে যদি বিলাস খানী টোড়ী হয়, তা হলে 'ধীরে বন্ধু ধীরে' কেন ঠাকুরী টোড়ী হবে না? আমার স্থির বিশ্বাস যে, কবি এমন কোন সুরের সঙ্গে এমন কোন প্রতিকূল অর্থাৎ বেখাপ্পা সুর মেশান নি, যার ফলে সঙ্গীত অশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। বেহাগের সঙ্গে কেদারা খাপ খায়, কেননা দুই সুরেই শুদ্ধ এবং তীব্র মধ্যমের কায রয়েছে এবং বাকী স্বরগুলি বিকৃত নয়। মূলতানের সঙ্গে টোড়ীর মিল খুবই রয়েছে—তফাৎ আরোহী, অবরোহীতে এবং কোমল নিখাদে। গাইবার সময়, অবরোহীতে শাস্ত্রমত শুদ্ধ নিখাদ থেকে কোমল ধৈবতে নামবার সময় বড় বড় ওস্তাদও মূলতানে এমন একটি নিখাদ ব্যবহার করেন, যেটি না শুদ্ধ না কোমল। ওস্তাদে সব কার্য্যই কোরে থাকেন—তাঁদের সাতখুন মাপ,—কেননা তাঁরা বিশ বছর ধরে সার্গমই সেধেছেন! রবি বাবু ওস্তাদ নন, কিন্তু কবি ও আর্টিষ্ট, অনেক ভাল গাইয়ে বাজিয়ের কাছে কান সজাগ রেখেই গান বাজনা শুনেছেন, এবং গান বাজনা সত্যই ভালবাসেন বোধ হয় স্বীকার কোরবেন। তিনি যে ইমনের সঙ্গে ভৈরবী মিশিয়ে, কিম্বা পর পর শুদ্ধ ও কোমল পর্দ্দা লাগিয়ে Sin against taste কোরবেন তা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি অ-সাধারণ, তার মানে সাধারণের কান ত তাঁর আছেই, উপরন্তু আরো কিছু তাঁর

আছে। তৃতীয় আপত্তি তাঁর গানের চালে। তাঁর গানের চাল হদ্দুখাঁর চাল নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বর-সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে অর্থ-সঙ্গীতের, অর্থাৎ টপ্পা ঠুংরীর চাল কি প্রকার স্মরণ রাখলেই দেখা যাবে যে রবিবাবুর গানের চাল অত্যন্ত মধুর। স্বর-সঙ্গীতের Style নির্ভর করে কথার ওপর গায়কের ওপর এবং তালের ওপর। আপনারা স্বীকার কোরবেন কিনা জানিনা, কথা হিসাবে রবিবাবু সোরী মিঞার চেয়ে অন্ততঃ কিছু বড়। রবিবাবুর চাল বুঝতে হলে তাঁর নিজের মুখে কিম্বা দিনেন্দ্র বাবু, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা দেবী এবং রমা দেবীর মুখেই শুনতে হয়। অন্যান্য ছেলে মেয়েরা যে তাঁর গানের সর্ব্বনাশ করে এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁরা হস্সুখাঁ, হদ্দুখাঁর ঘরোয়ানা Style নিয়েও যে সর্ব্বনাশ করে না বোলতে পারেন? অপকর্ম্ম করবার স্বাধীনতা এ যুগে আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু এই যুগ কি আমাদের এমন কোন অধিকার দিয়েছে যে ভক্তের দোষ গুরুর ঘাড়েই ফেলতে হবে? গান গাওয়া চৌরাচওর নয়। যতদিন অবশ্য পুরুষেরা মেয়েদের নাকী সুরের ন্যাকামী ভাল না লাগা সত্বেও, কিম্বা অন্য কারণে পসন্দ কোরতে থাকবেন, ততদিন রবিবাবুর গান গাওয়া মেয়েদের রূপ এবং রৌপ্যের ক্ষতিপূরণই কোরতে থাকবে। কোন আর্ট আগে কি ছিল জানি না, তবে কোন আর্ট যদি পুরুষ ও স্ত্রীর মনোহরণের অস্ত্র হয়, তা হলে সেটি আর্ট থাকে না জানি—কেন না আর্টের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নেই। তালের কথা এই যে, সাধারণতঃ রবি বাবুর গান জলদ একতালা, ঝাঁপতাল তেওরা, কিম্বা কাওয়ালী ঢিমে তেতালাতেই গাওয়া হয়। ধরা যাক্, রবি বাবু ব্রহ্মতাল ও রুদ্রতাল জানেন না, ধামার, আড়া চৌতাল তাঁর গানে নেই, তাঁর ভক্তবৃন্দেরাও ঐ সব তাল সম্বন্ধে Muff মূর্খ। আপনারা ত সব ঐ তাল সম্বন্ধে পণ্ডিত! অতএব আপনারাই শুরু কোরে তাঁর প্রদত্ত সোজা তালেই গান না। আপত্তি কি? সুরে তাল নেই কিন্তু গায়কের গলায় আছে। অতএব রবিবাবু যদি ভুল করেন আপনারা ঠিক কোরে গান্ না! অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে তাল সম্বন্ধে আপনাদের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কেন না সেটি সঙ্গীতের ছন্দের ওপরই নির্ভর কোরছে। তাল সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে, অত বড় ছন্দের ওস্তাদ সাধারণের অপেক্ষা লয় ও তাল বেশী বোঝেন স্বীকার করাই ভাল। ধরুন তাঁর সঙ্গীতে, দিনু বাবুর গলাতেও তাল ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে সুরের তাল এক রকম, কবিতার ছন্দ অন্য প্রকার। সুরকে যে কোন তালেই গাওয়া যায়, তার নিজস্ব কোন তাল নেই, কিন্তু সঙ্গীত তার কথার ভাব অনুসারে ছন্দে বাঁধা। সঙ্গীতে তালের অপেক্ষা লয়ই বেশী প্রয়োজনীয়। তাও ধ্রুপদে আস্তায়ীর লয় অন্তরার লয়ের চেয়ে দ্রুততর হয়, চতুরঙ্গে ত হয়ই। রবি বাবুর সঙ্গীত লয়ভ্রষ্ট হয় না, কেন না তাঁর সঙ্গীত কবিতা হিসাবেও খুব বড়। সঙ্গীতে তাল ভ্রষ্ট হবার কিছু স্বাধীনতা আছে, যেটি

কবিতায় নেই। সঙ্গীতে তাল ভ্রষ্টতার সীমা লয়ই নির্দ্ধার্য্য করে। অবশ্য সে সীমা গড়ের মাঠ নয়।

তাঁহারা। তর্কটা ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছে। আমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়ে জেতা খুব শক্ত কথা নয়।

আমি। আমার দুর্ভাগ্য যে আপনারা এত সহজ জিনিষটি বুঝতে পারছেন না। উত্তরার পাতায় দিলীপ কুমার গোটা কয়েক দামী কথা বোলেছিল পড়ে দেখবেন তা হলেই বুঝবেন। এক কথায় আমার বক্তব্য এই যে, সুরে বসান কবিতা অর্থাৎ Dramatised music, স্বর-সঙ্গীত অর্থাৎ সুর এবং অর্থ-সঙ্গীত, অর্থাৎ সঙ্গীতকে যেমন আলাদা কোরেছেন তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য তালও বিভিন্ন হওয়া উচিত, যদিও লয়ভ্রষ্ট হওয়া একেবারে Sin against the Holyghost মানতে হবে। কীর্ত্তনে এমন তাল আছে যেগুলি ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয় না, বাউলে গোটাকয়েক সোজা তালই প্রশস্ত, ঠুংরী গানে সাধারণতঃ ঠুংরী তালই প্রযোজ্য, খেমটা গানে খেমটা তালই প্রসিদ্ধ, কাজরী গানে সাধারণতঃ দাদরা কিম্বা কাহারোয়াই চলে,—যেমন হোরিতে ধামার এবং ধ্রুপদে চৌতাল। কীর্ত্তন কি বাংলা দেশে কি মাদ্রাজে, ঠুংরী কি দিল্লীতে কি লক্ষ্ণৌএ, কাজরী কি মির্জ্জাপুরে কি কাশীতে সর্ব্বক্ষেত্রেই অর্থসঙ্গীত এবং সেই অর্থসঙ্গীতে যখন কথার তান তোলা হয় তখন বাঁয়া তবলা চুপ কোরে থাকে, কিন্তু রবিবাবুর গানে যদি তবলচীকে একটু চুপ কোরতে অনুরোধ করা হয় তা হলে তাঁকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে—এ রকম অভিমানের কারণ নেই। অবশ্য কোন অভিমানেরই কারণ থাকে না। কি জানেন যার যা তার তা, মুড়ীর সঙ্গে সরষের তেলই ভাল লাগে, গোটাই ভাল লাগে, ঘিও নয়, আর sauceও নয়।

তাঁহারা। মশাই মুড়ী খাওয়াতে পারেন? তর্ক অনেক দূর গড়িয়েছে।

আমি। নিশ্চয়ই। কাশী থেকে মুড়ী এসেছে। আমার এক বন্ধুর এবং আপনাদের বিশেষ বন্ধুর শ্যালিকা নিজে হাতে ভেজেছেন। তবে দানা গোটা নেই।

তাঁহারা। তা আর কি করা যাবে! মধুর অভাবে গুড়, অর্থাৎ একটু sauce দিন, আপনারা সাহেব হয়ে পড়েছেন এই দুঃখ! যাই হোক রবি বাবুর বিপক্ষে এমন আপত্তি নিজেই তুললেন যার উত্তর নিজেই দিতে পারেন।

আমি। তর্কের রীতিই তাই। শঙ্করাচার্য্যও তাঁর বেদান্তভাষ্যে আমার রীতি অবলম্বন কোরেছেন। অতএব আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আপত্তি খণ্ডনের পর ও-কথা শোভা পায় না। আপনারাই পূর্ব্ব হতে আপত্তি তুললেন না কেন?

তাঁহারা। দেখুন আপনি অত্যন্ত দাম্ভিক! এখন একটু খানি লঙ্কা আনতে বলুন।

আমি। শেষ কথা আপনারাই বোলেছেন। আমি বরাবরই অন্যকে শেষ কথা কইতে দিই।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নাপোলিয়ঁ

প্রতীচী তখন শঙ্কা-মগন,
বাজিছে ডঙ্কা—রক্ত চাই!
অত্যাচারের কুটিল ভ্রূকুটি-
-ভঙ্গীতে আর দর্প নাই।
টলমল রাজ-সিংহাসনের
স্বর্ণে মিলায় শীর্ণ ছায়া।
কুবেরেরা দূরে পলায়,—পারে না
ধরিয়া রাখিতে মহ-মায়া।
নাচে বিপ্লবে নব-জাগ্রত
মানব মনের বৈতাদল,
অবিচারে ঘোর মর্ত্ত্যের প্রাণ
শোণিত-পিপাসা তার কেবল।
রক্তকালীর খড়্গ ঝলিছে
অপরূপ অতি ভীষণ শ্রী ও!
সম্ভব হল সেই দিন—তব
আবির্ভাব কি অভাবনীয়—,
নাপোলিয়ঁ, নাপোলিয়ঁ!

বজ্রের মত কে এল আবেগে
সচকিত করি নিখিল হিয়া,
সহসা সঘন আশঙ্কা আর
আশায় বক্ষে উদ্বেলিয়া?
মহারুদ্রের ধ্বনিল তূর্য্য,
"কে চাহে অমৃত মৃত্যু? আয়,
জীর্ণ জরা চূর্ণ করিতে!"
'আমি', 'আমি', 'আমি,—সবাই ধায়।
মা ভৈঃ বন্ধু, মৃত্যু-সমীপে
কারা আজ নব জীবন যাচে।
—শান্তি-পীড়িত অচরিতার্থ
প্রাণের কিছু কি মূল্য আছে?

দিক্-পারাবার করি তোলপাড়
ভাঙিয়া পৃথিবী গড়িবে কি ও?
লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল,
"এসেছে সে ওই অতুলনীয়,
নাপোলিয়ঁ নাপোলিয়ঁ!

এ কোন্ শক্তি? কোথা থেকে এল?
কোথা অবসান? কে জানে হায়!
বিদ্যুৎ-সম উন্মাদ-বেগ,
ঘূর্ণি-সম বহিয়া যায়।
জানে না বিরাম, মানে না বারণ,
অবাধ গতি,—কে রোধিবে পথ?
সিংহাসনের অলসার জীব
কেঁপে ওঠে ত্রাসে আর্ত্তরব।
"নেমে এস নীচে, দুর্ব্বল ভীরু;
কাপুরুষ, আজ মরমে মর!"
শ্রেষ্ঠ যে সে-ই, সম্রাট তাই,
আসন তাহার উচ্চতর।
দেশের বন্ধু, শঠের শত্রু,
অত্যাচারীর অনাত্মীয়।
অতুল দৃপ্ত, দৃঢ় বীর!
জনগণের চির প্রিয়,
নাপোলিয়ঁ, নাপোলিয়ঁ!

যুদ্ধে কি ঘোর উতরোল
গোলার সমুখে অটল কায়।
জীবন মরণ—সন্ধিস্থলে
ধীর, অভয় মূর্ত্তি হায়।
কামানের বাণী কি শিখালে বীর?
বারুদ বজ্র-বিহারী!

অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা লভিলা
    ফরাস-দেশের পুরুষ নারী।
অসমসাহসী সে অতিমানব,
    নব প্রতিভার সূর্য্য জ্বলে।
অন্যায় শিরে বজ্রধ্বনি না
    থামিতে কেনায় ভস্ম হলে।
এক দিকে একা, ও দিকে পৃথিবী,
    কিছু নাই ছাড়া প্রতিভা বীর।
সেকেন্দরের মহিমাও ম্লান
    করি জ্বলে কোন্ হোমোমি ও!
        নাপোলিয়ঁ, নাপোলিয়ঁ।

যেই নির্মম বহ্নি-দহন
    প্রতীচীর প্রাণ করিল শুচি
কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা নিল
    সব কলঙ্ক-কালিমা মুছি।
অতিকঠোর আদেশ তাহার
    কুসুমকোমল শুনা যায়,
বিরাট প্রাণের চঞ্চল লীলা
    জীবন মৃত্যুরে চমৎকার।
কাঁসের মাথায় মুকুট পরাতে
    ছুঁড়ে ফেলে দেয় ছিন্নমালা,
পরাণ-প্রিয়ার পূজার অর্ঘ্য,
    —শ্রাবণের মত হৃদয়ে জ্বালা।
সাগরের মত বেদনা গভীর,
    মমতার জলে ধরিত্রী ও;
ঝড় ও মেঘের মত বহে যায়
    অপরাহত ও অধিবীর,
        নাপোলিয়ঁ, নাপোলিয়ঁ।

নব বসন্ত-স্পর্শে—জীর্ণ
    শুষ্ক পত্র ঝরিয়া যায়।
অকাল দৈব আলোক প্লাবনে
    তামসী রাত্রি মরিয়া যায়।
নব-বিধানের বার্ত্তা কে আনে,
    অজানা দেবতা, অমর্ত্ত-দূত!
জীবন মরণ মিলি একত্রে
    বাজে সে ছন্দে কি অদ্ভুত!
নাচে ধূর্জ্জটি, জটাবিমুক্ত
    করুণা ধারায় গঙ্গা ঝরে;
বীণার সঙ্গে বাজিছে বিষাণ,
    সৃষ্টি—প্রলয় বক্ষে ধরে।
অগ্নি বদনে কণ্ঠে ধ্বনিছে,
    উড়িছে কেতনে উত্তরীয়;
বাহিরের নয়, অন্তরের
    মনোরাজ্যের অধিপতি ও,
        নাপোলিয়ঁ, নাপোলিয়ঁ!

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দশচক্র

দ্বিতীয় ভাগ

(১)

কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী উড়িয়া আসিলেন। শুধু ক্ষণিকের জন্য তিনি রামময়ের জীবনকে একবার স্পর্শ করিয়া আবার কোথায় উড়িয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু রামময়ের মাথায় একটা শিখা গজাইল, এক বছরের চারা, এখনো খুব ছোট। অভ্রভেদী সৌধশিখরে একটা ছোট্ট অশ্বত্থচারার মত শিখাটাকে খুব ছোট করিয়া দেখিবেন না। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, ইহার শিকড় শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মূলভিত্তি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং সমস্ত গাঁথুনি শিথিল করিয়াছে। এমন আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে এক সময়ে ঐ শিখার অন্তরালে মানুষটা লোপ পাইবে।

রামময় এতদিন ছিলেন জিজ্ঞাসু, আজ হইয়াছেন জ্ঞাতা। এতদিন তাঁহার বিশ্বাসের চালায় বড় বড় সন্দেহের ফোকর দিয়া যেখানে বাহিরের আলো প্রবেশ করিত, আজ সেখানে তুলোট পাতার ছাউনি পড়িয়াছে। ভাঙা ঘরে লোককে আহ্বান করিতে এতদিন তাঁহার সঙ্কোচ ছিল; আজ নিশ্ছিদ্র ছাউনির নীচে সকল পথহারাকেই তিনি আমন্ত্রণ করিতেছেন। এতদিন তিনি মনে করিতেন বুদ্ধির সাহায্যে সত্যকে সংগ্রহ করিতে হয়। তাই নিজের বুদ্ধি খাটাইতে শিখাইয়া, তিনি ছেলেদের সকল বই পড়িতে দিয়াছেন, সকল সমাজের সকল লোকের সহিত মিশিতে দিয়াছেন। আজ কিন্তু তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে চান। শাস্ত্রের placenta হইতে যাহাকে সত্য সংগ্রহ করিতে হয়, অনায়াসে, নিজের ক্ষুদ্র দলের গর্ভান্ধকারে সে লোক বেশ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। তাহার পক্ষে ফাঁকা হাওয়া একেবারে অনাবশ্যক।

ছেলেদের ফিরাইয়া আনিতে চান। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। তিনি এতদিন তাহাদের সহিত যে-ভাবে কথা কহিয়া আসিয়াছেন আজ ঠিক তাহার উল্টাটা একেবারে করিতে পারেন না। যুক্তির সুরটাও বজায় রাখিতে হয়। ময়দার সঙ্গে soapstone-এর গুড়া মিশাইতে চান। বেমালুম ভাবে মিশাইতে গেলে লাভ থাকে না। এবং বেশী মিশাইলে ভেজাল ধরা পড়িবে। বিশেষতঃ নিশির কাছে। কারণ সে বড় হইয়াছে। নিশিকে তিনি এক প্রকার ছাড়িয়াই দিলেন। কেবল তাহার গলায় পৈতা নাই বলিয়া দু একবার আপত্তি করিয়া ছিলেন। আর্য্যভট্ট যখন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন, তখন পৈতা না-রাখা যে অতি গার্হিত কার্য্য, এরকম একটা যুক্তিও দিয়াছিলেন। নিশি কিন্তু কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। রামও দেখিলেন, যে নাস্তিকতা জামার নীচে চাপা থাকিবে তাহার জন্য বেশী তাগিদ করাও ভাল নয়। রামের সমস্ত চেষ্টা পড়িল শশীর উপর।

(২)

শশী আজকাল অনেক সময় ভূপতির বাড়ীতে কাটাইত এবং নৈবেদ্যের শশাটা কলাটার জন্য হাত পাতিয়া খুড়িমাকে বিব্রত করিত। খুড়িমা যদি বলিতেন "আজ কিছু নেই নেই, তুই যা," শশী বলিত 'আচ্ছা, তবে বস্‌লুম।' এ নাছোড়বান্দাকে প্রতিভা কিছুতেই পারিয়া উঠিতেন না। নানা রকমের ঘুষ দিয়া তাহার মন জোগাইবার চেষ্টা করিতেন। মাঘের শীতের মত দুরন্ত শশীর কাছে আপনাকে রিক্ত করিয়াই তাঁহার পুলক জাগিত।

ভূপতির সহিত রামের পরিচয় ছিল না। তিনি লোক মুখে যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে ভণ্ড বলিয়াই জানিতেন। প্রতিভা লেখাপড়া জানেন, গান-বাজনা করেন, অথচ গৃহকর্ম্মে অপটু ন'ন; পূজা করেন, অথচ কৃশ্চানের সহিত এক বিছানায় বসিতে দ্বিধা করেন না; এই সব শুনিয়া তিনি এক সময়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং ঐ একই কারণে এখন তাঁহাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। সাদা চ'খে যে লেখা সুন্দর ও সুস্পষ্ট মনে হইয়াছিল, ধর্ম্মের দর্পণে সেই লেখাই একেবারে উল্টা ও অস্পষ্ট দেখাইল।

ভূপতির বাড়ীতে যাতায়াত করিতে করিতে শশীর আর একটা উপসর্গ জুটিল। নীলিমা-নাম্নী যে কৃশ্চান মহিলার কাছে প্রতিভা লেশবোনা শিখিতেন, শশী প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহাকে নগেন্দ্রের কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিল এবং নিজে অগ্রসর হইয়া আলাপ করিল। শশী বলিল "আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন, আশা করি।"

নীলিমা। চিন্‌তে পেরেছি। আপনার নেড়া মাথা ছিল না?

শশী বড় আঘাত পাইল। কেন নেড়া মাথাই কি তাহার একমাত্র বিশেষত্ব। যাহা হউক, একথা চাপা দিয়া বলিল, "সেদিনকার কথা মনে হ'লে আজও আমার কষ্ট হয়। সে দিন আপনার বাবার সঙ্গে বড় অভদ্র ব্যবহার করেছিলুম।"

নীলিমা। কৃশ্চান পাত্রীকে অপমান সহ্য করতেই হয়। এক সময় তাদের যে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হ'ত। Cross বহন করা ত আরামের কাজ নয়।

শশী। সেদিনকার অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

নীলিমা। আপনি অনুতপ্ত হ'লে ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন।

শশী। আপনি কিছু মনে করবেন না। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা না করলেও চলবে।

শশী ভাবিয়াছিল, তাহার এই কথায় নীলিমা হাসিবেন। কিন্তু তিনি হাসিলেন না, অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া গেলেন। ইহাতে শশীর অপরাধ বাড়িয়া গেল। আবার নূতন করিয়া ক্ষমা চাওয়ার পালা পড়িল। এমনি করিয়া ধাপে ধাপে শশী একদিন নগেন্দ্রের অন্দরমহলে আসিয়া উপস্থিত হইল। শশীর বর্ত্তমান বিনয়নম্র ব্যবহারে নগেন্দ্রও পুরাণ কথা ভুলিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেক জাল ছিঁড়িয়া, ছিপ ভাঙিয়া যে মাছটা ধরা দিল, তাহার প্রতি

ধীবরের যেমন গর্ব্বমিশ্রিত মমত্ব থাকে, শশীর প্রতি নগেন্দ্রের সেইরূপ একটা মনোভাব ছিল। তিনি বাইবেলের ভাষায় তরজমা করিয়া মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন, শশী এবার নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভেড়ার পালে ভিড়িতে আসিয়াছে।

(৩)

যাঁহারা বলেন নিজের দল ভারি করাই নগেন্দ্রের জীবনের একমাত্র সাধনা তাঁহারা ভ্রান্ত। নগেন্দ্র Native Christian-এর দল পুষ্ট করিতে চাহিতেন। নিজে কিন্তু সে দলে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল আরও একটি উচ্চতর ও মহত্তর দলে নিজেদের বিলীন করা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিজের পরিবারকে কাঁটা ও চামচের সাহায্যে মাটি হইতে টেবিলে তুলিয়াছেন, এবং মেয়েদের জুতার তলায় আড়াই ইঞ্চি করিয়া heel যোগ করিয়াছেন। এই heel-এর উপর চড়িয়া তাঁহাদের খুব বড় দেখাইত। তাহার পুত্র Viceman-এর কাজে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিত। পুত্রের Mechanical Engineering হইতে নগেন্দ্র এই শিক্ষালাভ করিলেন যে একটা সোজা পেরেককে যেখানে চালান যায় না, একটা Screw অতি সহজেই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে। তাই তিনি ছেলের নামটাকে Cork screwর মত পাকাইয়া বাঁকাইয়া ফেলিলেন, এবং ইহার সাহায্যে সে অনায়াসে ইউরোপীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া দেড়শত টাকার বেতনের Skilled labourer হইয়া গেল।

নগেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা একজন ফিরিঙ্গী firemanকে বিবাহ করে। কনিষ্ঠ নীলিমার রূপ ছিল। ইনি চেষ্টা করিয়া একজন খাঁটি ইংরাজকে পতিরূপে লাভ করেন। নগেন্দ্রের মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার সন্তান গুলিকে যীশুর সেবায় নিয়োজিত করা। নীলিমা তাঁহার মুখের কথাটাই শুনিলেন,—প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন। নগেন্দ্র ভাবিলেন কতকগুলা লেখাপড়া শিখাইয়া তিনি মেয়েটাকে নষ্ট করিলেন। হিন্দু জেনানায় যীশুর বার্ত্তা বহন করিবার ফলে ইনি স্বর্গে খুব সুখ, সুবিধা ভোগ করিবেন এ বিষয়ে নগেন্দ্রের সন্দেহ ছিল না। তিনি স্বর্গকে খুব ভাল বলিয়াই জানিতেন। মর্ত্তকে হয়ত আরও ভাল মনে করিতেন।

কৌচ, কেদারা, পরদা, পাপোষ খচিত নগেন্দ্রের সংসার, তাঁহার পুত্রের "পা ফাঁক করে Cigar টা" খাওয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বনেট, বডিস, স্কার্ট, এবং কনিষ্ঠার প্রচারকের শেমিজ শাড়ী, সমস্তই শশীর হৃদয় হরণ করিয়াছে—এ সংবাদও ক্রমে ক্রমে রামের কানে পৌঁছিল। এই ভয়াবহ আবেষ্টনের বিষক্রিয়া হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার তিনি এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ভাবিলেন কিছুদিন ইঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে মগ্ন রাখিবেন। নিজে পড়াইবেন না, তাহাতে শাস্ত্রের মর্য্যাদা ঠিক রক্ষা না হইতে পারে। ইহাকে পিতৃবন্ধু

শিবধন তর্কালঙ্কারের টোলে ভর্ত্তি করিবেন, স্থির করিলেন। শশীর জ্ঞানস্পৃহা প্রবল, সে নিজের চেষ্টায় ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান কিছু কিছু শিখিয়াছে। সংস্কৃত শিখিবার লোভে সে কলেজের অবকাশে টোলে পড়িতে সম্মত হইতেও পারে।

(৪)

শিবধন তর্কালঙ্কারের জীবনে একটি কাজ ছিল, জ্ঞানার্জ্জন। শয়ন ভোজনাদিকে তিনি জীবনব্যাপারে বিঘ্ন মনে করিতেন, ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারিয়া লইতেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রকেই একমাত্র জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া জানিতেন; এবং এ ভাণ্ডারের একটি কণাও অনাস্বাদিত রাখিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, উপনিষদ,—সর্ব্বত্র তাঁহার সমান অধিকার ছিল। যে কোন সময়ে, যে-কোন শাস্ত্রের কূটতর্কের মীমাংসা তিনি মুখে মুখে করিয়া দিতে পারিতেন। এ মীমাংসায় কিন্তু লৌকিক উপকার কিছু হইত কিনা জানা নাই। শিবধনের পাণ্ডিত্য ছিল পিরামিডের মত বিরাট, বিচিত্র, ও অনাড়ম্বর। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ইহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে বলিতে ইচ্ছা করে 'বাবা! কি প্রকাণ্ড পণ্ডশ্রম!'

তাঁহার পকেট ছিল না, Note book-ও ছিল না। তিনি নস্যদানীকে হাতের মুঠায়, ও বাণীকে জিহ্বাগ্রে বহন করিতেন। বাণী জিহ্বাগ্রেই রহিয়া গেলেন বলিয়া বেদান্ত ও মনু-পরাশর, কর্ম্মবাদ, ও পাঁজির বচন পাশাপাশি বাঁচিয়া রহিল;—মনোবিন্দুর অল্প পরিসরের মধ্যে আসিয়া পরস্পরে কাটাকাটি করিয়া মরিল না।

শিবধন অনেকগুলি ছাত্রকে সন্তানের মত পালন করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ একটু বুদ্ধির পরিচয় দিলে আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তেমনি একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেন যদি কেহ ব্যাকরণ ভুল করিত।

শিবধনের এইরূপ একটা চরম দুঃখের দিনে রামময় শশীকে লইয়া টোলে উপস্থিত হইলেন। রামকে দেখিয়াই শিবধন একটি ছাত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "শুনেছ? এই হতভাগা বলে কিনা অধর্ম্ম শব্দের উত্তর ষ্ণিক প্রত্যয় করে অধার্ম্মিক শব্দ হয়েছে। তুমি ত একটু আধটু সংস্কৃত পড়েছ। আচ্ছা, ষ্ণিক প্রত্যয় করে কি ক'রে অধার্ম্মিক হয় আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

রামময় ইহার উত্তর না দিয়া শশীকে বলিলেন "তুমি বল্‌তে পার ষ্ণিক প্রত্যয় করে কি হয়?"

শশী বলিল "অধার্ম্মিক হয়।"

শিবধন। বা, বা, বাঃ! বাবাজী দীর্ঘজীবী হও! দীর্ঘজীবী হও!—ছেলেটী তোমার সংস্কৃত জানে দেখ্‌চি।

রাম। আমি কিছু কিছু শিখিয়েছি।

শিব। বড় আনন্দ দিলে, বাবা। আজ আমি ভারি খুসী হয়েছি। ভারি খুসী হয়েছি।

রাম। তবে ওটাকে গ্রহণ করুন।

শিব। পড়্‌বে ?

রাম। হাঁ সংস্কৃত পড়াব। বড় ছেলেকে নাস্তিক করেছি। এটাকে আর এক রকমে মানুষ কর্‌তে চাই।

শশী। সংস্কৃত প'ড়ে বুঝি আর কেউ নাস্তিক হয় না ?

শিব। এইবারে! কি উত্তর দেবে দাও। চার্ব্বাকের নাস্তিক্যদর্শন ত সংস্কৃতেই লেখা।

রাম। তা হোক্। কিন্তু আমার ছেলেকে নাস্তিক করবেন না যেন।

শিব। নাস্তিক করবে কি বল ? কল্লেই হল ? টাকেটা পর্য্যন্ত আপনি ধরে না, একজনকে ধরিয়ে দিতে হয়। আর এই আকাশ জুড়ে এতগুলো সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র এতদিন ধরে চল্‌চে, এ কি আপনি চল্‌চে ? জগৎ এতবড় একটা কার্য্য, এর কোনো কারণ নেই ? তুমি বল্লেই মেনে নোবো ?

শশী। আপনি ধ'রে নিচ্ছেন জগৎ কার্য্য, কি না তা কৃত হয়েছে। এবং এর থেকে অনুমান কচ্চেন যে যা কৃত হয়েছে,—তার একটা কর্ত্তা আছে।

শিব। বাঃ! ছোক্‌রা কথা কইতে জানে! তা যাই বল, নাস্তিককে তকে হটাবার জো নেই।

রাম। আপনি অনুগ্রহ ক'রে ও কথা গুলো আর বল্‌বেন না। আমি ওর মনে যথেষ্ট নাস্তিকতা ঢুকিয়েছি। এখন সে সব মুছে ফেল্‌তে চাই।

শিব। কিন্তু নাস্তিকদের সঙ্গে তর্ক ক'রে সুখ আছে। দুজন পালোয়ানে কুস্তি ক'রে যেমন সুখ পায়।

রাম। আপনি শক্ত সমর্থ মানুষ,- কুস্তি করে সুখ পেতে পারেন। আপনার হার্‌লেও ক্ষতি নেই, জিত্‌লেও ক্ষতি নেই। ও ছেলেমানুষ, বড় পালোয়ানের হাতে পড়্‌লে মারা যাবে।

শিবধন হাহাঃ করিয়া কিছুক্ষণ হাসিয়া বলিলেন "তা ও পথ দিয়ে আর যাব না ?"

রাম। না। আপনি ওকে স্মৃতি পুরাণ এই সব পড়ান।

শিব। আচ্ছা তাই হবে।

রাম। হাঁ, তাই করবেন দয়া ক'রে। আমি ওর ইংরাজী পড়া বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলুম, পাছে ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা হারায় ব'লে। কিন্তু ও তাতে রাজী হল না।

শিব। তোমার ঐ ইংরিজী পণ্ডিতেরা মাঝে মাঝে বেশ কথা বলে।

রাম। কথা মন্দ বলেন না। ঐতেই ত আমাদের মাথা খাচ্চে।

শশীকে টোলে ভর্ত্তি করিতে রামময়কে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। সে সহজেই রাজী হইয়াছে। সে ত রাজী হইল। কিন্তু রামময় কি কাজটা ভাল করিলেন? তিনি বুদ্ধিমান্ লোক। তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে গঙ্গাজল দিয়া arrowrootকে গুলিয়া কাদা করা যায়, কিন্তু Paris plasterকে যায় না কিন্তু বুঝিবে কে? রামের বুদ্ধির টিক্‌টিকিটা যতদিন জীবন্ত ছিল, ততদিন সে পথবিপথে ঘুরিয়াছে। ধর্ম্মের তাড়নায় রামময় সর্ব্বাগ্রে আঘাত করিলেন এই বিপথগামী টিক্‌টিকির উপর। টিক্‌টিকি পলাইয়াছে। এখন রামের মাথার মধ্যে যেটা নড়িতেছে, সেটা সেই পলাতক টিক্‌টিকির খসা লেজ। লেজের চাঞ্চল্য আছে, গতি নাই। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা তাহার কর্ম্ম নয়।

(৫)

নগেন্দ্র দেখিলেন শশী হাতছাড়া হইয়া যায়। ইহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এবং কয়েকদিন ইতস্ততঃ করিয়া টোলের মধ্যেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবধন তখন অধ্যাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এবং তাঁহার চারিপাশে অনেকগুলি ছাত্র ছিল। নগেন্দ্র শাখাপ্রশাখা ভাঙিবার চেষ্টা না করিয়া একেবারে গোড়া ঘেঁসিয়া কোপ মারিলেন। শিবধনকে বলিলেন "পণ্ডিত মশায় খালি ব'সে বসে ব্যাকরণের খচাখচি করচেন। ছেলেদের ধর্ম্মের দিকটা একবার দেখচেন না।

শিব। ধর্ম্মকে আমি দেখ্‌বো কি? ধর্ম্মই আমাদের দেখ্‌বেন।

নগেন্দ্র। অত সহজ নয়, পণ্ডিতমশায়। তা যদি হ'ত ত ঈশ্বর তাঁর নিজের ছেলেকে পাঠাতেন না, পৃথিবীতে।

শিব। আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের ছেলে।

নগেন্দ্র। কিন্তু যীশু তাঁর ঔরসপুত্র।

শিব। কি ক'রে জান্‌লেন যে যীশু তাঁর ঔরসপুত্র?

নগেন্দ্র। কি ক'রে জান্‌লুম? এই বইখানি প'ড়ে দেখুন।

নগেন্দ্রের হাতে সর্ব্বদাই দুএকখানা বই থাকিত।

শিব। ও বইএর কথা যদি বিশ্বাস না করি?

নগেন্দ্র। বিশ্বাস করবেন না? যীশুর নিজের মুখের কথা এতে রয়েছে, জানেন?

শিব। তাঁর কথাই বা বিশ্বাস করবো কেন?

নগেন্দ্র। ঈশ্বরের নিজের পুত্র যীশু, তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন না?

শিব। কে বল্লে তিনি ঈশ্বরের পুত্র?

নগেন্দ্র। লেখা রয়েছে যে, মশাই। আপনি বাইবেল পড়েননি তাই এরকম বলচেন। একবার পড়ুন।

শিব। না মশায়, আমার ও বইএ দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান।

নগেন্দ্র। না আপনাকে পড়্‌তেই হবে। আপনি যে না প'ড়ে কথা কইলেন, তা হবে না। আপনাকে পড়্‌তেই হবে।

তিনি শিবধনের হাতে বই গুঁজিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে শিবধন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আঃ! কি করেন মশায়? আমি চাই না পড়্‌তে, তবু আমাকে পড়্‌তে হবে! নিয়ে যান আপনার বই।"

নগেন্দ্র নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া গেলেন। তবে যাইবার পূর্ব্বে ছাত্রদের হাতে অনেকগুলি বই দিয়া গেলেন। তাঁহার আশা ছিল এ বইগুলি চারের মত কাজ করিবে। ইহার পরে তিনি একদিন সুবিধামত আসিয়া তাঁহার বক্তৃতার ছিপ ফেলিবেন আর গণ্ডা গণ্ডা ছাত্রকে কৃশ্চিয়ানীর ডাঙায় টানিয়া তুলিবেন।

ছাত্রদের হাতে কৃশ্চানী বই দেখিয়া শিবধন জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা ও বই নিয়ে কি করবে?"

একজন ছাত্র বলিল "এগুলোকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে পথে ছড়িয়ে দোবো।"

শিব। এ কি কথা! একজনের ধর্ম্মপুস্তক তুমি টুক্‌রো টুক্‌রো করবে?—যাও তার বই ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

সেদিন আর অধ্যাপনা করা হইল না। নগেন্দ্রের স্থূলহস্তাবলেপে শিবধনের মনের যন্ত্র বিকল হইয়া গেল। তিনি কাতরোক্তি করিলেন "কি আপদ! সকাল বেলা এক বেটা চামার এসে, তার বাইবেল মাইবেল দিয়ে ছুঁয়ে মুয়ে লণ্ডভণ্ড করে গেল! এক্ষুণি আমাকে স্নান ক'রে তবে ঘরে ঢুক্‌তে হবে। আ—হ্‌!

(৬)

মধুসূদন হালদারের কন্যা শ্রীমতী চারুশীলা পিতামাতার আদরের সন্তান ছিলেন। শ্বশুর বাড়ীতে তাহাকে হয়ত কত কষ্ট পাইতে হইবে এই চিন্তায় তাঁহারা সারা হইতেন। তাই বিবাহের পূর্ব্বের কয়েকটা বৎসর এ যাহাতে পরমসুখে থাকিতে পারে সে বিষয়ে দুই জনেরই দৃষ্টি ছিল। বাস্তবিক, চারুশীলার মত সুখ খুব কম কুমারীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

এইবার পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে একটা ধাঁধা উপস্থিত হইল। চারুশীলার এত সুখী হইবার কারণ কি? সে কি গাছে উঠিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, সাঁতার কাটিয়া, এবং যাদুঘর ঘুরিয়া দিন কাটাইত? না। সে কি লোকলস্কর সঙ্গে লইয়া 'দিল্লী, দিল্লী, কলম্বো ও বোম্বে' ঘুরিয়া

আসিয়াছিল ? না। সে কি গান গাহিত, কবিতা লিখিত, এবং নিজের হাতের oil painting Exhibition এ পাঠাইত ? না। তবে তাহার এত সুখ কিসে ?

মধুসূদন ও তাঁহার স্ত্রী একযোগে উত্তর করিবেন "তাহাকে কখনও কুটিটী পর্য্যন্ত নাড়িতে দেওয়া হয় নাই।" নিষ্ক্রিয়তার স্বর্গলোকে সে জীবনের তেরটা বৎসর কাটাইয়াছে।

তারপর নিশির ঘরে আসিয়া দেখিল, এখানেও সকলে তাহাকে সুখী করিতে চান। কাজেই সে নিঃসঙ্কোচে নিজের সুখের পথ বাছিয়া লইল।—শুইয়া রহিল। শুইয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। আহারাদিতে ঘণ্টাখানেক, এবং সাজসজ্জায় ঘণ্টা দুই, ইহা ছাড়া বাকী সময়টাকে লইয়া করিবে কি ? সে দাসী নয় যে গৃহকর্ম্ম করিবে, মেমসাহেব নয় যে লেশ বুনিবে।

মধুসূদন নিজে উচ্চশিক্ষিত। তাঁহার ছেলেরাও উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু মধুসূদনের মত সেকালের উচ্চশিক্ষিত লোকদের লক্ষ্য ছিল নারীর দেবীত্বের প্রতি। মাথার উপরে ছাতা ও ভিতরে কথ—এ দুটাকেই তাঁহারা দেবীত্বের অন্তরায় মনে করিতেন। এ দেবীত্ব-অর্জ্জনের একমাত্র উপায় ছিল জন্মগ্রহণ। কাষ্ঠফলকে নিজের নাম লিখিয়া তৎপূর্ব্বে 'কবিরাজ' শব্দ যোগ করিলে যেমন নাড়ীজ্ঞান টনটনে হইয়া উঠে, তেমনি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেই নারীগণ দেবী হইয়া যাইতেন। তার পর সংশিক্ষা ও সৎ সঙ্গের প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা শুইয়া, বসিয়া, তাস খেলিয়া ও চুলের উপর আলবার্ট তুলিয়া নিজেদের দেবীত্ব অক্ষুন্ন রাখিতেন, এবং মৈত্রেয়ী গার্গী ও খনার দলে মিশিয়া যাইতেন। খনার মত পুথি হইয়া যাইতেন এমন কথা বলিতেছি না, তাঁহার মত সতী সাধ্বী হইতেন, ইহাই আমার বক্তব্য।

(৭)

নিশি ডাক্তারী পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে চাকুরী পাইয়াছে। সে সকাল সাতটায় বাহির হইত এবং বেলা দুটা তিনটার সময় বাড়ী ফিরিত। তার পর ক্লান্ত শরীরে জল কোথায় গামছা কোথায় খুঁজিতে খুঁজিতে দু মহল বাড়ী চষিয়া ফেলিত। একদিন নিশির মনে হইল তাহার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই। তাহার সবই আছে, অথচ কিছু নাই। তাহার এই সামান্য কাজটাও তাহার স্ত্রী করিতে পারে না ? অমনি মনে হইল, এত শিক্ষা পাইয়াও তাহার মনের বর্ব্বরতা ঘুচে নাই। সে পুরুষ বলিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে সেবার দাবী করিতেছে। কিন্তু সেও ত সেবা করিতেছে, রোগ শোক অগ্রাহ্য করিয়া ইহাদেরই জন্য ত প্রাণপাত করিতেছে। ছি ছি ! সে কি কিছু প্রাপ্তির আশায় ইহাদের সেবা করিতেছে ?

এ কু-চিন্তাকে নিশি আর বাড়াতে দিল না। আগুনটাকে তাড়াতাড়ি নিবাইয়া দিল বটে কিন্তু আধপোড়া বেগুনের মত তাহার মনে দড়কোচা পড়িয়া গেল। একদিন আহারাদির পর সে যখন একখানা বই লইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল, দেখিল চারু ঘুমাইতেছে.---

শিথিল কবরী দেহবল্লরী, ব্যায়ত বদন চন্দ্র,
গগনে গগনে উঠিছে সঘনে নাসার মধুর মন্দ্র।

নিশির অসহ্য হইল। সে অনেক ডাকাডাকি করিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিল, "ওঠ, ওঠ, সমস্ত দিন ঘুমোও কি ক'রে ?"

চারু উঠিল ; এবং তাহার এখনকার রূপ দেখিয়া নিশি যখন মুগ্ধ হইবে হইবে করিতেছে এমন সময়ে ছোট মুখে একটা বড় হাই তুলিল। নিশি তাড়াতাড়ি সে দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া, পুঁথির মধ্যে আপনাকে মগ্ন করিয়া দিল।

নিশি যখন পাঠে তন্ময় হইয়াছে তখন চারু আসিয়া হঠাৎ তাহার বই বন্ধ করিয়া দিল। সে ভাবিয়াছিল তাহার এই রসিকতায় নিশি প্রীত হইবে। নিশি কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইল। তবে মুখে কিছু প্রকাশ করিল না। হাত বাড়াইয়া চারুকে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া পড়িতে লাগিল। চারু আবার বই বন্ধ করিয়া দিল। এবার নিশি বই রাখিয়া দিল। এবং হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিল "তুমি পড়তে দিলে না। কিন্তু ভারি অদ্ভুত বই ওখানা। ওতে কি লেখা আছে জান ?"

চারু। কি ?

নিশি। ওতে দেখিয়েছে যে একরকমের গাছ বা জন্তু থেকে মানুষ আর এক রকমের গাছ বা জন্তু তৈরী করতে পারে। চেষ্টা করলে কাল কাকের বংশ থেকে হয় ত দুদিন বাদে সাদা বাচ্ছা বার করতে পারে। মানুষের চেষ্টায় যেমন পরিবর্ত্তন হয়, সংসারে আপনা আপনিই সে-রকম পরিবর্ত্তন অনেক হয়েছে,—বানরের মত জন্তু থেকে মানুষ হয়েছে। এই দেখ—

চারু। সাহেবের লেখা ত ?

নিশি। হাঁ। কেন ?

চারু। তা ওরা ত বানর থেকেই হয়েছে।

নিশি। কি ক'রে জানলে ?

চারু। ঐ যে ডালে ব'সে খাওয়া অভ্যাস। টেবিল চেয়ার না হ'লে খেতে পারে না।

নিশি। তা হলে তোমরা শোর থেকে হয়েছ, কেননা মাটী থেকে খাও।

চারু। তুমি আমার বাপ মাকে গাল দিলে ?

নিশি। গাল দিই নি। তুমি যেমন বলেচ, আমিও তেমনি বলেছি। ওর কোন মানে নেই।

চারু। আমি কি তোমার বাপ মাকে কিছু বলিছি ?

নিশি। না, না, আমার অন্যায় হয়েছে।—আচ্ছা বোস, একটা গল্প বলি।

নিশি তাড়াতাড়ি একখানা বইএর পাতা উল্টাইয়া লইল। তার পর বলিল "গল্পটা

আমার খুব ভাল লেগেছে। একটী মেয়ে ছিল, জান্‌লে ? তার মনটা বড় ভাল, কিন্তু চেহারাটা বড্ড খারাপ। বুঝেছ ? চেহারা খারাপ ব'লে কেউ তাকে বে করতে চাইলে না। চল্লিশ বৎসর বয়স হয়ে গেল, বে' হল না।--

চারু। ওমা ! চল্লিশ বছরের আইবুড়ো ?

নিশি। এ ত আর এ-দেশের মেয়ে নয়, সাহেবদের মেয়ে।

চারু। ও তাই বল। ওদের কি আর জাত ধর্ম্ম আছে ?

নিশি। তা বটে। তার পর, এই স্ত্রীলোকটী এক বন্ধুর বাড়ীতে কিছু দিন থাকেন। বন্ধুর একটী ছেলে ছিল। তার বয়স ছ বচ্ছর। ছেলেটীকে ইনি খুব যত্ন করতেন। একদিন তার অসুখ করেছে। ইনি পাশে বসে সেবা করচেন। এমন সময়ে ছেলেটা জিজ্ঞাসা কল্লে "আপনার বে' হয় নি ?" স্ত্রীলোকটী বল্লেন 'আমি বড় কুৎসিত বলে কেউ বে' করতে চায় না।' তখন ছেলেটা বল্লে 'আপনি ভাববেন না। আমি আপনাকে বে' করবো।'—

চারু। ঐ দেখ, বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে কেমন পাত্র জুটিয়ে নিয়েছে।

নিশি। সে কি গো ? পাত্রের বয়স যে ছ বছর সেটা বুঝি ভুলে গেলে ?

চারু। ওমা, কোত্তাবো ? ঐ বুড়ি একটা ছ বছরের ছেলেকে বে' করবে !

নিশি দেখিল গল্প জমিবে না। নিজের ভাল লাগার দিক দিয়া চারুকে স্পর্শ করা যাইবে না। চারুর যাহা ভাল লাগে তাহা লইয়া আলাপের চেষ্টা করিল। কিন্তু চারুর যাহা ভাল লাগে সে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বড় অল্প। সে প্রথমেই পদার্পণ করিল চোরা বালিতে। বলিল "তোমার কাণের সে ঝুমকো গেল কোথায় ?"

চারু। আমার কানে ত ফুল ছিল।

নিশি। হাঁ, হাঁ, ফুল। তা খুললে কেন ? কান থেকে ঝুলতো, বেশ দেখতে হত।

চারু। ফুল বুঝি ঝোলে ? তুমি কার কানে ঝুমকো দেখে এসেছ, তাই বল।

নিশি। আবার কার কান দেখতে যাব ?—বাস্তবিক সিঁদুর পরলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়।—আচ্ছা, আশ্চর্য্যি নয় ? একজন লম্বা চওড়া সাহেব,—বড় চোখ, বড় নাক,—সে গিয়ে এক কাফ্রীর দেশে হাজির হ'ল। সেখানে একটা কাল, বেঁটে, খাঁদা নাক, কাফ্রী মেয়ে দেখে তার মনে হ'ল 'এ আমার আপনার লোক। এর সঙ্গে মেশা যেতে পারে।' কেউ কারুর ভাষা বোঝে না। তাতে কি ? তাদের মধ্যে যে আদিম বর্ব্বর মানুষ ছিল, তার ভাষাতে তারা বেশ আলাপ জমিয়ে তোলে—

চারু। সে তোমরা পুরুষরা ঐ রকম কর।

নিশি। হাঁ, হাঁ, তাই, তাই। ঐ পুরুষেরাই।

ইতি প্রেমালাপ সমাপ্ত। এমনি প্রায়ই হইয়া থাকে। জলৌকার মত নিশির উন্নত

প্রেম চারুশীলার হৃদয়ে কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে যখন অতিদীর্ঘ হইয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে চারুশীলা দু একটা বাক্যের নুন ছিটাইয়া তাহাকে নিরস্ত, সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। নিশি দেখিল এমনি করিয়াই তাহাদের জীবন কাটিবে। দুইটী গোলার মত তাহারা পাশাপাশি থাকিবে, অথচ, শত চেষ্টাতেও একাধিক বিন্দুতে পরস্পরের মিলন হইবে না। সে এমন কুকর্ম্ম কেন করিল ? সখ করিয়া এমন বেক্কিটে চশমা কেন পরিল ? আজ সমস্ত সংসার যে তাহার চ'খে বক্কুর দেখাইতেছে, এবং তাহার কপালের রেখা ক্রমেই গভীরতর হইয়া উঠিতেছে।

চারুশীলা নিখুঁত সুন্দরী। এত কাছাকাছি না থাকিলে নিশিও ইহার রূপে মুগ্ধ হইত। কিন্তু বহুরূপী যখন গা বাহিয়া উঠিতে থাকে, তখন তাহার রূপ দেখিতে পারে কয়জন ?

আজ অনেক দিন পরে গৌরীর কথা মনে পড়িল। কেন সে এমন করিয়া তাহার হৃদয় উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিল,— একটা লীলাচঞ্চল কৃষ্ণ ছাগশিশুর মত, তাহাকে লুব্ধ করিল, তাহাকে পাছু পাছু ছুটাইয়া হয়রাণ করিল ; এবং স্পর্শমাত্র করিবার পূর্ব্বে লঘুললিতলম্ফে কোন অনধিগম্য অনির্দ্দেশ্যতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল ! সেই ত তাহাকে এমন করিয়া ডুবাইল।— কিন্তু তাহাকে পাইয়াই কি নিশি সুখী হইত ? সেও ত মূর্খ।—

এইখানে শশী আসিয়া একখানি চিঠি দিল—আঁকা বাঁকা লাইন, মাত্রাহীন অক্ষর,— দেখিলেই মনে হয় স্ত্রীজাতির লেখা। কারণ বক্তব্যের মধ্যে মাত্রা রক্ষা করিয়া না চলা তাঁহাদেরই বিশেষত্ব। চিঠি লিখিয়াছে গৌরী। শশীকে লিখিয়াছে। অনেক বাজে কথা ও অনেক পুনরাবৃত্তির শেষে একটা ছোট প্রার্থনা ছিল,—অনেকখানি ভুষিচাপা বরফের টুকরার মত,—ছ্যাঁৎ করিয়া হাতে লাগে। গৌরী বড় কষ্টে আছে, কিছু অর্থ সাহায্য পাইলে সে উপকৃত হয়,—একথাটা সে হাসির সুরে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছে। নিশির সমস্ত প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যাহাকে সে সর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল, সে আজ এক মুষ্টি অন্নের কাঙাল হইয়া তাহার দ্বারে আসিয়াছে !

শশী-জিজ্ঞাসা করিল 'কি করবে ?'

নিশি। আমি ?—এ—আমি আজই টাকা পাঠাচ্চি।

শশী। আচ্ছা, তাই পাঠিও। আমি কিন্তু চল্লুম।

নিশি। কোথায় ?

শশী। আমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে আস্‌বো।

নিশি নিজেকে বড় অপরাধী মনে করিল। এমন কথা ত তাহার মনে আসে নাই। সে শুধু টাকা পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিল। টাকা পাঠাইলেই কি কর্ত্তব্য শেষ হয়। শশীর চেয়ে তাহার হৃদয় এত ছোট ! কিন্তু সে করিবে কি ? তাহার হাঁসপাতাল আছে—

নিশি একটা অবান্তর প্রশ্ন করিল "আচ্ছা এ চিঠি কার লেখা রে ?"

শশী। কেন গৌরীদির লেখা। আমি ও লেখা চিনি।

নিশি। সে কি তোকে চিঠি লেখে না কি ?

শশী। দুএকখানা লিখেছেন।

নিশি। তা তুই কাউকে বলিস নি ত। কিন্তু গৌরী ত লিখ্‌তে জান্‌তো না।

শশী। বাঃ আমি শিখিয়েছি যে।

নিশির মাথা হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল। গৌরী মিথ্যা ছলনা করিয়া তাহাকে খাটাইয়াছে, অথচ লেখাপড়া শিখিয়াছে শশীর নিকট। সে শশীকে মাঝে মাঝে পত্র লেখে, তাহাকে একখানাও লিখে নাই। তাহার কাছে অর্থ সাহায্য চাহিয়াছে, অথচ পত্র লিখিয়াছে শশীকে। তবে শশীই যাক্‌। তাহাকে হয়ত সে চাহে না। ইহা ভাবিয়া সে তৃপ্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিল। জিজ্ঞাসা করিল "কবে যাবি ?"

শশী। আজই।

নিশি। আচ্ছা আমি তোর হাতে টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

(The Reserve Bank of India)

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা আইনে পরিণত হইলে এদেশের ব্যাঙ্কিং এবং বাণিজ্যের উপর যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। অন্যান্য দেশে দেখা গিয়াছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা সে-সব দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকরী শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেই জন্য ব্যবসায় বাণিজ্যেরও অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

অনেকেই জানেন যে ব্যাঙ্কগুলি একহাতে দেশের উদ্‌বৃত্ত টাকা ধার করে এবং অপর হাতে তাহা উপযুক্ত লোকদের ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য ধার দিয়া থাকে। বর্ত্তমান জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপ পরস্পরের মধ্যে ঋণদান ও ঋণ-গ্রহণের উপর নির্ভর করিয়াই ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রবাহ অবিরাম চলিতেছে। এর মূলে আছে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, আবার সেই বিশ্বাসের ভিত্তি হইতেছে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ শোধ করা। যদি সময়বিশেষে কোন কারণে এই

বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়, তবে দেশের ব্যাঙ্কগুলির এবং তৎসঙ্গে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। কোন ঘটনাচক্রে বা বিশ্বাসহীনতার দরুণ এই লেন-দেনের বিরামহীন স্রোত ক্ষণকালমাত্র থামিয়া গেলে, ব্যাঙ্কের এবং ব্যবসায়ীদের বিপদের সীমা থাকে না। এদের অনেকেরই দোকানপাঠ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। এইরূপ ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে না। কিন্তু প্রতি ১০।১২ বৎসর অন্তর এক একবার ব্যবসায় বাণিজ্যে এমন মান্দ্য আসিয়া পড়ে যে অনেক ব্যবসায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়মত ঋণশোধ করিতে পারে না, এবং তজ্জন্য ব্যাঙ্কও আমানতকারীদের টাকা শোধ দিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। গত ৩।৪ বৎসর ব্যবসায়-এর জগতে যে জড়তার ভাব চলিয়াছে, তাহাতে অনেক ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ীর ঐরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। এ অবস্থায় লোকের মনে স্বতঃই ব্যাঙ্কগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফলে, একদিকে যেমন আমানতকারীরা স্ব স্ব আমানতি টাকা প্রত্যাহার করিয়া নিতে চায়, অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধার শোধের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট থেকে আরও ঋণ গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হয়। অথচ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গচ্ছিত টাকা প্রত্যাহৃত হওয়ায়, ব্যাঙ্কের ধার দেওয়ার ক্ষমতা এই সময় বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপরদিকে ব্যবসায়ীদের বিপদের সময় তাদের টাকা ধার দিতে না পারিলে, অনেক ব্যবসায়ীরই দেওলিয়া (insolvent) হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়ায়, এবং ব্যবসায়ীদের ঐরূপ বিপদ হইলে, ব্যাঙ্কগুলিকেও নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এইরূপ বিপদের সময় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির এবং তথা ব্যবসায়ীদের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে। সমস্ত ব্যাঙ্কের টাকার অভাব এক সময়ে হয় না। যে-সব ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত টাকা আছে, তাহাদের টাকা লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অভাবগ্রস্ত ব্যাঙ্কদের সাহায্য করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকিলে দেশব্যাপী আতঙ্কের দরুণ ভাল মন্দ সমস্ত ব্যাঙ্কের উপরই চোট পড়িতে পারে। এই জন্য সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে উপদেষ্টা এবং সহায়করূপে দেখিয়া থাকে। তাদের উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে এবং আবশ্যক হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ করে। ব্যাঙ্কগুলির অনেক টাকা সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে বলিয়া, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক কাজে তাদের সহিত প্রতিযোগিতা করে না। এই জন্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদ দিয়া কাহারও নিকট আমানত জমা (deposit) নিতে পারিবে না। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সুদ দিয়া লোকের নিকট টাকা সংগ্রহ করিতে চায়, তবে সবাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই টাকা গচ্ছিত রাখিতে চাহিবে, অন্যান্য ব্যাঙ্কের তাহাতে সমূহ ক্ষতি হইবে। তেমনি ধার দেওয়ার বেলাও, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকেই ধার দিবে। সোজাসুজি ভাবে সাধারণ ব্যবসায়ীদের ধার দিবে না। কারণ তাহা না হইলে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণদান (loan) ব্যবসায়এর অনেক ক্ষতি হইবে।

সারা দেশময় বিক্ষিপ্ত ব্যাঙ্কগুলি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত হওয়াতে আর একটা বিশেষ উপকার সাধিত হয়। কোন যুদ্ধের সময় দেশের সৈন্যগুলি সমস্ত জায়গায় অল্প

অল্প করিয়া ছড়াইয়া থাকিলে যেমন শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে নিজেদের বাঁচাইতে পারে না, সেইরূপ ব্যাঙ্ক সমূহের উদ্বৃত্ত টাকাগুলি (cash reserves) নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে, আতঙ্কের সময় (panic) তাহাদের রক্ষা করিতে পারে না। কাজেই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সেই টাকাগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিলে সহজেই বিপদের সময় আত্মরক্ষা করা যায়।

এই গেল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রথম এবং প্রধান কাজ। উহার দ্বিতীয় কাজ হইবে গবর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্ত টাকাগুলি (surplus cash balances) হাতে লওয়া এবং তদ্দ্বারা দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়এর উপকার করা। এইটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটা অতি মূল্যবান বিশেষ অধিকারের মধ্যে (privilege)। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়টা প্রায় সমভাবে সমস্ত বৎসর ধরিয়াই হয়। কিন্তু আয়ের অধিকাংশ ভাগই আসে বৎসরের ৫।৬ মাসের মধ্যে। কাজেই অবশিষ্ট ৬।৭ মাস কাল সরকারের তহবিলে ৩০।৪০ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এমন কি যখন খুব বেশী ব্যয় হয় তখনও এই উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ ১০।১২ কোটীর কম হয় না। পূর্ব্বে এই টাকা যক্ষের ধনের মত নিতান্ত অকেজোভাবে সরকারী কোষাগারে পড়িয়া থাকিত। ১৯২১ সন হইতে এই টাকা বিনাসুদে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয় এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক উহা অল্প সুদে ধার দিয়া দেশের ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে। এই সমস্ত টাকা এখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে থাকিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অল্প সুদে ধার দিয়া ব্যাঙ্কার এবং ব্যবসায়ীদের উপকার করিতে পারিবে। ইহাতে দেশের মূলধন বাড়িবে এবং সুদের হার কমিবে।

কাগজী মুদ্রার পরিচালন (note issue) হইবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তৃতীয় কাজ। কাগজী মুদ্রা পরিচালন সম্বন্ধে সরকারের যে একচেটিয়া ক্ষমতা আছে, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সমর্পণ করা হইবে। তাহাতে কয়েকটী বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ—ব্যবসায় বাণিজ্যের সহিত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের কোনরূপ সম্পর্ক না থাকাতে, বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসায় বাণিজ্যের চাহিদা অনুসারে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে কমাইতে পারা যায় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের ব্যবসায়, বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হওয়াতে, নোটের বাড়্তি কম্তি, চাহিদা অনুসারে হইতে পারিবে। কাগজী মুদ্রার এইরূপ চাহিদা মাফিক্ হ্রাসবৃদ্ধি (elasticity) ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ—কাগজী মুদ্রার পরিবর্ত্তে ধাতুমুদ্রা দেওয়ার জন্য (conversion into metallic cash) সোণা এবং টাকার যে একটা বৃহৎ ফণ্ড (reserve) থাকিবে, সেটার সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের উদ্বৃত্ত টাকা (cash reserves) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একীভূত হইবে। তাহাতে দুইটী ফণ্ডের সংযুক্ত শক্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। ব্যাঙ্কিংএর কাজ এবং কাগজী মুদ্রা প্রচারের কাজ এক হাতে পড়িলে দুইটী কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চতুর্থ কাজ হইবে বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় করা (foreign exchange)। এতদিন যাবৎ এই বিনিময়ের হার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ কর্ত্তৃক

নির্দ্ধারিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। তদ্দরুণ, ইংলণ্ডের উপকারার্থে টাকার বিনিময়ের হার বাড়ান কমান হয়,—এইরূপ তীব্র সমালোচনা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সময় সময় হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে এই কাজটী অর্পিত হইলে, ঐরূপ রাজনৈতিক সমালোচনার কারণ থাকিবে না। সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের আদেশে বা ভারতের রাজস্বসচিবের খেয়ালে বিনিময়ের হার বাড়িবে কমিবে না, বরং আমদানী রপ্তানীর হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি আর্থিক কারণের দ্বারা তাহা পরিচালিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন ঘটিলে, ব্যবসায়ীদের মনে গবর্ণমেণ্টের শুল্কনীতি সম্বন্ধে কোনরূপ আতঙ্ক বা অনিশ্চয়তার কারণ থাকিবে না। তাহাতে ব্যবসায়এর বিশেষ উন্নতি হইবে।

এই কয়টী গেল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। দেশের বাণিজ্য এবং সাধারণ ব্যাঙ্কিংএর উপর এই সব যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন দেখা যাক্ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যে গঠন (constitution) করা হইতেছে, তাহাতে উক্ত কার্য্যগুলির কতটা নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। ব্যাঙ্কের মোট মূলধন হইবে ৫ কোটী টাকা। গবর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্ত টাকা এবং ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় কাজসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যাওয়াতে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কতক ক্ষতি হইবে। ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূলধনের ১½ কোটী টাকা মূল্যের অংশ কিনিবার অধিকার পাইবে। যদিও আইনানুসারে কোন অংশীদারই একলা ১০টার বেশী ভোট পাইবে না, তথাপি মনে হয়, প্রত্যেক অংশীদার উক্ত সংখ্যায় কত মূল্যের অংশ কিনিতে পারিবে, তাহার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকিলে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ন্যায় কয়েকটা বড় বড় ব্যাঙ্ক অধিকাংশ মূলধন নিজেদের হস্তগত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালীর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। তাহাতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নামমাত্র সর্ব্বসাধারণের ব্যাঙ্ক হইলেও, কার্য্যতঃ বড় বড় অংশীদার ব্যাঙ্ক বা ব্যবসায়ীর দ্বারা তাহাদের স্বার্থের জন্য পরিচালিত হইতে পারিবে। অন্ততঃ সেরূপ ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এজন্য আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক অংশীদার কত অংশ কিনিতে পারিবে, তাহার একটী সীমা থাকা উচিত। নতুবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যের প্রতি ব্যবসায়ীদের অনাস্থা জন্মিবে এবং তদ্দরুণ উহার কার্য্যকারিতাও বহুলপরিমাণে কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে।

আর একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে এই যে, ভারত সরকারের নিয়োজিত একজন প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালক হইতে পারিবেন না। এবং ভারতীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের কোন সভ্য পরিচালকরূপে মনোনীত হইতে পারিবেন না। এর কারণ বলা হইয়াছে এই যে, যে-সব ব্যক্তির রাজনৈতিক কার্য্যের সহিত সংযোগ আছে, তাঁহারা ব্যাঙ্কের পরিচালক হইলে, ব্যাঙ্কের কার্য্যের উপর রাজনীতির প্রভাব পড়িবে এবং তাহাতে ব্যাঙ্কের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে না। ব্যাঙ্কের কোন পরিচালক উহার আভ্যন্তরীণ নীতি এবং অবস্থা অবগত হইয়া সেই সব নিয়া যদি ব্যবস্থাপরিষদে প্রকাশ্য সমালোচনা করেন, তাহা হইলে

ব্যাঙ্কের পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসরণ করা কঠিন হইবে। ১৯২১ এবং ১৯২২ সনে জেনিভা এবং ব্রাসেল্‌স্‌এ অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতদের যে দুইটী বৈঠক হয়, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত প্রচার করা হয়, যে, যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালনে রাজনৈতিক প্রভাব না পড়ে, যথাসম্ভব সেরূপ চেষ্টা করা উচিত। সেই মতানুযায়ী ভারতেও উক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কংগ্রেসের সভ্যেরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালক হইতে পারেন না। কিন্তু, আমাদের বিবেচনায় ঐরূপ ব্যবস্থা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় অনুপযোগী। আমাদের দেশের ব্যবসায় ও শিল্পের যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের অনেকেই কোন না কোন ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য। তাঁহাদের বাদ দিলে অতি অল্পসংখ্যক দেশীয় লোক পাওয়া যাইবে, যাঁহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালক হওয়ার উপযুক্ত। কারণ, আমাদের দেশে বাস্তবিক মাথাওয়ালা ব্যবসায়ীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেইজন্য, উক্ত ব্যবস্থাতে এমন ফল দাঁড়াইতে পারে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকের পদগুলি বিদেশী বণিকদের একচেটিয়া হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ, ইউরোপীয় অর্থনীতিবিশারদেরা যে উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রভাবকে ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী থেকে দূরে সরাইয়া রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন, কেবল ব্যবস্থাপরিষদসমূহের সভ্য এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিচালক হওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেই যে সে-উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, তাহা অনুমান করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের যাহা কিছু বিপদ হইয়াছে তাহা সরকারেরই দরুণ। প্রত্যেক দেশেই সরকার স্বীয় অসীম অভাব পূরণার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অজস্র কাগজী মুদ্রা সৃষ্টি করিতে বাধ্য করেন। তাহাতে অনেক দেশের মুদ্রা প্রচলন (currency) নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাব প্রাপ্ত হয়। যদিও শান্তির সময়ে এই কথা বলা সহজ যে, সরকারকে ব্যাঙ্কের কাজে হাত দিতে দিও না, যুদ্ধের ন্যায় বিষম বিপদে পড়িলে সরকার যে ঐরূপ কথায় কর্ণপাতও করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই, ব্যাঙ্কের পরিচালন সভা হইতে রাজনৈতিকদের সরান ততটা দরকার নয়, যতটা আবশ্যক সরকারকে তফাৎ রাখা। কিন্তু, কার্য্যক্ষেত্রে যে তাহা একপ্রকার অসম্ভব, সেটা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহে জনসাধারণ যে টাকা গচ্ছিত রাখে, যাতে সে টাকাটা কতকটা নিরাপদ থাকে, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ভারতের ২৬টা বড় বড় ব্যাঙ্কের প্রত্যেককেই স্ব স্ব অস্থায়ী আমানত জমার শতকরা ৭½ টাকা করিয়া এবং স্থায়ী আমানত জমার শতকরা ২½ টাকা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। যে-সব ব্যাঙ্ক উক্ত নিয়মে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবে, সে-সবের উপর স্বভাবতঃই লোকের আস্থা বাড়িবে, এবং আবশ্যকানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিবারও বিশেষ সুবিধা তাহারা পাইবে। এই ২৬টা ব্যাঙ্কের মাত্র ৭টা ব্যাঙ্ক কেবল ভারতবর্ষেই কাজকারবার করিয়া থাকে। অবশিষ্ট ১৯টা ব্যাঙ্ক বড় বড় বিদেশীয় ব্যাঙ্কের ভারতীয় শাখা মাত্র।

এই ২৬টা ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটা, বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত ১৯টা বিদেশীয় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank), অত্যন্ত প্রভাবান্বিত। কোন কোনটা এক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতেও বড়। কাজেই,

তাদের সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম না করিলেও কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতের বহুসংখ্যক যৌথ ব্যাঙ্ককে উক্ত ব্যবস্থার গণ্ডীর বাহিরে রাখা হইয়াছে। অথচ ভারতীয় ব্যাঙ্কিংএর মঙ্গলের জন্য সব চেয়ে বেশী দরকার ছিল, এই সব ছোট ছোট যৌথ ব্যাঙ্ককে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহাদের উপর লোকের আস্থা জন্মিতে পারে এবং যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাবে তাহারা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কাজ চালাইতে পারে। এই সব ছোট ছোট যৌথ ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালীতে অনেক গলদ আছে। সেই জন্য বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি যৌথ-ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কলীলা সমাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতে ব্যাঙ্কগুলির উপর লোকের বিশ্বাসও কমিয়াছে। অতএব মনে হয়, যে-সব যৌথ ব্যাঙ্ক এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আমানত জমার পরিমাণ এক লক্ষ টাকা বা তদধিক, সেই সব ব্যাঙ্কমাত্রকেই পূর্ব্বোক্ত হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে বাধ্য করা উচিত। তাহা হইলে দেশের ব্যাঙ্কগুলি উন্নত প্রণালীতে কার্য্য পরিচালনা করিতে বাধ্য হইবে এবং দেশে ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-এর উত্তরোত্তর বিস্তার হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জনসাধারণের মনের আস্থার উপরই বর্ত্তমান ব্যাঙ্কিং এবং ব্যবসায় নির্ভর করে। যাহাতে লোকের বিশ্বাস স্থায়ী হইতে ও বাড়িতে পারে, তজ্জন্য এটা আবশ্যক যে, যে-ব্যাঙ্ক যে-টাকা লোকের নিকট আমানত জমারূপে ধার করে, তাহার একটা অংশ নিজের নিকট নগদ (cash reserve) রাখিবে। এই নগদ টাকার ভাগ খুব বেশী হইলেই, ব্যাঙ্ক লোকের টাকা চাওয়া মাত্র ফেরৎ দিতে পারিবে এবং তাহাতে ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থাও বাড়িয়া যাইবে। এতদিন ভারতে ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ আইন ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আইনে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নগদ জমা (cash balance) রাখিতে সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহকে বাধ্য করা হইবে। কিন্তু উক্ত আইনের প্রধান দোষ এই যে, তাহাতে নগদ জমা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর কোনরূপ বন্ধন নাই। মনে হয় এটা একটা মস্ত বড় ভুল এবং অন্যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির নেতা এবং আদর্শস্থানীয়। কাজেই নগদ জমা সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির উপর যতটা কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর তার চেয়ে অনেক বেশী হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যেরূপ অনেক বিশেষ অধিকার থাকিবে, তেমনি কতগুলি বিশেষ দায়িত্বও থাকিবে। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের গচ্ছিত টাকার লোকসান না হয় এবং যাহাতে ব্যাঙ্কগুলির ও ব্যবসায়-এর উপর কোনরূপ বিপদ পড়িতে না পরে, তার জন্য দায়িত্ব থাকিবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের। কাজেই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরও নগদজমা সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করা উচিত। আমেরিকাতে এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বীয় আমানত জমার অন্ততঃ শতকরা ৩৫ ভাগ নগদ (cash) রাখিবে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেও ঐ হারে নগদ জমা (cash balance) রাখিতে বাধ্য করা নিতান্ত আবশ্যক।

কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইতে সরকারের বার্ষিক লাভ দাঁড়ায় প্রায় ৩ কোটী টাকা।

বিলাতে যে স্বর্ণফণ্ড (gold standard reserve) আছে, তার আয়ও ৩ কোটী টাকার কাছাকাছি। এই দুইটীরই ভার এখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে সমর্পিত হইবে। কাজেই, ফলে সরকারের বার্ষিক ৬ কোটী টাকা ক্ষতি হইবে। এইজন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রথম কয়েক বৎসর ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ থেকে অংশীদারগণ স্ব স্ব অংশের (share capital) উপর শতকরা ৫৲ টাকা করিয়া পাইবে, অবশিষ্ট টাকার অর্দ্ধাংশ রিজার্ভ ফণ্ডে যাইবে এবং অপরার্দ্ধ সরকারের প্রাপ্য হইবে। রিজার্ভ ফণ্ডে আড়াই কোটী টাকা জমা না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা চলিবে। তৎপরে রিজার্ভ ফণ্ডে যতদিন-না ৫ কোটী জমে, ততদিন অংশীদারেরা পাইবেন শতকরা ৮৲ টাকা করিয়া, মোট লাভের ½ যাইবে রিজার্ভ ফণ্ডে, অবশিষ্ট সমস্ত টাকা সরকার গ্রহণ করিবেন। রিজার্ভ ফণ্ডে ৬ কোটী টাকা সঞ্চিত হইলে পর, অংশীদারগণ পাইবেন মাত্র শতকরা ৮৲ টাকা করিয়া : অবশিষ্ট সবই সরকারী কোষাগারে যাইবে। কাগজীমুদ্রার প্রচলন হইতে এবং স্বর্ণফণ্ড হইতে অধুনা যে ৬ কোটী টাকা লাভ হয়, ব্যাঙ্কের হাতেও সেইরূপ লাভ দাঁড়াইবে, বরং কিছু বেশীও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, ব্যাঙ্কের লেনদেনের কারবার হইতে ৫।৬ বৎসরে শতকরা অন্ততঃ ৫০৲ টাকা লাভ দাঁড়াইবে আশা করা যায়। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কয়েক বৎসরের মধ্যেই শতকরা ১০০৲ টাকার বেশী লাভ দেখাইয়াছে। সুতরাং ঐ কাজ হইতেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ২।২½ কোটী টাকা লাভ দাঁড়াইবে। ব্যাঙ্কের মোট লাভ এই ৮৮½ কোটী টাকা হইতে, অংশীদারগণ পাইবেন অংশের উপর শতকরা ৮৲ টাকা করিয়া, অর্থাৎ মোট ৪০ লক্ষ টাকা মাত্র। অবশিষ্ট ৭।।৮ কোটী টাকা সমস্তই সরকারের হস্তগত হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে সরকার মুদ্রা প্রচলনাদি গুরুতর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংস্পৃষ্ট না হইয়াও, যথেষ্ট লাভের অধিকারী হইতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে এই দেখা যায় যে, দেশের ব্যাঙ্কিং এবং ব্যবসায় সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিশেষ আবশ্যক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে দেশের চলতি মূলধনের (floating capital)-এর কার্য্যকারিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। দেশের কারেন্সী নীতি এবং বিনিময়নীতি (currency and exchange policy) সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ অথচ বাস্তবিক পক্ষে অনভিজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারীদের খেয়াল বা অভিসন্ধির উপর নির্ভর করিবে না। অভিজ্ঞ এবং বহুদর্শী ব্যাঙ্কারগণ বাণিজ্যের অবস্থানুসারে তাহা নির্দ্ধারণ ও পরিচালন করিতে পারিবেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। বিগত ৪০ বৎসরের ভিতর ভারতে অর্থনীতি বিষয়ক যত আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় আইনটী তন্মধ্যে অনায়াসেই প্রথম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে, এ কথা মনে রাখা উচিত যে, নিরপেক্ষভাবে কার্য্য পরিচালনা করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যেরূপ দেশের প্রভূত উপকার করিতে পারে, তেমনি আবার পক্ষপাতিত্বের দরুণ ক্ষমতার অপব্যবহার

করিয়া দেশের সর্ব্বনাশও করিতে পারে, যাহার শতাংশের একাংশ গভর্ণমেণ্টের অজস্র ভুলের দ্বারা হয় নাই। কাজেই ব্যাঙ্কের গঠন (constitution) যাহাতে নির্দ্দোষ হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালীর উপরও সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইবে। ব্যাঙ্ক যদি নিরপেক্ষভাবে কার্য্য পরিচালন করিয়া জনসাধারণের মনে আশা এবং বিশ্বাসের সঞ্চার করিতে পারে, তবে দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় নব অধ্যায়ের উন্মোচন হইতে পারিবে।

শ্রীহীরেন্দ্রলাল দে

শ্মশানে বসন্ত

চিতার বুকেতে কুম্‌কুম্ জ্বলে, গৃধিনীর চোখে মায়া
শ্মশানের গাঙে প্রেত-রাণীদের পড়েছে সীঁথির ছায়া।
সুপারির সারি ভস্ম মাখিয়া অধীর অসহ-সুখে,—
কোটি পিশাচীর তরল নূপুর বাজে কি তা'দের বুকে ?
ছাইএর ঢিপির আড়ালে কাঙাল লতাটি পেয়েছে আলো :—
শ্মশান কহিছে, "মরুভূ-বধূয়া আমারে বেসেছে ভালো।"
শবের শিয়রে চাঁপার দানাটি কে দিল উজাড় ক'রে ?
কান্নার সোণা গলিয়া পড়িছে ভগ্ন কলসী ভ'রে।
বাঁশের খাটেতে ঘুমায়ে রয়েছে শোকাতীত মহারাজ,
গোলাপ বকুলে হ'য়েছে তাহার নব বাসরের সাজ।
ছিন্ন কাঁথার বিজয় পতাকা উড়িছে ঝঞ্ঝাবাতে,
হাতের কাঁকন খুলিয়া দিতে কে নদীতীরে এলো সাথে।
অভাগীর যত সীঁথির আবীরে হোলি কে খেলিবে ভাই !
মৃতের নাসায় মলয় লেগেছে আর কি অধিক চাই !
খুলির রন্ধ্রে বাতাস পশিয়া ধ্বনিছে বিরহ ব্যথা,—
"বিধবা প্রেয়সী ! করুণ কণ্ঠে ভাঙ' আজি নীরবতা।"
প্রেতের উপরে প্রেতিনী রূপসী করিয়াছে অভিমান
কঙ্কাল-বধূ কঙ্কালে আজি শোনায় সাঁঝের গান।
মাটির তলায় মড়ার মাথায় উছলে মহুয়া সুরা ;
শ্মশানে আজিকে দক্ষিণা এসেছে স্ফূর্ত্তি চলেছে পুরা।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আপন কথা

(সাইক্লোন)

এটা জানি তখন—দিন আছে রাত আছে আর তারা দুজনে এক সঙ্গে আসে না আমাদের তিন তলার ঘরে! এও জেনেছি বাতাস একজন ঠাণ্ডা, একজন গরম কিন্তু তাদের দুজনের কারো একটা করে ছাতা নেই গোলপাতার—রোদে পোড়ে, বর্ষায় ভেজে ওদের গা!

এও জেনে নিয়েছি যে একটা একটা সময় রোদ অনেকগুলো বাইরে থেকে ঘরে এসেই জানলাগুলোর কাছে একটা একটা মাদুর বিছিয়ে রোদ পোহাতে বসে যায়: কোনোদিন বা রোদ একজন হঠাৎ আসে খোলা জানলা দিয়ে সকালেই—তক্তপোসের কোণে বসে থাকে সে, মানুষ বিছানা ছেড়ে গেলেই তাড়াতাড়ি গড়িয়ে নেয় রোদটা একবার বালিসে তোষকে চাদরে আমার খাটেই—তার পর চট্ করে রোদ বিছানা ছেড়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়ে কড়ি-কাঠে—ধরা পড়ার ভয়ে! ছাতের কাছেই আল্‌সের কোণে দুটো নীল পায়রা থাকে জানি আলো হলেই তারা দুজনে পড়া মুখস্ত করে—পাক্ পাখম্ সেজ্‌লী নেজ্‌লী।

বন্ধ খড়খড়ির একটু ফাঁক পেয়ে জানি রাতে আসে এক এক দিন একফোঁটা সাদা প্রজাপতির মতো আলো, মাথার বালিসে ডানা বন্ধ করে ঘুমোয় সে, হাত চাপা দিলে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে উঠে বসে—এমন ছোট্ট এমন চটুল যে বালিস চাপা দিলেও তাকে ধরে রাখা যায় না বালিসের উপরে চট করে উঠে আসে, চিৎ হয়ে তার উপর শুয়ে পড়িতো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে সে আমারি নাকের ডগায়, উপুড় হয়ে চেপে পড়লেই মুস্কিল বাধে তার—ধরা পড়ে যায় একেবারে এটা নিশ্চয় করে নিয়েছি তখন! পড়তে শেখার আগেই, দেখতে শুনতে চলতে বলতে শেখারও আগে ছেলেদের গ্রহনক্ষত্র, জলস্থল, পশুপক্ষী, আকাশ বাতাস, গাছপালা, ফুলফল, দেশ বিদেশ ইত্যাদির কথা বেশ করে জানিয়ে দেবার জন্যে বইগুলো তখন ছিলই না—বই লিখিয়েও ছিল না—কাযেই খানিক জানি তখন নিজে নিজে, দেখে কতক ঠেকে কতক শুনে কতক ভেবে ভেবেও কতক বা জানি! আমিই দিচ্ছি পরীক্ষা তখন আমারি কাছে কাযেই পাশই হয়ে চলেছি জানার এবং শোনার পরীক্ষাতে! আমাদের শান্তিনিকেতনের জগদানন্দ বাবুর পোকমাকড় বলে বই কোথায় তখন কিন্তু মাকড়সার জাল আমি মাকড়সাকে শুদ্ধ দেখে নিয়েছি আর জেনে ফেলেছি—মাকড় মরে গেলে খোকড় হয়ে খাটের তলায় কম্বল বোনে রাতের বেলায়। মাছের কথা পড়া দূরে থাক মাছ খাবারই উপায় নেই তখন কাঁটা বেছে না দিলে, কিন্তু এটা জেনেছি যে ইলিশ মাছের পেটে এক থলিতে থাকে একটু সতীর কয়লা অন্য থলিটাতে থাকে ঘোড়ার খুর একটুকরো বামুণের

পেটে টিকটিকির ল্যাজ এমনি সব নানা খারাপ জিনিষ যা মাছ কোটার বেলায় বার করে না ফেলে দিলে মুস্কিল বাধায় খাবার পরে মাছটা পেটে গিয়ে! জেনেছি সব রুই মাছগুলোই পেটের ভিতরে একটা করে ভুঁইপটকা লুকিয়ে রাখে, জলে থাকে বলে পটকাগুলো ফাটাতে পারে না, ডাঙ্গায় এলেই মাছ মরে যায় পটকা ফাটাতে পায় না, তাই তাদের দুঃখু থাকে, কোটার বেলায় পেট চিরেই পটকাটা মাটিতে ফাটিয়ে দিতে হয় না হলে মাছ রাগ করে ভাজা হতে চায় না, উনুনে পোড়ে নয় তো গলায় গিয়ে কাঁটা বেঁধায় হঠাৎ! ফলের বিচি খেলে গাছ বার হয় মাথা ফুঁড়ে! জোনাকি সে আলো খুঁজতে পিদ্দমের কাছে এল তো জানি লক্ষণ খারাপ—তখন তারা তারা বল্লেই জোনাকি পালায় দোষও কেটে যায় ঘরের হাওয়ার ফুসমন্তরে! বটতলায় চাপা হাজার জিনিষের বইখানার চেয়েও মজার একখানা বই, তারি পাণ্ডু-লিপির মাল-মসলা সংগ্রহ করে চলেছে বয়েসটা আমার তখন বড় হয়ে ছাপাবার মৎলবে কিম্বা সর্ট হেণ্ড রিপোর্টারের মতো সাঁট অক্ষরে টুকে নিচ্ছে সব কথা এ মনেই হয় না! আজও যেমন বোধ করি যাকিছু সবই এরা আমাকে আপনা হ'তে এসে দেখা দিচ্ছে, ধরা দিচ্ছে এসে এরা, খেলতে আমার মতো আসছে, নিজে থেকে তাদের খুঁজতে যাচ্ছিনে, নিজের ইচ্ছা মতো তারাই এসে চোখে পড়ছে আমার এবং যথাভিরুচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলা শেষে; সেই পঞ্চাশ বছর আগে তখনও তেমনি বোধ হতো—দেখছি না আমি, কিন্তু দেখা দিচ্ছে আমাকে সবাই, আর এই করেই জেনে চলেছি তাদের নির্ভুল ভাবে। রোদ বাতাস ঘর বাড়ী ফুল পাতা পাখি এরা সবাই তখন কি ভুল বোঝাতেই চলো অথবা স্বরূপটা লুকিয়ে মন ভোলানো বেশে এসে সত্যি পরিচয় ধরে দিয়ে গেল আমাকে তা কে ঠিক করে বলে দেয়? এ বাড়িটা তখন আমাকে জানিয়েছে মাত্র তেতলা সে, তেতলার নিচে যে আর একটা তলা আছে দোতলা বলে যাকে এবং তারও নিচে একতলা বলে আর একটা তলও আছে এ কথা জানতেই দেয়নি বাড়িটা কিন্তু সে জলে বা হাওয়ায় ভাসছে এ মিছে কথাটাও তো বলেনি বাড়িটা অসত্য রূপটাও তো দেখায়নি! আপনার খানিকটা রেখেছিল বাড়ি আড়ালে খানিকটা দেখতে দিয়েছিল তাও এমন একটি চমৎকার দেখার এবং না দেখারও মধ্যে দিয়ে যে তেমন করে সারা বাড়ির ছবি ধরে কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারের প্লান ধরে অথবা আজকের দিনে সারা বাড়ি খানা ঘুরে ঘুরেও দেখা সম্ভব হয় না। আজকের দেখা এই বাড়ি, সে একটা স্বতন্ত্র বাড়ি বলে ঠেকে যেটা সত্যিই এখনো দেখা দেয়নি আমাকে কিন্তু সে দিনের সেই একতলা দোতালা নেই এমন যে তিনতলা সে এখনো আমার কাছে জানা তিন তলা! নিজে থেকে জানা শোনা দেখা ও পরিচয় করে নেওয়া এ আমার ধাতে নেই এখনো, তখনও ছিল না—কেউ কাছে এলো তো হল ভাব কেউ কিছু দিয়ে গেল তো পেয়ে গেলেম—পড়ে পাওয়া জিনিষের আদর বেশি এখনো আমার কাছে, খুঁজে খুঁজে খেটে খুটে বুদ্ধি খাটিয়ে ধরা জিনিষের বড় একটা

মূল্য নেই বল্লেই হয় আমার কাছে ! আমি যদি সাহেব হতেম তো অবিবাহিতই থাকতেম কেননা কোর্টসিপ্‌টা চলতোনা বেশিক্ষণ আমার দ্বারায় কারো-সঙ্গেই ! দাসীটা চলে গেল তার যেটুকুখানি ধরে দেবার ছিল ধরে দিয়ে-হঠাৎ, এমনি হঠাৎ একদিন উত্তর পূব কোণের ছোট ঘরটাও-তার যা কিছু দেখাবার ছিল দেখিয়ে যেন সরে গেল আমার কাছ থেকে ! শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এসব কিছুই ছিল না এক সময় আমার কাছে ! ছোট ঘরে হঠাৎ একদিন সকালে জেগেই দেখ্‌লেম লেপের মধ্যে থাকতে থাকতে কোন্ এক সময় শীতকাল গিয়ে গরমকাল এলো ! আজ সকালে আমার কপালটায় ঘাম দিয়েছে, আজই দাসীরা বিছানার তলায় লেপটাকে তাড়িয়ে দেবে, আজ রাতে খোলা জানলায় দেখা যাবে আকাশে তারাগুলো জ্বলছে আর আমাকে একটা সূতোর জামার উপরে আর একট সূতোর জামা পরে নিতেই হবে না, সকাল থেকে গোজা পায়ে দিয়ে কর্ম্মভোগ ভুগতেও হবে না জেনে ফেল্লেম সবই হঠাৎ ! সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত না জানা থেকে হঠাৎ জানার সীমাতে পৌঁছনোর বেলা একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট ধারা ধরে অঙ্কের যোগ বিয়োগ ভাগ ফলটার মতো এসে গেল জগৎ সংসারের যা কিছু তা হ'ল না তো আমার বেলায় কিম্বা ঘটা করে আগে থাকতে জানান দিয়ে ঘটলো ঘটনা সমস্ত তাও নয়—হঠাৎ এসে বল্লেও তারা বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়ে—আমি এসে গেছি ! চম্‌কী দেবী বলে নিশ্চয় জানি একজন আছেন কাযই যাঁর চমক ভাঙ্গিয়ে দেওয়া গোড়া থেকেই ! দেখার পুঁজি জানার সম্বল তিল তিল খুঁটে ভরে তুলতে কত দেরী লাগতো যদি চম্‌কী না থাকতেন ; কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্রের মতো ষ্টেপ্-বাই-ষ্টেপ্ পড়তে পড়তে চলতে দিলেন না দেবী আমাকে—হঠাৎ-পড়া হঠাৎ না পড়া দিয়ে শিক্ষা করলেন সুরু তিনি ! যে সময় এক খিদে পাওয়া ছাড়া আর কিছুকে পাচ্ছিনে পেতেও চাচ্ছিনে—তখন একদিন সে বহুকাল আগের একটা ঝড় পাঠালেন আমাকে দেখাতে চম্‌কী দেবী—ঝড়টা এসেছিল রাতের বেলায় এটুকু মনে আছে, ঝড়ের আসার পূর্ব্বের ঘটনা—ঘনঘটা বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বন্ধ ঘর অন্ধকার কি আলো কিছুই মনে নেই ! ঘুমিয়ে পড়েছি তখন হঠাৎ উঠলো তেতলায় ঝড়—কেবলি শব্দ কেবলি শব্দ বাতাস ডাকে, দরজা পড়ে, সিঁড়িতে ছুটোছুটি পায়ের শব্দ ওঠে দাসী চাকরদের ; হঠাৎ দেখে ফেল্লম চিনেও ফেল্লম—দুই পিসিমা দুই পিসে মশায় মা বাবা মশায় সবাইকে যেন প্রথম সেইবার ! তিনতলার এঘর ওঘর সেঘর সবকটা ঘরই যেন ছুটোছুটি করে এসে একসঙ্গে একবার আমাকে দেখা দিয়ে পালিয়ে গেল ! এর পরেই দেখছি বড় সিঁড়ির মাঝে একেবারে চৌতলার ছাত থেকে মোটা একগাছ শিকলে বাঁধা লোহার একটা গির্জ্জের চূড়োর মতো কর্ত্তার আমলের পুরাণো লণ্ঠন—যেটা ঝোলে এখনো—সেটাকে নিয়ে শিকল শুদ্ধ বিষম দোলা দিচ্ছে ঝড়, নন্দ ফরাস লণ্ঠনটাকেই ভালবাসে—সরু একগাছা শণের দড়ি দিয়ে কোনো রকমে শিকল শুদ্ধ লণ্ঠনকে টেনে সিঁড়ির কাঠরায় বেঁধে ফেলতে চাচ্ছে—তুফানে পড়লে বজরাকে যেভাবে মাঝি চায় ডাঙ্গায় আট্‌কে ফেল্‌তে ঠিক তেমনি ভাবটা তার ! কোন

দিন এর আগে জানিয়েছিল শিকলি লণ্ঠন সিঁড়ি ও ফরাস আপন আপন কথা আমাকে তা একটুও মনে নেই কিন্তু এটা বেশ মনে হচ্ছে সেই প্রথম গিয়ে পড়লেম দোতলায় বৈঠকখানার মাঝের বড় ঘরটাতে; কে যে আমাকে নামিয়ে আনলে—হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে আনলে কিম্বা কোলে করে আনলে—তাও মনে নেই, কেবল মাঝের ঘর মনে আছে—সেখানে সারি সারি বিছানা কৌচ টেবেল সরিয়ে মাদুরের উপরে পেতে দিতে ব্যস্ত চাকর দাসীরা, হলদে রংএর বড় বড় কাঠের দরজা সারি সারি সব কটাই বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরে বাতাস আসতে পারছে না, চাকরাণী গুলো দুধের বাটি জলের ঘটি পানের বাটা পিতলের ডাবর ঝন্ ঝন্ করে এনে জমা করছে ঘরের কোণে, এরি মাঝে মাদুরে বসে দেখিছি—মাথার উপরে সাদা গেলাপ মোড়া একটার পর একটা বড় ঝাড়, দেয়ালে দেয়ালে দেয়ালগিরি ছোট বড় সব অয়েল পেণ্টিং বাড়ির লোকের, জানছি ঝড় যেন একটা কী জানোয়ার, গর্জ্জন করে ফিরছে বন্ধ বাড়ির চারিদিকে, দরজা গুলোয় থেকে থেকে ধাক্কা দিয়ে কেবলি পথ চাচ্ছে ঘরে ঢোকবার! এক সময় হুকুম হল ছেলেদের শুইয়ে দেবার; দক্ষিণ শিয়রে মায়ের কাছে সেদিন মেঝেতে পাতা শক্ত বিছানায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে নিলেম কিন্তু ঘুমিয়ে গেলেম না অনেক রাত পর্য্যন্ত শুনতে থাকলেম বাতাস ডাকছে বৃষ্টি পড়ছে, আর দুই পিসি পান দোক্তা খেয়ে বলাবলি করছেন এমনি আর একটা আশ্বিনে ঝড়ের কথা। সেই রাতে একটা ইংরিজি কথা জানলেম—সাইক্লোন! ঝড়ের এক ধাক্কায় যেন বাড়ির অনেকখানি, বাড়ির মানুষদের অনেকখানি সেই সঙ্গে ঝড়ই বা কি সাইক্লোনই বা কাকে বলে জানা হয়ে গেল! এক রাত্তিরে যেন মনে হল অনেকখানি বড় হয়ে গেছি জেনেও ফেলেছি অনেকটা ঘরকে বাইরেকেও।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজা রামমোহন ও বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার যে পার্থক্য, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর না হইলেও,—মোটের উপর ইহা বলা আবশ্যক যে মিতাক্ষরা আইনের অধীন,—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবসর যে পরিমাণে আছে, বাঙ্গালার দায়ভাগ আইনের অন্তর্ভুক্ত পরিবার মধ্যে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে। তবে পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের নাই। মিতাক্ষরার ব্যবস্থায়, পরিবার আগে, ব্যক্তি পরে। দায়ভাগে—ব্যক্তি আগে, পরিবার পরে। ইহা সামান্য পার্থক্য নয়, ব্যক্তিত্বের ক্রম-বিকাশে ও পরিবার গঠনে, ইহা বাঙ্গালী-সভ্যতার পক্ষে কম বিশেষত্বের

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার পার্থক্য।

পরিচয় নয়। তবে সম্পত্তির উপর নারীজাতির অধিকারে কোন ক্ষেত্রে বা মিতাক্ষরা অধিকতর উদার, কোন ক্ষেত্রে বা দায়ভাগ অধিকতর উদার।

বাঙ্গলায় ষোড়শ শতাব্দী একটা সংস্কারের যুগ।

বাঙ্গালীর স্মৃতি ও দর্শন ছাড়িয়া,—তাহার সাধন ধর্ম্মগুলির প্রতি এইবার আমরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিব। ষোড়শ শতাব্দীতে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে নব সংস্করণ বাঙ্গলাতে হইয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দী সেই আলোকে পথ দেখিয়া চলিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ষোড়শ শতাব্দীর কোন সংস্কারই, বিনা বিচারে বিনা প্রতিবাদে—একদিনে গ্রহণ করে নাই। তাহা সম্ভবপরও নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী-সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগে একটা সংস্কার হয়। ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালীর একটা সংস্কারের যুগ, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগেই এই সংস্কারের বিরুদ্ধে তৎকালে একটা প্রতিবাদও হয়। এবং এরূপ হওয়াও স্বাভাবিক। একটা নূতন কিছুর বিরুদ্ধে গতানুগতিকেরা সকল দেশে এবং সকল যুগেই অল্প-বেশী প্রতিবাদ করিয়া থাকে। সেই সমস্ত প্রতিবাদের চিহ্ন—সমাজ-অঙ্গ অদ্যাপি সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অদ্যাপি চৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপে মহাপ্রভুর অবতারবাদ ও তৎ-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাধক সম্প্রদায়ে স্পষ্টই অস্বীকৃত। তথাপি সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগের সংস্কার—সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীকে ইতিহাসের পথে আলোক দেখাইয়াছে। ক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি এই আলোক নিভিবার উপক্রম হইয়াছে,—অন্ধকার বিভীষিকা ছড়াইয়াছে, নূতন আলোকের প্রয়োজন হইয়াছে। রাজা রামমোহন ঠিক এই সময়ে সেই নূতন আলোক হস্তে জাতিকে পথ দেখাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আলোকের অভাব যখন খুব বেশী বোধ হইতেছিল,—তখনি বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর আলোক আসিয়া দেখা দিয়াছিল। বাঙ্গালী সেই আলোকের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার এই একশত বৎসর করিতে পারিয়াছে, এমন প্রমাণ কিন্তু বেশী নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর শাক্ত শৈব বৈষ্ণব—এক সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত এবং বিশেষতঃ এক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পরিবার ও সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে বাস করিত বলিয়া, এই সমস্ত পৃথক এবং বিভিন্নমুখী সাধনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যগুলি খুব স্পষ্ট করিয়া বিরোধীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সর্ব্বভূতেই পরমাত্মা আছেন এই রকম একটা ধারণা বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অল্লাধিক বদ্ধমূল ছিল। কাজেই এক সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্য সম্প্রদায়ের দেবতা বা দেবীকে রীতিমত পূজা না করিলেও—হয়ত বা প্রণাম করিত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে যাহা ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি তাহা থাকিল না। শাক্ত শৈব বৈষ্ণবে,—তখন সুস্পষ্ট বিরোধ দেখা দিল। শাক্তের দেবদেবী ও বলি প্রভৃতি পূজার উপকরণ বৈষ্ণবের অশ্রদ্ধার বস্তু হইল, বৈষ্ণবের খোল করতাল সংযুক্ত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন শাক্তের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হইল।

যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে ধর্ম্মভাবের ক্রমশঃ অভাব হইতেই এইরূপ ধর্ম্ম কলহের সূত্রপাত হয়। রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলায় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবের মধ্যে এমনি একটা আত্মঘাতী ধর্ম্মকলহ দেখা দিয়াছিল, দেবদেবীদের নৈতিক চরিত্রও নাকি রীতিমত অশ্লীল হইয়া উঠিতেছিল। তখনকার সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এইখানেই বলা সঙ্গত যে বাঙ্গালীর স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রে যেমন, তেমনি তাহার শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্ম অপেক্ষা, বাঙ্গালী-প্রতিভার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে। সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুর দীক্ষা ও উপাসনা তান্ত্রিক মতে হইয়া থাকে। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের পূজা পদ্ধতির যে-সমস্ত সাধারণ অঙ্গ, যেমন বোধন ভূতশুদ্ধি, ধ্যান, ন্যাস প্রভৃতি—ইহা সমস্তই তান্ত্রিক মতে নিষ্পন্ন হয়। গায়ত্রীও দুই প্রকারের,—যথা বৈদিক ও তান্ত্রিক। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বাঙ্গলায় তন্ত্রের খুব মান, বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেই তান্ত্রিক। আবার মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মের যে "কান্তভাব"—যে "রাধার ভাব"—তাহা বাঙ্গালী বৈষ্ণবের নিজস্ব। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীই ইহার সাক্ষী। বাঙ্গালী বৈষ্ণবের এই "কান্তভাবের" প্রাচুর্য্য—উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এতটা নাই; তা সে ভালই হউক, আর মন্দই হউক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব।

বাঙ্গালীর দীক্ষা ও উপাসনা তান্ত্রিক মতে হইয়া থাকে।

সুতরাং বাঙ্গালী-সভ্যতার কোন এক অঙ্গ—বাঙ্গালী-সভ্যতা নহে। বাঙ্গলার স্মৃতি, নব্য ন্যায়, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতির সমবায়ে বাঙ্গালী-সভ্যতার জন্ম। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে ঐক্য—যে যোগসূত্র ইতিহাসের পথে সভ্যতার সকল বিভাগকে ধারণ করিয়া উন্নতি ও অবনতির মধ্য দিয়া চলিয়াছে,—তাহাই বাঙ্গালী-সভ্যতার প্রাণ। কোন এক বিশেষ অঙ্গ অর্থাৎ কেবল শাক্ত বা কেবল বৈষ্ণব, কিংবা কেবল দায়ভাগ বা কেবল নব্য ন্যায় বাঙ্গালী সভ্যতার প্রাণ নহে। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রমাত্মক।

বাঙ্গালী সভ্যতার কোন এক অঙ্গ বাঙ্গালী সভ্যতা নহে

বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব গুলির মোটামুটি একটা সাধারণ রকমের পরিচয় আমরা পাইলাম। এখন দেখিতে হইবে প্রত্যেক বিভাগে এই সমস্ত বিশেষত্ব গুলি ইতিহাসের গতিপথে একস্থানে অচল হইয়া অবস্থান করিতেছে না। প্রত্যেক বিভাগের বিশেষত্বগুলি উন্নতি বা অবনতির মুখে বিভিন্ন সভ্যতার স্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছে। একের পর অন্য যুগ-পরিবর্ত্তনে বৈশিষ্ট্য গুলি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখন আমরা দেখিব—ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলি, ইতিহাস পথে পরিবর্ত্তন মুখে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কিরূপ অবস্থার মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছিল, এবং রামমোহনের অভিপ্রেত সংস্কার, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলিকে—কোথায় বা পরিবর্ত্তন কোথায় সংশোধন এবং কোথায় বা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন কেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল? তাঁহার ঈপ্সিত সংস্কার বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিয়াছে, না ধ্বংসের দিকে লইয়া গিয়াছে?

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সমাজ-ব্যবস্থার দুই শতাব্দীর কিছু অধিক কাল পরে রামমোহনের সংস্কার, বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থায় ইহলৌকিক এবং পারমার্থিক ব্যাপারে অনেক কিছু পুরাতন পরিত্যাগ করিতে বলে—এবং অনেক কিছু নূতন, প্রাচীন শাস্ত্রের আবরণে, গ্রহণ করিতে বলে। ইতিহাস পথে সমাজের গতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এইরূপ সাময়িক পরিবর্ত্তনকে সৎ অসৎ বিবেচনা সম্পন্ন সমাজস্থ নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া রামমোহন মনে করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে বর্ণাশ্রম ছিল না। ছিল জল চল এবং শ্রেণীবিভাগ অচল বহু জাতির আত্মঘাতী ভেদ বা মর্ম্মান্তিক বিরোধ। রঘুনন্দন বাঙ্গালী সমাজে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র এই দুই বর্ণ মাত্র দেখিয়াছিলেন ও তাহাই স্বীকার করিয়াছিলেন। মধ্যের দুই বর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য লুপ্ত বলিয়া অস্বীকৃত হইয়াছিল।

রামমোহন ও জাতিভেদ।

রামমোহন বর্ণাশ্রমকে একেবারে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রচলিত জাতিভেদকে “বজ্রসূচী”র প্রমাণ উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া ইহলোকেই শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে এমন কথা তিনি শাস্ত্রপ্রমাণে সমর্থন করিয়াছেন। Digbyর নিকট চিঠিতে এবং অপরাপর অনেকস্থানে তিনি জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। রাজার বিশ্বাস ছিল যে—জাতিভেদ আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতার একটি কারণ। যতদিন জাতিভেদ থাকিবে ততদিন জাতীয় একতা হইবে না। জাতীয় একতা না হইলে, আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না। বলা বাহুল্য যে—আমাদের জাতি স্বাধীন হউক, এই ইচ্ছা—সেকালে এবং শত বৎসর পর—একালের অনেক রক্ষণশীল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপেক্ষা রামমোহনে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ছিল এবং তাহা ছিল বলিয়াই সেকালে বা একালের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের সহিত জাতিভেদ সম্পর্কে তাঁহার স্বমতের ঘোরতর বিরোধ ছিল এবং আছে।

জাতিভেদ, রাজনৈতিক পরাধীনতার কারণ।

স্মৃতি এবং দেশাচার যেরূপ বিবাহ-পদ্ধতিকে তখন সমর্থন করিত, রামমোহন তাহাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। এক পুরুষের বহু স্ত্রী, ইহা তিনি অসঙ্গত মনে করিতেন। ইহা রহিত করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া শেষে আইন দ্বারা এই কুপ্রথা বন্ধ করিবার কথাও তিনি ভাবিয়াছিলেন। পুরুষের বহুবিবাহ এখনও স্মৃতির অনুমোদিত। তবে যে ইহার অল্পতা এখন অনুভব করা যায়, তাহার প্রথম কারণ দরিদ্রতা, দ্বিতীয় কারণ লোক-নিন্দার ভয়। এই লোকনিন্দার ভয়—রামমোহনের সময়ে ছিলনা। পরন্তু বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বলিলেই লোক-নিন্দার ভয় ছিল। এবং পুরুষের বহুবিবাহেরও আধিক্য ছিল। সুতরাং এই প্রথা নিবারণের জন্য শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রয়োজন রামমোহন বোধ করিয়াছিলেন—তাহার তীব্রতা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও এখন অনেকটা কম হইয়াছে।

রামমোহন ও বহুবিবাহ

বিধবাবিবাহ ব্যাপারে রাজার অভিপ্রায় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল বলেন যে তিনি

রামমোহন ও বিধবাবিবাহ।

বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, এমন সংকল্প তাঁহার কতিপয় বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর দল বলেন, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গে স্বামী সহবাসের প্রলোভন অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম আর পরমাত্মার ধ্যান করার কথাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। বিধবাবিবাহের সমর্থন তিনি করেন নাই। এমন কি ইহাকে অসদাচার বলিয়াছেন।* মৃত স্বামীর সহিত স্বর্গবাস সকাম কর্ম্ম। সকাম কর্ম্ম শাস্ত্রে প্রশংসনীয় নয়। ইহা অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম—ও আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিন্তন এবং ব্রহ্মচর্য্য—অধিকতর প্রশংসনীয় ও কর্ত্তব্য। বিধবার পক্ষে, মৃত স্বামীর সহিত স্বর্গবাস অপেক্ষা জীবিত অবস্থায় পরমাত্মার সহিত অভেদ চিন্তন এক খুব বড় সংস্কার। ইহার তাৎপর্য্য বহুদূরব্যাপী। রাজার শৈব বিবাহের প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাইব যে, ঐরূপ বিবাহকে তিনি শাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু শৈব-বিবাহে যেমন জাতিভেদ এবং বয়স বিচার নাই—তেমনি বিধবার পুনর্বিবাহেও বাধা নাই কেবল সভর্ত্তৃকা ও সপিণ্ডা না হইলেই হইল। সুতরাং শৈব বিবাহের দিক দিয়া রামমোহন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় ও সমাজে প্রচলনযোগ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন ও সতীদাহ।

সতীদাহ—অর্থাৎ মৃতস্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবিত স্ত্রীকে হস্তপদ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া নিক্ষেপ করা এবং বাঁশ দ্বারা চাপিয়া রাখিয়া ঐ স্ত্রীকে পুড়াইয়া ফেলাও—৯৯ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ আমলে বাঙ্গালী হিন্দুর এক অতি গুরুতর ধর্ম্মসংক্রান্ত শাস্ত্রীয় ব্যাপার ছিল। আচার বিভাগে ইহা সকাম কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। কোন কোন প্রাচীন স্মৃতি হারীত, অঙ্গিরা, ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি এবং প্রচলিত দেশাচারে ইহার সমর্থন ছিল। রামমোহন এই বর্ব্বরোচিত কুপ্রথার উচ্ছেদ কল্পে জীবনপণ করিয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ১৮২৯ খৃঃ ইহা রহিত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রের ও যুক্তির যে-সকল প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করেন—তাহা তৎপূর্ব্বে ১৮০৫ খৃঃ নিজাম আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মার মত কেবল প্রাচীন স্মৃতির উল্লেখ নহে। কেননা রামমোহনের ২০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে পণ্ডিত ঘনশ্যামও শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, শিশুসন্তানবতী, ঋতুমতী, গর্ভবতী ও অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবাগণ সহমৃতার যোগ্য নহেন। এবং বলপ্রয়োগ বা মাদক দ্রব্য সেবনের কথাও শাস্ত্রে নাই। কিন্তু রামমোহন, ইহার অতিরিক্ত, নারীজাতির পৃথক অস্তিত্ব ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র বিকাশের জন্য অনেক আধুনিক কথা বলিয়াছেন। এইখানেই রামমোহনের বিশেষত্ব। যদি তুলনা করিতে হয়,—তবে ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের বিশেষত্ব অপেক্ষা,—এক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনের বিশেষত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অধিক। রঘুনন্দনে, ষোড়শ শতাব্দীতে নারীত্ব সঙ্কোচনের দিকে

---

* বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য্য হইয়াছে, সুতরাং সদাচার কহাইতে পারে না—"পথ্য প্রদান"—পৃঃ ৩১৮।

আত্মবিলোপ করিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনে নারীত্ব, আত্মমর্য্যাদা লাভ করিয়া আত্মবিকাশের সুযোগ পাইয়াছে। রঘুনন্দনে নারীত্ব আর স্ত্রীত্ব এক পদার্থ, নারী যেন শুধু ভাল স্ত্রী হইবার জন্যই জন্মিয়াছে। রামমোহনে নারীত্ব, স্ত্রীত্ব হইতে ব্যাপক।

সতীদাহের উদ্দেশ্য।

সতীদাহের উদ্দেশ্য ছিল—মৃত স্বামীর আত্মার সহিত স্বর্গ নামক স্থানে পত্নীর সহবাস। উপায়? জীবন্ত অবস্থায় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরা। দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসার দিক দিয়া আধুনিক কালে প্রশ্ন উঠিবে,—স্বর্গ নামে কোন স্থান আছে কিনা? স্বামীর আত্মা স্বীয় পাপপুণ্যের তারতম্য অনুসারে তথায় গিয়া ঠিক পৌঁছিতে পারিয়াছে কিনা? বি-দেহ স্বামী-স্ত্রীর আত্মার একত্র বসবাস কি প্রকার? এবং তাহা সম্ভব কি, না? ইত্যাদি। এই প্রশ্ন এবং তাহার প্রচলিত উত্তরের বিরুদ্ধে রামমোহনের মনে যে শত বর্ষ পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই এমন কথা কে বলিতে পারে? যে উদ্দেশ্যের উপর সতীদাহের ভিত্তি, রামমোহন সেই উদ্দেশ্যকেই নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া বসিলেন। সতীদাহের উদ্দেশ্যকে নারীজাতির জীবনের চরম আদর্শ বলিয়া রামমোহন অস্বীকার করিলেন। তার পরিবর্ত্তে জীবিত থাকিয়া আত্মার পরমাত্মায় অভেদ চিন্তনকে নারীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য উৎকৃষ্টতর আদর্শ, বলিলেন। নারীত্বের এই আদর্শ পরিবর্ত্তনের মধ্যেই একটা যুগ পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। নারীর পক্ষে, স্বামীর স্থানে পরমাত্মা, এবং চিতায় পুড়িয়া মরা অপেক্ষা বাঁচিয়া থাকিয়া পরমাত্মার ধ্যান করা—যে কথা; আর নারীজাতির জীবনের সমগ্র আদর্শকে—মধ্যযুগ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া একেবারে বর্ত্তমান যুগে প্রোথিত করা—একই কথা। রামমোহন তাহাই করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব, এইখানেই তিনি যুগ প্রবর্ত্তক বলিয়া ইতিহাসে বরেণ্য। নতুবা কেবল একটা মন্দ দেশাচারকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে রহিত করা, বড় কাজ হইলেও, রামমোহনের সংস্কার তাহা অপেক্ষাও সুদূর সম্প্রসারিত। সতীদাহ নিবারণ প্রসঙ্গে, নারীজাতির ব্যক্তিত্বের বিকাশ পুরুষ হইতে নারীর পৃথক স্বাধীনতার কথা বিশেষ করিয়া রামমোহনের মনে আসিয়াছিল বলিয়াই, নারীজাতির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে তিনি জীমূতবাহন বা রঘুনন্দনীয় দায়ভাগের ব্যবস্থাকে, অনুদার বলিয়া পরিবর্ত্তন করিবার কথা বলিতে সাহস করিয়াছিলেন। শুধু সাহস নয়, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি উদ্ধার করিয়া নারীজাতির সম্পত্তির উপর দানবিক্রয় সম্পর্কে অধিকতর প্রশস্ত ও উচ্চাধিকার প্রচলনের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রচলিত দায়-

নারীজাতির বিষয় সম্পত্তির উপর অধিকার সম্পর্কে জীমূত রঘুনন্দন অপেক্ষা রামমোহন অধিকতর উদার।

ভাগ ব্যবস্থায়—নারীজাতির সম্পত্তির উপরে যেরূপ সঙ্কুচিত অধিকার, তাহা আধুনিক যুগে নারীত্বের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। অথচ বর্ত্তমান যুগের একটা বড় লক্ষণ হইতেছে—নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ;—শুধু গার্হস্থ্যে নয়—গৃহের বদ্ধ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া, মানবের সর্ব্বপ্রকার

কল্যাণে বাহিরের সমাজ ও রাষ্ট্রের—বৃহত্তর পরিধির মধ্যে। সুতরাং মধ্যযুগের অবসানকামী বর্ত্তমান যুগ-পুরোহিত রামমোহন, নারীজাতির স্বত্বাধিকার সম্পর্কে জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালী স্মৃতির বৈশিষ্ট্য দায়ভাগের বিরোধীয় সংস্কার নয়। দায়ভাগের মূলভাব যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তাহা জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনে বাঙ্গালী সমাজের পুরুষ পর্য্যন্ত আসিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল, রামমোহন দায়ভাগের এই গতিকে উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতির মধ্যে আনিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেন। "নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার" এমন একটা আধুনিক ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই রামমোহন,—শুধু সতীদাহের আচার বিভাগ নয়—বিধবার ও কন্যার সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে স্মৃতির ব্যবহার বিভাগেও—নবযুগের উপযোগী সংস্কার চাহিয়াছিলেন। বিধবা শুধু জ্বলন্ত চিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উপর পুরুষের সমান অধিকার লইয়া সমাজে জীবনধারণ করিবে। ইহকাল ও পরকাল সমস্ত দিক হইতে নারীজাতিকে এমন সম্পূর্ণ করিয়া ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অতি অল্প লোকই দেখিয়াছেন।

রামমোহন ও শৈব বিবাহ।

এইবার আমরা বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত স্মার্ত্ত মতাবলম্বী বৈদিক বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন কথিত শৈব-বিবাহের আলোচনা উপস্থিত করিব। "চারি প্রশ্নের উত্তর" গ্রন্থে "যবনী কি অন্য জাতি, পরদার মাত্রগমনে সর্ব্বদা পাতক হয়" বলিয়া রামমোহন প্রধানতঃ "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,—

"কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী কন্যা হইবা মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত নহে। বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কদা ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে, শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীত যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এক কালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারেন। এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। * * * সাক্ষাৎ মহেশ্বর প্রোক্ত আগম প্রমাণে সর্ব্বজাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয়না, এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। "যথা বয়োজাতি বিচারোত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ।"—মহানির্ব্বাণ। শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয়—তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক। ইতি বৈশাখ ৩০, শক ১৭৪৪।"

"পথ্যপ্রদান" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে রাজা বলিতেছেন—

"শৈবধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে, পত্নী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না। যদি স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব কেন না হয়? শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন একের মান্যতা অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নাই।"

গৃহীর বিবাহ ব্যাপারে, রামমোহন স্মৃতি ও তন্ত্রের সমান সম্মান দিয়াছেন। স্মার্ত্তমতের বৈদিক-বিবাহ সমাজে প্রচলিত বলিয়া শৈবমতের বিবাহ প্রচলন হইতে শাস্ত্র ও যুক্তিমতে বাধা নাই। শৈব বিবাহ তখন গৃহীদের মধ্যে বৈদিক বিবাহের ন্যায় প্রচলিত ছিল, এমন মনে হয় না। সে সম্বন্ধে রামমোহন নীরব। তিনি শুধু বলেন যে শৈব-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইতে বাধা নাই। এমনকি হওয়া উচিত। কারণ? মহানির্ব্বাণে ইহার সমর্থন আছে। আর মহানির্ব্বাণ ও রঘুনন্দন শাস্ত্র বোধে বিবাহ ব্যাপারেও সমান সম্মান পাইবার যোগ্য। শৈব বিবাহের এই অতি উদার ব্যবস্থায় মুসলমানীর সঙ্গে হিন্দুর বিবাহ হইতে পারে। স্ত্রীর বয়স, স্বামীর অপেক্ষা বেশীও হইতে পারে। স্ত্রী সপিণ্ডা হইবে না, যাহা হিন্দু বিবাহে অশাস্ত্রীয়। এবং পাত্রী ভর্তৃহীনা হইবেন। এখন ভর্তৃহীনা অর্থে স্বামী ছিল—এখন নাই—বুঝাইলে বিধবা বুঝায়। আর স্বামী ছিলই না বুঝাইলে কুমারী বুঝায়।* সুতরাং হিন্দু মতে, মুসলমানীর সহিত হিন্দুর বিবাহ এবং বিধবার বিবাহ রামমোহন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচলন করিবার প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন। কোন স্থানে রাজা স্মার্ত্তমতের বৈদিক বিবাহ উঠাইয়া দিবার কথা বলেন নাই। বা তাহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করেন নাই। যুক্তি দ্বারাও ঐ বিবাহ পদ্ধতিকে তিনি কোনরূপ আঘাত করেন নাই। তাঁহার তখনকার অভিপ্রায় এইরূপ বুঝা যায় যে বৈদিক বিবাহ—আছে, থাকুক সেই সঙ্গে শৈব-বিবাহও প্রচলিত হউক। শত বৎসর পূর্ব্বে, জাতিভেদ বর্জ্জিত বিবাহ, বিধবাবিবাহ, এবং যবনীর সহিত হিন্দুর বিবাহ—শাস্ত্র মতে হিন্দুসমাজে প্রচলন করিবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। এই শৈব-বিবাহের সমর্থনে—তাঁহার মানসিক বিকাশের একটা বিশেষ পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু প্রচলিত বৈদিক বিবাহ ও মহানির্ব্বাণ কথিত শৈব-বিবাহ পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থার বিবাহ। একই সমাজে এই দুই রকমের বিবাহ একই সঙ্গে, একে অন্যকে আঘাত না করিয়া প্রচলিত হইতে পারে কি না—বলাও শক্ত। রামমোহনের পর হইতে একশত বৎসর এই শৈব-বিবাহ বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে বৈদিক বিবাহের ন্যায় সমধিক প্রচলিত হইলে পর,—হিন্দু-সমাজ দুইটি পরস্পর বিরোধী, অপাংক্তেয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িত, কিংবা বৈদিক বিবাহ সমাজ হইতে একেবারে লোপ পাইত—কল্পনা করা শক্ত। এক পরিবারের এক ভ্রাতা বৈদিক বিবাহ, অপর ভ্রাতা শৈব-বিবাহ করিলে পর,—তৎক্ষণাৎ পরিবার ভগ্ন হইয়া যাইত। শৈব-বিবাহকারিগণ

শৈব বিবাহে পাত্র ও পাত্রীর অবস্থার বিবরণ।

শৈব বিবাহ প্রচলিত হইলে,—কি অবস্থা হইবে।

---

* ভর্তৃহীনা শব্দের অনুবাদ "সভর্তৃকা না হয়" রামমোহন এইরূপ করিয়াছেন। ভর্তৃহীনা কেবল বিধবা বুঝাইবে, কিংবা কুমারীও বুঝাইবে এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ আলোচনা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিলে উপকৃত বোধ করিব। লেখক।

বিভিন্ন জেলায় সামাজিক নিয়মে এক পৃথক সম্প্রদায়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেন। সংখ্যায় ও সভ্যতায় শৈব ও বৈদিক অর্থাৎ স্মার্ত্ত সম্প্রদায় কিরূপ আকার ধারণ করিত—তাহাও বলা কঠিন। কেহ বলিতে পারেন যে বৈদিক বিবাহের পরিবর্ত্তে সমাজে শৈব-বিবাহের প্রচলনই রাজার অভিপ্রেত ছিল। হইতে পারে। কিন্তু কোথায়ও স্পষ্ট সে কথা তিনি বলেন নাই। ভবিষ্যৎকে সম্ভবতঃ তিনি সমাজের স্বাভাবিক গতির উপরেই নির্ভর করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে রাজার অভিপ্রায় অনুমান করা কিঞ্চিৎ কঠিন।

রামমোহন ও বিবাহবন্ধন ছেদন।

স্বামী বর্ত্তমানে—বিবাহ বন্ধন ছেদন হইতে পারে কি, না এবং এ সম্বন্ধে রাজার মত কিরূপ ছিল—তাহা জানিবার জন্য শতাব্দী পরে আজ আমাদের স্বভাবতঃই কৌতূহল হইতে পারে। কেন না বিবাহ সম্পর্কে তিনি সমস্ত দিক হইতেই প্রখর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তাঁহার রচনাবলী হইতে এইরূপ অনুমান হয়। তুলনামূলক বিচারে দেখিতে পাই—খৃষ্টান ও মুসলমান বিবাহ চুক্তিমূলক। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ হইলে,—যে কোন সময়ে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। এবং বিচ্ছিন্ন স্বামী কিংবা স্ত্রী পুনরায় অপর পাত্র বা পাত্রী বিবাহ করিতে পারেন। হিন্দু বিবাহে তাহা হইতে পারে না। ইহা একটা ধর্ম্মের ব্যাপার, চুক্তির নহে। একবার বিবাহ হইলে, ইহ বা পরকালে বিবাহবন্ধন অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যায়। এমন কি স্বামী বর্ত্তমানে—স্ত্রীর ব্যভিচারাদি দোষ ঘটিলেও,—সংসামান্য খোরপোষ পাইয়া স্ত্রীর স্বামীগৃহেই পৃথকভাবে অবস্থানই ব্যবস্থা। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার—বা পুনরায় অন্য স্বামী গ্রহণের উপায় নাই। স্বামীর স্ত্রীর প্রতি অশাস্ত্রীয় অত্যাচার প্রমাণ হইলে পর, স্ত্রীর পৃথক ভাবে বাস করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার অভিমত শাস্ত্রে নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্র ও দেশাচার একমত।

এখন বিবেচ্য যে স্বামী-স্ত্রীর জীবিত অবস্থায়,—অনিবার্য্য কারণে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে কি না? এবং বিচ্ছিন্ন স্বামী কিংবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে কি না? এ সম্বন্ধে রাজার কি অভিপ্রায় ছিল?

বৈষ্ণবীয় মতের বিবাহবন্ধন ছেদন—রামমোহনের অনভিপ্রেত।

যতদূর দেখা যায়—তাহাতে মনে হয়,—বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া, বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর পুনরায় বিবাহে—রাজার মত ছিল না। এক্ষেত্রে, খৃষ্টান, মুসলমান ত দূরের কথা,—বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কণ্ঠিবদল বিবাহে—অবস্থাধীনে—যে ঐরূপ বিবাহ ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে—, তাহাকে রাজা স্পষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছেন। রাজা শৈব-বিবাহ প্রচলন করিবার প্রস্তাব যখন করেন, তখন তাহার রীতিমত প্রতিবাদ হয়। ইহা আশ্চর্য্য নয়। বরং না হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। প্রতিবাদকারী রাজাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে—"যাঁহারা যবনী-গমনে ও বেশ্যা

সেবনে সর্ব্বদা রত, তাঁহাদের স্ত্রীও বিধবা তুল্যা। যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয়,—তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব-বিবাহ করা যায় কি না?"

রাম মোহনের উত্তর —(পথ্য প্রদান ")

"স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রীবঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন। কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি যুদ্ধের শাস্ত্রে কি স্মৃতি শাস্ত্রে, লিখেন না। তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্য স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়েই আছে। পাঁচসিকা গোসাঁইটিকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়। আর পাঁচসিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় স্থাপন করত থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।"

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আড়াই টাকা মাত্র ব্যয়ে, পূর্ব্ববিবাহ খণ্ডন ও তৎপরের বিবাহের সংঘটন রাজার অভিপ্রায় নয়। শৈব মতের, জাতিভেদ বর্জ্জিত, মুসলমানী বিবাহ এবং বিধবাবিবাহ-পর্য্যন্ত রামমোহন হিন্দুবিবাহ বলিয়া, প্রচলন করিবার পক্ষপাতী, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণব মতের, স্বামী বর্ত্তমানে পাঁচসিকা দিয়া পূর্ব্ব বিবাহ খণ্ডনের পক্ষপাতী তিনি মোটেই নহেন। বিবাহ সম্পর্কে, এ ক্ষেত্রে রাজার মতের যে একটি বৈশিষ্ট্য—তাহা স্পষ্টই আমরা দেখিতে পাই।

(আগামী বারে সমাপ্য) *

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

প্রজাপতির দৌত্য

১

সনাতন পিতার স্বর্গ-প্রাপ্তির পর উত্তরাধিকারীসূত্রে বিষয়-সম্পত্তি যাহা পাইয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ দুঃখ কষ্ট না-করিয়া দিন চলিয়া যাইবার কথা। দুই পুত্র এবং এক কন্যা। নিজে কুলীন; পুত্রদ্বয়ের বিবাহে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশা ছিল। অতএব কন্যা শুভদা-সুন্দরীকে পাত্রান্তর ভালভাবেই করিতে পারিবেন,—এমন ভরসাই বরাবর রাখিয়া আসিতেন। কিন্তু গোল হইল যখন তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী মানদাসুন্দরী একটির পর একটি করিয়া আরো চারটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া বসিলেন। হিসাবের পাকা ঘুঁটিটি এমন করিয়া শেষ বয়সে কাঁচিয়া যাইবে, কেই বা আগে মনে করিতে পারিয়াছিল!

---

* এই প্রবন্ধটি এই মাসে শেষ হইবার কথা ছিল। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ায় এই মাসে শেষ হইতে পারিল না। বঃ সঃ

সনাতন লেখাপড়া জানিতেন খুব চলন সই ; কিন্তু তাঁহার চল্‌তি বুদ্ধিটি ছিল টন্‌টনে। আর্থিক বিষয়ে তাঁহাকে কেহ ঠকাইতে পারে, এমন বিশ্বাস তাঁহার ছিল না, এবং কার্য্যতঃ সেরূপ দুর্ব্বিপাকে কোন দিন পড়িয়াছেন বলিয়াও তাঁহার স্মরণে আসে না।

কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতা থাকিবে না, এমনও ত হইতে পারে না। তাঁহার প্রথম দুর্ব্বলতা, সংসার যাহা-কিছু এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে লইয়া ; এবং দুই জনের মধ্যে বয়সের সমধিক পার্থক্য। দ্বিতীয়টি লইয়া সকলের সহিত তাঁহার সমূহ মতভেদ চলিয়াছিল। সেটি কৌলিন্য-মর্য্যাদা।

তিনি বলিতেন, পিতৃ-পুরুষের কাছে দুটো জিনিষ পেয়েছি ; এক, সম্পত্তি ; দুই, বংশ। যেমন সম্পত্তির এক কাণা কড়ির অপব্যয় করবার ধর্ম্মতঃ সাধ্য আমার নেই, তেমনি বংশের মর্য্যাদাকে একতিল ক্ষুণ্ণ করলে নিরয়গামী হ'তে হবে।

এই যুক্তি দৃঢ় করিবার জন্য নিজের জীবন হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন, সাবর্ণ চৌধুরীরা কুল ভাঙ্গার জন্যে থলে ভ'রে টাকা এনে আমার হাতে পায়ে ধরে ছিল। বলিতে বলিতে তিনি রাগিয়া উঠিতেন, বেটারা কে কম পাজি ; বলে কিনা দ্বিতীয় পক্ষ ত' "নিকে"; আর কুল দেখার দরকার কি? তাইতো রাগ ক'রে গিয়ে পাটুলির চাড়ুয্যেদের আট বছরের মেয়েকে ঘরে আন্‌লুম। টাকাই কি সব? আগে কুল, তারপর আর যা কিছু সব।

এই কথা, কিন্তু তিনি অভ্যাস বশে ঝোঁকের মাথায় বলিতেন। আবার যখন পাঁচ পাঁচটা অবিবাহিত কন্যার কথা মনে পড়িত তখন তালু হইতে নাভি পর্য্যন্ত তাঁহার শুকাইয়া উঠিত।

নিজেকে আশ্বস্ত করিবার জন্য রামকিঙ্কর—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা মনে করিতেন ; আর বছর দুদিন পরেই রাম যখন মানুষ হ'য়ে উপার্জ্জন করতে সুরু করে দেবে তখন আর ভাবনা কি? তাহার পরই হরিকিঙ্করের কথা মনে পড়িত। হরি গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া পরের বৎসর কলিকাতায় পড়িতে যাইবে। তাহার খরচ কোথা হইতে জুটিবে? বৃদ্ধের চিন্তায় মন ভারি হইয়া উঠিত। তখন আবার একটু আশার কথাও মনে পড়িত ;—হেড্‌ মাষ্টার ব'লেছেন হরি নিশ্চয় জলপানি পাবে। আহা! তাই হোক মা!—তাহ'লে তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে ষোড়শোপচারে পূজো দেবো।

রাম কলিকাতায় মেসে থাকিয়া রিপণ কলেজে বি, এ, পড়িতেছিল। তাহাকে নিয়মিত খরচপত্র দিতে হইত না। তবে সময়ে সময়ে বই কাপড় ইত্যাদির জন্য যখন টাকা দিতে হইত তখন সনাতন রাগারাগি করিতেন। বলিতেন, কাজ কি বিএ—এমেতে ; চাকরি করলে আমি বাঁচতুম।

মানদা একথার উত্তরে, গলার হার গাছি খুলিয়া দিয়া বলিতেন, রাম, আমারই জেদে বিএ

পড়চে—এই নাও হার—বেচে ফেলো, ঐ টাকায় তার কল্‌কাতার খরচ খুব চ'লে যাবে। কি হবে আমার বুড়ো বয়সে গয়না প'রে?

সনাতন শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেন, না না: থাক্ থাক্, তোমার এমন কি বয়স হলো?

মানদা এবার রাগ করিতেন, হয়নি বয়স ত কি? ছাই পাঁশ মেয়েমানুষের আবার বয়স কি? সোয়ামির বয়সেই তার বয়েস।

সনাতন লজ্জা পাইয়া বাহির হইয়া যাইতেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, ওগো শুন্‌চো, দিলুম রানকে দশ টাকা পাঠিয়ে। মানদা শান্তভাবে উত্তর করিতেন, বেশ ক'রেছ।

কিন্তু এই টাকা যে কোথা হইতে আসে সে খবর তিনি লইতেন না। টাকার ব্যাপারে সনাতন যেমন কৃপণ, তেমনি চাপা ছিলেন।

এক সময়ে সনাতনের মনের সাধ ছিল যে শুভদার আট বৎসর বয়সে গৌরী দান করিয়া পরজন্মে অক্ষয় স্বর্গ অর্জন করিবেন। সেই সময়ে এই উদ্দেশ্যে যে-সকল পাত্রের সংবাদ আসিয়াছিল তাহারা সকলেই কুলীন এবং সঙ্গতি-সম্পন্ন; কিন্তু কেহই একটি মারাত্মক দোষ বর্জ্জিত নয়; কাহারও বা প্রথম পত্নী গত, কেহ বা তৃতীয় বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। সেই সময়ে শুভদার বিবাহ না হইবার একটি কারণ, মানদা এবং রানকিঙ্করের এইরূপ বিবাহে ঘোর আপত্তি। কিন্তু সনাতন এই সামান্য বাধায় হটিতেন না যদি আর একটি একান্ত গোপনীয় কারণ না থাকিত। সেটিকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিতেন। ত্রয়োদশ বর্ষে শুভদার বৈধব্য দোষ ছিল। তাই মানদা স্থির করিয়াছিলেন যে তেরো বৎসরের পরে শুভদার বিবাহ দিবেন; কিন্তু সনাতন শাস্ত্রের অনুশাসন চিন্তা করিয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

এইজন্যই বোধ করি শুভদার জন্য পাত্র অন্বেষণে সনাতনের একতিল আলস্য ছিল না। ঘটক-ঠাকুর সনাতনের বাল্য-বন্ধু; সনাতনের অবস্থার সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই অপরিজ্ঞাত ছিল না, অতএব মাসে দুটি একটি করিয়া প্রৌঢ় কিম্বা বৃদ্ধ আসিয়া কিশোরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিত। তখন তাহাদিগকে ঠেকান দায় হইত। মানদা রাগ করিতেন, সনাতন নিভৃতে ডাকিয়া অনেক করিয়া বুঝাইতেন, বিধাতার লিপি-কে খণ্ডন করিতে পারে? কিন্তু আমি কেন পিতৃ-পুরুষদের নরকে ডোবাই। মানদা বলিতেন, বেশ, তোমার যা খুশী তাই করগে—আমি বিষ খেয়ে, কি জলে ডুবে আত্মহত্যা করবো।

সনাতন ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া কোনরূপে একটা জবাব দিয়া সেদিনের মত রক্ষা পাইতেন। আবার ঘটক-ঠাকুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিতেন, ভায়া বুড়ো হয়েছি—পাঁচ পাঁচটি মেয়ে!—তুমি আমার একমাত্র ভরসা। ঘটক ঠাট্টা করিয়া বলিত—শাস্ত্রে কি সাধেই ব'লেছে দাদা,—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা! সনাতন বলিতেন তা তুমি তোমার বৌঠাণকে যত ইচ্ছে ঠাট্টা তামাসা করনা না ভাই; কিন্তু আমি তো তোমার দাদা। আমাকে উদ্ধার করতেই হবে।

ঘটক-ঠাকুর আবার পাত্র খুঁজিয়া আনিতে রাজি হইতেন।

কুসুমপুর একখানি বড় গ্রাম। তাহাতে নানা বর্ণের লোকের বাস; তবে ব্রাহ্মণ প্রধান, কেন না জমিদার ছিলেন ব্রাহ্মণ।

তাঁহার চেষ্টায় একটি হাই স্কুল চলিত; একটি ছোট ডাক্তারখানাও ছিল। সাব এসিস্টেন্ট ডাক্তারের মাহিনা জমিদারই দিতেন। কাজেই জমিদারের প্রতিপত্তি ছিল এবং কুলীন না হইলেও সমাজের নেতা ছিলেন তিনিই।

কুসুমপুরে যথাসময়ে ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা দেখা দিত। সেখানেও তলে-তলে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ করিত; কিন্তু মারামারি লাঠালাঠি কি খোলাখুলি দ্বন্দ্ব-কলহ হইলে জমিদারের বাড়ি গিয়া তাহা মিটাইয়া আসিতে হইত। যে কোন কারণেই হউক গ্রামের লোক জমিদারের বিনা অনুমতিতে সরকারী আদালতের শরণ গ্রহণ করিতে পারিত না এবং করিলে গ্রামে বাস যে ছাড়িতেই হইবে তাহাও কাহারও অবিদিত ছিল না।

লোকের বিপদে-আপদে জমিদার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহা দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। তাই গ্রামের লোক, জমিদার ব্রজকিশোর রায় চৌধুরীকে একদিকে আত্মীয়ের মত ভালবাসিত এবং অপর দিকে যমের মত ভয়ও করিত। তাঁহার বিপক্ষে কোন কথা লইয়া আলোচনা করিবার মত সাহসী পুরুষও কুসুমপুরে কেহ ছিল না।

(২)

কলিকাতায় বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের একটি গলিতে কুসুমপুরের জমিদারের পক্ষ হইতে একটি বাড়ি ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। বাড়ি বেশী বড় নহে, উপরে দুটি ঘর এবং নীচে তিনখানি। উপরের ঘরে বাবুরা থাকিতেন। বাড়িতে ঢুকিবার দরজার পাশে একটি ছোট টিনের প্ল্যাকার্ডে লেখা "কুসুমপুর লজ"।

এইখানে কুসুমপুরের জমিদারের পুত্র নন্দকিশোর এবং তাহার বন্ধু রামকিঙ্কর থাকিয়া পড়াশুনা করিত।

বন্ধুর কাছে থাকিলে রামের খরচপত্রের অনেক সুবিধা; কিন্তু কিছু কিছু ব্যাঘাতও ছিল।

রাম মাতৃদেবীর উৎসাহে এবং পিতৃদেবের ঘোর অমতে, কলিকাতায় পড়িতে আসে। কোন কলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে বহু চেষ্টায় একটি প্রাইভেট পড়ান জোগাড় করিয়া তবে সে সিটি কলেজে ভর্ত্তি হয়;—সিটি কলেজেই অধ্যক্ষের দয়াবশতঃ একটি হাফ্ ফ্রি সিপ পায়।

প্রাইভেট পড়ানর দক্ষিণা স্থির হইয়াছিল মাসিক পনর টাকা, কিন্তু অসুবিধা এই যে দুই বেলা পড়াইতে হইবে। তখন সে অখিল মিস্ত্রির গলিতে একটি অফিসার-মেসে স্থান পাইয়াছিল। অফিসার মেসের সুবিধা এইটুকু যে সর্ব্বসমেত তাহাকে মাসে আট-দশ টাকা দিতে হয়।

ছাত্রদের মেসে তখনকার দিনে বারো টাকার কমে কিছুতে হয় না। সেখানে কিন্তু থাকিবার জন্য যে ঘর খানি সে পাইয়াছিল—তাহাকে ঘর না বলিয়া একটি সিন্দুক বলা যাইতে পারে। পরন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়, বিদ্যালাভের জন্য এতটুকু কষ্ট স্বীকার না করিলে দরিদ্র সন্তানের চলে না।

রামকিঙ্করকে বেশীদিন এখানে থাকিতে হইল না। একদিন হঠাৎ নন্দকিশোরের সহিত পথে দেখা। সে সঙ্গে সঙ্গে রামের বাসায় উপস্থিত হইয়া—তাহার থাকিবার ব্যবস্থা দেখিয়া তখনি গাড়ি ডাকিয়া জিনিষপত্র সমেত তাহাকে নিজের বাসায় ধরিয়া আনিল। বলিল, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না বলে দিচ্ছি, রাম। ও ঘরে ছমাস থাক্‌লে যদি তার থাইসিস্ না হয়ত,—তুই আমার নামে কুকুর পুষিস্।

নন্দকিশোর—চেষ্টা করিয়া একটা একবেলা পড়ানও স্থির করিয়া দিল।

নানা কারণে রাম বন্ধুর নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ; কিন্তু তাহার দোষ যে সে বড়ই বন্ধু-বৎসল এবং আড্ডাধারী। কুসুমপুর লজে বিশেষ করিয়া কলেজের ছুটির পর, বই খোলার কোন উপায় ছিল না। নন্দর চায়ের সত্রে কোন দিন বন্ধুর অভাব হইত না।

সেরাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া যখন নন্দ শয়ন করিবার উপক্রম করিতেছে তখন রাম তাহার প্রদীপে তৈল ঢালিয়া নবোদ্যমে পড়িতে বসিল। নন্দ বলিল, তুই আবার এখন পড়তে বসলি ?

রাম বলিল, করি কি ? কাল সকালে কি সময় পাবো ?

নন্দ। কেন ? কিছু কাজ আছে নাকি রে ?

রাম। কাজ !— কাজ আবার কি থাক্‌বে ? সকালেই হয়ত কোন বন্ধু অনুগ্রহ করিবেন।

নন্দ, ওঃ তাই ! বলিয়া আলোর অন্যদিকে পাশ ফিরিয়া শুইল। বলিল, তুই আবার অনার্স নিয়ে মরেছিস কিনা ! ঐ পচা কলেজ থেকে কোন জন্মে কেউ অনার্সে পাশ ক'রেছিল ?

রাম কথার উত্তর দিল না।

নন্দ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, নে ভাই, তুই ভাল করে পড়।……এবার ত' মনে ক'রেছিলুম কম্পিট করবি। কোথায় গেল সে আশা !—কোন রকমে ফার্স্ট ডিভিসনে রইলি। সে হিসেবে কিন্তু আমার রেজাল্ট মন্দ হয়নি ভাই, আমিত জান্‌তুম থার্ড ডিভিশন; হয়ে গেলুম সেকেণ্ড।

রাম বলিল, তোর কলেজ ভাল যে রে।

নন্দ বলিল, তাইতো তোকে অত ক'রে বল্লুম যে আয় আমাদের কলেজে। তুই ভারি এক বগা। খুঁজে খুঁজে শেষকালে জুটলি কিনা রিপনে।

রাম ভারি গলায় উত্তর করিল, আর যে কোথায় সিট ছিল না। বাবার মত কিছুতেই হয় না। তিনি বলেন শুভি বড় হয়েছে—তোমার আর প'ড়ে কাজ নেই, চাকরিতে ঢুকে আমার একটু আসান্ কর।

নন্দ বলিল, শুভি ? এমন কি বড় হয়েছে ?

রাম বলিল, মাও ঠিক ঐ কথা বলেন যে সেত' এগার পেরিয়ে বারোয় পা দিয়েছে…… এত কিসের তাড়াতাড়ি ?

নন্দ বলিল, তোদের বাড়িটা বেশ মজার : অন্য বাড়িতে মেয়েরা করে কুল-কুল, বিয়ে দাও :—মেয়ে বড় হয়ে গেল :—আর তোদের বাড়িতে যত কিছু হাঙ্গাম—তোর বাবাই করেন ; হাঁরে রাম, ঠিক ক'রে বল্‌তো ভাই—তোমার মাই বেশী লেখাপড়া জানেন, না ?

রাম লজ্জা পাইল, বলিল, দূর পাগল।

না না, তুই আমাকে লুকোচ্ছিস, বলিয়া নন্দ খুব এক চোট হাসিয়া লইল।

নন্দর অভ্যাস ছিল কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়া, আবার একটুকু খুট-খাট শব্দ হইলেই সে একেবারে উঠিয়া বসিত। সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাম মনে মনে একটুও ক্লান্ত ছিল না। হাই তুলিতে তুলিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে দশটা বাজিয়াছে। বলিল, এখনো দেড়-ঘণ্টা বেশ পড়া যায়।

নন্দ ঘুমাইতেছিল। পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া রাম তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

নন্দ তাহাকে হাসি-ঠাট্টা করিত ; কিন্তু তাহার পরিহাস কোনদিন রামকে সত্যকার ব্যথা দেয় নাই।

একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে মনে মনে বলিল, হয়ত আর জন্মে আমার ভাই ছিল, ও। নন্দ নইলে কি কল্‌কাতায় থেকে লেখাপড়া করা সম্ভব হ'তো! তবুও……সে যেন একান্ত দুঃখের সহিত বলিল, তবুও নিজের মন ছোট্ট ব'লেই—অকারণে, সময়ে-সময়ে, কত রাগ করি!

হঠাৎ রামের মুখে হাসির ক্ষীণ রেখার দাগ পড়িল। সে আবার মনে মনে কহিল, যে বন্ধু-বাৎসল্য আমাকে এতখানি সুবিধা দিয়েছে—সেই জিনিষ অন্যের দিকে ধাবিত হ'লে আমার রাগ হয়! ভারি আশ্চর্য্য মানুষের চরিত্র! ঠিক ক'রে বিচার ক'রে বুঝলে দেখ্‌তে পাই—উঃ আমি-কি স্বার্থপর!

রাম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, মানুষ কেন স্বার্থপর হয় ? অভাবে ? কেন, অবস্থাপন্ন লোককেও ত স্বার্থপর হ'তে দেখা যায়! আবার অতি দরিদ্রকেও ত অসামান্য ত্যাগ করতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়! না, না, অবস্থা নয় : আরো কিছু। মানুষের অবস্থাই যদি মানুষকে চলার পথে সব সময়ে নিয়ন্ত্রিত করে,—আর তাতে যদি কোন দোষ না হয় ত—চোর-ডাকাতের অপরাধ কি ? না, অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে মানুষকে উঠ্‌তে হবে :– তবেই সে মানুষ। কিন্তু স্বার্থ

নইলেই বা মানুষ চলে কেমন ক'রে। ঠিক এবার বুঝতে পেরেছি, সক্রেটিসের গোল্ডেন মিনের অর্থ। এই দুইএর সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে! বটে! তাহলে এখন এই দাঁড়াচ্ছে যে—আমি স্বার্থের দিকে বেশী টানি, আর নন্দ সেদিকে বেশী ঢিল দেয়—তাই দুজনের মধ্যে একটা গরমিল দেখা দেয়!

আবার রাম হাসিল, কিন্তু নন্দ না ঢিল দিলে আমি যেতাম কোথায়? বোধ হয় দুদিকের সমান টানে সংসার অচল হ'য়ে দাঁড়াত। সক্রেটিসের ওটি আদর্শ;—হয় ত কোন দিন বাস্তবে পরিণত হবে না। কিন্তু তবুও ওটিকে মনে রেখে কাজ করতে হবে।

এমনি করিয়া রামের মন পাঠ্য-বিষয় ত্যাগ করিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ এক সময়ে সে শুভদার বিবাহ এবং বয়স লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। নন্দ আর মার এক মত: কিন্তু বাবা ত নির্ব্বোধ নন। তিনি জানেন, আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে আমি মানুষ হ'য়ে উঠে তাঁকে সাহায্য করলে শুভির বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে না। কিন্তু তখন আবার হরিকে কলকাতায় পড়াতে হবে। আর সে কিছু আমার মত নন্দর বাসায় থেকে পড়তে পারবে না। নন্দ, যতদিন আমি এখানে আছি—আছে। তার ভাবনা কি? তাকে তো তার বাবা জমিদার'র কাজ শেখার জন্য ডাকছেন।

অকস্মাৎ একটা কথা রামের মনে আসাতে সে নিজে নিজেই কতকটা লজ্জা অনুভব করিল; কিন্তু বিষয়টি মনে মনে আলোচনা করিতেও তাহার মন্দ লাগিল না।

সে ভাবিল, যদি শুভির সঙ্গে নন্দর বিয়ে হয়। একি সম্ভব? ব্রজকিশোর বাবুর মত হবে কেন? নন্দর? নন্দর মত হলেও হতে পারে। সে আমার জন্যে……তা বোধ হয় পারে। কিন্তু……দূর পাগল! বাবার মত ত হ'তেই পারে না। মার মত ক'রে নেওয়া? সে আমি পারি; কিন্তু বাবাকে কে পারবে? তাঁর ঐ কুল, কুল, কুল। রাম এবার যেন মনে মনে রাগ করিল। বংশের পরিচয়ই মানুষের সব? আগে তোমার নিজের কি পরিচয় দেবার আছে, তাই বল! বংশে কে মুনি-ঋষি কবে জন্মে ছিলেন, তার সেই ঠিক—সেই ধারা ধরে চলে যেতে হবে! বর্ত্তমানের এত বড় সমাজের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ব্যাপারটা কিছুই নয়! দুহাতে ক'রে সব ঢেলে দিতে হবে ঐ বংশ-মর্য্যাদার পায়ে!

রামের দুই কাণ গরম হইয়া উঠিল। সে উত্তেজনায় বই বন্ধ করিয়া বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। শান্ত দক্ষিণ দিকের বাতাস তাহার গরম চোখ-মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল। চাঁদ কখন ডুবিয়া গিয়াছে। সহর ক্রমেই নিঃশব্দ গম্ভীর। পাশের বাড়ীর ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল।

রাম নিঃশব্দে কুঁজো হইতে জল খাইয়া প্রদীপ নিবাইতে গিয়া দেখিল, নন্দ তাহার বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। সে অনুতপ্ত হইয়া বলিল, শব্দ ক'রে আমি তোর ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম, না?

নন্দ বলিল, তুই কোথায় গিছ্‌লি ? পড়্‌ছিলি নে ত ?

রাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার বিএ, পাশ-টাশ কিছুই হবে না। আমাকে একটা চাকরি জোগাড় ক'রে নিতেই হবে।……শুক্তির বিয়ে দিতে হবে, ……আসচে বছর হরিকে কল্‌কাতায় পড়াতে হবে।

নন্দ বলিল, নে নে, এখন ঘুমো।

(৩)

কলিকাতার অশেষ সুখ। পকেটে পয়সা থাকিলে কে কাহাকে দেখে ? গরমে প্রাণ যায়, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে ; ফেলো কড়ি, মাখো তেল ; গুলাবি সরবৎ ; তাহাতে বরফের চাঙ্গড় ভাসিতেছে ! এক গ্লাস, দুই গ্লাস, আরো চাহিয়ে বাবু ? না বাবা, বহুৎ হুয়া মেজাজ একদম ঠাণ্ডা ! কিন্তু দেখিও বাপু, পকেট সামলাইয়া ; ঐযে লোকটি তোমাকে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে—উহার হাতে আছে অদৃশ্য কাঁচি। উনি গাঁটকাটা ;—যাকে বলে, পিক্ পকেট ;

এই অশেষ সুখের দেশে দুঃখ যখন আসেন তাঁর মূর্ত্তিও করাল ! সে বৎসর বসন্তের সমাগমে দক্ষিণা বাতাস উতলা হইয়াছিল সত্য। বাবুদের বাড়ীতে পিঞ্জরের কোকিল কুহু কুহু করিতে সবে আরম্ভ করিয়াছে—এমন সময় কলিকাতাবাসীর মন উতলা হইয়া উঠিল। "কোথা গা হন্ত চির-বসন্ত, আমি বসন্তে মরি।" প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নাকি এইরূপ হয় ; বিশেষজ্ঞ যাঁহারা তাঁহারা মত দিয়া খালাস ; ঘরে ঘরে টিকাদার ফিরিতে লাগিল। এবং শীতলা তলায় হাতে ছোট-ছোট নৈবেদ্যের থালা বহন করিয়া লোকের ভিড় ঠেল মারিল।

কলেজের ছাত্রগণের মন সর্ব্বদাই বাড়ির দিকে ছুটিয়াছে—তাই তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে লম্বা-লম্বা দরখাস্ত পেশ করিতে লাগিল। স্কুলের ছেলেরা প্রতীক্ষায় রহিল মহাজনগণ যে পথে যাইবেন, সেই তাহাদেরও পথ।

কলেজগুলো যেন এক-একটা প্লেন পক্ষী ! যখন উড়িতে থাকে তখন কোথায় কোন শূন্যে যে ডানা বিস্তার করিয়া আছে, জানিবার উপায় নাই। আবার যখন ডানা বন্ধ করিয়া বসিবে—তখন আর উড়িবার কথা তাহাদের-মনেই থাকে না !

শেষ পর্য্যন্ত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ আর ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব হাতে না রাখিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন। পূজার ছুটি কাটা গেল বলিয়া ছাত্রেরা হৈ হৈ করিতে করিতে হাস্য-মুখে বাড়িমুখে ছুটিল।

তাই সেবার ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পূর্ব্বেই কলেজ খুলিয়া গেল। ভগ্নীদের মনের অবস্থা কি হইয়াছিল বলা শক্ত ; কিন্তু অনেক ভাই নিজেদের কর্ম্ম-ধারার মধ্যে ঐ দিনটিতে ছুটি পাইয়া হৃষ্টচিত্তে দিবা-নিদ্রার সুযোগ লাভ করিয়াছিল—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কুসুমপুর-লজের ভাগ্যে সেবার অন্য ফল ফলিয়াছিল।

বলিতে ভুলিয়াছি যে ব্রজকিশোরের দুইটি কন্যা ছিল। প্রথমা সধবা, বিনোদিনী এবং দ্বিতীয়টি বাল্যেই বিধবা—নাম কমলিনী। কমলিনীর কথা পরে বলিলে চলিবে: আপাততঃ বিনোদিনীর প্রসঙ্গে পাঠকের কিছু জানা আবশ্যক হইয়াছে।

বিনোদিনীর বিবাহ হইয়াছিল কলিকাতার দক্ষিণে ভবানীপুরে। শ্বশুরের অবস্থা ভাল; স্বামী ভবেশচন্দ্র এটর্ণি।

বিবাহের সময় বিনোদিনীকে লইয়া কোন গোল ছিল না। কিন্তু পরে ভবেশচন্দ্রের দ্বিতীয় ভ্রাতা রাগ করিয়া বিলাত গিয়া ডাক্তারি পাশ করিয়া আসিয়া ভাইদের সঙ্গে একত্রেই আছেন। ছোট ভাইটি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। ভায়ে ভায়ে বড় মিল এবং লোকে বলে যে বিনোদিনীর মত বড় বৌ মেলা ভাগ্যের কথা। কর্ত্তা এখনো জীবিত আছেন। তিনি আর সংসারের গোলমালের মধ্যে থাকিতে চাহেন না। তাই সস্ত্রীক কাশীবাস করিতেছেন। কর্ত্তার মোটা পেনশন এবং কাশীর বাড়িখানি নিজেদের।

দেবরের বিদেশ গমন লইয়া কলিকাতার মত সহরে কোন গোলমাল না থাকিলেও—কুসুমপুরে যে গোল বাধিবে, ইহা অনুমান করিয়া ব্রজকিশোর বিনোদিনীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। তথাপি নিজ গ্রামে এই সকল ব্যাপার লইয়া যে কোন কথা হইত না এমন নহে: কিন্তু লোকের মুখ সরা-চাপা দিয়া কাঁহাতক কে বন্ধ করিবে?

বিনোদিনীর তাই বহুদিন ভাইটীর কপালে ফোঁটা দিবার সুযোগ হয় নাই। এবার সে সংবাদ পাইল যে নন্দ কলেজ খোলার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছে। ভাইটিকে অনেক আদর অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আসিতে লিখিল।

বিনোদিনী জানিত যে নন্দর বাসাতেই রাম থাকে, তাই তাহাকেও সঙ্গে আনিতে অনুরোধ করিল। অধিকন্তু আরো দুই কথা লিখিয়া দিল যে—রাম ইংরাজি লেখা-পড়া করিয়া পাড়াগাঁয়ের সংকীর্ণতা দূর করিতে পারিয়াছে, এই তাহার বিশ্বাস। অপিচ কলিকাতার এই সকল ছোট-খাট সংবাদ কেই বা সেদেশে লইয়া যাইবে?

সকালে চা পান করিতে করিতে নন্দ প্রশ্ন করিল, রাম, তুই কি জাত যাবার ভয়ে দিদির নেমন্তন্ন রাখতে যাবিনি?

রাম পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, জাত আমি মানিনে ব'লে মিথ্যা বলা হবে; কিন্তু দিদির এই স্নেহের আহ্বান, তাঁর হাতের ধান-দূর্ব্বার আশীর্ব্বাদ, কপালে চন্দনের তিলক, এ সব সৌভাগ্য থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করতে যাবো?

নন্দ হাসিয়া বলিল, ওরে ইস্টুপিট্ তুই বুঝি তাই মনে করেছিস? দিদি তেমনি পাত্র কি না! তোর জাত না মেরে, তোকে না খাইয়ে, সে অমনি অমনি ছেড়ে দেবে?

পুস্তকের উপর চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া রাম মিটি-মিটি হাসিয়া বলিল, তা' যদি খেতেই হয় তো খাবো।

নন্দ বলিল, বুঝেছি তোর বিদ্যে—আবার বাড়ি গিয়ে প্রাচিত্তির ক'রবি ত ?

রাম এবার চোখ তুলিয়া পরিষ্কার নন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, যদি তার দরকার হয়, বাবা তাই করতে বলেন ত,—করবো।

নন্দ পরিহাস করিয়া বলিল, গোপাল বড় ভাল ছেলে, যাহা পায়—তাই খায়। বেশ বেশ ভাই !—এইতো বুদ্ধিমানের কাজ :—লাইন অফ লিস্ট রেজিস্টেন্স !

রাম বলিল, দিদির হাতে খেলে জাত যাবে—এ আমি মানিনে নন্দ কিন্তু ভাই, আমি ত স্বাধীন নই ·

শেষের কয়টি কথার ভিতর এমন একটা সুর ছিল যাহা লইয়া আর ঠাট্টা-তামাসা চলে না। তাই নন্দ চুপ করিয়া গেল।

দুই বন্ধুতে গিয়া বিনোদিনীর স্নেহ চন্দনে ললাট চর্চ্চিত করিয়া পাশা-পাশি বসিয়া খাইতে লাগিল। বিনোদিনী কাছে বসিয়া প্রখর নজরে প্রচুর তাগিদ দিয়া বলিল, বাসায় আধপেটা খেয়ে খেয়ে দুজনের পেটটি ম'রে গেছে : আচ্ছা, তোমরা দুজনে এসে মাঝে মাঝে মুখ ব'দলে যাওনা কেন ?

নন্দ বলিল, সত্যি বল্‌ছি দিদি, এবার থেকে প্রায়ই আস্‌বো। একলা আস্‌তে ভাল লাগে না। এখন দেখ্‌চি রামের বেশ সাহস—সত্যি বল্‌চি তোমায়, দুজনে ফি শনিবারে আস্‌বো।

বিনোদিনী স্বর গাঢ় করিয়া বলিল, হায়রে তেমন কপাল কি আমার ! মা-ই কেবল নেই ; কিন্তু আমার পোড়া কপালে বাপের বাড়ীর পোষা কুকুরটি পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না।

বিনোদিনী আস্তে আস্তে কত অতীতের কথা বলিল, বর্ত্তমানের পিতৃ-গৃহ দেখিবার তীব্র বাসনা জানাইল ; কিন্তু পোড়া পাড়াগাঁয়ের ভূতের জ্বালায় সব বন্ধ !

অবশেষে সে বলিল : হাঁ রাম, শুভির কোথায় বে হলো ?

রাম ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, কৈ আর হয়েছে।

বিনোদিনী বুঝিল যে এই প্রসঙ্গে রামের লজ্জা হয়। তাই বলিল, বেশ, বেশ, বড় হয়ে হ'লেই সব চেয়ে ভাল। কত বড়টি হয়েছে ?

রাম বলিল, বারো।

বেশ বড় সড়টি হ'য়ে উঠ্‌ছে—না ?

তা হচ্ছে বৈকি।

তা হোক হোক ; যেমন লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত আমাদের জেঠিমা, তেমনি রূপসী হয়েছে মেয়েরা………। আমাদের সনাতন জেঠার কুল-কুল এক বাই, নইলে আমাদের নন্দর সঙ্গে সুন্দর মানাত কিন্তু—যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ !

লজ্জা ঢাকিবার জন্য নন্দ এবার কথা কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার কি বুদ্ধি, আমার কি চারহাত যে তুমি আমাকে নারায়ণের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছ ?

বিনোদিনী মনে করিল যে,নন্দ তাহার পুরাণের বিদ্যার ভুল ধরিয়াছে—তাই তাড়াতাড়ি বলিল, তবে কি বোলবো ?—বলে দেনা রে :—বেশ মনে হচ্ছে—সুভদ্রা-অর্জ্জুন।

নন্দ চুপ করাতে বিনোদিনীর উৎসাহ বাড়িয়া গেল, সে বলিল, বেশতো রে—তুই অর্জ্জুনের মত আন্‌না তাদের কুল ভেঙে। তোরা ত সাবর্ণ চৌধুরী, বাংলা দেশের যত কুলীনের কুল ভাঙ্গার কালা-পাহাড় !

ভবেশচন্দ্র সেখান দিয়া যাইতে যাইতে বিনোদিনীর কথার কতকাংশ শুনিয়া বলিলেন, তাইতো, কে কার কুল ভাঙ্গবে ?

বিনোদিনী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত খাটো গলায় বলিল, বলচি নন্দকে, রামের বোন শুভিকে বে' করতে। ওরা কুলীন কিনা।

ওঃ ঘটকালি চল্‌চে ? তোমাদের অন্য চিন্তা নেই ; তাতে কিন্তু আমার অ-লাভ।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

ভবেশচন্দ্র কথার উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বেলা পড়িতে দুই বন্ধু বাসায় ফিরিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া ট্রামে চড়িল।

নন্দ বলিল, কিরে রাম কেমন লাগ্‌ল দিদিকে ?

রাম সংক্ষেপে উত্তর দিল, সুন্দর, চমৎকার লোক, দিদি, এত হাসি-খুসি, আদর-যত্ন ! বাস্তবিক বাড়িটায় আনন্দ যেন ঢেউ খেলচে !

নন্দ বলিল, মধ্যে মধ্যে এলে বেশ হয়, না ? বাসায় আমাদের সেই একঘেয়ে একটানা জীবন, বেশ মুখ ব'দলে যাওয়া যায় !

হুহু শব্দে ট্রাম চৌরঙ্গীর রাস্তা বাহিয়া চলিয়াছে ;—একদিকে বাড়ি-ঘর দোকান-পাটের অপূর্ব্ব সাজ-গোজ ! আবার তাহারি সম্মুখে বিস্তৃত মাঠ পড়িয়া, সবুজের পর সবুজ ! দুই জনের মনকে সুখের রঙ্গীন ফিকে নেশায় যেন পূর্ণ করিয়া তুলিল। ট্রামের ঘর্ঘরের মধ্যে তখনো যেন রামের কর্ণে বিনোদিনীর স্নেহের কথাগুলি বাজিয়া উঠিতেছে !

নন্দ বলিল, চল রাম, আজ বায়স্কোপে যাই।

আমার আপত্তি নেই—রাম বলিল, আজকের দিনটাত গেলই, মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কব্জির ঘড়ি দেখিয়া নন্দ বলিল, এখনো পূরো এক ঘণ্টা রয়েছে সুরু হ'তে;—তবে চল একটু ইডেন গার্ডেনটাও এই অবসরে চক্কর দিয়ে নেওয়া যাক্। রাম কহিল, তথাস্তু।

রাত্রে ফিরিয়া রাম যখন প্রদীপ লইয়া বই খুলিয়া বসিল তখন নন্দ ঘোর আপত্তি করিয়া বলিল, ওঃ তোর একটুও রস-বোধ নেই রাম। আজ মনটাকে ছেড়ে দে তোফা একটা ঘুম দিয়ে নিতে!

রাম বলিল, তুই ঘুমোনা কেন, আমি কি মানা করচি?

নন্দ শুইয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, তুই বুঝিস্ নে, পাশে একজন কর্ত্তব্য করতে থাকলে—মনে সুখ আসে না।

রাম বলিল, আমার কিন্তু কিছু না পড়লেও মন শান্ত হবে না; ঘুম আস্‌বে না।

নন্দ ঘুমাইয়া পড়িল। রাম একটা মোটা বই দিয়া প্রদীপের আলোটা তাহার চোখ হইতে আড়াল করিয়া দিয়া মনস্তত্বের কূট মীমাংসার মধ্যে ডুব দিল।

নন্দ কিছুক্ষণ ঘুমানর পর স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিল। অনুমান হয় সে সুভদ্রা-হরণের স্বপ্নই দেখিয়াছিল। কিন্তু কখন যে সে নিজে অর্জ্জুন হইয়া সুভদ্রার হাতে ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিল—তাহা সে নিজেই বুঝতে পারে নাই।

হঠাৎ সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কুঁজো হইতে এক গ্লাস জল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, বুঝেছিস রাম, একটা ভারি মজ সপোন দেখেছি।

রাম অন্যমনে বলিল, হুঁ।

কিন্তু তোকে বলব না, বলিয়া নন্দ বারাণ্ডায় বাহির হইয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নদীর কুহক

"চন্দর! এ চরটার নাম কিরে ?"

খাল ছেড়ে বাইরের নদীতে পড়তে পড়তেই চন্দ্র মাঝির বকুনি কমে গেছল; আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলুম। পদ্মার উপরে এমন জ্যোৎস্না রাতটা আমি তার সঙ্গে বকে-বকে কাটাতে মোটেই রাজী ছিলুম না। কিন্তু, গলুইয়ে বসে-বসে চোখ যেন ক্লান্ত হয়ে এল, মনটাও যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করল। আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার মুখ খুললুম।

চন্দ্র মাঝি বৈঠায় হাল ধরে জলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। নিস্তব্ধ নদীর উপর আমার কথাগুলি শুনে হঠাৎ সে চমকে উঠ্‌ল; মুখ তুলে বলল,

"কোন্ চরটা, বাবু ?"

"বাঁ দিকে পাড় ঘেঁসে যে চরটা।"

"চর কুহকী।"

"বেশ নাম ত! কুহকী! এমন নাম ওর দিল কে রে ?"

"আমরা মাঝিরাই।"

"কেন ?"

সে অনেক কথা—নাই বা শুন্‌লেন।"

"কেন ? বলই না—শোনা যাক্।"

চন্দ্র মাঝি জবাব না দিয়ে পালের দড়িটাকে টেনে আর একটুকু ডান দিকে পালখানাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "ঠিক মত হাওয়া পাচ্ছিল না, পালটা।"

নৌকার গতি একটু বেড়ে গেল—আমি বুঝলুম চন্দ্র বল্‌তে চাইছে না।—মাথা নুয়ে আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলুম, কান পেতে জলের কল-কথা শুনতে লাগলুম।

জ্যোৎস্না রাতে একা পদ্মার বুকে ভেসে চল্‌লে এমন লোক নেই যার মন নদীর জলের মতই এক চিন্তা থেকে আর চিন্তায় ভেসে না যায়। আমার মন কোনো ভাবনাকে নিয়ে একটু খেলা করেই আর একটা ভাবনাকে তুলে নিচ্ছিল—কোনোটাকে একটু ছুঁয়ে গেল, কোনোটাকে একটু নাড়া-চাড়া করে দেখল; কোনোটাকে আবার একেবারে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়েই পালাল। নদীর বুকে মানুষের চোখ খুলে যায়,—মানুষের দেহের চোখ যেমন থেকে-থেকে নতুন ও কল্পনাতীত দৃশ্যে চমকে উঠে বলে ফেলে 'এত রূপ কোথায় ছিল ?" মানুষের মনের চোখও তেমনি সামাজিক মেলা-মেশার বস্ত্র-বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন স্বপ্নে নতুন রঙ্গে পুলকিত হয়ে, আপনার মনে স্বীকার করে, 'তাইত, এত কথাও ভুলে ছিলুম !'

নদীর মায়া মনের উপর কত কথারই না জাল বুনে—জীবনের কথা মরণের কথা;—আধ-

ভোলা কথাকে আধ-স্মরণের রঙে রাঙিয়ে, স্মরণের পুঁজি-পাটাকে ভাসিয়ে দিয়ে,—ভুলে-যাওয়া কথাকে তুলে নিয়ে কি কাণ্ডই না করে! তারপরে এ আবার পদ্মা নদী,—যার বাঁকে বাঁকে মায়ার জাল পাতা রয়েছে, যার প্রত্যেকটি ছোট ঢেউ-এর মধ্যেও একটা বার্তা আছে।

নৌকার দুধারে যে জল ভেঙে ভেঙে কল-কল করছিল, আমি কান পেতে তাদের কাহিনী শুনতে চেষ্টা করছিলুম,—তাদের লীলা-চঞ্চল মুখরতা বুঝতে চাইছিলুম।

পদ্মার জলের একটা বাণী আছে,—সে একেবারে তার নিজস্ব। আমি গঙ্গার বুকে নৌকায় চড়ে গঙ্গার বাণী শুনতে চেষ্টা করেছি —সে এরূপ নয়। আমি পুরীতে সমুদ্রের বুকে নৌকায় বসে কান পেতে প্রাণভরে সমুদ্রের বাণী শুনছি, সেও এমনিতর নয়। গঙ্গা যেন কৃষ্ণপক্ষের শেষ যামের ক্ষীণ পাণ্ডুর শশি-লেখার মত- তার কথা, 'পারি নাগো পারি না ;—কলিযুগে মানুষের বস্তুপুঞ্জের চাপ আর আমি সইতে পারি না!' সমুদ্রের বাণী, সে যেন সবলের জয়-ধ্বনি,—প্রশস্ত, সংক্ষুব্ধ, কি মহান্, কি উদার। আর এই পদ্মা? তীব্র তির্য্যক গতি তার, বুকে মায়ার ফাঁদ,—শত স্বপ্নের অবগুণ্ঠনে দেহ আবৃত ; চির-কৌতুকময়ী, কিন্তু চির-কুহকিনী।

চাঁদের আলো জলের বুকে খান্-খান হয়ে যাচ্ছিল, আমি যেন পদ্মার স্বরূপ দেখছিলুম,—কত-কত প্রাসাদ, কত-কত মন্দির, কত-কত সংসার পদ্মার বুকে অতল তলে এমনি চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে আছে।

"বাবু!" মাঝি ডাকল। এবার আমি চমকে উঠ্লুম।

"শুন্বেন" ?

"কি ?"

"কেন ওর নাম কুহকী।"

ফিরে দেখলুম বাঁদিকের চরটা পিছনে প্রায় মিশে যাচ্ছে।

"বল্"—আমি গলুইয়ের উপর ঠিক হয়ে বসলুম,—দু গলুইয়ে দুজনা মুখোমুখি।

"তখন বলিনি—বল্লে হয়ত ভয় পেতেন।—

"আজ চরটা প্রায় পাড় ঘেঁসে আছে;—কিন্তু পনের বছর আগে তখন ও সবে জেগে উঠেছে—পাড়ের কাছে তখনও নদীর দারুণ ধার।

"কোজাগরের পরদিন এমনি জ্যোৎস্না। পনের বছর আগে আমি গেছলুম দেবগাঁ-এর দত্ত-মশায়কে ষ্টীমার ধরিয়ে দিতে। সন্ধ্যায় আসবার কথা, সেদিন ষ্টীমার এল রাত প্রায় এক পহরে। ষ্টেশন ঘাটে নৌকা বেঁধে আর সব মাঝিরা রান্নার জোগাড় দেখল। আমার পরদিন সকালে একটা 'কেরেয়া' ছিল। তাই আমি চিঁড়ে গুড় নিয়ে বৈঠা বেয়ে ফিরতে লাগলুম। এবার নদীতে উজান বাইতে হল ;—পদ্মার জল জোয়ারেও বড় একটা ফেরাতে পারে না, চিরকাল একগুঁয়ে।

"ওই চরটায় এখন যেখানে কাশবন—ঠিক ওই কালো-কালো আঁশগুলি সেখানে পৌঁছাতে

পৌঁছাতেই বড় পরিশ্রম বোধ হল   চরটা তখনও ভালো কোরে জাগেনি. সেখানে স্রোত একটু কম. ভাবলুম ওখানে নৌকাটা থামিয়ে চিঁড়ে-গুড় খেয়ে আবার চলব।

"লগিটা বেশ জোর করে পুঁৎলুম,—বেলে মাটি, তবু কেন যেন বসন্ত চাইল না। কোনো রকমে তবু পুঁৎলুম   তারপর এই লোহার শিকলটা তার গায়ে বেশ জড়িয়ে বাঁধলুম। শিকলটা বেশ লম্বা—অনেকটা জলের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল, যেন জলের নীচে একটা শব্দ হল 'ঠন্'। আমি কান না দিয়ে মাটির সরাখানায় চিঁড়ে ধুতে মন দিলুম।

"চিঁড়ে শেষ করে এক ছিলিম তামাক সেজে একবার গলুইতে বেশ আরাম করে বসে, টানতে সুরু করলুম।

"জ্যোৎস্না রাত, দিব্যি ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না। আশ্বিনের শেষ কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথম দিকটা মোটের উপর কোথাও মেঘের লেশ নেই ; তবে শেষ রাত্রিটায় নদীর উপরে কুয়াসা দেখা দিয়েছে। কিন্তু, বাতাস তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। হিমও নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ কোথাও একটি নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটুকু পর্য্যন্ত নেই   কেবল নৌকার দুধারে পদ্মার জল একটু একটু যেন কল-কল করছিল, তাও নিতান্ত অস্পষ্ট, অথবা হয়ত তা একেবারেই আমার মনের ভুল। ওপাড়ের কাশের বনে ফুল ফুটেছিল। কিন্তু সেখানে নদীর 'তোড়' বেশী, হাওয়া নেই, তবু কাশের বন যেন পাগল, মাতাল হয়ে দুলে-দুলে উঠছিল। কানপেতেও সেখানে ঝিঁঝিঁর ডাক বা নদীর পাড়ের আর কোন পোকার সাড়া পেলুম না। নদী ত নিঃশব্দই থাকে কিন্তু এমন নিঃশব্দ যেন আমিও কোনোদিন তাকে দেখিনি।

"আমার যেন কেমন-কেমন ঠেক্‌ছিল।—গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি একটা ভাটিয়ালীতে টান্ দিলুম -

'ও দরদী,
তুমি কেমন করে গেলে তরে, এ কাল জীবন-নদী !'—

"আমার ভাঙা গলাটা যেন চিরে গেল ; আমার কাণে যে স্বর পৌঁছল সে স্বর যেন আমার নয়।

"হুঁকো রেখে দিয়েছিলুম. তুলে নিলুম, দেখলুম ছিলিমটা নিবে গেছে। আর একটি ছিলিম সাজতে নৌকার ছইএর মধ্যে গেছি, মনে হল নৌকা যেন ঘুরছে , যেন সামনের গলুই ধরে কে আমার পোঁতা লগিটার চারপাশে তাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। "কে ?"বলে ডাক দিয়ে আমি ছইএর বাইরে এলুম.—দেখি কেউ কোথাও নেই, নৌকা ঠিক আছে। কেবল নদীর জলে যেন এবার শব্দ জাগছে.—সে শব্দ কান্নার না চাপা হাসির আমি ঠিক করতে পারছিলুম না।

"আমার ডাক আমাকে ঘিরে ঘিরে আমার কানের কাছে গম-গম করতে লাগল্।

"ও পাড়ে কাশের বন মাথা ঝেঁকে-ঝেঁকে জলের কানের কাছে যেন কি কথা কইছিল, কি ক্রুর, কি প্রহেলিকাময় এই কানা-কানি ·

"সমস্তটা দিন নৌকা বেয়ে আমি শ্রান্ত হয়েছিলুম। বুঝলুম, এ সব তারি কাজ। আমি নৌকা ছাড়ব, মনস্থ করলুম।

"লগিটা তুলতে চেষ্টা করলুম, উঠ্‌ল না, খুব বেশী করে পুঁতেছিলুম বোধ হয়। আবার টানলুম—তবু উঠ্‌ল না। মনে হল, কে যেন তার জলের নীচের গুঁড়িটাকে আঁকড়ে রয়েছে। প্রাণপণে আমি টানছি,—নড়েও না।

—"আমার ভয় হ'ল; এই নিঃসাড় নদীবক্ষ—এই নিষুতি রাত, ও-পারের কাশবনের ও নদীর জলের সেই রহস্য-ঘেরা কানা-কানি!

"তাড়াতাড়ি আমি শিকলটাকে লগির গা থেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলুম। দেখি শিকল নীচে পড়ে গেছে জলের তলে ডুবে গেছে। টানতে লাগলুম,—মনে হল সেই সাধারণ শিকলটাই যেন কত ভারি। একটি-দুটি করে শিকলের এক একটি কড়া উঠে আসছিল; কিন্তু হঠাৎ বাধল, আর উঠ্‌ল না। কত টানাটানি,—এদিক থেকে, ওদিক থেকে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে;—কিন্তু, কিছুতেই শিকল উঠ্‌ল না।

"একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালুম, ভাবলুম, কি করি। মনে পড়ল, আজ সন্ধ্যার গাঁজার ছিলিমটা বাদ গেছে; তাই, মাথাটা ঠিক নেই, শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। ছই-এর ভিতর ঢুকতেই আবার তেমনি নৌকা ঘুরতে লাগল। আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কল্‌কিটি সাজলুম, বেশ একটু বেশী রকম 'দ্রব্য' দিয়ে কষে টানলুম। প্রাণভরে এক চোট ধোঁয়া টেনে নাক-মুখ দিয়ে ষ্টীমারের চোঙার মত ধোঁয়া ছেড়ে ছই থেকে বেরুলুম,—বল্লুম, 'এসো, এবার কোন্ শালা আসবে।'

"আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম।—এবার নদীর শব্দ আরোও উঁচু হয়ে উঠেছে। বাতাস জেগে উঠেছে—সোঁ সোঁ,—সে এক কি দুনিয়া-ছাড়া শব্দ।—আকাশের উজ্জল চাঁদ এক শাদা পর্দ্দায় মুখ ঢেকেছে, নদীর সমস্ত বুক কুয়াসায় একেবারে মোড়া। কাশবন চোখ থেকে একদম মুছে গেছে। আমার চোখের সামনে সমস্তই ধোঁয়াটে, সমস্তই অস্পষ্ট, পাণ্ডুরতায় ঢাকা। একবার নৌকার দিকে চেয়ে দেখলুম—যেন চড়ক-বাজীর চক্রের মত নৌকা ঘুরছে। আমি তাড়াতাড়ি লগিটাকে ধরতে গেলুম, নাগাল পেলুম না।

"আমার সন্দেহ হল, হয় ত আমি কোনো অপ-দেবতার হাতে পড়েছি।

"এবার আমার মাথা ঘুরে গেল, আমি শিকলটাকে নৌকা থেকে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করলুম। অসম্ভব। ছুটে গিয়ে বৈঠাটা টেনে বার করে শিকলটার উপর মারতে লাগলুম, যদি এক আধটা কড়া ভাঙে। বৈঠা থেঁৎলে গেল। আমি হতাশ হয়ে গলুইয়ে বসে পড়লুম।

"ছলাৎ-ছল, ছলাৎ-ছল।···সোঁ, সোঁ, সোঁ। চারিদিকে ঘন কুয়াসা। আমি নিশ্চেষ্ট বসে রইলুম।

"হঠাৎ যেন সেই কুয়াসার মধ্যে দেখলুম একখানা হাত নৌকার অপর দিকে গলুই ধরে,—শীর্ণ, শুক্‌নো, হাতখানাতে একটি বালা,—নৌকা শান্ত হয়ে চলে। আমার চোখ বিস্ময়ে প্রায় ঠিক্‌রে বেরুতে চাইল। আমি উঠে দাঁড়াতে গেলুম—পারলুম না; চীৎকার করতে গেলুম, গলা যেন বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে, নৈরাশ্যে, আমি চোখ বুজলুম।

"টপ্‌, টপ্‌, টপ্‌,—অন্ধকারে শুনছিলুম, কে যেন নৌকার অপর দিকে অতি সন্তর্পণে টোকা দিচ্ছে;—যেন কার আস্‌বার কথা ছিল, সে এসেছে,—জানাচ্ছে, 'আমি এসেছি, আমি এসেছি।'—শব্দ এগিয়ে আসছে, আরো কাছে, আমার ঠিক পায়ের কাছে।—আমি চোখবুজে শুনছিলুম,—কানের কাছে টপ্‌ টপ্‌; আর বাতাসের ডাক, 'এসো,' 'এসো'।

"আমি মনে মনে ভাবছিলুম, হয় ত এতক্ষণে আমি ডুবে গেছি, এই নিঃশ্বাস হয়ত আমার মুখের উপর আসছে জলের নীচে থেকে। ভয়ে আমি আর চোখ খুললুম না। ভাবছিলুম যেন কাশবনের মধ্যে আমার দেহটা আঁটকে আছে, যেন আমার মুঠির মধ্যে দুএক গোছা ছেঁড়া কাশ, যেন আমার মাথার উপরে কাশগাছগুলি নুয়ে পড়ে বারে-বারে ছুঁয়ে যাচ্ছে।—আবার ভাবছিলুম, আমি যেন দূর চরটার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছি। চাঁদ আমার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে তেমনি হাসতে হাসতেই ডুবে গেল। তারপরে সূর্য্য উঠিল—তেমনি রাঙা।—তারপর, শকুনি।

"একবার নিজেকে বল্লুম, কিছু নয়, কিছু নয়;—ভয় নেই, ভয় নেই। ঠিক করে ফেললুম যে ভয় পেলে চলবে না, সাহসটাকে আর একটু চাঙ্গা করে নিতে হবে। আর এক কল্‌কি। চোখ বুজে ছইএর মধ্যে ঢুকলুম, কোনদিকে না তাকিয়ে কল্‌কিটি সাজলুম, তার পর টানলুম প্রাণপণে।—শেষে আর বসে থাকতে পারলুম না, শুয়ে পড়লুম।—আমার মাথা রইল ছইএর বাইরে, পা ছই-এর মধ্যে।

"আধখোলা চোখের সামনে অস্পষ্ট আকাশ ধীরে ধীরে নিজের ঘোম্‌টা খুলে ফেলতে লাগল।—আমার চোখ উর্দ্ধে বদ্ধ।—ধীরে ধীরে কুয়াসার জাল ছিঁড়ে চাঁদ ফুটে বেরুল—নদীর জলের উপর থেকে ছই-এর ঢাকুনি ঘুচে গেল;—কানে আসতে লাগল নদীর অতি মৃদু গীতি। ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল।

"পড়ে রইলুম—কতক্ষণ, কত দণ্ড, কত প্রহর। শেষে চোখ মেলে দেখলুম যেন পূব দিকটায় একটু লালচে আভা দেখা দিয়েছে; কিন্তু কুয়াসার জন্য সূর্য্য উঠতে পারছে না। আমি দেখলুম, লগিটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। আমি উঠে গিয়ে আবার লগিটা টেনে তুলতে চেষ্টা করলুম। তখনো উঠল না। আমার মাথা আবার ঘুরে গেল, আমি থর-থর করে কাঁপতে লাগলুম।—চীৎকার করে পড়ে গেলুম, পড়তে পড়তে বল্লুম—'মাগো,' 'মাগো'।

"ডুবো চরের পাকে জেলেরা মাছ ধরছিল চীৎকার শুনে তারা এগিয়ে এসে আমায় নৌকার উপর থেকে তুলে ধরল। ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান ফিরে এল।

"তার পর সেই জেলেরা মিলে আমার লগিটাকে টেনে তুল্ল অনেক কষ্টে। আমার শিকলবাঁধা লগিতে প্রথম উঠল সের দশেকের একটা পাথর তার পর একটা কঙ্কাল,—তার অস্থিসার একখানা হাতে তখনো একগাছি বালা রয়েছে, তার গলার সঙ্গে পাথরটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

"কুহকিনী পদ্মার কুহকে এখানে আমি মরতে বসেছিলুম এই চরে।"

শ্রীগোপাল হালদার

বড়লোকের স্মৃতি

(ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

বিদ্যাসাগর, কালীকৃষ্ণ, রামতনু প্রভৃতি মহাপুরুষদের আমলের আর এক মহাপুরুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আগেকার প্রবন্ধগুলিতে লিখিত বিবরণে যেমন মহাত্মা রামতনু ও কালীকৃষ্ণের জীবনের গোটাকতক ঘটনা মাত্র লিখিয়াছি, মহাত্মা ভূদেবের জীবন-প্রসঙ্গে তাহাই করিব। জীবন-চরিত লিখিবার সময় যেমন পরে পরে সুসম্বদ্ধভাবে নানা কথা রচনার ঠাস বুনানিতে বসান চলে, এশ্রেণীর লেখায় তাহা অসম্ভব। নানা সময়ের নানা কথা যেমন মনে আছে তেমন লিখিলাম; যাঁহাদের কাছে ঐ ঘটনাগুলি মণিমুক্তার মত আদৃত, তাঁহারা ঐগুলি আপনাদের মনের মত সাজাইয়া হার গাঁথিতে পারেন।

মনীষী ভূদেব ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সমান ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও সারা পৃথিবীর ছোট-বড় বহুজাতির ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা অতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা সকল গ্রন্থগুলিই এই প্রভূত জ্ঞানের সাক্ষী হইলেও তাঁহার জ্ঞানের পরিচয়ে বিশেষভাবে "সামাজিক প্রবন্ধ"খানির উল্লেখ করিতেছি। যে কেহ মনোযোগ করিয়া এই সমাজতত্ত্বের বইখানি পড়িলে নিশ্চয় লক্ষ্য করিবেন যে, ভূদেব অতি গূঢ় বিচারে ফরাসী পণ্ডিত কোঁৎ (Comte), ইংরেজ পণ্ডিত হর্বর্ট স্পেন্সর্, গল্টন্, টাইলর্ প্রভৃতি অনেকের মতবাদ সমালোচনা করিয়া স্বাধীনভাবে নিজের মত সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র ছত্রে অথবা পাদটীকায় কোথাও কোন পণ্ডিতের নাম করিয়া বিদ্যা জাহির করেন নাই। আমি এসকল বিবরণ লিখিতে গিয়া পাকেচক্রে আমার নিজের পরিচয় দিতে বসি নাই, কিন্তু এসম্পর্কে আমার নিজের একটি কথা বলিলে বক্তব্য বিষয়টি ভাল ফুটাইতে পারিব। আমি নিজে সমাজ বিষয়ে অতি বেশি

মাত্রায় নবপন্থী, আর মনীষী ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধে সমর্থিত হইয়াছে প্রাচীন পন্থা ; অথচ এই সামাজিক প্রবন্ধখানি আমি যত অনুরাগে ও শ্রদ্ধাভরে পড়িয়াছি, আমার নিজের মতের অনুরূপ অন্য বাঙ্গলা বই তেমনভাবে পড়ি নাই। তীক্ষ্ণ চিন্তায় ধীরতা, পরবাদ-সহিষ্ণুতা, সসম্মানে বিরোধী পক্ষের মতের আলোচনা ও ভাষার সংযম একালের অন্য লেখকের রচনায় তেমন দেখি নাই। ভূদেব আপনার বক্তব্য অতি স্পষ্ট ও সুবোধ্য করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও কথা ফেনাইয়া তোলেন নাই অথবা নিজের সমর্থিত মতকে পেটেন্ট ঔষধ বেচার ভাষায় লেখেন নাই। একালের বহু বক্তৃতার যুগে আমাদের সাহিত্যের রচনার এই আদর্শ বড় আদৃত হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রবর্ত্তনের যুগে অল্পে সাহিত্যিক যশ অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় অনেক লেখক আপনাদের রচনায় বিদ্যা দেখাইবার চেষ্টার বাড়াবাড়ি করিতেন ; এই সকল লেখকের রচনার পৃষ্ঠায় ভূদেব কখন কখন একটু মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেন, কিন্তু সে মন্তব্য পরকে দেখাইবার জন্য লিখিতেন না। একবার স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের একটি রচনার গায়ে লেখা এইরূপ একটি মন্তব্য দৈবাং বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে পড়িয়াছিল। ঘটনাটি এই। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন ও অনেক সময়ে ভূদেবের সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। একদিন প্রাচীন সংস্কৃত ও ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত নিজের একটি রচনার কথা উল্লেখ করেন। ভূদেবের মনে ছিল না যে, তিনি সে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন আর তাহার গায়ে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন ; তাই তিনি আগ্রহে তাঁহার পুত্র মুকুন্দদেবকে দিয়া বঙ্গদর্শনের ফাইল আনাইলেন ; বঙ্কিমচন্দ্র নিজে পাতা উল্টাইয়া প্রবন্ধটি বাহির করিলেন আর পাশের মন্তব্যটি মনে মনে পড়িয়া ফাইলটি রাখিয়া দিলেন,—প্রবন্ধটি পড়িলেন না। ভূদেব বুঝিলেন কিছু গোল ঘটিয়াছে, তাই বিষয়টি চাপা দিয়া অন্য বিষয়ে কথা পাড়িলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া যাইবার পর মুকুন্দদেব সেই প্রবন্ধ খুলিয়া ভূদেবকে দেখাইলেন যে উহার পাশে লেখা ছিল,—Fools rush in where angels fear to tread. পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকায় এই মন্তব্য লইয়া কোন বিবাদ ঘটে নাই।

ভূদেব এযুগের অনেক সমাজ সংস্কারের পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন ; কিন্তু বঙ্গদর্শনে যখন "সাম্য" বিষয়ক প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হয়, ভূদেব তখন বঙ্কিমের সেই রচনার অনেক অংশের প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে প্রসঙ্গে তিনি রুসো প্রভৃতির সাম্যবাদের ত্রুটির কথাও ধীরতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন। ভূদেবের রক্ষণশীলতার প্রকৃতি বোঝা বড় সোজা ছিলনা, তাই নবপন্থীদের কেহ কেহ আপনাদের চপলতায় ভূদেবকে "গোঁড়া" বলিয়া উপহাস করিতেন। ভূদেবের রক্ষণশীলতার প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য গোটাকতক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একদিন ভূদেবের এক বন্ধু তাঁহাকে "চায়না" পেয়ালায় চা খাইতে দিয়াছিলেন ; ভূদেব

একটি পাথরের বাটি আনাইয়া চাটুকু ঢালিয়া নিয়া খাইলেন। পেয়ালা যদি শাস্ত্রমতে অপবিত্র হইত, তবে ঐ পেয়ালার চা তিনি কিছুতেই স্পর্শ করিতেন না; কাজেই কৌতূহলী হইয়া ভূদেবের বন্ধু উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূদেব পেয়ালা ও পিরিচটি হাতে করিয়া উহার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতা ও কারিগিরির প্রশংসা করিলেন, আর বলিলেন—যদি আমাদের দেশের কুমারেরা ইহা গড়িতে পারিত, তবে আমি আদর করিয়া ব্যবহার করিতাম। এটা যে যুগের কথা তখন বিদেশী পদার্থ বর্জ্জনের স্বপ্নও কাহারও মনে জাগে নাই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই। চুঁচুড়ায় ইউরোপীয় কোম্পানিদের প্রথম আমলে গঙ্গার পাড়ে পোস্তা বাঁধিয়া যে বড় বড় এমারৎ গড়া হইয়াছিল, ভূদেব তাহার একটি কিনিয়া বাসগৃহ করিয়াছিলেন। এই বড় আয়তনের বাড়ীর ছাতের একটী প্রকাণ্ড বড় কাঠের কড়ি বদলাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু অত বড় কাঠ যখন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না তখন অনেকে বিলাতি লোহার কড়ি লাগাইবার পরামর্শ দিয়া ভূদেবকে রাজি করিতে পারেন নাই। সারা কলিকাতা ঘুরিয়া উপযুক্ত কড়ি কাঠ না পাইয়া ভূদেবের পুত্র মুকুন্দদেব বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে বর্ম্মা হইতে একখানি কড়ির আমদানি করাইয়াছিলেন। কড়ি কাঠখানি চুঁচুড়ায় পাঠাইবার সময় মুকুন্দদেব যে আনন্দে তাঁহার সফলতার কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

এ প্রসঙ্গের তৃতীয় ঘটনাটি বড় প্রাণস্পর্শী। মৃত্যু যখন প্রায় আসন্ন, সেই সময়ে ভূদেব আপনার কোমল শয্যার কর্কশতায় যাতনা পাইতেছিলেন। ভূদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দদেব বলিলেন—"বাবা, এসময়ে একখানা মোলায়েম বিলাতি চাদর কিনিয়া আনিয়া বিছানায় পাতিয়া দিলে ভাল হয় না কি?" ভূদেব বলিলেন—"আর বড় অধিক বিলম্ব নাই; এই শেষ মুহূর্ত্তে বিদেশী কাপড় ব্যবহার করিয়া মনের অশান্তি বাড়াইব না।" গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব মুখ ঢাকিয়া কাঁদিলেন। যিনি সরস্বতীর আরাধনার জন্য হাজার হাজার ইউরোপীয় গ্রন্থে আলমারি ভরিয়াছিলেন, তিনি কখনও তাঁহার শরীরের ভোগের জন্য সেই জিনিস ব্যবহার করিতেন না যাহা এদেশের শিল্পীরা গড়ে নাই। ১৮৯৩ অব্দে যখন ভূদেবের গৃহে এই ঘটনাটি ঘটে তখন সারা বঙ্গদেশে কেবল ইউরোপীয় পণ্যই কাটিতেছিল।

ভূদেব কি শ্রেণীর গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন, কেবল একটি দৃষ্টান্তে তাহার পরিচয় দিতেছি। দেওঘরে তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু ভূদেবকে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদের বিষয়ে কথা তুলিবার পর ভূদেব আপনার গলার পৈতাগাছটি খুলিয়া রাজনারায়ণের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানি।" রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেই পৈতাগাছটি সাদরে তাঁহার বসিবার ঘরের দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন ও উহা দেখাইয়া বহু লোককে ভূদেবের মাহাত্ম্যের কথা বলিতেন। যাঁহারা ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ খানি

পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না যে ভূদেব অনেক নূতন সংস্কারের ধুয়াধারীদের কত উপরে ছিলেন।

অন্যদিকের কয়েকটা কথা বলিতেছি। সেকালে নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক বেশী পাওয়া যাইত না; ভূদেব অনেক টোলের পণ্ডিতকে শিক্ষাবিভাগে চাকুরি দিয়াছিলেন ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময়ে তাঁহাদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বলা বাহুল্য যে তিনি ইচ্ছা করিলেই অনেককে চাকুরি হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ভূদেবের ধীরতা এত অধিক ছিল যে তাঁহার তাঁবেদারদের মধ্যে কেহ কেহ অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়াও লাঞ্ছিত হন নাই। একজন টোলের পণ্ডিতকে ভূদেব সব্‌ইন্স্‌পেক্টরের পদ দিয়াছিলেন; ইনি শিক্ষা বিবরণের যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন তাহাতে অসম্ভব বড় বড় সংস্কৃত কথা ছিল ও রচনা-রীতিও সরল ছিল না। ভূদেব সে রিপোর্ট অনেক স্থানে কাটিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিতটি এই সংবাদ পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"ভূদেব আমার লেখা কলমে কাটিয়াছে, আমি তাহার লেখা কোদালে কাটিব।" ভূদেব ইহা শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"যাহার যে অস্ত্র।" একজন পণ্ডিত ছাপা ভূগোলকে অগ্রাহ্য করিয়া বালকদিগকে শিখাইয়াছিলেন যে, পৃথিবী ঘোরে না, সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। ভূদেব তাঁহাকে শিক্ষাদানের ত্রুটি দেখাইলে পণ্ডিতটি চটিয়া বলিয়াছিলেন—"আচ্ছা, আমার এই কুড়ি টাকা বজায় রাখার জন্য এখন হইতে পৃথিবীকেই ঘুরাইব।" ভূদেব এই পণ্ডিতকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষের বই দেখাইয়াও বুঝাইয়া বলিলেন যে ঐ মতটি খৃষ্টিয়ানি মত নয় এদেশের জ্ঞানেও উহা সত্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পে ও এদেশে সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভূদেব ১৮৭০ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত যে সকল কাজ করিয়াছিলেন তাহা একটি বড় প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ করা যায় না। গবর্ণমেণ্টকে দিয়া নৃতত্ত্ব বিষয়ের অনুসন্ধান করাইবার ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া ভূদেব নিজের টাকা খরচ করিয়া কয়েকজন শিক্ষিত যুবককে ভারতের নানাস্থানে নৃতত্ত্বের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৮১ অব্দের প্রায় শেষভাগে আমার তখনকার বিশেষ পরিচিত রামোত্তম ঘোষ, এম-এ-কে অনেক টাকা খরচ করিয়া মাদ্রাজে পাঠান হইয়াছিল ও তাঁহাকে দিয়া মলবর প্রদেশের অনেক সামাজিক রীতি সংগ্রহ করান হইয়াছিল। নৃতত্ত্ব যে সুশিক্ষার উপযোগী বিষয় তাহা এই সময়ের ৩৮ বৎসর পরেই স্যর আশুতোষ এক রকম জোর করিয়া এদেশের লোককে বুঝাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টিকে এম-এর পাঠ্য করিয়াছেন। স্যর আশুতোষের এই উদ্যোগের সময়ে একালের শিক্ষিতেরাও অনেকে তাঁহাদের পত্রিকায় ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন আর সেনেট সভাতেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষের সভ্যেরা ঐ শিক্ষার প্রতিকূলে মত দিয়াছিলেন। ভূদেব তাঁহার জ্ঞানে বর্ত্তমান সময়েরও কত উপরে ছিলেন তাহা এই দৃষ্টান্তেই সুস্পষ্ট।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর সহপাঠী এই মনীষী ভূদেবের পাণ্ডিত্যের ইতিহাস, চরিত্রের পবিত্রতার ইতিহাস ও গভীর স্বদেশপ্রেমের ইতিহাস বঙ্গদেশের অমূল্য সম্পত্তি। যাহাদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যের সৌভাগ্যে আমি ভূদেবের পুণ্য কাহিনী আলোচনা করিয়া একদিন সুখী হইয়াছি তাঁহারা কেহ এখন এ পৃথিবীতে নাই ; গোবিন্দদেব চলিয়া গিয়াছেন, মুকুন্দদেব চলিয়া গিয়াছেন,—এখন আর কাহারও কাছে তাঁহার জীবনের কথা শুনিবার ও সংগ্রহ করিবার দিন নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ভারতীয় অর্থ-পঞ্জিকা

(১৯২৭-২৮)

অস্মিন্ বর্ষে পূর্ব্ব বর্ষের মত শ্রীযুক্ত সার বাসিল ব্ল্যাকেটই মন্ত্রী আছেন এবং যথারীতি বৎসরের আর্থিক ফলাফল গণনা করে' আয়-ব্যয়-স্থিতির একটা হিসাব প্রকাশ করেছেন। যথারীতি বলছি এই জন্য যে, এই গণনা-প্রণালীটি বিশুদ্ধ নয় : এতে যে সকল অঙ্ক দেওয়া হয়েছে সেগুলি অবিমিশ্র বাস্তব নয়। তার মধ্যে আনুমানিক, কাল্পনিক বললেও অত্যুক্তি হয় না, অনেক অঙ্ক আছে। গবর্ণমেণ্ট এই দোষের বিষয় অবগত হয়ে একটা পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটি (Public Accounts Committee) নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিটি ১৯২৪-২৫ সালের হিসাব পরীক্ষা করে বলেছেন এই হিসাবের অঙ্কগুলি থেকে ভারতগবর্ণমেণ্টের খরচ-খরচা-সমেত মোট আয়ব্যয় কত তা' বোঝা যায় না; খরচ-খরচা বাদে কত আয় তাও বোঝা যায় না। পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটির এই অভিমত প্রকাশের পরও সার বাসিল ব্ল্যাকেট কেন পূর্ব্বরীতি অনুসরণ করেছেন তার একটা কৈফিয়ৎও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন চিরাচরিত প্রথাভঙ্গ সর্ব্বদাই নিন্দনীয় ; সেই জন্য তিনি এই বজেট প্রস্তুত করতে অতীত আচারানুমোদিত রীতির ব্যতিক্রম করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি, যদিও এই রীতি কোন কোন বিষয়ে অসুবিধাজনক এবং ভ্রান্তিজনক। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন ১৯২৬-২৭ সালের প্রথমে যে বজেট প্রস্তুত হয় তাতে যে আয় দেখান হয়েছিল, ঐ বৎসরের পরিবর্ত্তিত (revised) বজেটে সেই আয়টা তার চেয়ে ১৮ লক্ষ টাকা কম হয়ে গিয়েছে। সার বাসিলের ভাষায়—"a break in the continuity is always to be deprecated and I have not thought it desirable to depart from the method of presentation sanctioned by past practice * * * The present form is, in some ways, inconvenient and may even be misleading." যা' হ'ক, এই রীতি অনুসারে প্রস্তুত যে আয়ব্যয়স্থিতির হিসাব তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

	রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎপত্তি স্থান	১৯২৫-২৬ সালের প্রকৃত হিসাব	১৯২৭-২৮ সালের আনুমানিক হিসাব
(১)	বাণিজ্য শুল্ক (Customs)	৪৬,৯৬,১৮,০১৭	৪৭,৮৫,৪৬,০০০ টাকা
(২)	আয়কর (Taxes on Income)	১৫,২৭,২১,৫৩৭	১৬,২৬,৫৭,০০০
(৩)	লবণ	৫,০৭,৯০,৬১৯	৫,৭৬,৩১,০০০
(৪)	আফিঙ	২,০৩,৫২,৪৩৭	২,৯২,৭৯,০০০
(৫)	অন্যান্য বাবত	১,৫২,০২,৯০৭	১,৭০,৪৩,০০০
(৬)	রেলওয়ে	৫,৪৯,০৩,৫৬৯	৫,৪৮,০৮,০০০
(৭)	ডাক ও টেলিগ্রাফ	১,৮৮,২৪,৯৬০	
(৮)	টাঁকশাল ও নোট	৩,৯৩,৭৭,৬৮৮	
(৯)	প্রাদেশিক কর এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত অন্যান্য হিসাবে	৬,০৮,৪০,৬৭৭	
(১০)	অসাধারণ বাব (Extraordinary items)	৩৭,৮০,৩০০	
	মোট আয়	৮৮,৬৪,১২,৭১১	৮৩,৫০,৮৪,০০০

ব্যয়ের প্রধান প্রধান বিষয়—

(১)	লবণের কারবার এবং অন্যান্য কারবারের মূলধন যা রাজস্ব থেকে দেওয়া হয়—	৭,১৮,০৬৪	১৮,৭৯,০০০ টাকা
(২)	খাল (জল সেচনের)	৮,১১,৯৫৬	৮,৩৪,০০০
(৩)	রাষ্ট্রীয় ঋণ	১৪.১২,২৯,৩৭২	১২,৫৮,২১,০০০
(৪)	শাসন	৯,৮৬,৫০,৭৩৮	১০,৪৭,১৮,০০০
(৫)	শাসন বিভাগীয় পূর্ত্ত	১,৪৭,৫৬,৬৬৩	১,৪৯,৫৩,০০০
(৬)	অন্যান্য বিষয়	৩,৭১,৪২,১২৭	৩,৫০,২৫,০০০
(৭)	সামরিক বিভাগ	৫৫,৯৯,৮৫,৬৫৪	৫৮,৯২.০০ ০০০
	মোট ব্যয়	৮৫,৩২,৯৪,৫২৪	৮৩,৫০,৮৪,০০০
	উদ্বৃত্ত	৩,৩১,১৮,১৮৭৲	

আয়ব্যয়ের এই হিসাব দাখিল ক'রে সার বাসিল ব্ল্যাকেট একটু সগর্ব্ব আশ্চর্য্যের সহিত বলেছেন ভারত-গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত শাসনবিধান অনুসারে কত উদারভাবে কত বিষয়ে নিজ ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে হস্তান্তরিত করে দিয়েছেন ! এখন ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিজের হাতে আছে কেবল ভারত-রক্ষা (defence of India), ভারতীয় করদ এবং মিত্ররাজদের সহিত এবং ভারতসীমার বাইরের প্রত্যাসন্ন রাজাদের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা, প্রধান প্রধান রাস্তা-ঘাট (major communications,) রাষ্ট্রীয় ঋণ, প্রচলিত মুদ্রা, জরিপ, প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা, গবেষণা,

এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা। ভাবটা, যেন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে স্বতন্ত্র স্বায়ত্ত শাসন (autonomy) দেওয়া হয়েছে; এখন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি—যাতে ভারতীয় জাতিটা সুগঠিত হয় এবং শ্রীসম্পন্ন হয়, সে-সকল কাজ প্রদেশিক গবর্ণমেণ্টই করবেন, তাতে আর ভারত-গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করতে হবে না।

এইরূপ বাজে কাজগুলির ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে সমর্পণ ক'রে দেওয়ার পর, যে সকল কাজ ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে, তার মধ্যে, বলা বাহুল্য, সামরিক কার্য্যই প্রধান। এবার এর জন্য বজেট ধরা হয়েছে ৫৪,৯২,০০,০০০ (চুয়ান্ন কোটি বিরেনব্বই লক্ষ) টাকা মাত্র! অর্থাৎ বজেটে-ধরা মোট আয় ৮৩,৫০,৮৪,০০০ (তিরাশী কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চুরাশী হাজার) টাকার শতকরা ৬৫.৭৬ টাকা বা প্রত্যেক টাকাটির প্রায় সাড়ে দশ আনা যাবে যুদ্ধের জন্য! এ ছাড়া আর একটি ব্যয় সাধারণ শাসনবিভাগীয় ব্যয়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন, যাকে সামরিক বিভাগেই স্থান দেওয়া উচিত ছিল। সেটি হচ্ছে সীমান্ত প্রদেশের পাহারা—Frontier Watch and Ward. এটি এবার নতুন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বজেটে ছিল না। মধ্য এসিয়াতে রুশীয় সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রভাব ক্রমেই বিস্তার লাভ ক'রে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছেছে। আফগানিস্থানের সীমা অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষের দিকে যাতে আর অগ্রসর হতে না পারে তারই জন্য এই পাহারার বন্দোবস্ত হচ্ছে। এর জন্য ব্যয় হবে, ভারতবর্ষে ২,৪৩,৫৩,০০০, বিলেতে ১০,০০০, আর বাটা ৩০০০৲—মোট ২,৪৩,৬৬,০০০ (দু' কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ ছষট্টি হাজার) টাকা মাত্র! এই পাহারার জন্য যেমন বিলেতে ব্যয় হবে দশ হাজার টাকা, আর তার বাটা দিতে হবে তিন হাজার টাকা, তেমনি মোট সামরিক ব্যয়ের মধ্যে ৯,৮০,৬২,০০০ (ন' কোটি আশী লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা খরচ হবে বিলেতে, আর তার জন্য বাটা দিতে হবে ৩, ২৬, ৮৭,০০০ (তিন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ সাতাশী হাজার) টাকা। এই বাটার হিসাবেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সকলেই জানেন আজকাল বাটার দর টাকায় এক শিলিং পৌনে ছ' পেন্স। আইন করে তাকে করা হল এক শিলিং ছ' পেন্স। কিন্তু ভারতের জন্য বিলেতে যে পাউণ্ড শিলিং পেন্স ব্যয় হয় তাকে ভারতীয় টাকা-আনা-পাই তে পরিণত করবার বেলায় বাটার হার ধরা হয় টাকায় দু' শিলিং। কেন এমন হয় তার কোন কৈফিয়ৎ দেখতে পাওয়া যায় না। ইঞ্চকেপ কমিটিও এটি লক্ষ করেছিলেন এবং সামরিক বিভাগ-এর কোন বিশেষ কারণ দর্শাতে পারেন নি ব'লে তাঁরা তখনকার প্রচলিত ১৫৲ টাকায় পাউণ্ড এবং বজেটে-দেখান ১০৲ টাকায় পাউণ্ড—এই দু' এর প্রভেদস্বরূপ কতকটা টাকা আন্দাজী ধরে নিয়েছিলেন।

১৯২২-২৩ সালের সামরিক হিসাব পরীক্ষা ক'রে ইঞ্চকেপ কমিটি বলেছিলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যে ব্যয় হয়ে গিয়েছে তা' হয় ত অপরিহার্য্য ছিল, কিন্তু এখনকার প্রশ্ন এই যে

ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য বর্ত্তমান হারে সৈন্য রক্ষা করতে ভারতবর্ষ সক্ষম কি না? কমিটির মতে, নয়। কমিটি আরও বলেন শান্তির সময়ে ভারতের প্রথম কর্ত্তব্য আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা, আর সামরিক ব্যয়ের অত্যন্ত হ্রাসই তার একমাত্র উপায়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩-১৪ সালের হিসাবের সহিত ১৯২২-২৩ সালের হিসাবের তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায় ৩২, ৫৪ ৮৫০০০ (বত্রিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পঁচাশী হাজার) টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে—অর্থাৎ ব্যয়টা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১৭ টাকা হারে! তারপর সৈনিক ব্যয়ের হ্রাস যেরূপ করতে হবে তার পরামর্শ দিয়ে কমিটি বলেছেন এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বাৎসরিক ৩,০৩,০০,০০০ (তিন কোটি তিন লক্ষ) টাকা বাড়ান যেতে পারে এবং ক্রমে এটা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৩৬,০০,০০০ (তিন কোটি ছত্রিশ লক্ষ) টাকায় উঠতে পারে। কিন্তু কোন কমিটি বা কমিশনের পরামর্শ শুনতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাধ্য নয়, বিশেষতঃ সামরিক বিষয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগটি প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টেরই একটি বিভাগ। ১৯১৯ সালের ভারত-গবর্ণমেণ্ট আইনের ২২ ধারা অনুসারে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বিনা সম্মতিতেও ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট ভারত সৈন্যকে ভারতের বাইরে পরিচালিত করতে পারে। "ফ্রান্সে ভারতীয় সৈন্য" নামে লর্ড বার্কেনহেড ও কর্ণেল মিয়ার্সওয়েদার লিখিত একখানি পুস্তক আছে। লর্ড কর্জ্জন তার ভূমিকায় লিখেছেন "ভারতের আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষা করা, বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করা এবং আদেশ পাবার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অভিযান করতে প্রস্তুত হওয়া—ভারত-সেনার এই তিনটি অধিকার আছে এবং এই অধিকারের জন্য তারা গৌরবান্বিত মনে করে। তৃতীয় অধিকারটি অর্থাৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে যে-কোন স্থানে অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য ভারত-সেনা ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কাজে লাগে; আর তাদের যোগ্যতাও যেমন বীরত্বও তেমনি।" ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সেদিন নৌসেনা সম্বন্ধীয় আইনের আলোচনা উপলক্ষেও এই কথা হয়েছিল। মিঃ পেথিক লরেন্স প্রস্তাব করেন যে, ঐ আইনে এমন একটা ধারা সন্নিবেশিত করা হক, যাতে ভারতের নৌসেনাকে ভারতের বাইরে পরিচালন করা যেতে পারবে না। তার উত্তরে আণ্ডার-সেক্রেটারি লর্ড উইণ্টারটন বলেন যে, তা হলে ভারতীয় সেনার স্বদেশ-প্রীতি ক্ষুণ্ণ করা হবে, ভারতীয় সেনাকে সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণদানের গৌরব থেকে বঞ্চিত করা হবে সুতরাং সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হল না। এইরূপ স্বদেশ-বাৎসল্য প্রদর্শনের জন্য এবং সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ-দানের গৌরবের অর্জ্জন করবার সুযোগ দেবার জন্যই বোধ হয় সেদিন চীনে ভারত-সেনা পাঠান হ'ল! যা হ'ক, এইরূপ নানা কারণে সামরিক ব্যয়টি ব্যবস্থাপক সভার ভোটের অধীন নয়--nonvotable. কিন্তু এর আনুষঙ্গিক কতকগুলি সামান্য কাজের জন্য প্রায় ছ' লক্ষ রাখা হয়েছিল, সেটি ভোটের অধীন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা বহু তর্ক-বিতর্ক ক'রে সেই টাকাটি নামঞ্জুর ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু

ভারত-গবর্ণমেণ্ট আইনের ৬৭ ক (৭) ধারা অনুসারে সপারিষদ গবর্ণর জেনারেল সার্টিফিকেট দিলেন যে, সে টাকাটি না হলে কিছুতেই চলবে না, সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার না-মঞ্জুরিটা না-মঞ্জুর হয়ে যা' ছিল তাই থাকল।

এই উপলক্ষে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেনাকে ভারতীয়-করণ (Indianization) সম্বন্ধে একটা কথা না বললে বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এক দেশের জন্য আর এক দেশের লোক যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে—এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থাটা যে চিরকাল চলতে পারে না, ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট তা' বিলক্ষণ বোঝেন, কিন্তু বুঝেও কেবল ভারতীয় লোক দিয়ে ভারতী সেনা সংগঠন করা নিরাপদ নয় মনে করে এতদিন সে সম্বন্ধে কিছু করা আবশ্যক মনে করেন নি। নানা কারণে এখন কিছু করা আবশ্যক মনে ক'রে এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয় করবার জন্য গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিটি,—যা' স্কীন কমিটি বলে খ্যাত,—বিষয়টি বেশ ক'রে তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছেন। তাতে তাঁরা যা' বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ভারতীয় লোককে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হবে; তার জন্য ১৯৩৩ সালে এ দেশে একটা সামরিক বিদ্যালয় খোলা হবে; পরে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদেকে বিলেতের স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে পাঠান হবে এবং সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তা-দেকে ভারতীয় সেনা-বিভাগের উচ্চ পদে (commissioned rank এ) নিযুক্ত করা হইবে। পঁচিশ বৎসর এইরূপে উচ্চ পদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীর সংখ্যা হবে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সংখ্যার অর্দ্ধেক। অপর অর্দ্ধেক ইংরেজই থাকবে, অন্ততঃ সে সম্বন্ধে কোন কথা নাই। এ সকল কথা অবশ্য এখন কমিটির রিপোর্টে নিহিত আছে। এর পরে অবসরমত ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁদের সমরমন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করবেন। তার পর যা' হয় করা হবে। ভারত-গবর্ণমেণ্টও এখনও তাঁদের মতামত জানান নি। তবে ফলাফল কি হবে, আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা তা' এক রকম অনুমান করতে পারি। যা' হক, সে সকল ভবিষ্যতের কথা এখন ছেড়ে দিয়ে আমরা উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজ কর্ম্মচারীদের শিক্ষার জন্য বিলেতে তিনটি সামরিক বিদ্যালয় আছে—স্যাণ্ডহার্ষ্ট, উলউইচ এবং চাথাম। স্যাণ্ডহার্ষ্টের জন্য ভারতবর্ষকে দিতে হয় বাৎসরিক আশী হাজার পাউণ্ড বা (গবর্ণমেণ্টের বাটার দরে) আট লক্ষ টাকা; উলউইচকে দিতে হয় ত্রিশ হাজার পাউণ্ড বা তিন লক্ষ টাকা এবং চাথামকে দিতে হয় পনর হাজার পাউণ্ড বা দেড় লক্ষ টাকা—মোট সাড়ে বার লক্ষ টাকা! কিন্তু সুবিধা এই যে এই টাকাটি দিয়েই ভারতবর্ষের নিষ্কৃতি, তার সন্তানকে আর সেখানে পাঠাতে হয় না। সেখানে ভারত-সন্তানের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই তিনটি কলেজ ছাড়া ব্রিষ্টলে একটা আকাশ-সেনার দল আছে। তার জন্যও ভারতবর্ষকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। বলা বাহুল্য সেখানেও ভারত-সন্তানের স্থান নাই।

তার পর সাধারণ শাসন কার্য্যের ব্যয়। ১৯২৫-২৬ সালে এই বাবতে ব্যয় হয়েছিল ৯,৮৬,৫০,৭৩৮ (ন' কোটি ছিয়াশী লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশ আটত্রিশ) টাকা : এবৎসরে— ১৯২৭-২৮ সালের বজেট ধরা হয়েছে ১০,৪৭,১৮০০০ (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার) টাকা, অর্থাৎ ৬০,৬৭,২৬২ (ষাট লক্ষ সাতষট্টি হাজার দু'শ বাষট্টি) টাকা বেশী। কেন এত বেশী টাকা ব্যয় হবে অনুমান করা হল, তার কোন কৈফিয়ৎ নাই। সার বাসিল ব্লাকেট সে সম্বন্ধে নীরব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতগবর্ণমেণ্টের আয়ের চেয়ে ব্যয় ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছিল, তখন ইঞ্চকেপ কমিটি আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য কতকগুলি কর্ম্মচারীর পদ এবং বেতন কেটে কমিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং অনিচ্ছাসত্বেও গবর্ণমেণ্ট ঐ পরামর্শের কতকটা কাযে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন সার বাসিল ব্লাকেট বলছেন, ইঞ্চকেপ কমিটির ঐ পরামর্শ অতি অদূরদর্শিতার কায হয়েছিল এবং সেই জন্য গবর্ণমেণ্টকে নানা উপায়ে গত দু' বছর সেই কাটা জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে হয়েছে—"The Government of India have been seeking to restore some of the cuts." যে পদগুলি উঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল সার বাসিল সেগুলির আখ্যান দিয়েছেন "beneficial services"—হিতকারিণী সেবা। কিন্তু সে "হিত"টা কার হচ্ছিল, দেশের না কর্ম্মকর্ত্তাদের, তা' তিনি বলতে ভুলে' গিয়েছেন। সার বাসিল বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছেন দুটী ব্যয়ের বিষয়—একটা হচ্ছে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিক্ষা-বিস্তার, অপরটি নতুন রাজধানী দিল্লীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবর্ত্তন। সামাজিক ফ্যাশান সকল রাজধানী থেকে আরম্ভ করে' সুদূর পল্লীতে গিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের ফ্যাশানটাও সেইরূপ ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে প্রদেশে প্রদেশে বিস্তৃত হবে কিনা তার কোন ইঙ্গিত বজেট বক্তৃতায় পাওয়া যায় না। আশা করবারও অবশ্য কোন হেতু নাই, কারণ, প্রদেশের শিক্ষা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তান্তরিত বিষয়ের মন্ত্রীদের হাতে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁদের মন্ত্রী মহাশয়েরা যে বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনিক শিক্ষার আবশ্যকতা বোঝেন না, তা' ত নয়। তাঁদের করুণ হৃদয়ে সহানুভূতিরও অভাব নাই, অভাব যা অর্থের। নতুন রাজধানী সম্বন্ধে আর একটি প্রণিধানযোগ্য কথা আছে—নতুন দিল্লীনগর নির্ম্মাণ কার্য্যটি, খাল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যেরই সামিল ধরা হয়েছে। কিন্তু লাভটা কি হয়েছে, বজেট বক্তৃতায় তার কোন উল্লেখ নাই। ১৯২৫-২৬ সালে এর জন্য ব্যয় হয়েছিল ৯৯,০৬,১৮৪ (নিরনব্বই লক্ষ ছ' হাজার একশ চুরাশী) টাকা। এর মধ্যে বিলেতে ব্যয় হয়েছিল ২,৬৩,৩৬৫ (দু' লক্ষ তেষট্টি হাজার তিনশ' পঁয়ষট্টি) টাকা। ১৯২৭-২৮ সালের জন্য ধরা হয়েছে মোট ৭০,০০,০০০ (সত্তর লক্ষ) টাকা, তার মধ্যে বিলেতে ব্যয় হবে ৩,৪২,০০০ (তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা। বিলেতের ব্যয়টা স্বতন্ত্র করে জানা আবশ্যক এইজন্য যে ভারতবাসী আশা করে যে ভারতের রাজধানী নির্ম্মাণের জন্য যা' কিছু আবশ্যক তা' ভারতেই প্রস্তুত হবে এবং ভারতেই খরিদ হবে, তাতে যা লাভ হবে তা' ভারতেই থাকবে; আর যা' কায হবে তাতে ভারতের লোকেরই কর্ম্মহীনতা নিবারিত হবে। কিন্তু কর্ত্তাদের ইচ্ছা অন্য রকম। তা' ছাড়া বিলেতে ব্যয় হলে ব্যয়ের আসল টাকাটা ত দিতেই হয়, তার উপর দিতে হয় বাটা সেলামী। সেটিও বড় কম নয়।

ডাক এবং টেলিগ্রাফের কারবারে এবার আয় হয়েছে মোট দশ কোটী আশী লক্ষ আর ব্যয়টা যায় মূলধনের সুদ তার চেয়েও কিছু বেশী, ফল, ক্ষতি ৭৬০০০৲ টাকা। সার বাসিল

ব্ল্যাকেট বলেন এই বিভাগ থেকে কিছুলাভ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাই বলে এও মনে করা উচিত নয় যে এটা করদাতাদের গলগ্রহ হয়ে থাকে। ব্যয়টা অন্ততঃ আয়ের চেয়ে বেশী না হয় তার চেষ্টা অবশ্য করা উচিত। কিন্তু সার বাসিল বলেন যে সুখের অবস্থা এখনও দৃষ্টির বাইরে। এই সকল ভূমিকা করে, তিনি বলছেন "অতএব ডাকমাশুল এবং টেলিগ্রাফের হার এখন কমাতে পারা যায় না।" ফল, গরীবের পোষ্টকার্ডখানার দাম দু' পয়সাই থাকল।

কিন্তু চা-এর রপ্তানি শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া হল। তার স্থানে চা-কোম্পানীদের উপর আয় কর বসান হল। চা কৃষিজাত দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্যের উপর আয়কর নাই। সুতরাং চা-সম্বন্ধে কৃষিজাত লাভ বাদ দিয়ে যা' থাকবে, তাই ধরা হয়েছে চা-এর বাণিজ্যজাত লাভ। খরচ-খরচা বাদে এই লাভের অঙ্ক স্থির করা বড় সহজ হবে না। যা হক অনুমান করা হয়েছে এতে ৪৫ লক্ষ টাকা আয় হবে। বর্ত্তমান রপ্তানি শুল্ক থেকে আয় আছে ৫০ লক্ষ—অর্থাৎ প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষতি হবে ৫ লক্ষ টাকা। এই আর্থিক ক্ষতি ছাড়া আর একটি বিবেচনার কথা আছে। ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা এবার বড় ভাল নয়, সেখানকার বজেটে অন্ততঃ এই কথাই সেখানকার রাজস্ব সচিব বলেছেন। সেই জন্য সেখানে এবার চা-এর আমদানী শুল্ক উঠিয়ে দিতে পারা গেল না। সেখানে আমদানী শুল্ক আর এখানে রপ্তানি শুল্ক—এই দুই শুল্কের জন্য চা-এর দাম ইংলণ্ডে অনেক বেশী হয়ে গিয়েছে। এখানকার রপ্তানি শুল্কটি উঠে গেলে ইংলণ্ডের চা-ব্যবহারকারীরা চা পাবে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে আর তার পরিবর্ত্তে আয়কর বসলে ভারতীয় চা-ব্যবহারকারীকে দাম দিতে হবে বেশী অর্থাৎ বিলিতী চা-পায়ীর সুবিধার জন্য ভারতবাসীকে দিতে হবে পাঁচ লক্ষ টাকা! গরীব ভারতবাসীর পোষ্ট কার্ড খানার দাম এক পয়সা করলে এর চেয়ে সরকার বাহাদুরের বেশী ব্যয় হত কি?

আর একটি প্রণিধানযোগ্য কথা আছে। এখন মোটরকার এবং টায়ারের উপর আমদানী শুল্ক আছে শতকরা ৩০ টাকা। প্রস্তাব করা হয়েছে মোটর কারের শুল্কটা কমিয়ে ২০৲ টাকা এবং টায়ারের শুল্ক কমিয়ে ১৫৲ টাকা করা হবে। প্রস্তাবটি পেশ করবার সময় সার বাসিল ব্ল্যাকেট বলেছেন এ প্রস্তাবে সকলেই সুখী হবেন—**It will be** ***universally popular.*** অর্থসচিবের **universe**টিতে বাস করেন কেবল মোটরকার-বিহারী কতকগুলি ধনী। তাঁদের এই বিলাসের সামগ্রীটি যোগাতে দরিদ্র ভারতবাসীকে আপাততঃ বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা দিতে হবে। তাও যদি এই শুল্ক কমানের জন্য মোটরকারের এবং টায়ারের আমদানী বাড়ে; তা না হলে আরও বেশী দিতে হবে। সার বাসিল ব্ল্যাকেট আরও ইঙ্গিত করেছেন যে মোটর কারের বেশী আমদানী হলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট রাস্তার উন্নতির জন্য মোটরবিলাসীদের কাছ থেকে কিছু করও আদায় করতে পারবেন।

উপসংহারে সার বাসিল ব্ল্যাকেট বলেছেন এবৎসরের অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি এবং তার জন্য সম্ভাবিত অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষের প্রতীকারকল্পে এখন থেকেই মনকে দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত করবার আবশ্যক নাই। সুতরাং তার জন্য বজেটে কোন সংস্থান করা হল না। কেন যে ভারতবাসীর নিত্য সহচর দুর্ভিক্ষের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হল না, সার বাসিল তা কৃপা করে বলেন নি। বোধ হয় তা হলে কোটি কোটি টাকার অঙ্ক পরিশোভিত সাম্রাজ্যিক আয়-ব্যয়-চিত্রের সৌন্দর্য্যহানি হত!

শ্রীহৃষীকেশ সেন

বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য

সাহিত্যে দালালী

২রা এপ্রিল তারিখের 'নেশন ও এথিনিয়ম" পত্রে মাইকেল স্যাডলিয়র লিখিয়াছেন—"সাহিত্যের বাজারে সম্প্রতি এক শ্রেণীর দালালের আবির্ভাব হইয়াছে। বিগত ৩২ বৎসরের মধ্যে প্রকাশক ও লেখকের সম্বন্ধটা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এখন প্রবন্ধ, ছোট গল্প, ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস, গল্পের অনুবাদ—এ সকলের প্রাধান্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। তা ছাড়া আজকাল নানা উপন্যাস ও গল্প অবলম্বনে নাটক ও ছায়াচিত্রও রচিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন স্থানের প্রকাশকের সহিত দেনা-পাওনা নিয়ে বন্দোবস্ত করা যে লেখকের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব তা সহজেই বোঝা যায়। তাই আজকাল এমন এক দালাল শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে দেনা-পাওনা বিষয়ে মধ্যস্থতা করিয়া থাকে। বাজার দর যাচাই করিয়া নিজের লেখা সম্বন্ধে প্রকাশকের সঙ্গে দর কষাকষি করার মত সময় ও যোগ্যতা সাধারণ লেখকেরও থাকে না। সুতরাং দালালের সহায়তা ব্যতীত লেখকদের প্রতারিত হওয়ারই সম্ভাবনা এবং আজকাল এই সম্ভাবনাটা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ এই যে, পাঠকশ্রেণী এখন সীমাবদ্ধ নয় এবং কোন একটা বইয়ের বাজার-দর নির্ণয় করিতে তীক্ষ্ণ ব্যবসা-বুদ্ধি দরকার। প্রকাশকের সেই কূটবুদ্ধি আছে, লেখকের তা নাই। সুতরাং লেখককে দালালের শরণাগত না হইলে চলে না। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—কাঁটা দিয়েই কাঁটা বের করা যায়।

কিন্তু সাহিত্যের বাজারে এই প্রকার দালালির একটা মস্ত বিপদ আছে। সাহিত্যের সবটাই যে বাজার নয় একথা আজকালকার লেখক ও প্রকাশক উভয়েই ভুলিতে বসিয়াছেন। আজকাল লেখক ও প্রকাশকের সম্বন্ধ—দুই ভাগে ভাগ করা যায়—একটি সাহিত্যিক সহানুভূতি ও ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ, আর একটি—দেনা-পাওনা ও আইনের চুক্তির সম্বন্ধ। সাহিত্যের দালাল এই প্রকার সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছে। কারণ, দালাল শুধু দেনা-পাওনা ও আইনের মার-প্যাঁচ সম্বন্ধেই কারবার করে। এর ফলে প্রকাশকদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। একদল প্রকাশক আছে যাহারা শুধু লাভ-লোকসানটাকেই বড় করিয়া দেখে না—যাহারা সত্যই অন্তরে সাহিত্যের চলার পথ সৃষ্টি করিয়া চলে। ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। আর একদল প্রকাশক আছে যাহাদের রস-জ্ঞানের কোন বালাই নাই যাহারা শুধু লাভ-লোকসানটাকেই বড় করিয়া দেখে এবং নিঃস্ব, অসহায় লেখকদের লইয়া জুয়া খেলে!

প্রকাশকদের মধ্যে এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ দেশের সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। আজকাল প্রকাশককে পুরা ব্যবসাদার সাজিতে হয় এবং কিরূপে কোন্ বইয়ের বেশী কাটতি হওয়া সম্ভব এইটাই ভাবিতে ও বুঝিতে ও শিখিতে হয়; অথবা কি উপায়ে একজন সত্যিকারের শিল্পী ও গুণীকে দশজনে বোঝে এই উদ্দেশ্যে পথ চলিতে হয়। এর ফলে সাধারণ পুস্তকের দোকানে শুধু সস্তা দামের অন্তঃসারশূন্য বই ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না এবং সাধারণ পাঠক পাঠোপযোগী বইয়ের কোন সন্ধানই পান না।"

ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের দোষ

সম্প্রতি বিলাতের 'ডেলি এক্সপ্রেস'এর কর্তৃপক্ষগণ বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সমালোচক Andre Maurois কে ইংরাজ-চরিত্রের দোষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। নিম্নে সেই প্রবন্ধের সারাংশ দেওয়া হইল।

(১) আপনাদের প্রথম দোষ অহংকার ; আপনাদের মত অহংকারী জাতি পৃথিবীতে নাই বলিলেই চলে।

লর্ড কর্জন কোন একটি গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বিধাতাকে বাদ দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত মানব-জাতির কল্যাণকর মহাশক্তি আর কিছুই থাকিতে পারে না—একথা যারা বিশ্বাস করে তাদেরই করকমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"

আপনাদের মধ্যে সকলেই মুখে যাই বলুন অন্তরে এই ভাব পোষণ করেন। আপনারা ভাবেন পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর জীব আছে—একদিকে ইংরাজ—যাদের সভ্যতার বাহন বলা যাইতে পারে এবং অন্যদিকে নেটিভ্ (Natives)—যাদের অত্যদ্ভুত হাব-ভাবে আপনাদের মনে হাস্য-রসের উদ্রেক হইয়া থাকে। তাদের আপনারা প্রথামত কতকগুলি দেশনে বিভক্ত করেন বটে কিন্তু তারা ব্যাপকভাবে বিদেশী নামধেয় একদল অসভ্য মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি একটা ইংরাজী উপন্যাসে পড়িয়াছি—"বিদেশীরা বড় কদর্য ও নোংরা জাত"। ডক্টর জনসন বলেছিলেন "বিদেশীরা বেশীর ভাগই বোকা"।

কোন একটা হোটেলে কিম্বা জাহাজে যদি একজন ইংরাজ থাকে এবং ৯৯ জন বিদেশী থাকে তা'হলে ইংরাজের আদব কায়দাই বজায় থাকিবে একথা ভাবিতে আপনাদের মোটেই সঙ্কোচ বোধ হয় না। যদি একজন ইংরাজের খুব গরম বোধ হয় তা' হলে গাড়ির জানালা খুলে দেওয়া হয় ; তাহাতে যদি একশ জন সহযাত্রী বিদেশীর শীতে কাঁপুনি ধরে তা হলেও কিছু আসে যায় না।

(২) আপনাদের দ্বিতীয় দোষ এই যে আপনারা কোন জিনিসেরই গুরুত্ব অনুভব করেন না এবং সব জিনিসেরই শুভ পরিণতিতে বিশ্বাস করেন। আপনারা কঠোর সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইতে চান না। আপনারা চান যে পৃথিবীটা স্বর্গ হ'ক, জীবনটা তাস-পাশার মত একটা খেলা হক এবং যুদ্ধবিগ্রহ জিনিসটা ফুটবল-ক্রিকেটের মত একটা তামাসার ব্যাপার হক। যখন কঠোর সত্য অত্যন্ত নির্মম হয়ে দাঁড়ায় তখন আপনারা তাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন।

(৩) ফ্রান্স, জার্মানি কিংবা ইটালির একজন সাধারণ রাস্তার লোককে যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরাজের জাতীয় দোষ কি তা' হলে সে বলিবে "ভণ্ডামি"।

মনে যে সব ভাব নেই সেই সব ভাবকে বাহিরে সত্য বলিয়া প্রকাশ করার নামই ভণ্ডামি। আপনারা যে ঠিক এই প্রকার ভণ্ড তা' বলিতে পারি না। অবশ্য একথা সত্য যে, আপনারা মুখে যে সকল ভাব ও আদর্শের কথা বলেন আপনাদের কাজে সেই সকল ভাব ও আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অসঙ্গতিটা আপনারা ধরিতে পারেন না। আপনাদের আন্তরিকতা নেই একথা বলি না ; তবে কথায় ও কাজে যে অসঙ্গতিটা আপনাদের চরিত্রে লক্ষ্য করি সেই অসঙ্গতিটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আপনাদের আছে।

এই সকল দোষগুলি দেখিয়া আপনারা বিচলিত হইবেন না ; কারণ চরিত্র জিনিসটা একক, তাহাতে দোষ ও গুণের সমন্বয় আছে। এসকল দোষ না থাকিলে আপনাদের চরিত্রের গুণগুলিও দেখা যাইত না। আপনারা পরের দোষগুলিকে একটু সহিষ্ণুতার চক্ষে দেখিতে শিখিবেন এবং কতকগুলি মানুষ যে ইটালিতে অথবা পোলাণ্ডে কিংবা জেকোস্লোভেকিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারে নাই তাহা তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ নয় একথা স্বীকার করিতে শিখিবেন। এর বেশী আপনাদের কাছে কিছু আশা করা যায় না।

কিন্তু ইহাও ঠিক যেদিন হইতে আপনারা বিদেশীকে বুঝিতে শিখিবেন সেদিন হইতে আপনাদের ইংরাজত্ব লোপ পাইবে। সেটাও যে দুঃখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।"

—রিভিউ অব রিভিউ, ফেব্রুয়ারি।

মহাত্মা গান্ধী

"রিভিউ অব রেলিজন্স" পত্রের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ফ্লুমিরেট ডেভিয়ার মহাত্মা গান্ধি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখিকা মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আলোচনা করিতে যাইয়া যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা মামুলি ঘটনার পুনরুক্তি হইলেও প্রবন্ধটী লিখিবার গুণে অতি চিত্তাকর্ষক। বিশেষতঃ মহাপুরুষের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিদেশীয়গণের কি অভিমত তাহা জানিবার জন্য আমাদের স্বতঃই কৌতূহল হয়।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন লেখিকার পক্ষে অভিনব। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন রক্তপাত, নরহত্যা, যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যতীত কখনও সম্পাদিত হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে একটি স্বর উত্থিত হইয়া জন-পুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে 'তোমাদের সহ্য করিতে হইবে—রক্তপাত তোমাদের পন্থা নয়। তোমাদের ত্যাগের ভিতর দিয়া দেশ উদ্বুদ্ধ হইবে।"

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে বিদেশীয়গণের কি ধারণা তাহা লেখিকা ব্যক্ত করিয়াছেন। মোগল বাদশাহগণের ময়ূর সিংহাসন, স্বর্ণখচিত জলপ্রপাত, অম্বরের মহারাজার মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত বিরাট মহল, বেনারস এলোরার বিচিত্র দেবমন্দির ইত্যাদি সম্বন্ধে পাঠ করিয়া ভারতবর্ষ যে রাজা-মহারাজাদের দেশ স্বর্ণ-হীরকের প্রাচুর্য্যে ভরপুর এই ধারণাই গঠিত হয়।

লেখিকা বলেন যখন এই বিচিত্র দেশ হইতে দুর্ভিক্ষের করুণ আর্ত্তনাদ সাগরের জলরাশি অতিক্রম করিয়া আমাদের কাছে পৌঁছায়, তখন আমরা ধারণা করিতেই পারি না এ কি করিয়া সম্ভব। এবং আমাদের ঔদাসীন্যের মাঝে সে আর্ত্তনাদের রেশের পরিণতি ঘটে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিগ্রহের অভিনব প্রতীক। কিন্তু কাহার বিরুদ্ধে এ বিগ্রহ? ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে? না, নীচ অবিচারের বিরুদ্ধে—যাহা কিছু মানুষের মর্য্যাদাবুদ্ধি সমর্থন করিতে পারে না তাহার বিরুদ্ধে।

এই আন্দোলন অর্কেষ্ট্রার ঐক্য সঙ্গীতের অনুরূপ। কোথায় একটি ভুল সুর উত্থিত হইয়াছে কি, সমস্ত সঙ্গীতের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধির প্রচেষ্টা ছিল জন-পুঞ্জের উৎসাহের আধিক্যকে সংযত করিয়া ন্যায় ও সত্যের পথে প্রচলিত করা। চৌরি-চৌরার কলঙ্ক সমস্ত আন্দোলনের বিকাশ আপাততঃ বন্ধ করিয়া দিল।

সুদূর অতীতকালের তপোবনের অন্তরাল হইতে মহাপুরুষ ঋষিগণের মহান্ উক্তির মত মহাত্মা গান্ধির বাক্য আমাদের হৃদয়ে আসিয়া বাজে, পৃথিবীতে সৈনিকের সংখ্যা কম হওয়া প্রয়োজন—মানুষের আত্মার-উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

বৈশাখে

শিবজির জন্মদিনের স্মৃতি—যেদিন বঙ্গসাহিত্যের নূতন যুগের প্রবর্ত্তক এদেশে প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া গাইয়াছিলেন—"এস, এস, বঁধু এস," সেদিন তিনি বাঙ্গলার মাটিতে স্মৃতিচিহ্ন খুঁজিয়া না পাইয়া গভীর আক্ষেপে বলিয়াছিলেন—"আমাদের বঁধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে"। নূতন যুগ প্রবর্ত্তনের সেই দিনে যিনি প্রাদেশিক দৃষ্টি এড়াইয়া ভারত-জোড়া জাতীয়তার চিন্তায় "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" লিখিয়াছিলেন, সেই মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করিতেছি। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফল যদি মহারাট্টাদের অনুকূলে হইত, তবে নূতন যুগের ভারত কিভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত তাহাই ঐ স্বপ্নলব্ধ ইতিহাসে লিখিত হইয়াছিল। শিবজি যে মহাত্মা ছিলেন, জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠায় জীবন ক্ষয় করিয়াছিলেন, আর মহারাষ্ট্রের প্রচেষ্টা যে এক সময়ে সারা ভারতের কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই স্পষ্টতর হইতেছে। ১৬২৭ অব্দে মহারাষ্ট্র-দেশের যে পার্ব্বত্য অঞ্চলে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শিবজির জন্ম হয়, তাহা আজ আমাদের পবিত্র তীর্থস্থান হউক। তিনশ বছর আগেকার পুণ্যদিনের স্মৃতিতে যে উৎসব হইবে, তাহাতে যেন আমরা নূতন চেতনা পাই,—যেন ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পথে চলিয়া কর্ত্তব্য পালনের প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হই।

• • • • •

খড়্গ্ বাহাদুর সিং—পাপের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া শিক্ষিত যুবক খড়্গ্ বাহাদুর আইনের বিধানে কিরূপে দণ্ডিত হইয়াছেন সে বিবরণ এ দেশের পাঠক মাত্রেই জানেন। হাইকোর্টে খড়্গ্ বাহাদুরের বিচারের প্রসঙ্গে অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন যে অতি জঘন্য পাপের ব্যবসায় চালাইবার জন্য পাপিষ্ঠেরা দল বাঁধিয়া এমন পৈশাচিক কাজ করিতেছে যাহা আইনের শাসনে দমাইবার উপায় পাওয়া সুসাধ্য নয়; যাহারা কুলশীল ভাঙ্গিয়া নারীকে নরকের আবর্ত্তে টানে, খড়্গ্ বাহাদুর তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। দুঃস্থ নেপালী নারীর উদ্ধারের জন্য তিনি পুলিসের কর্ত্তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছাইলেন ও সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু দেখিলেন প্রচলিত আইনের ব্যবস্থায় প্রতীকার পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি ক্ষোভে ও নিরাশায় সেই পাপিষ্ঠ পিশাচকে সংহার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন যে নারীর কুল-শীলকে পায়ে দলাইয়া পৈশাচিক লালসার তৃপ্তি করিতেছিল। একাজে তাঁহার প্রাণ যাইবে জানিয়াই খড়্গ্ বাহাদুর তাঁহার উদ্দিষ্ট কাজটি করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবন গেল দেখিয়া দেশের লোকে পাপ-নিবারণের জন্য উন্নততর আইন-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন, ইহাই ছিল খড়্গ্ বাহাদুরের সঙ্কল্প। হাইকোর্টকে বিচার করিতে হইয়াছে বাঁধা আইনের নিয়ম অনুসরণ করিয়া,—কাজেই খড়্গ্ বাহাদুরের প্রতি কঠোর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। হাইকোর্ট আইন অনুসারে বিচার করিতে বাধ্য,—আইন বদলাইবার অথবা শীল-ধর্ম্মের নিয়মে বিচার করিবার, কিম্বা অপরাধীর প্রতি দয়া দেখাইবার অধিকার হাইকোর্টের নাই। এ অধিকার যাঁহার আছে, যিনি অবস্থার বিচারে করুণা করিয়া শিক্ষিত ও ধর্ম্মানুরাগী খড়্গ্ বাহাদুরের মুক্তি দিতে পারেন, সেই গবর্ণর বাহাদুরের নিকটে খড়্গ্ বাহাদুরের মুক্তির জন্য ভারতের সকল প্রদেশের নরনারী আবেদন করিয়াছেন। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে

ও এদেশ-বিদেশ নির্বিশেষে সকলে যাঁহার মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছেন, গবর্ণর বাহাদুর নিশ্চয়ই তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন, ইহাই আমাদের আশা, বিশ্বাস ও প্রার্থনা।

* * * * *

সম্মান-বোধের মোহে বোকামি—রাষ্ট্রনীতির আন্দোলনে কল্পিত আত্মসম্মান-বোধের মোহে যে বোকামি চলিয়াছে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। প্রবাদ আছে যে একজন ব্যক্তি একালের সভ্যতা-জ্ঞাপক পরিচ্ছদ পরিয়া—লম্বা শার্ট-কোটাবৃত হইয়া "সভ্যসমাজে" তাহার হেঁটো-ধুতি পরা-বাপকে পুরাতন চাকর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল; সভ্যকুলে আত্মসম্মান-রক্ষার এই এক দৃষ্টান্ত। এ দেশে অনেক জাতির লোকে আপনাদের জাতি-পরিচয়ের প্রাচীন নাম নিন্দাসূচক মনে করিয়া জাতি-পরিচয়ের নূতন নাম বা উপাধি নিতেছে; যাহাদের কাছে আপনাদের জাতির নিন্দা ছিল, তাহারা উহাতে নিন্দা করিতে ভুলিবে না, ইহা নিশ্চিত। যথার্থ আত্মসম্মান-বোধ থাকিলে নিজেরাই আপনাদের জাতির নামকে হেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া উহা ত্যাগ করিত না, বরং আপনাদের মনুষ্যত্বের গৌরব বাড়াইয়া হেয় নামকে পূজ্য করিয়া তুলিত। যে অবস্থা আছে, যাহা খাঁটি সত্য, তাহা স্বীকার না করিলে সে দুরবস্থা ঘুচিবে না; ওষ্ঠার কপর সাপ দিয়া রক্তে বিষ থাকিতেও কিছু নাই বলিলে সাপের বিষ দূর হয় না; চোখ বুজিয়া মাথার উপরকার জ্বলন্ত সূর্য্যের অস্তিত্ব না মানিলে সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ পায় না। ইংরেজেরা এদেশের মালিক,—এ দেশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, আর আমরা সেখানে অনুগ্রহে রক্ষিত প্রজা, এ সত্য যত তিক্ত হইলেও উহা সত্য, আর সেই সত্যকে স্বীকার করিয়া উন্নতির উপায় খুঁজিতে না পারিলে প্রমাণিত হইবে আমাদের কাপুরুষত্ব, মূঢ়তা ও বোকামি।

শাসনবিধির সংস্কারই চাও, বা নির্ব্বাসিত বিশেষের মুক্তি চাও, বা অন্য অধিকার বিশেষেরই দাবি কর, তোমাকে প্রতি দাবির সময়েই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তুমি আজ হাত পাতিয়া, আর ইংরেজেরা দাতা; দাতার মনে দানের প্রবৃত্তি না জন্মা দোষের হইতে পারে, কিন্তু তোমাতে ও ইংরেজে সম্পর্কটা যে কিসের, তাহা বুঝিতে গোল হয় না। তোমার চাহিবার পদ্ধতি হয় আন্দোলন, না হয় ক্রন্দোলন, আর না হয় ঘন্দোলন; কিন্তু ইহা নিশ্চয় তুমি অনুগ্রহপ্রার্থী, চোখ রাঙ্গাইয়া কিছু চাহিলেও তুমি ভিখারী, আর চোখ রাঙ্গানিটাতেই আত্মসম্মান-বোধের পরিচয় হয় না। যাহারা অবোধ বালকের হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদার মত পিস্তল কুড়াইয়া ও বোমা ছুঁড়িয়া আত্ম-সংহারের পথ প্রশস্ত করিতেছে, তাহারা ধীরের আত্ম-সম্মান-বোধের পরিচয় দেয় না,—পরিচয় দেয় উত্তেজিত মূর্খের উন্মত্ততার।

এদেশের প্রতি ইংরেজের মমতা অতি গভীর; তিনি কিছুতেই আমাদের মায়া কাটাইয়া চাটি-বাটি তুলিয়া হোমে ফিরিবেন না; এদেশ রক্ষার নীতির সঙ্গে যতটুকু খাপ খায়, তাহার অধিক অধিকার কিছুতেই দিবেন না,—সে দান ১৯২৯ এই হউক আর পলাশী যুদ্ধের দুই শত বৎসর পরে ১৯৫৭ অব্দেই হউক।

শক্তির দুর্গে ক্ষমতার সিংহাসনে বসিয়া ইংরেজ যখন শিষ্টাচারের ভাষায় অথবা বালক ভুলাইবার ভাষায় আমাদিগকে কিছু বলেন, তখন আমরা উহার মর্ম্ম বুঝিয়াই যদি কাজ না করি, আর যদি সেই বচনের 'লজিক্' ধরিয়া তর্ক করি, তবে তর্কে হারিয়া বক্তা অপদস্থ হইবেন না,—তার্কিকেরাই আহাম্মক বনিবেন। চন্দ্র-সূর্য্য থাকিতে পৃথিবী হইতে বিবাদ-বিদ্রোহ যাইবে না; তবুও যদি এই

প্রতিশ্রুতি শুনি যে, ভারত হইতে পাপের আচার উঠিয়া গেলেই নির্ব্বাসিতেরা মুক্তি পাইবেন, তখন সেই উক্তির অর্থ বুঝিতে গোল হইবে কেন ? সেদিন বড়লাট বলিলেন যে নির্ব্বাসিতদের মুক্তি দেওয়ার অধিকার তাঁহার নয়,—পার্লামেন্টের ; আবার তাহার পরমুহূর্ত্তেই বিলাতের ভারত-সচিব বলিলেন যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট যেদিন মনে করিবেন যে নির্ব্বাসিতদিগকে মুক্তি দিলে বিপদের আশঙ্কা নাই সেইদিনই মুক্তির আজ্ঞা প্রচারিত হইবে। এখন এই উক্তি দুইটি ধরিয়া পরস্পরকে তর্কে হারাইতে পারা যায়, কিন্তু সে তর্ক করিতে যাওয়া বাতুলতা।

সুভাষচন্দ্রকে সুইট্জর্লণ্ডে রাখার নামই তাঁহাকে স্বাধীনতা দেওয়া কি-না, আর অন্য নির্ব্বাসিতেরা বাঙ্গলার মাটীতে পুলিশের পাহারায় রক্ষিত হইলে প্রার্থিত মুক্তি পাইবেন, কি-না, তাহা বিচার করিতে যাওয়াই বোকামি। ভারতের সৈনিক-বিভাগ ত্রিশ বৎসর পরে একেবারে ভারতীয় কর্ত্তৃত্বে চলিবে বলিয়া যে মন্তব্য বাহির হইয়াছে তাহাকে যাহাতে আমরা অতি উপাদেয় বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরি, এই হিসাবে সে প্রস্তাবটাকে অতি "বেশি দানে"র উদ্যোগ বলিয়া অভিনীত করা হইয়াছে। এ অবস্থায় এ প্রসঙ্গ ধরিয়া তর্ক করিবে কে ?

বড় দুঃখ হয় যে এসকল কথা আলোকের মত উজ্জ্বল হইলেও আমরা উহা দিয়া ধাঁধা গড়িতেছি আর ঐ কথার সমালোচনায় বিধাতার দেওয়া এই জীবনকে ক্ষয় করিতেছি। যে উপায় ধরিলে আমরা যথার্থই আত্মশক্তি বাড়াইতে পারি, কর্ত্তব্যবোধ জাগাইতে পারি, ধর্ম্মের নামের সকল পাপ অনুষ্ঠানকে দমাইতে পারি সেদিকে যে আমাদের দৃষ্টি পড়িতেছে না, ইহাই সকল দুঃখের উপর বড় দুঃখ। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বার্থবিশেষের লোভ দেখাইয়া যাঁহারা মুসলমানে অমুসলমানে প্রীতি ঘটাইবার উদ্যোগী, তাঁহারা যত বড় লোক হইলেও আগন্তুক। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের ধর্ম্মে মানুষ শিক্ষিত হইবে ও আপনাদের সাম্প্রদায়িকতা জনিত কুৎসিৎ বিদ্বেষ পরিহার করিবে সে দিকের উদ্যোগকে যাঁহারা অসম্ভব মনে করেন অথবা বড় বিলম্বসাপেক্ষ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি রাজনীতির ভেল্কিতে মিলন ঘটাইতে চান্ তাঁহাদের বিজ্ঞতা বোকামির নামান্তর মাত্র। যে রাজনীতির ক্ষেত্রে পা বাড়াইলেই পদমর্য্যাদা বাড়াইবার লোভ জন্মে, চাকুরি হাসিল করিবার সুবিধার দিকে নজর পড়ে, সে ক্ষেত্রে মানুষকে আড়াআড়ি ছাড়াইয়া মিলনের বাঁধনে বাঁধা চলে না ; সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলিতে মিত্রতার গলাগলি ঘটে না। আত্মসম্মান বোধ থাকিলে ক্ষণিকের স্বার্থ সাধনের জন্য নিজেদের প্রাণগত মত বিশ্বাসকে কেহ ঢাকা-চাপা দিয়া কাজ করিতে পারে না।

দাতার দুয়ারে ক্রুদ্ধ ভাষায় চীৎকার না তুলিয়া অন্য উপায়ে যে আমরা আত্মশক্তি বাড়াইতে পারি, ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিবার পথ প্রশস্ত করিতে পারি তাহাতে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস নাই। কাজেই এই উপায় বা পন্থার কথা আলোচনা করা নিষ্ফল। নেতারা প্রথমে ভাবিয়া দেখুন তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা ভ্রান্ত কিনা ; ভাবিয়া দেখুন যে ইংরেজের কথার প্রত্যুত্তরে আমরা যদি আকাশ ফাটাই যে আমরা ষোল আনা পাইবার উপযুক্ত, তাহা হইলেও ইংরেজ আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী ঢালিয়া দিবেন কিনা ; আর ভাবিয়া দেখুন যে ইউরোপে যে শ্রেণীর আন্দোলন সফল হয় তাহা এদেশে সফল হইতে পারে কিনা। কোলাহল ছাড়িয়া কি পন্থায় কাজ করা আমরা উচিত মনে করি তাহা বারান্তরে বলিব।

Editor Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77, Autosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shashi Bhusan Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road Calcutta

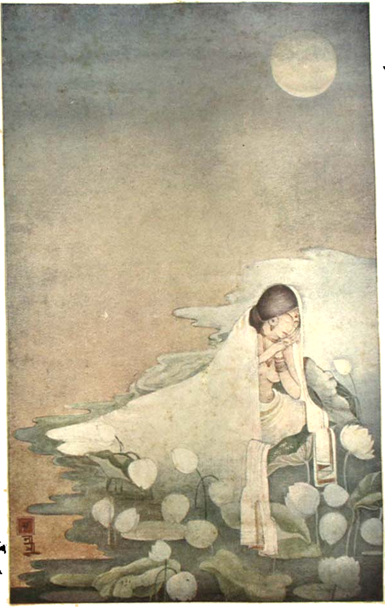

" পদ্মাবতী "

শ্রীরাণী দে—

THE INDIAN ART SCHOOL.
[illegible]

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৩৩৩-'৩৪

জ্যৈষ্ঠ

প্রথমার্দ্ধ
৪র্থ সংখ্যা

ভাব

ভাব[illegible] [illegible] ইতি [illegible] ভাবযুক্ত পদার্থ নিয়ে কথা, [illegible] একটি [illegible] ভার মাপ পরিমাণ দিয়ে থালায় নয় আর্টিস্ট ছুতোরে কুঁদে দিলে পাটিয়ের [illegible] মানুষের [illegible] তাকে আল্, তাতে পালিশ দিলে হল পড়া—দেখা বিভিন্ন হলেও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],—কেউ ঢোল দিতে পারে, কেউ [illegible] বাঁধাতে পারে, কেউ নৃত্যে জড়াতে পারে কিন্তু পাটিয়াকে বিয়ের ক'নেটির মতো অলকা-তিলকা দিয়ে সাত রংএর বরণডালাটি মাথায় সাজিয়ে ভাবযুক্ত করলে আর্টিস্ট, ভুলো হবে ছেলে। একটু বড় হলে ঘুড়ির সঙ্গে এই ভাবে ভাব হল, আরো বড় হলে হল ছবির সঙ্গে ভাব, পরে হল রঙীন কাপড়ের সঙ্গে ভাব, এইভাবে কেউ ভাব করে ফেলে কবিতার সঙ্গে, কেউ বা আর কিছুর সঙ্গে। বণিকের ঘরে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ধরা থাকে স্তূপাকারে, কিন্তু এতে করে বুঝতে হবে না যে, বণিকের সঙ্গে অলঙ্কার-গুলোর ভাব হয়ে গেছে। ভাবুক সে নিজে ভালবাসে সাজ, অপরকে ভালবাসে সাজাতে, ভাব হলো তার যেখানে যা-কিছু অলঙ্কৃত এবং যা-কিছু অলঙ্কারক আছে তার সঙ্গে। একজন সে সংসারের তেল-নুন চাল-ডালের ভাবনা নিয়ে বসে আছে কিম্বা সে [illegible] হয়ে বসে বসে আফিসের ফাইল আর হিসেবের ভাবনা ভাবছে, এদের বলতে হল ভাবনাগ্রস্ত। পরকালের ভাবনা ভেবেই আকুল, ইহকালের নানা [illegible], মানুষতো বিবিধ ভাবনাই ভাবছি, কিন্তু

ভাবুক নয় একেবারেই। মালাও জপছি না, হরিসভাতেও যাচ্ছি না, যাচ্ছি-আসছি আফিস করছি আর খাতায় মিষ্টি-মিষ্টি পদাবলী গীত ছড়া নাটক লিখছি—তা শুনে লোকের ভাব লেগে যাচ্ছে, তখন আমাকে ভাবনাগ্রস্ত নয়—ভাবুকই বলবে লোকে। মালি রয়েছে ফুলগাছের ভাবনা নিয়ে কিন্তু পুষ্পলতার ভাবের সে তো ভাবুক হল না এতে করে; মালাকর গাছের ভাবনা ভাবে না, অথচ সে পড়লো ভাবুকের দলে—তার ভাবনাগুলি ফুলের হার ফুলের সিঁথি ফুলের তোড়া কত কি রূপ ধরে প্রকাশ হল! উকিল ভেবেচিন্তে পাকা দলীল লিখে ফেলে—যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ হল তার, কিন্তু ভাবুকতা প্রকাশ করলে দলীল লিখতে উকিল—এ বল্লে তার ওকালতী-বুদ্ধিকে খাটো করা হয়; তেমনি “কৃষ্ণকান্তের উইল”—সেখানে বঙ্কিমবাবু তাঁর ওকালতী-বুদ্ধি খাটিয়েছেন—ভাবুকতা নয়—বল্লে মুস্কিল! কুবেরের ছিল হিসেবি বুদ্ধি, তিনি ভাবতেন ধনের হিসেব, আর কুবেরের অনুচর যক্ষরাজের ছিল রসবোধ—হিসেবি-বুদ্ধি একটুও নয়, সে বসে হিসেবের খাতায় অঙ্ক না কসে এঁকেই চল্লো প্রিয়ার ছবি—এ ওর ভাব বুঝলে না—এক বছরের জন্য সম্পদেও হলেন যক্ষরাজ; এই এক বছরে বুদ্ধির জোরে তবিলের ফাঁক পূর্ণ হল ধনপতির, আর বিরহী যক্ষের বুক ভাব-সম্পদে ভরে উঠলো দিনে দিনে। যক্ষ যদি বুদ্ধি খাটাতে চলতো তো মেঘকে দিয়ে ডাক-পেয়াদার কাজ করাতে চলতো না, সে ভাবুক ছিল তাই নির্ভাবনায় মেঘকে দূতের পদে বরণ করে নিয়েছিল। মেট্রোলজীর রিপোর্ট বুদ্ধিমানে লেখে, আর ভাবুক লেখে ‘মেঘদূতম্’।

কেল্লায় তোপ পড়লো রাত নটা বাজলো এই জ্ঞান জন্মে দিয়ে ঢুকলো তার কাজ, রাত্রির যে ভাবটা সেটি মনে পৌঁছে দেওয়া হল না তোপের শব্দে, তোপ জানান দিলে মাত্র প্রহর! সন্ধ্যায় আরতীর ঘণ্টাধ্বনি—সে শুধু জানালে না আরতীর বেলা হয়েছে, গির্জ্জের ঘণ্টা—সে শুধু জানালে না এত প্রহর হয়েছে, বিয়ের বাঁশি—সে শুধু জানালে না লগ্ন আর সময়টা—ভাবযুক্ত ধ্বনি এরা, রসের সংবাদ দিয়ে গেল সবাই ভাবের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে। শাস্ত্রকার বলেছেন, রস ছেড়ে ভাব নেই, ভাব ছেড়ে রস নেই :—এর সথারস,—ভাব হল দুই ছেলেতে তবে রস জাগলো মনে মনে, এমনি ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া—সেখানে, দুই বিপরীতমুখি ভাবের ধাক্কা লাগালে আর একটা রকম রস। আবার কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মনে একটা ভাব জাগলো, রসও বিঁধলো প্রাণে সেই সঙ্গে! অহেতুক ভাবের উদয়ে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একটা সুর মনের মধ্যে গুণ্‌গুণিয়ে ওঠে, একটা ছন্দ দোলা খেতে লাগে প্রাণের দোলায়, রংএর একটা নেশা উপস্থিত হয় চোখে কারণ সন্ধান করে পাইনে খোঁজ!

কোকিল ডাকলো বলেই বসন্ত এলো, না বসন্ত এলো বলেই কোকিল ডাকালো! ভাব হ'ল বলে রস হলো, না রস জাগলো বলে ভাব হলো? এর মীমাংসা করা নৈয়ায়িকদের কাজ, তবে এটা নিজে নিজে আমরা সবাই অনুভব করেছি যে শীতকালের বর-কনে দুজনের কাছেই

কোকিল দিলে না সাড়া বাহিরে, কিন্তু বুকের ভিতরে পড়ে গেল তাদের তাড়া ভাবের ফুল ফোটাবার, কিম্বা ফুল রইলো ঘুমিয়ে শীতের রাত্রে বনে বনে হঠাৎ মনে মনে বসন্ত বাহার রাগিণীতে মনোবীণা বেজে উঠলো আপনা হতে, লেগে গেল সেখানে বসন্ত উৎসব।

মানুষের ভাব প্রকাশ করে যে সমস্ত রস রচনা— কবিতা গান ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি— তারা কোনটা সহেতুক কোনটা এইভাবে অহেতুক বলে ধরতে পারি।

দু তিন পাট কাপড় জুড়ে কাঁথা বোনা হচ্ছে—এই কাঁথা বোনা হল শীতের নিমিত্তে, শীত হল হেতু এখানে কাঁথার! যেখানে শীত নেই সেখানে কাঁথা বোনার কাজ হয় অকারণে কাজ, শীতের কাঁথার উপরে যে কাজটা করা যাচ্ছে সেটা কি শীত নিবারণের নিমিত্তে করা হচ্ছে, সুন্দর দেখাবে বলেই তো কাঁথার উপরটায় কাজ করছি, কাজেই শীত এবং সৌন্দর্য্য দুটো হেতু হল কাঁথা রচনার, বলতে হয়। যে রচনার হেতু মাত্র আপনা হতে রসের উদয়, তাকে বলতে পারি অহেতুক রচনা..না হলে হেতু নেই, কারণ নেই, কোনো কিছুর নিমিত্তেও নয় অথচ রচনা হল কিছু,— এমনটা হয় না। ছেলেটা কোথাও কিছু নেই খেলতে খেলতে হঠাৎ কান্না ধরলে কি গেয়ে উঠলো কি নাচ সুরু করলে, ছেলের মনের ভিতরটাতে কি হচ্ছে ধরা গেল না, কাজেই বল্লেম—ছেলে অকারণে হাসে কাঁদে কেন দেখতো!

শিল্প কাজ সমস্তের মধ্যে একটা দিক থাকে সেটা রস ও ভাবের দিক, সেখানে—ভাব উদয় হল, কবিতা লিখলেম, ছবি লিখলেম, গান গাইলেম, নৃত্য করলেম—ভাবের বশে কলম চল্লো তুলি চল্লো হাত চল্লো পা চল্লো! শীতের জন্যে যে কাঁথা সেটা সুন্দর না হলেও কাজের ব্যাঘাত হয় না কিন্তু তাকে যদি শুধু শীত নিবারণকারি না রেখে চিত্তহারিও করে দিতে চাই তবে খানিক সুন্দর কারুকার্য্য দিয়ে ভাবযুক্ত করা চাই, তবেই সেটা একটা স্থান পেলে শিল্প জগতে, না হলে সে রইলো কাজের জগতে খুব কাজের জিনিষ হয়ে পড়ে।

একটা দিক শিল্প-কাজের যেটা হচ্ছে প্রকরণের বা টেক্নিকের দিক, সেখানে নৃত্যের আঙ্গিক ব্যাপার গানের বাচিক ব্যাপার ও কৌশল—এক কথায় রূপ দেবার ও ভাব প্রকাশ করার কৌশল সমস্ত রয়েছে,—ভাল করে লিখতে হবে তাই ভাল করে কলম বাড়ছি, রুল টানছি:—ভাল করে বাজাবো বাঁশি ফুটোফাটা বেছে কারিগরি করছি সরল বাঁশে;—নাচতে হবে ভাল করে তাই পায়ের নানা কায়দা শিখছি। ভাব নেই, ভাষাতে দখল নেই—ছন্দছাড়া হল সব। পাগলের প্রলাপ আর ওস্তাদের আলাপ দুয়েরই মূল হল ভাব যদিও তবু যে দুয়ে ভেদ করি তার কি কোনো কারণ নেই!

লেখার বেলায় দেখি যে চেক্ লিখছে আর যে ছবি লিখছে—দুয়ের কাজে ভেদ হচ্ছে সব দিক দিয়ে! তামাক আনতে দেরী হওয়াতে রেগে চাকরের নাকে ঘুসি বসালেম, আর অভিনয় করে স্টেজের উপরে উঠে একটা কারু বুকে ছুরি দিলেম—ভাবের বশে দুই ক্রিয়াই হল—কিন্তু

দুই কাজকেই এক শ্রেণীর কাজ বলে ধরা চলো না; চাকরকে মারলেম রাগের হেতু, নাটকের জগৎসিংহ হয়ে ওসমানকে মারলেম রসের খাতিরে, রাগের হেতুক মোটেই নয়। রাগের কারণে নয় রসের কারণে যে মার তাই হল স্টেজের মার বা মারের ভাণ মাত্র। এখন রস ও ভাব সৃষ্টির জন্য সকারণ মার বা সত্যিই মার যদি রঙ্গমঞ্চে গিয়ে দেওয়া যায় তবে রসের আগেই এসে হাজির হয় পুলিশ এবং লোকটাকে অকারণে প্রহারের জন্যে পড়ে হাতে হাতকড়ি—ভাবের দোহাই চলে না তখন, কেননা সত্যি সত্যি মার রস দেয় না বেদনা দেয়। মানচিত্র—ভাব জাগাবার কালে তাকে লাগানো চলো না, কোনো একটা জায়গার স্মৃতি তাও জাগিয়ে দিতে কাজে এলোনা মানচিত্র। চিত্রপট দিয়ে ভাব জাগানো চলো, স্মৃতি জাগানো চলো, রস জাগানো চলো। এমনি তারাপীঠ ত্রিপাট প্রভৃতি প্রতীক চিত্র তন্ত্রমন্ত্রের কাজে এলো কিন্তু ভাব জাগাবার কাজে এলো না, আবার নীলাম্বরের ভাবটা যখন দিলেম নীলাম্বরী সাড়িখানিতে—তখন সে রস জাগালো এবং সেটি হল নীলাম্বরের নিরস প্রতীক নয় কিন্তু আকাশের ভাবটার প্রতিমা; নীলাম্বরী সাড়ি তাকে আকাশের প্রতীক বলে এক হিসেবে ধরা চলে আবার চলেও না—সে প্রতীক হয়েও প্রতিমা, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের একটা যন্ত্র চিহ্ন সে কেবলমাত্র প্রতীক—বিশেষ নামে অভিহিত কতকগুলো রং ও রেখার সমাবেশ

নিজে সে কিছুর প্রতিমা নয় ভাবও জাগায় না, ভক্তেরই কাজে লাগে। প্রতিমা শিল্পের কৌশলই হচ্ছে রূপটাকে ভাবের প্রতিমা করে তোলাতে। একটা পোড়ামাটির পুতুল—তার সঙ্গে ভাব হয়, কেননা সেটা ভাবের প্রতিমা করে গড়া হয়েছে বলেই, কিন্তু বেশ করে পোড়ানো একখানা এগারো ইঞ্চি ইট বা টালি তার সঙ্গে ভাব হওয়া শক্ত সেটা ভাবের বস্তু নয় বলেই। আকাশ থেকে ঝরে পড়া এক পসলা জল, চোখের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়া এক বিন্দু অশ্রু ভাবের বস্তু এরা, কিন্তু নোনাধরা দেয়াল থেকে খসে পড়া এক চাংড়া বালি ভাবের বস্তু নয় অথচ নদীর বালুচর সেখানে বালি একটা ভাবের সৃজন করলে; বর্ষার শেষে আকাশে ভাসছে একটুকরো মেঘ সারা বর্ষার ভাবটা তাকে তখনো রাখলে মনোহর করে, পুরোনো শালের চমৎকার টুকরো, পুরোনো ছবি বৃদ্ধি চিনের বাসনের টুকরো যে ভাবে মনোহর তার চেয়েও ভাব সম্পদে মনোহর ঐ ছেঁড়া মেঘের একটি খণ্ড; কাজেই বলি ভাবের প্রতিমা যেটি হল সে অখণ্ড ভাবেও যেমন, খণ্ড ভাবেও তেমন, রস ও ভাবের বস্তু হয়ে রইলো। একটা ইটের পাঁজা—সে জাগাচ্ছে ভাব, একটা পাথরের স্তূপ পিরামিড় বা পাহাড়—তারা জাগাচ্ছে ভাব, একটা ভাঙ্গা বাড়ী—সে জাগাচ্ছে ভাব,—কিন্তু একটা ভাঙ্গা টালি কি ইট সে—ঝরা ফুলের পাপড়ি একটি যেমন ভাবের বস্তু—তেমনতরো ভাবের বস্তু বলে চলতে পারলে না। পুরো মানুষটা কি বাঁচা কি মরা দুই অবস্থাতেই ভাবের সঙ্গে এক হয়ে আছে—শুধু মানুষ কেন সব জানোয়ারের বেলাতেই এই কথা—কিন্তু মরামানুষের কি বন মানুষের হাড়—তার সঙ্গে ডাক্তারেরও পুরোপুরি ভাব হয় কিনা সন্দেহ, অথচ কঙ্কাল মালিনী তাঁকে প্রতিমাতে ধরেছে আর্টিস্ট ভাব দিয়ে কতবার কতভাবে কত ছাঁদে তার ঠিক

নেই, যাদুকরের সঙ্গে জড়িয়ে বনমানুষের হাড় জাগায় একটা ভাব। ভাবের ইতর বিশেষের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখ —এক থলী টাকা দেখে যে ভাব হয়, একথলী মোহর কি একখানা কোম্পানীর কাগজ দেখে ভাবটা সেই একই রকম হয় কেবল মাত্রাটা বেশী হয় মাত্র। অর্থ—যে রস দেয় খাদ্য, সে রস দেয়না অর্থ, একথাল মোয়া সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেয় এক থলী মোহর থেকে। যে সব জিনিষ নিয়ে মানুষ খেলে যাদের সঙ্গী করে খেলে লীলার এবং কাজেরও বটে এমন কি যাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলে পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গেই ভাব হয়ে গেল মানুষের—একটা কোনো না কোনো রকমের ভাব। ধূলো নিয়ে খেলে, ধূলো তুলে মুখে পোরে ছেলে—ধূলোর কাদার সঙ্গে ভাব তার রকম রকম দিক দিয়ে, এমনি টাকার সঙ্গে ভাব হ'ল কারু জুয়োখেলার দিক দিয়ে, কারু খাওয়া-পরার গাড়ি-ঘোড়ার স্বপ্নের দিক দিয়ে। প্রতিটির তারতম্য নিয়ে দেখতে গেলে দেখি —রসের রকম ভাবের রকম অনেকগুলো,—রস কেবল নয়টা নয় রস অনন্ত, ভাবও গোটাকতক নয় ভাব অনন্ত।

রূপের বেলায় শাস্ত্রকার বল্লেন "রূপভেদাঃ"—লক্ষ্য রইলো রূপে রূপে ভেদ নির্দ্দেশ করা। মান পরিমাণের বেলায় তেমনি বল্লেন "প্রমাণানি" বহুবচন দিয়ে নির্দ্দেশ করা হল ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্যে বহু প্রমাণ। ভাবের বেলায় বল্লেন 'ভাব যোজনম'—রূপকে ভাবের সঙ্গে যুক্ত করা চাই, ভাব যোজনা করতে হবে রূপে—এতে করে বোঝাচ্ছে যেভাবে রূপের সঙ্গে তার মান পরিমাণকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সে ভাবে ভাবকে পাচ্ছিনা—বস্তুরূপ রয়েছে একঠাঁই, ভাব রয়েছে অন্যঠাঁই; বলে থাকি—ভাবযুক্ত কথা, ভাবযুক্ত রূপ, ভাবযুক্ত লেখা, ভাবযুক্ত সুর সার ছবি মূর্ত্তি কাজের সময় কিছু একটা দেখে বলিও আমরা এটা ভাবযুক্ত অন্য কিছু সেটি ভাবযুক্ত নয়; সকালের ভাব সন্ধ্যার ভাব দিনের ভাব রাতের ভাব এসব বুঝতে দেরী হয় না আমাদের—জীবনটা দিন রাতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ওদের সঙ্গে খানিক ভাব করে নিয়েছে। এমনি আরো জগৎ-শুদ্ধ জিনিষ কারু সঙ্গে কাজের সম্পর্ক কারু সঙ্গে বা বাজে একটা সম্বন্ধ নিয়ে চেনা-শোনা ও পরিচয় করে যাচ্ছি আমরা। চেনা পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—যাদের কাছে পাই তাদের—ভাবের খানিকটা পেয়ে যাই সেই সূত্র ধরে, ক্রমে বন্ধুতা থেকে আত্মীয়তা পর্য্যন্ত ঠেকে গিয়ে ভাব উভয় পক্ষে। অবসরের অভাব ভাব বোঝার ব্যাঘাত ঘটায় অনেকক্ষেত্রে—কেরাণীর অবসর নেই সকাল সন্ধ্যা অন্তরে অন্তর মিলিয়ে ভাব করে নেওয়া, কবির সে অবসর আছে। সামান্য অবসর যেখানে তু একদিক দিয়ে অল্পভাব, অনেকখানি অবসর সেখানে বহুদিক দিয়ে অনেকখানি ভাব! সহজে ভাব করতে চট্‌করে ভাব ধরতে পাকা থাকে এক একজন—তারাই ভাবুক! পূজোর কনসেসন্ পেয়ে যেন আমরা সবাই ছুটেচি—নতুন নতুন দৃশ্য ও দেশের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন জিনিষ দেখতে দেখতে, সবাই কিছু আমরা ভাবুক নয় সুতরাং ভাব হয়েও হলনা। আমাদের যা দেখছি যা শুনছি যা নাগালের মধ্যে আসছে চোখের হাতের মনের তাদের সঙ্গে। ভাবুকের

বেলায় এমনটা হয় না, সে ভাব কুড়োতে কুড়োতে চলে যাত্রার আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত, সে যখন ছুটির শেষে দেশে ফেরে ফেরার পথেও ভাব করে নিতে নিতে আসে সবার সঙ্গে, ফিরে এসেও সে চলে নতুন থেকে নতুনের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে। আর আমি যে ভাবুক নয় আমি আসি মাত্র নতুন দেশ দেখে বেশ খেয়ে মোটা হয়ে শীত কি গ্রীষ্ম বেশ ভোগ করে, জলে স্থলে ঘুরে অনেকখানি স্বাস্থ্য নিয়ে, অনেকখানি ভাব নিয়ে নয়। একটা কিছুর তত্ত্ব জানা এক আর ভাব জানা অন্য—বিশ্বের শিল্পকলার পুরাতত্ত্ব জানলেম এবং তাদের ভাবটা জেনে নিলেম—এই নিয়ে তফাৎ ভাবুকে আর তত্ত্ববিদে।

কোনো কিছুর অন্তর্গত ভাব বাইরের কতকগুলো ভঙ্গী দিয়ে ধরা পড়ে। রচনার ভঙ্গীতে কথার ভঙ্গীতে সুরের ভঙ্গীতে ওঠা বসা চলা ফেরার ভঙ্গীতে ধরা পড়লো ভাব তবেই তো পেলেম মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুটির আসল রসটা। শাস্ত্রকার বলেছেন "যাহা গ্রীবা তির্য্যককরণ ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারি তথা ভাব হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশক তাহাকে "হাব" কহা যায়।" ভাব অন্তরের মধ্যে কুলুপ দেওয়া থাকে তো ভাব হয় না, কুলুপ খুলো তো ভাব হয়ে গেল এতে ওতে তাতে। হাবভাব হ'ল কুলুপ খোলার একটুখানি চাবি। বাইরের হাবভাব দিয়ে সহজে জানা গেল এবং জানান দেওয়া চলো মনে কি আছে। চোখের ইসারা হাতের ভঙ্গী ইত্যাদি সব ব্যাপার এবং গলার স্বর ইত্যাদি এরা হল ভাব প্রকাশের ভাষা—সকালের আকাশ সন্ধ্যার আকাশ জানাচ্ছে রং-এর ভাষায় নানা ভাব—একমাত্র ভাবুক জানে এই ভাষা যা দিয়ে মেঘ যাচ্ছে জানিয়ে ভাব, ফুল ফুটছে এবং ঝরছেও জানিয়ে ভাব। যখন কবি একটি গাছকে সবুজপরী বলে বর্ণনা করলেন তখন এটা হতে পারে যে কবি নিজের মনের ভাবটা গাছেতে আরোপ করে গাছকে দেখছেন পরীরূপ আবার এও হতে পারে যে গাছটি সত্য সত্যই আপনাকে ধরেছে কবির সামনে পরী সেজে। যাত্রার অধিকারি যখন যাত্রার পালার জন্যে গেল কবির কাছে তখন কবি নিজের কল্পনার সাহায্যে মনোমত করে পাত্র-পাত্রিদের সাজিয়ে ছেড়ে দিলেন—সেখানে রূপ সমস্ত কবির কল্পনার কবির ভাবের ধারায় মণ্ডিত হল—যেমন ভীমের কল্পনা রাবণের কল্পনা—ভীম ও রাবণ চাক্ষুষ হলনা কবির কাছে কিন্তু কবির দেওয়া সাজ ধরে এক একটা ভাব ও রস ভীষণ মূর্ত্তিতে। ধর কবি যখন বল্লেন উপমা দিয়ে—'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব"—এখানে ভাবটা তিনি মন থেকে আরোপ করছেন এও বলতে পার, আবার রূপের লতার মতো অনেক রূপসী রূপসীর মতো অনেক লতা প্রত্যক্ষ দেখে এই কথাগুলি কবি বলছেন এও বলতে পার। পঞ্চমুখি রুদ্রাক্ষ—রুদ্রের ভাবভঙ্গী আকৃতি-প্রকৃতি কিছুই নেই তাতে, অথচ শিবত্ব সম্পূর্ণ আরোপ করে দেখলেন ভক্ত, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র—তাতে দেখলেম সোনার থালের ভাবটা, ফুলে দেখলেম ফুলকুমারীকে, সেখানে নিজের মনোভাব বা কল্পনা আরোপ করে দেখতে হল না—ভাবটা বস্তু থেকেই পেয়ে গেলেম। এই ভাবে বলতে পারি আরোপিত ভাব এবং আহরিত

ভাব এই দুই রাস্তায় চলাচলি ভাবুকের মনের। কেন যে একটা ভাবে একটা কিছুকে দেখি আমরা, তার সঠিক হিসেব সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। পেঁচাটা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলা ফেরা করে চিৎকারটা বিকট পেঁচার সুতরাং নিশাচর বলে একটা ভয়ের ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে দেখার অর্থ বুঝি, কিন্তু কাক সে দিব্বি দিনের আলোতে দেখা দেয়, রংটাও তার কালো কৃষ্ণের মতোই সুন্দর, চিকণ কালো, কেন যে যমদূত ভেবে ভয় খেলে মানুষ তাকে তার অর্থই পাইনে। যার ভাবটা ঠিক বোঝা যায় না, তাকে ভয়ের ভাবে দেখি আমরা, আবার যা ভাল বুঝি না এমন গভীর রহস্যে ঘেরা কিছু সেও ভাব নিয়ে মনকে টানে! চাঁদনী রাত সেখানে ভাবুকের আনন্দ, হয়তো যে ভাবুক নয় তারও আনন্দ সুতরাং দুজনেই না হয় জ্যোৎস্না রাতকে একটা ফুটন্ত ফুলের মতো আনন্দরূপে বল্লে, কিন্তু রাত্রির ভাব বুঝিনে সবাই সেখানে, অন্ধকারে যে ভাবুক নয় সে ভয়ে চুপ রইলো কিন্তু ভাবুক—সে গভীর রাতের স্তব্ধ ভাব দেখে ভাবে বিভোর হয়ে কত কথাই ব'লে চল্লো দেখি!

দিনে বোধ করি চারিদিকে জাগ্রত ভাব, রাতে বোধ করি সুপ্তির ভাব এবং এই দুই ভাবেতে করে সত্যিই আমাদের ঘুম ভাঙ্গায় ঘুম পাড়ায়ও। উৎসবের রাত আলোতে আলো হল, নাচে গানে আনন্দে পরিপূর্ণ হল, ঘুম এলনা তখন—রাত পোহালো জেগে জেগে কোথা দিয়ে—কিন্তু যেমনি উৎসব বন্ধ অমনি আলস্যের ভাব এসে ধরল চেপে, ঘুম এল, ননমরা হয়ে থাকলেম শুয়ে যদিও জানি তখন বেলা দুপুরের জাগরণে সবাই জেগে বিশ্বে! বিচিত্র রকমে হয় ভাবের ক্রিয়া চরাচরের যা কিছু তার উপরে। একটা গাছ এক মনোভাব নিয়ে দেখলেম একরকম, পর মুহূর্ত্তেই অন্য ভাব নিয়ে দেখলেম সে অন্যরূপ! একই বস্তুকে আমি দেখি একভাবে তুমি দেখ অন্যভাবে। ফুলপাতায় সেজে এই দেখা দিলে গাছ একভাবে ফুলপাতা ঝরিয়ে দেখা দিলে সেই গাছই আবার অন্যভাবে!

আমরা কখন নিজের ভাবে চরাচরকে বিভাবিত দেখি কখন বা নিজের অন্তরকে বিভাবিত দেখি চরাচরের ভাবের ধারায়। ভাবুকের রচনা থেকে এবং আমরা নিজের নিজের কাছ থেকেও এর প্রমাণ পাই।

সূর্য্যের আলোয় রুদ্র তেজস্বিতা ইত্যাদি অনেক ভাব, চাঁদের আলোয় শীতল কান্ত নানাভাব। সূর্য্যের একটা রকম ভাব, জলের একটা রকম, আকাশের অন্যরকম ভাব! ঋতুতে ঋতুতে চরাচরের ভাব পরিবর্ত্তন এসব চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভাবের ক্রিয়ার। অবস্থাভেদে ভাবভঙ্গীর ভেদ ভাবের ভেদে নানা অবস্থাভেদের দেখা পাই আমরা—শয়ন, উপবেশন, গমন, গমনের ইচ্ছা, হাত মুখ চোখ ইত্যাদি নেড়ে বলা কওয়া, সভাতে গম্ভীর হ'য়ে বসা, পাতে বসে খাওয়া ভোজে, বর সেজে আগমন, তালঠুকে মারামারি করতে যাওয়া, খেলা করতে এগোনো, কোমর বেঁধে কাজ করতে চলা, নৃত্য করা ঘুরে ফিরে তালে তালে, যেন নাচনে এই ভাবে নড়ে

চড়ে ওঠা আনন্দে, ক্রীড়া কৌতুক নিদ্রা সব অবস্থাতেই ভাব এক এক রকম, ভঙ্গীও এক এক রকম—ভাব থেকে ভাবান্তর, অবস্থা থেকে অবস্থান্তর—এই হল চরাচরের গতিবিধির নিয়ম।

হাবভাব দিয়ে আসল ভাবটা ব্যক্ত করা হয় যেমন তেমনি আবার হাবভাব দিয়ে আসল ভাবটা—যেটাকে বলতে পারি স্বভাব অভিপ্রায় intention—তাকে গোপন করাও হয়—যে চাবি খুলে তালা সেই চাবিই বন্ধ করলে তালা; অভিনেতাকে নিজের ভাবটা ধরে চল্লে তো চলে না, কেননা নিজের মনোভাব যাই থাকুক সেটা গোপন রেখে নায়কের ভাবটা অভিনয় করে দেখাতে হয়—হয়তো বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনার চিন্তায় মুহ্যমান অভিনেতা কিন্তু দেখাতে হচ্ছে অভিনয় ক্ষেত্রে তাকে বেশ স্ফূর্তিবাজ নায়কের ভাব; চোর—মনে মনে তার কুভাব কিন্তু বাইরে দেখাচ্ছে সাধুর ভাব, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য; ছবিতে কবিতায় ভাব একেবারে গোপন রাখলে রচনার উদ্দেশ্য মাটি হয় কাজেই নানা বাহানা নানা ভঙ্গী দিয়ে কোথাও ভাবকে সুপরিস্ফুট কোথাও অপরিস্ফুট করে দিয়ে কাজ চালাতে হয়। ভাব ভাবাভাস, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ভাবসবলতা—এমনি ভাবের নানা দিকের কথা অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এসবই কাজে আসে আর্টিস্টের রকম রকম কাযের বেলায়; বিষয়টা এক কিন্তু কিভাবে তাকে প্রকাশ করা হল লেখায় বা চিত্রে—এই নিয়ে প্রভেদ এক রচনাতে অন্য রচনাতে চন্দ্রোদয় জলের ধারে সে এক ভাব, চন্দ্রোদয় বনের শিয়রে সে আর এক ভাব; "চন্দ্রোদয়ারম্ভমিবাম্বুরাশিঃ"—এ এক ভাবের ছবি—জলের ঢেউয়ের গুটিকতক টান আর পূর্ণচন্দ্রটির আভা জাপানের আঁকা ছবির ভাব। আবার "শরচ্চন্দ্র পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ" এখানে আর এক ছবি আর এক ভাব—যেন কাংড়ার কোনো শিল্পির আঁকা ছবিখানি, হুবহু সেই ভাব। এখন কবি কালিদাসের চন্দ্রোদয়ের ছবি থেকে পাচ্ছি জলরাশির স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত ভাব এপার ওপার নেই কেবল ফুলে ফুলে উঠছে জল আর জল, চাঁদ উঠি উঠি করছে এই ভাব এই ভঙ্গী এ অবস্থা। আবার ছেলে ভুলোনো ছড়ার অজানা কোন এক কবি—তার চন্দ্রোদয়—"দুলতে দুলতে বান এসেছে, জলে কত চাঁদ ভেসেছে সোনার বরণ সোনার চাঁদ!"—চাঁদের আলোয় কোন্ নদী বইছিলো গাঁয়ের ধারে সেই দেখে ভাব জাগলো গেঁয়ো কবির—কিন্তু কাজটা হ'ল আর্ট হিসেবে কালিদাসের চন্দ্রোদয়ের সমানই ভাবের জিনিষ। যে ভাবুক সে সব জিনিষেই ভাব যোজনা করে দিতে পারে, ভাব জাগাতেও পারে সামান্য অসামান্য সব জিনিষ দিয়েই: এক আঁজলা ফুল এক মুঠো পুঁতি বা মোতী এগুলোকে ভাব যুক্ত করে দেওয়া সহজ কর্ম্ম নয়।

প্রথম রাত্রে সুভদ্রার অভিসার অর্জ্জুনের কাছে নিষ্ফল হয়েছিল, তারপর আর্টিস্ট সত্যভামার হাতের একটু পরশ সুভদ্রাকে ভাবময়ী করে ছেড়ে দিলে তখন ভাব হয়ে গেল অর্জ্জুনে সুভদ্রায়! মালিনী—সে যে হার গেঁথে দিলে সুন্দরকে, তা তো শুধু ফুলহার হলোনা, ভাবের বেড়িও হল; শ্বেত পাথর গেঁথে গেঁথে ইমারৎ সাহেব কোম্পানিও করেছে কিন্তু কী পাথরের গাঁথনীই

গাঁথলে তাজের নির্ম্মাতা—যা দেখে ভাবে বিভোর হতে হয় আজও কবি অকবি সবাইকে। ইজীপ্তের পিরামিড তাকে কোনো অলঙ্কার দিয়ে সাজালে না আর্টিষ্ট, কেবল ভাবযুক্ত করে ছেড়ে দিলে; এক গোছা শুকনো পাতা—শীতের বাতাস তার রং ঢং সব হরণ করে মাটির উপরে ছড়িয়ে দিয়ে গেল শুধু একটু ভাবযুক্ত করে; এক পাট সাদা কাপড় তাতে সকালের শিশির ভাব দিয়ে বুনে গেল আর্টিষ্ট; বস্তু সামান্য ঘটনা সামান্য কিন্তু ভাবযোজনাতে করে অমূল্য অসামান্য অপরূপ হয়ে উঠলো সবাই। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের ঘরে বাইরে যথেষ্ট ধরা রয়েছে। ভাব দিয়ে ধূলো মুঠোকে সোণা মুঠো করে দিচ্ছে আর্টিষ্ট, এ রোজই ঘটছে চোখের সামনে আমাদের; ভাবুকের হাতে এক তাল কাদা, একখানা পাথর, একটা কাঠ যেমন ভাব পায়, রূপ পায়, তেমনিই কথাগুলো তেমনিই সুরগুলোও ভাব পেয়ে যায় রূপ পেয়ে যায় যখন তখন বলতে পারি বস্তু ভাষা ও সুর এরা পাষাণী অহল্যার মতো জেগে উঠলো ভাবের স্পর্শে;

ছবি যে লিখছে তার হাতে গোটাকতক রেখা আর তাদের গোটাকতক ভঙ্গী—দাঁড়ি কসি ইত্যাদি বোঝাতে রইলো উন্নত আনত অবনত এমনি গোটাকতক অবস্থা, এই নিয়ে ভাবুক সে কখন একটান কখন দুটান মিলিয়ে এক একটা ভাবযুক্ত রূপ লিখছে, রেখার ভঙ্গ দিয়ে জানাচ্ছে—বক দাঁড়ালো, বক উড়লো, বক ঘুমালো, উড়ি উড়ি করছে বক, চলি চলি করছে বক—এমনি নানা ভাব নানা ভঙ্গী গোটাকতক রেখায় খেলায়; ঝরণা ঝরছে সমুদ্র গর্জ্জন করে দুলছে সবার ভাব রেখার ফাঁদে ধরে নিচ্ছে—ভাবুক ও আর্টিষ্ট; দপ্তরীতে রেখা নিয়ে থাকা কিন্তু কই তার দ্বারাতো ভাবযুক্ত রেখা টানা কোনো কালেই হয় না। রূপের আর বস্তুর মূল্য তার ভাব সম্পদে না হলে একটুকরো পাথর ছেঁড়া কাগজ দুটো একটা রং বা রেখা তার মূল্য কি ?

রূপকথায় শুনেছি—পাতার ঠোঙ্গায় কোন্ এক রাজকন্যার একগাছি চিকণ কেশ—তাই দেখে বিভোর হল ভাবে রাজপুত্র; এটা রূপকথা সুতরাং কথার কথা বলতেও পারো, কিন্তু আকাশের প্রান্তে কাজল মেঘের সরু একটি টান সেটা দেখে যে কবির ভাব জাগে তার কি; শুনেছি চীন দেশে তারা একটা তুলির টান দেখে রস পায়—সাদা কাগজে একটি টান, অন্ধকারে একটি আলোর রেখা—এসব ভাব জাগায় কিনা পরীক্ষা করে দেখলেই পারো;

জোর করে কারু সঙ্গে ভাব হয় না, জোর করে রচনাতে ভাব ঢোকানো চলেনা। অভিনেতা কিম্বা গায়ক যখন একেবারে চোখ আকাশে তুলে কতকগুলো কৃত্রিম হাব ভাব করে তখন ধরা পড়ে যায় তার চেষ্টা আপনা হতে, এমনি ছবিতেও একটা যেমন তেমন কিছুকে খানিকটা ভঙ্গী দিয়ে ছবির নীচে বড় কবির একটা কবিতা জুড়ে টেনে বুনে ভাবযুক্ত ছবি করতে চলে রচয়িতার ও রচনার ভাবের অভাবই অনেকখানি ব্যক্ত করা হয়। আর্টিষ্ট নানা উপায়ে ভাব যোজনা করে থাকে রূপ রচনাতে, প্রথমতঃ ডৌল দিয়ে ভাবটা প্রকাশ হল, তারপরে

সাজসজ্জা দিয়ে ভাব প্রকাশ হ'ল, অঙ্গভঙ্গী ও সাজগোজ এই দুই দিয়ে ছবিতে মূর্ত্তিতে ভাবটা ধরা পড়লো।

কুটীর আর রাজবাড়ি দুটোর ভাব—ডৌল ও সাজ দুই মিলিয়ে একটা। সিংহদ্বারে আর খিড়কির দরজায় আঙ্গিক ভেদ এবং সাজ সজ্জাতেও ভেদ, এমনি অনেক সাজসজ্জা বোঝায় উৎসবের ভাব, সাজসজ্জার অভাব বোঝায় উৎসবের অভাব দীনতা কতকি। অভিনয়ের সময়ে পরীকে দৈত্যকে খালি সাজ ও ডৌল দিয়ে প্রকাশ করি যেমন তেমনি ছবি মূর্ত্তির বেলাতেও সাজের আর ডৌলের তারতম্য দিয়ে বোঝাই রূপের ভিন্নতা এবং ভাবেরও ভিন্নতা। পৈতের দিনে হঠাৎ ছেলেটা মাথা কামিয়ে গেরুয়া বসন দণ্ড কমণ্ডলু ধরে যে তরুণ দণ্ডী বনে যায় তার মূলে সাজ আর ডৌল ফেরানোর কায়দা। বিয়ের দিনে বরবধূর ভাবযুক্ত রূপ এই কৌশলেই প্রকাশ হয় চোখের সামনে। এগুলো হল সহজ উপায় আর্টিস্টদের হাতে, ভাব ফোটাতে চলে তারা নানা রং চং ইত্যাদি দিয়ে। এখন একটা দোকান ঘরের ভাব আছে, বসতঘরের ভাব আছে, দোকানীর তৈজসপত্র দিয়ে বোঝানো গেল দোকানটা, বসতবাড়ির নানা জিনিষ দিয়ে বোঝালেম এটা বসতবাড়ি, কিন্তু সাহেব কোম্পানির দোকান সেখানে বাড়ির ডৌল রাজবাড়ির মতো, ভিতরের সাজও যেন একটি ড্রয়িং রুম বৈঠকখানা কি দোকান, বোঝবারই জো নেই—এখানে দোকানি আসবাব খানিক জুড়ে তবে বোঝাতে হল এটা দোকান। কাজেই দেখতে পাচ্ছি কি বাইরের দৃশ্যটার ভাব কি নিজের অন্তরের ভাব দুই কাজেতেই আর্টিস্টকে ভাবোপযোগি রেখা রূপ প্রভৃতি জুড়ে দিতে হয় রচনাতে—একেবারে পরিকল্পনা বাদ দিয়ে কাজ হয়ই না। যেভাবে রাজা মহারাজা সত্যিও হয়তো বা একটা রাজ্যেশ্বর কিন্তু তার স্বাভাবিক ভাবখানা সাধারণ রকম সুতরাং রাজা বলে তাকে চালানোই চলোনা খালি ফটো দিয়ে কাজেই তার ডৌল মান পরিমাণ ভাব ভঙ্গী সব ফেরালেম তবে পেলেম রাজরূপটি রাজভাবটি।

কথাই আছে "কামালে জোমালে বর আর নিকোলে জুকোলে ঘর"। ডৌল ও সাজ ফেরানোর সঙ্গে ভাবের হের-ফের ঘটে ছবিতে মূর্ত্তিতে এটা জানা কথা। শুধু সাজ ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের অনেকগুলি দেবতার রচনা হয়েছে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবদেবী কেবল মুদ্রা আর সাজের পার্থক্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম হল। আবার ডৌলের ভিন্নতা নিয়েও অনেক মূর্ত্তি রয়েছে - যেমন, গণেশ কৃষ্ণ নটরাজ বুদ্ধ ইত্যাদি সমভঙ্গ ত্রিভঙ্গ অতিভঙ্গ মূর্ত্তি সব! বিষ্ণুমূর্ত্তি আর সূর্য্যমূর্ত্তি দুয়ের ভিন্নতা ভাব দিয়ে হল না কিন্তু সাজ-সজ্জার একটু-আধটু অদলবদল নিয়ে হল, আবার গণেশ আর বংশীধারি কিম্বা নটরাজ ও বুদ্ধ সবাই আলাদা আলাদা ডৌল নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা দিলে! এখন দেখি যে কোনো কিছুর ভাবটি নানা উপাদান নানা উপায় ধরে প্রকাশ করা চল্লো—একটা ঝরণার ভাব কোনো আর্টিস্ট ফোটায়—সেটি ঝরণা পাহাড় আকাশ ইত্যাদি নানা সামগ্রী জুড়ে একটা ছবি করে, আবার কোনো আর্টিস্ট শুধু মস্ত পটখানায়

গোটাকতক জলের ধারা মাত্র টেনে বুঝিয়ে দিলে ভাবখানা, কিন্তু দুই আর্টিস্টের কেউ ঝরণাকে বাদ দিয়ে কিছু করলে না শুধু একজন ঝরণার সঙ্গে তার আশ-পাশকে জুড়ে দেখালে, অন্য জন জলধারাটুকু মাত্র পৃথক করে নিয়ে ধরলে পটে—ঝরণা বাদ গেল না কোনো ছবিতেই। এইবার যাকে নিয়ে কথা, যার ফোটানো রূপ ও ভাব তার নিজ মূর্ত্তিটা বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র উপাদান দিয়ে তাকেই প্রকাশ কেমন করে হয় দেখ,—একটি সন্ধ্যার ভাব—দুখানা মাণিক আর একটি পিদুম দিয়ে ফুটলো, যথা,—"সায়মণির কোলে রতন মণি দোলে দুর্গাপিদিম জ্বলে"; শুধু কবিতাতেই যে এইভাবে তাকে ফোটানো চলে তা নয় সঙ্গীতে উপাদান উল্টে-পাল্টে ভাবের প্রকাশ যেমন—সকালের ভৈরবী সন্ধ্যার পূরবী কিম্বা গড়ের বাদ্যির মার্চ সুর দিয়ে সকাল, সুর দিয়ে সন্ধ্যা, সুর নিয়ে যুদ্ধ; মূর্ত্তি গড়ে এমনটা করা সহজ নয় তবু তাজমহলটা অনেককে বাড়ি না হয়ে নারী হয়ে দেখা দিয়েছে; অলঙ্কার শিল্পে এর প্রমাণ জলতরঙ্গ চুড়ি ও সাড়ি, গঙ্গাজলি কাপড় এমনি কতকি জিনিষে বর্ত্তমান; প্রতীক চিত্রেও এর নিদর্শন দেখি, যেমন পদ্ম-পত্রে জলবিন্দু জগৎ সংসারের ভাবটা বোঝালে।

এককে ভাবভঙ্গী সব দিক দিয়ে আরেকের প্রতিম করা এই হল সোজা রাস্তা ভাব রাজ্যের আর একটি রাস্তা হল প্রতীকের রাস্তা—কাক দিয়ে বক বোঝানোর মতো একটা রাস্তা—যাকে বলতে পারো ঘুরুণে রাস্তা। বাধা নেই কারু এই দুই পথেই চলার কিন্তু আর্টিস্ট না হলে চলতে গিয়ে পদে পদে ঠকতে হয় এবং অপ্রযুক্ততা, নিহতার্থতা, প্রতিকূলবর্ণতা, প্রসিদ্ধিত্যাগ, দূরান্বয়, প্রকাশিত বিরুদ্ধতা প্রভৃতি নানা অলঙ্কার দোষে ঠেকতেও হয়।

ভাবের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ নিয়ে নিয়েম রূপ সমস্তের সঙ্গে তবেই হল যথাভাবে পাওয়া, আপনার করে পাওয়া কোনো কিছুকে, এই জন্য অনেকে বলেছেন art is love আর্টের মূলে ভালবাসা, ভাব বুঝলেম তো ভাব হল এবং তা থেকে ভালবাসাও জন্মালো তখন তাকে নিয়ে ছবিই আঁকি, মূর্ত্তিই গড়ি, কবিতা গান যাই করি সেটি ভাল এবং ভাবের জিনিষ হল এবং অন্যের কাছেও আদর পেলে রচনাটি। প্রথম আপন করে নেওয়া ভাব করে তার পর সেটিকে সকলের আপন করে দেওয়া ভাব-যুক্ত করে এই হল কৌশল আর্টিস্টের; আমার আপন সে হল তোমারো আপন এই হল কৌশল আর্টের।

মায়া পড়ে যায় আমাদের অনেক জিনিষে কিন্তু যথার্থ ভাব হয় না তাতে করে—অনেক দিন যেখানে বাস, যাদের সঙ্গে ঘর-কন্না মায়া পড়ে তাদের উপর-ভাব থাক বা নাই থাক, কিছু আসে যায় না, অনেক বন্দীর কারাগারের উপরে একটা মায়া পড়ে যায় অনেক দিন সেখানে বন্ধ থেকে, পোষা পায়রার মায়া পড়ে যায় বিশ্রী খাঁচাটার উপর কিন্তু এতে করে খাঁচার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে পায়রার তা জোর করে বলতে পারিনে, কেননা "অঘটন পটীয়সী মায়া"—ঈশ্বর গুপ্তের মায়া পড়েছিল পাঁঠার উপরে এবং তিনি পাঁঠার উপরে কবিতাও লিখেছেন

কিন্তু সেটাকে কোনো দিন ভাবযুক্ত পদার্থ বলে ভ্রম হয় কারু ? খেলো হুকোর উপরে মায়া পড়েছে শতসহস্রের কিন্তু খেলো হুকো কোনো দিন ভাবের প্রতিমা বলে চলতে পারে এ বিশ্বাস কর কেউ ? মায়া দিয়ে একটা বস্তু যুক্ত হতে পারে কেবল আমারই সঙ্গে কিন্তু অন্যের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না। দেশটার উপরে মায়া আছে কিন্তু তাই বলে দেশটার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে একথা বলা চলে না। ভাবের জিনিষ সে মায়ার অতীত জিনিষ, কেননা সত্যভাবে তাকে লাভ করি আমরা এবং সেই কারণেই সত্য হয়ে ওঠে সে অন্যের কাছেও।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিন্দুস্থান

(   )

ঘুমায় হিন্দু ভারত-শ্মশানে, একি রে মৃত্যু, নিদ্রা নয় ?
পিশাচ-দানব হাসে খল খল, নাহিক তাহার শঙ্কা ভয়
কপট নিদ্রা কিম্বা এ কি রে—
মরণের ভয়ে চাহিছে না ফিরে ;
হেরে না উড়িছে তাহারেই ঘিরে
রক্ত-লোলুপ শকুনিচয় ;—
শিবা-সারমেয় আহারের লোভে লোল-জিহ্বায় দাঁড়ায়ে রয়।
ধিক্ এ ভয় !

(২)

হায়রে লজ্জা, মরণের মুখে মুমূর্ষু কহে শাস্ত্রবাণী,
শবে-শবে আজো রচে ব্যবধান, জাতি-জনমের গণ্ডী টানি !
গণ্ডূষ যেথা নাহি দিতে কেহ,
জল চলে কিনা সেথা সন্দেহ ;
করে দলভেদ হইয়া বিদেহ—
গত জনমের কীর্ত্তি মানি' ;—
শ্মশানচারীরা মানে লোকাচার, কঙ্কাল-ভারে মরিছে প্রাণী,
গণ্ডী টানি !

(   )

তুলনা থাক্, এ পরপদানত ভারতবর্ষ, নয় শ্মশান ;
শ্মশানে বিরাজে ভস্ম বিভূতি, পাবক অগ্নি বহ্নিমান।
হেথা ক্লেদ আর পঙ্ক গভীরে,
গলিত কুষ্ঠে নরের শরীরে,
আর্য্য হিন্দু গৌরবে ফিরে
লক্ষ লক্ষ কীট সমান ;
বাঁচে আর মরে এই ইতিহাস, চরণের তলে দলিত প্রাণ—
হিন্দুস্থান !

(৪)

হিন্দুরে আজ করিয়াছে গ্রাস, সিন্ধু সমান শাস্ত্রাচার -
জাতি-কঙ্কাল ভারতের বুকে স্থাপন করেছে পাষাণ ভার।
দূষিত হয়েছে ঘর ও বাহির,
নাহিক আকাশ নাহি সুখ-নীড় ;
বহে না হেথায় মুক্ত সমীর—
আলোহীন ঘোর অন্ধকার
মৃত ও অতীত অর্গল সম ভবিষ্যতের রুধেছে দ্বার—
শাস্ত্রাচার।

(৫)

কোথায় সাধনা, কোথা পূজারতি ভারত জুড়িয়া ভারতী কাঁদে
কে বাঁধিল হায়, মুক্ত-চেতসে অজ্ঞানতার মোহের ফাঁদে !
মগ্ন দেউল পুরোহিত দলে,
প্রণাম করিয়া আজিকে সে চলে,
ভিক্ষার ঝুলি সন্ন্যাস ছলে
নাহিক লজ্জা লইতে কাঁধে।—
ধরা দেয় যেবা সেই পড়ে ধরা, মুক্তি-কামীরে কেহ না বাঁধে—
মোহের ফাঁদে।

(৬)

অন্তঃপুরেতে ক্রন্দন রোল নারীর মহিমা লুটায় ভূমে—
পরাধীন জাতি, 'শক্তি' তাহার বিগত-চেতন মোহে ও ঘুমে।
নারীই নারীর করে দুর্গতি,
হায় রে ভ্রান্তি হায় দুর্মতি,
পতি-উৎপাতে পথে চলে সতী
মুক্তি খুঁজিছে চরণ-চুমে।
বাহিরের ধূলি স্পর্শে না তারে, সে আছে অন্ধ ঘরের ধূমে,
মোহে ও ঘুমে।

(৭)

হোথা দক্ষিণে কাঁদিছে শূদ্র যুগ যুগ সহি' অত্যাচার—
মানুষের ভয়ে মানুষ লুকায় সভয়ে ঢাকিয়া ছায়াটি তার।—
বাজায়ে ঘণ্টা চলে পথ'পরি—
সহে অপমান যুগ যুগ ধরি',
উচ্চে তাহার দেবতায় স্মরি'
অক্ষম, সহে ব্যথার ভার!
গাহে জনমের দুষ্কৃতি ভাবি' চাহে না বিচার লাঞ্ছনার—
এ দোষ কার?

(৮)

হেথা বাঙলায় অন্ন-কাঙাল বাঙালী মরিছে আপন দোষে;
বিদেশী লইল রক্ত শুষিয়া বুদ্ধি গর্ব্বে সে রহে ব'সে!
শুধু বক্তৃতা বৃথা হুঙ্কার—
আপনি খুলিছে মৃত্যুর দ্বার;
দস্যু পলায় সব লুঠি তার
গর্জ্জে সে পিছে মিথ্যা রোষে।
মৃত্যু আঁধার ঘনায় শিয়রে সে আপন ক্ষয় আপনি শোষে;
একেলা ব'সে।

(৯)

মস্তকে বহে পর-লাঞ্ছনা আত্মকলহ তবু না ছাড়ে,
পৃষ্ঠে পড়িছে পদাঘাত যত পদমর্য্যাদা ততই বাড়ে !
বাহিরে যতই পরে শৃঙ্খল,
ভিতরে গণ্ডী ততই প্রবল ;
বিজাতির কাছে যত হীনবল—
জাতি ভূত তত চাপিছে ঘাড়ে ;—
আপনার জনে বঞ্চিত করি' বিচার খুঁজিছে পরের দ্বারে,—
মূর্খ হা রে।

(১০)

সাধনার লাগি' শক্তি নাহিক মন্ত্রে করিবে বিশ্ব জয় ;—
মরণের টীকা না পরি' ললাটে বিজয়-মুকুট কে শিরে বয় ?—
রহিল আজো যে নিজ গৃহ কোণে,
রক্তের লোভ মিছা তার মনে !
বৃথা এ হিংসা সার্থক জনে
সে আজি বিজয়ী করেনি ভয় ;
বিদারণ যে না করিল তিমির, তিমির-গর্ভে সে হবে লয়—
সুনিশ্চয় !

( )

শক্তি হারায়ে লুব্ধ ভারত, অক্ষম দেখে স্বপন কত,
মুক্তি হারায়ে আপনার দোষে বিজয়ী-চরণ-সেবন-রত !
হয়েছে সে আজ পদানত যার—
তর্কে তাহারে বলে বার বার,
“অন্যায় তব এই ব্যবহার—
স্বাধীনতা মোর জন্মগত।”
ক্ষমতায় যেবা পারিল না নিতে, ভাল তার নেওয়া ভিক্ষাব্রত—
দীনের মত।

(১২)

মৃত্যু তাহারে ঘেরে চৌদিকে আপন দীনতা ভুলিল ও যে—
দেহে মনে যেবা হ'ল দুর্ব্বল, বচন-বিলাসে স্বস্তি খোঁজে ;
সোজা পথে যেবা আজো চলিল না,
তাহার দিবস হয়ে গেছে গণা ;—
কে দিবে তাহারে আলোকের কণা
আলোকে ব'সে যে চক্ষু বোজে ;
কে হইবে তার কল্যাণ-কামী নিজ কল্যাণ যে নাহি বোঝে—
ভ্রান্তি ও যে।

(১৩)

বৃথা আক্ষেপ মৃতের শিয়রে শকুনি গৃধিনী উড়িছে ওই
চিতার অনল ধূ ধূ ধূ জ্বলিছে ভূত প্রেত নাচে তাথৈ থৈ !—
শব মাঝে সবে মৃতের সমান—
আছে কি মানুষ, আছে কি রে প্রাণ ?
কে জাগাবে তারে বাজায়ে বিষাণ—
কোথায় পিণাকী শম্ভু কৈ ?
কোথা শঙ্কর শঙ্কাহরণ, বজ্রনাদে কে ঘোষে মাভৈঃ—
শম্ভু কৈ ?

(১৪)

অতীতের কথা কে গাহিবে আজ, চৌদিকে হেরি মহা শ্মশান,—
কে রচিবে দূর ভবিষ্যতেরে জ্ঞান-গরিমায় দীপ্তিমান—
মৃতের শরীরে কে আনিবে প্রাণ,—
ভয়াতুর জনে কে করিবে ত্রাণ,
জাগাবে সবলে কার আহ্বান,
জড়েরে করিবে চেতনাদান !—
বিগত ভুলিয়া ধূলি-শয্যায় লুটায় ঘৃণিত বর্ত্তমান—
মহাশ্মশান।

(১৫)

সোনার আগারে জাগে মহামারী ঘরে ঘরে আজ জ্বলিছে চিতা,
সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী অসুরের ভয়ে আজি কি ভীতা ?
কোথা শিব কোথা পতিতপাবন,
কে নিবারে আজ মৃত্যু-প্লাবন
কোথা শঙ্করী, দানব রাবণ
ঘরে ঘরে আজ হরিছে সীতা !
কোথা শ্রীকৃষ্ণ মৃত এ জাতিরে জাগাবে শোনায়ে জীবন-গীতা—
নিভাবে চিতা।

(১৬)

পাবন বহ্নি জ্বলিয়াছে ওই জ্বলে ভারতের অশুচি-ভার,
মৃত্যু ছেদিয়া শাশ্বত হোক্ মৃত্যুমথন সাধন তার।
ভস্ম-তিলক মাখিয়া অঙ্গে,
শঙ্কা দলিয়া যাক্ ভ্রূভঙ্গে,
যাত্রা করুক সবার সঙ্গে
বিদারণ করি, অন্ধকার !
মৃত্যুও যেন হয় মহীয়ান্ কণ্ঠে পরায়ে মৃত্যুহার--
পুরস্কার।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গিরীশ-স্মৃতি

(৪)

সেদিন—পয়লা বৈশাখ। ঠিক সন্ধ্যা বেলায় গিরীশবাবুর বাড়ীতে গিয়ে জান্তে পার্লেম গিরীশবাবু থিয়েটারে চ'লে গেছেন। আমি তাঁর বোসপাড়ার বাড়ী থেকে শ্যামবাজারের ঠিক মোড়ের মাথায় যখন এসেছি—তখন পেছন থেকে আমার নাম ধ'রে যেন কে ডাক্ছেন শুন্তে পেলাম। স্বর—পরিচিত, পিছনে তাকিয়ে দেখি গিরীশবাবু হন্ হন্ ক'রে আমার দিকে চ'লে আস্ছেন। নিকটে এসেই বল্লেন—"তুমি যাচ্ছ কোথায়?" আমি বল্লাম—"আপনার বাড়ীতে গিয়ে শুন্লাম যে আপনি থিয়েটারে চ'লে গেছেন—তাই বাড়ী ফিরে চলেছি।"

গিরীশবাবু। এখন আবার ফিরে চল। এই ব'লে তিনি দ্রুতপদে চল্তে লাগ্লেন। গিরীশবাবুর সঙ্গে হেঁটে পথ চলা একরকম ব্যায়াম বিশেষ। তিনি আদৌ ধীর মন্থর গতিতে চল্তে পার্তেন না। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি দ্রুতগতিতে চল্তেন।—তখন তাঁর বয়স ৬৩।৬৪ বৎসর হ'বে। হাঁপানী রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ—কিন্তু তাঁর সঙ্গে দ্রুতগতিতে চল্তে ২৫।৩০ বৎসরের যুবককেও ক্লান্ত বোধ কর্তে হতো। রাস্তায় চল্তে চল্তে বল্তে লাগ্লেন—"দেখ ম্যাদাটে ভাবটা আমি একদম পছন্দ করিনে,—কি চলা-ফেরায় কি কাজ-কর্ম্মে—কি আহারে-ব্যবহারে!"

আমি বল্লাম, "মশায়! আপনার সঙ্গে চলা রীতিমত exercise!"

গিরীশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কেন?—সবাই তো বলে walking is the best exercise, ঢিমে তালে চল্লে কি exercise হয়? একটু পরিশ্রম হ'লে ঘাম বেরুলে শরীর ঝরঝরে হয়, গায়ে স্ফূর্ত্তিবোধ হ'বে। বাতাসটা গায়ে লাগ্লে মনকে সতেজ ক'রে তুল্বে।"

এইরূপ কথা বল্তে বল্তে তাঁর বাড়ীতে এসে পৌঁছিলাম। তিনি হলঘরে বস্তে ব'লে—তাঁর স্বীয় প্রকোষ্ঠে গেলেন। এই প্রকোষ্ঠটী হলঘরের সংলগ্ন, কাঠের পর্দায় বিভক্ত ছিল। কয়েক মিনিট পরে তাঁর সেই প্রকোষ্ঠ থেকে পুনরায় হলঘরে প্রবেশ ক'রে তাঁর বিছানার উপর এসে বস্লেন।

তাঁর এই হ'লঘরের একটু বর্ণনা করা বোধ-হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—তাঁর সুবৃহৎ বোস্পাড়ার বাড়ীটীর দোতালার উপর এই হলঘর। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই দেখা যায় সাম্নে খোলা ছাদ—উত্তর দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বালম্বিভাবে ঘর এবং সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠ।

উত্তর দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা ঘরটীই কথিত হলঘর। এই ঘরে লম্বা ফরাস সতরঞ্চী ও কার্পেট পাতা থাক্তো এবং ঘরের ভিতরের পূর্ব্ব দিকে প্রায় কাঠের পর্দা স্পর্শ ক'রে গিরীশবাবুর বিছানা থাক্তো। গিরীশবাবু সচরাচর পশ্চিমাস্য হ'য়ে কথা বল্তেন। তাঁর বিছানার পশ্চিম পাশে

ইংরেজী বাংলা সাহিত্য মাসিক পত্র এবং অন্যান্য হস্তলিখিত পুঁথি ও চিঠি দোয়াত কলম থাক্‌তো। গিরীশবাবুর বিছানার উপরে দুটো বড় তাকিয়া এবং ফরাসের উপরও ২।৩টা তাকিয়া ছিল। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন—তাঁরাও তাকিয়া হেলান দিয়ে পান-তামাকে আপ্যায়িত হ'তেন। গিরীশবাবু সে সময় তামাক একেবারে খেতেন না—তাঁর হাঁপানী রোগের জন্য ডাবর পিক্‌দানী সম্পর্কই বেশী ছিল—অন্য জিনিষ বড় ব্যবহার করতেন না। এই হলঘরের পশ্চিম ও উত্তর কোণে কয়েকটী আলমারী ছিল—বেশীর ভাগ হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ এবং Encyclopædia Britannicaতে সেগুলি পরিপূর্ণ ছিল।

গিরীশবাবু বল্লেন—"দেখ একটু আধটু হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ক'রে বুঝ্‌তে পারচি আমাদের সমাজে কি ভীষণ পাপ প্রবেশ ক'রেছে। অনেক ভদ্র পরিবারে লুকেরিয়া ব্যারাম। মানুষ দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিপরায়ণ হ'লে সে যে শুধু একা ভোগ করে—তা নয়। তার পাপের ফল স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদি বংশক্রমে ভোগ ক'রে। ইচ্ছে আছে নাটকে এই বীভৎস পরিণাম আঁকবার—সমাজ হিসেবে, জাত হিসেবে, স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ হিসেবে, মানুষ হিসেবে কতটা সংযম আর ত্যাগের দরকার তা দেখাবার ইচ্ছে আছে। সমাজ complex হওয়াতে সব problemই complex হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—মূলতঃ তাই বোধ হয়। কিন্তু আমার মনে হয় কি জান—সংযম, ত্যাগ, সরলতার উপর সমাজের ভিত্তি দৃঢ় না হ'লে—বালির উপর প্রাসাদ-নির্ম্মাণ মাত্র।—জানবে যেখানে লুকোচুরী—সেখানেই পাপ।

আমি। সমাজের আদিম অবস্থায় অবশ্য সরলতা স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষা সভ্যতা বিস্তারে—নানা জাতের সংমিশ্রণে—মানুষের ভেতর সেই আদিম-সরলতা তো থাক্‌তে পারে না।

গিরীশবাবু। কিসে জান্‌লে পারে না? যে-শিক্ষায় মানুষকে অসরল কর্‌বে, যে-সভ্যতায় মানুষকে কপটতা শেখাবে, যে-সংমিশ্রণে মানুষের ভাবকে গুলিয়ে দেবে—তা জানবে উন্নতির পরিপন্থী। গুলিয়ে যাওয়া, compelx হয়ে যাওয়া—উদ্দেশ্য নয়। আমার মনে হয় কি জান—কালের ধর্ম্মে সব রকম এসে পড়্‌বে, কিন্তু হিন্দুর আদর্শ—সনাতন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, complexityর মধ্যে simplicity, conventionalityর মধ্যে reality এই সত্য ভারত প্রচার করচে আর কর্‌বে। এই জড়বাদ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মাঝে ঠাকুর নিরক্ষর হয়ে সরলতার অবতার হ'য়ে এসেছিলেন। নানা ভাববহুল সমাজ বিক্ষুব্ধ সহরের পাশে দীনহীন পূজারী হ'য়ে এসেছিলেন, Indiaর সনাতন message যা তা দেখিয়ে গেছেন।

আমি। কিন্তু আজকাল তো সবাই বলচে, প্রাচীনতার জীর্ণ কঙ্কাল খসে পড়্‌বে—নূতন জীবন নিয়ে বর্ত্তমান অগ্রসর হবে।

গিরীশ বাবু। তা তো ঠিক কথা। যে জিনিষগুলো বাইরের আবরণ প্রাণশূন্য নির্জ্জীব তা তো কালপ্রভাবে জীর্ণ হ'বেই হ'বে। এই সামনে উন্মুক্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখ—

কমণ্ডলু নিয়ে চলেছে—এক [illegible] পাতা সবুজ হয়ে দেখা দিলে আবার সব শুকো হ'য়ে ঝরে পড়্‌লো। আবার হাজার হাজার বছর অতীত হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতি তেমনি সবুজ হ'য়ে আছে,—গাছ পালা ফল ফুলে তেমনিই সজ্জিত। তার মানে কি? জীবনের খেলা চল্‌চে। জীবনের রসধারা শুকোয়নি, মরেনি—নানারূপে নূতন-নূতন হয়ে তা প্রকাশ পাচ্ছে। তেমনি ভারতের বাণী—যুগে যুগে নানাভাবে নানারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এক যুগে যা প্রকাশ পেয়েছে পরের যুগে তাই আবার নূতন হয়ে সেই সত্য জেগেছে। শুধু রূপান্তর। চিনতে ভুল হতে পারে, কিন্তু সেই পুরাতনই নূতন হয়ে আসে। তাই ঠাকুর বলেছেন—"সব শেয়ালের এক রা।"

আমি। সেটা শুধু ভারতের কথা বল্‌ছেন কেন? সেটা তো জগতেও ঘট্‌চে।

গিরীশবাবু। দেখ কোথাও দেখ্‌বে ধূ ধূ করচে তেপান্তর মাঠ, কোথাও বালির স্তূপ মরুভূমি, কোথাও কাঁটাবনের পর কাঁটাবন, কোথাও পাহাড়, কোথাও নদী, আর কোথাও সাগর। প্রকৃতিতে যেমন এই বিচিত্র বিকাশ দেখ্‌তে পাও—তেমনি মানুষের ভিতর নানা ভাবের নানারূপের প্রকাশ পেয়েছে। এই ভারতে ঋষি মহর্ষির স্থান—ধর্ম্মবীরের স্থান—দার্শনিকের স্থান। অবতার মহাপুরুষ যত ভারতবর্ষে জন্মেছে এত আর কোনও দেশে জন্মায়নি—এ কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। এদেশের এমনি আবহাওয়া যে, অতি দীন-দরিদ্রও উচ্চ চিন্তা ও রসের অধিকারী হ'তে পারে। এসব কত যুগ-যুগান্তের সাধনার আর শিক্ষার ফল।

আমি। আমাদের দেশে যাত্রা কথকতা ও পাঠে যেমন শিক্ষার প্রচার করতো তেমন কিন্তু আপনার থিয়েটারে করে না। থিয়েটারটা বিদেশী-আমদানী।

গিরীশবাবু হেসে বল্‌লেন "এখনকার থিয়েটার পাশ্চাত্য-প্রভাব-সম্পন্ন বটে। কিন্তু নাটক অভিনয় রঙ্গালয় এ সব তো অনেক কাল থেকে চ'লে আসচে। মুসলমান রাজত্বে এটা চাপা পড়েছিল—এই মাত্র। এই যে থিয়েটার—এটা কেবল শুধু বিলিতির অনুকরণ নয়। আকারটা পাশ্চাত্য ভাবে, কিন্তু প্রাণটা—ভাবটা—দিশি। সাবেক আর আধুনিক ভাবের সমন্বয় থিয়েটারের অনেক improvement কর্‌বার ও নূতন নূতন ভাব দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা হ'য়ে উঠ্‌লো না।

আমি। আপনি বোধ হয় West-এ ঘুরে এলে stageএর অনেক improvement কর্‌তে পার্‌তেন।

গিরীশ বাবু হেসে বল্‌লেন, "বাবা! বিলেত-ফিলেত যেতে হয় না। এই মাথার ভিতর যা ছিল তাই দিয়ে যেতে পারুচি না—দেশের লোকের apathyর জন্য আবার বিলেত গিয়ে বিলেতী idea! দেখ, আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক দেশের মাটি বীজ জল আর হাওয়া নিয়ে যেমন ফল-ফুলের গাছ হয়, তেমনি প্রত্যেক জাতের—তার ভাবের সাধনানুযায়ী—ভাষা শিল্প বিকাশ পাবে। শেক্ষপীর যদিও আমার আদর্শ তবুও আমার নিজের একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাব আছে। যে-দেশে জন্মেছি যে-ভাবে বর্দ্ধিত হয়েছি যে-আবহাওয়ায় বড় হয়েছি ভাব্‌তে শিখেছি, যে-দেশের শিক্ষা

আদর্শ আর রস আমাদের হাড়ে-মাসে জড়িয়ে আছে—তার একটা ছাপ আছে। ঠাকুরের দর্শন পেয়েছি, স্বামিজীর দর্শন পেয়েছি, সঙ্গ করেছি—তার একটা ছাপ আছে। আর একটা কথা। দেখ, rivalry-তে প্রতিভার বিকাশ হয়—struggle আসে কি না। শেক্সপীয়রের সময় Ben Johnson প্রভৃতি dramatist ছিল—যাঁরা শেক্সপীয়রের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু বাংলার নাট্যজগতের আসরে আমি একা প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন।" নিজেকে নিজের সঙ্গে rivalry করতে হ'য়েছে। যে-বই সাধারণে জমেছে, তাকে উচিয়ে যাতে আরও ভাল হয় এই রকম ভাব এনে লিখতে হ'য়েছে, সেটা যে কতটা অসুবিধে তা ব'লে বোঝান যায় না।

আমি। মশায় এটা কিন্তু একটা নূতন কথা শুনলুম। আপনি নিজেকে নিজে rival ক'রে নাটক লিখেছেন!

গিরীশ। হাঁ সত্যি। বই লিখে কখনও এ গর্ব্ব আসে নি—কি লিখেছি দেখ। রান্না করা যেমন! যে রাঁধে সে প্রাণপণে ভাল রাঁধতে চেষ্টা করে, কিন্তু খেয়ে তোমার ভাল লাগবে কি না—তা কি রাঁধুনি জোর ক'রে বলতে পারে? তেমনি বই লেখা;—যা বলবার কথা, তা ঠিকমত বলতে author চেষ্টা ক'রে—প্রাণ দিয়ে চেষ্টা ক'রে—public নেবে কি না তা কে মাথার দিব্যি দিয়ে বলতে পারে?

আমি। কিন্তু ভাল বই লিখে গ্রন্থকার তো বুঝতে পারে; এটা ভাল হয়েছে, একদিন না একদিন এর সমাদর হবে। মাইকেলও বলেছিলেন

“—গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।”

গিরীশবাবু। সেটা তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের গর্ব্ব। যে নূতন ছন্দে তিনি ভাষাকে সতেজ করলেন—সে ছন্দের এক দিন না একদিন আদর হ'বে—তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তা ছাড়া through inspiration-এ কবি লিখে যান—যেটা মা ভারতী স্বয়ং লিখিয়ে দেন, কবি নিজের বড়াই করবার জন্য লিখেন না।

আমি। inspiration-এ লেখা কি রকম।

গিরীশবাবু। কবি সেখানে কলের পুতুলের মত লিখে যায়। সেগুলো আগে ভেবে চিন্তে রাখা যায় না, কিন্তু লেখবার সময় কোথা থেকে নদীর বানের মত বেগে বেরিয়ে আসে। কবি তা প'ড়ে দেখে নিজেই অবাক হয়। তখন সে বুঝতে পারে, এ লেখা আমার চেষ্টায় হয় নি—আর এক জনের শক্তিতে লিখেছি। বাবু হরিনাথ দের সঙ্গে সেদিন এই সব আলোচনা হ'য়েছিল।

আমি। শুনেছি হরিনাথ বাবু আপনার খুব admirer.

গিরীশ। “যে নিজে বড় সে সবাইকে বড় ভাবতে জানে। হরিনাথ বাবু আমাকে

শেক্সপীয়রের অপেক্ষা অনেক উঁচুতে place দেন।" গিরীশবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন "বলেন কি জান, আপনি এ-দেশে জন্মেছেন, তাই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতির চরিত্র আঁকতে পেরেছেন—এ সব character শেক্সপীয়র কোথায় পাবে? এই রকম সব কথা বলেন।"

আমি। আপনি যে চিরকুমার সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্যকে নাটক লিখে থিয়েটারে খাড়া ক'রেছেন, অনেকে তাতে অবাক হয়েছে।—কেউ বলে ইংরেজী হিসেবে এটা drama হয় নি।

গিরিশবাবু। নাটকের জ্ঞান তাদের টনটনে। দেখ শঙ্করাচার্য্য লিখে আমার নূতন-ভাবে নাটক লেখ্‌বার ইচ্ছে হয়েছে। সাধারণতঃ গল্পের প্লটে এই দাঁড়ায়,—অমুকের সঙ্গে অমুকের love হ'ল—অমুকের জন্য অমুকে মরেন—তিনি হয় তো ফিরে তাকান না—নায়িকা হয় তো বিপদে পড়্‌লেন, নায়ক এসে উদ্ধার করলেন—এই তো সব স্থূল ঘটনা।—কিন্তু শঙ্করাচার্য্য লেখার পর আমার নূতনভাবে লেখ্‌বার ইচ্ছে হচ্ছে। কুমারিল ভট্টের সব facts সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে সেই মত লিখ্‌বো মনে কর্‌চি।

আমি। আচ্ছা মশায়, নূতন ভাব কি? কি ভাবে নাটক লিখ্‌তে চান?

গিরিশবাবু। শুধু internal facts and internal struggle. দেখ, যীশু খৃষ্ট, চৈতন্য, বুদ্ধ, শঙ্কর, কুমারিল ভট্টের জীবনে বাইরে dramatic events, নাই বল্‌লে চলে। কিন্তু এঁদের ভিতরের জীবন full of dramatic actions. যা নিয়ে জগৎ ভুলে আছে—যে কর্ম্ম সাধনে জগৎ দৌড়ুচ্ছে—এই সব মহাপুরুষরা তা তুচ্ছ মনে করে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর কঠোর কর্ম্ম-সাধনার প্রবল সংগ্রামে বিজয়ী হ'য়ে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আদর্শরূপে দাঁড়ান—তা' কম dramatic নয়! এই যে ভিতরের ঘন internal dramatic actions—যা সামান্য স্থূলভাবে বাইরে প্রকাশ পায়, সেই internal actions এঁকে দেখানোই best literary art. যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তবে তা হবে।

আমি। আপনি যে internal struggle দেখানোর কথা বল্‌ছেন—তা তো সব drama বা নভেলে দেখানো হয়।

গিরীশ। না—না—তুমি বোঝনি। আমি ঠিক express করতে পার্‌চি কি না জানিনি। এখন দেখান হয় বাইরের ঘটনাকে prominent ক'রে মনের বিশ্লেষণ। তা নয়। Actions—through mind—actions in internal life—actions—intense actions in deep meditation. —যে সাধনায় বাইরের রূপ স্নিগ্ধ গম্ভীর নীরব নিষ্কম্প দীপশিখার মত কিন্তু ভিতরে অনন্ত ক্রিয়াশীল—তাই দেখাতে হবে—যে বীরত্বের কাছে নেপোলিয়ানের বীরত্ব তুচ্ছ, যে আত্মা মরজগতে অমরত্ব স্থাপন করে—যে প্রেম ভালবাসা সমুদ্রের ন্যায় গভীর প্রশান্ত—তাই—dramaতে তাই দেখাতে হবে।—কি জান, যে-জিনিষটা সবাই তুচ্ছ ক'রে উদাসীন থাকে—ভাবে বা সাহিত্যের জন্য নয়, সাহিত্যের বীজ অনেক সময় তারই ভিতর থাকে। সাহিত্য মানে অনেকে ভাবেন, নায়ক

নায়িকার প্রণয় কিম্বা স্থূল জগতের যে-কোনও বৈচিত্র্যময় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ জীবন,—তা নয়। মহাপুরুষদের সাধনা full of dramatic actions—মহাপুরুষদের জীবন full of internal dramatic events এবং তাঁরা যে রস সম্ভোগ করেন তার আস্বাদ দেওয়া সব রসের চরম দান। কাব্য বা সাহিত্য রসাত্মক বাক্য বা ভাবের ব্যঞ্জনা। সেই রসস্বরূপের পরমানন্দদায়ক রস যিনি দিতে পারেন—তিনিই প্রকৃত artist.

আমি। আচ্ছা মশায় এই রসটা কি? শাস্ত্রে তো দেখি—রসো বৈ সঃ আমরা সাদা কথায় বুঝি তিনি রসস্বরূপ? কিন্তু রসটা কি?—

গিরীশবাবু। রসই নিখিল প্রাণ-প্রবাহ। এই বিরাট বিশ্বের—বহির্জগতের অন্তর্জগতের—রসই প্রাণশক্তির অনন্ত নির্ঝরিণী। তার ধারা আনন্দময়। আনন্দে তার স্ফূর্ত্তি। যতক্ষণ না মানুষ রসের সন্ধান পায়—ততক্ষণ তার প্রাণশক্তির স্পন্দন হয় না—আনন্দের বিকাশ হয় না। যিনি সকলের প্রাণের প্রাণ—আনন্দঘন মূর্ত্তি—তিনিই রসস্বরূপ। তাই ভগবদ্ভাবে রসিক ভক্ত সেই রসময়ের চিন্তায় পরমানন্দ ভোগ করেন। ব্রহ্মানন্দ ভক্তি—পরম প্রেমিকের প্রেমবিকার—এই রসানুভূতির স্ফূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় রসের চরম বিকাশ। বিমল আনন্দেই রসের বিকাশ।

আমি। কিন্তু কবির বা শিল্পীর রসও কি তাই?

গিরীশবাবু। নিশ্চয়ই। এই জগতটা তো তাঁরই প্রকাশ। ফুলটা পাখীটা মানুষটা—প্রকৃতির যে কোন পদার্থে বা জীব জন্তুটীর ভেতর প্রাণ শক্তির খেলা। কবি বা শিল্পী যে কোনও জিনিষের ভিতর যখন সেই শক্তিটা জাগিয়ে তোলেন—তারই ইঙ্গিতে তোমারও প্রাণ স্পন্দিত হয়—সেই রসে তুমি মজে যাও—আনন্দের ধারায় মেতে যাও। তোমার ভেতরেও যে-সে-রস বিদ্যমান রয়েছে—তাই সমজাতীয় ব'লে সহানুভূতির উদ্রেক করে। স্বজাতীয় বাৎসল্য গুণে আনন্দ উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে তোমার emotion feeling-এর নানা স্তর খুলে যায়। এই প্রাণশক্তির মূল নির্ঝরিণীর রসের সন্ধান যে না পেয়েছে—তার শিল্প—শিল্প নয়, কবিতা—কবিতা নয়। ভাষা ছন্দ ভাব থাকলেও তা নির্জ্জীব।

আমি। আপনি যে রসের ধারা আনন্দময় বল্লেন, তা কি ঠিক? কোনও কবিতা বা শিল্প রচনা দেখে বীভৎস বা করুণ রসের উদ্রেক হ'ল,—তা'তে আনন্দ কোথায়? ধরুন, যে কোনও বিয়োগান্ত নাটক ধরুন, তা'তে আনন্দ কোথায়? নবরস তো বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার কর্‌চে—সবগুলো রসে তো আনন্দ নেই।

গিরীশবাবু হেসে বল্লেন—তুমি কি বল্‌চো, তা তুমি নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। নয় রসের যে রসই হোক্—যে emotional expressions হোক—তার মূলে রয়েছে আনন্দ। দেখ শেক্সপীরের King Lear—grim tragedy; কিন্তু তা প'ড়ে—কি তার সুন্দর অভিনয় হ'লে—

তুমি আনন্দ পাওনা ? ক্রোধে শোকে দুঃখে তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু তাতেও তুমি আনন্দ পাচ্ছ—নতুবা সেই নাটকের নাম শুন্‌তে পারতে না। এ কি জান—চ'খের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু তার ভেতর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাচ্ছ। দক্ষ শিল্পীর চিত্রে হয় তো প্রত্যেক বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ আছে, কিন্তু তার প্রত্যেকটা তোমার হৃদয় স্পর্শ করচে—আর from the very depth of your heart আনন্দের নির্ঝর ব'য়ে যাচ্ছে।

আমি। এটা সত্যি বোধ হয় বটে!

গিরীশবাবু। দেখ যার ভিতরে রসের বিকাশ হয় না—সে নাস্তিকের মত। তাই সাবধান ক'রে দেয়—অরসিকের কাছে এসব বলো না।

আমি। আপনি তো এই বল্লেন যে জগতের প্রত্যেক পদার্থেই রসে রসে আছে—প্রাণশক্তির খেলা চ'লছে। সমজাতীয় বলে সহানুভূতি-সম্পন্ন হৃদয়ে সে আনন্দ ধারা উথ্‌লে উঠ্‌চে। আবার অরসিক ব'লে সাবধান ক'রে দেবার কথা ব'লছেন।

গিরীশবাবু। কি জান—সবাই সব জিনিষের অধিকারী হয় না। যেমন গাঁজাখোরে গাঁজাখোরে মিল দেখ্‌বে, তেমনি ভক্তে ভক্তে মিল দেখ্‌বে। যে যে-জিনিষের উপাসক—চর্চ্চা করে—যার হৃদয়ের বিকাশ হচ্ছে, ধারণা শক্তি গ্রহণ করবার শক্তি বাড়চে—তার আস্বাদে আনাড়ী থেকে বিভিন্ন হবেই হবে।—আস্বাদ করবার তারতম্য আছে। কেউ গপ্‌ গপ্‌ ক'রে গিলে খেয়ে যায়, আর কেউ তারিয়ে তারিয়ে খায়।—যারা তারিয়ে খায় তারাই ঠিক রসের আস্বাদ পায়।

আমি। আচ্ছা মশায় রসই কি প্রাণশক্তির মূল ?

গিরীশবাবু। সোজা বুঝে দেখ—প্রাণের চিহ্ন কি—struggle—সংগ্রাম। তোমার growth হচ্ছে—কত প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে গিয়ে—কত বাধা বিঘ্নের সঙ্গে লড়াই ক'রে। যে শক্তিমূলে এই নানাভাবের ঘাতপ্রতিঘাতের সমাবেশ হচ্ছে,—সে শক্তি—এক মহাশক্তির প্রেরণা। গাছ ম'রে শুকিয়ে যায়—ফুলপাতা ঝরে পড়ে যায়—যখন তাতে রস থাকে না। যতক্ষণ তার মূলে রস থাকে—ততক্ষণ সে সুন্দর সবুজ রঙে আলো ক'রে আছে, লাবণ্য-সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল করচে—ফল ফুলে ডালগুলি নত হয়ে পড়্‌চে। এই রসই প্রাণশক্তির আধার। যিনি রসময়—দেখ, তাঁর চিন্তায় আনন্দ—তাঁর প্রসঙ্গে আনন্দ—তাঁর কল্পনায় আনন্দ। রসের একটা উন্মত্ততা আছে, তারই রূপ—প্রেম; তার স্বরূপ,—আনন্দ। দেখ সব রকম নেশা তো ক'রে দেখিছি। সে নেশা কি—না কৃত্রিম উত্তেজনা। মদ খেলে খোঁয়াড়ী ভাঙ্গবার জন্ত আবার মদ খেতে হয়—নেশা ছুটে গেলে অবসাদ আসে—সেই অবসাদকে দূর করবার জন্ত আবার মদ খেতে হয়। তার পরে হয় তো অজ্ঞান বেঁহুস হ'য়ে একটা অসাড় জড় পদার্থের মত পড়ে থাক্‌তে হ'ল। কিন্তু দেখ ভগবৎ প্রসঙ্গে যে নেশা হয়, তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়,—তার অবসাদ নেই—সে আনন্দের নেশায় মন আপনি ভরপুর।—না হ'লে মদ ছাড়ি ? এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই, তার এক কণা নেশা যদি

ভাং মদ গাঁজায় থাক্‌তো। বাস্তবিক এই আনন্দের আস্বাদ যে না পায় তার মত দুঃখী জগতে আর নেই। এমন আনন্দ! তাঁরই লেখা সার্থক, তাঁরই শিল্প সার্থক, তাঁরই সঙ্গীত সার্থক,—যাঁর লেখায়, শিল্পে, সঙ্গীতে সেই রসিকশেখরের রসধারা উথ্‌লে উঠে, যা' আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদের অনুকূল ভাব জাগিয়ে তোলে।

এই গুলি বলিতে বলিতে গিরীশবাবুর চক্ষু উজ্জ্বল ও সজল হয়ে উঠ্‌লো—তাঁর চোখ মুখ যেন অপার্থিবভাবে রঞ্জিত হ'ল। তিনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাক্‌লেন—রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে—ধীরে ধীরে তাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে চলে এলাম।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

গজল-গান

(মান্দ্—কাওয়ালী)

এত জল ও-কাজল-চোখে, পাষাণী, আন্‌লে বল কে।
টলমল জল্-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে ॥
দিল কি পুব-হাওয়াতে দোল্, বুকে কি বিঁধিল কেয়া ?
কাঁদিয়া কুটিলে গগন এলায়ে কামর-অলকে ॥
চলিতে পৈঁচি কি হাতের বাধিল বৈঁচি-কাঁটাতে ?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা বিঁধিল হিয়ার ফলকে ॥
যেদিনে মোর-দেওয়া-মালা ছিঁড়িলে আন্‌মনে সখি।
জড়াল বেণ্-কুসুমীহার বেণীতে সেদিন ওলো কে ॥
যে পথে নীর্ ভরণে যাও ব'সে রই সেই পথ-পাশে।
দেখি, নিত্ কার্ পানে চাহি কলসীর সলিল ছলকে ॥
আমার্ লই ফুটিয়ে মুকুল কেবলই আন্‌পথে ধাওয়া।
দূরের বায় যাই ঝরায়ে হিম্ সরসীর নলিন্-নোলকে ॥
বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিট্‌লনা কবি !
ফটিক-জল ! জল খুঁজিস্ যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে ॥

নজরুল ইস্‌লাম

ছন্দের কথা

(তৃতীয় পর্ব্ব)

আলোচ্যমান ছন্দের অঙ্কুর ছিল সংস্কৃতের 'গীত্যার্য্যা'বর্গের ভূমিতে—শাখাপ্রশাখায় জীবনায়ত্ত ও ফলপুষ্পে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে প্রাকৃতভাষার সমগ্র ভারতবর্ষে। সেজন্য এ ছন্দকে প্রাকৃত ভাষারই নিজস্ব সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে গোবর্দ্ধন মঠ হইতে সারদা মঠ পর্য্যন্ত, উত্তর-দক্ষিণে যোশীমঠ হইতে শৃঙ্গেরীমঠ পর্য্যন্ত এই ছন্দ বহুকাল হইতে উদ্গীত হইয়া আসিতেছে- বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা ভারতের সঙ্গীত-ভাণ্ডার [illegible] করিয়া আসিতেছে। ভারতের বিবিধ ভাষাবৈচিত্র্যের মধ্যে এ ছন্দ বাস্তব মিলন-বন্ধস্বরূপ। সমস্ত প্রাকৃতজ ভাষাতেও এ ছন্দ চলিয়া আসিতেছে। গুজরাতী, মারহাট্টি, হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, বাংলা সকল ভাষার কবিরই এ ছন্দ চিরকান্ত।

প্রাকৃত ও বাংলা-মৈথিলী-উড়িয়া-অসমীয়ার মাঝামাঝি যে সন্ধ্যা ভাষা তাহাতেও এই ছন্দেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধগান ও দোহা হইতে ১ম পর্ব্বে ২।১টী উদাহরণ দিয়াছিলাম এবার এ ছন্দের বিবিধ রূপের ২।৪টি উদাহরণ দিই। এ ছন্দে রচিত চর্য্যাপদের প্রত্যেক পংক্তিতে মাত্রা সমান নাই। বিবিধসংখ্যক মাত্রার পংক্তির সমবায়ে এক একটি পদ।

৮ বা ৯+৮+৮+৯—বাম দাহিণ দো | বাটা ছাড়ী | শান্তি বুলথেউ | সংকেলিউ।
৮ বা ৯+৭+৬+৭—ঘাটন গুমা খড়- | তড়ি নো হোই | আখি বুজিঅ | বাট যাইউ। (শান্তিপাদ)
৮+৭+৮+৪—তিনি এঁ পাটেঁ | লাগেলি রে | অণহ কসণ ঘন | গাজই।
৮+৮+৮+৪—তা সুনি মার ভ- | য়ঙ্কর রে সঅ | মণ্ডল সএল | ভাজই। (মহীধরপাদ)
৮+৭+৮+৪—মহারস পানে | মাতেল রে | তিহুঅন সএল উ- | এখী।
৮+৬+৮+৪—পঞ্চ বিষয় রে | নাষকরে | বিপখ কো বী ন | দেখী। (ঐ)
৮+৮+৮+৪—মোরঙ্গি পীচ্ছ | পরহিণ সবরী | গিবত গুঞ্জরী | মালী।
৮+৮+৮+৪—নানা তরুবর | মৌলিল রে গঅণ- | ত লাগেলী | ডালী॥ (শবরপাদ)
৭+৯+৮+৪—গিঅবর নিঅড় | লখি পইসন্তে | শবরো লোড়িব | কইসে। (ঐ)
৮+৮+৮+৮—কিন্তো মন্তে | কিন্তো তন্তে | কিন্তো রে ঝাণ | ব খানে।

অথবা তৃতীয় পর্ব্বের দুটি দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ববৎ গণ্য করিয়া,—

৮+৮+৮+৪—কিন্তো মন্তে | কিন্তো তন্তে | কিন্তোরে ঝাণ ব | খানে।
৭+৮+৭+৪—অপইঠান ম- | হাসুহ লীণে | দুলখ পরম নি- | বাণে। (দারিকপাদ)
৭+৭+৮+৪—দুঃখে সুখে | একু করিআ | ভুঞ্জই ইন্দী | জানী।
৭+৮+৮+৬—স্বপরাপর ন | চেবই দারিক | সঅলানুত্তর | মাণী। (ঐ)

৮+৮+৪+৩—ঘর বই পক্কণ্ঠ | সহজে সমাই | বাজ বি | রাজ।
৮+৮+৮+৩—খিল পাপবইঠ্ঠী | চিত্তে বইঠ্ঠী | জোইণি মহ পডি | হাস॥ (সংকোচায়)
৮+৮+৮+৭—পবন ধীর অমি | আহ পক্ক ভিঅ | মূল বিদ্ধ ভাবি | অ অবধূই।
৮+৮+৮+৬—বজ্‌ঝই কম্মে | ণ উণো কম্ম বি- | মুক্কেণ হোই | মণ মোক্‌খম্‌।
(৩য় পর্ব্বের ২টি দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব ধরিয়া)
৮+৮+৮+৪—বজ্‌ঝই কম্মে | ণ উণো কম্ম বি- | মুক্কেণ হোই মণ | মোক্‌খম্‌।
৮+৮+৮+৮—এবং চিত্তে | বজ্‌ঝে বজ্‌ঝই | মুক্কই মুক্কে | ণত্থি সন্দেহো।
৮+৭+৭+২—এই কয়বা | পেক্‌খু সহি বিহ | ভিম মহ পড়্‌ডি | হাই।
৬+৮+৬+৯—জাকের মণ | অক্খয় মাই | তণু তুট্টই | বন্ধণ।
৮+৮+৯+৪—তক্কে সহজ | সহজে বন্ধিই | এই মুক্কণ | বন্ধণ।
৮+৮+৪৮+৮+৪—পবন বিরল তহি | বেণি উএক্ক তহি | ধম্মক্খর মহে | লক্‌খই।
৮+৬+৮+৮—অইস উএসে পই | ছুণ ণিজ্‌রই | পবনবিহিণি চাহ | ণিচ্চল খণ্‌রই।

১ম দুই পর্ব্বে মিলের জন্য দীর্ঘ উচ্চারণকে অবহেলা করিয়াও এই ভাবে সাজাইতে হইবে।

প্রাকৃত ও হিন্দীর দোহা ছন্দ সম্বন্ধে ২য় পর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে—এই দোহা ও জয়দেবী একই, কেবল ২য় পর্ব্বে ৮ মাত্রার বদলে ৫ কিংবা ৬ মাত্রা। চর্য্যাপদগুলির মধ্যে বহু শ্লোক এই দোহা ছন্দেই রচিত। গত ১৩২৯ সালের "প্রতিভা"-র মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'কাহ্নুপার দোহার টীকা' নামক প্রবন্ধে দোহাপদের যে পর্ব্ব-বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেনতাহা আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। প্রাকৃত পিঙ্গলে যে দোহার লক্ষণ ও নিদর্শন দেওয়া আছে—হিন্দী কবিগণ দোহা রচনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন—চর্য্যাপদেও তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নাই।

৮+৫+৮+৩—জহি মন পবন ন | সঞ্চরই • • • | রবি শশি নাহ প | বেশ।
তহি বট চিত্ত বি | সাম করু • • • | সরহে কহিঅ উ- | এস। (সরহপাদ)
৮+৫+৮+৩—লো অহ গমণ ম- | ণুঅ হই • • • | হউ পরমপথে প | বীণ
কোড়িঅ মাঝেঁ | একু জই • • • | হোই নিরঞ্জন | লীণ। (কাহ্নুপাদ)
পর অপ্পাণ ম | ভন্তি করু • • • | সঅল নিরন্তর | বুদ্ধ
এহুসো নিম্মল | পরম পউ • • • | চিত্ত সহাবে | সুদ্ধ।
অদ্বঅ বাড়া | দমল কজ্জ • • • | পাহি নিরক্খর | কোই
তাব সে অক্খর | ঘোলিআ • • • | জাব নিরক্খর | হোই।

২য় পর্ব্বে ৫ মাত্রাও আছে—৬ মাত্রাও আছে—অথবা একটি দীর্ঘ মাত্রাকে হ্রস্ব পড়িলেও চলে।

গুরু উন এসো | অমিঅ-রসু • • • | হবহিঁ ণ পীঅউ | জেহি
বহু সথ্থ ম- | রুথলি তিং • • | তিসিএ মরিথউ | তেহি।
অবহি ম থক্কু ম | জাহি বনে • • | জহি তহি মন প্রি | আণ।
সঅল নিরস্তর | বোহি ঠিঅ • • | কহি ভব কহি নিব্‌ | বাণ।

২য় পর্ব্বে ৪ মাত্রাও দেখা যায়—যথা,—

৮+৪+৮+৪—দলনা বদনা | কবিলখি ● ● ● ● | তুড়িআ বেণ বি | পাসে।

দোহার পংক্তির সহিত পাঁচটি জয়দেবীর পংক্তির মিলন চর্য্যাপদে প্রায়ই দেখা যায়—যথা

৮+৫+৮+৩—বঙ্গিমি শিহর উ | ফুল মুণি ● ● ● | শবরে জহি কি অ | বাস
৮+৮+৮+৩—পউঁসো লংবিঅ | পক্কাসনেহি | করিবর মুক্তিম | আস।
৮+৫+৮+৩—এহুসো গিরিবর | কহিঅ মধি ● ● ● | এহু সো মহাসুহ | থাব
৮+৮+৮+৩—এপ্‌রে নিম্‌- | সণ্‌স দহে বণ্‌ | ভন হই মহাসুহ | যাব।

জয়দেবী পংক্তিতে ৭ মাত্রাও দৃষ্ট হয়।

৮+৫+৮+৩ - সহজে নিচ্চল | যেন কিয় ● ● | সমরসে নিজমন | রাঅ
৮+৭+৭+৩—সিকে লো পুণ | চক্ষুখণে পউ | অবমঅণচ স | ভাব

উভয় পংক্তিতেই সাতমাত্রা দেখা যায়। চতুর্থপর্ব্বেও ৫ মাত্রা থাকিতে পারে।

৭+৬+৭+৫—গঅণ সমীরণ | মুহঅা মহি ● ● | পক্কেহি পরি | পুরএ
৮+৭+৮+৫—দজল মুয়াগুর | এক উক্কিত্তি | ব টিত্র এহ সো | সুহএ।

শেষপর্ব্বে ২ মাত্রাও আছে।

৮+৭+৮+২—সুমহিঁ সহন | করহি তুহ ● ● ● | জহি তহি সম চিৎ | তর
৮+৫+৮+২—তিলক্কু সমর বি | সদত্তা ● ● ● | যেহেণ্‌ করই অ | বস।

প্রথম দুইপর্ব্বে ৮+৫ এর বদলে ৭+৬ মাত্রাও দেখা যায়।

৮+৫+৮+৩—বিশ্বাসাতি ন | বন্ধ করু ● ● ● | অরে বট সরই | বুক্ত,
৭+৬+৮+৩ - নীপ পয়গম | কবি ভমরু ● ● পেক্ষখহ হরিণহ | ছুত্ত।

প্রকৃতের গগনাঙ্গনছন্দের অনুরূপ।

এথু সে সুর | সরি জমুনা ● ● | এথু সে গঙ্গা | সাঅর।
এথু পআগ | বণারসি ● ● | এথু সে চন্দ দি | বাঅর।

দোহার দ্রুতচঞ্চল রূপ হিন্দী দোহার সম্পূর্ণ অনুরূপ।

বজ্জই পিজ্জই | ন চিত্তজ্জই | চিত্তে পড়্‌ড়ি | থাই
মণু বাহি ঘু | হুহুৰ হুলে | বিনব্রি অ জোইনি | মাই।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদে জয়দেবী ছন্দের নানা প্রকার বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। রাজা শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ সম্বন্ধীয় পদে ৪র্থ পর্ব্বে ৬ মাত্রার পংক্তির উদাহরণ পাওয়া যায়—

৮+৮+৮+৬ মাত্রা—অনল রন্ধ্র কর | লক্‌খণ নরবর | সক সমুদ্দ কর | অগিনি সসী
চৈত কারি ছটি | জেঠা মিলিও বার বেহপ্পয় | জাউ লসী।

২য় পংক্তির চতুর্থ পর্ব্বের ৩ মাত্রা হইতে ১ম পংক্তির ৪র্থ পর্ব্বের মাত্রাও নিরূপিত হইতেছে। অতএব 'আগনি'র 'আ' হ্রস্বমাত্রা। ৪র্থ পর্ব্বে ৭ মাত্রার উদাহরণ ;—

৮+৮+৮+৭ মাত্রা—কালি কহল পিআ | এ সাঁঝহি রে | জাবব মোয়ে মারু দেশ
মোয়ে অভাগিনী | নহি জানল রে | সঙ্গ জইতঁ হু | যোগিনী বেশ।

কোন কোন পর্ব্বে ২।১টি দীর্ঘ মাত্রা হ্রস্ববৎ। ২য় পর্ব্বে—৬ মাত্রার উদাহরণ ;—

বিদ্যাপতি কবি | গাওল রে • • | আবি মিলত পিয় | তোয়
লখিমা দেই বর | নাগর রে • • | শ্রীশিবসিংহ নহি | ভোর।

উপরের ২ পংক্তির ২য় পর্ব্বের শেষে 'রে' যোগে ছন্দে ঈষৎ বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে—পর্ব্বান্তের বিরতিকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হওয়ায় ছন্দঃ স্পন্দের সুবিধা হইয়াছে। ইহাই বিদ্যাপতির দোহা। 'রে' যোগ করিয়া কবি শেষ পর্ব্বে ৫ মাত্রাও ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—

শঙ্খ কর চুর | বসন কর দূর | তোড়হ গজমতি | হার রে
পিয় যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে | যমুনা সলিলে সব | ডার রে।

আবার ২য় পর্ব্বে ৫ মাত্রা—শেষ পর্ব্বে কেবল 'রে' রাখিয়া ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

সপনহু সংগম | পাওল • • • | রঙ্গ বঢ়াওল | রে
সে মোর বিহি বিঘ- | টাওল • • • নিন্দে হেরায়ল | রে।

পংক্তি দুইটীর ২য় পর্ব্বান্তেও মিল আছে।

২য় পর্ব্বে প্রতি পংক্তিতে 'রে' যোগে পাঁচমাত্রা, ও তৃতীয় পর্ব্বে ছয় মাত্রা—৪র্থে ৩-ও আছে ৪-ও আছে যেমন—৮+৫+৬+৩ মাত্রা।

মধুপুর মোহন | গেল রে • • • | মোরা বিহরতি • • ছাতি
গোপী সকল বিস | রলনি রে • • • | জত ছিল অহি • • | বাতি

২য় পংক্তির দ্বারাই ১ম পংক্তির তৃতীয় পর্ব্বের মাত্রা নিরূপিত হইতেছে। উহার দীর্ঘস্বর হ্রস্ববৎ না হইলে ৬ মাত্রা হয় না। আবার ঐ পদেই ৮+৬+৬+৪ মাত্রা,—

গোকুল চান চ- | কোরল রে • • | চোরী গেল | চন্দা
বিছুড়ি চললি দুহু | জোড়ী রে • • | জীব ইহ গেল | ধন্দা।

ইহা প্রাকৃতের কুণ্ডলিকার অনুসরণ—যথা

দিগমগ ণহ অং | ধার আন • • | খুরসাহুক | উল্লা
দরমরি দমসি বি- | পক্খ মারু • • | ঢিল্লী মহঁ | ঢোল্লা।

এ ছন্দে ২য় ও ৪র্থ পর্ব্বে ২।১ মাত্রা কম বেশী করিয়া হিন্দী কবিগণ প্রয়োজন মত ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন।

গোবিন্দদাস শেষ পর্ব্বে যথাক্রমে ৬।৭।৮ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া ছন্দের হিল্লোলকে আরো বাড়াইয়াছেন। নৃত্যশীল ছন্দের চরণে তিনি অনুপ্রাসের নূপুর পরাইয়াছেন।

৮+৮+৮+৮ বঁধু চঞ্চল | নাচত মোহন | খঞ্জন গঞ্জন | মঞ্জীর বাজে
নীল বসন মণি | কিঙ্কিণী রণরণি | কুঞ্জর দমন গ- | মন ক্ষীণ মাঝে।
৮+৮+৮+৭ গদগদ আধ ম | ধুর বচনামৃত | মন্দ মন্দ হাস বি | কাশিত গণ্ড,
শারদ খণ্ডন | শ্রীমুখ মণ্ডন | কনক খচিত অব | লম্বন দণ্ড।
৭+৯+৮+৭ নটবরহিল্লোল | দোলমণি কুণ্ডল | ভ্রমরদল চঞ্চল | বদনহি চন্দ।
রসভরে গলিত | ললিত কুচকঞ্চুক | নীবি খসত অঙ্গ | কবরিক বন্ধ॥
৭+৯+৮+৬ চম্পক শোণ | কুসুম কনকাচল | জীতল গৌর তনু | লাবণি রে
উন্নত গীম | সীম নহি অনুভব | জগ মনোমোহন | ভাঙনী রে॥
৮+৮+৮+৬ বিপুল পুলককুল | আকুল কলেবর | গর গর অন্তর | প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি | গদগদ ভাষণি | কত মন্দাকিনী | নয়নে ঝরে॥

৮+৮+৮+৬ মাত্রা—পর্ব্বে পর্ব্বে মিল
কুঞ্চিত কেশিনী | নিরুপমবেশিনী | রস আবেশিনী | ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী | অঙ্গ তরঙ্গিণী | নব নব সঙ্গিনী | রঙ্গিণী রে॥

অনুপ্রাস মিল ইত্যাদি শব্দালঙ্কারে গোবিন্দদাসের পরই জগদানন্দের স্থান। জগদানন্দ যথাক্রমে শেষ পর্ব্বে ৭ ও ৮ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। গোবিন্দদাস অধিকাংশ স্থলে অনুনাসিকবর্ণসংযুক্ত যুক্তাক্ষরের দ্বারা হিল্লোল ও মাধুর্য্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। জগদানন্দ হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের সুসমঞ্জস প্রয়োগে ছন্দকে একই প্রকার হিল্লোল ও মাধুর্য্য দান করিয়াছেন। জগদানন্দের পদে যুক্তাক্ষরের সংখ্যা অল্প।

৮+৮+৮+৮ অভিনব কৃত কটি | তটহি নীলিম ধটী | পীতিম কলপ পটী | তাপর রাজে।
পদযুগ মঞ্জরল | তায় তরল তর | মৃগমদ তিলক ল- | লাটক মাঝে॥
৮+৮+৮+৭ শিখণ্ড ধবলীতল | তরুণ তাল দল | কাঁদি আদি বর- | পাবলী আর।
জানল অনুপ ক- | লাপ আলাপনে | পঞ্চ অবধে সব | শবদ বিচার॥

পংক্তিশেষ ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ পর্ব্বে পর্ব্বে মিলের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। অনায়াসে যেখানে মিল জুটিয়া গিয়াছে, সেখানেই মিলের সম্ভব হইয়াছে। এ সকল রচনায় এত বেশী অনুপ্রাস, এত বেশী হিল্লোল লালিত্য ও মাধুর্য্য যে, মিলের এখানে কোন বিশিষ্ট মূল্যও নাই। মিলের মৃদুগুঞ্জন, ঝঙ্কৃত শব্দালঙ্কারের মধুশিঞ্জনে মগ্ন হইয়া যায়।

জ্ঞানদাসের পদে চতুর্থ পর্ব্বে মাত্র ২ মাত্রাযুক্ত পংক্তিও পাওয়া যায়। শুনিতে শ্রুতি-কটু লাগে না। যেমন—

৮+৮+৮+২ মাঃ চলত নিতম্ব মণি বাস বিরাজিত | সুন্দর স্তম্ভব | দে।

শেষ পর্ব্বের এই দুই মাত্রা একাক্ষরে দীর্ঘস্বরসংযুক্ত। ইহার বদলে দুইটি হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষর বসাইলে ছন্দের মাধুর্য্য রক্ষিত হইত না।

জ্ঞানদাসে প্রথম ও শেষ পর্ব্বে ৭ মাত্রার উদাহরণ পাওয়া যায়

৭+৯+৮+৭ মাঃ সুবলিত বলিত | ললিত পুলকাঙ্কিত | মুরতি পীরিতিময় | কাঞ্চন কান্তি,
শারদ চাঁদ | ছাঁদ মুখমণ্ডল | লীলা গতি রতি- | পহিরো ভাতি।

জ্ঞানদাসের ছন্দোলহরী অনেক সময় চতুর্থ পর্ব্বের বেলা-সীমান্ত পার হইয়াও চলিয়াছে—

৭+৮+৮+১ মাঃ গিরিধর দাপ | গিরি পর খেলন | তরু খেলন পদ | পঙ্কজ মোহনি-য়া
অতি বল দুবল | মহানল বালক | কাহ্নে ছান্দ করে | তাও মোহনি-য়া।

বিদ্যাপতি জগদানন্দ গোবিন্দদাস ইত্যাদি বৈষ্ণবকবিগণ যে-সকল পদ মৈথিলী বা মৈথিলীমিশ্র বঙ্গভাষায় রচনা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই, হয় পজ্ঝটিকা নয় জয়দেবীতে রচনা করিয়াছেন। জয়দেবীর চতুর্থপর্ব্বে মাত্রা বাড়াইয়া যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন—তাহার সংখ্যাও অল্প নহে। এই শ্রেণীর পদ গোবিন্দদাসের রচনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দুইমাত্রার জন্য দীর্ঘস্বর ব্যবহার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না—তাহার বদলে ২টি করিয়া হ্রস্বস্বরান্ত ব্যঞ্জন ব্যবহার করিয়াছেন এবং দীর্ঘ স্বরকে এক মাত্রাই ধরিয়াছেন ফলে ইহা গীতার্য্যার চুলিকার মতই দাঁড়াইয়াছে।

অরুণ কমলদল | বিমল চরণতল | হিমগিরি নিকর ন | মিত নখরে।
ভ্রমে কোকনদদল | মধুকর চঞ্চল | লঘুগতি পতিত যু | বতী অধরে।

রামপ্রসাদ এই ছন্দে আগাগোড়া একটি সঙ্গীতও রচনা করেন নাই। তাঁহার পদে বিভিন্ন মাত্রার পংক্তির সহিত মিশ্রিতভাবে এছন্দের পংক্তি দৃষ্ট হয়। কবিরঞ্জনের এ শ্রেণীর সঙ্গীতগুলি লোককান্ত হইয়া উঠে নাই। রামপ্রসাদ আলোচ্যমান ছন্দের একজন অনুকারক মাত্র। সঙ্গীতে বাংলার নিজস্ব ছড়ার ছন্দের বা স্বরবৃত্ত ছন্দের তিনি আদিপ্রবর্ত্তক।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের প্রথম পংক্তি পড়িলে মনে হয় যে ইহা জয়দেবী। যথা—

৮+৮+৮+৫　　নম নম সুতহর | দেব গণেশ্বর | বিঘ্ন বিনাশন | মহাশয়,

কিন্তু পরের পংক্তি পড়িলেই সে স্বপ্ন দূর হইয়া যায়।

একদন্ত মহাকায়—সর্ব্বকার্য্যে সহায়—জয় জয় পার্ব্বতী তনয়।

ইহা দীর্ঘ ত্রিপদী। জয়দেবী ক্রমে যে দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। প্রাচীন কাব্যে উভয় প্রকার পংক্তির মিশ্রণ দেখা যায়। অনেকস্থলে পুঁথির লিপিকারগণ জয়দেবীর হ্রস্বদীর্ঘ-বৈষম্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া আট মাত্রার বদলে আটটি করিয়া যুক্ত ও অযুক্ত অক্ষরের শব্দ রচনা করিয়া বসাইয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গৌরচরিতাত্মক বা বৈষ্ণবতত্ত্বমূলক কাব্য গুলিতে জয়দেবী একেবারেই দেখা যায় না। লোচন—বৃন্দাবন—কৃষ্ণদাস— নরোত্তম ইত্যাদি কবিগণ বোধ হয় জয়দেবীকে সঙ্গীতের নিজস্ব ছন্দ-স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদের চরিত-লীলাতত্ত্বমূলক গ্রন্থে, তাহার স্থানই দেন নাই। জয়দেবীতে কলা-কৌশলগত কৃত্রিমতা আছে। তাঁহারা সহজ সরল স্বচ্ছ ও সুবোধ্য ভঙ্গিতে তাঁহাদের মর্ম্মবাণী প্রচার করিয়াছেন—কোনপ্রকার কৃত্রিমতাই তাঁহাদের কাব্যে প্রশ্রয় পায় নাই। ছন্দোবৈচিত্র্য তাঁহাদের রচনায় প্রত্যাশা করা যায় না। গদ্যরচনার প্রথা ছিল না বলিয়াই তাঁহারা পয়ার ত্রিপদীর আশ্রয় লইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র জয়দেবী ছন্দ যখনই গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই তাহাকে হয় সংস্কৃতাত্মক বা সংস্কৃত করিয়া তুলিয়াছেন---নয়ত, চল্‌তি বাংলার কাছাকাছি করিয়া তুলিয়াছেন।

৮+৮+৮+৮ লট পট কেশে | প্রবিকট বেশে | হুতবহভাহুতি | মুখ শিখিকুণ্ডে
ফণিমণ দশনং। ফণিগুণ কথনং | বিরচয় ভারত | কবিবর তুণ্ডে।

অথবা

যদি কর মমতা | হত তব যমতা | দিবি ভুবি সমতা | শুভ বোধে
ভবজল তরণে | শরণ চরণে | ভারত স্মরণে | করি কামদে॥

ভারতচন্দ্রের হাতে এ ছন্দ দেবদেবীর স্তবস্তুতির বাহন হইয়া পড়িল। ললিতকান্ত পদাবলীর ছন্দকে ভারতচন্দ্র গুরুগম্ভীর করিয়া তুলিলেন।—খেয়াল ও মনোহরসাহী ধ্রুপদ হইয়া উঠিল—মৃদঙ্গ মুরজে পরিণত হইল

২+৮+৮+৮+৫ জয়—শিবেশ শঙ্কর | বৃষধ্বজেশ্বর | মৃগাঙ্কশেখর | দিগম্বর।
জয়—শ্মশাননাটক | বিষাণবাদক | হুতাশভালক | মহত্তর॥
জয়—সুরারি নাশন | বৃষেশ বাহন | ভুজঙ্গ ভূষণ | জটাধর।
জয়—ত্রিলোক কারক | ত্রিলোকপালক | ত্রিলোক নাশক | মহেশ্বর।

অথবা— জয়—চণ্ডবিনাশিনি | মুণ্ডনিপাতিনি | দুর্গবিঘাতিনি | মুখ্যতরে।
জয়—কালি কপালিনি | মস্তক মালিনি | খর্পর ধারিণি | শূলধরে।
জয়—চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি | কৌষিকি ভারত | ভীতিহরে।

কৃষ্ণনগরের শাক্তকবি নবদ্বীপের জয়দেবীকে হরিভজনের বদলে হরভজন করাইয়াছেন—গৌরবন্দনার বদলে গৌরীবন্দনা করাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এ ছন্দকে বাঁশী ছাড়াইয়া অসিও ধরাইয়াছেন।

পয়দল কলবল | তুরঙ্গ টলমল | সাজিল দলবল | অটল সোয়ারা।
দামিনী তক্ তক্ | দানকী ধক্ ধক্ | বক্ মক্ চক্ মক্ | খর তরবারা।
ব্রাহ্মণ রজপুত | ক্ষত্রি রাহুত | মোগল মাহুত | রণ অনিবারা।
ভাঁড় কলাবত | নাচত গায়ত | ভারত অভিমত | গীত সুধারা॥

বলা বাহুল্য উপরে ছন্দে যে রণবাদ্য বাজিল তাহাতে ধ্রুবপদ যাহা থাকা স্বাভাবিক তাহাই আছে—

"ধাঁ ধাঁ গুড়গুড় বাজে নাগরা।"

ছন্দে আকৃতির সহিত প্রকৃতির—দেহের সহিত আত্মার কিরূপে সামঞ্জস্য রাখিতে হয় ভারতচন্দ্র তাহা জানিতেন।

ঘনরাম চতুর্থ পর্ব্বে মাত্রা না বাড়াইয়াই এ ছন্দে রণবাদ্য বাজাইয়াছেন—

রঙ্গিণী রণরঙ্গী | দুন্দুভি বাজই | ঘন ঘোর গাজই | বাদ্য।
রজপুত মজবুত | সৈন্যন যমদূত | সম যুক্ত দুখে পান | সাধ্য॥
দানাদী দল বল | মহীমাঝে মাতল | মানব মহিষে মহঃ | লম্ফে।
ধন ধর বলে ঘন ধাইছে দানাগণ ! ধমকে ধরাধর | কম্পে॥
করয়ে তর্জ্জন | ঘোরতর গর্জ্জন | দুর্জ্জন দানাগণ | দর্পে।
সংগ্রামে সেনাগণ | সংহারে সৈন্যন | ক্ষুধিত বিহগপতি | সর্পে
বড় গোলা বন্দুক | গুড় গুড় বজমুখ | সচকিত চমকিত | শেষ।
অবনী উলটল | কম্পিত কুলাচল | ত্রাসে তরল ফণি- | বেশ।

কবি রামেশ্বরও তাহার শিবায়নে এই ছন্দে যথাশক্তি রণবাদ্য বাজাইয়াছেন

ভৈছন যম তট | কটো উৎকট | পিটয় বহুবিধ | বাদ্য।
দুর্জ্জয় দুই দল | সকল মহাবল | অবিরল শব্দে চলন | চার॥
যুদ্ধের মধ্যে দুন্দুভিবাদ্যে | তাণ্ডব জন্মিল | চণ্ডে
বধ্ বধ্ মধ্ বধ্ | নিঃস্বন অদ্ভুত | পাদপ পর্ব্বত | বর্ষে॥
খড়্গ চর্ম্ম ধরি | মার মার মার করি | চৌদিকে বেড়িয়া | বাটে।
ভনে রামেশ্বর শঙ্কর কিঙ্কর | নির্ভয়ে জুড়িল | কাট॥

এগুলিতে কিন্তু কোন পর্ব্বে মাত্রা বেশী কম নাই। চতুর্থ পর্ব্বে মাত্রা বেশীর উদাহরণও শিবায়নে পাওয়া যায়।

কারো গেল আশা | কারো গেল বাসা | কারো গেল নাসা | শ্রবণাক্ষ।

রণযাত্রা করিতে গিয়া সংস্কৃত ভদ্রমাত্রাকে বাধ্য হইয়া 'ইতর' ভাষার সহিত মিশিতে হইয়াছে। ফলে খাঁটী বাংলায় জয়দেবী—বিভিন্ন সংখ্যার মাত্রাতে যে বেশ চলিতে পারে উক্ত কবিগণ তাহা দেখাইয়াছেন। আর্য্য-অনার্য্য-হিন্দু ম্লেচ্ছ ক্ষত্রশূদ্রের মিলিত রণকোলাহলের ভাষা সংস্কৃতমূলক হইতে পায় নাই—খাঁটী বাংলা হইতে বাধ্য। খাঁটী বাংলা হসন্তবহুল,—সেজন্য ছন্দে স্বরান্তের লাস্যের বদলে হসন্তের তাণ্ডব সম্ভব হইয়াছে। হসন্তের জন্য, ছন্দে নিরুপদ্রব শান্তির ধীর মন্থরতার বদলে বিগ্রহের দ্রুতচাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়দেবীর এই দ্রুতচঞ্চল রূপটি

বহুদিন পর্য্যন্ত সাধ্বীভাষার অন্তঃপুরে অন্তরায়িত ছিল—বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রকারের যবনিকা-মোচনের সঙ্গে সঙ্গে উহারও যবনিকা দূর হইয়াছে।

খাঁটী জয়দেবীর মত বর্জ্জিতমাত্র জয়দেবীও জয়দেবের আগে হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত স্তবস্তুতির ছন্দ হইয়াই ছিল। * স্তবস্তুতি সংস্কৃতেই রচিত হইত। প্রাচীন বাংলার কাব্যগ্রন্থেও

---

* শঙ্করাচার্য্যের মহিষমর্দ্দিনী স্তব এই ছন্দে রচিত—কয়েক পংক্তি তুলিয়া দেই।

৮+৮+৮+৬ অয়ি গিরিনন্দিনি | নন্দিতমেদিনি | বিশ্ববিনোদিনি | নন্দি-নুতে
গিরিবর-বিন্ধ্যশি- | রোধি নিবাসিনি | বিষ্ণু-বিলাসিনি | জিষ্ণু-নুতে।
ভগবতি হে শিতি- | কণ্ঠ-কুটুম্বিনি | ভূরি-কুটুম্বিনি | ভূরি-কৃতে,
জয় জয় হে মহি- | ষাসুর মর্দ্দিনি | রম্য কপর্দ্দিনি | শৈল-সুতে॥
অয়ি জগদম্ব ক- | দম্ব বন প্রিয় | বাস নিবাসিনি | বাসরতে।
শিখর শিরোমণি | তুঙ্গ হিমালয় | শৃঙ্গ নিজালয় | মধ্যগতে।
মধু মধুরে মধু | মেহ মধুরে মধু | কৈটভ ভঞ্জিনি | রাস রতে
জয় জয় হে মহি- | ষাসুর মর্দ্দিনি | রম্যকপর্দ্দিনি | শৈলসুতে।
অয়ি শত খণ্ড বি | খণ্ডিত রুণ্ড বি | তুণ্ডিত শুণ্ড গ | জাধিপতে।
নিজ ভুজ দণ্ড নি | পাতিত চণ্ড নি | পাতিত মুণ্ড ভ | টাধিপতে।
রিপু গজ গণ্ড বি | দারণ খণ্ড প | রাক্রম চণ্ড মৃ | গাধিপতে
জয় জয় হে মহি.........ইত্যাদি।

আজিও সংস্কৃতে এই ছন্দে দেবদেবীর স্তোত্র রচিত হয়—বিশেষতঃ সারস্বত মন্দিরে সরস্বতীর স্তব রচনায় সংস্কৃত ভাষা ও এই ছন্দ আজিও সমাদৃত। আবৃত্তি ও সঙ্গীতের পক্ষে এগুলি বড়ই উপযোগী। ছন্দের উপযোগিতার জন্য সুললিত সরল ও তরলায়িত ভাষা ব্যবহার করা হয়—শুনিতে অনেকটা মার্জ্জিত বাংলার মতই শুনায় দুই একটি উদাহরণ দিই।

৮+৮+৮+৪—ভগবতি ভারতি | মলিন মুখী মতি | ভূষণ ভাবে বি- | হীনাং।
চিত্তং সীদতি | দুঃখে নিমজ্জতি | জানিহ বীক্ষ্য সু | দীনাং॥
শ্বেতং বসনং | মুখমাসনং | মলিনং মলিনং | জাতং।
সিত সিত নয়নং | প্রোজ্জ্বলনয়নং | অসিতং অসিতং | জাতং॥
করধৃত বীণা | গীতবিহীনা | বমতি ন প্রতিমধু | ধারাং।
জানতি দীনাং | মন্ত্রে ক্ষীণাং | স্বর্গপতিত গুরু | ভারাং॥
দুঃখ বিলীনাং | পুনরিহ বীণাং | বাদয় বাদয় | তূর্ণং।
অপগত হর্ষং | ভারতবর্ষং | কুরু কুরু সুখপরি | পূর্ণং॥
কাব্যনিকুঞ্জং | কবিপিকপুঞ্জং | গন্ধা গুঞ্জতু | নিত্যং।
ভাবপরীতৈঃ | দীপকগীতৈ | সন্দীপয় মুগ্ধ | চিত্তং॥

সংস্কৃতে রচিত বন্দনার অভাব নাই। পবিত্র দেবভাষায় স্তবস্তুতি না করিলে দেবতা প্রসন্ন হইবেন কেন? সর্ব্বসাধারণের উচ্ছিষ্ট প্রাকৃত ভাষায় দেববন্দনা কিরূপে চলে? কবিরা যখন বাংলা ভাষাতে স্তবস্তুতি লিখিতে আরম্ভ করিলেন—তখন ছন্দ ত সংস্কৃত থাকিলই—ভাষাও অনুস্বার বিসর্গ বাদ দিয়া রীতিমত সমাসসঙ্কুল সংস্কৃতই রহিয়া গেল। এমন কি বহুদিন পর্য্যন্ত কবিদের একটা ধারণা ছিল 'জয়দেবী, স্তবস্তুতিরই ছন্দ।' ভাষাকে সংস্কৃতমূলক করিলে হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রাবৈষম্য অস্বাভাবিক শুনাইবে না, —ইহাও তাঁহাদের অন্যতম সঙ্গত ধারণা ছিল।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার বাসবদত্তার প্রারম্ভে স্তব করিতেছেন—

হে ভবভামিনি | ভীমবিলোচনি | ভৈরবনাদিনি | শৈলসুতে।
শঙ্খিনি চক্রিণি | বজ্রিণি শূলিনি | বাণকৃপাণক ধৃতহস্তে॥
হে গিরিনন্দিনি | শক্রবিমর্দ্দিনি | দীনদয়াময়ি | রক্ষ করে।
হে সুরবন্দিনি | কর্ম্মনিবন্ধিনি | পাপবিনিন্দিনি | রক্ষ ভবে॥

অথবা—
ধৃতশশিশকলা | শ্রিতসিতকমলা শুভমতি বিতরণ শীলা।
নিরবধি মহিমা | পরিহৃত জড়িমা | কবিকুল বিরচিত | লীলা॥
শশধরবদনা | সুস্মিতরদনা | সিতরুচিরপি সিত বাসা।
অবচয় চিদয়: সকরুণ হৃদয়া | জগদস্তু জগদিতি | ভাষা॥

অথবা—
ভারতি জয় জয় | সপদি বিনাশয় | শৈশব সঞ্চিত | পাপং।
সুখদে বরদে | জয়দেহভয়দে | প্রশময় সেবক | তাপং
ইহ শুভ ভবনে | মানস গগনে | বাণী বিতরতু | বোধং।
সুললিত কথয়া | শ্রুতি সমতয়া | জনয়তু বিবুধ-বি- | নোদং।
বিকিরতু হৃদয়ে তামস নিলয়ে | চন্দ্র বিনিন্দন | ভাসং।
জীবনমমলং | কুরু মে সকলং | জীবয় মৃতমিব দাসং॥

এগুলি সংস্কৃত হইলেও বুঝিবার কোন অসুবিধা নাই। এবং স্তব হইলেও শুধু শব্দবীজের মালাজপ নহে। এই ছন্দে সংস্কৃতে 'উদ্বোধনী' রচনাও দৃষ্ট হয়। স্তবের ন্যায় ইহা 'উদ্বোধনী' 'অভিনন্দনী' বা 'আগমনী' রচনারও উপযোগী। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

৮+৮+৮+৮—হে মুনিকুলধর | জড়তাং পরিহর | চিরকৃতমঙ্গল | পুণ্যবিধানং।
ক তব তপস্যা | মধুর বয়স্যা | ক তব বিরাজতি | বৈদিক গানং॥
ক নু বিবিবোধিত | ভাব বিশোধিত | বিবিধ বিধীনাং | মধুর বিধানং।
পুনরপি দীপয় | পুণ্য সুকৃতিচয় | মাপয় ভারত | মনু গুণ মানং॥
সুরকরুণাময় | লক্ষয় ভুবি নয় | নব নিজ বোধ-নি | শামবসানং।
অধিকুরু সদনং | বহুবিধগহনং | বিরচয় নিশ্চল | পুণ্যবিতানং॥
ভারত হিতকর | কৃতিচয়মঙ্গল | শুভকর পথমনু | কুরু পদদানং।
পুনরপি দীপয় | পূর্ব্ব চরিতচয় | মাপয় ভারত | মনু গুণমানং॥

ইহা কেবল সম্বোধন পদের নামাবলী, তর্কালঙ্কারের শব্দঝঙ্কার এ যেন "পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন—ভক্তিবিহীন তান।"— মহিষমর্দ্দিনী স্তবের মত ইহাও শুষ্ক রুদ্রাক্ষের জপমালা।

হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যায়

৮+৮+৮+৮ ভীমা লম্বোদরা | ব্যাঘ্রচর্ম্মপরা | খর্ব্ব আকৃতি বামা | মুণ্ডমালিনী।
ফণীবিভূষণা | পিঙ্গলবরণা | জটাগ্রে উন্নত | খর্পরধারিণী।

হেমচন্দ্র অবশ্য এ ছন্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হ'ন নাই— উপরের দুই পংক্তিতে ভাষা গদ্যাত্মক হইলেও ছন্দ বিরূপ হয় নাই—বরং তারাস্তবোচিত গাম্ভীর্য্য ফুটিয়াছে—কিন্তু তারপরই যখন—

খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল উৎপল ধরে রক্তিমরবিচ্ছবি দৃপ্ত ত্রিনয়নে,
জ্ঞানের অঙ্কুশ ধরি জীবহৃদয় ভরি বিরাজেন অই সতী ভুবনে।

ইত্যাদি দেখিতে পাই, তখন মনে হয়, হেমবাবু মাত্রার মর্য্যাদা আর রাখিতেছেন না। কবি এ ছন্দের নাম দিয়াছেন দ্রুতঘনপদী—'ঘনপদী' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই স্বরব্যঞ্জনের এত জনতা ও ঘনতা, যে দুর্ব্বল পর্ব্বগুলি তার বহনে অক্ষম। তবে ছন্দ 'দ্রুত' কিরূপে চলিবে বুঝিতে পারিলাম না—পদে পদে যুক্তাক্ষরে পদস্খলন হইলে দ্রুত চলা যে অসম্ভব। হেমবাবুর এ ছন্দ বর্দ্ধিতমাত্র জয়দেবী ও দীর্ঘ চৌপদীর মাঝামাঝি একটা কিছু।

তাঁহার—

পন্নগ ভীষণ | ফণাপ্রসারণ উৎকট গর্জ্জন | তরঙ্গে দুলিছে।
কূর্ম্ম কমঠাদি | ঊর্ম্মিতে লটপট | লোহিত তৃষাতুর | সংপুট খুলিছে॥

এই দুটী পংক্তি বরং জয়দেবীর দ্রুতঘনপদী রূপ কতকটা পাইয়াছে। 'তরঙ্গে দুলিছে' যদি 'দুলিছে তরঙ্গে', হইত তাহা হইলে ছন্দের সহিত অধিকতর সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারিত।

নাট্যপুরোহিত গিরীশচন্দ্র তাঁহার নাটকে এই ছন্দে মাঝে মাঝে স্তবযোজনা করিয়াছেন ইহাও সংস্কৃত নামমালা।—যেমন—

৮+৮+৮+৫ মাত্রা

আশ্রিত পালিকে | অম্বিকে কালিকে | শিবরাণী লজ্জা নি | বারিণী
রুধিরনিমগনা | রঙ্গিণী নগনা | ঘোরানন রণ বি | হারিণী।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত সঙ্গীতের মাধুর্য্য সৃষ্টির জন্য এই ছন্দে স্তব রচনা করিয়াছেন—

কংসবিনাশক | মথুরাপতি জয় | নিখিল ভকতজন | শরণ,
দুর্জ্জনপীড়ক সজ্জনপালক সুরনরবন্দিত চরণ।

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

তাত জননি সখে, কে জানে হে বিভো | নাথ পরাৎ পর | চিরবিহারি
কলুষনিসূদন নিখিলবিভূষণ | অগুণ নিরূপণ | মোহ নিবারি।

(রজনীকান্ত)

তরুণ কবিরাও স্তোত্র রচনায় এ ছন্দের আশ্রয় লইয়াছেন।

ভীমা ভৈরবি | ধকধক প্রোজ্জ্বল | শতরবিমণ্ডিত | শশিভালা।
শোণিতচন্দন- | কৃতাম্বরাঙ্গা | ধৃতাম্বরবসন | মুণ্ডমালা॥
ত্রিশূল ধারিণি! | কুণপনিবাসিনি | বিজয়বরাভয় | শুভদাত্রী।
লোহিতবসনা | সিতাসিতদশনা | সুজ্ঞানভক্তিফল | চির দাত্রী।

(ভৈরবীস্তব—সোমবারী)

প্রচণ্ড চণ্ডী | তাণ্ডবনটনা নিজকরখণ্ডিত | নিজমুণ্ডা,
গলোচ্ছলোচ্ছল | শোণিতধারা- প্লাবনসিক্তা | রুণ্ড-তুণ্ডা॥
অর্পিছ স্বরুধির | তর্পিছ ভবভূত, | কঙ্কণহার রচি | শতসর্পে,
মন্মথ-রতি শির | চূর্ণ বিমর্দ্দিত | করি তব নর্ত্তিত | পদ দর্পে॥

(ছিন্নমস্তা স্তব ঐ)

হ্রস্বদীর্ঘস্বরের উচ্চারণবৈষম্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে। কতকটা সেজন্য এবং কতকটা পরিস্তুতা দেবতার ভৈরবত্ব ও প্রচণ্ডতা পরিস্ফুট করিবার জন্য ভাষা সংস্কৃতাত্মক। ষোড়শী স্তবের ভাষা কিছু সহজ সরল, ষোড়শীরই উপযোগিনী।

পূর্ণ চন্দ্র সম | রাজিছ অনুপম | বিশ্ব বিজয়ি-যৌ- | বন রূপে।
তব পদ পঙ্কজ | পূর্ণ সুধা মধু- | কর সম অগণন | ভক্তিধূপে॥
তব তনু-মণি-রেণু | ফুটি ফুটি ষোড়শি | বিতরিছ অর্ণব | মন পোতে,
ঐরাবতদল | মূর্চ্ছিত ত্রিভুবন | তব দিঠি-গঙ্গা | জল স্রোতে।

ব্রাহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্মবন্দনায় জয়দেবী ছন্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু সংস্কারমুক্ত সমাজে ভাষা অনেকটা সংস্কৃত-মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্থ পর্ব্বে যে গুলিতে মাত্রা বেশী আছে সেই গুলিরই উদাহরণ দিব।

২+৮+৮+৮+৫ মাত্রা।

জগ—দীশ্বর জাগ্রত | মঙ্গল আলয় | সঙ্কট মোচন | প্রেমঘন,
ভব—তাপ-নিবারণ | নাম সুধা তব | পান করে যদি | যোগিজন।
চির—যৌবন আশ্রয় | শান্তির সাগর | দীন অনাথ জ- | নের গতি
শিব—সুন্দর ঈশ্বর | দেব নিরঞ্জন | বিঘ্ন বিনাশন | লোকপতি।

(কৈলাসচন্দ্র সেন)

জয়—শিবসুন্দর, জয় | প্রেম-সুধাকর | জয় প্রাণ মনোহর | শোভন হে
জয়—হে জীবন পতি | দাও হে জীবনে প্রীতি | দিবানিশি করি জয় | কীর্তন হে।

(কাশীচন্দ্র ঘোষাল)

ওহে নির্মল | সুন্দর উজ্জ্বল | শুভ্র আলোকে | কে তুমি বিরাজ,
বরণ মাগিয়ে | রয়েছি জাগিয়ে | তোমারি লাগিয়ে হে হৃদয় রাজ।

(হেমলতা দেবী)

ব্রাহ্মসঙ্গীতকারগণ এ ছন্দ ছাড়া পজ্ঝটিকা ও তোটকেও অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সঙ্গীত সমাসবহুল সম্বোধন পদের ঝরা ফুলের মালা নহে – বাংলার বনবাগানের তাজা ফুলের অঞ্জলি, সেজন্য তাঁহার এ ছন্দ খাঁটী বাংলা ভাষায় রচিত। যথা—

৮+৮+৮+৩ মাত্রা।

নাহি বিনাশ বি কার বিশোচন নাহি দুঃখ সুখ তাপ।
হৃদয় বিমল হোক্ প্রাণ সবল হোক বিঘ্ন দাও অপ সারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ কেন এ ছদ্ম বেশ কেন এ মান অভি মান। ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের এ ছন্দে রচিত ব্রাহ্মসঙ্গীত সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

পণ্ডিত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় তাঁহার দশাননবধ কাব্য আগাগোড়া সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন —একথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ পর্ব্বে মাত্রা বাড়াইয়া তিনি জয়দেবী ছন্দের ভিন্ন নামই দিয়াছেন।

৮+৮+৮+৮

(ক)—দুষ্ট কপট খল | তিষ্ঠ নিমিষ পল | দণ্ডিব দণ্ডি বল | পুন অবিলম্বে,
ধ্বংসিব সমুদয় | মর্কট নর চয় | অদ্য করিব লয় | অমর কদম্বে।

৮+৮+৬+৫

(খ)—ইচ্ছহ যদি পিত | বান্ধব দরশন | সত্বর উঠি • • | রথ বরে
সম্প্রতি চল মম | সংহতি সযতনে | অদ্ভুত রণ • • | শর তরে।
(গ) – করি | শাস্ত্র সুকীর্তন | সন্ধি নিবর্তন | সর্ব্ব বিপত্তি কি | অন্ত হবে ?
শুধু | অম্বুধি সন্নিধি | তিষ্ঠি, মহারিধি | দুর্গতিগ্রস্ত হ | লব্ধ কবে ?
(ঘ)—পরম পরিষ্কৃত | মতি তব নিশ্চিত | সুবিদিত চর্চ্চিত | শাস্ত্র অগণ্য,
তবু মম বাঞ্ছিত | কহিব কথঞ্চিত | নিখিল জগৎহিত | মঙ্গল জন্য।
(ঙ)—রঘুবর কি ফিরে | গৃহ গত চলি রে | হত মন গণ • • | রক্ষণে ?
চিরমৃত জগতে | পুন অমৃত চয়ে | সঁপিল কি বিধি • • | এক্ষণে ?
নিরিখহ নয়নে | কি গতি পুরজনে | তব মুখ শশি • • | বঞ্চিত,
জলধি জল বিনা | জল কমল বিনা | কমল অরুণ- • • | বর্জ্জিত

(চ) জতি | অধমা তুণা রব | নগণ্য জন সব | মনসান্তর মধ | শক্তি,
কত | কি সাধ্য গুণ গণ | স্তুবণি অতুলন | বিকবি জনগণ | ভক্তি।
(ছ)—জয় | সুরেন্দ্র সুন্দর | জগৎ শুভঙ্কর | সমস্ত নির্জ্জর তবাশ্রয়ে
তব | মহত্ত্ব অদ্ভুত | দিগন্ত বিশ্রুত | সুরক্ষণ ক্রত | মন্ত্ররে।
(জ)—নিরিখ নলিবে। সুরপতি বিশে | অপর কি সম্ভব | মম সম ধন্যা
তৃণগণ গর্ব্বে | গণি নিজ গর্ব্বে | মম সম সক্রম | কভু নহি অন্যা।

(ক) ১ম ৩-পর্ব্বের ১ম মাত্রা ও শেষ পর্ব্বের শেষ মাত্রা—দীর্ঘ। বাকী সবই হ্রস্ব মাত্রা। হরগোবিন্দ বাবু ইহার নাম দিয়াছেন **লঘু চৌপদী**।

(খ) ইহাতেও দীর্ঘ মাত্রা প্রয়োগের ব্যবস্থা ১ম দুই পর্ব্বে (ক)-এর মত—তবে তৃতীয় পর্ব্বে ইহার ছয়মাত্রা এবং ৪র্থে ৪ চারি অক্ষরে ৫ মাত্রা ৩টি লঘু ১টি গুরু। পর্ব্বে পর্ব্বে মিলও নাই। কবি ইহাকে **'ভ্রমর গুঞ্জন'** ছন্দ বলিয়াছেন।

(গ) অতিপর্ব্ব মাত্রা ২টি প্রারম্ভেই আছে। প্রত্যেক পর্ব্বার্দ্ধের প্রারম্ভে দীর্ঘ মাত্রা। প্রতি পংক্তি দীর্ঘ মাত্রায় শেষ হইয়াছে, পংক্তির ১ম পর্ব্বদ্বয়ে মিলও আছে। ইহা প্রাকৃতের **চউবোলা** ও সংস্কৃতের 'মদিরা' অভিন্ন। পূর্ব্বে উভয় ছন্দেরই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। কবি ইহাকে **দীর্ঘ ত্রিপদী** বলিয়াছেন,—কেন বলিয়াছেন—বুঝি না। প্রচলিত দীর্ঘ ত্রিপদী হইতে ইহা নানারূপে স্বতন্ত্র।

(ঘ) প্রত্যেক পর্ব্বের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রারম্ভে কেবল দীর্ঘ মাত্রা আর শেষ পর্ব্বেও ২টি দীর্ঘমাত্রা। তিন পর্ব্বেই মিল চলিয়াছে।

(ঙ) পংক্তির ১ম পর্ব্ব দুইটার শেষে কেবল দীর্ঘমাত্রা। আর শেষ পর্ব্বে ৩ অক্ষরে ৫ মাত্রা অর্থাৎ পর্ব্বের আগুন্তে দীর্ঘ মাত্রা। ১ম ২ পর্ব্বে মিলও আছে। তৃতীয় পর্ব্ব স্বর নামাইয়া পড়িয়া চতুর্থ পর্ব্বে স্বর চড়াইয়া দিলেই ইহার তরঙ্গায়িত গতি অনুভূত হইবে। ইহাকে কবি **পীযুষবল্লী** ছন্দ বলিয়াছেন। ইহা জয়দেবের "সমুদিত মদনে | রমণী বদনে চুম্বিত বলি[illegible]তাধরে" ইত্যাদির অনুসরণ। জয়দেব হ্রস্বদীর্ঘস্বরবিন্যাস সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, হরগোবিন্দ বাবু সে স্বাধীনতার সুযোগ না লইয়া প্রতি পর্ব্বে ৬টি করিয়া লঘু মাত্রা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে হরগোবিন্দ বাবুর এ ছন্দে হিল্লোলের অভাব হইয়াছে।

(চ) প্রতি পর্ব্বের ২য় মাত্রাটি কেবল দীর্ঘস্বর। তিন পর্ব্বেই মিল আছে।

(ছ) প্রতি পর্ব্বের ২য় মাত্রা ও ২য় পর্ব্বার্দ্ধের ১ম মাত্রার দীর্ঘস্বর—অর্থাৎ নিয়মিত ব্যবধানে প্রতি পর্ব্বে ২টী করিয়া দীর্ঘ মাত্রা। অতিপর্ব্ব ২ মাত্রা। তিন পর্ব্বেই মিল আছে। কবি ইহাকে **শিখিনর্ত্তন** ছন্দ বলিয়াছেন। ইহার সহিত অভিন্ন,—ভারতচন্দ্রের—"জয়—শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর মৃগাঙ্ক শেখর দিগম্বর" ইত্যাদি।

(ক প্রতি পর্ব্বের শেষ দুই মাত্রা গুরু—কেবল ৩য় পর্ব্বের শেষটি বাদ। প্রাকৃতের 'সুন্দরী' ছন্দের ২য় পর্ব্বের মত ইহার প্রত্যেক পর্ব্বটি। কবি ইহার নাম দিয়াছেন—উগ্রচণ্ডা।

হরগোবিন্দ বাবু 'জয়দেবী'তে দীর্ঘ মাত্রা গুলিকে নিয়মিত করিয়া হিল্লোলগত বৈচিত্র্যসৃষ্টি করিয়াছেন এবং বৈচিত্র্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন। জয়দেবী ছন্দে পর্ব্ব মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরবিন্যাসে যে স্বাধীনতা জয়দেবাদি বৈষ্ণবকবিগণ উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন—সে স্বাধীনতা হরগোবিন্দ বাবু গ্রহণ করেন নাই। ইনি পংক্তির প্রথম পর্ব্বে যেস্থানে দীর্ঘমাত্রা ব্যবহার করিয়াছেন পরবর্ত্তী সকল পর্ব্বেই ঠিক সেই সেই স্থানে দীর্ঘ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। দীর্ঘ মাত্রার নিয়মিত ধ্রুব ব্যবধান ছন্দের তরঙ্গকেও অভ্রান্তভাবে নিয়মিত করিয়াছে।

স্বাধীনতা, যে স্ফূর্ত্তি ও মাধুর্য্যদান করে, গণ্ডীবদ্ধ তরঙ্গ সে স্ফূর্ত্তি ও মাধুর্য্য কতকটা হারাইয়াছে। আর একটি কারণে হরগোবিন্দ বাবুর ছন্দে লালিত্য ও মাধুর্য্যের অভাব হইয়াছে। হরগোবিন্দ বাবু প্রায় সর্ব্বত্রই যুক্তাক্ষরের দ্বারা দীর্ঘমাত্রা রক্ষা করিয়াছেন—দীর্ঘস্বর প্রয়োগ না করা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্ক। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণে তাহার নিজস্ব একটা কম্পন-মাধুর্য্য আছে, তাহার ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র যুক্তাক্ষরের দ্বারা সম্যকরূপে সম্ভব নহে। যুক্তাক্ষর খুব ঘন ঘন দেওয়া চলে না—সেজন্য যুক্তাক্ষরের ব্যবধান একটু বেশী রাখিতে হয় এবং সেই ব্যবধান কেবলমাত্র লঘুস্বরান্ত ব্যঞ্জনের দ্বারা পূরণ করিতে হয়—যে স্থানে ঐরূপ অক্ষর সংখ্যা অধিক হইয়াছে, সেখানে হিল্লোল দমিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ কোথাও মানিয়া লয়েন নাই—বাংলা উচ্চারণের নিয়ম রক্ষা করিতে গিয়া দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বীকার করাও সম্ভব হয় নাই। দোটানায় পড়িয়া যে সকল সংযুক্তাক্ষর-হীন শব্দে দীর্ঘস্বর আছে সে সকল শব্দকে একেবারেই পরিহার করিতে হইয়াছে- ফলে অসংখ্য সহজ সরল সুশীল সুবোধ প্রচলিত শব্দের সাহায্য হারাইয়াছেন। দীর্ঘমাত্রার জন্য যেখানে মুহুর্মুহুঃ যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন এবং স্বয়ংবৃত নিয়ম-কঠোরতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন সেখানে দুরূহ শব্দাবলীর দ্বারা পদপংক্তি কণ্টকিত হইয়াছে—ফলে জয়দেবীর 'ললিত লবঙ্গলতা' ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে।

৺ভুবনমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় বহু সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপ দিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত নিয়মানুসারে হ্রস্বদীর্ঘের উচ্চারণ-বৈষম্য বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছেন। তিনি কিন্তু সাধারণ প্রচলিত বাংলাতেই ছন্দগুলিকে রূপান্তরিত করিয়াছেন—প্রচলিত বাংলার প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে অস্বাভাবিক ও ক্লান্তিকর হইয়া পড়ে সেজন্য ঐ সকল ছন্দের তিনি আদর্শ ও নিদর্শন দিলেও বাংলায় চলে নাই। যেগুলি বাংলায় চলিতে পারে না কোন-না-কোন ভাবে বা

স্বরে চলিতেছে, সেগুলির মধ্যে আবার যেগুলিকে মাত্রাসমকের নিয়মে ৮ মাত্রার পর্ব্বে ভাগ করা যাইতে পারে, আমি সেইগুলিরই এখানে উদাহরণ দিব।

৮+৮+৮+৮ মাত্রা—(**পংক্তি**)

কৃষ্ণ বিদূরে | ব্যাকুলিত দশা | ইন্দির রাধা | সম্বিত হানে।
বেষ্টিত গোপী | চঞ্চল মানে | চেষ্টিত চিন্তা | কাকন দানে।

৮+৪+৮+৪ (**ভুজঙ্গ শিশুভৃতা**)

নটবর তরুণী | বেশে ... | পদ্ পদ মন উন্ | মাদে
জয় জয় মদনা | ঘাতে | মৃদু মৃদু মধু সম্ | ভাষে।

৮+৪+৮+৪ মাত্রা (**ত্বরিতগতি**)। ২য় ও ৪র্থ পর্ব্বে দীর্ঘমাত্রা একটি করিয়া কম—তাহার বদলে দুইটি লঘু মাত্রা। ১ম ও ৩য় পর্ব্বের দীর্ঘ মাত্রা স্থানচ্যুত। ইহাই প্রভেদ।

শুন তরুণী নৃপ | গুহিতে | নিবিড় বনে রত | কি দুখে
বিধু বিপিনে চকি | ত মনে... | তব কি দশা বল | সুমুখী ?

৮+৬+৮+৬ মাত্রা (**মণিমধ্য**)

আপন কষ্টে | দুঃখ ঘটে | বন্ধু বিচ্ছেদে | হীন দশ
কর্ণ হলে দুর | ভাগা ফলে... | মান বিপাকে | আঁখি ক্ষণ।

৮+৬+৮+৬ মাত্রা (**সারবতী**)। ১ম ও ৩য় পর্ব্বে একটি দীর্ঘ মাত্রা কম। তৎস্থলে ২টি করিয়া হ্রস্বমাত্রা। ৪র্থ পর্ব্বে ৪ মাত্রা বা ৩ মাত্রা হইলেই দোহা ছন্দ হইত।

প্রেম যথা অধি কার পরে ... | মান কি গৌরব তুচ্ছ সেথা.
মান বলে হত | গর্ব্ব মনে | পন্ডিত বঞ্চিত | সত্যসুখে।

সারবতীর ১ম ও তৃতীয় পর্ব্বের ১ম দীর্ঘমাত্রার বদলে ২টি লঘুমাত্রা বসাইলে হয়—**সুমুখী**

৮+৬+৮+৬

যদপি পরে তুমি ধন্য সতী... | বচন সুধা সম | শুদ্ধমতি
শশি বদনা অব | লা সরলা... | পরিহর জ্ঞান দু | জন হিতে

৮+৮+৮+৮ মাত্রা (**মত্তা**)

মানে মানী | হয় অপমানী | মানে প্রাণী | ইহ পর লোকে।
মান প্রেমে | পরম বিরোধী | মান দায়ে | অবিরত শোকে।

৮+৮+৮+৪ মাত্রা (**চিত্রলেখা**) ইহাও মন্দাক্রান্তা অভিন্ন।

যে ভাস্কর্য্য | চরি ভজন করে | চিন্তনে শক্ত | ভাসে
জন্মে পূর্ণায় | চিত্ত সুকৃতি ফলে মান্য ভূপাল | বংশে।
ভুঞ্জে রাজ্যে | ক্ষিতি পতি হইয়া | যশ বজ্ঞাদি | দিংশে
দেবে বিপ্রে | বহু বিধ বিতরণ | বাহু বীর্য্যে ক | রে সে

৮+৮+৮+৬ মাঃ (মদিরা)

দেখহ সুন্দর | লৌহরথে চড়ি | লৌহপথে কত | লোক চলে
ষষ্ঠ মুহূর্তক | মধ্যে করে গতি | যোজন শত দ | শের পথে।
লৌহ-বিনির্মিত তার তরে বহু | দূর অবস্থিত | লোক সবে
দূর অবস্থিত | বন্ধু জনে সুখ | চিত্ত পরস্পর | বাক্য কহে।
মানব মণ্ডলি | লৌহ সমাশ্রিত | হেতুক মানস | ইষ্ট লভে।
লৌহ নিয়োজিত। নৌ তরণী করি | দুস্তর সাগর | পার করে।
লৌহ-বিনির্মিত | যন্ত্র-বলে কত | দুষ্কর কর্ম্ম ক | রে সহজে,
সার মহৌষধ | লৌহ পুরাতন | বিষম দুষ্কর | রোগ হরে।

৮+৮(২)+৮+৬ (মত্তাক্রীড়)

কালে পালে | কালে নালে ইতি | তরল বিবৃত জন | দত্ত বুকে
যাগে যজ্ঞে | ধর্ম্মে কর্ম্মে | মতি | রহিত অসময়জ মরণ বিনা
বাদে নাদে রঙ্গে রঙ্গে | গতি | যখন তখন মনু | বিগত করে
সৎকার্য্যে উদ্ | যোগী তাহে হয় মরণ নিকট বুঝি | সভয় মনে।

২য় পর্ব্বের পর ২ মাত্রাকে অতিপর্ব্ব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৮+৮+৮+৭ (চিত্রপদা)

বান্ধব হীন জ | রা দূত পঙ্গু ত থা বধিরান্ধ দু | দীন দরিদ্র
মূক নিরাশ্রয় | বাতুল খঞ্জ কি | ম্বার্ত্ত সমস্ত স | দা নিরুপায়।
যে সব দুঃখ প নে করুণা করি সে হয় সাধন, অক্ষয় ধর্ম্ম
নির্দ্দয় যে জন | দুষ্ট মতে বহু | দুষ্কৃতি, নিষ্কৃতি | নাহিক তার।

প্রথম পংক্তিটিকে, ৭+৮+৮+৮ এইভাবে ভাগকরা যাইতে পারিত।

বান্ধবহীন | জরাভূত পঙ্গু | তথাবধিরান্ধ | দুদীন দরিদ্র।

কিন্তু পরবর্ত্তী পংক্তিগুলি এ নিয়মে মেলে না।

৮+৮+৮ (মালতী)

শীতল বারি দি | য়া তৃষিতে তুষি | তে করি তৃপ্ত চ | তুর্ব্বিধ অন্নে
শীতনিপীড়িত | কে নববস্ত্র দি | য়া তঞ্জাত ক | রে যত দাতা।
এসব নিত্য স্ব | খাদ্য সম্পদ | সকল নাহি ক | রে কৃপণেরা
কুণ্ঠিত চিত্ত ক রে ধন সঞ্চিত | কিন্তু পরে হয় | বঞ্চিত তাহে।

১+৮+৮+৮+৬ (মল্লিকা)

স— | সাদর নাহি ক | রে কভু সে রূপ | পাদম গৃহ কি | নিমন্ত্রণে
ব— রং কটু টীক্ষ ক | থা অনলে দগ্ধ | দের মনোগৃহ | দগ্ধ করে।

ভ-- থা কথিতাবি লি | থা কৃপণের মু | রা কৃত সংস্কৃতি | পুরু নরে
ভ যুবক যৌবন | নাম ধরে চয় | সে হয় তাপক | সে স্বদেশে ॥

কিংবা

৮+৯+৮+৬

সমাদর নাহি করে কভু সে রূপ | পাবন হয় কি | নিজ জনে | ইত্যাদি:

৮+৯+৮+৮ মাত্রা (মাধবিকা)

সদা ব্যয় মুষ্টি | করে উপকারক | চিংসন, কুষ্ঠিত | প্রত্যুপকারে
স্বয়ং জন মাত্র | হবে বলিয়া ধন- | দান পরায়ণ | কে বহু নিজে।
ফলে কৃত কর্ম | ফলে হয় বর্দ্ধিত | পাতক লক্ষিত | সম্পদ মধ্যে
বিচিত্র সংস্থ ইহা, কহিতে ধন | ভোগা নহে শুধু | পাতক ভুগে ॥

২+৮+৮+৮+৬ মাত্রা (দুর্লতিকা)

অন্ত | এব সদা ধন | সম্পদ-কেবল | পাপ নিধক্ত ক | সে রূপসে
ধ্রুব | অর্থ অনর্থক | মোহক বন্ধক | চেত হবে ধন | মূঢ় নরে
তব | দানপরায়ণ | চিত্তি সুকৌশল | উদ্ধারিতে হয় | দত্ত অর্পণে
অথ- | মূলক সে ধন | সংহরণে কত | তস্কর দস্যু নি- | যুক্ত করে ॥

৭+৮+৮+৮ মাত্রা (তন্বী)

ভাবস রাত্রি | তর্পিত কমলে | বাঞ্ছিত সঞ্চিত | করুণ নিধানে
ছিন্ন সমূহে | অন্ন বিতরণে | পাতক বর্জক | বিভব বিনাশে।
ভাস্কর তেজে | কবি হত কুশলে | যায় সুশীতল | বদন নিকাশে
তাপিত জীবে | তপ উপশমনে | কুতুক শীতল | তরুর ছায়াতে ॥

৮+৮+৮+৮ মাত্রা (ক্রৌঞ্চপদা)

নাগর কৃষ্ণে | না কর নিন্দা | তিনি নিখিল ভুবন | পতিপতি চরণে
চক্র সমাজে | পালন অঙ্গে | জনম লভিল নয় | বপু ধরি জগতে।
বাসুদ ভাবে | ভাবক ভাবে | প্রণয় ভকতি রিপু | মতিদ্যুত ভজনে
তাপুণ বেশে | মাধব ভাবে | হিতকর হয় তব | জলনিধি তরণে ॥

কিংবা

৮+৮+(২)+৮+৬

নাগর কৃষ্ণে | না কর নিন্দা | তিনি | নিখিল ভুবন পতি | গতি চরণে ইত্যাদি।

২+৮+৮+৪ মাত্রা বেগবতী।

বৃক- | ভাবুকতা বশ- | শাখী চম্পক | পুষ্পনিভা তনু | শোভা
যমু | না জলবৎ চরি | কালো পঙ্কজ, | চম্পক শোভিত | তাহে।

যতি | সুন্দর সাজিল | দুকে জানল | গৌর মনে হর | বর্ণে
ভবহঁ | অঙ্গ মুনগতি | নাড়ে উজ্জ্বল | কান্তি ধরে উভ | রাগে।

৮+৮+৮+৮ শুভমালি।

সংযোগ-সুখে | নবকুঞ্জবাসে | রাধা সহ সে | মুরারি বৈসে
সেবা করিছে | ব্রজাঙ্গনারা | যোগী সকলে | যথা মহেশে।

৮+৮+৬+০ মত্তময়ুর।

সংসারেতে | গোচর সর্ব্বে | তব কা—লো | • •
দৈত্যো চোরে | মার বলেতে | বল না—লো | • •
বাঘের লাগে | রাক্ষস যক্ষে | সহ কা—রী | • •
হিংসার্থে সে | সাহসদাতা | নিদি কো—পে | • •

ইহাই প্রাকৃতের মাত্রা। শেষ পর্ব্ব একেবারে নাই।

বহু দুঃখ | চারির সঙ্গ | ভুগনা—চং | • •

৮+৮+৮+০ ঝোলা। চতুর্থ পর্ব্ব ইহাতেও নাই।

চিরদিন রত রতি | কুহুক বিহারে | বিভব বিলাসে | • •
যৌবন সেবন | নিরত সতত রম | নী—সহ—বাসে | • •

ইত্যাদি।

২+৮+৮+৮+৪ চৌপেয়া। চৌপেয়া ছন্দেই চৌপেয়ার লক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা

চৌ | পেয়া ছন্দে | ত্রিংশৎ মাত্রা | সুমধুর ভণিতে | বর্ণে
গুন | বলি স্পষ্টে | যতিদশ অষ্টে | এবং দ্বাদশ | বর্ণে।
প্রতি | বিরতি দানে | মিলিত সমানে | মিত্রাক্ষর যদি | থাকে
যতি | সুরস হবে সে | কবিতা ভণিতে | নহিলে দুষি না | তাকে।
যথা,—ভ্রম | হয় শিশু সঙ্গে | ভ্রম অবসাদে | মধু বলি মদিরা | পানে,
ক্ষণ | ভঙ্গুর বিত্তে | পুলকিত চিত্তে | কর মমতা অজ্ | ঞানে।
ভৌ | তিক তব কায়া | -ভূত ভূত জায়া | মায়াময় সং | সারে
চিন্ | তহ একান্তে | সে শ্রীকান্তে | ভজ মন সারাৎ | সারে।

ভুবন বাবু এক এই চৌপেয়া ও ঝোলা ছন্দ ছাড়া উপরি উক্ত অন্য কোন ছন্দে দীর্ঘহ্রস্ব স্বর সন্নিবেশে জয়দেবী স্বাধীনতা গ্রহণ করেন নাই। এই দুটি ছাড়া কোন ছন্দই তাঁহার মাত্রা-সমক বা গীত্যার্য্যার রীতি পদ্ধতি অনুসারে রচিত নয়—'জয়দেবী'র অনুসরণেও রচিত নয়। সংস্কৃতের যে সকল ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘস্বর সন্নিবেশের ধ্রুব নির্দ্দেশ আছে ভুবন বাবু সেই সকল ছন্দের নিয়মই বর্ণে বর্ণে উপরের ছন্দগুলিতে অনুসরণ করিয়াছেন—তাঁহার ছন্দঃপংক্তির যতি নির্দ্দেশও ঐ সকল ছন্দের নিয়মানুযায়ী।

বাংলায় পজ্ঝটিকা ও জয়দেবী সহজে চলিয়াছে· জয়দেবীর পর্ব্ব বিভাগ ও যতি নির্দ্দেশের সহিত বাঙ্গালী পাঠক পরিচিত। সেজন্য জয়দেবীমতে মাত্রাগণনা করিয়া অর্থাৎ একটা দীর্ঘমাত্রা দুইটা হ্রস্বমাত্রার সমান, এই রীতি অনুসরণ করিয়া আকৃতি প্রকৃতি ও সুরে যে ছন্দগুলি কতকটা জয়দেবীর সবর্ণ ও সগোত্র, সেগুলিকে অষ্টমাত্রার পর্ব্বে বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছি। ইহাতে ছন্দগুলিকে বাংলায় অনুসরণ করা সহজ হইবে। প্রবন্ধের প্রারম্ভ হইতে একই রীতি আমি অনুসরণ করিতেছি। এগুলিকে আমি জয়দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপ বলিয়া গণ্য করিয়াছি—কোনটার ২য় ও ৪র্থ পর্ব্বে মাত্রাধিক্য বা মাত্রাল্পতা আছে কোনটাতে বা দীর্ঘমাত্রাগুলির নিয়মিত ধ্রুব ব্যবধান আছে—আবার কোনটিতে দুইই আছে অথবা দুই-ই নাই। ইহাতেই যাহা কিছু বৈষম্য হইতেছে। হরগোবিন্দ বাবু ও ভুবনবাবু যে ছন্দগুলির আদর্শ নিদর্শন দিয়াছেন—তাহাদের সকলগুলিকে বাংলায় চালান কঠিন—এত কৃচ্ছ্রসাধ্য, যে তাহাতে রসের প্রবাহ ও ভাবের ধারা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে—কবির লেখনী ও পাঠকের রসবোধ দুইই, ২।৪ পংক্তির পরই অবসন্ন হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়। ভুবনবাবু বা হরগোবিন্দ বাবুর ন্যায় ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, ক্লেশ সহিষ্ণুতা, ছন্দোবোধ, সংস্কৃত জ্ঞান ও শব্দসম্পৎ অতি অল্পসংখ্যক কবিরই আছে। জয়দেবের ছন্দ আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা অনেকেরই আছে—সে জন্য হরগোবিন্দ বাবু ও ভুবন বাবুর প্রবর্ত্তিত অনেকগুলি অচল ও অপাংক্তেয় ছন্দকে 'সচল' ও পাংক্তেয় করিবার আশায় জয়দেবীতে গোত্রান্তরিত করিয়া দেখাইলাম। কবিগণ খুশীই হইবেন। পণ্ডিতগণ হয়ত বিরক্ত হইবেন—তাঁহাদের মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

ছন্দগুলির অনায়াসে চলার সম্বন্ধে আরো ২।১টা কথা আছে।

(১) প্রচলিত দীর্ঘ চৌপদীর মত দীর্ঘ মাত্রা একেবারে বর্জ্জন করিলে চলিবে না—মনে রাখিতে হইবে হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রার সামঞ্জস্যে যে ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টি হয় তাহাই ছন্দগুলির প্রাণ স্বরূপ।

(২) হরগোবিন্দ বাবুর মত দীর্ঘমাত্রার জন্য কেবল মাত্র যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিলে চলিবে না—মনে রাখিতে হইবে যুক্তাক্ষর সংখ্যা বাড়িলে ভাষা সংস্কৃতাত্মক ও দুরূহ হইয়া উঠিবে—আর মনে রাখিতে হইবে দীর্ঘস্বর দীর্ঘ উচ্চারণে যে স্পন্দন দেয় যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হইলেও সে স্পন্দন দিতে পারে না।

(৩) ভুবন বাবুর মত সকল দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘমাত্রার মর্য্যাদা দিলে চলিবে না—মনে রাখিতে হইবে বহু বাংলা শব্দের বিশেষতঃ খাঁটী বাংলা শব্দগুলির দীর্ঘস্বর (ঐকার ঔকার ছাড়া) দীর্ঘ উচ্চারিত হইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। সে গুলিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে বড়ই অস্বাভাবিক শুনাইবে।

বাংলা ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ অভ্রষ্ট ও অবিকৃত রূপে বর্ত্তমান আছে—সে গুলির দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণ করা চলিতে পারে—কিন্তু খাঁটী বাংলার দেশজ ও অপভ্রষ্ট শব্দগুলির

কোন স্বরই কখনো দীর্ঘ উচ্চারণে অভ্যস্ত নহে, কাজেই তাহাদের অনভ্যাসের দীর্ঘতিলক ললাট-পীড়ারই কারণ হইবে। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণনির্ণয়ে কবির কতকটা স্বাধীনতা থাকিলেই ভাল হয়—স্বাধীনতার অনিয়মের মধ্যেও একটা নিয়ম ক্রমে গড়িয়া উঠিতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য, জয়দেবের ও বৈষ্ণব কবিদের পদের মধ্যে উপরে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির ঠিক অনুরূপ পংক্তি বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ান আছে। ভুবনবাবু ও হরগোবিন্দ বাবু একই শ্রেণীর পংক্তিগুলিকে একত্র শৃঙ্খলিত করিয়া বাংলায় কবিতা রচনা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। তাঁহারা দীর্ঘমাত্রার নিয়মিত ক্রম ব্যবধানের দ্বারা ছন্দের হিল্লোলকে নিয়মিত করিয়াছেন। জয়দেবীর ছন্দঃস্পন্দকে নিয়মিত করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে হইলে জয়দেবীর স্বাধীনতাকে ঈষৎ কুণ্ঠিত করিয়া দীর্ঘমাত্রার নিয়মিত ব্যবধান রক্ষা করিতে হইবে।

বারান্তরে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে জয়দেবীর ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিতে যে রূপান্তর হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীকালিদাস রায়

গজল-গান

[সিন্ধু কাফি···কার্ফা]

করুণ কেন অরুণ আঁখি, দাও গো সাকী দাও শারাব।
হায় সাকী এ আঙ্গুরী খুন, নয় বেদনার খুন্-খারাব ॥
দুর্দ্দিনের এই দারুণ দিনে স্মরণ নিলাম পান্‌শালায়।
হায় সাহারার প্রখর তাপে পরাণ কাঁপে দিল্ কাবাব ॥
সইতে নারি দিল্ নিয়ে এই দিল্‌দরদীর দিল্‌লগী।
তাইত চালাই নীল্ পেয়ালায় লাল শিরাজী বে-হিসাব ॥
হায়, শারাবের নেশার রঙে নয়ন-জলের রং লুকাই।
দেখ্‌ছি আঁধার জীবন ভরি ভরপেয়ালার লাল খোওয়াব ॥
আমার বুকের শূন্যে কে গো ব্যথার তারে ছড়্ চালায়।
গাইছি খুশীর মহ্‌ফিলে গান বেদন্-গুণীর বীণ্ রোবাব ॥
হারাম কি এই রঙীন্ পানি, আর হালাল্ এই নয়্না-নীর ?
দোজখ্ আমার হোক মোবারক, বিদায় বন্ধু, লও আদাব ॥
দেখ্‌রে কবি, প্রিয়ার ছবি সাকীর শারাব্-আরশীতে।
লাল্ গেলাসের কাচ্‌মহলার পার হ'তে তার শোন্ জওয়াব ॥

নজরুল ইস্‌লাম

দিল্‌লগী—রহস্য, বিদ্রূপ
খোওয়াব—স্বপ্ন।
রোবাব—তারের যন্ত্র।
মোবারক—ধন্য।
দোজখ—নরক।
মহ্‌ফিল—জলসা।

মারে কেষ্ট রাখে কে !

স্বর্ণকার গঙ্গাধর রায়ের পুত্র পঞ্চানন কি-কারণে পাপপথে পা দিল, তাহা মনস্তত্ত্বের দুরূহ সূক্ষ্ম একটা প্রশ্ন। পঞ্চানন এখন পঞ্চানন, ওরফে গৌরগোপাল, ওরফে সরোজকুমার, ওরফে নিত্য, ওরফে সাতকড়ি !······ফৌজদারী আদালতে নথিপত্রে এতগুলি ওরফে ভড়িঘড়ি পরিচিত হইয়া ওঠা যার-তার কর্ম্ম নয় ; কিন্তু পঞ্চানন হইয়াছে।—

পঞ্চাননের বাপ গঙ্গাধর স্বর্ণকারের কেবল সোনা লইয়া নাড়াচাড়া ; ঐ নাড়াচাড়ায় যেটুকু গুঁড়া পড়ে তাহাই কুড়াইয়া গঙ্গাধরের ঢের পয়সা।······তৎসত্ত্বেও পঞ্চানন কেন পরের দ্রব্যে লোভ করিতে শিখিল তাহা বাড়ীর সকলে বুঝিতে ত' পারেই নাই, তার দলের লোকেও পারে নাই।······

দলের মুকুন্দ বলে,—তুই শালা হেতায় কেন রে ? বাপের ঘরে যা—

কিন্তু, গাঁজার মাহাত্ম্যে মুকুন্দর ধর্ম্মজ্ঞান বাড়িয়াছে মনে করিয়া পঞ্চানন শুধু ঐ সম্বোধনটাই তাহাকে ফিরাইয়া দেয়।

পঞ্চানন চারবার জেল খাটিয়াছে।

অনাহারে তার দিন কাটিয়াছে, শেষসম এ সংবাদও পঞ্চাননের মাতার কর্ণে পৌঁছিয়াছে।

ভদ্রবেশে মেস, হোটেলে ঢুকিয়া ছেলেদের ঘড়ি ছাতা ব্যাগ প্রভৃতি লইয়া চম্পট দেয় যারা, পঞ্চানন তাদেরই একজন।

······বেশ সুশ্রী চেহারা ; তার মনের ছাপ মুখে যেন পড়ে নাই ; দেখিলে সন্দেহ করা অসম্ভব যে ঐ সুশীল সুঠাম রূপের আড়ালে পাপের বাসা আছে।—

আজ সারাদিন পঞ্চানন অনাহারে আছে। গত রাত্রিটাও তার অর্দ্ধাহারে কাটিয়াছে ; তাই সন্ধ্যা সাতটার সময় কিছু উপার্জ্জনের আবশ্যকতা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।······

জুতার উপর কোঁচা আছড়াইয়া ধুলা ঝাড়িয়া আপাদমস্তকে মার্জ্জিত রূপ ধারণ করিল ; এবং হেলিতে দুলিতে ২৯।১ নম্বর হরকুমার দাসের লেনে ঢুকিয়া পড়িল।······তার ডান হাতে মাথা-বেঁকান' বেতের ছড়ি, বাঁ হাতে কাগজে মোড়া রাবিস্······এই রাবিস্‌ই তার উপার্জ্জনের মূলধন।

২৯।১ হরকুমার দাসের লেন একটা বোর্ডিং—ছেলেরা থাকে।······ঢুকিতেই শিলান করা করিডরের মুখে খানিকটা প্রশস্ত স্থান, তারপর প্যাসেজ্।

……পঞ্চানন সটান্ চলিয়া আসিয়া সিঁড়ির ধাপের উপর এক পা তুলিয়া দিতেই পিছন্ হইতে প্রশ্ন আসিল,—কি চাই মহাশয়ের ?

পঞ্চাননের বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল……

কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য—

পরক্ষণেই সে নিরতিশয় নির্লিপ্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, নীচে কাঠ এবং উপরে কাচ দিয়ে ঘেরা বুকিং অফিসের মত ছোট্ট একটা কুঠরীর ভিতর হইতে একজোড়া বৃশ্চিকের মত গোঁফ তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তাহারই দিকে মন দিয়া চাহিয়া আছে

ইনি কেরাণী।—

পঞ্চানন বলিল,—নীহারবাবুকে চাই।

এবং কাগজ মোড়া রাবিসের পার্শেলটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—এই পার্সেলটা তাকে দিতে দিয়েছেন একজন।

গোঁফ বলিল,—কোন্ ফ্লোরে, কোন নম্বরে ?

—তা' জানিনে।

গোঁফ বলিল,—থামুন, দেখ্ছি।……বলিয়া সে মোটা একখানা বাঁধান খাতার পাতা উল্টাইয়া নীহার বাবুকে খুঁজিতে লাগিল।

নীহার বাবু কাল্পনিক ব্যক্তি—

কাজেই থপ্ করিয়া খাতা বন্ধ করিয়া গোঁফ বলিল,—নীহারবাবু কেউ এখানে থাকে না।

থাকে কি থাকে না তাহা পঞ্চাননের কষ্ট স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জানিবার বিষয় নহে।……তবে তাহাকে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেই হইল।…কাঁচা লোক হইলে আম্তা আম্তা করিয়া ওখান হইতেই ফিরিত। কিন্তু পঞ্চাননের গুরুপদে মতিই বৃথা, যদি এটুকু শিক্ষাও তার না হইয়া থাকে যে, দীর্ঘসূত্রতা যতই দোষাবহ হোক, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, তৎপরতার মত স্থানে স্থানে এমন কাজে লাগিয়া যায় যে, সেটা ভাবিতেও আরাম।…… একটুখানি পরে যে কাজটি করিলে ভবিষ্যৎ নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত হইতে পারিত, সেই কাজটা তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া গেছে ইহার দৃষ্টান্ত তাদের মহলে ঢের আছে।……

যাই হোক্, মতলবের গলায় দড়ি পড়িবামাত্র পঞ্চাননকে ন্যাকা সাজিতে হইল।……আস্তে আস্তে আগাইয়া যাইয়া বলিল,—এটা কি ২৯ নম্বর নয় ?

গোঁফ বলিল,—না। এটা ২৯এর ১ নম্বর। আপনার নীহারবাবু বোর্ডিং-এ থাকেন কি বাড়ীতে থাকেন জানা আছে কি ?

—বোর্ডিং-এ থাকেন।

—তা' হ'লে ২৯১২ নম্বর দেখুন। সেটাও বোর্ডিং।

শুনিয়া পঞ্চানন যেন দিশা পাইল; অতিশয় খুসী হইয়া, বলিল,—ঠিক্ ঠিক্, তাই বটে; ২৯১২ নম্বরের কথাই ত' তিনি বলে দিয়েছেন।…কি আশ্চর্য্য!…আচ্ছা, তবে আসি। অনর্থক আপনাকে কষ্ট দিলুম।—বলিতে বলিতে পঞ্চানন পার্সেল এবং ছড়িসহ যুক্তকর কপালে তুলিল,……

কিন্তু কে জানে কেন, গোঁফ তাহা লক্ষ্যও করিল না; কোটর ছাড়িয়া সে বাহিরে আসিল; এবং ক্রমশঃ একেবারেই পঞ্চাননের গায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া চোখ্ নাড়িয়া বলিল—ঐ ২৯১২ নম্বরেই দেখুন, সুবিধে হ'তে পারে।……বলিয়া গোঁফ গোঁফের আড়াল হইতে এমন দু'পাটি দাঁত বাহির করিল যে মানুষ মাত্রেরই তা' অসহ্য।—

২৯১২ নম্বরে সুবিধার কথাটায় গোঁফ কি ইঙ্গিত করিতেছে তাহা পঞ্চাননের বুঝিতে দেরী হইবার কথা নয়; বিশেষতঃ তাহার ঐ গুম্ফলগ্ন বক্রহাসি……

হাসিটা পঞ্চাননের প্রাণে যেন বৃশ্চিকের বিষ ঢালিয়া দিল।

কিন্তু এইখানে পঞ্চানন যে অভিনয়টুকু করিল তা' একেবারে নির্দ্দোষ, চমৎকার……

অবাক্ হইয়া গোঁফের মুখের দিকে খানিক্ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া সে নিজের মুখের উপর মর্ম্মাহতের অপার বেদনার এমন একটা কালো ছায়া নামাইয়া আনিল যার কৃত্রিমতায় সন্দেহ করা দূরে থাক্, মনেই হইবে না যে এই আঘাত সে জীবনে ভুলিতে পারিবে।……নিষ্কলঙ্কে যে এমন দারুণ সন্দেহ করে তাহাকে পঞ্চাননের বলিবার কিছু নাই।…পুনর্ব্বার সে কপালে হাত ঠেকাইয়া ঘাড় হেট করিয়া বাহির হইয়া গেল।—

মোড়ের আড়ালে আসিয়া পঞ্চানন ফুট্‌পাথের উপর দাঁড়াইয়া মনের অশান্তি ও ক্লান্তি দমন করিতে লাগিল।…এতক্ষণ সে বাহিরে একেবারে নির্লিপ্ত সাধারণ ভদ্রোচিত ভাব বজায় রাখিলেও বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়া তার ভিতরের উত্তাপ কিছু ওঠানামা না করিয়া পারে নাই।…

দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে ভয় হয় বৈকি—

অত্যন্ত অসাবধান ব্যস্তবাগীশ কাঁচা লোক কাজে হাত দিয়া বাজার এমন খারাপ করিয়া দিয়াছে যে একটু বেতর হইলেই আর কথা নাই……কেলেঙ্কারীর একশেষ হইয়া যায়।—

পঞ্চানন ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল; যেন কাহার আসিবার কথা আছে; আপন মনে সে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে……

কিন্তু মনটিকে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় পুনরায় কেন্দ্রে আনিতে তখন তাহার পায়চারিরই দরকার।……ঠিক্ মানুষের এইটুকু বড় সুখ যে, মন একসঙ্গে অসংখ্য বিষয়ে তাগিদ্ দিতে থাকিলেও দেহ তাদের একটিকেই প্রাধান্য দিয়া চলে, বসে, ছোটে কি শোয় ইত্যাদি।……কিন্তু

এমন মানুষও আছে, যে এই অসংখ্য তাগিদে অস্থির হইয়া ওঠে…কোনো দিকেই দিশা পায় না…কেবল আকুলি-ব্যাকুলি করে…

ইহারাই কাজ পণ্ড করিবার গোঁসাই—

এবং মন ইহাদের অসুস্থ।

জ্বালা-নিবারণই পঞ্চাননের মনের তখনকার প্রধান আকাঙ্ক্ষা; কাজেই উপার্জ্জনের দিকে দুর্ব্বার একটা তাগিদ সত্ত্বেও সে পায়চারি করিয়া মানসিক দাহ নিবারণ করিতে লাগিল।—

পাশেই ২৯।২ নম্বর।—

কিছুক্ষণ হাওয়া খাইয়া ঢুকিবে কি না ভাবিতে ভাবিতেই পঞ্চানন ২৯।২ নম্বরে ঢুকিয়া পড়িল।…দুটিই একই প্যাটার্নের বাড়ী।…বাঁ দিকে সিঁড়ি; কিন্তু বিমুখ-কাহিনীর নাম স্মরণ করিয়া সে ঘুরিল এবার ডান দিকে।—২৯।১ নম্বরে ডান দিক হইতেই শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল।…দেখিল, এখানেও কেরাণী বিদ্যমান; কিন্তু তিনি একটু অলস প্রকৃতির।—টেবিলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া কায়-ক্লেশ মোচন করিতেছেন।……

সেই মুহূর্ত্তেই স্তম্ভিত বাধ' বাধ' ভাব কাটাইয়া পঞ্চানন সাফল্যের সম্ভাবনায় ক্ষিপ্র হইয়া উঠিল……গোড'-এর ছেলেরা যেমন তর্ তর্ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে উঠিয়া যায় পঞ্চানন তেমনি অবাধগতিতে উঠিয়া গেল।—

সিঁড়ির সম্মুখেই রেলিং-গাঁথা প্রশস্ত বারান্দা; বারান্দার কোণেই একটা ঘর, অন্ধকার এবং নিঃশব্দ।…ঘরের সামনে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়াই গলার একটু শব্দ করিয়া পঞ্চানন ঢুকিয়া পড়িল—

কিন্তু আজ বিধাতা বাম।……

তখনই পাশের ঘরে চটির শব্দ এবং সিঁড়িতে জুতার শব্দ যুগপৎ জাগিয়া উঠিল।…চটি যার সে কাহার প্রশ্নের উত্তরে একটু থামিয়া বলিল,—পড়্‌তে যাচ্ছি।…চটির শব্দ পাশের ঘরের দরজার বাহিরে আসিল।—

ও কি এই ঘরেরই অধিবাসী? নিশ্চয়ই তাই। পাশের ঘরে ছিল বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া যায় নাই।…সিঁড়িতে খট্ খট্ জুতার শব্দ অবিশ্রান্ত উঠিয়া আসিতেছে।—

…কয়েক মুহূর্ত্তেই অন্ধকার অভ্যস্ত হইয়া বিছানার সাদা চাদরটা পঞ্চাননের লক্ষ্য হইল…হাতড়াইয়া তক্তাপোষের কিনারা পাইল…এবং কালবিলম্ব না করিয়া অক্লেশে তক্তাপোষের নীচে ঢুকিয়া গেল।…সেই নিমেষেই চটির শব্দ সেই ঘরেই ঢুকিল; এবং সিঁড়িতে জুতার শব্দেরও শেষ হইল।……

তক্তাপোষের উচ্চতা অল্প; আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সাড়ে তিন টাকার তক্তাপোষ।—তাহার নীচে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকা যায় বটে, কিন্তু তাহার সময়ের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করা আছে; সময়ের সেই সীমাটা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই ঘাড়ের দাঁড়া টাটাইয়া ওঠে।...চটি বিজলী বাতি জ্বালিয়া পড়িতে বসিল। তার পড়া সুরু করিবার তোড়জোড় করিতে যে মিনিট পনর' গেল তাহার মধ্যেই হেঁটমুণ্ড পঞ্চাননের ঘাড় টাটাইয়া যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল।—

পঞ্চানন ভাবিতে লাগিল,—ছোঁড়া পড়িতে বসিল খাওয়া শেষ করিয়া, না পড়া শেষ করিয়া খাইতে যাইবে? রাত মোটে আটটা—ইহারই মধ্যে খাওয়া বোধ হয় হয় নাই।...আর একখানা তক্তাপোষ দেখিতেছি। তিনি আসিবেন কখন!...যদি খাইয়া আসিয়া পড়িতে বসিয়া থাকে তবে, মাল হাতান চুলোয় যাক্ পলায়নের অবসর মিলিবে কি?...ভাবিয়া লাভ নাই, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।...

পঞ্চানন ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

দ্বিতীয়বার পদশব্দ ঘরে ঢুকিল—

এবার রোপ্‌সোল। ইনি অন্য সিটের দখলিদার।

রোপ্‌সোল বলিল,—কি হে ভাল ছেলে, সন্ধ্যে না হ'তেই যে বসে গেছ।

চটি বলিল,—মনটা ভাল নেই ভাই, তাই অন্যমনস্ক হচ্ছি।

—ছাই হ'চ্ছ। "এমন চাঁদের আলো"—ঘরে মন ভাল থাকে কখন! চল ছাতে যাই। দিব্যি জ্যোৎস্না।

চটি কথা কহিল না।

রোপ্‌সোল বলিল,—ঘরে বসে' এমন সন্ধ্যা কাটিও না, মহাপাপ হবে।

পঞ্চানন তক্তাপোষের নীচেয় আশান্বিত হইয়া উঠিল...চাঁদের আলোর এ নিমন্ত্রণ বুঝি সার্থক হয়।......

কিন্তু পঞ্চাননের এ উল্লাসটুকু বাজে খরচ হইয়া গেল।...চটি বলিল,—ছাতে এখন যাব না, জ্যোৎস্নায় মন আরও উদাস হ'য়ে যায়।—

পঞ্চানন মনে মনে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, উদাস! ব্যাটা কত কথাই কইতে শিখেছে! তোমার মাথা খাওয়া গেছে বাবা।...এই বয়সেই জ্যোৎস্না দেখে উদাস!...হয় হবে উদাস—একটিবার বা।

কিন্তু পঞ্চাননের মনের কামনা চটিকে ঠেলিয়া ছাতে পাঠাইতে পারিল না—সে বসিয়া বসিয়া পড়িতেই লাগিল...জ্যোৎস্নায় তার রুচি নাই।

—তবে পড়'। বলিয়া রোপ্‌সোল বাহির হইয়া গেল।

ঘাড়ের হাড় টনটন্ করিয়া টাটাইয়া ওঠায় পঞ্চানন পা ছড়াইয়া কনুইয়ে ভর দিয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসার মত বসিয়াছিল, কিন্তু মানুষের রক্ত-মাংসের দেহে সেটাও অসম্ভব—এই কারণে যে, কঠিন স্থানে কনুই বেশীক্ষণ চাপিয়া রাখিলে সন্ধিস্থলে যেন আগুন জ্বলিয়া ওঠে।…কাজেই বহুবার এ-হাত ও-হাত পাল্টাপাল্টি করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া পঞ্চানন পার্শেলটি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল। শুইবার সময় হস্ করিয়া একটু শব্দ হইল।…চটি চেঁচাইয়া পড়িতেছিল, শব্দটা শুনিতে পাইল না।…পঞ্চানন কাঁপিয়া উঠিয়া ভাবিল,—সর্ব্বনাশ শুনতে পেলেই গেছলুম।……

কিন্তু বাবার দাখিল করিয়া তুলিল মানবশত্রু মশা।…তাহারা একদল পঞ্চাননের আশেপাশে জুটিয়া গেল…কেহ ধরিল কর্ণমূলে গান…পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ না করিলেও কেহ কেহ খাইয়া পড়িল পায়ে। মশার গান মধুর না হইলেও বিষাক্ত নহে ; কিন্তু হুলে তার বিষ জীবাণু দুইই আছে।…… পঞ্চানন ঘনঘন দেহ আন্দোলিত করিয়া নূতন মশা বসিতে দিল না বটে, কিন্তু যাহারা বসিয়া গিয়াছিল তাহারা শুধু আন্দোলনে বিচলিত হইল না —

তা হয়ও না। যাহারা রক্ত শোষণ করে তাহারা আন্দোলনে বিচলিত হয় না এটা আধিভৌতিক, বৈজ্ঞানিক সত্য—

রক্ত শোষণের ধর্ম্মই ঐ।

মশক অল্পপ্রাণ জীব, কিন্তু তার জ্বালা অল্প নয়।…অমানুষিক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া পঞ্চানন মশক-দংশন নিঃশব্দে সহ্য করিতে লাগিল।…কিন্তু সময় আর কাটে না—

ছোঁড়া কি মহাভারত শেষ না করিয়া উঠিবে না? ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই?

ঢং ঢং করিয়া খাবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—

সে শব্দে পঞ্চাননের মনে হইল, যেন কত যুগ পরে গুরুভার মর্ম্মবেদনার নীরবতা ভাঙ্গিয়া পৃথিবী সহসা আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া কলকণ্ঠে হুলুধ্বনি করিতেছে।…কত যুগ সে বন্দী হইয়া আছে…মুক্তি ঐ অদূরে।—

চটি সশব্দে বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, রোপ্ সোলও “চাঁদের আলো” ছাড়িয়া ঘরে আসিল, বলিল,—তালাটি কোথায় রেখেছ?

শুনিয়া পঞ্চাননের অদূরবর্ত্তী মুক্তি সুদূরে সরিয়া গেল, এবং যাইবার সময় তার মুখেচোখে একটা পাণ্ডুরতা মাখাইয়া দিয়া গেল।…হঠাৎ একটা মানসিক উত্তেজনার ধাক্কায় পঞ্চানন সহসা উঠিয়া বসিবার উদ্যম করিয়াই যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া থাকিয়া সম্মুখে জেলের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে লাগিল।…তবে কি ধরা পড়িলাম!…দরজায় তালা লাগাইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ বাহির হইয়া দু'জনকে দু'হাতে ঠেলিয়া দিয়া কি লম্বা দেওয়া যায় না!…খুব দ্রুতবেগে অথচ শব্দটি না করিয়া তক্তাপোষের

তলদেশ হইতে বাহির হইতে পারিলে তাহা সম্ভব বটে, কিন্তু নিঃশব্দে নির্গত হওয়াই অসম্ভব…খস্‌খস্‌ খুট্‌খাট্‌ একটু শব্দ হইবেই। আচ্ছা দেখা যাউক।—

তালা খুঁজিয়া লইয়া দরজায় লাগাইয়া দিয়া ছেলে দু'টি খাইতে গেল।…পঞ্চানন তক্তাপোষের তলাকার পিঠটার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—এ পিঠটা পালিস করে না কেন!…সে কথা যাক্—এখন উপায় কি?…আছে, উপায় আছে।…ছেলেরা বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িলে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া—শব্দ একটু হইলই বা, মনে করিবে ইঁদুর টিঁদুর—আস্তে আস্তে বাহির হইয়া ছট্‌ করিয়া দরজা খুলিয়া হৈ চৈ চিত্তাকর্ষক হইবার পূর্ব্বেই দৌড় দিলেই—

কিম্বা এখনই দরজার পাশে একেবারে খাড়া-চৌকাঠ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া যদি থাকা যায়, আর দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে হুম্‌কি মারিয়া ভয় দেখাইয়া—

কিন্তু ছেলেরা বেজায় আড্ডাধারী—

পড়াশুনা ত' অষ্টরম্ভা, কেবল বাপমায়ের পিণ্ডি চট্‌কান'—

খাওয়া দাওয়ার পর পাঁচসাতজন এক একটা ঘরে বসিয়া অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক দেড়েক ধরিয়া আড্ডা দিয়া থাকে; যদি পাঁচসাতজন একসঙ্গে এই দরজার সম্মুখেই আসিয়া দাঁড়ায়……কাজ কি অত-শতয়। প্রথমটাই ভাল।

…দেখিয়া রাখি কোথায় কি আছে, যাইবার সময় ফাঁক্‌তালে যদি কিছু সরাইতে পারা যায়। ফাঁক অবশ্য পাওয়া কঠিন; তবু……

পঞ্চানন চিৎ হইয়া ধীরে ধীরে ঘষিয়া ঘষিয়া আসিয়া শরীরের অর্দ্ধেকটা তক্তাপোষের বাহিরে আনিয়াছে এমন সময় দরজার বাহিরে কে ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল,—কে?

পঞ্চাননের বুক ধড়ফড় করিয়া নিঃশ্বাস যেন আটকাইয়া আসিল।…

কিন্তু তাহাকে নয়।

বাহিরেই কে একজন বলিল,—আমি।

—প্রভাত? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ, আমি হঠাৎ দেখে চম্‌কে উঠেছি।

পঞ্চানন মনে মনে বলিল,—ঢের বেশী চম্‌কেছি আমি।

বুকের ধড়ফড়ানি থামিলে পঞ্চানন মাথাটা ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল, কোথায় কি আছে; দেখিল—যে ছেলেটি পড়িতেছিল তাহার টেবিলের উপর একটি রিষ্ট্‌-ওয়াচ্‌ রহিয়াছে—চোরাই মালের দামে তার দাম তিন টাকা কি তের সিকে; মণিব্যাগ একটা আছে বটে, কিন্তু তার চোপসান পেট দেখিয়া মনে হইল তার গর্ভে কিছু নাই; একটা ফাউণ্টেন পেন রহিয়াছে; পঞ্চাননের মনে হইল,

নূতনই তার দাম দশ আনার বেশী নয়; আল্‌নায় মামুলি চাদর, জামা, ছাড়া-কাপড় রহিয়াছে···ইত্যাদি।

···ওধারকার রোপ্‌সোলের টেবিল দেখিতে পাওয়া গেল না; চিৎ অবস্থায় সেটা পঞ্চাননের পিছনে পড়িয়াছিল।—

ছেলেরা খাইয়া আসিল—

কিন্তু তৎপূর্ব্বে পঞ্চানন স্বস্থানে প্রবেশ করিয়াছে।···পঞ্চাননের নাকে রোপ্‌সোলের বিড়ির এবং চটির সিগারেটের একটা মিশ্রগন্ধ আসিতে লাগিল।···রোপ্‌সোল দু'টানেই বিড়ির মুন্সী পর্য্যন্ত আগুন আনিয়া ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল—

কি চাওয়া যে চেয়ে গেল
মৃগনয়নী—
বুকে রক্ত তোলপাড়,
নাচে ধমনী।
যৌবন লুট 'তে চায়
তারি পায় তারি পায়,
দোলে প্রাণ ঢেউ লাগি'
যেন তরণী।
তার সেই চাহনিতে
বিষ ছিল কি—
ঢেলে' দিয়ে গেছে তাই
ছলে ঝলকি।
মিলাল বিদ্যুৎরেখা—
কোথা তার পাব দেখা,
জ্বলে প্রাণ জ্বলে প্রাণ—
শুষ্ক ধমনী।
কি চাওয়া যে চেয়ে গেল—হা।...

সোমের স্থানে হা দিয়াই রোপ্‌সোল বলিল—বউয়ের চিঠি পেলাম আজ আবার।

চটি বলিল,—বেশ ঘন ঘন লেখে ত!

—লিখবেই ত। চোদ্দ বছর বয়েস, লিখ্‌বে না?

—পড়, শুনি।

—একটুখানি সবুর কর। চোদ্দ বছরটাকে একবার অনুভব ক'রে নি।

মিনিট খানেক নিঃশব্দে গেল।

চটি বলিল,—কি রকম বোধ করলে ?

—গরম। আঃ হা হা। শাঁসে জলে' নিরেট হ'তে সুরু করেছে। আ হা হা।...

—মসগুল যে! আমারও দিন আসবে হে আসবে ; তোমরা তখন—

—কবে আসবে ? আসতে আসতে ওদিকে যাবার সময় হয়ে আসবে। সত্যি ভাই, ষোল আনা সুখ যদি কোথাও থাকে তবে চোদ্দ বছরেই আছে।

—বিরহেও ?

—তুমি নেহাৎ একটি ভোজপুরী খোট্টা, রসশূন্য! সুখ ত' বিরহেই। কাঁচা মাংস যেমন অচল, শুধু মিলনও তেমনি অচল! ধ্যান ক'রে ক'রে মনটাকে কেমন তৈরী ক'রে নিচ্ছি—সেও নিচ্ছে। যখন দেখা হবে তখন—

বলিয়া সে থামিল।

চটি বলিল,—তখন কি ?

—ত'ক্ষণেই পরিপক্ক ; বিরহের তাতে পে'কে লাল হ'য়ে আছি .....দুই বুকের মাঝখানে ফুলের মালার ব্যবধানটাও সইবে না।

—আমাকেও যে তাতিয়ে তুললে হে!

—চোদ্দ বছরের ধর্ম্মই ঐ। যে শোনে সেও তাতে।

—এখন চিঠি শোনাও দেখি।

পঞ্চানন অবিবাহিত, কিন্তু রসগ্রাহী।...মস্তকের দংশনজ্বালা ভুলিয়া সে ছেলেদের কথাগুলি বেশ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করিতে লাগিল।......

চোদ্দ বৎসর যার স্ত্রীর বয়স সে বলিল,—শোনো ; অবহিত হ'য়ে শোনো। প্রিয়া লিখ্ছেন—

প্রাণাধিক, তোমার চিঠি পেলুম। তুমি কত কথা লিখেছ, আমি তোমার সব কথা ভাল বুঝ্তে পারিনি। তুমি জান্তে চেয়েছ, আমি তোমাকে ভালবাসি কি না। ইহা জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিৎ হয় নি। স্বামীকে কে না ভালবাসে ?......

চটি বাধা দিয়া বলিল—এই মরেছে। এ যে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চিঠি। রস কই ?

—আছে, বন্ধু, আছে। সিঁড়ি ভাঙ্তে হবে, নইলে স্বর্গে উঠ্বে কি করে।

রোপ্সোল বিষবৃক্ষ পড়িয়াছে।

চটি বলিল,—আচ্ছা, তারপর ?

রোপ্‌সোদ পড়িতে লাগিল,—স্বামীকে কে না ভালবাসে ? তোমার মুখখানা সব সময়ই আমার মনে পড়ে। স্বপ্নেও দেখি যেন তুমি আমায় আদর করছ। ঘুম ভেঙ্গে দেখি, গায়ে কাঁটা দিয়ে আছে।

শ্রোতা চটি বলিল,—দেবারই কথা।

পাঠক রোপ্‌সোদ বলিল,—ভেবে দেখো, কত বড় কথাটা লিখেছে—গায়ে কাঁটা দিয়ে আছে !...ইস্। আমার একটা দুঃখু র'য়ে গেল, ভাই।

—কি দুঃখু ?

—আমি ছুঁলে তার গায়ে কাঁটা দেয়, দেয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সেইটে আমি চোখে কখনো দেখ্‌তে পেলাম না। দেখ্‌তে পেলে বেশ জমে কিন্তু।

—সাম্‌নাসাম্‌নি বোধ হয় অন্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্বপ্নে শিহরণ, কিন্তু জাগ্রতে স্বেদ। যাক্, তারপর ?

—আগের চিঠিতে চুমু দিতে ভুলে' গেছ্‌লুম তাতে তুমি রাগ ক'রে' লিখেছ, এই বয়সেই চুমু দিতে যে ভুলে যায় সে পাষাণ। তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি করছি রাগ করো না। সেবারকারটা এখুনি দিলুম। নিলে ত' ?

মনের কথা ভাল ক'রে আমি লিখ্‌তে পারিনে। তাতে কি তুমি রাগ কর ? তোমাকে দেখ্‌বার আশায় আমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল। মনে হয়, তোমার কাছে ছুটে যাই।

চটি বলিল,—তা' বেশ ত, আসুন না। আম্‌রা না হয় একটা ঘর ছেড়ে' দেব।

রোপ্‌সোদ বলিল, তুমি একটি ছাগল। হাটের মাঝে প্রেম হয় ? মনে কর ব্রজাঙ্গনাদের কথা···তাঁরা বৃন্দাবনের বাজারে ব'সে প্রেম করেন নি, প্রত্যেকের একটি ক'রে কুঞ্জ ছিল।

চটি বলিল—তা' সত্যি।

রোপ্‌সোদ বলিল,—আমার মনে হয় কি জানো ? আমাদের ভালবাসাটা বরাবর যোয়াল' থাকে না এই জন্যে যে, নিরিবিলি ভাবটা, শুধু আমরা দুজন এই ভাবটা, বেশিদিন থাক্‌তে পায় না।

—যায় কিসে ?

—একান্নবর্ত্তিপরিবারের গোলে যায়; তার উপর ছেলে-পিলে হ'লে ত একেবারে সে কুরুক্ষেত্রের হাঙ্গামা ঘরের ভেতর। কার সাধ্যি যায়, তার কোনো উপায় নেই।... তারপর শোনো।—ছুটে' যাই। কিন্তু উপায় নাই। দূরে থেকেই সব জ্বালা সহ্য ক'রতে হচ্ছে। একটিবার আস্‌তে পার না ? দু'দিনের জন্যে ? যদি পারো তবে এসো।

ভাল আছি। আর সবাই ভালই আছেন। আমার প্রণাম নিও। চুমু। ইতি—

তোমারই সেবিকা বরুণা।

চটি বলিল,—এ নামটা নতুন শুনছি।

—আগের চিঠিতে ঐ নাম রেখেছি। হাসির ঝরণা, প্রেমের ঝরণা, প্রাণের ঝরণা, রসের ঝরণা কি না।

—চিঠিরও ঝরণা।

—সে আমরা দু'জনেই।

—ডেকেছে, যাবে নাকি ?

—কি ক'রে যাই বল ; একটু কারণ না দেখা'তে পারলে বাড়ীতে বড় লজ্জা করে।

শুনিয়া এত কষ্টের মধ্যেও পঞ্চানন ঠোঁট মুচ্‌ড়াইয়া একটু হাসিল।

চটি বলিল,—আলো নিবিয়ে দেব ?

—একটু প'ড়্‌ব কি না ভাব্‌ছি।

—এই যে পড়্‌লে। এইবার শুয়ে পড়ো।

......তক্তাপোষের পায়া বাহিয়া ছারপোকা নীচের দিকে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ছারপোকা সন্ধান পায় একটু বিলম্বে, কিন্তু নামে একেবারে ডিম্বটি পর্য্যন্ত···

একটি পঞ্চাননের ঘাড়ে এবং একটি পঞ্চাননের পায়ে একসঙ্গে শুঁড় ফুটাইয়া দিল... পঞ্চানন নড়িয়া উঠিল এবং ঘাড়েরটাকে ঘাড়ের সঙ্গেই টিপিয়া মারিল···পা খানা একপাশে একটু কাৎ করিয়া অন্যটাকে বঞ্চিত করিল বটে, কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য।—

চটি উঠিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ডাণ্ডা লাগাইয়া দিল···আলো নিবাইয়া দিয়া দু'জনেই শুইয়া পড়িল।

রোপ্‌সোল বলিল,—ছুটির আর কত দেরী ?

চটি বলিল,—হি হি হি। এখনো তিন মাস।

—তিন মাস দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে, কি বল ?

—তা' যেতে পারে।

—যেতে পারে কি রকম ? যাবেই।

—তা' ছাড়া আর সান্ত্বনা কই ! তিন মাসকে যত লম্বা ক'রে দেখ্‌বে কষ্ট তত বেশী।

মিনিট দুই দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল।—

ওরা দরজা বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই পঞ্চাননের মনে একটু আশার আলোক প্রবেশ করিয়াছিল ; দু'জনে চুপ করিতেই আলোর তেজ একটু বাড়িল; কিন্তু ছেলেদের, বিশেষ করিয়া এই দু'টির পড়ায় যেমন অমনোযোগ, চোখেও তেমনি ঘুম নাই।......

ঘোপ্‌সোল বলিয়া উঠিল, আজ এক ব্যাটা কাড়ে দোকানদার আমায় বড্ড ঠকিয়েছে, ভাই।

—কি রকম।

—আস্‌ছি বৌবাজার দিয়ে। পুরণো ল্যাম্প ট্যাম্প গুলো মাটিতে দোকান পেতে' যারা বেচে তাদেরই একজন। দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা বাতিদান আমার পছন্দ হ'য়ে গেল, দিব্যি ফুলদার। দাম বল্‌লে আট আনা। আট্‌ আনাই দিয়ে চলে আস্‌ছি, তখন সে বল্‌লে, মশাই, ভুল হয়েছে, ওটার দাম এক টাকা। আমি বল্‌লাম,—এখন দাম বাড়ালে' চল্‌বে না। তুমি নিজে চাইলে আট আনা, আমি বিনাবাক্যে দিলাম, এখন বল্‌ছ দাম এক টাকা। কথাটা ত ব্যবসাদারের মত হ'ল না। সে বল্‌লে—একটাকাই দিতে হবে যদি নিতে চান্‌, না হয় রেখে যান্‌। ……চন্‌ করে' আমার মাথায় রক্ত চড়ে' গেল ; বনাৎ করে' আর একটা আধুলি তার সাম্‌নে ফেলে দিয়ে বাতিদানটাকে একখানা ইঁটের ওপর রেখে একখানা ইঁট দিয়ে ছেঁচে' তার দোকানে ফেলে দিয়ে চলে' এলাম রাস্তার লোক সব অবাক্‌ হ'য়ে গেল।

চটি বলিল,—দোকানীর ত' ভারি লোক্‌সান হ'ল তাতে ;

—হ'ল বৈকি। কতজন তাকে কথা শুনিয়ে গেল……আরো দু'চারজন যারা দোকানে বসে' জিনিস পছন্দ করছিল তারা সরে' পড়ল

আমারও একদিন প্রায় ঐ রকমই হয়েছিল।—বলিয়া চটিও ঠনঠনিয়ার এক অসৎ দোকানদারের কারচুপির একটা দৃষ্টান্ত দিল।…

ইতিমধ্যে অধোগামী ছারপোকার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। কাপড় জামার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহারা পঞ্চাননের দেহ যেন শরশয্যার উপর তুলিয়া দিয়াছে।……তৎসত্ত্বেও তার চোখের চারিটি পাতা ঘুমের আঠায় যেন জড়াইয়া জড়াইয়া আসিতে লাগিল।……সমস্ত দিনের শ্রান্তিতে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়াছিল, তার উপর স্নায়ুমণ্ডলী ক্ষুধায় দুর্ব্বল।……পঞ্চাননের হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল।—

……বেপরোয়াভাবে তক্তপোষের নীচে হইতে বাহির হইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাই……আর ভয় করিলে চলিতেছে না……ধরা পড়িয়া মার খাওয়াও ভাল, কিন্তু এ অবস্থায় আর নয়।……ভাবিতে ভাবিতে পঞ্চাননের দিবাদৃষ্টি লোপ পাইতে পাইতে হঠাৎ রহিয়া গেল।—

……মা'র ত' আছেই তারপর যদি পুলিশে দেয়… নিষ্ফল চেষ্টার অপরাধেও দাগীর খুব লম্বা জেল হয়। …এতক্ষণে পঞ্চাননের ভগবানকে মনে পড়িল ; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আপ নিই বাহির হইয়া আসিল। …কিন্তু সে উত্তপ্ত আকুলতা ভগবানের পায়ে পৌঁছায় নাই ইহা ঠিক।……

দশটা বাজিল

ছেলেরা গল্প করিতেই লাগিল..... প্রফেসারদের গল্প, বন্ধুবান্ধবের গল্প :—নিন্দাই তার বেশীর ভাগ ;—খরচপত্রের গল্প, বিলাতের গল্প, রাজনৈতিক গল্প......

অবশেষে রোপ্‌সোল বলিল,—শুনেছ হে, ভারতবর্ষে নাকি আটলক্ষ শিক্ষিত লোক কাজের অভাবে বেকার বসে আছে।

চটি বলিল,—আমাদেরও থাক্‌তে হবে।

আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থগুলো কালে লোপ পেয়ে যাব।

—যদি শিক্ষার অভিমান না ছাড়্‌তে পারি।

—অভিমান ছাড়্‌লে উপায় আছে নাকি ?

—আছে, মানে নতুন কিছু নেই। এখন যে-কাজ অশিক্ষিত লোকে করছে সেই কাজ আমাদের করতে হবে।

—যথা ?

—কামার, কুমোর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি—

—তা' হলেও ত' লোপ পাওয়াই হ'ল। আমরা মর্‌ব না বটে, কিন্তু আম্‌রা আর আম্‌রা থাক্‌ব না। মধ্যবিত্তশ্রেণী লোপ পাবেই, তাতে—

* * * * *

সকালবেলা ছেলেরা মুখ ধুইতে গিয়াছে—

সেই অবসরে চাকর ছোঁড়া ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল,—বাবুগো, খাটের নামোতে কে রয়েছে।

পাশের ঘর হইতে একটি ছেলে বাহির হইয়া বলিল,—কে রে ?

ছোঁড়া বলিল,—কি জানি, বাবু। দেখুন এসে।

—চল্ দেখি বলিয়া পাশের ঘরের ছেলেটী তার নির্দ্দেশমত হামা দিয়া দেখিল, তক্তাপোষের নীচে কে একজন কাগজের একটা পার্শেল মাথায় দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে।......
চক্ষের নিমেষে এই আবিষ্কারের সংবাদ ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল—খাটের নীচে শুয়ে কে ঘুমুচ্ছে, দেখুন এসে......

পশু ঝাঁটা হাতে করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—আমি আগে দেখেছি, বাবু।—

চটি ও রোপ্‌সোলও, কোথায় কোথায় ?...জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদেরই ঘর লোকে পূর্ণ হইয়া গেছে।...সবাই হেঁট হইয়া জানু পাতিয়া একবার করিয়া পঞ্চাননকে দেখিয়া লইল ; এবং চটি ভয়ে শুকাইয়া উঠিয়া নিজের ছিন্নকণ্ঠ চোখের সামনে দেখিতে লাগিল।......

কিন্তু এত বিক্ষোভেও পঞ্চাননের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।—

[illegible] বলিল,—ঢুকল কখন ?

কেহ তাহা জানে না।

হেমন্ত বলিল,—জাগাও লোক্‌টাকে। বলিয়া নিজেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া ডাকিল,—মশাই, উঠুন, ঢের বেলা হয়েছে।

মশাই উঠিলেন না।

বামন গলার আওয়াজের জন্য বিখ্যাত; বলিল,—মিহি গলার কাজ নয়। আমি দেখি। বলিয়া সে ডাকিল,—কে আপ্‌নি তক্তপোষের নীচে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন ?

……আওয়াজে কাজ দিল;

পঞ্চাননের ঘুম ভাঙ্গিল—এবং চোখ খুলিয়াই দেখিল, তক্তপোষের তলাটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে……

হরেন বলিল,—জেগেছে ?

বামন পঞ্চাননকে চোখ খুলিতে দেখে নাই বলিল,—বোধ হয় না।

রমেশ হুকুম দিল,—খুঁচোও

শুনিয়া পঞ্চানন ধাপ্‌সে নড়িয়া উঠিল……

এবং চোখ্ ফিরাইয়াই সে যে-দৃশ্য সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইল, ছাগ বলি আর রক্তমাখা বলির খাঁড়া গোঁসাইয়ের চক্ষে তত কঠোর দৃশ্য নহে। কিন্তু দেখিল অতিশয় সাধারণ দৃশ্য ……দুই জোড়া চক্ষু, আর অসংখ্য পা।—

তক্তপোষের তলাটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াই তার মনে ভবিষ্যতের একটা ইতিহাসের প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল।…অতগুলি পা কাছাকাছি এক জায়গায় দিবালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া প্রাণ ফাটিয়া দৈত্য বাহির হইয়া আসিল।—

বামন বলিল,—জেগেছেন, আমাদের পানে চেয়ে রয়েছেন।—পঞ্চাননকে বলিল,—দয়া ক'রে বেরিয়ে আসুন। আপনাকে এ অবস্থায় দেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে।

পঞ্চাননের মনে হইল, এই বিদ্রূপে যেন জেলখানার অসংখ্য সিপাই অসংখ্য কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।……কিন্তু ভগবানের মস্ত একটা আশীর্ব্বাদ এই যে, বিপদের যখন কূল থাকে না মন তখন নিরালম্ব অসাড় হইয়া পড়ে।—

পার্সেলটা কোণের দিকে সরাইয়া দিয়া পঞ্চানন টানিয়া টানিয়া নিজেকে তক্তপোষের বাহিরে আনিল, এবং ছেলেদের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ভাবহীন স্থিরদৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলেরা কেবল কোলাহল করিতেই জানে, কাজের ব্যবস্থা করিতে জানে না। এইসময় ম্যানেজার বাবু সংবাদ পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িলেন, এবং তাঁর আগমনেই দেখিতে দেখিতে একটা ব্যবস্থা হইয়া গেল।...তিনি বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়ে অবাক্ এবং ক্রোধে লাল হইয়া গেলেন; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—কে তুমি?

পঞ্চানন তাঁহার দিকে চোখ আনিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—আজ্ঞে আমি চোর। নাম আমার পঞ্চানন। চোরকে ক্ষমা করুন; আমার যথেষ্ট সাজা হয়েছে।

ছেলেদের কুশল অকুশলের দায়িত্ব ম্যানেজার বাবুর। তিনি ছারপোকার কথা জানেন না; তাই দাঁত খিচাইয়া বলিলেন,—সাজা কি হয়েছে, ধন? তক্তপোষের নীচে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে উঠ্‌লে! এ সিট্ কার?

চটি বলিল, আমার।

—কিচ্ছু টের পাওনি?

—আজ্ঞে, না।

—আশ্চর্য্য!...পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কখন ঢুকেছিলে?

—সন্ধে সাড়ে সাতটায়।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন,—উঃ কি দুঃসাহস! তোমাকে নিয়ে কি করব তাই ভাব্‌ছি।—বলিয়া তিনি লোকটার আস্পর্দ্ধায় এবং নিজের কর্ত্তব্যের ভাবনায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।—

ক্ষীরোদ বলিল,—ছেড়ে দিন্, সার্।

এ অনুরোধ বাহুল্য—এম্‌নি ভাবে ঘাড় নাড়িয়া ম্যানেজার বাবু বলিলেন,—উঁ হু, কিছুতেই না!... ..এত বড় সাহস যে আমার বোর্ডিং-এ ঢুকে তক্তপোষের নীচে শুয়ে ঘুমোয়।...ব্যাটা খুনে.....যদি কিছু ঘট্‌ত আমি কি কৈফিয়ৎ দিতুম বল দেখি।... কত বড় একটা বদ্‌নাম আমার হ'ত। .দেখ, ওর পকেট ট্যাঙ্ক সব দেখ তারপরে ব্যবস্থা কর্‌ছি।—বলিয়া ম্যানেজার বাবু চোখ্ পাকাইয়া তুলিলেন

......পঞ্চাননের পকেট-আর ট্যাঙ্ক দেখিবার কাজে তিনজন লাগিয়া গেল...তার জিব্ হইতে জুতা পর্য্যন্ত খানাতল্লাস করা হইল, কিন্তু অপরাধের প্রমাণ কিছু পাওয়া গেল না।—

রসিক মত একটা ছেলে পঞ্চাননের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে বলিল,—পয়সা কড়ি নেই. থাক্‌লে বাজ্‌ত।

শুনিয়া ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।..দু' একজনের অদৃষ্ট এমন ভাল থাকে যে রসিক বলিয়া তার একটা অযোগ্য খ্যাতি যেন কেমন করিয়া বাহির হইয়া যায়। ওই ছেলেটা সেই দলের; কিন্তু সেই অযোগ্যতার শাস্তি একদিন না একদিন আসেই—স্তাবকের দল না জানিয়াই পাঠাইয়া দেয়।......

যাই হোক ম্যানেজারবাবু দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বলিলেন,—ইচ্ছে করছে তোমাকে জ্যান্ত কবর দি ; কিন্তু তা দেব না।…আর কখনো এ দিক মাড়াবে ?

পঞ্চানন বলিল,— না।

—চোর ধরা পড়ে' ও-রকম বলে' থাকে। জেল খেটেছ কবার ?

—চারবার।

—কি সর্ব্বনাশ ! চারবার ? এবার তোমার স্বেচ্ছায় ফাঁসি যাওয়া উচিত।

জ্ঞানাঙ্কুর বলিল,— চুরি করতে এসে ঘুমুলে কি করে ?

পঞ্চানন আনুপূর্ব্বিক সব বলিল ; শেষে বলিল,—ওঁরা বলছিলেন, ভদ্রলোকেরা সব লোপ পাবে যদি তারা ছুতোর মিস্তিরির কাজ না করে।… ঐ পর্য্যন্ত জানি তারপরেই ঘুমিয়ে পড়েছি, শ্রান্ত ছিলাম কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেও পারিনি।

এই অবসরে ম্যানেজার বাবু কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন।…পঞ্চাননকে জীবন্ত কবর দিবার ইচ্ছা তিনি মুখে প্রকাশ করিলেও, তাহার গায়ে হাত দিবার সাহসও ম্যানেজার বাবুর হয় নাই।…রাস্তা ঘাটে বেড়াইতে হয়—দলের কেউ যদি ছুরিই মারে। পুলিশে দিলে সাক্ষিসাবুদের হাটাহাটির অনেক ঝঞ্ঝাট।

সুতরাং তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিলেন,— এবার ছেড়ে দিলুম। ফের যদি এদিকে তোমায় দেখি তবে মেরে হাড় থেকে মাস ছাড়িয়ে দেব।…যাও ত হে, তোমরা চারপাঁচজনে ওকে একেবারে রাস্তার ওপারে দিয়ে এস।—বলিয়া তিনি আঙ্গুল তুলিয়া জানালা দিয়া আকাশের প্রান্ত দেখাইয়া দিলেন…যেন রাস্তার দুই পারের মধ্যে সাত সমুদ্র তের নদী রহিয়াছে।—

বোর্ডিং শুদ্ধ বাইরা পঞ্চাননকে রাস্তার ওপারে রাখিয়া আসিল।—*

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

---

* ইংরেজি হইতে।

সম্মান

চন্দননগরে পৌরসভায় অভ্যর্থনা উপলক্ষে কথিত)

যখন বালক ছিলেম তখন চন্দননগরে আমার প্রথম আসা। সে আমার জীবনের আরেক যুগে। সে-দিন লোকের ভিড়ের বাইরে ছিলেম প্রচ্ছন্ন, কোনো ব্যক্তি, কোনো দল আমাকে অভ্যর্থনা করেনি। কেবল আদর পেয়েছিলেম বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে। গঙ্গা তখন পূর্ণগৌরবে ছিলেন, তাঁর প্রাণধারায় সঙ্কীর্ণতা ঘটেনি : ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামলতায় তাঁর দুই তীরের গ্রামগুলি শান্তি ও সন্তোষের রসে ভরা ছিল।

তার পূর্ব্বে শিশুকাল থেকে সর্ব্বদাই ছিলেম কলকাতার ইটের খাঁচায়। মুক্ত আকাশে আলোকের যে সদাব্রত, তার নানা বাধা-পাওয়া দাক্ষিণ্যের খণ্ডঅংশ পৌঁছত আমার ভাগে। আমার অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট মন এখানে এসে মুক্তির অমৃত অঞ্জলি ভ'রে পান করেছে। চিরদিন যারা এই শ্যামলার আঁচলে বাঁধা হ'য়ে থাকত, তারা একে তেমন সম্পূর্ণ দেখেনি। আমি এসেছিলেম যেন দূরের অতিথি, তাই আমার জন্যে ছিল বিশেষ আয়োজন। সে-দিন গঙ্গাতীরের পূর্ব্বদিগন্তে বনরেখার উপরের পথে প্রতিদিন সকালে সোনার আলোয় মাধুর্য্যের যে ডালি আসত সে আর কারো চোখে তেমন করে পড়েনি, আর সূর্য্যাস্তের নানা রঙের তুলিতে গঙ্গার জলধারায় রেখায় রেখায় যে লেখন দেখা দিত, সে বিশেষ করে আমারই জন্যে।

সেই অতিথিবৎসলা বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর অবারিত আঙিনায় সে-দিন যখন বালককে বসালেন, তাকে কানে কানে বল্লেন, "তোমার বাঁশিটি বাজাও।" বালক সে দাবী মেনেছিল।

ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষী সুরে যেখানে বাজ্‌ত সে আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি, বড় যত্নে তৈরি, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী ছিল বিচিত্র। তার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুলগাছের আগ্‌ডালের চিকণ পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চারদিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হ'ত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আঙিনাতেই। এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেম—

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার

সে ঘর নেই, সে বাড়ি আজ লৌহদন্তদন্তুর কলের কবলে কবলিত। সে গঙ্গা আজ অবমাননায় সঙ্কুচিত, বন্দী হয়েছে কল-দানবের হাতে—ত্রেতাযুগে জানকী যেমন বন্দী হয়েছিলেন দশমুণ্ডের দুর্গে। দেবী আজ শৃঙ্খলিতা।

সে-দিন যে-বালক জীবনের উষালোকে আপনাকে স্পষ্ট করে চেনেনি এবং চেনেনি এই সংসারকে, তার উপরে একে একে অন্তত পঞ্চাশ বছরের চাপ পড়েচে। এই চাপে সেই বালক সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। আমি আজ নানা কাজে হাত দিয়েচি, এবং নানা দেশের কাছ থেকে খ্যাতি অর্জ্জন করেচি। কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই বালক এখনো আছে কাঁচা--সংসারের যে-হাটে সব জিনিষের দর যাচাই হয় সেখানকার রাস্তাঘাটে ও চালচলনে এখনো সে পাকা হয়নি; প্রকৃতির খেলার প্রাঙ্গণটার দিকে এখনো তার টান,—তা' ছাড়া খ্যাতির মধ্যে সে আপনার খাঁটি পরিচয় পায় না। খ্যাতির মতো বন্ধন নেই, দশের মুখের কথার জাল থেকে মনকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে রাখা শক্ত। বালকের মনের যে-ডানা সেদিন আকাশে ছাড়া পেয়েছিল তার সঙ্গে খ্যাতির দড়ি বাঁধা ছিল না। আজো সেদিনকার সেই খ্যাতিহীন মুক্তির আকাশের জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়। সেইজন্যেই এত ক'রে মনে পড়ে চন্দননগরের গঙ্গার তীর, সেই মোরানের বাগানবাড়ির উপরিতলের খোলা ঘরটি, যেখানে বাতাস আলো এবং বালকের কল্পনার পরস্পর অবাধ মেলামেশার মাঝখানে জনতার খ্যাতি নিন্দার কলরব আবর্ত্ত তৈরী করেনি।

মানুষের কাছ থেকে দরদ ও আদর পাবার লোভ আমার নেই এ-কথা বল্‌লে অত্যুক্তি করা হবে। মনে ভাবি, বিধাতার স্নেহের দান মানুষের সমাদর বেয়েই ঝরে আসে। যখন মানুষ বলে, তুমি যা দিয়েছ তা'তে খুসি হয়েছি,—তখন সেই খুসির কথাটা একটা মস্ত পুরস্কার। এ পুরস্কার চাইনে ব'লে স্পর্দ্ধা করতে পারিনে।

কিন্তু সংসারে যশের পুরস্কার বালকের জন্যে নয়, তার জন্যে মুক্তি। জনসভায় আসন বজায় রাখতে হলে তার উপযুক্ত সাজসজ্জা চাই, জনসভার দস্তুর বাঁচিয়ে চলবার আয়োজন অনেক। বালকের বসনভূষণের বাহুল্য নেই, যেটুকু তার আছে তা যদি ছেঁড়া হয় বা তাতে ধূলো লাগে তবু সেটা বেমানান হয় না। সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো সে অন্যের জন্যে খেলে না, তার খেলা তার আপনারই জন্যে। এই কারণে খেলাতে তার কর্ম্মের বাঁধন নেই, খেলাতে তার ছুটি। বিশ্বের মধ্যে যে-চিরবালক জলেস্থলে আকাশে আলোতে ছায়াতে অবহেলায় খেলা করেন, যিনি সেই খেলার বদলে শিরোপা চান না, মর্ত্ত্যের বালক তাঁকে না চিনেও না জেনেও তাঁকেই পায় আপন খেলার সাথী, তাই দেশের লোকের কথায় তার কোনো দরকার হয় না।

কিন্তু বয়স্কের কীর্ত্তি তো বালকের খেলার মতো নয়। বহুলোকের সঙ্গে তার বহুতর যোগ। এখানে বন্ধুকে না হলে চলে না, এখানে সহায়কে না পেলে ক্লান্তির ভারে পিঠের হাড় বেঁকে যায়। কাজের দিনে প্রাঙ্গণে ধূলোয় একলা বসে অকিঞ্চনের আয়োজনে তার শক্তি পাওয়া যায় না, পাঁচজনকে ডাক দিতে হয়। বালককালে যে-দিন চন্দননগরে এসেছিলেম সেদিন এসেছিলেম বিশ্বপ্রকৃতির খেলাঘরে! সেদিনকার দান দেবতার প্রত্যক্ষ দান, সে আমি আকাশে

বাতাসে, বনের ছায়ায়, গঙ্গার কলস্রোতে পেয়েছি। আজ এসেছি জনসভায়, কবিত্ব নিয়ে নয়, কর্ম্মের ভার নিয়ে,—এর যোগ্য দান আজ আমি মানুষের কাছে দাবী করতে পারি। যেদিন সেই ছাতের উপর খোলা আকাশের নীচে মনের স্বপ্নকে ছন্দের গাঁথনিতে একলা বসে রূপ দিয়েছি সেদিন ছিলেম সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিখেলার সহযোগী। তিনি আমার মনে আনন্দ জুগিয়েছিলেন। আজ আমি কর্ম্মীরূপে কর্ম্ম ফেঁদে বসেচি। এ কর্ম্ম মানুষের কর্ম্ম, মানুষকে তাই সহযোগিতার জন্যে ডাক দেব। আজ আমাকে আপনারা যে সম্মান দিতে এসেছেন সে যদি সেই সহযোগিতার আহ্বানের সাড়া হয় তবে জান্‌ব কর্ম্মের ক্ষেত্রে সার্থক হয়েচি। তা যদি না হয়, এর সঙ্গে যদি সহযোগিতা না থাকে তবে এই সম্মানের ভার দুর্ব্বিষহ। বহুদূর থেকে নারদের পুষ্পমাল্য ইন্দুমতীকে সাংঘাতিক আঘাত করেছিল, বস্তুত সে মালারই ভার নয়, সে দূরত্বের ভার। দূরে থেকে যে-সম্মান, সে-সম্মানের ভার বহন করে সংসারে মুক্তচিত্তে বিচরণ করতে ক'জন পারে? মানুষ সকলের চেয়ে সুখে থাকে যখন সে আপনাকে ভোলে, যখন খ্যাতির ধাক্কায় ধাক্কায় তার নিজের দিকে তার নিজেকে কেবলি জাগিয়ে রাখে তখন আত্মার যে-নিভৃতে তার গভীরতম কৃতার্থতা সেখানে যাবার পথ অবরুদ্ধ হয়।

বালককালে বাঁশির উপরে দখল ছিল না, বাজিয়েছিলেন যেমন-তেমন ক'রে, পথে লোক জড়ো হয় নি। তারপরে যৌবনে, বাঁশিতে সুর লাগ্‌ল ব'লে নিজের মনে সন্দেহ রইল না, তখন সকলকে নিঃসঙ্কোচে বলেছি "তোমরা শোনো।" তেমনি কর্ম্মের আরম্ভে একদিন কর্ম্মকে সম্পূর্ণ চিনিনি। কোন্ রূপের আদর্শে তার প্রতিষ্ঠা হবে সেদিন জান্‌তেম না,—সেদিন পথের লোকে উপেক্ষা করে চলে গেছে, আমিও বাইরের লোককে ডাক দিইনি। শেষে কর্ম্ম যখন আপন প্রাণশক্তিতে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করলে তখন তার পরিচয় গোপন রইল না। তখন নিঃসংশয় দৃষ্টিতে তাকে দেখ্‌তে পেলেম। তখন সকলকে ডেকে বলেছি "তোমরা এসো।" বাঁশির সুর বিকাশ লাভ করে একদিন যেমন বিশ্বের সকলের হয়—কর্ম্মও তেমনি বিশেষ পরিণতিতে বিশ্বের সামগ্রী হয়ে ওঠে। সেই বিশ্বের ধর্ম্ম যখন কর্ম্মের মধ্যে দেখা যায় তখন, শুধু সম্মান নয়, সহায়তা দাবী করবার অধিকার জন্মে। সেই অধিকার আজ এই সভায় সকলের কাছে নিবেদন ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

২১শে বৈশাখ
১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্দী-ভগবান

মন্দিরের অন্ধকারে দেবতা করুণ হাসি হাসে।
যাত্রীরা ফিরিয়া আসে
নয়নের আনন্দ না পায়;
নিদারুণ ব্যর্থতায়
পূজারীর পায়ে ধরে,—করাঘাতে ভাঙ্গে বুক,
ভাবে বুঝি দেবতা বিমুখ,
পাপী বলে দর্শন না মেলে।
মানুষেরে অবহেলে
দেবতা কি ছাড়িল মন্দির?
মর্ম্মছেঁড়া আর্ত্তরবে ভগবান রহিবে বধির?

দেখিতে না পাই কিছু চোখে,
মন্দিরের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে সর্ব্বলোকে।
সূর্য্য গেছে অস্তাচলে
নিবাইয়া দিনের প্রদীপ;
সন্ধ্যার কপোল তলে ফুটিয়া উঠিল স্বর্ণ টিপ
ধীরে অতি ধীরে।
ধূ ধূ করে বালুবেলা, যমুনার মরুভূ সমীরে
ধ্বনি হ'তে প্রতিধ্বনি ব্যেপে
অযুত যাত্রীর কণ্ঠে আর্ত্তস্বর ওঠে কেঁপে কেঁপে;
"দাও দাও আলো দাও আলো
আঁধারে পাইনা দেখা আরতি প্রদীপখানি জ্বালো।"
সঙ্কীর্ণ মন্দিরপথে বহু কষ্টে বক্ষে আগুলিয়া
যে আনিল পূজাপুষ্প মরমের বৃন্তটি ছিঁড়িয়া,
—সে ফিরিবে নয়নের জলে?
পূজারী রুধিবে পথ দর্পিত সেবার বাহুবলে?

কোথায় দেবতা মোর, ললাটের বহ্নিশিখা কই?
তব আবির্ভাব তরে মানুষ আমরা জেগে রই

অন্ধকার আসনের তলে ;
কখন উঠিবে জ্বলে
বিদ্যুৎস্ফুরণ-বহ্নি ধিকি ধিকি নয়নে তোমার ;
রুদ্ধ মন্দিরের অন্ধকার
কোণে কোণে মরিবে লজ্জায় ;
আলোক বাতাস হ'তে লুকাইয়া এই নিরালায়
যাহারা করিছে বন্দী আমার প্রাণের ভগবানে ,
ভক্তিদৃপ্ত হীন অভিমানে
যাদের পূজার অর্ঘ্য অপমানে কলুষিত করি'
দেবতার পাদপীঠ পাপপঙ্কে তুলিয়েছে ভরি'
তাহাদেরি হবে জয় ?
মিথ্যা হবে জয়ী ? যে মাগিছে চরণে আশ্রয়
গলদশ্রু কৃতাঞ্জলিপুটে,
সহস্র হৃদয়তন্ত্রী টুটে
অবিরাম গুমরিছে যে করুণ কাতর প্রার্থনা,
সে যদি গো ব্যর্থ হয়, যদি এ ধর্ম্মের বিড়ম্বনা
মন্দিরের অন্ধকারে, ঠাকুরের সেবার আড়ালে
বেড়ে চলে প্রতিদিন, ধর্ম্মের তিলক যদি এঁকে দেয় ভালে
কলঙ্কের মসীকৃষ্ণ রেখা
দেবতার দেখা
অর্থ দিয়ে যদি যায় কেনা,
কাঙ্গাল কোথায় যাবে ? দেবতার দেখা কি হবে না
প্রাণমূল্যে পূজার দেউলে ?
কে লইবে তুলে
মন্দির তোরণ পথে ধূলায় লুটায় যারা আজ,
ভগবান মিথ্যা হবে ? সত্যের মর্য্যাদা পাবে লাজ ?

আলো মিথ্যা, প্রেম মিথ্যা, অসীম অনন্ত নীলাকাশ
দিগন্ত হইতে আসে বসন্তের উন্মুক্ত বাতাস
এ সব কি মিথ্যা কথা ?
মানুষের অন্তরে যে ব্যথা

শোণিতে ভিজিয়া ওঠে   রাঙা ফুল অর্ঘ্য হ'য়ে ঝরে
তারে অবহেলা ক'রে
হে আমার প্রাণের ঠাকুর
হেলার নৈবেদ্য নেবে এতখানি তুমি কি নিষ্ঠুর ?
চাও চাও মুখ তুলে চাও
স্ফীত গর্ব্বে বন্ধ দ্বার মোহন পরশে খুলে দাও !

উন্মত্ত হইয়া যারা পাষাণের দুর্ভেদ্য প্রাকারে
বন্দী করে রাখে দেবতারে,
আলো ও বাতাস হ'তে   লুকাইয়া অন্ধকার কোণে
প্রণামীর কানাকড়ি গোণে.
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া অর্চ্চনার গন্ধদীপাধারে
অপমান করে দেবতারে,
করে হীন পূজা-অভিনয়
তোমার মন্দিরে আজ তাহাদেরি মিলিবে অভয় ?
সত্যই কি হয়েছ দুর্ব্বল
পাথর-প্রতিমা ব'লে স্থাণু সম র'বে অচঞ্চল ?
বিস্ফারিত আঁখিযুগ দিয়া
পূজার বীভৎস দৃশ্য যেন তুমি নিতেছ গ্রাসিয়া.
তবু হায় সরে নাক বাণী ?
তোমার ধর্ম্মের গ্লানি
ফেনাইয়া ওঠে বন্যাজলে
অভ্রভেদী ধ্বজা তব খসে' বুঝি পড়ে বা ভূতলে।
কেমনে তা স'ব ধ্বজাধারী ?
নূতন যুগের পথে দাঁড়াইয়া লক্ষ নরনারী
রুদ্ধশ্বাসে আছে প্রতীক্ষায়
তুমি ত দিলে না দেখা,—এ ব্যথায় প্রাণ ফেটে যায় !

* * * *

আরতি হইয়া গেল, অন্ধকার আসনের তলে
একটি প্রদীপমাত্র জ্বলে ;—

অনির্ব্বাণ শিখাটি তাহার !
থেমে গেছে বাদ্যভাণ্ড কোলাহল ; একাকার
সর্ব্বলোক ; অনাহত একটি সঙ্গীত
ছন্দে ছন্দে মূর্চ্ছনায় কার পানে করিছে ইঙ্গিত ?
মন্থর পবন ভরে পাল তুলে চলে গেছে দিন
মন্দির প্রাঙ্গণ স্তব্ধ, ধীরে হ'ল জনতাবিহীন
সন্ধ্যা হ'ল অবসান।
কোথা তুমি—কোথা ভগবান ?

এত আলো, এত আলো কোথা হ'তে
অন্ধকার এ নির্জ্জন পথে ?
হতভাগা চলিয়াছে একা
নিরানন্দ দিবসের আনন্দ-নিশীথে কার দেখা,
কার দেখা পাব আঁধিয়ায়
আকুল আগ্রহভরে নয়ন ঠিকরি' বাহিরায় ;
উল্লসিত সর্ব্ব মনপ্রাণ
জয় প্রভু জয় ভগবান।
রোমাঞ্চ পুলক জাগে সর্ব্বদেহে, হৃদয় অধীর
উচ্চকিত শ্রুতিযুগ প্রতীক্ষায় হয় বা বধির—
সর্ব্বদেহ সর্ব্বমন ভরি'
এক অনুভূতি জাগে আছ তুমি আছ হে শ্রীহরি
লোক হতে লোকান্তরে
আপনারে বিস্তারিয়া বিশ্বরূপে নিখিল অন্তরে,
পাতিয়াছ তোমার আসন
তবু যে তৃষিত আঁখি পেতে চায় তোমার দর্শন !

সচকিতে শুনি প্রভু চুপি চুপি কহে মোর কানে
"মন্দির ছাড়িয়া আমি ফিরি পথে তোমারি সন্ধানে।"

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সিম্‌লা—তারাদেবী

'সিম্‌লা পাহাড়' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, বাঙ্গলাদেশ হইতে সেন রাজবংশ ক্রমে হিমালয়ে আসিয়া বাস ও রাজ্যস্থাপন করিলে, তাঁহাদের গৃহবিগ্রহ শ্যামলাদেবী, কামনা (কমলা) দেবী ও তারাদেবীকে সাথে আনিয়া তিনটি পর্ব্বত-শৃঙ্গে স্থাপনা করেন। এই শ্যামলা দেবী হইতেই সিম্‌লা পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে। শ্যামলাদেবী ও কমলাদেবীর শ্বেতপ্রস্তর-মূর্ত্তি আজও সিমলা কালীবাড়ীতে এবং প্রস্পেক্ট হিলের ক্ষুদ্র মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ৺কালীমূর্ত্তি স্থাপনার পরে শ্যামলাদেবী আর পূজিতা হন বলিয়া মনে হইল না। কমলাদেবী আজিও পূজা পাইয়া থাকেন। এই কমলাদেবীর মূর্ত্তি বাঙ্গলার চিরপরিচিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী মূর্ত্তি নয়। শ্যামলা বা কামনা দেবী বঙ্গে কোথাও পূজিতা হন শুনি নাই এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ইঁহাদের স্থান কোথায় তাহাও জানা নাই। মূর্ত্তিতত্ত্ববিদ্যায় লিখিত পুস্তকে (Hindu Iconography by Gopinath Rao) এই দেবীমূর্ত্তিদ্বয়ের কোনও উল্লেখ নাই। তবে হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর পার্থক্য করা সুকঠিন—কে কোন্ শ্রেণীর দেবতামণ্ডলী-ভুক্ত তাহা নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। এই সন্দেহ হওয়ার কারণ, তারাদেবীর মূর্ত্তি দেখিলে এবং সেই মন্দিরে ও নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া স্বতঃই প্রশ্ন উঠে ইহা হিন্দু বা বৌদ্ধ মূর্ত্তি। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জানাইয়াছেন (১) যে, বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই তারাদেবীর মূর্ত্তি ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দে উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন হিন্দু দেবীর মূর্ত্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। হিন্দু দেবতামণ্ডলীতে তারামূর্ত্তির যে ধ্যান ও মুদ্রা আছে এই মূর্ত্তির সহিত তাহার মিল নাই। সে কথা বিশেষজ্ঞেরা বিচার করিবেন।

কথিত আছে যে সেন বংশ যখন পর্ব্বতে রাজ্যস্থাপন করেন তখন যোগী তারানাথ এতদঞ্চলে আসিয়া যে পর্ব্বতোপরি আসন স্থাপন করেন, তাহাই "তরাব" পাহাড় নামে খ্যাত হয় এবং সেখানেই তিনি তারামাতার মূর্ত্তি স্থাপনা করেন, তাঁহার চেষ্টাতেই রাজার আদেশে দেবীর জন্য মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং অদূরে ভৈরব শিব মন্দিরও স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে আজিও তিনি পূজিত হইতেছেন।

---

(১) "I was laid up with Influenza when your letter reached me at Simla, so I could not make any personal inquiry regarding any of the images. But I met Mr. R. D. Banerjee and he said he had very carefully examined the images at Tara Devi. It is a Hindu goddess of the type prevalent in upper India and probably belongs to the 13th. or 14th. century A. D. Mr. Banerjee says it is impossible to take a photograph"—R. C. Majumdar M. A. Ph. D.

তারানাথের নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতার কথা কিংবদন্তীর ন্যায় আজও প্রচলিত আছে। তিনি যেখানে ধুনী জ্বালাইয়া আসন গ্রহণ করেন সেখানে কখনও একবিন্দু বৃষ্টিপাত হইত না, দেবীর সহিত তিনি কথা বলিতেন, বনের ব্যাঘ্র-মহিষাদি সকল জন্তু তাঁহার নিকট মেষশাবকের ন্যায় যাতায়াত করিত ইত্যাদি।

শুনা যায় পূর্ব্বে তারাদেবীর মন্দির কুসল (Khusala) পরগণায় অবস্থিত ছিল। এখনও সেই মন্দির বর্ত্তমান আছে। সেখানে তারামূর্ত্তি বর্ত্তমান আন্দাজ ১½ ফুট (পাদপীঠ সহিত) পিত্তল মূর্ত্তি অপেক্ষাও ছোট ছিল। এখন দেবী সিংহবাহিনী পিত্তল-নির্ম্মিত প্রহরণ সহ অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। কথিত আছে রাজা বলবীর সেনের রাজত্ব সময়ে এই পিত্তল মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও স্থাপিত হয়। ইঁহার পূজাপদ্ধতি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে উক্ত মহিষাসুর বধকারিণীর পূজার অনুরূপ। বাঙ্গালী পূজারীর বংশধরগণ এখন পাঞ্জাবী হইয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশেও ছয়শত বৎসরে পূজাপদ্ধতির বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কাজেই তুলনামূলক অনুসন্ধানে সহজে ফল পাওয়া যায় না।

তারাদেবী জাগ্রত দেবতা। তিনি কোনও কারণে রুষ্ট হইলে গো-মহিষাদির মড়ক ও বসন্তাদি ব্যাধির প্রকোপ হয়। সেই সময় জুম্মা দরবার দেবীর নিকট ধরণা দিয়া তাকে প্রসন্না করিলে সকলপ্রকার আধি-ব্যাধি নিবারণ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত পূজাপদ্ধতির কয়েকটী নিদর্শন আজও পাহাড় রাজ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার শারদীয় উৎসবের ন্যায় তারাদেবীর তরাব পাহাড়ে মহাষ্টমীর দিন একটি মেলা বসে তাহাতে ৭।৮ হাজার লোক উপস্থিত হয়। শুক্লা সপ্তমীর দিন হইতে প্রত্যহ একটী ছাগ বলি সহ অদূরে তারাদেবী পূজিতা হন। মহাষ্টমীর দিন রাজা সপরিবারে পাত্রমিত্রসহ সকালেই পাহাড়ের নীচে আসিয়া আহারাদির পরে ১টার সময় মন্দিরে প্রবেশ করেন। রাজা এবং রাজবংশীয় প্রত্যেকে একটা করিয়া মোহর দক্ষিণা দেন এবং তাঁহাদের নামে সংকল্প করিয়া ছাগবলি হয়। পরে অপর সকলে বলি বা চাউল, আখরোট, মিষ্টান্ন, বাতাসা, ফল, ফুল, ঘৃত প্রভৃতি অর্ঘ দান করে। বেলা ৪টার সময় মহিষ বলির আয়োজন হয়। এই মহিষ বলিও বাঙ্গালা দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। রাজা সংকল্প করিলে পূজারী তিলকদানে উৎসর্গ করিয়া দেন। পরে গরম জল মহিষের গায় দেওয়া হয়; কখনও বা জলন্ত আগুন দেওয়াও হয়, যাহাতে মহিষ কাঁপিতে থাকে। তখন খড়্গ, কুঠার, তরবারির আঘাতে নিষ্ঠুরভাবে চামার, কোল, আহির, ডাঁরো প্রভৃতি নীচজাতি মহিষকে বধ করে। সে সময়ে উপস্থিত লোকে দেবী যাহাতে বলি গ্রহণ করেন সেজন্য হাত জোড় করিয়া 'দেবী জি কী জয়'—বলিয়া মহা উত্তেজনায় চীৎকার করিতে থাকে। এক কোপে কাটিলে অশুভগ্রহ বলিয়া মনে করে। নিষ্ঠুরতার কারণ দেবীর প্রীতি; মহিষাসুর দেবীর শত্রু, সেজন্য মহিষ দেবীর শত্রুপুত্র—তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করিলে

দেবীর প্রীতি জন্মিবে ;—এই বিশ্বাস বঙ্গদেশে প্রচলিত বিশ্বাস হইতে কত বিভিন্ন। বৈকাল ৬টার সময়ে ভোগ ও পরে আরতি হইয়া থাকে।

রাজা সপরিবারে সে রাত্র পাহাড়েই বাস করেন। সমস্ত দিন ও মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত মেলায় ভীড় থাকে। মেলায় আনুষঙ্গিক দোকান, নাগরদোলা, চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়াখেলা সকলই থাকে। পুলিস শান্তি-বিধান করিলেও সেদিন কাহাকেও কোনও কারণে গ্রেপ্তার করিতে পারে না।

নবমীর দিন বেলা ২টায় দেবীর পূজা হয়। তাহার নির্ম্মাল্য রাজপ্রাসাদে পৌঁছিলে রাজা দরবারে বসেন এবং রাজপতাকা, অস্ত্রাদি ও বাদ্যযন্ত্রসকল পূজিত হওয়ার পরে, অদূরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে দলবলসহ গিয়া মালা মিষ্টান্ন বিতরণ ও পরস্পর আলিঙ্গন করেন। পরে মন্দির সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তরে স্তূপীকৃত কাঠ সকলে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করেন। কিংবদন্তি যে রামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয় উপলক্ষে দেবীর পূজা করিয়া রওনা হইয়াছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতি জাগরূক রাখার জন্যই উপরোক্ত প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রতিবৎসর ১লা আষাঢ়ে এই রাজ্য মধ্যে সায়ের মেলা হইয়া থাকে। নাপিত থালায় করিয়া গোবরের গণেশ মূর্ত্তি আনয়ন করে। রাজপরিবার বৈকালে খাদ্ আস্‌নি (Khad Ashni) যান। সেখানে আটা, ঘৃত ও গুড় প্রত্যেকের ৫২ সের হিসাবে মিলিত করিয়া একটী প্রকাণ্ড পিষ্টক প্রস্তুত হয়। ভোগ দেওয়ার পরে রাজা তরবারি দ্বারা উহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া অর্দ্ধাংশ উপস্থিত সকলকে বিতরণ করেন। তাহার পরে মহিষ-মুণ্ড ও মিষ্টান্ন বিতরণ হয়। কথিত আছে যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সাংবৎসরিক দিনে এই মেলা হয় এবং রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মল্লার সেন বলিতেন—এই আচার গৌড় হইতে আনীত।

কাংরা জেলায় ধারিচ গ্রামে এক অষ্টভূজা দেবী মূর্ত্তি বাঙ্গলাদেশের দুর্গাপূজার ন্যায় তিন দিন পূজিতা হন।

এই সকল পূজাপদ্ধতি ও আচার ব্যবহার হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সেন বংশের সহিত বাঙ্গালাদেশের দেবী মূর্ত্তি ও পূজাপদ্ধতি সুদূর হিমালয় পর্ব্বতেও নীত হইয়া প্রায় চারিশত বৎসর স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়াছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

দশচক্র

(৮)

শশী যখন গৌরীর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা হইবে। চণ্ডীমণ্ডপে একজন স্ফীতোদর পুরুষ দেয়ালে ঠেস দিয়া, এবং পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া, তুড়ি সহযোগে ঘন ঘন হাই তুলিতেছিলেন; আর একজন একাগ্রমনে কলিকার উপর পরিপাটীরূপে জ্বলন্ত কয়লা সাজাইতেছিলেন। পৈতার সাহায্যে দুজনকেই গৌরীর অভিভাবক মনে করিয়া শশী নিজের পরিচয় দিল, এবং বলিল সে গৌরীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে অভিভাবক দুইটী তখন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। শশীর বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে কি গৌরী নাই? না। গৌরী মরে নাই। তবে মরিলে ভাল করিত। কলঙ্কিনী গৃহত্যাগ করিয়াছে।

চার পাঁচ দিন পাড়ার বারোয়ারী-তলায় যাত্রা বসিয়াছে। গত পরশু রাত্রে গৌরী যাত্রা শুনিতে যায়। তাহার দ্বাদশবর্ষীয় সপত্নীপুত্র কৈলাস সঙ্গে ছিল। সে যখন ফিরিতেছিল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে কোথা হইতে পাঁচ ছয় জন লোক আসিয়া গৌরীকে আক্রমণ করে। কৈলাস ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাড়ার লোক জমা হইবার পূর্ব্বেই তাহারা গৌরীকে লইয়া পলায়ন করে। ইহাদের সহিত পূর্ব্ব হইতেই হয়ত গৌরীর সড় ছিল। কারণ সে এ অবস্থাতেও চেঁচামেচি করে নাই। পাড়ার লোক জড় না হইলে এ লজ্জাকর ঘটনা চাপাই থাকিত। কিন্তু দ্রুত লোক জানাজানির পর আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। পুলিশে খবর দিতে হইল। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া আজ সকালে জমীর নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে গৌরীর সন্ধান পাইয়াছে। গৌরী বলিয়াছে সে জমীরকে বিবাহ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এবং কিছুতেই ফিরিয়া আসিতে চাহে না।

শশী আর দাঁড়াইল না। যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া গেল। স্ফীতোদর ব্যক্তিটী একবার বলিবার চেষ্টা করিলেন "এত বেলায়,—কিছু না খেয়ে—" শশী উত্তর দিল না। সে কোথাও ছুটিতে পারিলে বাঁচে। তাহার উন্মুখ আশার মুখে এই অগ্নিসংযোগের পর সে হাউয়ের মত ছুটিতে না পারিলে, পট্‌কার মত ফাটিয়া যাইত।

গৌরীর সহিত দেখা না করিয়া সে ফিরিবে না, প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু দেখা করার পথে যে অনেক বিঘ্ন থাকিতে পারে, একথা সে ভাবিয়া দেখে নাই। সে কলিকাতার ছেলে। পল্লীগ্রামের লোকদের কৃপার চক্ষে দেখিত। তাহাদের নিকট হইতে ধমক দিয়া কাজ আদায় করা যায়, ইহাই তাহার বিশ্বাস। জমীর মুসলমান, হয়ত গুণ্ডা। কিন্তু ইহাতে সে দমিল না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বাড়ী বাহির করিল; এবং নির্ভয় নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত দেখা করিয়া বলিল, বামুন পাড়ার যে মেয়েটী তাহার বাড়ীতে আছে সে তাহার সহিত দুএকটা কথা কহিতে চায়। এই

যুবকের সাহস দেখিয়া জমীর স্তম্ভিত হইল। গৌরীর আত্মীয়দের মধ্যে কেহ একাকী, এমন অবস্থায় তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে মনে করিল এ লোকটা পুলিশের সংক্রান্ত কেহ হইবে। কিন্তু পুলিশের সহিত তাহার বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে সে দিক হইতে তাহার ভয় ছিল না। গৌরী নিজেই তাহাকে বাঁচাইবে। তাই একটু দোনামোনা করিয়া সে শশীকে ভিতরে লইয়া গেল।

গৌরীকে আজ বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইল। চলিবার সময় যেন তাহার পা টলিতেছিল। আর, সে দাঁড়াইয়া রহিল না ত। ধপ্ করিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মুখে একটা লাল তমতমে ভাব দেখিয়া মনে হইল, হয়ত তাহার জ্বর হইয়াছে। শশী অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখানেই থাকবে না কি ?" গৌরী হাসিয়া জবাব দিল "মুসলমানীর আর কোন্ চুলোয় জায়গা আছে বল ?" আজিকার এ হাসি শশীর ভাল লাগিল না। এই লঘুচিত্ততায় সে চটিয়া গেল। গৌরী যে দুর্ব্বল, এবং সম্ভবতঃ রুগ্ন একথা তাহার মনে রহিল না, ক্ষিপ্রগতিতে গৌরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল 'বাড়ী গিয়ে মুসলমান হোয়ো।'

জমীর দাঁড়াইয়া ছিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না ; ছুটিয়া আসিয়া ঠাস্ করিয়া শশীর গালে এক চড় বসাইল।

এমন প্রচণ্ড আঘাত শশী জীবনে কমই পাইয়াছে। সে চ'খে অন্ধকার দেখিল, এবং একটা খুঁটি ধরিয়া নিজেকে সংবরণ করিল। এক চড়ে তাহার মাথার মধ্যে সমস্ত উলট পালট হইয়া গেল। গৌরীর কথা, তাহার ভবিষ্যতের কথা, আত্মরক্ষার কথা, সমস্ত ভুলিয়া তাহার মন উদগ্র হইয়া উঠিল একটা হিংস্র প্রতিশোধ কামনায়। কিন্তু ঘুসি পাকাইয়া জমীরের দিকে অগ্রসর হইতেই গৌরী ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। বলিল 'এখানে গুণ্ডামি করতে এসেছ নাকি তুমি ? —যাও।'

গৌরীর ব্যবহার তাড়িতপ্রবাহের মত শশীর মনের চুম্বকশলাকাকে মুহূর্ত্তে দিগ্ভ্রান্ত করিয়া দিল। জমীরের সহিত তাহার আর কোন শত্রুতা রহিল না। সে অপদস্থ শান্ত ছেলেটার মত নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

শশীর বহু যত্নের আঁকা ছবি আজ ইঁদুরে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। গৌরীকে সে দেবী বলিয়া জানিত। সেই দেবী আজ পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিবে। এ দৃশ্য দেখিবার পর সে মনে শান্তি আনিবে কিরূপে ? সান্ত্বনা পাইবে কিরূপে ? তাহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল। এখনও তাহা শুখায় নাই। হায় ! গৌরী এত নিষ্ঠুর কেমন করিয়া হইল ? সে তাহাকে মার খাইতে দেখিল, অথচ দয়া হইল না। তাহার সঙ্গে চলিয়া আসা দূরে থাক, তাহাকেই ধাক্কা দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

পথের ধারে একটা বড় পুষ্করিণীর জলে মুখ হাত ধুইয়া শশী চাতালের উপর বসিল। এই

আগন্তুকের জন্য পল্লীসুন্দরী আজ বাসর সাজাইয়া বসিয়াছিলেন। "তালের বনে করতালি" তাহাকে মাতাইতে চাহিল, বাঁশের কুঞ্জ হাতছানি দিয়া ডাকিল, মৃদুসমীরণের সহিত কলকণ্ঠায় কাণাকাণি করিতে করিতে দীঘীর জল পায়ের কাছে লুটাপুটি করিল, এবং দু'একটা বড় বড় মাছ সরসীর চটুল কটাক্ষের মত মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

এসব দেখিবার বা শুনিবার শক্তি শশীর ছিল না, তাহার সমস্ত প্রাণে তখন গা বমি বমি করিতেছিল।

(৯)

শশী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সে বিছুটীর মত কাঁটায় ভরা,—কোন দিক দিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার উপায় নাই। কেহ কোন প্রশ্ন করিতে গেলে সে খুব কতকগুলা কড়া-কথা শুনাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া দেয়। তথাপি নিশি ছাড়িল না। অনেক সাধ্যসাধনায় সে এটুকু আদায় করিল যে গৌরী ঘর ছাড়িয়া এক মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছে। নিশি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 'ছি ছি ছি!' শশী গর্জ্জন করিয়া উঠিল "ছি ছি বলতে লজ্জা করে না? খেতে দেবে না, পরতে দেবে না, অথচ সে হাড়ী কামড়ে পড়ে থাকবে এই তোমরা চাও?"

নিশি দেখিল সত্যই ত। অসহ্য দুঃখের মধ্যে না পড়িলে গৌরী কি তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিত? কিন্তু—কিন্তু কি? সে যাহাদের কাছে গিয়া পড়িল তাহারা কেমন লোক কিছুই জানা নাই। সে এতদিন এমনি বা কোন্ সুসংসর্গে বাস করিতেছিল? তাহার দেবর, ভাশুর—তাহার পরমারাধ্য পিতৃদেব,—ইহারা এমনি কি দেবচরিত্র? মুসলমান! নিশির কাছে সকল ধর্ম্মই ত সমান অশ্রদ্ধেয়। গৌরী কাল হিন্দু ছিল, আজ না হয় মুসলমান হইয়াছে তাহাতে তাহার কি? বিধবা?—সে নিজেই ত বিধবাকে বিবাহ করিতে চহিয়াছিল, আর এক জন না হয় করিয়াছে। তবু,—তবু, কেন জানি না নিশির মনে শান্তি নাই।

সে কি বলিতে চায় গৌরীর উচিত ছিল বিবাহিত নিশির স্মৃতি বহন করিয়া চিতায় উঠা? অথচ এই গৌরীকে সে একদিন বলিয়াছিল মৃত পতির স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে। গৌরী নারী বলিয়া সেও কি সাধারণের মত তাহাকে **property** মনে করে? পশ্চিমের বাগানবাড়ীর মত ফেলিয়া রাখিবে, নিজে দেখিবে না, অপর কাহাকেও দেখিতে দিবে না; সময়ে অসময়ে নিজে গিয়ে সেখানে মাতব্বরী করিবে, অথচ অন্য কেহ বাস করিতে আসিলেই জিজ্ঞাসা করিবে সে তামাক খায় কি না?

(১০)

দুঃখের সময় নিশির একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন খুড়িমা। আজ তাই সে খুড়িমার কাছে ছুটিয়া গেল। প্রতিভাসুন্দরী কিন্তু নিশিকে কথা কহিবার অবসর দিলেন না। তাহার সহিত দেখা হইতেই বলিয়া উঠিলেন "দেখ্ নিশি, আমার ইচ্ছে করে খুব কতকগুলো বই নিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরী করি। পড়াবি আমাকে?"

নিশি। এই বয়সে পরীক্ষা দেবার সখ হ'ল ?

প্রতিভা। হাঁ। একেবারে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাক্‌বে না, এমনি ক'রে একটা কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চাই।

নিশি। কেন, সংসারে কি তোমার কাজ কম ?

প্রতিভা। কোথায় কাজ? অফুরন্ত সময়,—কি ক'রে যে কাটে তা জানি না।—তোর মা ভাল আছেন ?

নিশি। হাঁ, ভালই আছেন।

প্রতিভা। সরোজ আর বাড়ী আসে না, শুনেছিস ?

নিশি। হাঁ, শুনেছি তার বৌকে নিয়ে আলাদা বাসা করেছে। তা ব্রাহ্ম বে করেছে। তোমাদের সঙ্গে তার বৌএর বনবে কেন ?

প্রতিভা। তা ত বটে। সেই কথাই বল্লে। বল্লে আমার স্ত্রী মাছ ছোঁয় না। এখানে থাক্‌লে হয় ত তাকে মাছ খেতে বল্‌বে, না হয় কুট্‌তে বল্‌বে। মিছামিছি একটা মনোমালিন্য হবে। কাজ কি ?

নিশি। দেখ দিকি, কত ভেবে চিন্তে কাজ করেছে।

প্রতিভা। এক সঙ্গে থেকে মন কষাকষি হওয়ার চেয়ে আগে থেকে আলাদা হওয়া ভাল।

নিশি। সত্যই ত।

প্রতিভা। সত্যই ত। পাকা ফল আপনি খসে পড়ে যাবে। আমি আঁক্‌ড়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করলেই বা থাক্‌বে কেন ?—হাঁরে, এই কি তোদের ধর্ম্ম ? আমরা কি বিধবা নিয়ে ঘর করি না ? যে আস্‌বে তাকেই মাছ খাইয়ে দোবো ?

নিশি। তা আমাকে বলছ কেন, খুড়িমা। তোমার ছেলের তবু একটা ধর্ম্ম আছে। আমার কিছু নেই।

প্রতিভা। তা ত জানি। পৈতেটা পর্য্যন্ত ফেলে দিয়েছিস্।

নিশি। ফেলে দিইনি। প'ড়ে গেছে। যাই হোক, তুমিই সরোজকে তাড়িয়েছ।

প্রতিভা। আমি তাড়িয়েছি !

নিশি। নিশ্চয় ! তুমি যে পুতুল পূজো কর। ব্রাহ্মেরা পুতুল সহ্য কর্‌তে পারেন না। রাস্তা দিয়ে প্রতিমা গেলে তাঁরা ঘরে দোর বন্ধ ক'রে বসে থাকেন, পাছে দেখ্‌তে হয় ব'লে।

প্রতিভা। তাও ত রোজ পুতুল পূজো কর্‌চি না। সরস্বতী পূজা করি, সে বছরে একবার।

নিশি। রোজ কর্‌চো না ? বাড়ীতে শালগ্রাম পুষে রেখেছ যে।

প্রতিভা। তা সত্যি কথা বল্‌বো ? মনের কথা ভগবান্ টের পাচ্ছেন, মুখে বল্‌তে দোষ নেই। সরোজের জন্য আমি শালগ্রামকেও ছাড়্‌তে পারি বোধ হয়।

এমন সময়ে ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নিশি বলিল "কাকাবাবু, খুড়িমা বলচেন উনি সরোজের মন রাখবার জন্য শালগ্রামটা ফেলে দিতে পারেন।"

ভূপতি সহজভাবে বলিলেন "ফেলে দিতে হবে কেন? Paperweight করলেই হয়।"

প্রতিভা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বারবার মনে মনে ঠাকুরের কাছে নতশিরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "ছি, ছি, এমন কথা আমি বলিনি। তাঁর সেবার ভার আর কারুর হাতে দিতে পারি বলতে চেয়েছিলুম।"

ভূপতি। হ্যাঁ, যেটা বলতে চেয়েছিলে সেটা পরিষ্কার ক'রে বলে দাও। নইলে অন্তর্য্যামী ভুল বুঝতে পারেন।

প্রতিভা। হাঁ, আজ আবার পুরুত ঠাকুর আসবেন না। তোমাকেই শেতল দিতে হবে।

ভূপতি। বটে? এখুনি?

প্রতিভা। হ্যাঁ, তুমি কাপড় ছাড়।

ভূপতি চলিয়া যাইতে, প্রতিভা বলিলেন 'আমার দেবতা। ওঁর Paperweight. উনি যাচ্ছেন Paperweight-এর পূজা করতে। কৈ আমাদের ত আলাদা হবার দরকার হয় নি।

নিশি। ওঁর ধর্ম্মজ্ঞান মোটে নেই ব'লে।

প্রতিভা। আমি ত তা ব'লে তোদের মত নাস্তিক নই।

নিশি। কমও যাও না বড়। দরকার হ'লে শালগ্রামটা ফেলে দিতে পার।

প্রতিভা জিভ কাটিয়া বলিলেন "না, না, তা পারি না। আমার শ্বশুর মশাই নিজে পূজো করতেন। আমি প্রথম যখন এ বাড়ীতে এসুম তখন সকলের ভয় হয়েছিল 'ইস্কুলে পড়া মেয়ে, এ কি আর ঠাকুরের সেবা করবে?' শ্বশুর মশাই এক কথায় তার মীমাংসা করলেন। প্রথম দিন থেকেই আমাকে ঠাকুর ঘরের ভার দিলেন। তখন থেকে এই ত্রিশ বৎসর তাঁদের ঠাকুরের সেবা ক'রে আসচি। আজ সব ছেড়ে দিতে পারি?—তা যা, দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? আমি যাই ঠাকুরের যোগাড় ক'রে দিইগে।

নিশি। ঐ যে শেতল না কি হচ্ছে। ঠাকুর কি একাই খাবেন?

প্রতিভা একটু হাসিলেন।

নিশি যাহা বলিতে আসিয়াছিল বলা হইল না। কোন আলোচনাই হইল না। তবু সে তৃপ্তি পাইল। তাহার মনে হইল মানুষগুলা কুম্ভকারের দোকানে হাঁড়ির মত পাশাপাশি বাস করিতেছে। কেহ কাহারও রিক্ততা দূর করিতে পারে না। কিন্তু বুকের শূন্যতায় সকলেই একসুরে বাঁধা।

(১১)

অনেকে জানিতে চান গৌরীর গৃহত্যাগ ব্যাপারে তাহার নিজের ইচ্ছা বা লোভ কতটা ছিল। এ জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝিতে পারি না। আমরা যে-সমাজে বাস করি সে ত এমন প্রশ্ন করে না।

সেকালে ত করিতই না। এ কালেও করে না। গৌরী পরস্পৃষ্ট হইয়াছে কিনা, ইহাই সে জানিতে চায়। কেন হইল, স্বেচ্ছায় বা ছলে বলে পরাভূত হইয়া, এরূপ হওয়া ছাড়া তাহার অন্য উপায় ছিল কিনা, এ সব কথা লইয়া সে সময় নষ্ট করে না। অপর দিকে, মুসলমান সমাজ জানিতে চাহিবে গৌরী ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে কিনা। কেন করিল, স্বেচ্ছায় বা ছলে বলে পরাভূত হইয়া, এরূপ করা ছাড়া তাহার অন্য উপায় ছিল কিনা, ইহা লইয়া সেও মাথা ঘামাইবে না। দেবতার মত আমাদের সমাজের দণ্ডপুরস্কার অব্যর্থ, অপক্ষপাতী, অসঙ্গত ও অমানুষিক। এই দণ্ড পুরস্কারে আমরা সমাজের সহায়তাই করিয়া থাকি। অথচ গৌরীর উদ্দেশ্য কি ছিল জানিবার জন্য ব্যগ্রতা মন হইতে তাড়াইতে পারি না। আশ্চর্য্য!

সে দিন রাত্রে দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌরী আর্ত্তনাদ করে নাই, সত্য। করিবার সময় পায় নাই। সে প্রথমেই প্রাণপণবলে ইহাদের একজনের হাতে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। হাত ছাড়াইতে লোকটাকে এত বল প্রয়োগ করিতে হয় যে গৌরীর মুখের দু এক জায়গা ছড়িয়া কাটিয়া যায়। তার পর, মুখে কাপড় গুঁজিয়া ইহাকে নিরস্ত্র করা হইল বটে, কিন্তু ইহাকে বহিয়া লইয়া যাইতে কয়জনকে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। কারণ, গৌরী তাহার দেহের সমস্ত ব্যর্থ শক্তি ব্যয় করিয়া অনেকক্ষণ মুক্তির জন্য যুঝিয়াছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিধবার মত গৌরীর পিত্রালয়ে স্থান ছিল না, শ্বশুরালয়ে স্থান ছিল না, পিতৃশ্বশুরকুলের বাহিরে, কোথাও স্থান ছিল না। সে যেখানেই থাকিবে, একটা অনর্থক, অনভীপ্সিত উপসর্গের মত থাকিবে,—সেবা করিবে, সেবা পাইবে না; আহার জোগাইবে, আহার পাইবে না; বুক দিয়া বাঁচাইয়া, বুক পাতিয়া লাথি খাইবে। এই ত জীবন! ইহাতে সুখ আছে, না শান্তি আছে, না আশা আছে, না গৌরব আছে? অথচ এই জীবনে ফিরিবার জন্য অন্য শত শত বিধবার মত সেও প্রাণপণে যুঝিয়াছিল! কেন যুঝিয়াছিল বলিতে পারেন? ধর্ম্মলোপ ভয়ে? আমার সন্দেহ আছে। অন্য সকলের কথা বলিতে পারি না। তবে গৌরীর কথা জানি। সে যে ফিরিতে চাহিয়াছিল সেটা কেবল সংস্কারের বশে, কেবল সে নিজে পঙ্গু বলিয়া, কেবল নূতন একটা কিছু ধরিবার সাহস তাহার ছিল না বলিয়া। তট-ভূমি হইতে স্খলিত তৃণখণ্ড জলে পড়িয়াই তীর ছাড়িতে পারে না। তীরের সহিত তাহার কোথাও কোন যোগ নাই। তবু সে বার বার তীরের মাটী আঁকড়াইয়া ধরিতে থাকে,—তরঙ্গ-তাড়িত হইয়া বারবার তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতে চায়। কিন্তু একবার যদি সে মাঝ দরিয়ায় গিয়া পড়ে, তখন আর কূলের কথা ভাবিবার সময় থাকে না। তখন অকূলের দিকে একটানা ভাসিয়া যাওয়াই তাহার জীবনের একমাত্র পরিণতি। গৌরীর অবস্থা ঠিক তাহাই হইল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন সে দেখিল, তাহার জাত গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, অতীতের সহিত সম্বন্ধ চিরদিনের মত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন আর সে বাধা দিল না। নিজেই জমীরকে বলিল সে আর পলাইবার চেষ্টা করিবে না, কাহারও কাছে কোন অভিযোগ করিবে না,—জমীর ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে তাহাকে মুসলমান মতে

বিবাহ করিতে পারে। এত সহজে বশ মানায় একটু সুবিধা হইল। রসারসির বাঁধন অনেকটা ঢিলা হইয়া আসিল, এবং অনেকগুলা কলুষপরুষ হস্তের প্রেমালিঙ্গন হইতে সে রক্ষা পাইল। একটু অসুবিধাও হইল। জমীরের অনেকগুলি বন্ধু লুটের সমান ভাগ না পাইয়া চটিয়া গেল।

শশী যেদিন জমীরের বাড়ী হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেই রাত্রে গৌরী দ্বিতীয়বার লুট হয়। এবার লুটের সর্দ্দার কেরামত আলি, এ লোকটা জমীরের প্রতিবেশী। কাজেই দেশ ত্যাগ করা ছাড়া ইহার উপায় ছিল না। গৌরী তখন জ্বরে আচ্ছন্ন-প্রায়। বাধা দিবার শক্তি ও সাহস তাহার ছিল না। ইহাতে কেরামতের ভারি সুবিধা হইল। সে ইহাকে কম্বল মুড়ি দিয়া, ট্রেণে তুলিয়া কলিকাতায় রওনা হইল।

পল্লীগ্রামের লোক,—জ্বরকে ভয় করে না। সে জানিত আজিকার এক শ' পাঁচ ডিগ্রী কাল ঘাম দিয়া ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু গৌরীর জ্বরটা কেমন ভাল বলিয়া মনে হইল না। সে যেন ভুল বকিতেছে। তখন কম্বল সরাইয়া দেখে, তাহার সমস্ত মুখ ফুলিয়া বীভৎস, বিকটাকার হইয়া গিয়াছে! এই মুখের জন্য সে এত কাণ্ড করিল! কেরামতের মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার দুষ্ট সংকল্প পরিত্যাগ করিল, এবং দমদমায় গাড়ী থামিতেই গৌরীকে শক্ত করিয়া নামাইয়া প্ল্যাটফরমের একপাশে শোয়াইয়া দিল। তার পর overbridge পার হইয়া অন্য platformএ গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে কলিকাতা হইতে একখানা ট্রেন আসিল। কেরামৎ গার্ডকে বলিয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

দৈব-দুর্ব্বিপাকে গৌরীকে স্বর্গের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহার মনে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, তাহার মুখে কয়েকজন ইস্লাম ধর্ম্মীর যে নখক্ষতি ছিল তাহাতে অনেকগুলা streptococci প্রবেশ করিয়াছে।

জমীর ও কেরামৎ একটু অসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আরও চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পরে জন্মিলে তাহারা অমর হইত পারিত। তাহারা কাফেরের রক্তপাত করিয়া স্বর্গে, এবং পবিত্রীকৃত কাফের কন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া মর্ত্তে, 'বিশ্বাসীর' সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা যে কত বড় গর্ব্বের বিষয় সেটা তখনকার দিনে ভাল জানা ছিল না। সংখ্যা যে একটা সাধনার বস্তু। সমাজের লোকদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল তাহাদের সংখ্যা বাড়াইলেই যে চরিতার্থতা লাভ হইবে; তাহারা দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই, কিন্তু তাহাদের percentage কমিলে একেবারে পাগল হইয়া যাইতে হইবে; এ কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার লোক তখন বেশী ছিলেন না। নিজের দলের সমস্ত নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও বর্ব্বরতার ধূলিরাশিকে ধার্ম্মিকতার পঙ্করূপে স্থায়ী করিবার মত অল্পবিস্তার ইন্ধন গুঁড়ি তখনকার দিনে এমন করিয়া বর্ষিত হয় নাই।

(১২)

দুই দিন বিকারে সংজ্ঞাহীন থাকিয়া গৌরী প্রথম যে দিন জাগিয়া উঠিল, দেখিল সে একটা প্রকাণ্ড ঘরে, একখানি ধবলকোমল শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার আশে পাশে আরও কয়েকজন তাহারই মত শয্যাগত। অনুসন্ধানে জানিল, এটা হাঁসপাতাল। এখানে সে কিরূপে আসিল, কে আনিল, কোথা হইতে আনিল, কিছুই তাহার মনে নাই। হাঁসপাতালকে সে চিরকাল ভয়ের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। যাহার কেহ নাই, তাহাকেই হাঁসপাতালে ফেলিয়া আসা হয়, এইরূপ তাহার ধারণা। সে বেশ বুঝিতে পারিল, এতদিন যাহাদের পায়ের তলায় সে পাঁউরুটীর ঠাসা ময়দার মত ধর্ষিত হইতেছিল, তাহারাই তাহাকে রুগ্ন দেখিয়া হাঁসপাতালে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। এই চিন্তায় সে একটু আরাম পাইল। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাইল ততোধিক। ইহারা ছাড়িয়া গেলে সে গিয়া দাঁড়াইবে কোথায়? সে শুনিয়াছিল নিশি হাঁসপাতালে কাজ করে। এই কি সেই হাঁসপাতাল? এখানে কি সে নিশিকে দেখিতে পাইবে? নিশি কি তাহার সহিত কথা কহিবে? পিশাচের স্পর্শ বর্ষাকালের গেঁড়ির মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে একটা লালাক্লিন্ন রেখা টানিয়া দিয়াছে। ইহাকে সে মুছিবে কি দিয়া? আজই যদি——দূরে ঐ লোকটা কে? ঐ যে, একজন রোগীর সহিত কথা কহিতেছেন? নিশি না? হা, নিশিই ত। গৌরীর আজ এ কি হইল? বৎসরান্তের ধ্বংসভ্রংশোন্মুখ কদলীকাণ্ড হইতে আরক্ত মোচার ন্যায়, তাহার হৃৎপিণ্ড একটা প্রাণফোড়া বাসনায় বৃন্তে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল।

নিশি কাছে আসিল। তাহার দিকে একবার তাকাইল, তাহার মাথার কাছে ঝুলান টিকিটের দিকে একবার চাহিল, তার পর নিজের কাজে চলিয়া গেল। গৌরীর মনে হইল সে কি এতই পতিতা? তাহার সহিত একবার কথা কহিলে কি নিশির জাত যাইত? হায়! সে আজ নিজেকে লুকাইবে কোথায়? ফাটিবার-মত-হইল-অথচ-ফাটিল-না-এমন ফোড়ার মত তাহার সমস্ত হৃদয় টন্‌টন্ করিতে লাগিল। ইহাকে লইয়া সে কি করিবে? কোথায় গিয়া জুড়াইবে?

ইহার কিছুদিন পরে নিশি প্রথম গৌরীকে দেখিল। নিজের বুকপকেটের ঘড়িকে হঠাৎ যাদুকরের বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইতে দেখিলে লোকে যেমন হতভম্ব হইয়া যায় নিশি সেইরূপ হইল। সে ধীরে ধীরে গৌরীর কাছে গিয়া বলিল, "তুমি এখানে রয়েছ?"

গৌরী একথার উত্তর দিতে পারিল না। কেবল একবার 'নিশি দা!' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নিশির তখন যে অবস্থা হইল তাহা নার্স্ বা রোগীদের কাছে প্রকাশ করিবার মত নয়। সে একটা কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল।

গৌরী নিশির ওয়ার্ডের রোগী নয়, তাই ইচ্ছামত তাহার কাছে আসিত পারিত না। তবে দুই বেলা তাহার কাছে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিত, ফল মূল আনিয়া খাওয়াইত, অল্পক্ষণের জন্য একটু আধটু সেবাও করিত। ইহাতে প্রথম প্রথম তাহার খুব লজ্জা করিত। শেষটা অভ্যাস হইয়া গেল। গৌরীকে সে নিজের সম্পর্কিত ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিল।

সে বারবার গৌরীর কাছে কৈফিয়ৎ দিয়াছে যে তাহার মুখ এত ফুলিয়াছিল যে সে প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কথাটা গৌরী মানিয়া লইল কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করিল না। নিজের মুখ এত ফুলিয়াছিল যে চেনা যায় না, এ কথা সে নিজে কেমন করিয়া বুঝিবে? সে মনে করিল নিশি তাহাকে এড়াইতেই চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া এখন হয়ত তাহার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। তাই আর সে দূরে থাকিতে পারিতেছে না।

হাসপাতাল হইতে যেদিন তাহার ছুটি হইল, সেদিন নিশি তাহার জন্য কাপড় কিনিয়া আনিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া একখানা গাড়ি করিয়া দিল। গৌরীর যৌবনজীবন সম্বন্ধে নিশি কোন প্রশ্ন করে নাই। সে ধরিয়া লইয়াছিল ইহার দেহের মালিক একজন কেহ কোথাও আছেন। এখন সে তাহার কাছে ফিরিয়া যাইবে। মালিকটী যে এতদিন কোন সংবাদ ল'ন নাই, এবং আজ তাহাকে লইতে আসিলেন না, এ সব প্রতিকূল যুক্তি, অপ্রিয় বলিয়াই নিশির চ'খে পড়ে নাই। গৌরীর মনের স্রোত ঠিক উল্টা দিকে বহিতেছিল। নিশি যখন তাহাকে হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া গাড়ি করিল, তখন আর তাহার সন্দেহ রহিল না যে, সেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া কোথাও লইয়া যাইবে। বাস্তবিক, তাহার এই নিরাশ্রয় অবস্থায় নিশি ছাড়া আর কে দেখিবে? কিন্তু সে যে নিরাশ্রয় এ কথা নিশি জানিবে কি করিয়া; এমন প্রশ্ন তাহার মনে উদয়ই হয় নাই।

সে সহজ ভাবে গাড়িতে উঠিয়া কোণ ঘেঁসিয়া বসিল এবং নিশির জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিল। ইহাতে নিশি একেবারে বেয়াকুব বনিয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া গৌরীও লজ্জিত হইয়া পড়িল, এবং seat এর মাঝামাঝি সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব, নিশি দা?"

নিশি পরিষ্কার করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

"কেন তোমার—এঁ—আ—"

গৌরী বলিল "না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।"

নিশি বিপদে পড়িল। এ ক্ষেত্রে তাহার কি করা উচিত? একবার যন্ত্রচালিতের ন্যায় পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিল, এবং তাহার ভিতর হইতে ছয়টা টাকা বাহির করিয়া গৌরীকে দিল, একটা কি বলিবার চেষ্টা করিল,—তারপর, কি ভাবিয়া হঠাৎ দরজা খুলিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিল।

একজনকে ডুবিতে দেখিলে আর একজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য। যে সাঁতার জানে না, সেও ঝাঁপাইয়া পড়ে, এমন ঘটনা প্রায় শোনা যায়। ধর্ম্ম প্রচারকেরা বলেন মানুষের মনে এই প্রবৃত্তি দিয়াছে ধর্ম্ম। হইতে পারে, বিশ্বচরাচরে এমন মহাপুরুষ কেহ আছেন যিনি ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া আর্ত্তত্রাণ করেন,—স্বর্গের আশায়, ভাল ভাল অপ্সরার পাশে বসিবার লোভে, বা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার কামনায় পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধারণ লোকে যে অনেক সময়ে নিজেদের বিপন্ন করিয়া পরকে বাঁচাইতে যায়, সে শুধু পরের

দুঃখে তাহাদের প্রাণ কাঁদে বলিয়া, তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না বলিয়া। স্বার্থপরতার ন্যায় পরার্থপরতাও মানুষের স্বভাব। অণুপরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ন্যায় এই দুইটি প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে কাজ করিতেছে। স্বার্থে নিতান্ত আঘাত না পড়িলে, এমন কি অনেক সময়ে স্বার্থকে ব্যাহত করিয়া, সে আর্ত্তত্রাণ করিতে ছুটিবেই। সাধারণ লোকের এই প্রবৃত্তিকে একমাত্র ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না। পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে, এমন সময়ে যদি দেখি একজন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বাছিয়া বাছিয়া শুধু হিন্দু বা মুসলমানের ঘর বাঁচাইবার জন্য,—তবে বুঝিতে পারি ইনি সহজ লোক নন! ইনি ধার্ম্মিক।

নিশির ত ধর্ম্ম নাই। তাহাকে ঠেকাইবে কে? সে যেমনি দেখিল গৌরী নিরলম্ব, পতনোন্মুখ, অমনি ছুটিয়া গিয়া ঘাড় পাতিয়া তাহাকে গ্রহণ করিল, ইহাতে তাহার নিজের ঘাড় ভাঙ্গিবে কি হাড় ভাঙ্গিবে, ভাবিবার সময় পাইল না। পতিতাকে কাঁধে লইবার পর তাহার চিন্তা হইল, ইহাকে লইয়া এখন সে কি করিবে? কোথায় যাইবে? দেখিল, কোথাও যাওয়া যায় না। পতিতা বলিয়া যাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে সাহস করিতেছে না, তাহাকে পরের ঘাড়ে চাপাইবে কি বলিয়া? না, অস্পৃশ্যকে যদি স্থান দিতে হয়, নিজের ঘরেই দিতে হইবে।

গৌরীকে সঙ্গে করিয়া নিশি নিজের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, Tartaric acid solutionএ Soda Bicarbonate এর মত। অমনি সংসার ফোঁস্ করিয়া উঠিল, এবং তার আগাগোড়া তোলপাড় হইতে লাগিল। জগত্তারিণী, দূর দূর করিয়া গৌরীকে বিদায় করিলেন। তাহাকে অন্দর মহলে ঢুকিতেই দিলেন না। গৌরীর আগমনে জগত্তারিণী প্রীত হইবেন না, নিশি জানিত। কিন্তু তিনি যে এতটা হিংস্র হইবেন তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই। যাহার হউক, গৌরীর কাছে তিনি যে পাইয়াছেন অনেক। গৌরীও নিজকে অস্পৃশ্য বলিয়া প্রচার করিত বটে। কিন্তু এই অস্পৃশ্যতার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা এতদিন বুঝে নাই, আজ বুঝিল।

নিশি ভাবিতে লাগিল নারীর প্রতি নারী এত নির্দ্দয় কেন? পতিতাকে পুরুষ ক্ষমা করে, নারী করে না কেন? তাঁহাদের আদর্শ মহান্ বলিয়া? মিথ্যা কথা। তাঁহাদের কোন আদর্শ নাই বলিয়া। সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া যে ছুটিয়াছে সে নদী নিজের পাবকতার বলে অতি মলিন জলধারাকেও প্রত্যাখান করে না। আপনার ক্ষুদ্রতায় পরিসমাপ্ত কূপকেই চারি দিকের অপবিত্রতা বাঁচাইয়া চলিতে হয়।

নিশি ফিরিয়া যাইবে মনে করিতেছে, এমন সময়ে রামময় তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিলেন "এ একটা কি কাণ্ড করে বসেছ?"

নিশি। গৌরীর কথা বল্‌চো?

রাম। হাঁ। কাজটা কি ভাল হয়েছে? একটা বারবনিতা—

নিশি। বারবনিতা কাকে বলচো? যে বারজনের মুঠো থেকে পালিয়ে এসে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে চায়?

রাম। আজ না হয় তাঁর শ্মশান-বৈরাগ্য হয়েছে—

নিশি। আমি তাই বলচি, আজ ইনি বারবনিতা নন।

রাম। অমন ঘণ্টায় ঘণ্টায় মানুষ বদ্‌লায় না।

নিশি। বদ্‌লায় ত দেখি। আজ দালাল, কাল মাতাল, পরশু বৈরাগী।

রাম। যাক্, এ নিয়ে আর কথা কাটাকাটি করতে চাই না। আমি বলচি তুমি এ স্ত্রীলোকটিকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিও না।

নিশি। এ হুকুম সম্পূর্ণ পালন করবো। কেন না তোমার বাড়ী।

রাম। আমার বাড়ী বলে? একটা দেখতে হয় ত। এ স্ত্রীলোকটি পতিত,—সমাজ তাকে ত্যাগ করেছে।

নিশি। সমাজ যাকে ত্যাগ করেছে, সে কত বড় নিরাশ্রয় একবার বুঝে দেখ।

রাম। কিন্তু এত নিরাশ্রয় হয়েছেন কেন? ইনি কতগুলি ঘর ভেঙেছেন, কতগুলি লোকের বুকে রাবণের চিতা জ্বালিয়েছেন, জান?

নিশি। ঠিক জানি না। মনে করা যাক্ পঞ্চাশটি ঘর ভেঙেছেন। সেই জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইনি আরও পাঁচ শ' টা ঘর ভাঙতে পারেন?

রাম। ওগো, অমন কথা আমরাও ঢের বলেছি।

নিশি। তাই আমরা আর বলবো না এমন ত হ'তে পারে না।

রাম। আমরা এতদিন ভুল ক'রে ঠকেছি।

নিশি। আমাকেও না হয় দু'দিন ঠক্‌তে দাও। যার কোথাও স্থান নেই, আমি ভুল ক'রেই না হয় তাকে স্থান দিলুম।

রাম। তুমি শুধু রাস্তার লোকের উপরই কর্ত্তব্য করতে যাচ্ছ। বাড়ীতে তোমার কর্ত্তব্য নেই? তোমার স্ত্রীর কথা কি ভেবেছ? তোমার মার প্রতি কি কর্ত্তব্য করচো?

নিশি। বাপের কথাটাও বাদ দিও না।

রাম। আমার নিজের মনে কি কষ্ট হচ্চে না? কিন্তু—

নিশি। তোমার মনেও তা হলে কষ্ট হয়? আশ্চর্য্য! বলিয়া নিশি চলিয়া যাইতেছিল। রাম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবে ঠিক করলে?"

নিশি। যাই করি, তোমার বাড়িতে ওঁকে রাখ্‌বো না।

রাম। দেখ, বাড়াবাড়ি ক'রো না।

নিশি। না, বাড়াবাড়ি করবো না। যে টুকু না করলে নয়, সে টুকুই করবো!

নিশি আর দাঁড়াইল না।

নিজের বাড়ী ছাড়া আর একটি জায়গায় নিশির অবারিত দ্বার ছিল,—খুড়িমার বাড়ী। নিশি ভাবিল, তাহার পিতামাতা যেমন করিয়া গৌরীকে তাড়াইলেন, তাহার খুড়িমা কি তেমন করিয়া তাড়াইতে পারিবেন ? খুব সম্ভব পারিবেন না। তবু গৌরীকে ভিতরে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার অনুতাপ হইতে লাগিল, সে ইতিপূর্ব্বে কেন খুড়িমার কাছে গৌরীর পরিচয় দেয় নাই।

নিশিকে দেখিয়া খুড়িমা প্রায় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ওরে, শুনেছিস ? সরোজ ফিরে এসেছে।"

নিশি নিজের কথা পাড়িতে পারিল না। সে প্রতিভার সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, "কি রকম ?"

প্রতিভা। সে যে এখন এই বাড়ীতেই থাকে।

নিশি। তাই নাকি ? তার বৌ মাছ খেতে আরম্ভ ক'রেছে ?

প্রতি। মাছ খাবে কেন ? যা খেতো তাই খায়।

নিশি। আলু আর পেঁয়াজ ?

প্রতি। কেন আর কিছু খেতে নেই ?

নিশি। শুধু আলু খেলে লোকে বলবে হিঁদু হ'য়ে গেছে। তাই পেঁয়াজ দিয়ে কোন রকমে জাত বাঁচাতে হয়--যাক্ তোমরা মাছ খাওয়া ছেড়েছ না কি ? তা হ'লে বলে দাও এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করি।

প্রতি। আমাদের মাছ ছাড়তে হয় নি। তাদের রাঁধা খাওয়া আলাদা।

নিশি। তা বেশ হয়েছে। কল্‌কেতায় আলাদা বাসা ক'রে আলু-পেঁয়াজ খেতেই জিভ বেরিয়ে পড়ে। এক সঙ্গে থাকাই ভাল।

প্রতি। তুই বড় নিন্দুক হ'য়েছিস। কেন তার টাকার কিছু অভাব ছিল ?

নিশি। টাকার অভাব নেই। তবে রাত্রিবেলা খেতে ব'সে দেখা গেল আলুভাতেতে নুন নেই। তখন চট্ ক'রে দোকানে যাওয়ার চেয়ে, যার কাছ থেকে চেয়ে আনা সুবিধের না ?

প্রতি। হাঁ, সেও তোর নামে ভয়ানক অপবাদ দিচ্ছিল। বল্‌ছিল, তুই নাকি হাঁসপাতালের কোন একটা মেয়ের সঙ্গে—

নিশি। সে মিথ্যা কথা বলেনি। হাঁসপাতালের একটা মেয়ে রুগী আমাকে পেয়ে বসলো।

প্রতি। কি বলচিস তুই ?

নিশি। হাঁ খুড়িমা, সত্য কথা। গাড়ীতে উঠে আমাকে ডেকে নিলে।

প্রতি। ভারি আবদার দেখি ! গালে ঠাস ক'রে দুটো চড় মারতে পারলি নি ?

নিশি। মরেতে গিছ্লুম। দেখলুম দু' চোখ দিয়ে জল পড়্ছে। চ'ড়ের হাত পিছ্লে গেল।

প্রতি। ভারি বদ মেয়ে ওরা। ঐ রকম ক'রে লোকের মন ভেজায়।

নিশি। আমার ত মন ভিজিয়ে ফেলে।

প্রতি। তারপর কি হ'ল ?

নিশি। সঙ্গে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে এলুম।

প্রতি। বাড়ীতে নিয়ে এলি ? বলিস কি রে ?

নিশি। কি করবো ? সরোজের মত ত আমার হাতে টাকা নেই যে একটা বাসা ভাড়া করবো ?

প্রতি। বাসা ভাড়া করবি কি বল ? তোদের আজকাল হচ্চে কি সব ?

নিশি। তা হলে কি করবো বল ?

প্রতি। তাড়িয়ে দিবি। আবার কি করবি ?

নিশি। তাড়িয়ে দিতে গেছলুম। সে বল্লে তার যাবার কোন জায়গা নেই।

প্রতি। জায়গা নেই। ন্যেকী। একেবারে মাটী ফুঁড়ে বেরিয়েছেন।

নিশি। বল্লে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিল। তারপর যার সঙ্গে এসেছিল সে বোধহয় পালিয়েছে। এখন সে একেবারে একা। আজ সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও তার মাথা রাখবার স্থান নেই, আর এই লক্ষ কোটী লোকের মধ্যে একজনকেও সে আপ্‌নার বল্‌তে পারে না।

প্রতি। উঃ, তুই এমনি করে বলিস্! তুই বড্ড বাড়িয়ে বলিস।

নিশি। আমি সত্য কথাই বলিছি।

প্রতি। তোর বাপ মা আপত্তি করেন নি ?

নিশি। করেছেন বৈকি। তাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রতি। তা হ'লে এখন সে কোথায় আছে ?

নিশি। রাস্তায়।

প্রতি। রাস্তায় কি বল ?

নিশি। হাঁ রাস্তায় তোমারই দোরগোড়ায়।

প্রতি। তা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন ? তুইও ত কম নিষ্ঠুর নয় দেখি।

আনন্দস্রোতে নিশির বুক ভরিয়া গেল। সে হাসিল। কে জানে কোন কৃপণ বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি মানুষের এই দেহ যন্ত্র। নিশির বুকজোড়া হাসি আজ যন্ত্রের দোষে একেবারে বুকফাটা কান্নার মত দেখাইল।

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো

আজ প্রতীচীর গগন ভুবন জ্ঞানের আলোয় ফুট্‌ফুটে !
সেই আলোকে প্রাচ্যদেশের ঘুচ্‌লো আঁধার ঘুট্‌ঘুটে !
স্বপ্নলোকের মানুষ যারা, চোখ মেলে' আজ আত্মহারা,
নাস্তানাবুদ্‌ হোচ্ছে নাহক্‌, কয় না কথা মুখ ফুটে' !
দাম্ভিকতার স্তম্ভ চূড়া আজ পলকে যায় টুটে' !

তাসের প্রাসাদ যায় উড়ে' আজ, ফাঁকির ফানুস যায় পুড়ে' !
লজ্জা ঘৃণা মজ্জাতে খুব ঢুক্‌ছে গিয়ে হাড় ফুঁড়ে' !
ছুট্‌লো পরম আত্মপ্রসাদ, জাগ্রত সব গুণ্‌ছে প্রমাদ,
যত্নে-পোষা অধঃপতন আর কি ছেড়ে যায় দূরে ?
নিঃস্ব নিরাশ আলসে জাতির আজ্‌কে হৃদয় খায় কুরে' !

আর্য্য ব'লে বড়াই করি, আম্‌রা আবার আর্য্য কি ?
আর্য্য হ'লে পতন এমন ঘোট্‌তো অনিবার্য্য কি ?
তা'রাই খাঁটি আর্য্য বটে, কীর্ত্তি আঁকা বিশ্ব পটে,
নিত্য নতুন আবিষ্কারের ছাড়্‌ছে কোনো কার্য্য কি ?
মর্‌ছে তবু মৃত্যু-ভয়ে পন্থা পরিহার্য্য কি ?

আকাশ পাতাল সাগর ভূতল জরিপ্‌ তা'রাই কর্‌ছে রে !
মকর্‌-পোতে যাচ্ছে ছুটে' জলের তলে ডুব মেরে' !
চ'ড়ে বিরাট্‌ খেচর-গাড়ী, শূন্যপথে দিচ্ছে পাড়ি,
বাষ্পপোতে চ'ল্‌ছে ভেসে সাত সাগরের বুক ফেড়ে' !
সৈন্য-বোঝাই বাষ্পযানে পণ্য, পুণ্য ন্যায় কেড়ে' !

আমদনীর নিম্নে মুণ্ড্‌, কর্‌লো কলির দেব্‌তারা !
মেঘের মেয়ে বিদ্যুতেরে বানায় দাসী আজ তা'রা !
লক্ষ যোজন সুদূর থেকে, বে-তারে কয় সব্‌কে ডেকে,
কাট্‌লো সুয়েজ খাল সুবিশাল ; মেরুর খোঁজে যায় মারা !
আট বছরে আল্প্‌স্‌ পাহাড় কর্‌লো ছ্যাঁদা আকারা !

সাগর সেতু গ'ড়্‌লো তা'রাই 'পদ্মা' বেঁধে শৃঙ্খলে !
শৈলশিরে দার্জ্জিলিঙে স্বর্গ রচে কৌশলে !
সিন্ধুনদে বাঁধ বেঁধে আজ, কর্‌লো একি অপূর্ব্ব কাজ !
আজ মরুতে বন্যা বহায়, ফসল ফলায় সেই জলে !
হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায় চ'ড়্‌তে মরণ পায় দলে !

এখন একটু স'মঝে দ্যাখো ! মত্ত তা'রা শক্তিতে !
আম্‌রা অলস ঘোর তামসিক, দেব্‌তাকে চাই দুধ দিতে !
"ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষোজহি ॥"
প্রার্থনাতে পরম পটু, নৃত্য করি ভক্তিতে !
তৃপ্ত আছি প্রাক্তনতার পোক্ত অনুরক্তিতে !

লঙ্কায় হাজির করার মোহ আজ পেয়েছে জাত্‌টাকে !
আর্য্যামির তাই দিচ্ছি প্রমাণ ফক্কিকাময় হাঁক্ ডাকে ।
পুষ্পকরথ ? চিড়িয়া-গাড়া ! ছিল রাবণ রাজার বাড়ি
উর্ব্ব ঋষির বাড়বানল, বারুদ বলি আজ তা'কে ;
নালিকায়ুধ বন্দুক হোয়ে তাড়ায় শত্রু-শঙ্কাকে !

সেই যুগের সেই শতঘ্নীকে কামান রূপে আজ দেখি !
তা'র যে গোলা গুড়ক ছিল, কর্‌তে প্রমাণ বই লেখি ।
জলে স্থলে উচ্চ নভে, লড়াই নাকি চল্‌তো তবে ।
উঠ্‌তো কেঁপে চৌদ্দ ভুবন ; শক্তি ছিল কম সে কি ?
জাত্‌টা হঠাৎ হচ্ছে বৃহৎ শাস্ত্রীয় সেই সাক্ষ্যে কি ?

তড়িৎ-তত্ত্ব ? সেও তো জানা দেব্‌তা কাঁদে সন্ত্রাসে !
বৈদ্যুতিকী শক্তি ছিল শক্তিশেল ও নাগ্‌পাশে !
অষ্টধাতুচক্র, ত্রিশূল, বজ্রাঘাতে বাঁচায় দেউল,
হৃদয় তবু দ্যায়্‌ না সাড়া প্রাচীনতার উল্লাসে !
ছিল অনেক, কোন্‌টি এখন ? বুক ফাটে তাই উচ্ছ্বাসে ।

টিঁক্‌তে যদি চাও জগতে, মাতো জড় বিজ্ঞানে !
এক সাথে আজ হও রে আকুল মনুষ্যত্ব সন্ধানে !
সাঁৎরে' সাগর উৎরে' শেষে, পারদলে যাও দেশ বিদেশে,
উপ্‌ড়ে' পাহাড় ফেল্‌তে শেখো, উড়্‌তে শেখো আসমানে !
হয় তো তখন মজ্‌বে অমর, ভুল্‌বে পামর সামগানে ;

জল-পড়া আর তুক্‌-তাকের ঐ রাখো বাজে বুজ্‌রুকি !
দেহের মনের জ্ঞানের বলে চল্‌তে শেখো বুক ঠুকি' !
জগৎ প্রাণের চায় পরিচয়, সত্য মানে, মিথ্যাকে নয় ;
ঝড় বাদলে হাল ছেড়ো না, সামলে' চলো সব ঝুঁকি ;
একটা মধুর মিলন-আশায় হও রে সবাই উন্মুখী !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

বিপ্র পরশুরাম

(আলোচনা)

মাঘের 'বঙ্গবাণী'তে বিপ্র পরশুরাম সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ পড়িলাম। পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পরশুরাম এবং মাধব সঙ্গীতের পরশুরাম এক কি না, সন্দেহ হইতেছে। সম্প্রতি আমি বগুড়া হইতে পরশুরামের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রায় সমগ্রটা উদ্ধার করিয়াছি। পুঁথিখানার আয়তন বেশ বড়, দৈর্ঘ্যে ১৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৭½ ইঞ্চি,—প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৭ লাইন করিয়া লেখা। ইহা মূলতঃ অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মতই ভাগবত অবলম্বনে লিখিত, পারিজাত হরণের উপাখ্যানটি হরিবংশ হইতে নেওয়া হইয়াছে। আমার প্রাপ্ত পুথি ১০৯ পাতায়, তুলসীপত্র-বিনিময়ে সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। পরে আর বোধ হয় বেশী ছিল না। প্রথমে, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ও শুকদেবের ভাগবত কথন, এবং ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যানে গ্রন্থের আরম্ভ,—পরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও ব্রজলীলা, পরে মথুরালীলা এবং সর্ব্বশেষ দ্বারকায় রাজত্ব প্রসঙ্গে গ্রন্থের সমাপ্তি।

গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের পরিচয় চোখে পড়িল না সমগ্র পুঁথি আগাগোড়া পড়ি নাই, থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রত্যেক প্রসঙ্গের শেষেই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার নাম আছে। যদৃচ্ছা ক্রমে দুই একটি ভণিতা দিলাম--

ভক্ত রসিক মনে আনন্দে বিভোল।
দ্বিজ পরশু রামে গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ ২৩।১

শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল কথা সর্ব্ব পাপ নাশা।
গায় বিপ্র পরশুরাম গোপাল ভরসা ॥ ২৭।১

শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ ধেয়ান করিয়া।
বিপ্র পরশুরাম গান গোপাল ভাবিয়া ॥ ২৯।১

প্রথম অর্দ্ধার কথা হইল সমাধান।
গোপাল কৃপায় বিপ্র পরশুরাম গান ॥ ৪১

কচিৎ—"গায় বিপ্র পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণ যার সখা" এইরূপ ভণিতাও আছে। গ্রন্থারম্ভে গণেশ ও চৈতন্য নিত্যানন্দ ইত্যাদির বন্দনার পর আছে—

ঘরের ঠাকুর বন্দ শ্রীরঘুনন্দন।

—বোধ হয় শ্রীরাম বিগ্রহ কবির গৃহদেবতা ছিল।

ভণিতাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, কবি গোপালের উপাসক ছিলেন। মাধব সঙ্গীতের যে দুইটী ভণিতা হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, কবি "গুরুপদ আশ" করিতেন। এই দুই নমুনায় ভণিতা একই কবির কিনা সন্দেহ হইতেছে।

পরশুরামের আবাসস্থান কোথায় ছিল তার নির্দ্দেশ হরেকৃষ্ণ বাবু করিতে পারেন নাই, তথাপি তাহাকে তিনি পশ্চিম বঙ্গের কবি বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। ইহা সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় না। কবি হিসাবে পরশুরামের বেশ আদর ছিল তাহার রচনার প্রচারও যথেষ্ট হইয়াছিল। পরশুরাম রচিত সুদাম চরিত্রের একখানা পুঁথি দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" পরিশিষ্টে প্রদত্ত পুঁথির তালিকার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা সুদাম চরিত্রের ১৩ খানা পুঁথি পাইয়াছি—সর্ব্ব প্রাচীনখানা ১১৭৪ সনের এবং ৭ পাতায় সমাপ্ত। এই সমস্ত পুঁথিই শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত। সুদাম চরিত্রের বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ সখা দীনদরিদ্র সুদাম পত্নীর প্ররোচনায় দ্বারকায় গিয়া ভক্তিপ্রদত্ত এক মুষ্টি ক্ষুদ দিয়া কিরূপে কৃষ্ণের তৃপ্তি সাধন করেন এবং প্রার্থনা ব্যতিরেকেই কিরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হন। এই উপাখ্যানটি ভাগবতের ১০ম স্কন্দের অশীতিতম অধ্যায়, ব্রাহ্মণের নাম তথায় শ্রীদাম। সম্ভবতঃ

এই উপাখ্যানটি লক্ষ্মীর ব্রতের পাঁচালী স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। পরশুরাম রচিত এই উপাখ্যানটির অনুবাদ তাই এত বহুল-প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। পরশুরাম রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একটি উপাখ্যান পারিজাত হরণ,—ইহা হরিবংশ হইতে গৃহীত। এই পারিজাত হরণ উপাখ্যানের ভিন্ন পুঁথিও পাওয়া যায়—আমরা ৬খানা পাইয়াছি—এই পুঁথিগুলিও পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই পাওয়া। এই সর্ব্ববঙ্গ-প্রচারিত কবিকে কোন স্থানবিশেষের অধিবাসী বলিয়া দাবী করিতে হইলে প্রবলতর প্রমাণ আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রীতিমত গানের বাঁধা পালা। প্রত্যেক অধ্যায় শেষে ধুয়া আছে এবং রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। মাধব সঙ্গীতও ঠিক সেই রকম বলিয়াই বোধ হয়। উভয় কাব্যের বিষয়ও এক। একই কবি কি একই বিষয়ে দুইখানা পুঁথি লিখিয়াছিলেন?

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী
সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংগ্রহ সমিতি।

তার-পর

"কোথায় যাচ্ছ"—হাসিয়া অনাদি প্রশ্ন করিল। প্রভাত-সূর্য্য তখন আকাশের অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াই যেন জানাইয়া দিতেছে—যে, পূর্ব্বাহ্ন প্রায় শেষ। কাজেই সুস্মিতের চরণ দুইটি আর তাহাদের বেগ রোধ করিতে রাজি ছিল না। সেই জন্য সে একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল—"যাব নগরবাড়ী। আর দেরি করার সময় নেই। প্রথম মোটারটা ধরতে হবে।"

হাসি চিবাইতে চিবাইতে অনাদি বলিল—"এই ভর্ অশ্লেষা মাথায় বার হয়েছ। মোটার আর পাচ্ছ না। আজ বাড়ী ফের—পরশু যেও।"

আবার বাধা। বিরক্ত সুস্মিত ভাবিল—একি মানুষের স্বভাব। পদে পদে বাধার সৃষ্টি। আমি যখন বাহির হইয়াছি—তখন আমাকে আবার আটক করিবার বৃথা চেষ্টা কেন? সে অপ্রসন্ন মনে বলিল—"না, আমাকে যেতেই হবে। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

অনাদি চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় একটি কামড় দিয়া গেল—"যাও; অশ্লেষার বিড়ম্বনা—অদৃষ্টের লেখা।"

সুস্মিতও আর দাঁড়াইল না। কিন্তু অশ্লেষা তাহার সঙ্গেসঙ্গে চলিল। সে মনের উপর হইতে অশ্লেষার ছাপ কিছুতেই দূর করিতে পারিল না। কিন্তু অশ্লেষাও অকৃতজ্ঞ নয়। সঙ্গে থাকিয়া তাহার কোনও অনিষ্ট করিল না। সে মোটর পাইল—কোনটি দুর্ঘটনাও ঘটিল না। ট্রেণও ধরিল এবং ট্রেণ হইতে নামিয়া নৌকাও পাইল। সেই নৌকাতে সে স্বচ্ছন্দে নগরবাড়ী অভিমুখে রওনা হইল।

(২)

কবির কানা সেদিন বস্তু-জগতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল—

"একে কৃষ্ণপক্ষ নিশি, ঘোর অন্ধকার
চারিদিকে মেঘাচ্ছন্ন তাহাতে আবার।"

দৃষ্টি চলে না। ঝড়ের ভয়ে মাঝিরা নদীর কূলে কূলে নৌকা বাহিয়া চলিতেছিল। সুস্মিত ভাবিল—তাই ত' অশ্লেষা দেখিতেছি—পিছনেই লাগিয়া রহিল। যাক ইহা লইয়া আর মিথ্যা ভাবিব না। 'যদ্বিধের্মনসি স্থিতং'—তাহাই হইবে।

অদূরে একটা আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। যেন কাহার মুখ চাপিয়া ধরা হইয়াছে, সে সেই রুদ্ধ অবস্থাতেই ফুঁপাইতে চেষ্টা করিতেছে। সুস্মিত মাঝিকে বলিল—"নৌকা লাগাও।"

মাঝিরা কহিল "কর্ত্তা, এটা শ্মশান। এই সন্ধ্যার ঝুঁকে এখেনে ভূত-প্রেতেরা নাচ্‌তে থাকে। এখেনে এ সময়ে তারা না' নাগাতে পার্‌বে না।"

কিন্তু সুস্মিত ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সেখানে মাঝিরা নৌকা লাগাইতে বাধ্য হইল। একজন মাঝী নৌকায় রহিল, আর একজন তাহার সহিত আলো ধরিয়া চলিল। সুস্মিত নদীতীরে সেই অব্যক্ত আর্ত্তনাদ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল।

(৩)

তারা খানিক দূর অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইল—নদী-তীরে সামান্য একটা বনের ধারে কয়েকজন লোক রহিয়াছে। আলো দেখিয়াই লোকগুলি যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

সুস্মিত সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল—একটি মেয়ে, হাত-পা-মুখ-বাঁধা তার—অর্দ্ধ-দিগম্বর অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

সে মেয়েটির বাঁধন খুলিয়া দিল, এবং তাহার চাদরখানা তাহাকে দিয়া কহিল—"এইখানা পর', পরে আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দেব।"

মেয়েটি তখনও কাঁপিতেছিল। তাহাকে সাহস দেওয়ার জন্য সে পুনরায় বলিল—"আমার কাছে তোমার কোনও ভয় নেই। এস আমার পাছে-পাছে।"

সে নৌকা-অভিমুখে অগ্রসর হইল। মেয়েটিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

(৪)

নৌকাতে সুস্মিতের প্রশ্নের উত্তরে বালিকা বলিল—"আমার নাম বিনোদিনী। আমি চোদ্দ-পনের বছর বয়সে বিধবা হই। আমার বাপ নেই। এক ভাই আছে। সে গরীব—কানে

চাকরি করে। শ্বশুর বাড়ীতে আমি থাকি। সন্ধ্যার সময় আমাকে কাল বাধ্য হয়ে একলা নদীতে আসতে হয়, তার পরই আমার এই দুর্গতি।"

বিনোদিনী নীরব হইল। সুস্মিত তাহার দুঃখে সহানুভূতি জানাইল। এবং তাহাকে লইয়া তাহার শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আবেদন জানাইল যে, যেন তাঁহারা বিনোদিনীকে নিরাশ্রয় না করেন।

তাহার শ্বশুর বলিলেন—"সে হয় না—তিনি কলুষিতা নারীকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারেন না।"

সুস্মিত সানুনয়ে কহিল "যখন আমরা এ নীচ অত্যাচারকে দমন কর্ত্তে পেরে উঠ্‌চিনে,—তখন কি আমাদের সমাজের পক্ষ হতে তাদের আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়?"

শ্বশুর কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন—"আপনিও ত সমাজের একজন—আপনিই আশ্রয় দিন না কেন? দেখ্‌চি—আপনি একজন পরদুঃখে কাতর, সমাজহিতৈষী সংস্কারক, তখন আর মিথ্যা আমার দুয়োরে ধর্ণা দিতে এসেছেন কেন? কিন্তু দেখুন—আপনি যেমন বলচেন—সমাজ ত' ঠিক তেমন নয়। সমাজ মৃত—পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থাও ত' মানে না। এদিকে একে আশ্রয় দিলে সমাজই ত' আমাকে একঘরে করবে। যান মশাই, আপনার পথ দেখুন। আমাকে ছেলে পিলে নিয়ে সমাজের আওতায় বাস করতে হয়।"

"আচ্ছা, আমিই আশ্রয় দেব"—বলিয়া বিরক্ত হইয়া সুস্মিত বিনোদিনীকে সঙ্গে করিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

(৫)

নারী-রক্ষা-সমিতি সাহায্য করিল। সুস্মিত তদ্বির করিল। মোকর্দ্দমায় দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তি হইয়া গেল। তারপর—

মোকর্দ্দমা যতদিন চলিল, ততদিন বেশ একটা হৈ চৈ ছিল। উৎসাহের বন্যায় বিনোদিনী অনেকের নিকট হইতে অনেক রকম সাহায্যও লাভ করিল।

কিন্তু?

সমস্তই ঘটিল। পণ্ডিত সমাজের নিকট হইতে ব্যবস্থাপত্রও আদায় হইল। কিছুই বাকি রহিল না। কিন্তু বিনোদিনীর উপায়? আশ্রয় দেওয়া উচিত—এ কথা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সামাজিক মর্য্যাদা সহ স্থান কোনখানেই তাহার জুটিল না। শ্বশুর বাড়ীর দুয়ারও সমাজ তাহার জন্য খুলিয়া দিতে পারিল না। অভাগিনীর বৃথাই সমাজের দুয়ারে মাথা-খোঁড়া সার হইল।

সুস্মিত তাহার একটা সামাজিক মর্য্যাদা স্থির করিতে চেষ্টা করিলেও—তাহার কোনও উপায় করিতে পারিল না। সে তাহাদের বাড়ীতে রহিয়া গেল বটে—কিন্তু কোনও পারিবারিক মর্য্যাদালাভ করিয়া নয়—দাসী হিসাবে।

তাহার মন বলিল—তাই ত, সমাজের দুয়ারে আজ এত বড় একটা সমস্যা আসিয়া উপস্থিত—অথচ সমাজ তাহার সমাধান সম্বন্ধে এমনই উদাসীন।

ধীরে ধীরে বিনোদিনী আসিয়া ডাকিল—"দাদা !"

সুস্মিত মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল—"কি ?"

সে বলিল—"দাদা, সবই ত' হল। কিন্তু তারপর।"

সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া বুঝি ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল—আসামীর দণ্ড হইল—খবরের কাগজের খোরাক জুটিল—উন্মত্ত জনসাধারণের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল ; কিন্তু আমার কি হইল ?

ক্ষুব্ধ ব্যথিত সুস্মিতের বুক ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল—"তারপর—

জানি না আর কত দিন সমাজের বুকের কাছে এই অমীমাংসিত প্রশ্ন ঘুরিয়া বেড়াইবে—"তার-পর—

শেষ নাই—*

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

প্রাণী ও উদ্ভিদের স্নায়ু

(সার্ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার)

আগুনে হাত দিলে তাপ পাইবামাত্র হাত আপনা হইতেই আগুনের কাছ হইতে সরিয়া আসে। এই কাজ করিবার জন্য আমাদের নিজের কোনো চেষ্টা করিতে হয় না—বিপদ্ আসন্ন বুঝিয়া হাত আপনাকে আপনিই সামলায়। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় আমাদের স্নায়ুর Reflex ক্রিয়া। ইহা যে কি, তাহা শরীরবিদ্‌গণ জানেন। তাঁহারা বলেন, তাপের প্রবল উত্তেজনা স্নায়ু অবলম্বনে শরীরের ভিতরে গিয়া কোনো কোনো স্নায়ুকেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং তার পরে সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয়া তাহাই আবার নূতন স্নায়ু দিয়া বাহিরের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ যে উত্তেজনা পূর্ব্বে ছিল অন্তর্মুখ (Afferent), তাহাই এখন হইয়া দাঁড়ায় বহির্মুখ (Efferent)। শরীরবিদ্‌গণ বলেন, এই প্রতিফলিত বহির্মুখ উত্তেজনাই আমাদের হাতকে আগুনের কাছ হইতে সরাইয়া আনে। এই কাজের উপরে আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নাই। খুব

---

* "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী" সুতরাং জানি না—কোনও কালে সমাজ এ সমস্যার সমাধান করিয়া লইবেন কি না ?—লেখক

জোর না করিলে হাতকে আগুনের কাছে এগানো যায় না। ইহাতেই কলের মতো হাত আগুনের কাছ হইতে সরিয়া যায়। ইহার উপরে ইচ্ছাশক্তির কোনো অধিকারই নাই। প্রাণিশরীর ব্যবচ্ছেদ করিলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ুসূত্র পাশাপাশি বিন্যস্ত দেখা যায়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের দেহেও অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ুগুচ্ছের আবিষ্কার করিয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, তাহাদের কার্য্য যে প্রাণীরই অনুরূপ চলে, তাহাও দেখাইয়াছেন। তিনি লজ্জাবতীর পাতার বোঁটা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে বোঁটায় চারিটি করিয়া স্নায়ুগুচ্ছ ধরা পড়িয়াছিল। এগুলিই বোঁটার উপরকার চারিটি পাতার বৃন্তমূলের (Pulvinus) সহিত স্নায়বিক যোগ রক্ষা করে। জগদীশচন্দ্র দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, এই স্নায়ুগুচ্ছগুলি একই প্রকার স্নায়ু লইয়া গঠিত নয়। প্রত্যেক গুচ্ছের বাহিরে এবং ভিতরে দুইটি করিয়া পৃথক স্নায়ু-সূত্র স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহাদের কার্য্য প্রাণীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ুর অনুরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি ?

আমাদের দেহে যদি কেহ ধীরে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহা বেশ ভালোই লাগে। হাতের এই রকম স্পর্শ আমাদের দেহের হানিকর নয়। ইহার অতি মৃদু উত্তেজনা অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়া চলিয়া শেষে আমাদিগকে আরাম জানায়। কিন্তু হাত না বুলাইয়া যদি কেহ ছুরি দিয়া আমাদের গায়ের চামড়া চাঁচিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আমরা আরাম পাই কি ? মোটেই আরাম পাই না। এ ক্ষেত্রে ছুরির আঁচড়ের প্রবল উত্তেজনা অন্তর্মুখ স্নায়ুর সাহায্যে ভিতরে গিয়া স্নায়ুকেন্দ্রে ঠেকে এবং সেখান হইতে প্রতিফলিত হওয়ার পরে বহির্মুখ স্নায়ুর পথে বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে ছুরির কাছ হইতে দূরে লইয়া যায়। প্রবল উত্তেজনা দেহের হানিকর, তাই এই উপায়ে দেহ স্বভাবতঃ নিরাপদ থাকিতে চায়। উদ্ভিদেও অবিকল ইহাই দেখা গিয়াছে। সূর্য্যের আলো না পাইলে উদ্ভিদের জীবনান্ত হয়। আলোই পাতায় পড়িয়া তাহাদের খাদ্য হজম করায়। সুতরাং আলোর মৃদু উত্তেজনা উদ্ভিদের পরম উপকারী। সূর্য্যমুখীর কচি পাতা বেশি আলো পাইবার জন্য সূর্য্য যে-দিকে থাকে সে-দিকে আপনা হইতেই মুখ ফিরায়। লজ্জাবতী এত লাজুক, তথাপি সে সব পাতাগুলিকে খুলিয়া সমস্ত দিন রোদ পোহায়। রোদের মৃদু উত্তেজনা উদ্ভিদের অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়া চলিয়া তাহাদের পাতাগুলিকে উন্মীলিত করে এবং যাহাতে পূর্ণমাত্রায় রৌদ্র গায়ে পড়ে তাহার জন্য সেগুলিকে প্রয়োজন মত বাঁকাইয়া ধরে। কিন্তু যখন উত্তেজনা প্রবল হয়, তখন আর এ ভাবটি থাকে না। এই অবস্থায় উত্তেজনা হইতে দূরে থাকিবার জন্য উদ্ভিদের প্রাণপণ চেষ্টা হয়। এই সময়ে সেই অনিষ্টকর প্রবল উত্তেজনা অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়া ভিতরে যায় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্নায়ুকেন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া বহির্মুখ স্নায়ুর সাহায্যে বাহিরে আসে। ইহাতে আপনা হইতেই পাতা গুটাইয়া যায় এবং

উত্তেজনার দিক্ হইতে দূরে থাকিবার জন্য ঘাড় বাঁকায়। প্রাণীর ও উদ্ভিদের স্নায়ুর কার্য্যে এই প্রকার অত্যাশ্চর্য্য মিল দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। উদ্ভিদের পাতা ও কচি ডালের উঠানামা এবং মুখ ফিরানো যে স্নায়ুর উত্তেজনাতেই হয়, তাহা জগদীশচন্দ্র উহাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাণীর দেহে যেমন অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ু থাকে, উদ্ভিদের দেহেও ঠিক তাহাই আছে। উভয় দেহেই বাহিরের উত্তেজনা অন্তর্মুখ (Afferent) স্নায়ু দিয়া স্নায়ুকেন্দ্রে যায় এবং উত্তেজনা যদি প্রবল হয় তাহা কেন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া বহির্মুখ (Efferent) স্নায়ু দিয়া বাহিরের দিকে আসে। ইহাতে প্রাণী ও উদ্ভিদেরা অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া প্রবল উত্তেজনার হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করে। প্রাণিদেহে এই উভয় স্নায়ুতে উত্তেজনার বেগ একই প্রকার বা বিভিন্ন তাহা আমাদের জানা নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদে স্নায়ুর উত্তেজনা-বহনের বেগ পরিমাপ করিতে গিয়া যে-ফল পাইয়াছেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। স্নায়বিক উত্তেজনা যত দূরে যায়, ততই তাহার বেগ কমিয়া আসে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, অন্তঃস্নায়ুর সাহায্যে উত্তেজনা কেন্দ্রে পৌঁছিয়া যখন বহিঃস্নায়ু দিয়া বাহিরে আসে, তখন সেই বেগ আরো কমে। কারণ বাহির হইতে কেন্দ্রে যাওয়া এবং কেন্দ্র হইতে বাহিরে আসার পথটা, বাহির হইতে কেবল কেন্দ্রে যাওয়ার পথের দ্বিগুণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র ইহারি ঠিক বিপরীত ফল পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, যে-বেগে অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়া উত্তেজনা কেন্দ্রে যায়, তাহারি প্রায় ছয়গুণ বেগে সেই উত্তেজনা বহির্মুখ স্নায়ু দিয়া বাহিরে আসে। এই বেগ বৃদ্ধির জন্য যে-শক্তির প্রয়োজন তাহা আসে কোথা হইতে? জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, অন্তর্মুখ উত্তেজনাকে বহির্মুখ করিয়াই স্নায়ুকেন্দ্রের কাজ শেষ হয় না, নূতন শক্তি দান করিয়া উত্তেজনাকে অধিক বেগে বাহিরে প্রেরণ করাও তাহার একটি কাজ।

ইহা হইতে বুঝা যায়, স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজনাকে নির্দ্দিষ্ট দিকে চালনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না,—সে আবশ্যক মতো কাজ চালাইবার জন্য অনেক শক্তিও সঞ্চয় করিয়া রাখে। বন্দুকের বারুদে যে শক্তি আছে, তাহা বারুদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বন্দুকের ঘোড়া টিপিলে তাহাই বন্ধনমুক্ত হইয়া গুলিকে চালায়। জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, অন্তর্মুখ উত্তেজনা স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছিয়া বন্দুকের ঘোড়ার মতোই সেখানকার শক্তি-ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দেয়। তার পরে সেই শক্তিতেই বহির্মুখ উত্তেজনা ভীষণ বেগে বাহিরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজারা দুর্গে অনেক গোলা বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। স্নায়ুকেন্দ্রের শক্তি-সঞ্চয় কতকটা সেই রকমেরই ব্যাপার। দেহরক্ষার জন্য কখন অন্তর্মুখ উত্তেজনাকে হঠাৎ বহির্মুখ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। তাই স্নায়ুকেন্দ্র প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিয়া কাছে রাখে। তার পরে বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র স্নায়ুকেন্দ্র সেই শক্তি প্রয়োগে

উত্তেজনাকে বহির্মুখ করে। ইহার ফলেই উদ্ভিদ্ নিজের ডাল-পাতা বাঁকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। স্নায়ুকেন্দ্রের এই কার্য্যে যদি একটু বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে মহাবিপদ্ উপস্থিত হয়। তাই সে সর্ব্বদা প্রচুর শক্তি সঞ্চিত রাখিয়া অন্তর্মুখ স্নায়ু কি সংবাদ বহন করিয়া আনে, তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। জীবন-রক্ষার জন্য উদ্ভিদ্-দেহের এই সুব্যবস্থা বিস্ময়কর নয় কি ? *

শ্রীজগদানন্দ রায়।

আপন কথা

(ঘর ঘর)

একটা সময় ছিল, যখন এই তিন তলার নীচের আর দুটো তলা ছিলনা আমার কাছে। তেমনি আর একটা সময়, যখন দেখ্‌চি, তিন তলার কড়ি বরগা, থামের উপর পিঠে ছাত্‌ বলে একটা স্থান আছে কি নেই। চোখে দেখার অনেক আগে বাড়ীর ছাত্‌টা আছে শুনতেম কিন্তু চোখে দেখতেম না—শুধু এক টুনটুনির রূপকথার মধ্যে দিয়ে পেতেম ছাত্‌টা! কোণের ঘর থেকে ছাড়া পেয়েছি তখন—উত্তরের পঁচিশ ফুট লম্বা একটা ফালি ঘরে; সেই ঘরের এক কোণে বসে রূপকথা বলে একটা দাসী—দাসীটার চেয়ে তার রূপকথাটা বেশি মনে পড়ে! এই দাসীটা ছিল আমার ছোট বোনের—সে বলে তার দাসীটার নাম ছিল মঞ্জরী—আর দোয়ারী চাকর এই কবিত্বপূর্ণ মঞ্জরী নামটির নাকের ডগাটা বঁটির ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছিল তাও বলে সে! আমি দেখি মঞ্জরীকে—শুধু একটা গড়া-পরা নাকভাঙ্গা নাম সে বসে আছে—একটা লাল চামড়ার তোরঙ্গ ঠেস্ দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে—তোরঙ্গটার সকল গায়ে পিতলের পেরেক মালার মতো করে আঁটা—মঞ্জরী ঝিমোচ্ছে আর কথা বলছে—"একছিল টুনটুনি—সে নিমগাছে না থেকে রাজবাড়ীর ছাতের আল্‌সেতে থাকে আর রাজপুত্তুরের তোষক থেকে তুলো চুরি ক'রে ক'রে 'ছোট্ট একটি বাসা বাঁধে!" ছাতে ওঠবার সিঁড়ি ব'লে একটা কিছু নেই তখনো আমার কাছে, অথচ টুনটুনির বাসার কাছটায়—একেবারে নীল আকাশের গায়ে—ছাতের কার্ণিশে উঠে গিয়ে বসি পা ঝুলিয়ে। এমনি, দিনের বেলায় রূপকথার সিঁড়ি ধরে পাখীর সঙ্গে পেতেম ছাতের উপরের দিকটা, আবার রোজই নিশুতি রাতে মাথার উপরে পেতেম শুনতে হুটোপাটি করছে ছাতটা—ভাঁটা গড়গড় গড়াচ্ছে, দুম্‌দুম্ লাফাচ্ছে! ছাতটা তখন ঠেক্‌তো ঠিক একটা অন্ধকার মহারণ্য ব'লে—যেখানে সন্ধ্যেকালে গাছে গাছে ভোঁদড় করে লাফালাফি, আর আকাশ থেকে যুঁইফুল টিকিতে বেঁধে ব্রহ্মদৈত্য থাকে এছাত ওছাতে পা মেলে দাঁড়িয়ে ধ্যান ধরে। এমনি ক'রে গল্প কথা ছড়ার মধ্যে দিয়ে কত কী দেখে চলেছি তখন।

---

* লেখকের রচিত "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামক যে-পুস্তক ছাপা হইতেছে, এই প্রবন্ধ তাহারি একটি অধ্যায়।

যখন চোখও চলে না বেশীদূর, পাও হাঁটে না অনেকখানি, তখন কান ছিল সহায়, সে এনে পৌঁছে দিতো কাছে ছাতু, হাতে দিতো এনে কমলা ফুলের টিয়ে পাখী, চড়িয়ে দিতো আগ্‌ডুম্ ঘোড়ায়, লাট সাহেবের পাল্কীতে এবং নিয়ে যেতো মাসিপিসির বনের ধারে ঘরটাতে আর মামার বাড়ীর দুয়োরেও।

মায়ের অনেকগুলো দাসী ছিল —সৌরভী, মঞ্জরী, কামিনী—কত কী তাদের নাম? অনেক দিন অন্তর দেশে যেতো এরা সব গাঁয়ের মেয়ে, অনেক দিন পরে ফিরতো আবার—কখন বা এরা দল বেঁধে যেতো গঙ্গা নাইতে পার্ব্বণে আর নিয়ে আসতো দু'চারটে ক'রে খেলনা—পীরের ঘোড়া, সবুজ টিয়ে, কাঠের পাল্কি, মাটির জগন্নাথ, সোনার ময়ূর, আতা গাছে তোতা, ঢেঁকি বঁটি এমনি নানা রূপকথার দেশের, ছড়ার দেশের পশুপক্ষী ফুলফল তৈজসপত্র! সবাইকে পেতেম চোখের কাছেই কিন্তু মাসিপিসির ঘর আর মামার বাড়ী—দেখা দিয়েও দিতো না, বাড়ীর ছাতের মতোই অজ্ঞাতবাসেই ছিল! মঞ্জরী দাসী এক একদিন খেয়াল মতো খোলা জানলার ধারে তুলে ধরতো আর বলতো ঐ দেখ্ মামার বাড়ী, বাড়ীর সন্ধানে উত্তর আকাশ হাতড়াতো চোখ কিন্তু দেখতো না একখানিও ইট, শুধু পড়তো চোখে তখন আমাদের বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে মস্ত তেঁতুল গাছটার শিয়রে মন্দিরের চূড়োর মতো সাদা সাদা মেঘ স্থির হ'য়ে আছে! এই টুকু দেখিয়েই দাসী নামিয়ে দিতো কোল থেকে খড়খড়ির তলায় মেঝেতে, তারপর সে দরজা জানালা বন্ধ দিয়ে রান্নাবাড়ীতে ভাত খেতে যেতো—একটা ঝক্‌ঝকে বগীথালা সিন্দুকের পাশ থেকে তুলে নিয়ে!

সেই দুপুরবেলায় প্রায় রাতেরই মতো চুপচাপ আর অন্ধকার থাকতো ঘরখানা, দিনে দুপুরে সবুজ খড়খড়িগুলো সোনালি দাঁড়ি টানা একটা একটা ডুরে কাপড়ের পর্দার মতো ঝুলতো চৌকাঠ থেকে —কাঠের তৈরী বলে মনেই হতোনা জানালাগুলো—বাইরের খানিক আঁচ পাওয়া যেতো খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে, সুতোর সঞ্চারে পৌঁছতো এসে ঘরে আকাশের দিক থেকে চিলের ডাক, বাতাসেরও ডাক খুব মিহি সুর দিয়ে কানে এসে পৌঁছতো, এই বাতাসের ছন্দ, সুর ধ'রে যেটা আসতো, সে যেন বহুদূরের ধুলো উড়ানোঝড়ের একটা আবছায়া মনে পড়াতো—একটা দুটো কোমল টান প্রথমে, তারপর খানিক চড়া সুর, তারপর বেশ একটা ফাঁক, তার ঠিক পরেই এক টানা তীব্র সুর। কবি হলে তখন লিখে ফেলতেম একটা গান এই বাতাসিয়া ছন্দে, কিন্তু তখনো এখনো আমি দেখি ছবিই—বাতাস রোদ আর ধুলোর! গোটা দুই ঝিম্ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নেই যখন তিন তলায়, সেই সময়ে সেই নিঃসাড়াতে চোখ দুটো দেখতে বার হতো—যেন রাতের শিকারী জন্তু, খুঁজতো এটা ওটা সেটা, এদিক ওদিক সেদিক, সন্ধানে চলতো সেদিনের আমিও—তক্তার নীচে, সিঁড়ির কোণে, সার্সির ফাঁকে, আয়নার উল্টো পিঠে এবং চৌকি বেয়ে আলমারীর চালে নানা জিনিস আবিষ্কার করবার ঝোঁকে, ছাতের উপরের কথা ভুলেই যাই, তখন ঘর ঘর দেখতেই মসগুল থাকে মন! এক ছোট ছেলে মেয়েদের ছাড়া—এই সময়টাতে খানিকক্ষণের মতো বড়দের কাউকে পেতো না তিনতলার

ঘরগুলো, কাজেই এ সময়ে আমাদের সঙ্গে যেন ছাড়া পেয়ে ঘরের জিনিসগুলোও হঠাৎ বেঁচে উঠতো এবং বার হতো দিন দুপুরের অন্ধকারে খেলার চেষ্টায়—এটা ভাবে জানাতো।

সারা তিন তলার ছবি, সিঁড়ি, তক্তা, আলমারী, ফুলদানি, মায় মেঝেতে পাতা মস্ত জাজিম এবং কড়িতে ঝোলানো পাখাগুলোর সঙ্গে এমনি ক'রে দুপুরে ঘর ঘর ফিরে আর উঁকি দিয়ে, এদের কতদিনে পেয়েছিলেম পুরোপুরিভাবে তা বলা যায় না। একটা দোলনা-খাট—ছোট্ট, সেটা খাট থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ কবে একদিন জাহাজ হয়ে উঠলো এবং দুলে দুলে আমাদের নিয়ে সমুদ্রে চলাচল সুরু করলে; মস্ত জাজিম বিছানার হঠাৎ আমাদের ছোট হাতের তাড়ায় যেন ফুলে ফুলে উঠলো ক্ষীর সাগরে ঢেউ তুলে! তক্তার উপরটার চেয়ে তক্তার নীচেটা কবে যে আপনাকে ভারি নিরিবিলি আরামের জায়গা বলে জানিয়েছিল—কোন তারিখে কোন বছরে কখন—তাকি মনে থাকে? জানিনে ভুলে গেছি—এই উত্তর হ'ল তারিখের বেলায়, কিন্তু জিনিষের বেলাতে একেবারে তা নয়—এখনো পঞ্চাশ বৎসর আগেকার ঘরে ঘরে কোথায় কি তা স্পষ্ট দেখ্‌ছি আমি, জিনিষগুলোকে একটুও ভুলিনি, কিন্তু আশ্চর্য্য এই মানুষদের মধ্যে অনেকের চেহারাই লোপ পেয়ে গেছে এই তিন তলা থেকে, যেটার কথা আজ বল্‌ছি! কাঠের বেড়া দেওয়া দোলনা-খাট—জাহাজ জাহাজ খেলে যে কোণে বসে আমাদের সঙ্গে—সেখান থেকে দেখা যায় উত্তরে সরু এক ফালি দেওয়ালে ঝোলান একটা ছোট্ট আলমারি—ওষুধ থাকে তার মধ্যে—এই আলমারীর চালে বসানো রয়েছে দেখি হলদে মাটির নাড়ুগোপাল, সে হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে—ডান হাতের মস্ত নাড়ুটা এগিয়ে দিয়েই আছে আমার দিকে! এই গোপাল ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোগা-পানা সরু গলার একটা নীল কাচের বোতল—রাঙ্গা হলুদ কালো সাদা রংএর টিকিট আঁটা সেটার গায়ে! নাড়ু দিয়ে লোভ দেখাতো মাটির হলেও নাড়ুগোপালটি, আর বিস্বাদ তেলের দু তিন চামচ নিয়ে বসে থাকতো নীল কাচের বোতলটা—রঙ্গীন টিকিট দিয়ে ভোলাতে চাইতো কিন্তু পারতো না। আর একটা জিনিষকে দেখতে পাই—আনারপুরের জালি কাপড় মোড়া একটা মস্ত ঢাকন্—ছোট বোন যখন ছোট্ট ছিল সে এই ঢাকনে পাখির মতো ঘুমের সময় চাপা পড়তো! আমার সময় ঢাকনটার কাজ গেছে, খালি ঢাকনটা তখনো কিন্তু ঘরের পশ্চিম ধারে মস্ত একটা আলমারির চালে, চড়ায় বেধে যাওয়া উল্টোনো নৌকোর ছৈখানার মতো কাত হয়ে আছে। ঘরের দক্ষিণ গায়ে দেখতে পাই তিনটে মোটা মোটা পলতোলা থাম অন্ধকারের পর্দ্দার উপরে, মাঝের থামটা থেকে একগাছা মশারির দড়ি ঝুলছে, তার গায়ে সারি সারি মাছি বসে গেছে—কালো কালো ফুলের কুঁড়ির মতো—নড়েনা চড়েনা! আমাদের ঘরের পশ্চিম গায়ে আর একটা কেম্বিসের বেড়া ঘেরা ঘর চমৎকার করে সাজানো—ময়ের বসবার ঘর সেটা—সেখানের প্রত্যেক জিনিষটিকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট স্পষ্ট—যেখানকার যা ধরা রয়েছে সব ঠিকঠাক আজও! মনের মধ্যে রয়েছে এই ঘরটার পূব দিকের দরজার কাছে—একেবারে কাচের মতো পিছল, কালো বার্ণিস মাখানো বাদামি টেবিল, একটা পায়ে

দাঁড়িয়ে, টেবেলে কিনারায় সোনালি পাড়, ঠিক মাঝে একটা পাহাড় আর সরোবরের ছবি লেখা—এই টেবেলটার নীচে একটা কেমনতরো কল ছিল—সেটাতে জোরে টান দিলেই টেবেলের উপরটা কাত্ হয়ে মাটিতে ফেলে দিতো—বই কাগজ সেলায়ের বাক্স উল্ বোনার কাটি ইত্যাদি টুকিটাকি! এই টেবেলটার সামনে থাকে—হল্‌দে কাঠের ছোট্ট একখানা চৌকি ফুলকাটা কার্পেট্ মোড়া—ঠেলা দিলে সেটা হঠাৎ ভাঁজ হয়ে হাত পা গুড়িয়ে চেপ্টা হয়ে পড়ে যায় মাটিতে! এই ঘরে থাকে কাঠির মতো সরু সরু পা এক জোড়া ইটালিয়ান্ কুকুর—কাচের পুতুলের মতো ছোট্ট—কুকুর দুটো পাঁউরুটি বিস্কুট মুরগীর ডিম খায়, আমার জন্যে পড়ে থাকে কৌচের নীচে খালি ডিমের খোলাটা এবং লুকিয়ে সেটা চিবিয়ে খেয়ে ধরা পড়ে যাই—হঠাৎ পিঠে পড়ে বেত, নীলমাধব ডাক্তার বাবু এসে পরীক্ষা করেন আমাকে হাইড্রোফোবিয়া ধরবে কি না, মা পিসি দাসী সবাই ছি ছি করতে থাকে, বাবা মশায় হুকুম দেন আমাকে নংলু মেথরের কাছে পাঠিয়ে দিতে—মেথরের সঙ্গে থাকতে হবে শুনে ভয়ে ঘৃণায় লজ্জায় কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমি, শেষে দেওয়ালের দিকে এক ঘণ্টা মুখ ফিরিয়ে থাকার শাস্তিটা বাবা মশায় দিয়ে চলে যান অন্য ঘরে, তখন কুকুর দুটোকে একদিন কি করে মেরে ফেলা যায় তারি ফন্দি আঁটি মেঝেতে পাতা মস্ত গাল্‌চের দিকে চেয়ে। এই গাল্‌চেখানাকে মনে পড়ে—বড় বড় সবুজ পাতা আর সাদা ধুঁতরো ফুল দিয়ে কালো জমির উপরে বোনা! কটা কৌচ নীল আর সাদা ছিট মোড়া আছে এখানে ওখানে ভাঁকা বাঁকা করে সাজানো। দুটো কৌচ চন্দ্রপুলির গড়ন, আর একটা দেখতে যেন তিনটে বেং একসঙ্গে পিঠে পিঠে জোড়া কিন্তু ঝগড়া করে তিন দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে! ডবল-ব্রাকেটের মতো করে কাটা, গোলাপি রংএর ছোপ ধরানো, মার্বেল পাথরের একটা টেবেল এক কোণে, তার উপরে পাথরে কাটা দুটি পায়রা—ফল খেতে নেমেছে, সত্যিকার পাখির মতো আর আপেলের মতো রং দেখে লোভ জাগে মনে। ঘরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বড় হল্‌টাতে উঠে চলবার পাঁচ ধাপ সিঁড়ি, এইখানে দেওয়ালের অনেক উপরে একটা ব্রাকেটে তোলা আছেন—চৌকো কাচের ঢাকনা দেওয়া—গড়া লক্ষ্মী আর সরস্বতী—ছোট্ট ছোট্ট, আসল মানুষের মতো রং করা কাপড় পরানো! দেশী কুমোরের হাতে গড়া এই খেলনা দেবতার কাছেই—দরজার উপরে খাটানো চওড়া গিল্টির ফ্রেম বাঁধানো তেল রং করা বিলিতি একটা মেয়ের ছবি, চোখ তার কালো, চুল কটা নয় একটুও, মাথায় একটা রাঙ্গা কান-ঢাকা টুপি, খয়েরী মখমলের জামা হাতকাটা, সাদা ঘাঘরা পরণে, সে বাঁ হাতে একটা ঝুড়ি নিয়েছে, রুমাল ঢাকা চুবড়ির মধ্যে থেকে একটা যেন সত্যিকার মদের বোতল গলা বার করেছে, ডান হাত রেখেছে মেয়েটা ঠিক যেন সত্যিকার মস্ত একটা কুকুরের পিঠে, কুকুর চেয়ে আছে ঝুড়ির দিকে, মেয়েটা চেয়ে আছে কুকুরের দিকে—একেবারে জলজীয়ন্ত মানুষ আর কুকুর আর মখমল আর ঝুড়ি আর ব্রাণ্ডির বোতল অথচ কিছুতেই মনে হতো তা সেটা ছবি নয়!

মায়ের এই বসবার ঘরের পাশেই বাবামশায়ের শোবার ঘরটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে

তখন—মস্ত একটা চাবি দিয়ে সে ঘরের দরজাটা বন্ধই রয়েছে,—শুনতে পাই সেখানে সাহেব মিস্ত্রী লাল সাদা হলদে কালো নতুন রকমের বিলিতি টালি কেটে কেটে বসাচ্ছে মেঝেতে, ঠুক্ ঠাক্ খিট্ খাট্ ছেনির শব্দ হচ্ছেই সেখানে সারাদিন! ঘরটা যেদিন খুলো দুয়োর সেদিন দেখি—সেখানে সব কটা জানলা দরজার মাথায় মাথায় সোনার হলকরা কাণিস্ বসে গেছে, সেগুলো থেকে ফুলকাটা ফিন্‌ফিনে পর্দ্দা জোড়া জোড়া ঝুলছে—সবুজ আর সোনালী রেশমে পাকানো মোটা দড়ার ফাঁসে লট্‌কানো; ঘরজোড়া পালঙ্ক—আয়নার মতো বার্ণিশ করা! ঘরটার পশ্চিমমুখো জানলাটা খুলে তার ওধারটাতে বানিয়েছে অক্ষয় সাহা ইঞ্জিনিয়ার বাবু একটা গাছ ঘর—কাঠ আর টিন আর ঘসা কাচের সার্সি দিয়ে. সেখানে দেওয়ালগুলো আগাগোড়া গাছের ছালের টুকরো দিয়ে মুড়ে ভাগবত মালি লট্‌কে দিয়েছে তারি উপর সব বিলিতি দামি পরগাছা—কোনোটা সাপের ফণার মতো বাঁকা, কোনোটার লম্বা পাতা দুটো সাপের খোলোসের মতো ছিট্ দেওয়া ডোরা কাটা, কিন্তু এর একটা পরগাছাতেও ফুল ফল কিছুই নেই, কোনোটাতে বা পাতাও নেই কেবল সোঁটা আর ডাঁটা! এই গাছ ঘরের মাঝে একটা তিন কুঠোর দালানের মতো খাঁচা—তারের টেবেলে—তাতে হলুদ রংএর কয়জোড়া কেনেরী পাখি ধরা থাকে: শোবার ঘরটা তখনো নিজের সাজ সম্পূর্ণ করেনি ফুলদানি ইত্যাদি দিয়ে—শুধু সরু শ্বেত পাথরের তাকের সঙ্গে আঁটা গোল চুল বাঁধার আয়নাখানা মায়ের একটা দিকে রয়েছে দেখি—এই আয়নাখানিকে ঘিরে মিহি গিল্টির পাড়, সবুজ আর সাদা মিনাকারি দিয়ে নক্সা করা, যুঁই ফুল আর কচিপাতার এক গাছি সোনার গোড়ে মালা ঘেরা আয়নাখানির সামনে—স্ফটিকে কাটা চৌকোনা একটি ফুলদানির মাঝখানে সোনার বোঁটাতে আট্‌কানো, যেন বরফ-কুচি দিয়ে গড়া-ভুঁইচাঁপা একটি—সোনার ডাঁটি তাকে নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে, জলের মতো পরিষ্কার আয়নার দিকে চেয়ে—ফুল দেখছে ফুলের একখানি স্থির ছায়া!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রজাপতির দৌত্য

(৪)

বিনোদিনী কমলিনীকে পত্র না দিয়া থাকিতে পারিল না।

পিতৃ-গৃহে গিয়া দিনকতক কাটাইয়া আসিবার ইচ্ছা যে তাহার কত প্রবল, তাহা সে প্রতি পত্রেই লিখিত; কিন্তু কমলিনী ব্রজকিশোরের কাছে তাহা প্রকাশ করিতে সাহস পাইত না। জানিত, পিতার সে বিষয়ে কত বড় ইচ্ছা; কিন্তু উপায় ছিল না বলিয়া তাঁহার দুঃখও ছিল সমধিক। এই কথা বলিয়া বার বার তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেও তাহার মন চাহিত না।

ব্রজকিশোর বিপত্নীক হইবার পর দুইকন্যা এবং নন্দকে লইয়া একদিন অতি দুঃখেই দিন যাপন করিয়াছেন। তাহার পর এক এক করিয়া কন্যা দুইটি শ্বশুর গৃহে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় সংসারের কথা সেদিনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। বিবাহের দুই বৎসর যাইতে না যাইতে কমলিনী ফিরিল; তাহার কপাল পুড়িয়াছিল। বিনোদিনী তখন ঘন ঘন আসা-যাওয়া করিত। কুসুমপুরে না থাকিলেও চলে না, আবার ভবানীপুরের সংসারও তাহারই হাতে। হঠাৎ এই সুখে বিধাতা বাদ সাধিলেন। সমাজের ভয়ে বিনোদিনীর পিতৃ-গৃহে আসা বন্ধ হইল।

বিনোদিনী জানিত ব্রজকিশোর জোর করিলে কাহারো এমন সাহস ছিল না যে কথা কহে। কিন্তু জোর তিনি কোনদিন করিলেন না; এই খানেই তাহার যত-কিছু দুঃখ, যত-কিছু অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। বেশী কথা কহেন না, অনেক কিছু বলিলে, নিজের কপাল দেখাইয়া দিতেন, চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরিয়া পড়িত।

কিন্তু তিনি সবচেয়ে বিচলিত হইলেন সেই দিন, যেদিন নন্দ চলিয়া গেল কলিকাতায়, পড়া শুনা করিতে। কমলিনীর শোক-ভার হৃদয়ের নিঃসঙ্গ অবসরে ব্রজকিশোর তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহাদরে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সকালে কমলিনী তাঁহার পূজার ফুল চয়ন করিয়া পরিপাটি করিয়া পূজার সাজ করিয়া দিত; তাহার পর, সে কিছুক্ষণ রন্ধনশালায় অতিবাহিত করিত। সেই অবসরে ব্রজকিশোর জমিদারির কাজ-কর্ম্ম সারিয়া—স্নানাহার সমাধা করিতেন। আহারের পর দুইজনে মিলিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ চলিত। কমলিনী পড়িত, ঠেকিলে তিনি বুঝাইয়া দিতেন।

বিনোদিনী পত্র শেষ করিয়া পুনশ্চের মধ্যে নন্দর বিবাহের কথা লিখিয়াছিল:—যতদূর বুঝলুম, নন্দর বে' করার ইচ্ছে হয়েছে; আর মনে হয়, হয়তো শুভিকে পেলে সে সুখী হবে। বাবাকে অবসর মত এ কথা বলিস্। শুভি কি তোর খুব ভাল সঙ্গী হবে না, কমল?

চিঠি খানি পিতাকে দেখাইবার বড় ইচ্ছা তাহার মনে হইয়াছিল;—তাই মহাভারতের মধ্যে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়া দিল; যাহাতে বই খুলিতেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে।

ব্রজকিশোর জানিতেন বিনোদিনীর পত্র আসিয়াছে ; কিন্তু তাহার উল্লেখ করিতে তাঁহার ভয়-ভয় করিত ; কারণ বিনোদিনীর ইচ্ছা পূরণ করা মোটেই সহজ ছিল না।

সেদিন মহাভারত পাঠ করিবার পূর্ব্বে, কমলিনী চিঠিখানি বাহির করিয়া মনে-মনে পড়িতে লাগিল। পত্র শেষ করিয়া তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল দেখিয়া তিনি কেমন যেন অতর্কিতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, কি লিখেছে, দিদি ?

কমলিনী বুদ্ধি করিয়া প্রথমাংশের উল্লেখ না করিয়া এক নিশ্বাসে নন্দর বিবাহের প্রসঙ্গে আসিয়া উপনীত হইল. সে বলিল, ভাইফোঁটায় নন্দরা দিদির বাড়ী গেছ্‌লো।

এই সংবাদে ব্রজকিশোর প্রসন্ন হইয়া হাসিয়া বলিলেন, তারপর ? কমলিনী বলিল, দিদি নন্দর বের কথা লিখেছে।

বটে !—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়ে দেখেছে নাকি ?

শুভির কথা বলিতে তাহার কিন্তু সাহস হইল না, সে কেমন চুপ করিয়া রহিল।

ব্রজকিশোর বলিলেন, বেশতো তাকে মেয়ে দেখ্‌তে ব'লে দাও না ; তার পছন্দ হ'লে,—আমরা গিয়ে দেখে আস্‌বো।

কমলিনী এই কথায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল !

কমলিনীর আনন্দে ব্রজকিশোর একটু সুখ বোধ করিলেন বটে ; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনটি অবসাদ-ভারাক্রান্ত হইল। তিনি বুঝিলেন যে কিরূপ ব্যাকুলতার সহিত কমলিনী একজন সঙ্গিনীর কামনা করে। এই কথা তাহার এতদিন মনে আসে নাই। নিজের আশ্চর্য্য ঔদাসীন্যের জন্য লজ্জিত বোধ করিলেন। তিনি মনে করিলে এই অভাবের আশু পূরণ হইতে পারিত এবং এই উদ্দেশ্যে কমলিনী প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা কমল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; তুমি মাঝে মাঝে পাড়ার মেয়েদের কেন ডাক না ?

সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। একটা কিছু উত্তর দিতে তাহার যেন লজ্জা করে।

ব্রজকিশোর কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। কমলিনী অনেকখানি সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল, শুভিকে কাল ডাকবো, বাবা ?

বেশতো ডাক না—তাতে আমার কি আপত্তি আছে ?

হঠাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, দিদিও তাই লিখেছে।

এই কথা শুনিয়াই ব্রজকিশোরের কাছে ব্যাপারটা যেন অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল, একটু হাসিয়া বলিলেন, তা হয় না রে পাগ্‌লি। ওরা ভারি কুলীন, আর সনাতন দাদার কুল নিয়ে একটা বাই আছে।

কমলিনী নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, কিন্তু তার মত সুন্দর মেয়ে—আমাদের গ্রামে নেই, বাবা !

তাতো আমি জানি ; কিন্তু একেবারে অসম্ভব।

মুখে এই কথা বলিলেও ব্রজকিশোরের মনে একটা সংকল্পের আভাস যেন ধীরে ধীরে স্থান পাইতে লাগিল। মনের অজ্ঞাতসারে এমনি করিয়া কত বাসনা, কত ইচ্ছা জন্ম লাভ করিয়া গোপনে উঠিয়া একদিন তাহাদের দাবি ঘোষণা করিয়া বসে! সে দিন আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কমলিনী মহাভারতের কতকাংশ পাঠ করিল বটে, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল ব্রজকিশোরের মন তাহাতে নাই। গুড়গুড়ির নলটা মুখে আছে, অভ্যাসবশতঃ দু-এক টানও দিতেছেন, কিন্তু তাহাতে ধোঁয়া বাহির হয় না! কমলিনী বুঝিল পিতা কেন এত অন্যমন হইয়া আছেন।

সে জানিত যে এই স্তব্ধ প্রকৃতির লোকটি কোন কাজেই অধীরতার সহিত করিতে অগ্রসর হন না ; কিন্তু যদি কোনক্রমে একবার কোন বিষয়ে তাঁহার মন ধাবিত হয় ত'—তাহার গতিরোধ করাও একান্ত কঠিন।

অপরদিকে সনাতন জেঠার বংশ-মর্য্যাদার কাহিনী কাহার না অবিদিত ছিল? দুই বীর-সিংহের ভেদ জাগ্রত হইলে ফলে যে কলহ-বহ্নির সৃষ্টি হইবে—তাহার কথা মনে করিয়া কমলিনীর মনটা হঠাৎ ভারি হইয়া উঠিল। নন্দকিশোরের বন্ধু-প্রেমের কথা সে জানিত, যদি দুই পরিবারের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মলাভ করে তো, নন্দ যে কতখানি আহত হইবে, এই অবিবেচনার ফলে যে সে তাহাদের উপর কতখানি রাগ করিবে,—তাহা অনুমান করিয়া মনে মনে কমলিনী ভয় পাইতে লাগিল। কিন্তু সে পিতাকে আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

অস্বস্তির সহিত পুকুর হইতে গা ধুইয়া আসিয়া কমলিনী দেখিল পিতা তেমনি অচল হইয়া পড়িয়া তামাক খাইবার যেন অভিনয় করিতেছেন। সে কাছে গিয়া বলিল, বাবা বেলা যে গেল!

উত্তরে ব্রজকিশোর বলিলেন, হুঁ তাতো দেখ্‌ছি কমল, কিন্তু আমার যে উঠ্‌তে ইচ্ছে হয় না। শরীরটা ভাল নেই মা। আজ রাতে কিছু খাবো না আর।

কমলিনী মনে মনে প্রমাদ গণিল। সে অন্য ঘরে গিয়া জানালার উপরে একান্ত অবসন্ন মনে বসিয়া পড়িয়া বলিল, যা, ভয় করেছি—শেষকালে তাই, বুদ্ধির দোষে আমরা বুঝি ঘটিয়ে ফললুম!

একটা দমকা বাতাস তাহার উপর ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িয়া যেন তাহাকে রীতিমত কাঁপাইয়া দিয়া গেল। কমলিনী তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া—তুলসী তলায় হরির চরণতলে তাহা নিবেদন করিয়া বলিল, ঠাকুর, তুমি বাবার মনটিকে শান্ত করে দাও। বাতাসে প্রদীপ-শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিভিয়া গেল। কমলিনী আবার তাহাকে জ্বালিবার জন্য ত্রস্তপদে ঘরের মধ্যে ছুটিল।

(৫)

কিছুদিনের জন্য কলিকাতার কুসুমপুর-কলেজে চাবি পড়িল। পৌষের শেষের দিকে দুই বন্ধুরই কলেজের লেক্‌চার বন্ধ হইয়া গেল ; এখন কঠিন পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আর কলিকাতায় থাকায় লাভ নাই। অতএব রামকিঙ্কর অধীর হইয়া উঠিল। নন্দ দুই হাত জোড় করিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, যাবো ভাই যাবো, এই দু-চারদিন একটু অপেক্ষা কর, এইতো কল্‌কেতার মরসুম্।

রাম রাগ-রাগ মুখে বলিল, বড়লাটের বাড়ি ডিনার পাটিতে নিমন্ত্রণ আছে নাকি ? বল্ নাচ্‌বি ?

নন্দ তখনো অনুনয়ের মোলায়েম কণ্ঠে বলিল, বেশী না, তিনদিন, একদিন সার্কাস, একদিন থিয়াটার—আর একদিন বায়স্কোপ—বাস্, তারপর সটান্ চল্‌তি, বুঝেচিস্ কিনা ?

রামকিঙ্কর আঙ্গুল গণিয়া বলিল, কাল রবি, পরশু সোম, তারপর মঙ্গল, বুধবারে কিন্তু নড়চড় নেই ব'লে দিচ্চি।

নন্দ বলিল, একেবারে নিশ্চয়, এক তিল এদিক ওদিক নয়। যদি কথা না রাখিতো—তুই যা খুসী তাই বলিস্।

রাম বলিল, তুমি তার বড় কেয়ার কর কিনা !

ছাত্রদের অধ্যয়ন তপ, এ কথা রামকিঙ্কর সর্ব্বদা মনে রাখিবার চেষ্টা করিত। তাই বাড়ি আসিয়া নিষ্ঠার সহিত তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিল। একটি মুহূর্ত্তও সে বাজে যাইতে দিবে না। কিন্তু নন্দ দুই চার দিন আলস্যে কাটাইয়া দিয়া ভারি মনে রামের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল, ভাই আমার ত' দেখ্‌চি উল্টোই হলো, তবুও সেখেনে থাক্‌তে এক আধ ঘণ্টা পড়্‌তুম। কি করি বলত ?

বহু পরামর্শের পর ঠিক হইল দুইজনে এক সঙ্গে পড়াশুনা করিবে। নন্দকিশোর বলিল, চল্, আমাদের বাড়িতে পড়ার আড্ডা হোক্। রাম কিন্তু তাহাতে রাজি হইল না। অবশেষে রামেদের বাইরের ছোট ঘরটিতে দুইজনে পড়ার ব্যবস্থা করিল।

কয়েক দিনের মধ্যে সকলেই বুঝিল রাম এবং নন্দর পড়ার চেষ্টার মধ্যে একটা সমূহ পার্থক্য ছিল। রামের চেষ্টার সহিত নিষ্ঠা বিজড়িত ; কিন্তু নন্দ নিষ্ঠার কোন ধার ধারিত না। ভাল লাগিলে সে পড়ে, নহিলে পড়ার ঘর হইতে পলাইয়া রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়া হয়ত খানদার সহিত গল্প জুড়িয়া দেয়।

নন্দর পড়ায় অবহেলার জন্য কিন্তু কেহ কিছু মনে করিত না। সকলেই জানিত যে সে না পড়িলেও কিছুই যায় আসে না ; তাহার পড়া, বিশেষ করিয়া কি উদ্দেশ্যে কলিকাতায় থাকা,

তাহা পরিষ্কার করিয়া মুখে উচ্চারণ না করিলেও সকলেই মনে মনে জানিত এবং তাই বুঝি তাহার প্রতি এ বাড়ির সকলের এতখানি শ্রদ্ধা, এতখানি ভালবাসা।

মানদা বলিতেন, কি ছেলে এই নন্দটি আমাদের! মনটি যেন গঙ্গাজল, হাসি খুসি, কথায়-বার্ত্তায় সে যেখেনে থাকে যেন জায়গাটা আনন্দময় ক'রে তোলে; বাবা, দীর্ঘজীবি হ'য়ে বেঁচে থাক, তোমার জীবনে কোন দুঃখ হবে না।

নন্দ হাসিয়া উত্তর দিত, জেঠিমা, তুমি আমাকে খুব ভালবাস, তাই আমার সব গুণ দেখ। কিন্তু সবাই আমাকে এমন ত' মনে ক'রে না।

নন্দর এই স্বচ্ছতার ফলে একটি তরুণ সুকুমার মনের মধ্যে যে কল্প-লোকের সৃষ্টি হইতেছিল—তাহা কেহ অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। ফুলবনের পাশেই লোকচক্ষুর অগোচরে মধু-নীড়খানি গড়িয়া উঠিতে থাকে!

হঠাৎ একদিন সকালে নন্দ আসিয়া দেখিল বাড়ির সকলের মুখ যেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে; সে ইহার কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিল তাহার সাজ-সরঞ্জামের কিছু কিছু ওলট-পালট। কিন্তু রাম সে-সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া আসনে দৃঢ় বসিয়া মনকে যেন চাবুক দিয়া সোজা রাখিয়াছে।

নন্দ রামের পিঠে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিল, কিগো রামচন্দ্র, এত গম্ভীর দেখায় কেন?

রাম কথার উত্তর না দিয়া তাহার প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কিরে?

এবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাম কথা কহিল, বাবা এক হাঙ্গামা জুটিয়েছেন, শুভিকে আজ আবার কারা দেখ্‌তে আসচে।

নন্দ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, ওঃ এই! আমি মনে করলুম, না-জানি তোদের হ'লো কি!

বাহিরের ঘরের চৌকির উপর সাদা ধোয়া চাদর দেওয়া হইল। কালি-ধরা বাঁধা হুঁকো নিমেষে বক্ বক্ করিতে লাগিল। সনাতন সে দিন আর বাহিরে গেলেন না; বাড়িখানা ফিট্-ফাট্ করিয়া তুলিবার জন্য অবিশ্রান্ত খড়মের খট্ খট্ শব্দে এ-দিক ও-দিক করিতেছেন, তার মধ্যে-মধ্যে হরির ডাক পড়ে। হরির কোন দল নাই, তাই তাহাকে নিজের দলে টানিয়া লইবার যেন একটা চেষ্টা। মানদা এবং রামের যোগ তিনি কল্পনা দিয়া একেবারে ধ্রুব করিয়া জানিয়াছিলেন; তা ছাড়া রামের যে পরীক্ষা—আর এতো যে-সে পরীক্ষা নয়; বি এ! ইহা পাস করিলে তবে ত মানুষের গো-জন্ম উদ্ধার হয়।

চণ্ডীতলার জমিদার শ্রীমান্ ভবশঙ্কর গাঙ্গুলী সর্ব্ব-গুণান্বিত পাত্র; কুল, মান, টাকা কড়ি কিছুরই তাঁর অভাব নেই; এই কথা বলিয়া ঘটক মশাই সেদিনের বৈঠক জমাইয়া বসিলেন।

বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া এই ভাবের অজস্র কথা-বার্ত্তা ; ঘরের মধ্যে নন্দ এবং রাম উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। সনাতন কাছে বসিয়া হাঁ হাঁ করিয়া সায় দিতেছেন।

বাড়ীর মধ্যে মানদা স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে ভাবী জামাতা বাবাজির জন্য রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত ! পুকুর হইতে একটা বড় গোছের মাছ ধরান হইয়াছে। উদ্যোগের কোন ত্রুটি সনাতন হইতে দেন নাই। আহারের জুৎসই ব্যবস্থার সংবাদ রন্ধনের গন্ধে ঘটক মশাই অবগত হইয়া—সনাতনের প্রশংসাবাদের দিকটাও ছাড়িয়া কথা কহিলেন না ; হাজার হোক পাটুলির চাটুর্য্যেদের মেয়ে পাকা গৃহিণী, গৃহধর্ম্মে যেন স্বয়ং ভগবতী ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন ! পাত্রী লক্ষ্মীর মত অশেষ লাবণ্য-সম্পন্না। ঘটক মশাই চক্ষের সম্মুখে দেখিতে.পাইতেছে যে, এবার আর শুভকর্ম্মে কোন বাধা নাই।

অবশেষে সনাতন অধীর হইয়া বলিলেন, কিন্তু কৈ পাত্রের যে দেখা নেই ? ঘটক মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, শাস্ত্রে বলে, বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি।

যখন ঘটকঠাকুরের ক্ষুধার উদ্রেক হইল তখন তিনি হঠাৎ সুর বদল করিয়া বলিলেন, তা হলে দেখ্‌ছি এ বেলা আর আসা হলো না। জমিদার মানুষ, কাজেই একটু আয়েসি কিনা ; তা ছাড়া কাজ কর্ম্ম লোকজন, ফুরসৎ ত' একটুও নেই !

সনাতনের ইহা ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন, তবুও, কথা দিয়ে, কথা রাখা উচিত ছিল। লোকের সঙ্গে ভদ্রতা না রাখলে চ'লে কেমন ক'রে ?

ঘটক একটু নরম হইলেন, তা ঠিক বটে, নিজে না আস্‌তে পারলে একটা সংবাদ দেওয়াও উচিত ছিল।

মধ্যাহ্নে নন্দ বাড়ি গেল না। বোধকরি অদৃষ্টের অনুগ্রহে ভবশঙ্করের অংশের মাছের মুড়াটি তাহার ভাগ্যেই জুটিল।

খাওয়া দাওয়ার পর ঘটকঠাকুর বলিলেন, ও-বেলা নিশ্চয়ই তাঁরা আস্‌বেন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

সনাতন বলিলেন, আচ্ছা এলে দেখা যাবে সে।

অপরাহ্নে চুলে কলপ দিয়া নব-কার্ত্তিকের বেশে চণ্ডীতলার জমিদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; সঙ্গে তাঁহার পরম প্রিয় ভাগ্নে সনৎকুমার। ভাগ্নে বাবাজির হাল ফেশনের কিছুই অজ্ঞাত ছিল না ; তাই তাহার পছন্দের উপর ভবশঙ্করের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

পাত্রী পরীক্ষণের পূর্ব্বে ভবশঙ্কর নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির কিছু পরিচয় দিবার মানসে ঘটকঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন, শুনেছেন বিলেতে নৌকার চাকা করে জলের উপর দিয়ে রেলগাড়ীর মত চালাচ্ছে ?

ঘটকঠাকুর বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মাথা নাড়িয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন, আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কি জানবো বলুন, বাবু ; এই আপনাদের মত লোকের দর্শন পেলে দু-কথা শুনে ধন্য হই।

এই কথা শুনিয়া ভবশঙ্কর আনন্দে শিশু-হস্তীর মত মৃদু মৃদু মাথা দোলাইতে লাগিলেন।

সনৎকুমার তাগিদ দিয়া বলিলেন, তবে আর দেরি কিসের ? বেলা যে বয়ে যায় ; দিন থাকতে থাকতেই হয়ে গেলেই ত ভাল ?

মাতুলের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল, বলিলেন, ঠিক, ঐ যে লিখে গেছে, শুভস্য শীঘ্রং।

ভবশঙ্করকে বড় বেশী অপেক্ষা করিতে হইল না। শুভদা বড় হইয়াছিল, তাহার শান্ত সুন্দর রূপ-যৌবনের ছবিখানি দেখিয়া জমিদারের চিত্ত অধৈর্য্যে বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখে এমন সকল ভাব প্রকট হইল যাহা উপস্থিত অন্য সকলের কিছুতেই ভাল লাগিতে পারে না।

জমিদার এবং তাঁহার সহযাত্রী ভাগ্নে, ঘটক ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, পাত্রী তাঁহাদের পছন্দ হইয়াছে এবং তাঁহারা অন্য আর একদিন আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবার প্রয়োজন দেখেন না, সেই দিনই সেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে চাহেন। অতএব পিতাকে প্রস্তুত হইতে বলা হউক।

ঘটক এই কথা বলিলে সনাতন উত্তরে বাড়ীর কি মত জানিতে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীর মধ্যে মানদা মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়াছিলেন। সনাতন সেদিকে যাইতে তিনি রাগ করিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

সনাতন একটু ভয়ে ভয়ে ডাকিলেন, ওগো শুনচো, দেখো···এই গিয়ে···সনাতনের আর কথা বাহির হইল না মানদার মুখ দেখিয়া, কাঁদিয়া দুই চক্ষু তাঁহার জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছিল।

সনাতন বলিলেন, ইস্ চোখ যে বড় লাল দেখায়, কেঁদেছ বুঝি ?

মানদা গম্ভীরভাবে বলিলেন, কাঁদবো না তো, হাস্‌বো নাকি···কি পাত্তরের ছিরি ! তোমার চেয়ে বয়েসে বড় হবে, ছোট ত' নয়ই।

সনাতন বলিলেন, আরে চুপ্ চুপ, বাইরে যে শোনা যাবে। কৈ আমি তো কিছু ঠাহর করতে পারলাম না।

মানদা রাগ করিয়া বলিলেন, তা পারবে কেন ? তা নইলে আমাদের কপাল পুড়্‌বে কেন ? ঐ বুড়োর চুলে কলপ দেওয়া, দাঁতের পাটি যে বাঁধানো, তাও কি ছাই চখে ঠেকে না ?

তাই নাকি ? বলিয়া সনাতন যেন অনেকখানি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাইতো, কি যে করি—বলিয়া এমন একটা অপদস্ত-বিভ্রান্ত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন যে মানদার মনে দুঃখ হইল।

মানদা আগাইয়া আসিয়া নরম কণ্ঠে বলিলেন, কি হয়েছে কি ? কি চায় ওরা ?

সনাতন মানদার দিকে লজ্জায় যেন চাহিতে পারিলেন না, বলিলেন, ওরা এখুনি আশীর্ব্বাদ সেরে দিয়ে যেতে চায়। মেয়ে ওদের ভারি পছন্দ হয়েছে।

মানদার আবার রাগ হইল, শুভিকে কার না পছন্দ হবে ? বলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া বলিলেন, তুমি কর্ত্তা, সকলের চেয়ে বোঝ বেশী, যা উচিত মনে কর, কর। আমি তোমায় বাধা দেব না; এটা ঠিক জেনো। কিন্তু আশীর্ব্বাদটা ক'রবে কে শুনি ? ঐ গঙ্গাজলে বুড়ো ?—না তার ভায়ে ? একটা ভারিক্কে লোকও ওদের কেউ নেই ?

সনাতন যেন একটা উপায় দেখিতে পাইলেন, তাইতো, সে বেশ কথা ব'লেছে—তাই ব'লে ওদের বিদায় ক'রে দি গে,—বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে গিয়া কিন্তু এই আপত্তি বেশীক্ষণ টিকিল না; সনৎকুমার বলিল, বেশতো আমাদের পক্ষে আশীর্ব্বাদের ভার আমরা ঘটক ঠাকুরকে দিচ্ছি। বাড়ীতে যদি এই আপত্তি হয়তো, আমি যেটা বলি, সেটা কি তার একটা যুক্তিপূর্ণ খণ্ডন নয় ?

ঘটক বলিলেন, একশোবার।

সনাতন আবার বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। সেখানে মানদা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া তার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, বলিলেন, আর আমি পার্‌চিনে। তোমরা যা হয় কর, ওদের বিদায় করার ব্যবস্থা কর—আমি ঘুরে আস্‌চি—কথা বলিতে বলিতে সনাতন খিড়কির দরজা দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

নন্দ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। তখন কি করা উচিত বিবেচনা করিবার জন্য সে রামকে ডাকাইয়া আনিয়া—বলিল, রাম আজ ওদের কোন রকমে বিদায় করা যায় না ? ছোটলোকের দল ওরা;—ওদের একটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই, দেখ্‌চিস্ না ?

রাম জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোথায় গেলেন ?—মানদা বলিলেন, তিনি হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে চলে গেলেন, বল্লেন, ওদের বিদায় করার ব্যবস্থা কর। কিন্তু ভেবে দেখ তোমরা বাপু, তাও কি উচিত হবে ?

নন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, জেঠিমা আপনারা কিচ্ছু ভাবিত হবেন না; আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি ঘটক ঠাকুরকে ডেকে।

বাহিরে গিয়া দেখিল ঘটকও বিদায় হইয়াছেন। অতএব সে নিজেই কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

নন্দ বলিল, আজই কি আশীর্ব্বাদ করার ধনুর্ভঙ্গ পণ নিয়ে আপনারা বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন ?

নন্দকিশোরের পরিচয় ঘটকঠাকুর নিভৃতে দিয়া গিয়াছিলেন তাই হঠাৎ তাহার উপরে রাগ করা চলে না !

সনৎকুমার কিন্তু কথা কহিল না, অগত্যা মাতুল বিকশিত দন্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কি বলেন, ওটা হ'য়ে গেলেই বেশ সুবিধা হয় না।

নন্দ উত্তরে বলিল, বাঃ, আপনার দাঁতগুলি ত বেশ চমৎকার ক'রে দিয়েছে ? কোন্ দোকানে করিয়েছিলেন ?

ভবশঙ্কর একেবারে নিশ্চয় করিয়া জানিতেন যে, দাঁতের কৃত্রিমতা বাহির করা সম্ভব নয় ; তাই প্রথমে একটু থতমত খাইলেন, তাহার পর বলিলেন, ওটা আমার বয়সের জন্য নয়; কোবরেজ বলেছে, রোগে।

নন্দ একটু হাসিয়া বলিল, তাতো দেখাই যাচ্ছে, আপনার চুল পাকারই কি বয়স হয়েছে ? সেওত রোগেই ; তা কি বলা যায় ? কলপটা আর বারদুই দিলে কেউ বুঝতে পারতো না।

হঠাৎ সনৎকুমারের উপর ভবশঙ্করের বিশ্বাসটি টলিয়া গেল কেননা সে বলিয়াছিল যে, পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে ধরিতে পারে তাঁহার দাঁত বাঁধানো এবং চুলে কলপ আছে !

সনৎকুমার মাতুলের দৃষ্টির বিদ্যুৎ চমকে বুঝিয়াছিল যে, তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চয় হইতেছিল। সে জানিত যে মাতুল একবার রীতিমত রাগ করিলে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়িবেন যে, তখন তাঁহাকে সামলান মুস্কিল হইবে এবং সেই দৃশ্য দেখিলে তাঁহাকে কন্যাদান করিবার ইচ্ছা কন্যাপক্ষের সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়া যাইবে। তাই সে বলিল, চলুন, আজ যাওয়া যাক্ ; অন্য একদিন এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাওয়া যাবে।

মাতুলের কিন্তু একথা ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, তুমি বল কি ? এই বল আজই হোক্ ; ঘটকঠাকুর তেরো হ'তে চ'লে গেলেন, আবার বল, আজ থাক্ ! এ সব আমার ভাল বোধহয় না।

সেই দিনই আশীর্ব্বাদ করিবার প্রস্তাবের মধ্যে একটা কুৎসিৎ ব্যগ্রতা ছিল, সনৎ তাহা বুঝিয়াছিল ; কিন্তু ঘটকের দৃঢ় অনুমোদনে সে মনে করিয়াছিল যে, ব্যাপারটা সহজেই শেষ হইবে। এখন কিন্তু নন্দর কথাবার্ত্তা, কর্ত্তার গৃহ হইতে অকস্মাৎ চলিয়া যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারের যোগে তাহার মনে হইয়াছিল যে অচিরে তাহাদের চলিয়া যাওয়া সবচেয়ে শোভন এবং কল্যাণকর হইবে। কিন্তু মাতুলকে দুই কথায় সব বুঝান একান্ত কঠিন।

সনৎকুমার আর কথা না কহিয়া উঠিয়া পড়িতে ভবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, যাস্ কোথা ?

উত্তরে সে বলিল, দেখি একবার ঘটকঠাকুরকে, এত দেরিই বা হয় কেন ?

ভবশঙ্করের একলা থাকিতেও ভাল লাগিল না। দুইজনে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথ চলিতে চলিতে সনৎ বলিল, ওই জমিদারের বেটাটা ভারি সয়তান, আপনাকে ঘুরিয়ে

কি জুতোই না দিলে, মামা, ভাল চান্ ত বাড়ী ফিরুন; নইলে কপালে আজ অনেক দুর্গতি আছে'। ও মেয়ের বিয়ে হ'তে একটুও দেরি লাগ্‌বে না; কিন্তু আপনাকে এবার ফিরলে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবে, ওই শালা জমিদারের পো।

বটে, বলিয়া রাগে ক্ষোভে ভবশঙ্কর পথের মধ্যে এমন তর্জ্জন-গর্জ্জন সুরু করিয়া দিলেন যে লোক জমা হইয়া গেল।

গ্রামের ছেলেরা নিমেষে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া ভবশঙ্করকে টিট্‌কারি দিয়া চীৎকার করিয়া বার বার বলিতে লাগিল,

বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো বর।
পেঁচোর মাকে বিয়ে কর॥

নন্দ বাহিরের ঘরে একটা তালা লাগাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। মানদা রোয়াকের উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। সে বলিল, জেঠিমা তারা নিজে নিজেই বিদায় হ'য়ে গেছে। তাহার কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল।

মানদা একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

ঘরের কোণ হইতে একটি স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া সন্ধ্যার মন্থর পবনে আত্ম-সমর্পণ করিল। অলক্ষ্যে দুই চক্ষু ভরিয়া যে অশ্রুর জোয়ার আসিয়াছিল, তাহার উদ্বেলতার মধ্যে একখানি সুকুমার কচি মন, কিসের ব্যথায়, সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল তাহা বিষয়ী সংসার জানিবার কোন কামনা রাখে না! শুধু কবি নিগূঢ় বেদনায় বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

জাগো রে, জাগোরে
চিত্ত জাগো রে;
জোয়ার এসেছে
অশ্রু সাগরে!

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

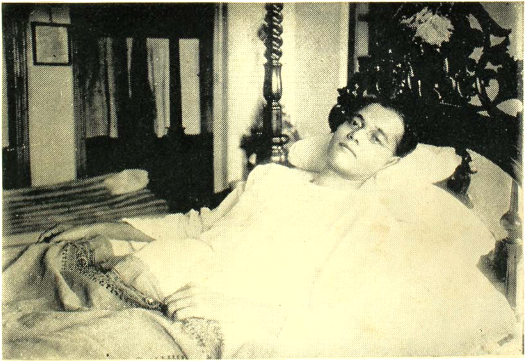

সদ্যোমুক্ত শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

বন্দিত্ব—২৫শে অক্টোবর ১৯২৪ সাল। মুক্তি—১৬ই মে ১৯২৭ সাল।

THE INDIAN ART SCHOOL
[illegible]

বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য

ভারতে চিত্র-শিল্পের পুনরুত্থান

সম্প্রতি "দি মাদ্রাজ মেল" পত্রে মিঃ জেমস্, এইচ্. কাজিন্স ভারতে চিত্র-শিল্পের পুনরুত্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ এই :—

দশ বৎসর পূর্ব্বে যদি কোন ভদ্রলোক ভারতীয় চিত্র-শিল্পের কোন প্রদর্শনী খুলিতে ইচ্ছা করিতেন তিনি তিন চারিমাস অনবরত চেষ্টা করিয়াও একটি ছোট ঘরে সাজাইবার মত সামগ্রী যোগাড় করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ!—এবং যদি বা পারিতেন তাহার উপযুক্ত দর্শক যোগাড় করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সময়ের এমনি পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এখন সামান্য চেষ্টা করিলেই দুই সপ্তাহের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড প্রদর্শনীর আয়োজন সহজেই করিতে পারা যায়। লেখক বলিতেছেন তিনি রাজনীতিবিদ্ নহেন; সুতরাং তিনি বলিতে পারেন না যে, এ বৎসর ভারতীয় জাতীয় মহাসভার যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে তিন চার বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত প্রস্তাবের ন্যায় এ বৎসরও বক্তৃতার মধ্যে শিল্প-চর্চ্চার কথা ছিল কিনা, কিন্তু সংবাদপত্রের মারফতে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে সূচী-শিল্পের একটা বিশেষ অংশ এবার সেখানে গৃহীত হইয়াছে। লেখকের মতে সেটা অবশ্য খুব ভাল, কিন্তু একটা জিনিসের সম্পূর্ণ কোন অংশ না লইয়া তাহার বিশেষ কোন অংশ লওয়ার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর কিছু হইতে পারে না। যাহা হউক, লেখক বলেন দেশের সর্ব্বত্রই শিল্প-চর্চ্চার ক্ষেত্রে একটা নূতন জাগরণের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে।

এ কথা সত্য যে ভারতবর্ষের সীমা ও লোকসংখ্যার অনুপাতে জগতের অন্য কোন দেশের সঙ্গে এই প্রচেষ্টার তুলনা করিলে ইহা অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই অনুভূত হইবে। গত দশ বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষে যতগুলি শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছে তাহার মোট সংখ্যা যোগ করিলেও প্যারীতে এক সপ্তাহে যাহা হয় তাহার সহিত তুলনা হয় না। কিন্তু জগতে কোন জিনিসের উন্নতির পরিচয় জানিতে হইলে তাহার ভিতরকার সূক্ষ্ম জাগরণের সন্ধান লইতে হয়। লেখক বলিতেছেন ইহা তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, গত দশ বৎসর ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট থাকায়, তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন যে বাহিরে প্রকৃষ্টভাবে প্রতীয়মান না হইলেও ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উন্নতির ধারা অন্তরে 'ফল্গু' নদীর ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে।

ভারতের চিত্র-শিল্প যেমন একদিকে দ্রুত পুষ্টিলাভ করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের মধ্যে সমাদরও লাভ করিতেছে। সত্য-শিল্পী যাঁহারা তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সাউথ কেন্‌সিংটনের প্রথা অনুসারে যে সমস্ত ভারতীয় শিল্পীরা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ধারা না মানিয়া নিজেরা নিজেদের দেশীয় পথে অগ্রসর হইতেছেন। ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরাও ক্রমেই ভারতীয় চারু-শিল্পের গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহার প্রশংসায় শতমুখ হইয়া পড়িতেছেন। ১৯১৬ খৃঃ লেখক যখন "বেঙ্গল স্কুলের" কতকগুলি চিত্র লইয়া মাদ্রাজে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তখন তাঁহারই পরিচিত একটি উচ্চশিক্ষিত ইংরাজ ভদ্রলোক সেগুলি দেখিয়া উপহাস করেন। দ্বিতীয়বারে আবার সেই প্রদর্শনী খোলা হইল। এবার কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি উপহাস করা দূরে থাকুক—বরং দুইখানি ছবি কিনিলেন। তৃতীয়বারে কিনিলেন প্রচুর ভারত হইতে বিদায়কালে তাঁহার চিত্র-সংগ্রহের মধ্যে বহু মূল্যবান্ চিত্র সকল স্থান পাইয়াছিল এবং মনে মনে তিনি তাহার জন্য গর্ব্বই অনুভব করিয়াছিলেন।

যে-সমস্ত ভারতীয় চিত্র-শিল্পীরা এখনো পর্য্যন্ত ইউরোপীয় চিত্র-কলা নকল কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, তাঁহাদের আদর ক্রমেই দেশ হইতে কমিয়া যাইতেছে।—এবং ইউরোপ হইতে যে সকল কদর্য্য চিত্র এখনো এদেশে আসিতেছে তাহাদের প্রতি দেশের মধ্যে বেশ একটা অশ্রদ্ধার ভাব জমিয়া উঠিতেছে। রাজপুত, মোগল কিংবা “বেঙ্গল স্কুলের” চিত্র দেখিতে দেখিতে দেশের রুচি এমনি বদ্লাইয়া গিয়াছে যে, রবি বর্ম্মার চিত্রকে অনেকেই যেমন শিল্প কলার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ বলিয়া থাকেন, উহাদিগকেও সেইরূপ মনে করিয়া থাকেন। মিঃ কাজিন্স লিখিয়াছেন কোন একটি ভারতীয় ভদ্রলোক একটি চিত্র প্রদর্শনী খুলিবার পূর্ব্বে তাঁহার একখানি প্রকাণ্ড সাইজের তৈল-চিত্র কোথায় রাখা হইবে এই লইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু মজার কথা এই যে, তিনি কয়েক দিন পরে প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত কয়েকখানি সুন্দর ছবির সংস্পর্শে আসিয়া এবং ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি মনোরম বক্তৃতা শুনিয়া নিজের ছবিখানি গোপনে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া যান।

মিঃ কাজিন্স লিখিয়াছেন কালিকটে যে চিত্র প্রদর্শনী হইয়াছিল সেরূপ প্রদর্শনী মালাবার তটভূমিতে সেই প্রথম। যে-দেশের লোকেদের মধ্যে শিল্প-কলার প্রতি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুভূতি নাই, সে-দেশে যেমন হওয়া উচিত কালিকটের প্রদর্শনী ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছিল “ভারতীয় মহিলা সমিতির” উদ্যোগে এবং উহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, যাহাতে ভারতীয় চিত্রানুরাগী দর্শকেরা সহজেই একখানি করিয়া চিত্র তাঁহাদের গৃহ-প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া রাখিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা তিন শত চিত্র প্রত্যেকখানি মাত্র এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। উহা হইতে আশা করা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে আর দুই একটি ঐরূপ চিত্র-মেলা খুলিতে পারিলেই মালাবারে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের আরও কিছু উন্নতি আশা করা যাইতে পারে।

বেনারসে প্রতিবৎসর যে চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন হয় তাহা থিওজফিক্যাল সোসাইটির চেষ্টায় তাহাদের বাৎসরিক উৎসবের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ১৯২৩ খৃঃ প্রদর্শনীর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেন্ট্রাল হিন্দু স্কুল হলে। সেখানে বর্ত্তমান যুগের এবং মধ্য-যুগের ভারতীয় চিত্র-শিল্পের যে চরম উৎকর্ষ দেখান হয় তাহা আজিও ভুলিবার নহে। সেই সম্বন্ধে যে গল্প আছে তাহা পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উন্নতি কত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

১৯২০ খৃঃ কৃষ্ণদাস নামে বেনারসের একটি তরুণ যুবক ভারতের চারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে ঐ সংগ্রহ কার্য্যে তাহার নেশা জমিয়া গেল। বর্ত্তমানে তিনি মোগল, রাজপুত ও পারশিক স্কুলের প্রায় হাজার চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া “মডার্ণ স্কুলের” চিত্র, পুরাতন যুগের মূর্ত্তি শিল্প ও সূচি-শিল্প প্রচুর সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মূল্যবান্ সংগ্রহের সমস্ত সত্ত্ব তিনি “ভারত কলা পরিষৎ”কে দান করিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে ইহা হইতে কিছু শিখিতে পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষেরা করিয়া রাখিয়াছেন। সেন্ট্রাল হিন্দু স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের বিদ্যালয় গৃহের কিয়দংশ ইহাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখানে চিত্র-শিল্প ছাড়া সঙ্গীত শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত আছে। চিত্র সংগ্রহ যাহাতে দিন দিন বৃদ্ধি পায় তাহার দিকে পরিষদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে।

উপসংহারে মিঃ কাজিন্স এই বলিয়া সকলের নিকট নিবেদন জানাইয়াছেন যে, ভারতের এই গৌরবময় আন্দোলনটিকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে দুইটি জিনিসের আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমটি

হইতেছে একটি নিখিল ভারতীয় শিল্প-সভা প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি হইতেছে একটী নিখিল ভারতীয় শিল্প-দর্পণের প্রকাশ। প্রথমটির কার্য্য হইবে শিল্পী ও শিল্পোন্নতির সহায়ক যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির সংস্থাপন করিয়া ভারতের মৃত-শিল্পের পুনরুদ্ধার করা,আর দ্বিতীয়টির কার্য্য হইবে ভারতে ও ভারতের বাহিরে এই আন্দোলনের সহজ প্রচারের উপায় করা। পত্রিকাখানি অবশ্য ইংরাজি ভাষাতেই লিখিত হইবে।

আশুতোষ-স্মৃতি

আশুতোষ আজিকে কোথায় —
ভাবি যত, বহে তত খরস্রোত আঁখির ধারায়!
জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর, দানবীর, আশ্রিত বৎসল,
সদানন্দ, সেবাব্রত, শিশুভাবে সতত সরল,
অগ্নিসম আলোময়, শৈত্যে বারিধার
বিরাট হিমাদ্রি সম
আকাশের তুল্য মুক্ত অনন্ত উদার,
অপ্রমেয় সিন্ধুর সমান,
বিচারের তুলাদণ্ডে শক্তিধর পুরুষ প্রধান,
বাণী-কুঞ্জে অনিদ্র ঋত্বিক,
সত্যাশ্রয়ী, উচ্চশির
দেশপ্রাণ, নির্ভয় নির্ভীক,
চিন্তা-নায়কের মণি নীতি মহিমায়,
সে মহামানব আজি
রহস্যের কি ইঙ্গিতে অদৃশ্য কোথায়!

দিন গেছে, মাস গেছে, বর্ষ গেছে তিন,—
আসে নাই তবু ফিরে এ ডাকে হৃদয়বিহীন,
ভূলোকে কি দ্যুলোকের বিশ্ববিদ্যালয়
গড়িতেছে আশুতোষ
নিজহাতে হইয়া তন্ময়,
ডাকিলেও সাড়া নাহি পাই,
আকাশে বাতাসে শুনি—সে নাই, সে নাই,
মানব-হৃদয়-রাজ্যে আছে তা'র স্থান,
সেখানেতে করিলে সন্ধান,
কীর্ত্তির কল্যাণী দ্যুতি
প্রিয়জনে সেখানে বিলায়—
সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত
আশুতোষ ধ্যানযোগী মূর্ত্তির লেখায়,
সে যে ছিল, সে আছে গো—থাকিবে সেথায়—
হারা'য়ে বুঝিনু আজ সে আছে কোথায়!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

অঞ্জলি

আজিকে তোমার শ্রাদ্ধ-বাসরে
কত কথা জাগে মনে,
বাংলার তেজ, বাংলার প্রেম
অস্ত তোমার সনে।
সিংহের মত উদার দীপ্ত
ভাস্বর সেই আঁখি,
হৃদয় আছিল দীনের লাগিয়া
প্রেম ভালোবাসা মাখি'।
দুখিনী বঙ্গমাতার মলিন
বদন নিরখি আহা,
নীরবে একাকী সাধকের মত
তুমি হ'য়ে গেলে সারা;
যতদিন যাবে, অভাগা বঙ্গ-
বাসীরা বুঝিবে ধীরে,
থাকিয়া থাকিয়া তোমারে স্মরিয়া
তিতিবে নয়ন-নীরে।
দেখ দেখ ঐ তোমাকে হারিয়ে
বঙ্গজননী আজ,
বিষাদ ধূসর পরিয়াছে আহা!
চির-কাঙালিনী সাজ!
তোমার রুদ্র-নয়নের পানে
চাহিতে নারিত যা'রা,
(আজ) বৃথা বীরমদে আপনার পায়ে
কুড়াল মারিছে তারা।
আপনার হৃত্‌পিণ্ড নিঙাড়ি'
গড়ে ছিলে যেই মঠ,
ধূলিসাৎ তাহা করিবারে কত
জুটিয়াছে আজি শঠ।
ভিক্ষার লাগি কখনো জীবনে
কোথাও মাগ'নি কিছু,
গোলামের মত কখনো কাহারো
ছোট নাই পিছু পিছু।
ভীমের মত শপথে অটল
ভীমের মতন কায়,
লক্ষ্য ভেদিতে অর্জ্জুন সম
ছিলে তুমি বাংলায়।
তোমার হৃদয়-সায়রের কূল
ছাপিয়ে প্রেমের বান,
বাংলার দীন পল্লীবাসীর
ভরে দিয়েছিল প্রাণ।
চাষার কুটীরে আশার তুফান
কত না উঠালে তুমি,
জ্ঞানের বর্ত্তি হাতে ল'য়ে আহা
ঘুরিলে ভারতভূমি।
তব তর্জ্জনী কম্পনে সারা
ভারত কাঁপিত হায়,
প্রাণ ভয়ে আসি, দেশের যে অরি,
সেও লুটাইত পায়।
স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা চাই,
'স্বাধীনতা চাই—বলি,'
(আর) পঞ্চমে তান কে ধরিবে—দেশ-
মাতৃকার প্রেমে গলি'।
আপনার দেশে বিদেশিনী প্রায়
ছিল যে বঙ্গবাণী,
পুত্রের মত সেই জননীরে
করিয়াছ রাজরাণী।
বঙ্গ ভারতী তোমার কৃপায়
বিশ্বভারতী আজ,
রাজার ভাষায় উপহাসি তারে
পরায়েছ রাজ-সাজ।
বড় সাধ ছিল, বাংলায় যত
ছোট বড় সব ঘর।
জ্ঞান বিজলীর প্রভায় করিবে
চিরতরে ভাস্বর।

বঙ্গদেশের একটীও প্রাণী
না রবে নিরক্ষর।
জ্ঞানের বর্ম্মে আবরিয়া তনু,
আপনার পায়ে ভর,
করিয়া দাঁড়াবে, বুঝিতে শিখিবে
আপনার অধিকার;
তবে সে ঘুচিবে বঙ্গমাতার
বুকের অন্ধকার।
বিদ্যার পূত মন্দিরে মহা-
যজ্ঞ না করি' শেষ
কোথা লুকাইলে, ওহে ঋত্বিক,
কারে দিয়ে গেলে দেশ?
সঙ্কল্পিত যজ্ঞের তব
ধ্বংস করিতে কত,
নানা বেশ ধরি আসিত যজ্ঞ-
বিঘ্নকারীরা শত।
যত বাধা পেতে ততই তোমার
দ্বিগুণ বাড়িত বল।
নহ পরাভূত জীবনে কখনো,
যেন ধীর হিমাচল।
প্রেমভরা বুকে হাসি হাসি মুখে
ঝাড়িয়া পায়ের ধূলি।
কত দীনহীন কাঙাল ছাত্রে
আদরে লইতে তুলি।
কখন'ও কেহ যায় নি ফিরিয়া
তোমার দুয়ার হ'তে।
তোমা বিনে আজ ম্লান মুখে তারা
ঘুরিতেছে পথে পথে।
যেন তাহাদের কেহ নাই আর,
কত অপরাধী তারা।
হায়রে একদা আছিল তোমার
বুকের মাণিক যারা।
এত ভালো তুমি কেন বেসেছিল,
যদি তাড়াতাড়ি যাবে,
স্বর্গেও তুমি তাদের ছাড়িয়া,
বল না, কি সুখ পাবে?
ওহে বাংলার বিজয় কেতন
গর্ব্ব ভারতমার,—
তোমার অভাবে এ দেশ আঁধার,—
সব বুঝি ছারখার।
পারো যদি ফিরে' আসিও,
কিংবা খুলিয়া স্বর্গদ্বার,
দেখিও, তোমার দেশের কি দশা,
তোমারে সে পাঠাগার—
হাতে করে' তুমি গড়েছিলে যাহা,—
বুকের রক্ত দিয়া,
রঞ্জিত কত করেছিলে, যত
সাধ ছিল,—পুরাইয়া।
সঙ্গে ত কিছু যাও নাই নিয়া,
সব রহিয়াছে পড়ি,
একের অভাবে সকলি ধূলায়
যাইতেছে গড়াগড়ি।
প্রাণহীন দেহ রয়েছে পড়িয়া,
বাহিরেতে জাঁক কত,
শবের উপর নৃত্য করিছে
নৃত্য-কারীরা যত।
স্বর্গ হইতে বর্ষণ, দেব,
করো' এ আশীষরাশি,
মানুষ হউক মানুষ হউক,—
বাংলার অধিবাসী।*

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

---

* স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি সভায় পঠিত।
ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, ২৭ শে মে, ১৯২৭

পুস্তক-পরিচয়

মাথুর-কথা :— শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত, (৭২ সংখ্যক গ্রন্থ) মূল্য ২॥০। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। মথুরা একাধারে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-স্মৃতি-বিমণ্ডিত প্রাচীন নগরী। মথুরার ইতিহাস জানিলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্ম-জীবনীর একটা প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের সহিত পরিচয় হয়। বেদে "মথুরা" নামটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যমুনার ও তাহার তীরবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ আছে। রামায়ণের ইঙ্গিত স্পষ্টতর, মহাভারত ও নানাবিধ পুরাণের মধ্য দিয়া মথুরার চিত্রটি বেশ উজ্জ্বল বর্ণেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম এই মথুরা-মণ্ডলে প্রাধান্য বিস্তার করে, পাঠান-মোগলের অত্যাচারেও মথুরা বারবার প্রপীড়িত হইয়াছে। এই মথুরা নগরে স্থাপত্য-শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন অপরূপ সৌধরাজি ও দেব-মন্দির-শ্রেণী একাধিকবার চূড়া উত্তোলন করে এবং প্রতিবারেই অত্যাচারীর হস্তে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভারতবাসীর গৌরবের তিলক ও কলঙ্কের ছাপ যেমন মথুরার ভালে অঙ্কিত অন্যত্র সেরূপ নয়। শিল্পেতেও ভারতবাসীরা কতদূর দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ এই মথুরায় নিহিত আছে। সুতরাং মথুরার ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই দুরূহ। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার প্রাচীন বয়সে এই প্রয়োজনীয় ও দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বিপুল পরিশ্রম গবেষণা, ও বিচার করিয়া তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পুরাণ, প্রাচীন বিদেশী পর্য্যটকগণের ভ্রমণ কাহিনী, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের মধ্য দিয়া অতি দুর্গম ও জটিল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি এই তীর্থ-পরিক্রমা শেষ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলও তিনি আহরণ করিয়াছেন। তিনি নিজে প্রত্নতাত্ত্বিক নহেন, নিজে কোন আবিষ্কারও করেন নাই, তবুও তাঁহার গৌরবের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। যে সমস্ত উপাদান নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল সেগুলি একত্র করিয়া বিচার-নৈপুণ্য-সহকারে ঝুটা বেকী বাদ দিয়া এই যে অপরূপ মালা-রচনা,—ইহাও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। বঙ্গবাণীর কণ্ঠে এ রত্ন-হার অকলঙ্ক প্রভায় চিরদিন দোদুল্যমান থাকিবে।

গ্রন্থের শেষাংশে যে চিত্রাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়-সমূহ বুঝিবার সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষা বেশ সরল ও স্বচ্ছ।

জাপান ঃ—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত একখানি ভ্রমণ-কাহিনী। কলিকাতা ২ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে এন্, এম, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ—দাম ন'সিকা।

লেখক ছাত্রাবস্থায় দীর্ঘকাল জাপানে বাস করিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই বিশদভাবে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। জাপানের রাজধানী, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, চিত্রকলা, শিল্পনৈপুণ্য, নৃত্যচর্চ্চা, কাব্যোন্নতি, আচার ও অনুষ্ঠান সকল বিষয়ের একটা সূক্ষ্ম পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়। প্রারম্ভে সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায়, বিদায়ের চিত্রটি চোখের কোণে জল আনিয়া দেয়। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট রসের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুস্তকখানিতে লেখকের বীরত্বের কাহিনী বিশেষ কিছুই নাই, আছে প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্য,—যাহা উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। লেখকের ভাষা সরল ও সুমিষ্ট—লিখন-ভঙ্গী বিশিষ্টতা সম্পন্ন। তাঁহার বর্ণনাশক্তির গুণে জাপানের আভ্যন্তরীণ অনেক অবস্থার চিত্র জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা জাপান সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছুক, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবেন।

অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেওয়া হইয়াছে। চিত্রগুলির বিশেষ মূল্য আছে। প্রচ্ছদপটের মনোরম জাপানী পরিকল্পনাটি করিয়া দিয়াছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়। ছাপা, কাগজ, ছবি চমৎকার।

তন্বী ঃ—শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এম্, এম্, রায় চৌধুরী কোং ২ নং কলেজ স্কোয়ার। মূল্য পাঁচ সিকা। বাঁধাই, কাগজ সুন্দর।

পুস্তিকাখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে "তন্বী"। সব গল্পগুলি ভাল না হইলেও, দুই একটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। প্লটগুলি বড়ই পুরাতন। গল্পের ঘটনা-স্রোত মাঝে মাঝে এত দ্রুত আসিয়া পড়িয়াছে যে অনেকস্থলে অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে। "সৌন্দর্য্য" নামক গল্পে সৌন্দর্য্যপ্রিয় পুত্র সুকুমার দুই বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও যখন মনোমত কোন পাত্রীর সন্ধান করিতে পারিল না, তখন তাহার মাতা তাহাকে লইয়া কালীঘাটে দেবীদর্শনে যাইলেন। সেখানে গিয়া তিনি সদ সদ চিত্তে কালীমাতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"মা আমার সন্তানকে সুমতি দাও, তাহাকে সংসারী কর।" অমনি দেখিতে দেখিতে সেইখানে এক "অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী পুষ্পমঞ্জরী সদৃশা অতুলনীয়া সুন্দরী" অঙ্গনের তলে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল, এবং জানা গেল সে তাহাদের স্বজাতি। সুতরাং সুকুমারের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক! "বিধবা" গল্পটি বরাবর বেশ জমিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু শেষে স্টিমারের জাহাজের ঢেউতে ডুবিয়া মরা সেকেলে ধরণের পরিণতি।

নানা দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মোটের উপর বইখানির লেখা মন্দ নহে। হিন্দুর নানা রীতিনীতি ও সদাচারে ইহা পরিপূর্ণ।

আলোর আঁধার ঃ—শ্রীপঞ্চানন মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এখানি একটি উপন্যাস। পঞ্চানন বাবুর "মরীচিকা" পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম, এখানিও সুন্দর লাগিল। প্লটের নূতনত্ব না থাকিলেও লেখার গুণে বইখানি বেশ জমিয়াছে। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটিও বেশ সুন্দর হইয়াছে। বাঁধাই ও ছাপা মনোরম।

জটিল-তপস্বী ঃ—"আলোচনা"—সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—জগন্নাথ সাহিত্য মন্দির, ৩৫।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। নীল কাপড়ে চমৎকার বাঁধাই। মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

আমাদের ভারতবর্ষ সাধকের দেশ। কত তপঃ-নিরত সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহাদের পুণ্যাচরণ স্পর্শে এই ভূমিকে মহিমান্বিত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এ জগতে কত আসে কত যায়, কে তাহাদের খবর রাখে, কিন্তু যাঁহাদের স্বার্থপরতার দাগ লাগে নাই, পরের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া যিনি পরকে আপন করিতে চাহিয়াছেন পরের মঙ্গলার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। আজ কত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু ব্রহ্মচারী জটিলকে কেহ ভুলিতে পারে নাই। এক পল্লীবাটে নিতান্ত দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও হোম-যাগ-তপশ্চরণদ্বারা আজীবন ধর্ম্মের পদতলে বসিয়া জটিল এমনিভাবে লোকের সেবা করিয়াছিলেন যে তাঁহার গৃহত্যাগকালে তৎকালীন নবাব সাহেব পর্য্যন্তও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে—"যো গিয়া ওসা আর নেহি হোগে গা। হিন্দুকা একঠো বড়া আদমী চলা গিয়া।"

যাহা হউক লেখক তপস্বী জটিলের কর্ম্মময় জীবনী এমনি মধুময় করিয়া লিখিয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে অনেক সময় উহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়, কেননা এইরূপ প্রাতঃ

স্মরণীয় ব্যক্তিদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিলে চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা স্বাস্থ্য ও চরিত্র সংগঠিত হয় ও সমাজদেহ পুষ্টি লাভ করে।

আবর্ত্ত—শ্রীহরিপদ পাণ্ডে, এম. এ প্রণীত একখানি বৃহৎ উপন্যাস। কলিকাতা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। মূল্য দুই টাকা।

এই বৃহৎ উপন্যাসখানির লিখনপদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন না হইলেও বিশিষ্টতাসম্পন্ন। ইহার নায়ক জমীদার সুরথ চৌধুরী বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী যুবক। ফরাসী দার্শনিকদিগের প্রচণ্ড প্রভাব যেমন ফরাসী-বিপ্লবের অন্যতম কারণ হয়েছিল, বাল্যে স্কুলের শিক্ষক অটল বাবুর শিক্ষার প্রভাবে সুরথও বড় হইয়া সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ফরাসীবিদ্রোহও যেমন যে কোন কারণেই হউক সফলতামণ্ডিত হয় নাই, সুরথও জীবনের ঘূর্ণ 'আবর্ত্তে' পড়িয়া কেবল ঘুরিয়াছে কোন ক্রমেই জয়লাভ করিতে পারে নাই। লেখক সুরথকে আশ্রয় করিয়া মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বহু জিনিসের আলোচনা করিয়াছেন এবং দেশী ও বিলাতী সমাজের তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। লেখক দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে জলপ্লাবনের মত প্রবেশ করিয়া একটা সাময়িক আন্দোলন তুলিয়াছে মাত্র, কিন্তু স্থায়ী কোন ফল রাখিয়া যাইতেছে না। যেমন জাতীয়তা,—আমরা জাতীয়তার কতকগুলি ভঙ্গী (attitude) গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু মূল উপাদান আমাদের মধ্যে না থাকায় আমাদের জাতীয়তা একটা দাগিকায় (caricature) দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ-জ্ঞানের কিরূপ অভাব সেটিও বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। মনোনীত বাবু কবির কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়া নিজের মৌলিকতা সম্বন্ধে অসাধারণ অহং জ্ঞান জন্মায় এবং সাধারণ জ্ঞানের পরিপূর্ণ অভাবে, তাঁহাকে পাঁচজনের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইত। সুরথ এই সব দেখিত এবং দুর্দ্দমনীয় হাসি পাইলেও হাসি চাপিয়া ভাবিত, মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করাই মানুষের সব চেয়ে বড় দরকারী কাজ। তাই সে চুপ করিয়া থাকিত।

নবদ্বীপে তীর্থভ্রমণে গিয়া সুরথ সেখানে যে যথেচ্ছাচার দেখিল তাহাতে তাহার মন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, ধর্ম্মের স্থানে, ধর্ম্মের আসনে বসে যে মানুষ মানুষকে অধর্ম্মে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাকে সহ্য করার মত মহাপাপ আর কি আছে তা' জানিনে। এখানকার যাত্রীদের মধ্যে দেখছি স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী, অথচ এ জায়গাটা যে স্ত্রীলোকের পক্ষে নিরাপদ স্থান একেবারেই নয় তা' আমি স্পষ্ট দেখেছি। ধর্ম্মকে দাঁড়িয়ে থেকে ধরার ব্যবস্থা বোধ হয় আর অন্য কোন দেশে নেই।" সুরথের সহযাত্রী সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দিরে ঢুকছেন না কেন?" সুরথ উত্তর দিলে,—"দেখছেন না দরজায় টিকিট বিক্রী হচ্ছে। পয়সা না দিলে এরা ঢুকতে দেবে না, আমিও বলেছি প্রোগ্রাম না পেলে পয়সা দেব না।... ...এ জায়গাটা বুঝি নবদ্বীপের কর্পোরেশন ষ্ট্রীট? এখানে গ্যায়াইটী, ওখানে এ্যালবিয়ন, সেখানে পিক্‌চার প্যালেস।"

এইরূপ নানাবিধ তথ্যের আলোচনার পর ঘুরিতে ঘুরিতে বইখানি অসহযোগ আন্দোলনে আসিয়া শেষ হইয়াছে। স্বরাজ্যপার্টি ও তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে লেখকের সূক্ষ্ম

মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের ও মানব চরিত্র পর্য্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারাও ইহাতে মিশিয়া চিত্রে, চরিত্রে ও বৈচিত্র্যে ইহাকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

অভিশাপ—শ্রীবিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিত। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বসু এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক ভবানীপুর পি-৮১ রসা রোড, "দি বুক হল," হইতে প্রকাশিত। ছাপা, কাগজ বাঁধাই সুন্দর। দাম বারো আনা মাত্র।

পুস্তকখানি লর্ড লিটনের সুবিখ্যাত উপন্যাস "লাষ্ট ডেজ্ অফ পম্পিয়াই" হইতে শিশুদিগের উপযোগী করিয়া সুন্দরভাবে লিখিত। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "দেবতার অভিশাপে" পম্পিয়াই-এর বুকের উপর দিয়া ধ্বংস-দেবতার যে অগ্নিলীলা চলিয়াছিল, লিটনের উপন্যাসে সে দৃশ্যে আজিও জগতের লোকের চোখে জল ভরিয়া আসে। লেখক তাঁহার সুন্দর লিখন-ভঙ্গীতে সেই অকথন বেদনায় চিত্রখানি কল্পনায় তুলিতে যাইয়া লইয়া বেশ মনোরম করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন আমরা লেখকের এই প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

পুস্তকখানিতে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচখানি ছবি আছে। প্রচ্ছদপটের "অগ্নিসমাধি" চিত্রখানির পরিকল্পনা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ।

লেনিন ও সোভিয়েট—শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী প্রণীত ও ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা স্থিত সরস্বতী লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত;—কাগজ ও ছাপা সুন্দর,— ১২০ পৃষ্ঠা;—মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

লেনিন ও সোভিয়েট—এই দুইটি কথা শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। "কমুনিজম্" "বলশিভিজম্" প্রভৃতি শব্দও এখন প্রতিনিয়ত শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা রুশিয়ার জার-তন্ত্রের উচ্ছেদকারী লেনিনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত জানিতে চান, সোভিয়েট, কমিউনিজম্ প্রভৃতি শব্দের তথ্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন,—তাঁহারা এই পুস্তকখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন।

কল্যাণের পথে—শ্রীবিজয়কান্ত চৌধুরী প্রণীত;—প্রাপ্তিস্থান,—বিদ্যারথী, পোঃ আলামপুর, জেলা নদীয়া; ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে,—৯১ পৃষ্ঠা;—মূল্য আট আনা মাত্র।

জাতীয় দুঃখ ও দৈন্য বিদূরিত করিতে ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিতাই এই পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাপুরুষগণের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অভিমতও এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার সামাজিক ও জাতীয় জীবনে ব্রহ্মচর্য্য যে স্থায়ী আনন্দ, শান্তি ও শক্তি আনিতে সক্ষম, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

দীর্ঘজীবন—কবিরাজ শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত প্রণীত,—লাভর (ঢাকা) হইতে শ্রীজগদীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত;—১১৪ পৃঃ,—মূল্য দশ আনা মাত্র।

দীর্ঘজীবন লাভ পক্ষে আয়ুর্ব্বেদে যে-সমস্ত বিধি আছে, গ্রন্থকার কৃতিত্বের সহিত তাহার সন্ধান সাধারণ পাঠকগণকে দান করিয়াছেন। প্রত্যেক দীর্ঘজীবন-লাভেচ্ছু মানবের প্রত্যহ কি কি কর্ত্তব্য, কি কি খাদ্য, কি কি পানীয়,—কোন্ ঋতুতে কোন্ বিষয়ে দৃষ্টিদান আবশ্যক এবং কোন্ ঋতুর কোন্ রোগে কি মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা—গ্রন্থকার তাহা বিশদভাবে লিখিয়াছেন। এরূপ পুস্তকের ভাষা আরও সহজ, সরল ও সংস্কৃত-বর্জ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জয়শ্রী—চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দোতালা) হইতে এন্ এম্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত;—৩১ পৃষ্ঠা;—মূল্য ছয় আনা।

এখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে—জর্ম্মনীর লুক্সেমবুর্গ অবরোধ অবলম্বনে ইহা রচিত। তা' হউক, ইহা আমাদের ঘরের কথার মতই সজ্জিত। ইহা হৃদয়স্পর্শী, মনোজ্ঞ ও অপূর্ব্ব। পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে সমস্ত স্কুলে অভিনয়ের ব্যবস্থা আছে, সেখানে এই নাটিকাখানি অভিনীত হইলে সকলেই আনন্দ পাইতে পারেন।

চিত্ত-চিতা—শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত,—৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট স্থিত ডি, এম্, লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, ৫৬ পৃষ্ঠা;—মূল্য ছয় আনা মাত্র।

দেশবন্ধুর তিরোধানের পরে নানা সাময়িকপত্রে কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের যে-সমস্ত পদ্য ও গদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল এই পুস্তিকায় সেই-সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে। দেশবন্ধুর প্রতি ভক্তিশীল কবিশেখরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত লিখিত এই রচনাগুলি সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভের যোগ্য।

ঢেঁকির কীর্ত্তি—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত,—২ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে এন্. এম্. রায় চৌধুরী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—১৩১ পৃষ্ঠা,—মূল্য বার আনা মাত্র।

ইহাতে ছয়টি গল্প আছে। গল্পগুলির অধিকাংশ সত্যঘটনা মূলক। তদুপরি পল্লীচিত্রে সিদ্ধহস্ত দীনেন্দ্র বাবুর লেখনীর গুণে গল্পগুলির মধ্যে সেকালের পল্লী-জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দীনেন্দ্র বাবু এবার এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাঁহার এই পুস্তকে ছেলে ও বুড়ো সকলেরই আনন্দ লাভের ব্যবস্থা আছে।

জগৎ কথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত ও ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ হইতে ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—৩৮২ পৃষ্ঠা,—মূল্য আড়াই টাকা।

ইহাতে পঁচাত্তরটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলির কয়েকটি "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ত্রিবেদী মহাশয় যখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য ইহা ছাপাইতেছিলেন, তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। এক্ষণে ইহা এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের অনুগ্রহে ও শ্রীজগদানন্দ রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইল। ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রধানতঃ তাঁহারই আগ্রহের ফল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যে এই পুস্তকখানির উপযোগিতা যথেষ্ট বলিতে হইবে। বিজ্ঞান-পাঠার্থী ছাত্রগণ এই পুস্তক পাঠে অল্পায়াসে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত ও ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ হইতে ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—১২৭ পৃষ্ঠা,—মূল্য বারো আনা।

পুস্তকখানি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব রবীন্দ্রনাথের জীবন-প্রসঙ্গের আলোচনা। শিশু ও শিশুর মাতাপিতা—সকলেরই নিকট রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত,—কিন্তু তাঁহার জীবন কথা হয়ত সকলে জ্ঞাত নহেন। এই পুস্তক খানি সেই অভাব পূর্ণ করিবে। রবীন্দ্রনাথের বংশ পরিচয়, তাঁহার বাল্য শিক্ষা, বিলাত ভ্রমণ, বিশ্বজয়, তাঁহার অন্তরের পরিচয়, রচনার অল্পবিস্তর আস্বাদ—অতি অনায়াসে সকলেই এই পুস্তক হইতে লাভ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যামিনী বাবুর "ছেলেদের বিদ্যাসাগর" পড়িয়া আমরা যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, এই পুস্তকখানি পড়িয়া ততোধিক আনন্দ পাইয়াছি।

বিস্মরণী—কবিতার বই। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কাগজ, মলাট ও বিন্যাসশৃঙ্খলা চমৎকার! .৩২ পৃষ্ঠা—মূল্য ২।০ টাকা। প্রবাসী কার্য্যালয়ের উদ্যম ও সাহস প্রশংসনীয়।

'বিস্মরণী' নামের সার্থকতার ইঙ্গিতচ্ছলে কবি বলিয়াছেন—

"তোমরা আমারে ভুলে যেও ভাই, এসেছিনু পথ ভুলে,
পান করিবারে জাহ্নবীবারি কীর্ত্তিনাশার কূলে।
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা এবারে পুরিবে, মনে ছিল আশা
ভাঙা মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা পুরাণো বটের মূলে
প্লাবনের মুখে ভেসে গেল সব কীর্ত্তিনাশার কূলে।"

স্বগত অনাদরে নিঃস্পৃহ হায় অভিমানোদ্ধত কবি! তোমাকে ভোলা কি এতই সহজ? ভুলিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু উপেক্ষা বারবার পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া শ্রদ্ধায় পরিণত হইতেছে,—উপায় নাই। যে কবি রূপের সহিত রসের; সম্ভোগের সহিত সংযমের, প্রজ্ঞার সহিত কল্পনার, গভীরতার সহিত নিবিড়তার, ছন্দের সহিত গন্ধের, হার্টের সহিত আর্টের এমন অপূর্ব্ব মিলন ঘটাইতে পারে তাহাকে ভোলা কি এতই সহজ? যে স্বপ্নবিলাসী কবি 'নাদির শাহ' 'বেদুইন' 'স্মরগরল' 'হারেমের স্বপ্ন' 'উচ্চৈঃশ্রবা' 'পান্থ' 'স্পর্শরসিক' 'মোহমুদ্গর'

'ঘুঘুর ডাক' 'মৃতপ্রিয়া' 'মৃত্যুশোক' ইত্যাদি অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়কে বঙ্গবাণীর অঙ্গুলি ভরিয়া দিয়াছে তাহাকে ভোলা কি এতই সহজ ?

'মৃতপ্রিয়া' পাঠকালে রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়িতেছি বলিয়া বারবার ভ্রম হয়। কালাপাহাড় 'কীর্ত্তিনাশা'র কূলে কালো পাথরের পাহাড়—রায়বাহাদুরের ইষ্টকপুরী নহে। বৃহস্পতির আশীর্ব্বাদে কবি 'মোহমুদ্গরে' 'শঙ্করের' অট্টহাস্যকেও উপেক্ষা করিয়াছেন! 'বাঁধন' দেবেন্দ্রভক্ত কবির লেখনীর উপযুক্ত। বিস্মরণীর 'সুরগুচোন' স্বপনপসারীর খুস্মাহানেরই সমকক্ষ! 'পান্থ' 'নাগার্জ্জুন'ও 'যম ও নচিকেতা'র তত্ত্বের নির্ঝরে রসের পাথার প্রবাহিত। কবি 'শবনমীতে' যতীন্দ্রনাথের, 'দীপশিখা' ও 'কল্লাশয়তে' সত্যেন্দ্রনাথের, 'পিউলির বিয়ে' ও 'মাধবী'তে যতীন্দ্রমোহনের, 'সত্যেন্দ্রবিয়োগে'—করুণানিধানের সতীর্থ ও সহযাত্রী। বাকী অধিকাংশ কবিতায় কবি আপনার নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন 'পিউলীর বিয়ে' কবিতাটি আগাগোড়া তুলিয়া দিতে পারিলে ভাল হইত। অপূর্ব্ব !! কবি সুইনবার্ণের মারফতে যে কড়া কথা শুনাইয়াছেন—তাহা এ পুস্তকে না থাকিলে ভাল হইত।

কবিতাগুলির রসবোধে একটু অসুবিধা আছে। বিশেষ ধৈর্য্যশীল শ্রদ্ধাবান্ রসজ্ঞ পাঠক ব্যতীত অন্যের হয়ত এগুলি ভাল লাগিবে না। রচনায় স্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণের অভাব আছে! পাঠকের মস্তিষ্ককেও একটু শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ দীর্ঘ কবিতাগুলি আপনার নিজস্ব আকর্ষণীশক্তিতে পাঠকের কৌতূহলকে অবাধে টানিয়া লইয়া যায় না। পাঠকের চিত্তকে দীর্ঘপথ লইয়া যাইতে হইলে তাহাকে পরিশ্রান্ত না করিয়া কথায় কথায় ভুলাইয়া লইয়া যাওয়াই উচিত। রবীন্দ্রনাথ এ কৌশল জানেন। প্রাঞ্জলতা নিবিড় রসের জন্য সনেটই ভাল।

বিষাদের বিলাস হইতেই বোধ হয় প্রসাদ গুণের অভাব ঘটিয়াছে। একটা বিষাদের সুর তাঁহার রচনাভঙ্গিকে অনেক স্থলে কুণ্ঠিত ও গুণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহাতে রচনায় লক্ষ্যাংশ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যাংশের পরিমাণ ও কথিত বাণী অপেক্ষা অকথিত ব্যঞ্জনার পরিসর অধিক হইয়াছে। অর্দ্ধনগ্নতা ও অর্দ্ধবসনতার সামঞ্জস্যই যে রসসৃষ্টির মূলমন্ত্র কবি তাহা ভাল করিয়াই জানেন। আধুনিক কাব্যসাহিত্যের অবাধ নগ্নতায় বিরক্ত হইয়াই যেন কবি ঘোমটার দিকে অধিকতর সতর্ক হইয়াছেন। তাহাতে স্থলে স্থলে কৃত্রিমতা রসশিল্পকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ কৃত্রিমতা কবির অক্ষমতার পরিচয় নহে—ইহা উচ্চশ্রেণীর আলঙ্কারিকতা। নিবিড় অনাবিল রস লাভ করিতে হইলে এটুকু সহ্য করিতেই হইবে—Ausitralian minerএর সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় চাই। উপসংহারে বলি :—

হায়—কীর্ত্তিনাশার জলে—মোরা ডুব্‌বো দলে দলে
কবি—তোমার 'স্বপন' রইবে ফুটে 'অপরাজিতা' ফুলে
ঐ—বিস্মরণীর কূলে।

প্রাচীন চিত্র—আলোচনা পুস্তক শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। মূল্য ৸৵০।

এই গ্রন্থখানিতে অনুসূয়া-প্রিয়ম্বদা-শকুন্তলা, মহাশ্বেতা-কাদম্বরী চরিত্রের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আর আছে আগাগোড়া অঙ্কে অঙ্কে উত্তর রামচরিতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। উচ্চ সাহিত্যের আলোচনাও যে উচ্চসাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে—টীকাভাষ্যও যে মূলের মতই রসঘন বা জ্ঞানগর্ভ হইয়া উঠিতে পারে—creationএর আলোচনাও যে নূতন একটা creation হইয়া উঠিতে পারে—তাহা রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্য' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তকখানিও সেই ধরণের একটা কিছু হইবে ভাবিয়াছিলাম। তাহা হয় নাই। টাকাটা পাঁচ সিকা কেন হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। টাকাটা সত্যই টাকা কিনা—মেকী বা অচল কি না তাহাই দেখা উচিত।

পণ্ডিত মহাশয় বঙ্কিম-ভূদেব-চন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত রীতিতেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আলোচনা যেমন বিশদ তেমনি সরল। তরল হইলেও নিঃস্বাদ নয়। পোলাও নয় বটে—কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অন্ন—সাহিত্যরস-পিপাসুদের হতাশ হইবার কারণ নাই।

পণ্ডিত মহাশয় যে নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও সূক্ষ্মতার সহিত প্রাচীন কবিগণের সমালোচনা করিয়াছেন—তাহা সাহিত্য সমাজেও দুর্লভ। তাঁহার শ্রম সার্থক হইবে। এ গ্রন্থপাঠে মূল সাহিত্য পাঠের জন্য যে উদ্‌গ্রীবতা জন্মিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ত্রিবেণী—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ প্রণীত। সাথী প্রেস. মূল্য ৸৹ —

কাব্য গ্রন্থ কবির নিভৃত হৃদয়-উৎস হইতে উৎসারিত এই কাব্যরস ধারা ত্রিপথগামিনী হইয়া পাঠকের হৃদয়ভূমি সরস করিয়া বঙ্গীয় কাব্য-সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। (১) "স্বপ্ন ও জাগরণে"র পথটী মুক্তিকামী যোগীজন-সেবা। (২) "বিরহ ও মিলনের" পথ প্রেমিকের লোভনীয় এবং (৩) "হাসি ও অশ্রুর" পথ সংসারীর পক্ষেই প্রশস্ত। এই তিন রকম বিভিন্ন ধারার একত্র সমাবেশ এ ক্ষেত্রে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী-সঙ্গমের মতই পবিত্র। পুণ্যতোয়া বিষ্ণুপদী জাহ্নবীর উদার ও নির্ম্মল স্রোতোধারা এই 'ত্রিবেণী'তে বিদ্যমান। ভাগীরথীর অপূর্ব্ব স্রোতোধারায় অপরূপ ছন্দে অলঙ্কৃত ও ধ্বনিত, যমুনার গোপীপ্রেমপূত লীলা-তরঙ্গ কোথাও উচ্ছ্বসিত বেগে, কোথাও বা উপল-ব্যথিত গতিতে প্রবাহিত। আবার সরস্বতীর গুপ্তধারাকেও বাঙ্গালীর হতভাগ্য জীবনের মরুচিত্রের অন্তরালে অন্তঃসলিলা বহাইয়া কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কবিতাগুলির বৈচিত্র্য ও সাবলীল গতি পাঠকের মনকে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইতে না দিয়া আবেগভরে অগ্রসর করিয়া দেয়, অবশেষে সাগর-সঙ্গমের পুণ্যস্নানে তাহাকে স্নিগ্ধ তৃপ্ত, ও পবিত্র করে। 'আলোকের স্বপ্ন', 'মহাস্বপ্ন', 'অদর্শন', 'দুঃখীর কথা', 'মিলন', 'অর্থমনর্থম্' প্রভৃতি কবিতাগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। 'সমালোচক' কবিতাটিকে এই শ্রেণীর সহিত পাংক্তেয় করা কবির পক্ষে সমীচীন হয় নাই; উহার 'চিত্তশুদ্ধি' এখনও হয় নাই।

বিশ্ববাণী—(১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৪) সম্পাদক, স্বামী অভেদানন্দ ও শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি, লিট্ (লণ্ডন) বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৹। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যা পড়িয়া মনে হয় ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি যাবতীয় কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনাই পত্রিকার উদ্দেশ্য। আমরা নবীন সহযোগিনীর সুস্থ দেহ, পবিত্র মন ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

ভিখারিণী—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত ও কলিকাতা ৩৩ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাণী-প্রেসে মুদ্রিত এবং তথা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৲ মাত্র।

আজকাল বাঙ্গালায় কবিতার হাওয়া এমন নিশ্বাসরোধকর হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিতা-পুস্তক খুলিতেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মনে হয়, বুঝি কেবলই কতকগুলি প্রচলিত উপাদান লইয়া প্রাণহীন উচ্ছ্বাস অথবা আড়ম্বরময়ী ভাষার তাণ্ডব লীলা দেখিতে হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িতে গিয়া কিন্তু আমরা ইহার প্রথম কবিতাতেই প্রাণের স্পর্শ পাইলাম—বুঝিলাম, কবি নূতন গ্রন্থকার হইলেও প্রাণ তাঁহার সরল এবং হাত ও নেহাৎ কাঁচা নয়। গ্রন্থারম্ভেই "বিশ্বভিক্ষা" একস্থলে কবি বলিতেছেন—

"এস অগ্রসর হয়ে, এস দান লয়ে,
কাঙ্গালিনী দুয়ারে তোমার।
প্রসারিয়া বহু-বাহু সুকোমল করে,
মুছে ফেল অশ্রু বসুধার।"

এবং শেষে বলিতেছেন—

"আপনারে বিলাইয়া অপরের তরে
স্বর্গ সুখ করিবে অর্জ্জন;
হারিয়া জিনিবে তুমি, বাঁচিবে মরিয়া,
লভিবে যে নূতন জীবন।"

এইরূপে কবি "ভিখারিণী" বেশে মানব-হিতের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে ভিক্ষা করিতেছেন। সর্ব্বত্রই আশার বাণী। নৈরাশ্যের অবসাদ কোথাও নাই।

"ভিখারিণী" কখনও মহাপুরুষের স্তব করিয়াছেন, কখনও প্রকৃতির পুলক পীযূষে "আনন্দ" করিতেছেন, কখনও "বিশ্বযাত্রা" করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, কখনও মূকের বাণী শুনাইতেছেন। সকলই একটা সুন্দর, প্রশান্ত ও নিবিড় শান্তিরসে হৃদয় আর্দ্র হয়।

প্রচ্ছদ পত্রে ভগবানের প্রতীকস্বরূপ ওঁকারাত্মক সূর্য্যমণ্ডলের কাছে "ভিখারিণী" অঞ্জলি পাতিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। এই সাঙ্কেতিক চিত্রটীতে গ্রন্থখানির মর্ম্মবাণী সুব্যক্ত। পুস্তকখানির শোভন সজ্জায় কোন ত্রুটী নাই। কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপা পরিষ্কার, দামও অধিক নয়। সহৃদয় পাঠক-সমাজ গ্রন্থখানিকে সমাদরে গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। আমরা ভরসা করি, কবির বাণীপূজার নূতন-নূতন নৈবেদ্য মধ্যে মধ্যে পাইব।

সান্ ইয়াট্ সেন্ ও বর্ত্তমান চীন—শ্রীজ্যোতিষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ; ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক প্রাচীন ও বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান চীনের ইতিহাস ও রাষ্ট্র-আন্দোলন এবং স্বদেশপ্রেমিক সান্ ইয়াট্ সেনের পুণ্য জীবন কথা এই বইখানির মধ্যে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস কিছুই জানেন না—তাঁহারা শুধু এই একখানি বই পড়িলেই অল্পের মধ্যে অনেক কথাই জানিতে পারিবেন।

এই শ্রেণীর বই বাংলা ভাষায় যতই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। বর্ত্তমান চীনের ইতিহাস শৃঙ্খলিত পদানত জাতির মুক্তিপ্রয়াসের মঙ্গলময় কাহিনী। সকল দুর্ভাগা পরাধীন দেশের সকল নরনারীর বুকে এই বীরত্বপূর্ণ কাহিনী আশার পুণ্যপ্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া জ্বালাইয়া তুলিবে।

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। অন্যান্য ছবির সহিত চীনদেশের একখানি মানচিত্র থাকিলে পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইত। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক এ অসুবিধা দূর করিবেন।

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—শ্রীমতিলাল রায়, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমানযুগের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার জীবন ও শিক্ষার প্রভাবে যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার ফলে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ অদ্ভুত অগ্রসর লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যতে তাঁহার জীবন ও শিক্ষার প্রভাব আরও বাড়িবে বই কমিবে না। সুতরাং তাঁহার জীবনের কথা যত বেশী আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। সেই জন্যই আমরা আলোচ্য গ্রন্থখানি সাদরে বরণ করিতেছি।

পুস্তকখানিকে ঠিক জীবনচরিত বলা চলে না। ইহা কয়েকটী প্রবন্ধের সমষ্টি মাত্র। স্বামিজীর জীবনের প্রধান প্রধান প্রায় সকল ঘটনাই পুস্তকখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গ্রন্থকারের স্বভাবসিদ্ধ আবেগময়ী ভাষা এই গ্রন্থখানিতে চরমোৎকর্ষলাভ করিয়াছে। মনে হয় যেন হৃদয়ের সবখানি ঢালিয়া, অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উজাড় করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর মাতার চরিত্রের মাহাত্ম্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত স্বামীজীর গভীর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ অতি নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

স্বামিজীর মধ্যে যে অনন্ত তেজ, গভীর ঈশ্বরানুরাগ, বিপুল উৎসাহ ও অতুল স্বদেশপ্রেম ছিল, তাহা গ্রন্থকার পুস্তকের ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট প্রকটিত করিতে পারিয়াছেন।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে গ্রন্থকারের অনেক কথা আমাদের মনঃপূত হয় নাই। ৯ম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "যে দিন হইতে ঠাকুর সাধনার চাবী লুকাইলেন......সে দিন হইতে ভারতের সাধনার মোড় ফিরিয়াছে।" উল্লিখিত ঘটনার যে গভীর দার্শনিক অর্থ করা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় ভ্রমাত্মক, কারণ স্বামিজীর বক্তৃতাতেই দেখিতে পাই তিনি কোন সেবাধর্ম্মের অনুসরণ করিতেই বলেন নাই, প্রত্যেকে যাহাতে সকল প্রকার দুর্ব্বলতা জয় করিয়া ঈশ্বরের সহিত একাত্মানুভূতি লাভ করিয়া ঋষিত্বে উপনীত হয় ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। ১৯ পৃষ্ঠায় কামপ্রবৃত্তি দমন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "কভু তার কোথাও জয় নাই", স্বামিজীর ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ইহা চেষ্টা নহে, ইহা সংযম নহে, ইহা স্বভাব"—কিন্তু আমরা যতদূর জানি স্বামিজী কামদমনের শক্তি স্বতঃই লাভ করেন নাই, ইহার জন্য তাঁহাকে চেষ্টা ও সাধনা করিতে হইয়াছিল। ২৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি সেদিন শিথিল হইয়াছিল, রামমোহনের চেষ্টায় তাহা সুদৃঢ় হইয়াছে, ইহাও কি হিন্দুজাতি অস্বীকার করিতে

পারেন ?" মহাত্মা রামমোহনের প্রতি এই দেশের ঋণ আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু তিনি যে হিন্দুত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন বা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারিলাম না। 'মহর্ষি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন কি না' এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর যে বিবেকানন্দ মহর্ষির নিকট পান নাই তাহার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ইহা মহর্ষির ত্রুটি নহে", শ্রীরামকৃষ্ণ অলক্ষ্যে স্বামিজীকে আকর্ষণ করিতেছিলেন ইহাই তাহার কারণ—মহর্ষির যে বিবেকানন্দকে ঈশ্বরোপলব্ধি করাইবার ক্ষমতা ছিল না সে কথা গ্রন্থকার যেন স্বীকার করিতে চাহেন না।

স্বামিজীর ইংলণ্ড-প্রবাসের কথা অতি অল্পে সারা হইয়াছে—পণ্ডিত মোক্ষমূলারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা লণ্ডনে তিনি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। স্বামিজীর ইয়ুরোপ ভ্রমণ সম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ করা হয় নাই।

"যুগ পরিচয়" অধ্যায়টী "আবির্ভাব ও বাল্যজীবন" শীর্ষক অধ্যায়ের পূর্ব্বে দিলে সুসঙ্গত হইত। শেষোক্ত অধ্যায়ে স্বামিজীর যৌবনের কথা কিছু কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। "মহামিলন" অধ্যায়ের শেষ চারি প্যারাগ্রাফ এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট না হইলেই ভাল হইত।

পুস্তকখানিতে সাধক বিবেকানন্দের চরিত্র যেমন ফুটান হইয়াছে যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের চরিত্র তেমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয় নাই।

কি হিসাবে স্বামিজীর বাণী কেবল ভারতের পক্ষে নয়, জগতের অন্যান্য সকলদেশের পক্ষেও মঙ্গলজনক, সে বিষয়ে একটু বিশদ আলোচনা থাকিলে ভাল হইত।

দোষ ত্রুটি থাকিলেও বইখানি স্বামিজীর জীবনের অনেক কথা বুঝিতে সাহায্য করিবে। বই খানির বাঁধান ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

জ্যৈষ্ঠে

সুভাষচন্দ্রের মুক্তি ঃ—সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের কৃতী সন্তানেরা যাঁহাদের ক্ষমতার দুর্গে গচ্ছিত ছিলেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া সুভাষচন্দ্রকে দেশের হাতে ফিরাইয়া দিয়াছেন। চেহারা দেখিয়া দেশের লোকে বুঝিয়াছে, সুভাষচন্দ্রই ফিরিয়া আসিয়াছেন, তবে ঠিক যাহা গচ্ছিত ছিল তাহাই কি আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি ? উৎসাহী কর্ম্মক্ষম ও প্রফুল্ল তরুণ জীবনের সেই স্বাস্থ্য কই ? স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে বলিয়াই যদি সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তবে বহু পূর্ব্বে যখন তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হয় তখনই এই কৃপার ব্যবস্থা হইল না কেন ? আমাদের এই প্রশ্ন ক্ষমতাশীলদের কাছে কোন উত্তর পাইবার প্রত্যাশায় নয়,—মনের ক্ষোভে নিজেদের মধ্যেই উহার আলোচনা করিতেছি। যে পাপ সুভাষচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে ছিল তাঁহার বাল্যে যাহা এদেশে ছিল এখনও যাহা লুপ্ত হয় নাই, তাহা যে সুভাষচন্দ্র মুক্ত থাকিলেই বাড়িত, ইহা কি যথার্থই কেহ ভাবিয়াছিলেন, না কেবল সুভাষচন্দ্রকেই দণ্ডিত করিবার জন্যই তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল ! আমাদের প্রশ্নের উত্তর তিনিই জানেন যিনি সকল রাষ্ট্রলীলার নিয়ন্তা।

মুসলমান ও অ-মুসলমান ঃ—একদিকে সুচিহ্নিত মুসলমান সম্প্রদায় আর অন্যদিকে বাদ বাকী দেশের লোক, যাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক নামে অভিহিত হইতে পারে না। দেশের স্বার্থে সকলে এক সঙ্গে মিলিতে পারেন, কেবল মুসলমান ও অ-মুসলমানে মিলন হওয়া কঠিন, ইহাই হইয়াছে আমাদের প্রধান সমস্যা। সার আবদার রহিম স্পষ্ট ভাষায় আলিগড়ে

যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ভুলিলে চলিবে না। সকল রকমের আচার-ব্যবহারে, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঐতিহ্যে মুসলমানেরা অন্য সকল সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর সেই কারণে নাকি মুসলমানদের স্বার্থ দেশের অন্য সকলের স্বার্থের অনুরূপ নয়। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্মমত বা সামাজিক রীতি পালন করেন না, তাঁহারা প্রাচীনকে আপনাদের পিতৃপুরুষদের প্রাচীন বলিয়াই মানিয়া চলেন, কিন্তু এদেশের যে-কোন শ্রেণীর লোক মুসলমান হইলে আর স্বীকার করেন না যে, তাঁহার উৎপত্তি এদেশের প্রাচীন 'কাফের'দের বংশে। ইউরোপের সকল দেশের লোকই খ্রীষ্টান, কিন্তু কোন দেশের লোকেরাই তাঁহাদের প্রাচীন 'হিদেন'-বংশের উৎপত্তি ও প্রাচীন 'হিদেন'-যুগের ঐতিহ্য অস্বীকার করেন না; তাঁহাদের যুগের ভাষায় ও সাহিত্যে জুপিটার, এপলো, জুনো প্রভৃতির নামের উল্লেখ ও উপমা অশোভন বা জাতীয়ত্বের বিরোধী হয় না: 'হিদেনযুগের' নামে আপনাদের নামকরণ করাও পাপের কাজ হয় না। কোন মুসলমান কিন্তু উৎপত্তিতে হিন্দুকুলের লোক হইলেও ঋষিদের নামের গৌরব করেন না, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গৌরবে আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন না ও করিম, রহমান প্রভৃতি বিদেশী ভাষার শব্দের পরিবর্ত্তে 'মহিমা' 'করুণা' প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা পাপ মনে করেন। এদেশের প্রতি যাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ তাঁহারা অকপটে কিছুতেই অমুসলমানদের সঙ্গে মিলিতে পারেন না। দুই একটা স্বার্থের লোভ দেখাইয়া কোন রকমে যাহারা গোঁজামিল দিয়া মুসলমানকে লইয়া দল বাঁধিতে চান, তাঁহাদের বুদ্ধির ও নীতির প্রশংসা করা চলে না। মিথ্যার ভিত্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা অতি অসার যোগ। মুসলমানদের কথা দূরে থাকুক, যদি নিজেদের দলের লোকের মধ্যে অথবা যদি নিজের পরিবারের লোকেদের মধ্যে অমিলন ও বিরোধ ঘটে, সেখানেও ফাঁকি বা গোঁজামিল দিয়া মিলন ঘটান অসম্ভব। এ সম্পর্কে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের দীর্ঘ আলোচনা ও ব্যাখ্যা এখানে সম্ভবপর নয়। যে যাহার নিজের কর্ত্তব্য নিজের জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে করিলে চলিবে ও ধীরভাবে আপনার মত প্রচার করিবে; এ পদ্ধতিতে চলিলে তাড়াতাড়ি একটা বড় দল গড়া অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে তাড়াতাড়িতে ও কোলাহলে কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ হয় না। চালাকী ও ফাঁকির নীতি ছাড়িয়া অকপটে কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিলে সকল শ্রেণীর লোকেরাই স্থির বুদ্ধিতে যথার্থ হিতের পথ দেখিতে পাইবেন ও অজ্ঞাতে বিদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবেন।

ফিউডেটরী রাজ্যগুলি সম্বন্ধে নূতন প্রস্তাব ঃ—এদেশের ফিউডেটরী রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে, আর সুপ্রতিষ্ঠিত সন্ধির নিয়মে ঐ রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপিত। এই রাজ্যগুলির অধিপতিরা মিলিয়া এখন যে নরেন্দ্র-মণ্ডল গড়িয়াছেন, উহার একটি বিশেষ অধিবেশনে এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, একটি সরকারি কমিসন বসিয়া নির্দ্দিষ্ট হোক যে রাজাদের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক সুনির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য কি কি কাজ করা উচিত। নরেন্দ্র-মণ্ডলের সকল রাজারা এইরূপ কমিসন বসিবার পক্ষপাতি নন, তাই কয়েকজন রাজা বিলাতে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া দক্ষ আইনজ্ঞের মত জানিতে চান যে, ঐরূপ কমিসন বসিলে তাঁহাদের স্বত্বে ও অধিকারে বাধা পড়িবে কি না। আইন অনুসারে ফিউডেটরী রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে হইলেও ফিউডেটরী রাজ্যের অধিবাসীরা আমাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত ও সেখানকার লোকের

উন্নতির ও অবনতির সহিত আমাদের উন্নতি ও অবনতি গ্রথিত। ব্রিটিশ ভারতে আমরা স্বরাজ্য স্থাপনের দাবী করিতেছি ; এ সময়ে যে ফিউডেটরী রাজ্যগুলিতে দেশীয় প্রাচীন রীতিতে শাসন চলিতেছে সেখানকার স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আমরা তাহা চাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের সময় ফিউডেটরী রাজাগুলি যে সন্ধির নিয়মে আবদ্ধ হইয়াছিল কিছুতেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যায় না। ঐ সন্ধির পত্রগুলি এটিসন্ সাহেবের সন্ধিপত্র-সংগ্রহ-গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন ব্যবহারে কোন ফিউডেটরী রাজ্যে অনধিকার চর্চ্চা হইয়া থাকে, তবে নির্দ্দিষ্টভাবে সেই বিষয়টী বা বিষয় গুলি উল্লিখিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন হওয়া উচিত, আর সেই বিচারের জন্য রাজারা আপনাদের পক্ষ হইতে কয়েকজন আইনজ্ঞ বিচারক মনোনীত করিতে পারেন, কিন্তু সরকারী একটি কমিসন বসিয়া ফিউডেটরি রাজ্যের অবস্থা বিচারিত হইলে সন্ধির নিয়মে রাজাদের অধিকারে বাধা পড়ে মনে করি।

শোক-সংবাদ ঃ -অল্পদিন হইল প্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ পার্জিটর সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। পার্জিটর ভারতের সিভিল সার্ভিসের লোক ছিলেন ও কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে থাকিবার সময় তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে সংস্করণ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই এখন মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণগুলিতে যে সকল ভৌগোলিক নাম পাওয়া যায় সেগুলির স্থিতি নির্দ্দেশের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন ও সুফল পাইয়াছেন, তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে পারিব না। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও ক্ষত্রিয় সাহিত্য স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করিয়া তিনি প্রাচীন সমাজের অবস্থা ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসী ছিলেন। কলি-সংবৎসরের বিচার করিয়া ভারত-সভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে পার্জিটর সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখন পণ্ডিত-সমাজে আলোচিত হইতেছে। পার্জিটরের মৃত্যুতে আমরা একজন নিপুণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হারাইলাম।

Editor: Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road, Cal.

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৩৩৩-'৩৪

আষাঢ়

প্রথমার্দ্ধ
৫ম সংখ্যা

সতী

(১)

হরিশ পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত ভাল উকিল। কেবল ওকালতি হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবেও বটে। দেশের সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিতই সে অল্প-বিস্তর সংশ্লিষ্ট। সহরের কোন কাজই তাহাকে বাদ দিয়া হয় না। সকালে "দুর্নীতি-দমন" সমিতির কার্য্যকরী সভার একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেছে, এখন কোন মতে দুটি খাইয়া লইয়া আদালতে পৌঁছিতে পারিলে হয়। বিধবা ছোটবোন উমা কাছে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিল পাছে বেলার অজুহাতে খাওয়ার ত্রুটি হয়।

স্ত্রী নির্ম্মলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অদূরে উপবেশন করিল, কহিল, কালকের কাগজে দেখ্‌লাম আমাদের লাবণ্যপ্রভা আস্‌ছেন এখানকার মেয়ে-স্কুলের ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস হয়ে।

এই সহজ কথা কয়টির ইঙ্গিত অতীব গভীর।

উমা চকিত হইয়া কহিল, সত্যি নাকি? তা' লাবণ্য নাম এমন ত কত আছে বৌদি।

নির্ম্মলা বলিল, তা' আছে। ওঁকে জিজ্ঞেসা করচি।

হরিশ মুখ তুলিয়া সহসা কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি জানবো কি ক'রে শুনি? গভর্ণ্মেণ্ট কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে লোক বাহাল করে নাকি?

স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিল, আহা, রাগ কর কেন, রাগের কথা ত বলিনি। তোমার তদ্বির তাগাদায় যদি কারও উপকার হয়ে থাকে সে তো আহ্লাদের কথা। এই বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি মন্থর মৃদুপদে বাহির হইয়া গেল।

উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, আমার মাথা খাও দাদা উঠোনা—উঠোনা—

হরিশ বিদ্যুৎ-বেগে আসন ছাড়িয়া উঠিল, নাঃ—শান্তিতে এক মুঠো খাবারও যো নেই! উঃ। আত্মঘাতী না হলে আর—

বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। যাবার পথে স্ত্রীর মধুর কণ্ঠ কানে গেল, তুমি কোন্ দুঃখে আত্মঘাতী হবে? যে হবে সে একদিন জগৎ দেখ্‌বে।

এইখানে হরিশের একটু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলা প্রয়োজন। এখন তাহার বয়স চল্লিশের কম নয়, কিন্তু কম যখন সত্যই ছিল সেই পাঠ্যাবস্থার একটু ইতিহাস আছে। পিতা রামমোহন তখন বরিশালের সবজজ, হরিশ এম্, এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে কলিকাতার মেস্ ছাড়িয়া বরিশালে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিবেশী ছিলেন হরকুমার মজুমদার। স্কুল-ইন্সপেক্টর। লোকটি নিরীহ, নিরহঙ্কার এবং অগাধ পণ্ডিত। সরকারী কাজে ফুরসৎ পাইলে এবং সদরে থাকিলে মাঝে মাঝে আসিয়া সদরআলা বাহাদুরের বৈঠকখানায় বসিতেন। অনেকেই আসিতেন। টাক-ওয়ালা মুন্সেফ, দাড়ি-ছাঁটা ডেপুটি, মহাস্থবির সরকারী উকিল এবং সহরের অন্যান্য মান্য-গণ্যের দল সন্ধ্যার পরে কেহই প্রায় অনুপস্থিত থাকিতেন না। তাহার কারণ ছিল। সদরআলা নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। অতএব, আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হইত ধর্ম্ম সম্বন্ধে। এবং যেমন সর্ব্বত্র ঘটে, এখানেও তেমনি আধ্যাত্ম-তত্ত্বকথার শাস্ত্রীয় মীমাংসা সমাধা হইত খণ্ড-যুদ্ধের অবসানে। সেদিন এমনি একটা লড়াইয়ের মাঝখানে হরকুমার তাঁহার বাঁশের ছড়িটি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কোনদিন তিনি কোন অংশ গ্রহণ করিতেন না। নিজে ব্রাহ্ম-সমাজ ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই হৌক, অথবা শান্ত মৌন-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই হোক, চুপ করিয়া শোনা ছাড়া গায়ে পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিবার চঞ্চলতা তাঁহার একটি দিনও প্রকাশ পায় নাই। আজ কিন্তু অন্যরূপ ঘটিল। তিনি ঘরে ঢুকিতেই টাক-ওয়ালা মুন্সেফ বাবু তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিলেন। এইবার ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া তিনি কোথায় যেন এই লোকটির ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের একটা জনরব শুনিয়া আসিয়াছিলেন। হরকুমার স্মিতহাস্যে সম্মত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ মাত্র সম্বল করিয়া ইঁহার সহিত তর্ক চলেনা। সবাই খুসি হইলেন, হইলেন না শুধু সব-জজ বাহাদুর নিজে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জাতি দিয়াছে তাহার আবার শাস্ত্রজ্ঞান কিসের জন্য? এবং বলিলেনও ঠিক তাই। সকলে উঠিয়া গেলে তাহার পরম প্রিয়

সরকারী উকিলবাবুকে চোখের ইঙ্গিতে হাসিয়া কহিলেন, শুন্‌লেন ত ভাদুড়ী মশাই। ভূতের মুখে রাম নাম আর কি!

ভাদুড়ী ঠিক সায় দিতে পারিলেন না, কহিলেন, তা' বটে। কিন্তু জানে খুব। সমস্ত যেন মুখস্ত। আগে মাস্টারি কোর্‌ত কিনা।

হাকিম প্রসন্ন হইলেন না। বলিলেন, ও জানার মুখে আগুন। এরাই হ'ল জ্ঞান পাপী। এদের আর মুক্তি নেই।

হরিশ সেদিন চুপ করিয়া একধারে বসিয়াছিল। এই স্বল্প-ভাষী প্রৌঢ়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং, পিতার অভিমত যাহাই হোক, পুত্র তাহার আসন্ন পরীক্ষা-সমুদ্র হইতে মুক্তি পাইবার ভরসায় তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল। সাহায্য করিতে হইবে। হরকুমার সম্মত হইলেন। এইখানে তাঁহার কন্যা লাবণ্যর সহিত হরিশের পরিচয় হইল। সেও আই. এ. পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে কলিকাতার গণ্ডগোল ছাড়িয়া পিতার কাছে আসিয়াছিল। সেইদিন হইতে প্রতিদিনের আনাগোনায় হরিশ পাঠ্যপুস্তকের দুরূহ অংশের অর্থই শুধু জানিল না, আরও একটা জটিল-তর বস্তুর স্বরূপ জানিয়া লইল যাহা তত্ত্ব হিসাবে ঢের বড়। কিন্তু সে কথা এখন থাক্‌। ক্রমশঃ, পরীক্ষার দিন কাছে ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল, হরিশ কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষা সে ভালই দিল, এবং ভাল করিয়াই পাশ করিল।

কিছুকাল পরে আবার যখন দেখা হইল হরিশ সমবেদনায় মুখ কালি করিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ফেল কর্‌লেন যে বড়?

লাবণ্য কহিল, এ-টুকুও পারলনা আমি এতই অক্ষম?

হরিশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যা' হবার হয়েছে, এবার কিন্তু খুব ভাল করে একজামিন দেওয়া চাই।

লাবণ্য কিছুমাত্র লজ্জা পাইল না, বলিল, খুব ভাল করে দিলেও আমি ফেল হব। ও আমি পার্‌বনা।

হরিশ অবাক্‌ হইল, জিজ্ঞাসা করিল, পারবেন না কি রকম?

লাবণ্য জবাব দিল, কি রকম আবার কি? এম্‌নি। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ, কথাটা হরিশের মাতার কানে গেল।

সেদিন সকালে রামমোহনবাবু মকদ্দমার রায় লিখিতেছিলেন। যে দুর্ভাগা হারিয়াছে-তাহার আর কোথাও কোন কূল-কিনারা না থাকে এই শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে রায়ের মুসাবিদায় বাছিয়া বাছিয়া শব্দ যোজনা করিতেছিলেন, গৃহিণীর মুখে ছেলের কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার মাথায় আগুন ধরিয়া গেল। হরিশ নরহত্যা করিয়াছে শুনিলেও বোধকরি তিনি এতখানি

বিচলিত হইতেন না! দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কি! এত বড়— ! ইহার অধিক কথা তাঁহার মুখে আর যোগাইল না।

দিনাজপুরে থাকিতে একজন প্রাচীন উকিলের সহিত তাঁহার শিখার গুচ্ছ, গীতার মর্ম্মার্থ ও পেন্সনান্তে ৺কাশীবাসের উপকারিতা লইয়া অত্যন্ত মতের মিল ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল; একটা ছুটির দিনে গিয়া তাঁহারই ছোট মেয়ে নির্ম্মলাকে আর একবার চোখে দেখিয়া ছেলের বিবাহের পাকা কথা দিয়া আসিলেন।

মেয়েটি দেখিতে ভাল; দিনাজপুরে থাকিতে গৃহিণী তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তথাপি স্বামীর কথা শুনিয়া গালে হাত দিলেন, বল কি গো, একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলে? আজকালকার ছেলে—

কর্ত্তা কহিলেন, কিন্তু আমি ত আজকালকার বাপ নই? আমি আমার সেকেলে নিয়মেই ছেলে মানুষ করতে পারি। হরিশের পছন্দ যদি না হয় তা'কে আর কোন উপায় দেখ্‌তে বোলো।

গৃহিণী স্বামীকে চিনিতেন, তিনি নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

কর্ত্তা পুনশ্চ বলিলেন, মেয়ে ডানা-কাটা পরী না হোক্ ভদ্রঘরের কন্যা। সে যদি তার মায়ের সতীত্ব আর বাপের হিঁদুয়ানী নিয়ে আমাদের ঘরে আসে, তাই যেন হরিশ ভাগ্য বলে মানে।

খবরটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। হরিশও শুনিল। প্রথমে সে মনে করিল, পলাইয়া কলিকাতায় গিয়া, কিছু না জুটে, টিউশনি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। পরে ভাবিল সন্ন্যাসী হইবে। শেষে, পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

কন্যার পিতা ঘটা করিয়া পাত্র দেখিতে আসিলেন, এবং আশীর্ব্বাদের কাজটাও এই সঙ্গে সারিয়া লইলেন। সভায় সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, নিরীহ হরকুমার কিছু না জানিয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষে রায় বাহাদুর ভাবী বৈবাহিক মৈত্র মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন, এবং ইংরাজি শিক্ষার সংখ্যাতীত দোষ কীর্ত্তন করিয়া অনেকটা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে হাজার টাকা মাহিনার চাকুরী দেওয়া ব্যতীত ইংরাজের আর কোন গুণ নাই। আজকাল দিন-ক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে, ছেলেদের ইংরাজি না পড়াইলে চলে না, কিন্তু যে-মূর্খ এই স্লেচ্ছ বিদ্যা ও স্লেচ্ছ সভ্যতা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে টানিয়া আনে তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

একা হরকুমার ভিন্ন ইহার নিগূঢ় অর্থ কাহারও অবিদিত রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল, এবং যথাকালে শুভকর্ম্ম সমাধা হইতেও বিঘ্ন ঘটিল না। কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইবার প্রাক্কালে তাহার সতী-সাধ্বী মাতাঠাকুরাণী বধূ-জীবনের চরম তত্ত্বটি মেয়ের কানে দিলেন, বলিলেন, মা, পুরুষ মানুষকে চোখে চোখে না রাখ্‌লেই সে গেল।

সংসার করতে আর যা-ই কেননা ভোল কখনো এ কথাটি ভুলোনা। তাঁহার নিজের স্বামী টিকির গোড়া ও শ্রীগীতার মর্ম্মার্থ লইয়া মাতিয়া উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনেক জ্বালাইয়াছেন। আজিও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, মৈত্র বুড়া চিতায় শয়ন না করিলে আর তাঁহার নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই।

নির্ম্মলা স্বামীর ঘর করিতে আসিল এবং সেই ঘর আজ বিশ বর্ষ ধরিয়া করিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালে কত পরিবর্ত্তন, কত কি ঘটিল। রায় বাহাদুর মরিলেন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মৈত্র গতাসু হইলেন, লেখাপড়া সাঙ্গ হইলে লাবণ্যর অন্যত্র বিবাহ হইল, জুনিয়ার উকিল হরিশ সিনিয়ার হইয়া উঠিলেন, বয়স তাহার যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পড়িল, কিন্তু নির্ম্মলা আর তাহার মাতৃদত্ত মন্ত্র এ জীবনে ভুলিল না।

(২)

এই সজীব মন্ত্রের ক্রিয়া যে এত সত্বর সুরু হইবে তাহা কে জানিত। রায়বাহাদুর তখনও জীবিত, পেন্সন লইয়া পাবনার বাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন। হরিশের এক উকিল বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন ভাল কীর্ত্তন-ওয়ালী আসিয়াছিল, সে দেখিতে সুশ্রী এবং বয়স কম। অনেকেরই ইচ্ছা ছিল কাজ-কর্ম্ম অন্তে একদিন ভাল করিয়া তাহার কীর্ত্তন শুনা। পরদিন হরিশের গান শুনিবার নিমন্ত্রণ হইল; শুনিয়া বাড়ী ফিরিতে একটু-অধিক রাত্রি হইয়া গেল।

নির্ম্মলা উপরের খোলা বারান্দায় রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, স্বামীকে উপরে উঠিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, গান লাগ্‌লো কেমন?

হরিশ খুসি হইয়া কহিল, খাসা গায়।

দেখ্‌তে কেমন?

মন্দ না, ভালই।

নির্ম্মলা কহিল, তা'হলে রাতটা একেবারে কাটিয়ে এলেই ত পারতে!

এই অপ্রত্যাশিত কুৎসিত মন্তব্যে হরিশ ক্রুদ্ধ হইবে কি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, কি রকম?

নির্ম্মলা সক্রোধে বলিল, রকম ভালই। আমি কচি খুকি নই, জানি সব, বুঝি সব। আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি? আচ্ছা—

উমা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সভয়ে কহিল, তুমি কোর্‌চ কি বউদি, বাবা শুন্‌তে পাবেন যে?

নির্ম্মলা জবাব দিল, পেলেনই বা শুন্‌তে! আমি ত চুপি চুপি কথা কইচিনে!

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে সে উমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু পাছে তাহার উচ্চস্বরে বৃদ্ধ পিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে সে পরক্ষণেই জোড়-হাতে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় মিনতি করিয়া কহিল, রক্ষে কর বৌদি, এত রাত্রে চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারি কোরোনা।

বধূর কণ্ঠস্বর ইহাতে বাড়িল বই কমিল না, কহিল, কিসের কেলেঙ্কারি! তুমি বল্‌বেনা কেন ঠাকুরঝি, তোমার বুকের ভেতরটা ত আর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছেনা! বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

হরিশ কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে নীচে আসিয়া বাকি রাতটুকু মক্কেলদের বসিবার বেঞ্চের উপর শুইয়া কাটাইল। অতঃপর, দিন দশেকের মত উভয়ের বাক্যালাপ স্থগিত হইয়া গেল।

কিন্তু, হরিশকেও আর সন্ধ্যার পরে বাহিরে পাওয়া যায়না। গেলেও তাহার শঙ্কাকুল ব্যাকুলতা লোকের হাসির বস্তু হইয়া উঠিল। বন্ধুরা রাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হরিশ, যত বুড়ো হচ্চো, রোগও যে তত বেড়ে যাচ্চে হে?

হরিশ অধিকাংশ স্থলেই জবাব দিতনা, কেবল খোঁচা বেশি করিয়া বিঁধিলেই বলিত, এই ঘেন্নায় আমাকে যদি তোমরা ত্যাগ করতে পারো ত তোমরাও বাঁচো আমিও বাঁচি।

বন্ধুরা কহিতেন, বৃথা! বৃথা! ওকে লজ্জা দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই লজ্জায় মরি।

(৩)

সেবার বসন্ত রোগে লোক মরিতে লাগিল খুব বেশি। হরিশকেও রোগে ধরিল। কবিরাজ আসিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন, কহিলেন, মারাত্মক। রক্ষা পাওয়া কঠিন।

রায়বাহাদুর তখন পরলোকে। হরিশের বৃদ্ধা মাতা আছাড় খাইয়া পড়িলেন, নির্ম্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই আমার নোয়া সিঁদুর ঘুচোবে সাধ্যি কার? তোমরা ওঁকে দেখো আমি চললুম। এই বলিয়া সে শীতলার মন্দিরে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িল। কহিল, উনি বাঁচেন ত আবার বাড়ী ফিরবো, নইলে এইখান থেকেই ওঁর সঙ্গে যাবো।

সাতদিনের মধ্যে কেহ তাহাকে জল পর্য্যন্ত খাওয়াইতে পারিল না।

কবিরাজ আসিয়া বলিলেন, মা, তোমার স্বামী আরোগ্য হয়েছেন, এবার তুমি ঘরে চল।

লোকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা পায়ের ধূলা লইল, তাহার মাথায় থাবা থাবা সিঁদুর ঘষিয়া দিল, কহিল, মানুষ ত নয়, যেন সাক্ষাৎ মা—। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সাবিত্রীর উপাখ্যান মিথ্যে, না কলিতে ধর্ম্ম গেছে বললেই একেবারে ষোলো আনা গেছে? যমের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

বন্ধুরা লাইব্রেরি ঘরে বলাবলি করিতে লাগিল, সাধে আর মানুষে স্ত্রীর গোলাম হয় হে! বিয়ে ত আমরাও করেছি, কিন্তু এমন নইলে আর স্ত্রী! এখন বোঝা গেল কেন হরিশ সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকতনা।

বীরেন উকীল ভদ্রলোক, গত বৎসর ছুটিতে কাশী গিয়া সে সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র লইয়া আসিয়াছে, টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত করিয়া কহিল, আমি জানতাম হরিশ সহজেই পারে না।

সত্যিকার সতীত্ব জিনিসটা কি সোজা ব্যাপার হে ? বাড়ী থেকে বলে গেল যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই ত—উঃ ! শরীর শিউরে ওঠে।

তারিণী চাটুয্যের বয়স হইয়াছে, একধারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক খাইতেছিলেন, হুঁকাটা বেহারার হাতে দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, শাস্ত্রমতে সহধর্ম্মিণী কথাটা ভারি শক্ত। আমার দেখনা কেবল মেয়েই সাতটা। বিয়ে দিতে দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম।

অনেকদিন পরে ভাল হইয়া আবার যখন হরিশ আদালতে উপস্থিত হইল তখন কত লোকে যে তাহাকে অভিনন্দিত করিল তাঁহার সংখ্যা নাই !

ব্রজেন্দ্র বাবু সখেদে কহিলেন, ভাই হরিশ, স্ত্রৈণ বলে তোমাকে অনেক লজ্জা দিয়েছি মাপ কোরো। লক্ষ কেন, কোটী কোটীর মধ্যেও তোমার মত ভাগ্যবান নেই, তুমি ধন্য।

ভক্ত বীরেন বলিল, সীতা সাবিত্রীর কথা না হয় ছেড়ে দাও, কিন্তু, খনা, লীলাবতী, গার্গী আমাদের দেশেই জন্মেছিলেন। ভাই, স্বরাজ ফরাজ যাইই বল, কিছুতেই কিছু হবেনা মেয়েদের যত দিন না আবার তেমনি তৈরি করতে পারবো। আমার ত মনে হয় শীঘ্রই পাবনায় একটা আদর্শ-নারী-শিক্ষা সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এবং যে আদর্শ মহিলা তার পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট হবেন তাঁর নাম ত আমরা সবাই জানি।

বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে বলিলেন, সেই সঙ্গে একটা পণ-প্রথা নিবারণী সমিতিও হওয়া আবশ্যক। দেশটা ছারখার হয়ে গেল।

ব্রজেন্দ্র কহিলেন, হরিশ, তোমার ত ছেলেবেলায় খাসা লেখার হাত ছিল, তোমার উচিত তোমার এই রিকভারি সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখে আনন্দ বাজার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া।

হরিশ কোন কথারই জবাব দিতে পারিল না কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

(৪)

মৃত জমিদার গোঁসাইচরণের বিধবা পুত্রবধূর সহিত তাঁহার অন্যান্য পুত্রদের বিষয় সংক্রান্ত মামলা বাধিয়াছিল। হরিশ ছিল বিধবার উকিল। জমিদারের আমলা কে যে কোন্ পক্ষে, জানা কঠিন বলিয়া গোপন পরামর্শের জন্য বিধবা নিজেই ইতিপূর্ব্বে দুই একবার উকিলের বাড়ী আসিয়াছিলেন। আজ সকালেও তাঁহার গাড়ী আসিয়া হরিশের সদর দরজায় থামিল। হরিশ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নিজের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইলেন। আলোচনা পাছে ও-ঘরে মুহুরির কানে যায় এই ভয়ে উভয়েই সাবধানে ধীরে ধীরে কথা কহিতেছিলেন। বিধবার কি একটা অসংলগ্ন প্রশ্নে হরিশ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিবার চেষ্টা করিতেই পাশের ঘরে পর্দ্দার আড়াল হইতে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠের শব্দ আসিল,—আমি সব শুনেচি !

বিধবা চমকিয়া উঠিল, হরিশ লজ্জা ও শঙ্কায় কাঠ হইয়া গেল।

এক জোড়া অতি-সতর্ক চক্ষু কর্ণ যে তাহাকে অহরহ পাহারা দিয়া আছে, এ কথা সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়াছিল।

পর্দ্দা ঠেলিয়া নির্ম্মলা রণমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিল, হাত নাড়িয়া কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া দিয়া কহিল, ফুস্ ফুস্ ক'রে কথা ক'য়ে আমাকে ফাঁকি দেবে? মনেও কোরোনা। কই, আমার সঙ্গে ত কখনো এমন হেসে কথা কইতে দেখিনি!

অভিযোগ নিতান্ত মিথ্যা নয়।

বিধবা সভয়ে কহিল, এ কি কাণ্ড হরিশবাবু?

হরিশ মূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পাগল।

নির্ম্মলা কহিল, পাগল? পাগলই বটে। কিন্তু করলে কে শুনি? এই বলিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া সহসা হাঁটু গাড়িয়া বিধবার পায়ের কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল। মুহুরি খাতা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, একজন জুনিয়ার উকিল সেইমাত্র আসিয়াছিল সে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, বোস্ কোম্পানির বিল-সরকার তাহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতে লাগিল, এবং তাহাদেরই চোখের সম্মুখে নির্ম্মলা মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—আমি সব জানি! আমি সব বুঝি! থাকো, তোমরাই সুখে থাকো। কিন্তু সতী মায়ের সত্য কন্যা যদি হই, যদি মনে-জ্ঞানে এক বই না দুই জেনে থাকি, যদি—

এদিকে, বিধবা নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিল, এ কি ব্যাপার হরিশ বাবু! এ কি দুর্নাম দেওয়া,—এ কি আমার—

হরিশ কাহারও কোন প্রতিবাদ করিল না। অধোমুখে দাঁড়াইয়া শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী দ্বিধা হওনা কিসের জন্য?

লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে সেদিন হরিশ সেই ঘরেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, আদালতে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না। মধ্যাহ্নে উমা আসিয়া বহু সাধ্য সাধনা এবং মাথার দিব্য দিয়া কিছু খাওয়াইয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বামন ঠাকুর রূপার বাটীতে করিয়া খানিকটা জল আনিয়া পায়ের কাছে রাখিল। হরিশের প্রথমে ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া আজও পায়ের বুড়া আঙুলটা ডুবাইয়া দিল। স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া নির্ম্মলা কোন দিন জল স্পর্শ করিত না।

রাত্রে বাহিরের ঘরে একাকী শয়ন করিয়া হরিশ ভাবিতেছিল তাহার এই দুঃখময় দুর্ভর জীবনের অবসান হইবে কবে? এমনি অনেকদিন অনেক রকমেই ভাবিয়াছে কিন্তু তাহার এই সতী স্ত্রীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের সুদুঃসহ নাগপাশের বাঁধন হইতে মুক্তির কোন পথই তাহার চোখে পড়ে নাই।

(৫)

বছর দুই গত হইয়াছে। নির্ম্মলা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে খবরের কাগজের খবর ঝুটা নয়। লাবণ্য যথার্থ ই পাবনার মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হইয়া আসিতেছে।

আজ হরিশ একটু সকাল সকাল আদালত হইতে ফিরিয়া ছোট বোন উমাকে জানাইল যে, রাত্রের ট্রেণে তাহাকে বিশেষ জরুরি কাজে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ফিরিতে বোধ হয় দিন চারেক বিলম্ব হইবে। বিছানা এবং প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় যেন চাকরকে দিয়া ঠিক করিয়া রাখা হয়।

দিন পনেরো হইল স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল।

রেলওয়ে ষ্টেশন দূরে,—রাত্রি আটটার মধ্যেই মোটরে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সন্ধ্যার পরে সে মকদ্দমার দরকারী কাগজ-পত্র হ্যাণ্ডব্যাগে গুছাইয়া লইতেছিল, নির্ম্মলা আসিয়া প্রবেশ করিল।

হরিশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

নির্ম্মলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আজ কলকাতায় যাচ্চো নাকি ?

হরিশ কহিল, হুঁ।

কেন ?

কেন আবার কি ? মক্কেলের কাজ,—হাইকোর্টে মকদ্দমা আছে।

চলনা, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

তুমি যাবে ? গিয়ে কোথায় থাক্‌বে শুনি ?

নির্ম্মলা কহিল, যেখানে হোক্। তোমার সঙ্গে গাছতলায় থাকতেও আমার লজ্জা নেই।

কথাটি ভাল, এবং সতী স্ত্রীরই উপযুক্ত। কিন্তু হরিশের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিল। কহিল, তোমার লজ্জা না থাক্ আমার আছে। আমি গাছতলার পরিবর্ত্তে আপাততঃ কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠ্‌বো স্থির করেছি।

নির্ম্মলা বলিল, তা হলে ত ভালই হ'ল। তাঁর বাড়ীতেও স্ত্রী আছে ছেলে-মেয়ে আছে, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

হরিশ কহিল, না, সে হবে না। বলা নেই কহা নেই,—বিনা আহ্বানে পরের বাড়ী তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমি উঠ্‌তে পারব না।

নির্ম্মলা বলিল, পারবে না সে জানি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যর ওখানে ওঠা যায় না।

হরিশ ক্ষেপিয়া গেল। হাত-মুখ নাড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, তুমি যেমন নোংরা, তেম্‌নি মন্দ। সে বিধবা, ভদ্র মহিলা, আমিই বা সেখানে যাবো কেন, সেই বা আমাকে যেতে বল্‌বে কেন ? তা'ছাড়া, আমার সময় বা কই ? কলকাতায় গিয়ে পরের কাজে ত নিশ্বাস ফেলবারও ফুরসৎ পাবো না।

পারে গো পারে। এই বলিয়া নির্ম্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিন তিনেক পরে হরিশ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে স্ত্রী কহিল, চার পাঁচ দিন বলে গেলে, তিন দিনেই ফিরে এলে যে বড়?

হরিশ কহিল, কাজ চুকে গেল, চলে এলাম।

নির্ম্মলা জোর করিয়া একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি?

হরিশ কহিল, না।

নির্ম্মলা অতিশয় ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতাতেই যদি গেলে একবার খবর নিলে না কেন?

হরিশ জবাব দিল, সময় পাইনি।

অত কাছাকাছি গেলে,—সময় একটুখানি করে নিলেই হতো। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার মাসখানেক পরে একদিন আদালতে বাহির হইবার সময়ে হরিশ ভগিনীকে ডাকিয়া কহিল, আজ আমার ফিরতে বোধকরি একটু রাত হয়ে যাবে উমা।

কেন দাদা?

উমা কাছেই ছিল, আস্তে বলিলেই চলিত, কিন্তু কণ্ঠস্বর উঁচুতে চড়াইয়া হরিশ উত্তর দিল, যোগীন বাবুর বাড়ীতে একটা জরুরি পরামর্শ আছে,—দেরি হ'য়ে যেতে পারে।

ফিরিতে দেরিই হইল। রাত্রি বারোটার কম নয়। হরিশ মোটর হইতে নামিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। কাপড় ছাড়িতে চাড়িতে শুনিতে পাইল স্ত্রী উপরের জানালা হইতে সোফারকে ডাকিয়া বলিতেছে, আবদুল, যোগীন বাবুর বাড়ী থেকে এলে বুঝি?

আবদুল কহিল, নেহি মাইজী, ষ্টেশনসে আতেহেঁ।

ইষ্টিশান? ইষ্টিশান কেন? গাড়ীতে কেউ এলো বুঝি?

আবদুল কহিল, কলকত্তাসে এক মাইজী আউর বাচ্চা আয়া।

কলকাতা থেকে? বাবু গিয়ে তাদের নিয়ে এসে বাসায় পৌঁছে দিলেন বুঝি?

আবদুল হাঁ বলিয়া জবাব দিয়া গাড়ী আস্তাবলে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে হরিশ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ সম্ভাবনার কথা যে তাহার মনে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু নিজের চাকরকে মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করিতে সে কিছুতেই পারিয়া উঠে নাই। রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে একটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই লাবণ্য ছেলে লইয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ বাহিরের ঘরে ছিল, তাহাকে কহিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় নেই, চলুন আলাপ করিয়ে দেবেন।

হরিশের বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। একবার সে এমনও বলিতে চাহিল যে,

এখন অত্যন্ত কাজের তাড়া, কিন্তু সে অজুহাত খাটিল না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইল।

বছর দশেকের ছেলে এবং লাবণ্য। নির্ম্মলা তাহাদের সমাদরে গ্রহণ করিল। ছেলেকে খাবার খাইতে দিল, এবং তাহার মাকে আসন পাতিয়া সযত্নে বসাইল। কহিল, আমার সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম।

লাবণ্য ইহার উত্তর দিয়া বলিল, হরিশবাবুর মুখে শুনেছিলাম আপনি ক্রমাগত বার-ব্রত আর উপবাস ক'রে ক'রে শরীরটাকে নষ্ট করে ফেলেছেন। এখনো ত বেশ ভাল দেখাচ্ছে না।

নির্ম্মলা সহাস্যে কহিল, বাড়ানো কথা। কিন্তু এ আবার উনি কবে বল্লেন? হরিশ তখনও কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

লাবণ্য কহিল, এবার কলকাতায়। খেতে বসে কেবল আপনারই কথা। ওঁর বন্ধু কুশলবাবুর বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ী খুব কাছে কি না। ছাতের ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে শোনা যায়।

নির্ম্মলা বলিল, খুব সুবিধে ত?

লাবণ্য হাসিয়া বলিল, কিন্তু, তাতেই শুধু হয়না,—ছেলেকে পাঠিয়ে রীতিমত ধরে আন্‌তে হয়।

বটে?

লাবণ্য বলিল, আবার জাতের গোঁড়ামিও কম নেই। ব্রাহ্মদের ছোঁওয়া খাননা,—আমার পিসিমার হাতে পর্য্যন্ত না। সমস্তই আমাকে নিজে রাঁধ্‌তে হয়,—নিজে পরিবেশন করতে হয়। এই বলিয়া সে হাসি মুখে সকৌতুকে হরিশের প্রতি চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, এর মধ্যে আপনার কি লজিক আছে বলুন ত? আমি কি ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়া?

হরিশের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম করিতে লাগিল, তাহার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়ায় তাহার মনে হইল এতদিনে মা বসুমাতা দয়া করিয়া বোধহয় তাহাকে জঠরে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, নির্ম্মলা আজ ভয়ঙ্কর উন্মাদ কাণ্ড কিছু একটা না করিয়া স্থির হইয়া রহিল। সংশয়ের বস্তু অবিসংবাদী সত্যরূপে দেখা দিয়া বোধ হয় তাহাকেও হতচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল।

হরিশ বাহিরে আসিয়া স্তব্ধ পাংশু মুখে বসিয়া রহিল। এই ভীষণ সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিবার কথা যে তাহার মনে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু আত্ম-অবমাননাকর ও একান্ত মর্য্যাদাহীন লুকাচুরির প্রস্তাব সে কোনমতেই এই শিক্ষিত ও ভদ্র মহিলাটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারে নাই।

লাবণ্য চলিয়া গেলে নির্ম্মলা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছিঃ—তুমি এমন মিথ্যাবাদী! এত মিথ্যে কথা বল!

হরিশ চোখ রাঙাইয়া লাফাইয়া উঠিল,—বেশ করি বলি। আমার খুশী!

নির্ম্মলা ক্ষণকাল স্বামীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, বল, যত ইচ্ছে মিথ্যে বল, যত খুশী আমাকে ঠকাও। কিন্তু ধর্ম্ম যদি থাকে, যদি সতী মায়ের মেয়ে হই, যদি কায়মনে সতী হই,—আমার জন্যে তোমাকে একদিন কাঁদতে হবে, হবে, হবে! এই বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

বাক্যালাপ পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ চলিতেছিল এখন সেটা দৃঢ়তর হইল,—এইমাত্র। নীচের ঘরে শয়ন ও ভোজন। হরিশ আদালতে যায় আসে,—বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া কাটায়,—নূতন কিছুই নয়। আগে সন্ধ্যার সময়ে একবার করিয়া ক্লবে গিয়া বসিত, এখন সেটুকুও বন্ধ হইয়াছে। কারণ, শহরের সেই দিকে লাবণ্যর বাসা। তাহার মনে হয় পতি-প্রাণা ভার্য্যার দুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া দশ দিক হইতে পতিকে অহরহ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,—মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় তাহা নিত্য। স্নানের পরে আর্শির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইত সতী সাধ্বীর এই অক্ষয় প্রেমের আগুনে তাহার কলুষিত দেহের নশ্বর মেদ-মজ্জা-মাংস শুষ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া অত্যন্ত দ্রুত উচ্চতর লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। তাহার আলমারির মধ্যে একখানা কালীসিংহের মহাভারত ছিল, সময় যখন কাটিত না তখন তাহা হইতে সে বাছিয়া বাছিয়া সতী নারীর উপাখ্যান পড়িত। কি তার প্রচণ্ড বিক্রম ও কতই না অদ্ভুত কাহিনী। স্বামী পাপী তাপী যাহাই হৌক, কেবলমাত্র স্ত্রীর সতীত্বের জোরেই সমস্ত পাপ-মুক্ত হইয়া অন্তে কল্পকাল তাহারা একত্রে বাস করে। কল্পকাল যে ঠিক কত হরিশ জানিত না। কিন্তু সে যে কম নহে, এবং মুনি ঋষিদের লেখা শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে, এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া উঠিত। পরলোকের ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া সে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে ইহলোকের ভাবনা ভাবিত। কিন্তু কোন পথ নাই। সাহেবদের হইলে মামলা-মকদ্দমা খাড়া করিয়া এতদিনে যাহোক একটা ছাড়-রফা করিয়া ফেলিত; মুসলমানদের হইলে তিন তালাক দিয়া বহুপূর্ব্বেই চুকাইয়া ফেলিত; কিন্তু নিরীহ, এক-পত্নীব্রত ভদ্র বাঙালী,—না, কোন উপায় নাই। ইংরাজি শিক্ষায় বহু-বিবাহ ঘুচিয়াছে,—বিশেষতঃ, নির্ম্মলা। চন্দ্র সূর্য্য যাহার মুখ দেখিতে পায়না, অতি-বড় শত্রুও যাহার সতীত্বে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক লেপ করিতে পারেনা, বস্তুতঃ, স্বামী ভিন্ন যাহার ধ্যান-জ্ঞান নাই, তাহাকেই পরিত্যাগ! বাপ রে! নির্ম্মল, নিষ্কলুষ হিন্দু-সমাজের মধ্যে কি আর মুখ দেখাইতে পারিবে? দেশের লোকে খাই খাই করিয়া হয়ত তাহাকে খাইয়াই ফেলিবে।

ভাবিতে ভাবিতে চোখ কান গরম হইয়া উঠিত, বিছানা ছাড়িয়া মাথায় মুখে জল দিয়া বাকি রাতটুকু সে চেয়ারে বসিয়া কাটাইয়া দিত। এমনি করিয়া বোধহয় মাসাধিক কাল গত হইয়া গেছে, হরিশ আদালতে বাহির হইতেছিল, ঝি আসিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল। কহিল, জবাবের জন্য লোক দাঁড়িয়ে আছে।

খাম ছেঁড়া, উপরে লাবণ্যর হস্তাক্ষর। হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি আমার খুল্লে কে?

ঝি কহিল, মা।

হরিশ চিঠি পড়িয়া দেখিল লাবণ্য অনেক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে, সেদিন আমার অসুখ চোখে দেখে গিয়েও আর একটি বারও খবর নিলেন না আমি মরলুম কি বাঁচলুম। অথচ, বেশ জানেন এ বিদেশে আপনি ছাড়া আমার আপনার লোকও কেউ নেই। যাই হোক্, এ যাত্রা আমি মরিনি, বেঁচে আছি। এ চিঠি কিন্তু সে-নালিশের জন্য নয়। আজ আমার ছেলের জন্মতিথি, কোর্টের ফেরৎ একবার এসে তাকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন এই ভিক্ষা। লাবণ্য।

পত্রের শেষে পুনশ্চ দিয়া জানাইয়াছে যে, রাত্রির খাওয়াটা আজ এইখানেই সমাধা করিতে হইবে। একটুখানি গান বাজনার আয়োজনও আছে।

চিঠি পড়িয়া বোধকরি সে ক্ষণকাল বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল ঝি হাসি লুকাইতে মুখ নীচু করিল। অর্থাৎ, বাটীর দাসী-চাকরের কাছেও এ যেন একটা তামাসার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্ত্তে তাহার শিরার রক্ত আগুন হইয়া উঠিল,—ইহার কি সীমা নাই? যতই সহিতেছি, ততই কি পীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে?

জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি কে এনেছে?

তাঁদের বাড়ীর ঝি।

হরিশ কহিল, তাকে বলে দাওগে আমি কোর্টের ফেরৎ যাবো। এই বলিয়া সে বীরদর্পে মোটরে গিয়া উঠিল।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিতে হরিশের বস্তুতঃ অনেক রাত্রিই হইল। গাড়ী হইতে নামিতেই দেখিল তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া নির্ম্মলা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া আছে।

(৬)

ডাক্তারের দল অল্পক্ষণ হইল বিদায় লইয়াছে। পারিবারিক চিকিৎসক বৃদ্ধ জ্ঞানবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন বোধহয় সমস্ত আফিঙটাই বার করে ফেলা গেছে,—বৌমার জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই।

হরিশ একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া কি ভাব যে প্রকাশ করিল, বৃদ্ধ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না, কহিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন কাছে কাছে থেকে দিন দুই সাবধানে রাখলেই বিপদটা কেটে যাবে।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হরিশ স্থির হইয়া বসিয়া পড়িল।

সেদিন বার-লাইব্রেরি ঘরে আলোচনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর হইয়া উঠিল। ভক্ত বীরেন কহিল, আমার গুরুদেব স্বামীজি বলেন, বারেন, মানুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না। সেদিন গোঁসাই

বাবুর বিধবা পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে স্ক্যাণ্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তোমরা তা' বিশ্বাস করলেনা, বল্লে হরিশ এ কাজ করতেই পারেনা। এখন দেখ্‌লে? গুরুদেবের কৃপায় আমি এমন অনেক জিনিস জানতে পারি তোমরা যা ড্রিম করোনা!

ব্রজেন্দ্র বলিল, উঃ—হরিশটা কি স্কাউণ্ড্রেল। ও রকম সতী-সাধ্বী স্ত্রী যার,—কিন্তু মজা দেখেচ সংসারে? বদমাইসগুলোর ভাগ্যেই কেবল এ রকম স্ত্রী জোটে!

বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে হুঁকা লইয়া ঝিমাইতেছিলেন, কহিলেন, নিঃসন্দেহ। আমার ত মাথার চুল পেকে গেল কিন্তু ক্যারেক্টারে কেউ কখনো একটা স্পট্‌ দিতে পারলেনা। অথচ আমারই হ'ল সাত সাতটা মেয়ে, বিয়ে দিতে দিতে দেউলে হয়ে গেলাম।

যোগীনবাবু কহিলেন, আমাদের মেয়ে ইস্কুলের পরিদর্শক হিসেবে মহিলাটি দেখ্‌চি একেবারে আদর্শ! গভর্ণমেণ্টে বোধ করি মুভ্‌ করা উচিত।

ভক্ত বীরেন বলিলেন, অ্যাবসোলিউট্‌লি নেসেসরি!

সম্পূর্ণ একটা দিন পার হইল না, সতী-সাধ্বীর স্বামী হরিশের চরিত্র জানিতে সহরে কাহারও আর বাকি রহিল না। এবং সুহৃদ্‌বর্গের কৃপায় সকল কথাই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

উমা আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, দাদা, তুমি আবার বিয়ে কর।

হরিশ কহিল, পাগল!

উমা কহিল, পাগল কেন? আমাদের দেশে ত পুরুষের বহুবিবাহ ছিল।

হরিশ কহিল, তখন আমরা বর্ব্বর ছিলাম।

উমা জিদ্‌ করিয়া বলিল, বর্ব্বর কিসের? তোমার দুঃখ আর কেউ না জানে ত আমি ত জানি? সমস্ত জীবনটা কি এমনি ব্যর্থ হয়েই যাবে?

হরিশ বলিল, উপায় কি বোন? স্ত্রী ত্যাগ কোরে আবার বিয়ে করার ব্যবস্থা পুরুষের আছে জানি, কিন্তু মেয়েদের ত নেই। তোর বৌদি'রও যদি এ পথ খোলা থাক্‌তো তোর কথায় রাজি হোতাম উমা।

তুমি কি যে বল দাদা! এই বলিয়া উমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিশ চুপ করিয়া একাকী বসিয়া রহিল। তাহার উপায়হীন অন্ধকার চিত্ততল হইতে কেবল একটি শব্দই বারম্বার উত্থিত হইতে লাগিল, পথ নাই! পথ নাই! এই আনন্দহীন জীবনে দুঃখই ধ্রুব হইয়া রহিল।

তাহার বসিবার ঘরের মধ্যে তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল পাশের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব ভিখারীর দল কীর্ত্তনের সুরে দূতীর বিলাপ গাহিতেছে। দূতী মথুরায় আসিয়া ব্রজনাথের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া নালিশ করিতেছে। দূতী কি জবাব পাইয়াছিল হরিশ জানিত না, কিন্তু সে ব্রজনাথের উকিল হইয়া

তর্কের উপর তর্ক জুড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ওগো, সতী-নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভাল জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি ত সব কথা বুঝ্‌বেনা—বল্‌লেও না। কিন্তু আমি জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং এক শ' বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হন নি। কংশ টংশ সব মিছে কথা। আসল কথা ঐ একনিষ্ঠ প্রেম। একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, তবু ত তখনকার কালে ঢের সুবিধে ছিল দূতি, মথুরায় লুকিয়ে থাকা চল্‌তো। কিন্তু এ-কাল ঢের কঠিন। না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এখন ভুক্ত-ভোগী ব্রজনাথ দয়া করে একটু সত্বর অধীনকে পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুশ *

তুমি কুশাঙ্কুর প্রথম আহুতি তুমি কুশাশ্ব-কেশর ভালে,
ব্রহ্মর্ষির তুমি জটাকেশ—কৃষ্ণসারের জীবনাধার।
উষর ধূসর ভূমিরে হে কুশ দিলে কী হরিৎ আকর্ষণী,
প্রথম আর্য্য গো-স্বামিগণে পাঠাইলে শুভ আমন্ত্রণী।
শাস্ত্রীরে তুমি দিয়েছ শস্ত্র, কুশল করেছ সকল কাজে,
কৃষিতন্ত্র শিখালে তাহায় ব্রহ্মাবর্ত্ত-মরুর মাঝে।
রচিলে আর্য্য-অতিথির লাগি আসন,ভূষণ, উটজ গৃহ,
যজ্ঞদেবের চরণের তলে বহিলে ভোগ্য আহরণীয়।
বেদাবর্ত্তন করেছ, আর্য্য, যাজনে হয়েছ তপঃস্বেদ,
তব শ্যামাঙ্গে তুলি রোমাঞ্চ উদীরিত সাম যজুর্ব্বেদ।
সমিধ্‌ বন্ধু, অগ্নিবেশ্মে বাঁচায়ে রেখেছ হবির্ভুকে,
কোশাকুশীরূপ দিলে মন্দিরে চষক-চমস-কুশপ-স্রুকে।
গঙ্গারে নব মেধ্যতা দিলে কুশাবর্ত্তের পুণ্যখাতে,
অরণির মত অগ্নিগর্ভ হ'লে শাপোদকে ঋষির হাতে।

---

* কুশাশ্ব ও কৌশিক—বিশ্বামিত্র। কুশাশ্ব ও ব্রহ্মর্ষি—শ্লিষ্ট। কুশ ও কৃষ্ণসারমৃগবিহার—আর্য্যভূমির দুইটি প্রধান লক্ষণ। আহবনীয়—হব্যপদার্থ। চষক, চমস, কুশপ, স্রুক—যজ্ঞে ব্যবহৃত সোমরস, চরু ও হবির জন্য পাত্রাদি। মুঞ্জ—পবিত্র তৃণ বিং। বটু—ব্রাহ্মণবালক। কব্য—পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পিণ্ডাদি। কুশেশয়—পদ্ম। দ্বি-রসন—কুশস্থ অমৃত লেহন করিতে গিয়া অমৃতহারী গরুড়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের (সর্পগণের) জিহ্বা দ্বিধাবিভক্ত হয়। দ্বি-রসন—শ্লিষ্ট। কক্ষ—কোমর—কাঁখ। গ্রন্থিভেদক—গাঁট-কাটা। কুশীদ—সুদ। কুশাগ্র ইত্যাদি—পুরোহিত সম্বন্ধে। ব্রীহি—বিড়িধান। কুসূল—ধানের গোলা। কুশা—ডোবা।

শান্তিসলিলে কুশল ছিটায়ে কলুষ-কুষ্ঠ হরিয়া নিলে,
মন্ত্রের সাথে মিলিয়া বটুরে উপবীতে নব জন্ম দিলে।
প্রেতপুরুষের কব্য-ওদন—নিবেদনে হ'লে তৃণাঞ্জলি
কুশণ্ডিকায় গৃহ আঙিনায় রচিলে তীর্থ কুশস্থলী।
তব বুকে কুশ আর্য্য-যোগীর চিৎকুশেশয় প্রস্ফুটিত,
তাহার শয্যা করিতে সজ্জা হলে কুশ তুমি কুসুমান্বিত।
ছেদিলে সর্ব্বসংশয় তার হৃদয়গ্রন্থি, তীক্ষ্ণধারে।
তব জ্বলন্ত শাণিত অগ্রে বিঁধি অজ্ঞান-অন্ধকারে।
কুশধারনিভ দুর্গমপথে চলিতে যাত্রা করিল যারা,
জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকার রূপে ফুটালে তাদের নেত্র-তারা।

হায়, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি হারালে তাদের বংশধর,
ভগবানে ভুলে তোমার পুতুলে পূজিতে লাগিল তৎপর।
হে পূত দণ্ড, দর্প হইয়া তুলিলে শীর্ষ তাদের গেহে,
অঙ্কুশ না পেয়ে হলো দ্বি-রদন তারাও দ্বি-ধার দেহাবলেহে।
বক্ষঃগ্রন্থি আর ভেদিলে না কক্ষগ্রন্থিভেদক হ'লে
নখদশনের মতনই দর্ভ জাতির মর্ম্মচ্ছেদক হ'লে।
কৌষেয় বাস-বিলাসে ঢাকিল তারা তব পূত আসন খানা,
হে কুশ, তোমারে মূলধন করি হরিতে লাগিল কুশীদ নানা।
ক্রতুযজ্ঞে আহুতি সঁপিতে হলে ঘৃতাক্ত নগরে গ্রামে,
কৌশলি-করে পিণ্ড বহিলে জীবিতের লাগি মৃতের নামে।
কুশাস্ত্রবাদের কু-শাসনে হায় কুশের 'কু'-টুকু লভিল গৃহী,
কুশের আদর করিল ভীরুরা ফেলিয়া গোধূম-যবব্রীহি।
কুশজীবিগণ কৃষিজীবীদের কুশূলের পুঁজি হরিল নিতি,
তোমারি কশায় শাসিয়া তাদেরে সৃজিয়া নানান্ নরকভীতি।

মুক্তিপথের আছিলে সহায় মুক্ত ভূভাগে গাহিতে সাম,
শতশত পাকে রচিল তোমাকে তাহারা বাঁধন রজ্জুদাম।
সেই কুশডোরে দেশ বাঁধা প'ড়ে পঙ্গু হয়েছে, মুদিয়া আঁখি,
অঙ্গুলি হতে কণ্ঠ চরণ কোন' ঠাঁই তার পড়েনি বাকী।
আজিকে তাহার যাত্রার পথ ভরিয়া রেখেছ কুশাঙ্কুরে,
দুই-পা আগায়, পায়ে ব্যথা পায়, ভয়ে ভাবনায় দাঁড়ায় ঘুরে।
নবকৌশিক কোথা চাণক্য কে তুলিবে এই কুশের কাঁটা,
'গুপ্তচন্দ্রে' পুন যে জাগাবে সহজ হইবে এপথ হাঁটা ?

শ্রীকালিদাস রায়।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে লিখিত)

২০)

ওঁ

কুষ্টিয়া

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

পাব্লিকের সেবাকার্য্য হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে কতদিন থেকে চেষ্টা করচি—দূরে থাকি, চুপচাপ করে থাকি, কারো কোনো কথায় থাকি নে, যেন মরেই গেছি এমনিতর ভান করে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি কিন্তু তবু আপনারা দয়া করেন না কেন? আপনারা কি এই কথাটাই জানিয়ে দিতে চান যে, সত্যি সত্যি না মরলে উপায় নেই? এ রকম আভাস ইঙ্গিত প্রয়োগ করা কি বন্ধুর কাজ? সংসার এবং বিষয়কর্ম্ম থেকে একেবারে সরে পড়েছি—সুতরাং যে দাঁড় আশ্রয় করে আমি পাব্লিকের চিড়িয়াখানায় ঝুল্‌তে পারতুম সে দাঁড় ভেঙেছি—এখন বাঘের মত আমাকে আর তাড়া করে বেড়াবেন না। আপনাদের অনুরোধ বরাবর সাধ্যমত পালন করা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে সেইজন্যে এখনো আপনাদের আহ্বান এড়ানো আমার পক্ষে সহজ নয়—সেই কারণেই আপনাদের দিক থেকেই দয়া হওয়া উচিত। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাকে ভিড়ের হাত থেকে বাঁচান। আমি যেটুকু পারি কাজ করচি এবং করব, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আমি আর মিশ্‌তে পারব না। গোলে হরিবোল দেওয়াই ভিড়ের প্রধান কাজ, এখন আমার সে রকম উদ্যম, ইচ্ছা, এবং গলার জোর নেই। আপনাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে—রজনী সেন মহাশয় যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন অবসান করেছেন আমি তার পরিচয়ও পেয়েছি এবং তাঁর আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা দেখে মুগ্ধও হয়েছি এইজন্যে আপনাদের চেষ্টায় তাঁর দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের ভারলাঘব হয় এ আমার একান্ত মনের ইচ্ছা—কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি সেখানে আমাকে আর আহ্বান করবেন না। এক পা বাড়ালেই দ্বিতীয় পা বাড়াতে হয়, শেষকালে কেউ কোনোমতেই দোহাই মানে না, নজির দেখায়। আপনি যদি পীড়াপীড়ি করেন তবে অবশ্যই আমাকে রাজি হ'তে হবে—কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার তরফের কথাটা একবার আপনার সাম্‌নে উপস্থিত করলুম—আমার প্রতি যদি দয়া না হয় তবে আমিই হার মানব।

আমি কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছি। আমার নামের সহযোগে "কুষ্টিয়া" এই ঠিকানা দিলেই আমি চিঠি পাব। ইতি তারিখ ঠিক জানা নেই!

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২১)

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

এতদিন চিনির কারখানা আপনার মনোরাজ্যেই ছিল, একথা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু সেটাকে দেহক্ষেত্রে বিস্তৃত করলেন কেন? ওটা একেবারে রহিত করা কি চলে না? কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় দীর্ঘকাল বিশ্রাম করা কি অসম্ভব? কলকাতার জাঁতার মধ্যে আর নিজেকে দলিত করবেন না—বেরিয়ে আসবার হুকুম এসেছে—এখন বিশ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে মহত্তর কাজে বসে যান। একথা আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই বলচি—আমার এ জায়গায় আপনাকে পাব এমন লোভ আমার থাকতে পারে কিন্তু আশা নেই, অতএব নিরাসক্ত চিত্তেই আপনার মঙ্গল কামনা করচি।

সাহিত্য পরিষৎ ক্রমশঃ এমন সকল লোকের দ্বারা আবিষ্ট অভিভূত হয়ে পড়চে যাঁরা খুব ভাল লোক, বুদ্ধিমান লোক, কৃতী এবং সামর্থ্যশালী কিন্তু তাঁরা সত্যভাবে সারস্বত নন—এতে করেই পরিষদের সাত্ত্বিকতার লাঘব হয়ে আসচে সুতরাং নিত্যতার গভীরতম মূলে আঘাত পড়চে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে দারিদ্র্যটা কোনোমতেই সাংঘাতিক নয় কিন্তু সরস্বতীর পদ্মবনে যখন বড় বড় লোহার চাকাওয়ালা বহুমূল্যবান দমকল বসে তখন জয়েণ্টষ্টক কম্পানী খুসী হয়ে ওঠে কিন্তু দেবীর চরণরেণুপ্রত্যাশী মধুকরের দল প্রমাদ গণ্‌তে থাকে। আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই রাজসিকতার স্থূল হস্তাবলেপটা নূতন এইজন্যে তার প্রতাপটা অপরিমিত এবং কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে সাহস করে না। পূর্ব্বকালে নবরত্ন সভায় রাজা একজন মাত্র ছিলেন সুতরাং নবরত্নকে আচ্ছন্ন করতে পারতেন না; এখন রাজা এত রকম বেরকম, তাদের সংখ্যা এত বেশি, তাদের ফরমাস এত বিচিত্র, তাদের মেজাজ এত অনিশ্চিত, তাদের ঔদার্য্যের এত অভাব অথচ দৌরাত্ম্যের এতই প্রাদুর্ভাব যে আসল জিনিষকে আর দেখবার জো থাকে না। আসল কথা কোনো জিনিষকে চালাতে হলে তার সামনেকার পথটা ত ছেড়ে দিতে হয়—আমরা কিছুতেই কাউকেই পথ ছাড়তে পারিনে—ঘোড়া ও সারথীর সাম্‌নে সবাই মিলে জড় হয়ে আমরা এমনি হুড়োহুড়ি করতে থাকি যে মনে করি তাতেই বুঝি অগ্রসর হবার খুব সাহায্য হচ্চে। অথচ উপায় ভেবে পাইনে—আজকাল সকল কাজেই মালমসলা এত বেশি গুরুতর হয়ে পড়েছে যে, তার খাতিরে সকলেরই কাছে আসল জিনিষটাকে আগাম বন্ধক রেখে কাজ সারতে হয়—সে বন্ধক আর উদ্ধার হয় না—চিরকাল বিকিয়ে থাকতে হয়। বাড়ি গড়বার জন্যে যে রাজমিস্ত্রিকে ডাকা যায় অবশেষে সেই বাড়িটি দখল করে ধূমধাম করে বাস করে আর গৃহস্থ চিরদিন দ্বারের বাইরে বসে গৃহকর্ত্তার ভাণ করে কাষ্ঠহাসি হেসে রৌদ্রে জলে লোককে অভ্যর্থনা করবার ভার নিয়ে থাকে।

বিদ্যালয় বন্ধ হবে ১৭ই তারিখে। বন্ধ হবার পূর্ব্বেই ছেলেরা একটা কিছু অভিনয় করবে—আমাকে ও নিশ্চয়ই ছাড়বে না—সেই কথা ভাবচি। আপনার সভায় উপস্থিত থাকার প্রলোভন আমার খুবই আছে—যাবার চেষ্টা মনে জেগে থাকবে নিশ্চয়ই জানবেন—কিন্তু একথাও মনে রাখবেন আমার এই সব ছেলেদের কাছে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও এরা আমার সংসারপক্ষের ছেলে নয়, দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে—সেই জন্যে এদের জোর বেশি—এরা চেপে ধরলেই আমার পথ বন্ধ। আপনাকে আমাদের শারদোৎসবে টেনে আনার আশা করা কি একেবারেই দুরাশা? কিছুতেই বিচলিত হবেন না? ইতি ৩২শে ভাদ্র ১৩১৭

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২২)

ঔঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের দেশে জন্মলাভকে একটা পরম দুঃখ বলিয়া থাকে। কথাটা যে অমূলক নহে তাহা আমার জন্মদিনের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুভব করিবার কারণ ঘটিল।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার বন্ধু তাঁহাদের প্রীতি আমি লাভ করিয়াছি সেই আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনার পরম সফলতা। কিন্তু সম্মানলাভকে ভগবান মনু বিষের মত পরিহার করিতে বলিয়াছেন--আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধবয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন—আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন যে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব—তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারিব। কিন্তু সাধারণ জনসভা যে মানের মুকুট আমার মাথায় পরাইতে চাহেন তাহার ভার বহন করিতে গিয়া আমার মাথা হেঁট হইবে। আমি জানি আপনি আমাকে ভালবাসেন সেইজন্য আপনার কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ, এই জনসভার স্নেহালিঙ্গন হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।

আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহ তাঁহারা পরিষদের সভ্য। আপনাদের এই কবি-সম্বর্দ্ধনা প্রস্তাবের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন আপনারা চক্ষুলজ্জার বিড়ম্বনায় আপনাদের বিধিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সত্য কি না বলিতে পারি না।

কিন্তু তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পাঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহাররূপে লাভ করিলাম এই যে, আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষৎকে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপরে নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার একপঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৩)

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

একখানি পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। লেখক আমাকে জানাইয়াছেন যে, আপনাদিগকে আত্মসঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া আমার ঔদার্য্যপ্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে—অথচ আমার পূজাটাও একেবারে মারা না যায় এমন সান্ত্বনাজনক ব্যবস্থারও অভাব নাই।

আপনি জানেন আমি সংসারের জনতা হইতে সরিয়া আসিয়াছি আজ আমাকে এই গ্লানির মধ্যে কেন টানিয়া আনিলেন? অন্তর্যামী জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি না এই সম্মানের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করাই আমি আমার পক্ষে কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের সভায় আমি উপস্থিত থাকিব না বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, এ কথা জানেন আত্মহত্যা করিলেই যে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা নহে। আমার অনুপস্থিতিতেও আমার মুক্তি হইবে না। এই জন্য আপনাদের কাছে সানুনয়ে আমি মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি। আমার সম্মানে এই যে বাধা পড়িয়াছে ইহাতে আমি বুঝিয়াছি ঈশ্বর আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমার কর্ম্ম অবসানে তিনি আমার মাথা নত করিয়া দিন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই ছুটি লইব, আমি তাঁহার কাছ হইতে মজুরি চুকাইয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইব না। ইতি ২২শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৮)

ঔ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আমার পুরাতন চিঠিপত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্রস্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপ মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ ত অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেন না এ আমার প্রাণের কথা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ়স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই একথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্ব্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে—আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহুযুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে—নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করিতে যাই! আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে সে এই জল স্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ—সে আপনি আমাকে কবুল করিতে দিবেন না কেন? পাছে লোকে আমাকে উপহাস করে? আমি যদি কালো আলপাকার চাপকানপরা আপিসের কেরাণীজীবনের পরিচয় দিই তবে লোকে সেটাকে একটা সত্যপদার্থ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে থাকে—আর আমার যে পরিচয়টা জগৎজোড়া পরিচয় সেটাতে যদি ট্রামগাড়ির যাত্রী ও সীজ্‌ন্‌টিকিট্‌ওয়ালাদের হাসি পায় তবে সে হাসি আমাকে হজম করিতেই হইবে। দেখুন, আমি আমার বোটের খোলা জানলায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিকরঙের মাটির উপরে যখন সূর্য্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধূলা এবং ঘাসের মধ্যে দিক্‌প্রান্ত পর্য্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্য্য-চন্দ্রনক্ষত্র এবং মাটিপাথরজল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভ মুহূর্ত্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জাবোধ করি না। আমি মানুষ এইজন্যই আমি ধূলামাটিজল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই—ইহাই আমার গৌরব—আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে—আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই

জন্যই আমার রক্ততরঙ্গ সমুদ্র তরঙ্গের তালটাকে চিনিতে পারিয়া নৃত্য করে কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গ আমাকে চেনে না—এইজন্য আমার প্রাণের সুখ গাছপালার প্রাণের সুখের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে কিন্তু গাছপালা আমাকে চেনে না। আমার স্মৃতি তাহাদের মধ্যে নাই। ইহাতে কি হাসিবার কিছু আছে? আপনার Execution of dutyতে গায়ের জোরে আমি বাধা দিব না কিন্তু নালিশ জানাইয়া রাখিলাম। ইতি ১৭ই ফাল্গুন ১৩১৮

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৫)

ওঁ শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয় বন্ধু!

সম্মানের ভূতে আমাকে পাইয়াছে, আমি ত মনে মনে ওঝা ডাকিতেছি—আপনাদের আনন্দে আমি সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছি না। আপনি হয়ত ভাবিবেন এটা আমার অত্যুক্তি হইল কিন্তু অন্তর্যামী জানেন আমার জীবন কিরূপ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে।

"কোলাহল ত বারণ হল
এবার কথা কানে কানে"—

এই কবিতাটি দিয়া আমি গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা সুরু করিয়াছিলাম বারণটা যে কতদূর সফল হইল তাহা দেখিতেই পাইতেছেন।

আপনি আছেন কেমন সে কথা লেখেন নাই। শীঘ্রই কলিকাতায় একবার যাইতে হইবে তখন দেখা করিব। ইতি ১ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৬)

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

কোনো ঠিকানা না রাখিয়া কিছুকালের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আপনার চিঠিখানি পাইলাম। দুই একদিনের মধ্যেই আবার নিরুদ্দেশের মধ্যে ডুব মারিবার চেষ্টায় আছি। শিকারী যতই গুলি চালাইতে থাকে হাঁস তেমনি যেমন ঘনঘন জলে কেবলি ডুব মারে আমার সেই দশা হইয়াছে। নানাকারণ বশতঃ আমি হঠাৎ দূর দূরান্তরের

লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছি তাই ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হইবার আয়োজন করিতেছি। চিঠিতে কাহাকেও সাড়া দেওয়া একপ্রকার বন্ধ করিয়াছি—কিন্তু আপনার ডাকে চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত কঠিন বলিয়াই মৌনব্রত ভঙ্গ করিলাম। কিন্তু আমি উড়ুক্কু—ডানা মেলিয়াছি—অতি শীঘ্রই আমি নাগালের বাহিরে পৌঁছিব—এমন কি, সেখানে গোলাগুলিও পৌঁছিবে না।

আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয়—আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর। আমার মতে আচারে বিচারে যদি আপনাকে বেদনা দিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলে হয়ত মঙ্গলই হয়—কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের ত বাধা নাই। এত কথা যে বলিতেছি তার কারণ এই যে, প্রতিকূলতা চারিদিকেই তর্জ্জনী তুলিয়াছে, বুঝিতেছি যে দেশের লোককে আমি ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিয়াছি—সেটা যদি দোষের হয় তবে তাহা আমার বুদ্ধিরই দোষ, হৃদয়ের দোষ নহে—আপনি জানেন আমি দেশের লোককে ভালই বাসি—সেইজন্যই আমি তাহাদের ভাল চাই—ভাল কথা চাই না। এই দুর্য্যোগের দিনে এই আশাটিকে সম্বল রাখিতে চাই যে বন্ধুরা যদিবা আমার মঙ্গলের আশা ত্যাগ করিয়া থাকেন তবু হৃদয় হইতে আমাকে ত্যাগ করেন নাই। ইতি ১২ পৌষ ১৩২১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৭)

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আপনার স্নিগ্ধ পত্রখানি পাইয়া আনন্দ পাইলাম। আমার শেষ চিঠিখানির সুরের মধ্যে কিছু রুদ্ররসের আমেজ দিয়াছিল না কি? বোধ হয় সেটা করুণ রসেরই ছদ্মবেশমাত্র—সূর্য্যাস্ত-কালের মেঘের মত বাহিরে দেখিতে আগুনের রং কিন্তু একটু আঁচড় কাটিলেই অশ্রুবাষ্প বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কিছু দীর্ঘকালের মত সমুদ্র পাড়ি দিবার আয়োজন করিতেছি বোধ করি তাই মনের ভিতরটা কিছু আর্দ্র অবস্থায় আছে—দেশকে গভীরভাবে ভালবাসি বলিয়াই এই রকম সময়টায় অনেক দিনের রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে অভিমানের কথাগুলো কিছু আতপ্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাই আপনার চিঠিতে নিজেকে বোধকরি ঠিক সাম্‌লাইতে পারি নাই। সংযত হইবার বয়স হইয়াছে—অন্যকে উপদেশ দিবার বেলাতেও পাকাচুল কাজে লাগে কিন্তু নিজের দিকে তাকাইয়া দেখি কবির কোষ্ঠিতে বয়স আর কিছুতেই এগোইতেই চায় না—শরীরটা শেষের পথে খুব ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্তু স্বভাবটা সেই যে পঁচিশের কাছে আসিয়া ঠেকিয়া গেছে কিছুতেই আর প্রোমোশন পাইতেছে না। আমি জানিতাম গণিতের বুদ্ধি আমারই নাই কিন্তু আমার বিধাতারও যে আমারই দশা প্রতিদিন তাহা ধরা পড়িতেছে—আমার ভিতরকার

বয়সটার সম্বন্ধে কেবলি তিনি ঠিকে ভুল করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে আমার পাকাচুলের সঙ্গে আমার আচরণের বড়ই বেমানান হইতেছে। সত্য কথা যদি বলিতে হয় আপনার মধ্যেও এক দিকের অঙ্ক অন্যদিকে চালিয়া দেওয়া হইয়াছে—অনেককাল হইতেই আপনার অন্তরের দিক হইতে হরণ করিয়া আপনার পাকাচুলের দিকে পূরণ করা চলিতেছে, এ ভুলটা আজ পর্য্যন্ত সংশোধন করা হইল না। কিন্তু এখন প্রার্থনা করিবার সময় হইয়াছে আপনার শরীরের দিকটায় ভুল অঙ্কের ভার আর যেন চাপানো না হয়। ইতি ২৭ পৌষ ১৩২১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুধবার রাত্রে কলিকাতায় যাইব—আপনার পটলডাঙ্গার বাসার সমস্যা ভেদ করিতে পারিব না, আমি লিভিংষ্টোন্ নই আমি যৎসামান্য কবি মাত্র, ইহা মনে রাখিবেন।

কবির প্রতি

কেবল কথার ঝুটা মুক্তার গেঁথে গেঁথে হার ফিরিস কবি,
আঁকিস নিত্য বেদনা-সিক্ত কল্পনা-রাঙা রঙীন ছবি ;
ছন্দের তালে তালে
দোল খাস তুই, ফোটে বেল জুঁই গাছে গাছে ডালে ডালে !
আপনার গানে আপনি বিভোর,
না রাখিস কারো খেয়াল খবর,
থাকিস মগ্ন সোনালী স্বপনে—
কৃত্রিম আলো দীপ্তি কিরণে,
আলেয়া-আলোকে পলকে পলকে ঝলকে লক্ষ চন্দ্র রবি !
কেবল কথার ঝুটা মুক্তার গেঁথে গেঁথে হার ফিরিস কবি।

ওরে বাজীকর, কোথা তোর ঘর ? এ অবনীপর কখনো নহে,
তোর ঐ স্বরে উন্মাদ করে, স্বপ্নলোকের বার্ত্তা কহে ,
মন্ত্রের তারে তারে
বেজে ওঠে তার স্বর্গ ঝঙ্কার থেকে থেকে বারে বারে ;

ক্ষণিকের তরে করি অনুভব
যা কিছু জগতে সুন্দর সব,
কেবলি মাধুরী ফুল গান হাসি
চাঁদের কিরণ ভালোবাসাবাসি
নিমেষেই হায় স্বপ্ন মিলায়, হাজারো জ্বালায় চিত্ত দহে !
ওরে বাজীকর, কোথা তোর ঘর ? এ অবনীপর কখনো নহে।

তুই মনোচোর লুব্ধ চকোর সারা নিশিভোর রহিস জাগি
মানস-বধূর অধর মধুর কাঁদিয়া সাধিয়া ভিক্ষা মাগি !
গুঞ্জরি কানে কানে
কী রচিস গান সারা দিন মান—বুঝিনা অর্থ মানে।
তৃণ পল্লবে তারায় তারায়,
দ্রুত চঞ্চল রক্তধারায়,
কাঁপে তার সুর মরি মরি মরি !
শুষ্ক নয়ন জলে আসে ভরি।
বিকশে কমল শত শতদল তোর ও সুরের পরশ লাগি !
তুই মনোচোর লুব্ধ চকোর সারা নিশিভোর রহিস জাগি !

সাগরে শৈলে অনিলে সলিলে আকাশের নীলে কে দিল ঢেলে
সুষমা কান্তি ? রচিল ভ্রান্তি সরস্বতীর কোন সে ছেলে ?
ধরণীর ধূলি পথে
সুধা সিঞ্চন করে কোন জন অমৃত-উৎস হতে ?
কাহারি পরশে কালো জঞ্জাল
হয়ে ওঠে রাঙা—টকটকে লাল ?
সিঁদুরে মেঘের রং করে চুরি
কে মাখালো বধূ মুখে সে মাধুরী ?
মণি আভরণ মায়া আবরণ সৃষ্টির পরে কে দিল মেলে ?
রচিল ভ্রান্তি সুষমা কান্তি, সরস্বতীর কোন সে ছেলে ?

তুই সে কুহকি স্পষ্ট নিরখি ; দেখেছি পরখি নাইক খাঁটি
তোর রচনায় পনেরো আনায়—সোনা বলে ভুল করেছি মাটি—।

পড়ে গেছে ফাঁকি ধরা,
মিথ্যে এখন মোহ-অঞ্জন—রঙীন স্বপ্ন-ভরা!
বুঝেছি তোর ও কলা-কৌশল—
ভাষার চাতুরী কল্পনা ছল,
শ্রবণ-মধুর শব্দ যোজনা,
ভাবের বিলাস লীলা ব্যঞ্জনা;
উপমার ছটা, ছন্দের ঘটা, অনুপ্রাসের বোঝাই আঁটি!
তোর রচনায় পনেরো আনায় দেখেছি পরখি নাইক খাঁটি!

কঠোর কঠিন শ্রীহীন মলিন জীর্ণ প্রাচীন মোদের ধরা,
বিঘ্ন-বিপদ হিংস্র-শ্বাপদ লক্ষ রোগের বীজাণু ভরা:
বারিহীন ধূ ধূ মরু,
কোথাও না-শেষ তুষারের দেশ—নাহি তৃণ নাহি তরু;
আঁকিলি শিল্পী করে ফুলময়,
লাগিল চমক, প্রাণে বিস্ময়,
সাজালি নিখিল শ্যামলে সবুজে
কাঁচা যৌবনে ভুলেছি না বুঝে,
এবে ওরে চোর প্রতারণা তোর ছলনা চাতুরী পড়েছে ধরা:
কঠোর কঠিন শ্রীহীন মলিন জীর্ণ প্রাচীন মোদের ধরা।

পাপে পঙ্কিল স্বার্থ-জটিল ক্রূর ও কুটিল মানব জাতি
ইন্দ্রিয়-দাস;—ওরে কবি গাস তারি জয়গান দিবস রাতি?
কাটাকাটি হানাহানি,
ঘোর সংগ্রাম চলে অবিরাম প্রাণ নিয়ে টানাটানি!
প্রণয় পিরীতি প্রেম লীলাছল—
সেরেফ লালসা স্বচ্ছ সরল,
নগ্নতা তার দিলি তুই ঢেকে
সভ্য ভাষার রং গুলে এঁকে;
ঐন্দ্রজালিক, তোর ও অলীক কুহকে ভুলিয়া আর না মাতি!
পাপে পঙ্কিল স্বার্থ-জটিল ক্রূর ও কুটিল মানব জাতি!

তোর ও প্রলাপ শুনবে গোলাপ, কর গে' আলাপ তাহার সনে,
তরু-মর্ম্মর ঝিল্লি-মুখর চাঁদিনীর রাতে ফুলের বনে !
প্রাণ-লেন-দেন খেলা
খেলবে তরুণ লজ্জা-অরুণ তরুণী সন্ধ্যেবেলা
শুনে তোর সুর, শুনে তোর স্বর ;
—মিলবে কাঁপিয়া অধরে অধর !
আমরা যতেক বুড়ো সুড়ো লোকে
বুঝিনা কী আছে তোর ঐ শ্লোকে,
নিমেষের ভ্রম জাগে মনোরম—থাকে না সে দাগ মনের কোণে !
তোর ও প্রলাপ শুনবে গোলাপ, করগে' আলাপ তাহার সনে।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ময়মনসিংহের কাব্য-কথা

(১)

ভারতীর সুললিত আহ্বান যার ভিতর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্য রচনা করে। প্রশংসায় তার তৃপ্তি হয়, নিন্দায় সে ক্ষুব্ধ হয়। ইহা তার মানুষ স্বভাব। কিন্তু সত্য সত্যই যে বাগ্দেবতার প্রসাদ পাইয়াছে, যার ভিতর সত্য শিব সুন্দরের কোনও নূতন প্রকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে প্রশংসার কামনায়ও লেখে না, নিন্দার ভয়েও তার লেখনী কুণ্ঠিত হয় না। সে লেখে আপনার অন্তরের ভিতর শত উৎসমুখে নিঃসৃত রসের প্রাচুর্য্যে—তার সম্ভোগের আনন্দে। যে রূপ বা রসের আস্বাদ সে পাইয়াছে তাহা সে তার আপনার জন—তার দেশবাসী, তার ভাবাভাবীকে বিলাইয়া দিতে চায়—তার অমূল্য সম্পদ উপভোগ করিবার জন্য সে সকলকে আমন্ত্রণ করে।—কিন্তু সে লেখে নিজের আনন্দে, আপনার ভিতরকার নিবিড় রসানুভূতি তাহাকে লিখিতে প্রণোদিত করে, লিখিয়া সে তৃপ্তি পায় আনন্দ পায়,—সে আনন্দের তুলনা নাই।

লেখা বাহির হইলে তাহা পাঠক ও সমালোচকের হাতে পড়ে। তাঁরা তার ভালমন্দ বিচার করেন। উৎকণ্ঠিত লেখক সমালোচকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে,—প্রশংসার জন্য তত নয়, খ্যাতির জন্য তত নয়—যত রসানুভূতির প্রতিধ্বনির জন্য। কবির অন্তরে যে রস ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যার স্বরূপ তিনি বাক্যে অপ্রচুরভাবে ফুটাইয়া ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এই যে পাঠক ও সমালোচক সে রসের যেন আস্বাদ

পান, তাঁর রচনায় যেন পাঠকের চিত্তে, তাঁর নিজের অনুভূত রস সঞ্চারিত হয়। যখন কবি দেখিতে পান যে পাঠক সে রস অনুভব করিয়াছেন, কবির অন্তরের তন্ত্রী পাঠকের প্রাণে ঠিক আপন সুরের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে, তখন কবি সার্থকতায় বিভোর হইয়া যান। উচ্চাঙ্গ বিশেষণ-বহুল সুদীর্ঘ প্রশংসাপত্রের চেয়ে এই রসানুভূতিকে তিনি সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে নত মস্তকে গ্রহণ করেন। আর যখন তিনি দেখিতে পান যে পাঠক বা সমালোচক সে রসের ধারার সন্ধান না পাইয়া, কবির অন্তরের টলমল রস-সাগরের আশেপাশে কেবল উপলখণ্ড কুড়াইয়া তার বিশ্লেষণ করিতে বসিয়াছেন, তখন তাঁর অন্তর হতাশায় ভরিয়া যায়। আমি এমন অনেক প্রশংসাপত্র পাইয়াছি যাহা পড়িয়া আমার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে ইহাই ভাবিয়া যে, সে সমালোচক আমার রচনায় প্রশংসার যে বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা আমার কল্পিত রসবস্তুর পক্ষে একান্ত অবান্তর। রসগ্রাহী সমালোচকের নিন্দাও অ-রসগ্রাহীর স্তবের অপেক্ষা অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে।

যে কবির ভিতর নূতন কোনও রসানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে, সত্যশিব সুন্দরের কোনও নূতন রূপের যিনি সন্ধান পাইয়া আজ বাঙ্গালীকে তার সন্ধান দিবার অসম সাহস করিয়াছেন তাঁর আজ বড় দুর্দিন। কেন না, যে-বাঙ্গলা ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত রসে টসটস্ করিতেছিল, তার রসানুভূতি আজ আশ্চর্য্য রকম শুকাইয়া উঠিয়াছে। দরকারী জিনিষের—টাকা আনা পাইয়ের—সন্ধানে আমরা এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি—সারবস্তু ও সুগম্ভীর তত্ত্বকথায় আমাদের মনটা এমন একাগ্রভাবে বসিয়া গিয়াছে যে আমাদের অন্তরে আনন্দের উৎস প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে রসানুভূতির ব্রহ্মপুত্র আজ ঊষর সৈকতে পরিণত হইয়াছে। তাই যখন কবি আমাদের কাছে নূতন রসের কথা বলেন তখন আমরা তাঁর কথাকে তত্ত্বের বকযন্ত্রে চুয়াইয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেই। রস যে তাহাতে উপিয়া যায়, সে আমরা চাহিয়া দেখি না, যে কাদা থিতাইয়া পড়িয়া থাকে তাই লইয়া ঘাঁটাঘাটি, মাতামাতি, মারামারি লাগাইয়া দেই। ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির দাঁড়িপাল্লা লইয়া ওজন করিতে বসি রসের।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসিয়া Anatole France লিখিলেন তাঁর উদ্ভট গল্প Revolt of the Angels, Maeterlinck লিখিলেন তাঁর Blue Bird. রসগ্রাহী জগৎ তাহাতে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। তারা যাচাই করিতে বসিল না বৈজ্ঞানিক হিসাবে এ গল্পের সত্যাসত্য, সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা। তারা ইহার ভিতর দেখিতে পাইল শাশ্বত রসবস্তুর এক অপূর্ব্ব প্রকাশ—তাই তারা মাতিয়া উঠিল। প্রকৃতের ক্ষেত্র ছাড়িয়া, অসম্ভবের জগতে কল্পনার অবাধ লীলায় যে কত অপূর্ব্ব রসের উদ্ভব হইতে পারে তার পরিচয় পাই রূপকথায়—সে রসের অনুভূতি যে আজও আমাদের বিজ্ঞানপুষ্ট মনে বিলুপ্ত হয় নাই তার পরিচয় আমরা পাই যখন তোমার বা আবিষ্ট

যেনিস, বাল্মীকি বা কালিদাসের অদ্ভুত রসবহুল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অপার আনন্দ অনুভব করি। যক্ষকে যে আমরা বাস্তব জগৎ হইতে বাতিল করিয়াছি, অভিশাপের বৈজ্ঞানিক ফলাফল সম্বন্ধে যে আমাদের অবিশ্বাস সন্দেহের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কি আমাদের মেঘদূতের রস অনুভব করিতে বাধা দেয়? যে কোনও দিন দেবযোনি বা অবতারের অদ্ভুত কার্য্যশক্তিতে বিশ্বাস করে না সেও কি বালকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়া পুলকিত হইয়া ওঠে না?

তেমনি, সেক্সপীয়ার যে গ্রীকবীর Theseusকে ইংরাজী পোষাকে সাজাইয়া যোল আনা ইংরাজী পরীরাজ Oberon ও তাঁর পত্নী Titaniaর সঙ্গে সংযোগসাধন করিয়াছেন, কিম্বা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকাবলীতে ঐতিহাসিক সত্যের ঝুড়ি ঝুড়ি অপলাপ করিয়াছেন তাহাতে কি তাঁর নাটকের রস আমাদের অন্তরে পৌঁছাইতে কোনও বাধা হয়। নীতি বা সমাজতত্ত্বের দিক হইতে স্থানে স্থানে নিন্দনীয় বলিয়া কি আমরা Anatole France এর উপন্যাসে আনন্দলাভ করিতে পারি না, না পেলিয়াস ও মেলিসাঁদার অবিমারক বা দুষ্মন্ত শকুন্তলার বা বিদ্যাসুন্দরের প্রেমকাহিনীর রসাংশ উপভোগ করিতে কুণ্ঠিত হই?

যার অন্তরে রসবোধ আছে কাব্য বা কথার মধ্যে রসবস্তু যার অন্তরের নিকষমণির উপর সোণার দাগ অভ্রান্তভাবে কাটিয়া যায় তার কাছে একথা বলিতে হয় না যে রসবস্তুর বিচারে এই সব ভারী-ভারী তত্ত্বপূর্ণ বিস্তার কোনও স্থানই নাই। তত্ত্বের বিচারে যাহা অগ্রাহ্য, রসের বিচারে তাহাই শ্রেষ্ঠ স্থান অনেক সময়েই অধিকার করে। অথচ আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে রসরচনা নিরন্তই এই সব তত্ত্বের তীক্ষ্ণ ছুরিকায় নির্ম্মমভাবে কাটা-ছেঁড়া হইয়া পরীক্ষিত হইতেছে। তত্ত্বের ভারী ওজনে যেখানে ফাঁকি ধরা পড়িতেছে সেইখানেই রসরচনা বাতিল হইয়া যাইতেছে। ইহা কি রসস্রষ্টার পক্ষে সাধারণ বিড়ম্বনা?

আজ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সাহিত্য সম্মেলনে আমি এ কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে সাহস করিতেছি, কেন না প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব লীলাভূমিতে, মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ-বিকাশ-বহুল এই পুণ্যক্ষেত্রে যে কত বড় রসের আকর সুদূর অতীত কাল হইতে নিহিত আছে তার সামান্য পরিচয় আমরা অল্পদিন হইল পাইয়াছি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে ও রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন মহোদয়ের চেষ্টায়। চন্দ্রকুমারবাবুর সংগৃহীত ময়মনসিংহের গীতি কবিতার যে ক্ষুদ্র অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে রসের ফোয়ারা ছিল, অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলে কবিতা লিখিত, অপূর্ব্ব কাহিনী রচনা করিত, গাহিত—আর ময়মনসিংহের অধিবাসী তাহা মুগ্ধ হৃদয়ে শুনিত। এদেশ ছিল রসের দেশ। শত কবির মুখে সহস্রধারায় এখানে রস প্রবাহিত হইত। সে ধারা শ্রোতার মনে আনন্দের সঞ্চার করিত

ময়মনসিংহের গীতি কবিতার মধ্যে ইতিহাস আছে, পুরাণ আছে, ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, সমাজতত্ত্ব

আছে—সে কালের লোক কি খাইত কি পরিত, কেমন করিয়া কাপড় প'রত, কেমন ঘরে বাস করিত, কোন্ কাজ করিত—সে সব কথা আছে এমন কি দার্শনিক গভীর তত্ত্বও সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার আলোচনা করিয়া Philology, Phonetics প্রভৃতি দুগম্ভীর গ্রীক নামধারী বিজ্ঞানের বহু উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আমার ভরসা আছে যে ময়মনসিংহের গীতিকার এই অনতিপরিসর গ্রন্থখানি লইয়া কালক্রমে এই সব ভারী তত্ত্ব লইয়া অনেকগুলি ভারী ভারী বই লেখা হইয়া যাইবে—তাদের চাপ আপনাদের আলমারী ও অন্তর সমানভাবে অনুভব করিবে। এই সব তত্ত্বকথা চিরকাল জগতে জয়যুক্ত হউক, আমার তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে—জগতের সারভূত যে তত্ত্ব তার ঈদৃশ বৃদ্ধিতে কার না সহানুভূতি থাকিবে? কিন্তু এই সব তত্ত্বের বোঝায় যদি রসেও টুপটুপ এই সংগ্রহের কাব্যরস, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের জন্য সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাটিপ্পনির মধ্যে পথভ্রান্ত শকুন্তলার রসের মত হারাইয়া যায় তবে পরিতাপের সীমা থাকিবে না। কেন না, এ গানগুলির ভিতর তত্ত্ব যতই থাকুক ইহাদের প্রধান মূল্য ইহাদের রসে। সে রস শুকাইতে শুকাইতে তার পরিক্ষীয়মান ধারার পথে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ও রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র যে বাঁধটা বাঁধিয়া দিয়াছেন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া যদি আমরা সে মরা নদীকে আবার কোনও মতে জীয়াইয়া তুলিতে পারি, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তরের যে স্বাভাবিক রসানুভূতি আছে তাহা পুনরায় কতকটা উদ্বুদ্ধ করিতে পারি তবে আমরা এ সৌভাগ্যের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব। এই আশায় আমি এই কবিতাগুলির রসাংশ কথঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি।

ময়মনসিংহের গীতিকার বিশেষত্ব এই অপরাপর পুরাতন গীতি-কথার মত এগুলির গল্পাংশ কোনও পৌরাণিক গল্প বা মনসার ভাসান বা বিদ্যাসুন্দরের পালার মত ভূয়োভূয়ঃ পুনরাবৃত্ত কাহিনীর নূতন প্রকাশ নয়। ইহার অধিকাংশই সম্পূর্ণ নূতন এবং সেকালের ময়মনসিংহবাসীর দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকগুলিই সত্যঘটনা বা সত্যঘটনামূলক চলিত ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ইহার গল্পগুলির ভিতর বাস্তব জীবনের স্বরূপ অনুভূতির প্রকাশ ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতিপ্রাকৃত বিষয় ইহাতে স্থানে স্থানে না আছে তা' নয়, কিন্তু ইহার রসের প্রধান আশ্রয় বাস্তবজীবনের হাসিকান্না, তার ভিতরকার সূক্ষ্ম tragedy ও comedy. সেইজন্য এ সব গীতিকবিতা পাঠ করিয়া আমরা আধুনিক উপন্যাস পাঠে যে রসের অন্বেষণ করি তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। ইহার ভিতর মানুষের অন্তরের বিকাশ দেখিতে পাই, আর সে অন্তরের ইতিহাসের ভিতর যে উৎকৃষ্ট রসের আকর আছে তার বহু নিদর্শন দেখি। এ সব গল্পের পাত্র-পাত্রী দেবতা নন, প্রকাণ্ড বড় রাজারাজড়াও ন'ন,—সামান্য মানুষ, আমাদেরই মত সাধারণ তাদের জীবন, সাধারণ তাদের অনুভূতি। মহাকাব্যের মত এগুলি নায়কের অত্যুৎকর্ষ হইতে গল্পের গৌরবের উপাদান সংগ্রহ করে না

সেইজন্য আমরা এ সব গল্পের রসের ভিতর পরিপূর্ণ সহানুভূতির সহিত ডুবিয়া যাইতে পারি। এই সহানুভূতি—পাঠকের অন্তরের সঙ্গে এই যোগ সৃষ্টি করিবার জন্য কবিদের মহাদেবকে একটি সাধারণ আধপাগলা নেশাখোর বাঙ্গালী ভদ্রলোক করিয়া আঁকিতে হয় না, হিমালয়-পত্নী মেনকাকে বাঙ্গালী গৃহিণী ও মাতার পদবীতে নামিয়া বসিতে হয় না—সাধারণ মানুষের কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তা বেদনা ও আনন্দ স্বচ্ছন্দ ও সহজভাবে পাঠকের অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দর রসানুভূতির উদ্বোধন করে। শুধু গল্প হিসাবে এ কবিতাগুলির অনেকগুলিই অতি সুন্দর। কাহিনী গাঁথিবার ভিতর যে সূক্ষ্ম রসবোধের প্রয়োজন, তাহা এই সব কবিদের যে প্রচুর পরিমাণে ছিল তার ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত আমরা এই সংগ্রহের ভিতর দেখিতে পাই।

“মহুয়া”র মত করুণ প্রেমের কাহিনী আমাদের সাহিত্যে খুব বেশী নাই। ইহার অংশগুলির বিন্যাসে কবি অপরূপ সংযম প্রকাশ করিয়াছেন, রসোদ্বোধনের জন্য যাহার প্রয়োজন আছে তার অতিরিক্ত কোনও কথাই তিনি বলেন নাই, আর যাহা বলিয়াছেন তাহা এমন করিয়াই বলিয়াছেন যে তাহা সোজা অন্তরের ভিতর গিয়া পৌঁছায়। গল্পের ভিতর রোমান্সের রসের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু আতিশয্য নাই। বেদের অজ্ঞাতকুলশীলা পালিত কন্যা মহুয়ার প্রেমে পড়িয়া ব্রাহ্মণ কুমার নদীয়ার চাঁদ দেশে দেশে ঘুরিয়া তার সন্ধান পাইল। বেদের তাকে পছন্দ হইল না, সে কন্যাকে আদেশ দিল নদীয়ার চাঁদকে বধ করিতে। কন্যা তাহাকে লইয়া পলাইল। পথে নানা বিপদের মধ্যে তার প্রেমের পরীক্ষা হইয়া গেল, শেষে তাদের মিলন হইল বনের ভিতর। কিন্তু সুখের দিন আসিতে না আসিতে চরম বিপদ ঘনাইয়া আসিল। বেদের দল আসিয়া তাদের আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, বেদে আবার মহুয়াকে আদেশ করিল নদীয়ার চাঁদকে হত্যা করিতে। মহুয়া তখন কাঁদিয়া বলিল,

“সোণার তরুয়া বন্ধু, একবার দেখ
আমার চক্ষু নিয়া তুমি নয়ান ভইর‍্যা দেখ

কিন্তু মহুয়ার করুণ আবেদনে বেদের মন গলিল না, সে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরী দিল। তখন মহুয়া ছুরী উঠাইয়া আপনার বক্ষে মারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ক্রোধোন্মত্ত বেদে তখন নিজ হাতে নদীয়ার চাঁদকে বধ করিল। তারপর অনুতপ্ত চিত্তে সে কন্যার সঙ্গে নদীয়ার চাঁদকে এক কবরে স্থাপন করিল মহুয়ার সখী পালঙ্ক সে কবর পাহারা দিয়া একলা বনে রহিল। এ গল্পের আদ্যোপান্ত এত সুন্দর, এত সংযত ও বাহুল্য-ও আতিশয্য-বর্জ্জিত যে ইহার ভিতর কোথাও কোনও সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের ক্ষীণ ইচ্ছাও কোন রসজ্ঞের মনে জাগিয়া উঠিবে না।

মলুয়ার গল্পাংশের পরিকল্পনায় ঠিক এতখানি সংযম নাই। কিন্তু এ কাহিনী দীর্ঘতর হইলেও ইহার ভিতর আদ্যোপান্ত গল্পের রস পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। মলুয়া প্রেমময়ী, সে সতী, অপূর্ব্ব দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও বুদ্ধি তার জীবন-কাহিনীর ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোড়া

শিকারের জন্য সমাগত নায়কের প্রতি তার প্রেমের উদ্রেকে যেমন আবেগ আছে তেমনি সংযম আছে। সে প্রেমে তার বাধা হইল বিনোদের দারিদ্র্য। সে নিরাশা সে সহ্য করিল।—সৌভাগ্যক্রমে বিনোদের অদৃষ্ট ফিরিল—এবার আর ঘটক ফিরিয়া আসিল না, মলুয়া আনন্দে বিনোদের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী গেল। কিন্তু দিনে দিনে তার সৌভাগ্য ক্ষয় হইল, একদিকে দারিদ্র্য আসিল, আর এক দিকে দুর্ভাগ্য পাপিষ্ঠ কাজীর লোকে তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। কুটনী পাঠাইয়া কাজী দুইবার মলুয়াকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল—মলুয়া নির্ভয়ে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কাজীর প্রস্তাব অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল। কাজী তখন দেওয়ানের নাম করিয়া বিনোদের কাছে মলুয়াকে চাহিয়া পরোয়ানা পাঠাইল। সে পরোয়ানা অগ্রাহ্য করায় তাহাকে ধরিয়া জীবন্ত কবর দিতে লইয়া গেল। বুদ্ধিমতী মলুয়া শিক্ষিত কোড়ার দ্বারা ভাইদের সংবাদ দিয়া তাহাদিগের দ্বারা স্বামীর উদ্ধার করিল—কিন্তু ইতিমধ্যে দেওয়ানের লোক মলুয়াকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। দেওয়ানের কাছে গিয়া মলুয়া কৌশলে আপনার সতীত্ব রক্ষা করিল আর তার শত্রু কাজীর প্রাণদণ্ড করাইল। তারপর আবার কোড়ার সাহায্যে ভাইদের সংবাদ দিয়া কোড়া শিকারের ছল করিয়া মলুয়া দেওয়ানের হাত হইতে মুক্ত হইল।

স্বামীর ঘরে ফিরিলে আত্মীয় কুটুম্বগণ চিরন্তন প্রথানুসারে সাহার মত সাধ্বী মলুয়ার চরিত্র-গৌরব গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া তাহার নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। তখন মলুয়া স্বামীকে আবার বিবাহ দিয়া নিজে "বাইর কামুলা" দাসী হইয়া স্বামীর ঘরে রহিল.

বাইর কামলী মলুয়ার মনে দুঃখ নাহি পায়।
বাইর কামুলার কাম করে মনের সন্তোষে।
সতীনেরে রাখে কন্যা মনের হরষে॥
তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাপের বাড়ী।
যতন করিয়া সেবে সোয়ামী শাশুড়ী॥

এইখানে সমাজতত্ত্বের বহু বহু জটিল প্রশ্ন উঠিতে পারে। নারীকের এই যে আদর্শ এটা বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ কি না? ইহা পুরুষের প্রভুত্ব-প্রিয়তার ফল কি না? ইহা দূর করিয়া ইহার স্থানে অন্য আদর্শের প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা আছে কি না, ইত্যাদি। কিন্তু কথার রসের বিচারে এসব প্রশ্ন একেবারে অবান্তর। রসের দিক হইতে এই চিত্রের যে সৌন্দর্য্য আছে কেবল সেই টুকুর দিকেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই!

তারপর বিনোদ সর্পাঘাতে মরিল। সকলে কান্নাকাটি আরম্ভ করিল—কিন্তু দৃঢ়চিত্ত-মলুয়া স্থিরভাবে বলিল,

"না কাইন্দ না কাইন্দ ভাই আমার কথা শুন
পরীখাইয়া দেখি একবার আছে কি না প্রাণ।"

তারপর সে স্বামীর দেহ লইয়া গেল—শিবের কাছেও নয়, যমের কাছেও নয়,—গাড়বী ওঝার বাড়ী। ওঝার চিকিৎসায় স্বামী প্রাণ পাইলে সতী তাহাকে লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিল।

পতি-জিয়াইয়া সতী ফিইরা আইল ঘরে,
জয় জয়ধ্বনি হইল জুড়িয়া নগরে।
কেউ বলে বেউলা জিয়াইল লক্ষীন্দরে।
কেউ বলে সতী কন্যা গেছিল দেবপুরে॥
হালুয়া দাসের গোষ্ঠি করিতে উদ্ধার।
বংশাইয়া সতী কন্যা হইল অবতার॥
পান ফুল দিয়া কন্যায় তুইল্যা লও ঘরে।
সতী কন্যা হইয়া কেন কাম্লির কাম করে॥
মরা পতি জিয়াইয়া আনে যেই নারী।
তাহারে সমাজে লইতে কেন দেমত করি।

কিন্তু হইলে কি হয়, বিনোদের মামা আছেন—তিনি হাঁকিলেন, "যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাত যাইবে তার।" বিনোদের পিসা আছেন—তিনি বলিলেন, "ঘরেতে না লইব কন্যা জাতি-ধর্ম্ম ছাড়িয়া।" বিনোদের বিপদের সময় অবশ্য ইঁহাদের নামগন্ধও শুনা যায় নাই। তখন তাকে পদে পদে রক্ষা করিয়াছে মলুয়া। আজ তার জাতরক্ষার জন্য চিরন্তন প্রথানুসারে এই নির্ব্বিকার কুটুম্বের দল কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইল। শেষ পরীক্ষার আহ্বানে জানকীর মত, সহিষ্ণুতার অবতার, ত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তির চরম দৃষ্টান্ত মলুয়ারও ইহা অসহ্য হইল। নীরবে সে ঘাটে গেল, ভাঙ্গা নৌকায় উঠিয়া সে তাহা মাঝ গাঙ্গে ভাসাইয়া দিল। শাশুড়ী ছুটিয়া আসিল, ননদিনী আসিল, ভাই আসিয়া সাধিল। স্বামী আসিয়া বলিল

"এমন কইরা জলে ডুবে আমার নয়নতারা॥
চান্দ সূরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর তো নাই চাই॥
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও।
একটিবার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও॥
ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্ম্মের দোহাই॥"

কিন্তু মলুয়া ফিরিল না। বিনয় বচনে স্বামী, শাশুড়ী ও সতীনকে সম্ভাষণ করিয়া মলুয়া ডুবিল—অভিমানিনী জানকীর মত সতী আত্মবিসর্জ্জন করিয়া তার মানরক্ষার শেষ উপায় অবলম্বন করিল।

চন্দ্রাবতী গল্পটীর tragedy আরও সূক্ষ্ম এবং আরও হৃদয়গ্রাহী। শৈশবের বন্ধু জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর প্রণয়ের উদ্বোধন হইল পুষ্পবনে। তাই কন্যা ফুলের ভাষায় তার হৃদয় দান করিল।

"বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মালতী বকুল।
আঞ্চল ভরিয়া তুলবো তোমার মালার ফুল॥
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে রক্তজবা সারি।
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি॥—ইত্যাদি।

বিবাহের আয়োজন হইল, বরের প্রতীক্ষায় কন্যার কুটুম্বেরা বসিয়া আছে, কিন্তু বর আসিল না। জয়ানন্দ ইতিমধ্যে এক মুসলমান নারীর মোহে পড়িয়া গৃহত্যাগী হইল।

পিতা কন্যার অন্য সম্বন্ধ খুঁজিতে লাগিলেন। কন্যার বুক ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু সে "মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আগুনে।" পিতা সম্বন্ধ খুঁজিতেছেন দেখিয়া, সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া স্বল্প সংযত কথায়

চন্দ্রাবতী বলে "পিতা মম বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া, রইব আইবর॥

বুদ্ধিমান ধর্ম্মপ্রাণ পিতা কন্যার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাকে শিবপূজা করিতে ও রামায়ণ লিখিতে আদেশ দিলেন। কন্যা একনিষ্ঠভাবে শিবপূজা করে, রামায়ণ লেখে,

শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাহি হাসি।
একরাতে ফুটা ফুল ঝইরা হইল বাসি॥

এমন সময়ে জয়ানন্দের মোহ ভাঙ্গিল। পরিভূত প্রেম অন্তরে আবার জাগিয়া উঠিল—সে চন্দ্রাবতীর জন্য আকুল হইয়া উঠিল। চন্দ্রাবতীকে সে পত্র লিখিল—

"একবার দেখিব তোমায় জন্ম শেষ দেখা।
একবার দেখিব তোমার নয়নভঙ্গি বাঁকা॥
একবার শুনিব তোমার মধুরস বাণী।
নয়নজলে ভিজাইব রাঙ্গা পা দুইখানি॥
না ছুঁইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া।
পুণ্যমুখ দেইখ্যা আমি জুড়াইব অন্তরা॥

* * * *

ভাল নাহি বাস কন্যা এই পাপিষ্ঠ জনে।
জন্মের মত হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে

এই দেখা চক্ষের দেখা এই দেখা শেষ ।
সংসারে নাহিক আমার সুখ শান্তির লেশ ॥"

পত্র পাইয়া চন্দ্রাবতী কাঁদিয়া ভাসাইল ।

নয়নের জলে কন্যার অধর মুছিল ।
একবার দুইবার পত্র যে পড়িল ॥

পিতার কাছে সে পরামর্শ চাহিল । পিতা বলিলেন "উচ্ছিষ্ট ফুল দেবকার্য্যে লাগে না । তুমি ওকথা ভাবিও না, যে কাজ লইয়াছ, সেই কাজ করিয়া যাও ।"

পিতার আদেশে কন্যা মন্দিরে প্রবেশ করিল, একমনে পূজা করিয়া চক্ষের জল শুকাইল ।

কিন্তু জয়ানন্দ ছাড়িল না । রাত্রে সে আসিয়া চন্দ্রাবতীর দ্বারে করাঘাত করিল – আকুল-কণ্ঠে কাতর আবেদন করিয়া জন্মের শোধ একটীবার শুধু তাকে দেখিতে চাহিল । ধ্যানমগ্না চন্দ্রাবতী কিছু শুনিল না । নিরাশ হৃদয়ে জয়ানন্দ মালতী ফুল দিয়া সে কপাটের উপর তার শেষ বিদায়ের পত্র লিখিয়া গেল ।

ধ্যান ভাঙ্গিলে চন্দ্রাবতী দেখিল কেহ কোথাও নাই —তখন সে দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল । দুয়ারে বিদায়-লিপি দেখিল । মন্দির অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া সে কলসী লইয়া জলের ঘাটে চলিল—কিন্তু

জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি ।
হেন কালে দেখে নদী ধরিছে উজানী ॥
একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ ।
জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ ॥
দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান ।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নমাসীর চান ॥
আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী ।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী ॥
স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ানচান্দে গায় ।
নিজের অন্তরের দুক্ষু পরকে বুঝান দায় ॥

এই সংক্ষিপ্ত সরস পরিসমাপ্তিতে যে অনুপম রসমণ্ডিত অচলচিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা পাঠকের মনের ভিতর স্থায়িভাবে বসিয়া যায় । এমন সংযত গভীর রসভূয়িষ্ঠ সমাপ্তি আজকালকার খুব বেশী গল্পে দেখা যায় না । অনেকের মতে ট্রাজেডিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিত্ব । সে শ্রেষ্ঠ রসের যে প্রকৃষ্ট অনুভূতি এই কবির রচনার সংযমের ভিতর দিয়া গভীরভাবে আলোড়িত হইয়াছে তাহাতে ইঁহাকে খুব শ্রেষ্ঠ কবি না বলিয়া পারা যায় না

আর অধিক কাহিনী উদ্ধার করিব না। কমলার কথা, দেওয়ান ভাবনার কথা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাঞ্চনরেখা, দেওয়ানা মদিনা প্রভৃতি প্রত্যেকটি কথায়ই আমরা ময়মনসিংহের প্রাচীন কবিদিগের গল্প গাঁথিবার সুকৌশল ও কথার প্রাণ যে রসানুভূতি তার প্রচুর পরিচয় পাই।

শুধু কাহিনী গাঁথিবার কারিগরিতেই এই কবিদের উৎকর্ষের একমাত্র দাবী নয়। কবিত্বের গৌরব ইহাদের সবদিক দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্লট বা গল্পাংশ কথাকাব্যের সৌষ্ঠবের অত্যাজ্য অঙ্গ হইলেও, ভাল প্লট হইলেই ভাল কথা হয় না। সে প্লটটি গুছাইয়া সাজাইতে হয়। তার ঘটনা সন্নিবেশে সুবিবেচনা ও রসগ্রাহিতার আবশ্যক। অরসিক কথক ঘটনার পর ঘটনা বসাইয়া যান, তাতে কথা জমে না, কিন্তু প্রকৃত রসিক তার ভিতর বাছবিচার করেন—ঘটনা সন্নিবেশে তিনি তাঁর রসজ্ঞানের পরিচয় দেন। তাহাতে যে কত প্রভেদ হয় তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে রামপ্রসাদের তুলনা করিলেই বুঝা যায়। এই কবিদের অনেকেরই এ বিষয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান অত্যন্ত সতর্ক ছিল। তাই অধিকাংশ কবিতায়ই দেখিতে পাই কথার স্রোতে রসের ধারা কোথাও বাধা পায় না তাহা অবাধগতিতে দুই কূলে রস ছড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোনও স্থানেই পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না, কোনও অংশই প্রায় নীরস হয় না। কাহিনীটির আদ্যোপান্ত তরল রজতধারার মত উজ্জ্বল, সুসঙ্গত ও সমতাযুক্ত।

তারপর বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা। ভাষা যদি সরস না হয় তবে বিষয়-গৌরব সত্ত্বেও কাহিনী নিস্তেজ ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়ে। ময়মনসিংহ গীতিকায় যে কয়টী কথাকাব্য সংগৃহীত আছে তাহার কোনওটিতেই ভাষার দৈন্য নাই। অলঙ্কারবহুল ভাষার ভারী চাল ও নীরস ঝঙ্কার নাই, আছে প্রাণের ভাষার সজীব সরসতা। এ কবিদের অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন না, তাই তাঁরা সেকালের পণ্ডিতের মত অভিধান মুখে করিয়া কথা বলেন নাই। আমরা পাইয়াছি তাঁদের প্রাণের সহজ কথা। যে ভাষায় তাঁরা ভাবিয়াছেন সেই ভাষায় গান গাহিয়াছেন—তাই প্রাণের টাট্‌কা অনুভূতি সোজা শ্রোতার অন্তরের ভিতর ঘা দিয়াছে। যার খাঁটি কবির প্রাণ আছে তার অনুভূতির ভাষা রসবহুল হইতেই হইবে। এই পদগুলির রচয়িতারা ছিলেন খাঁটি কবি, তাঁদের অন্তরের রসবাহুল্যের ফলে তাঁদের অনুভূতি শোভামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে আর প্রাণের সরল ভাষায় সে অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁদের প্রকৃষ্ট রসানুভূতি ভাষাকে সহজ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে পরিচ্ছদ বা বন্ধনরূপে স্বীকার করে নাই, তাই তাহা সে অনুভূতির সকল গৌরব বহন করিয়া আমাদের অন্তরে পৌঁছিয়াছে।

ইদানীং সাহিত্যের ভাষা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমরা কোন ভাষায় লিখিব বাঙ্গলার পণ্ডিত সমাজ তাহার ছক কাটিয়া দিবেন, কবির ভাষা সে ছকের সীমা লঙ্ঘন করিতে

পারিবে না, এই রকম একটা প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা অনেক পণ্ডিতের লেখায় দেখিতে পাই। যাঁরা এইরূপ কথা বলেন, আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে তাঁরা রসসৃষ্টির স্বভাবদত্ত অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। যাঁহার এ অধিকার লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে তিনি জানেন যে ভাব ও ভাষার ভিতর যে দ্বৈতভাব—যে পরস্পর নিরপেক্ষতা তাঁহারা কল্পনা করিয়াছেন বাস্তবিক তাহা নাই। কবির চিত্তে যে রস জন্মে তাহা একটা ভাষাবিহীন ভাব নয়—ভাব সেখানে ভাষায় আকারিত হইয়া ফুটিয়া ওঠে। এমন অনেকে অবশ্যই আছেন যাঁদের ভাবোদ্রেক হয় কিন্তু তাঁরা সে ভাবের ভাষা খুঁজিয়া পান না। তাঁদের হয় তো শব্দ-সমুদ্রের মধ্যে তোলপাড় করিয়া কোনও মতে ভাবের একটা শাব্দিক আকৃতি গড়িয়া তুলিতে হয়। যেমন, এমন অনেকে আছেন যাঁরা ইংরাজীতে ভাবেন এবং তার পর চেষ্টা করিয়া বাঙ্গলায় তাঁদের ভাব ভাষান্তরিত করেন। কিন্তু বাগ্দেবীর যে বরপুত্র সর্ব্বাঙ্গীণ রসসৃষ্টির ক্ষমতা লইয়া জন্মিয়াছে তার ভাব ও প্রকাশের মধ্যে এই চেষ্টার ব্যবধান নাই। তার অন্তরে ভাব আপনার উপযোগী ভাষায় ফুটিয়া ওঠে। তাঁর চিত্তে ভাব আপনি আপনার ভাষা খুঁজিয়া বাহির করে, আর সেই ভাষায় আকারিত হইয়াই তাহা কবির চিত্তকে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল করিয়া তোলে। সে-ভাষা সেই ভাবের সহজ পরিচ্ছদ, তাহাতেই তার পর্য্যাপ্ত প্রকাশ। পণ্ডিত যদি কবিকে বলেন যে ঐ ভাষায় তার ভাব প্রকাশ করা চলিবে না, তাহাকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পোষাকী করিতে হইবে, তার অলঙ্কার পরিতে হইবে, কেন না, ইহার দ্বারা সাহিত্য ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে কবিকে কাঁদিয়া বলিতে হয় যে এ ভাষা সম্পূর্ণ আমার নয়, আমার ইহা বদলাইবার অধিকার নাই, আমার যেটুকু রসবোধ আছে এই ভাষাই তাহা প্রকাশ করিতে পারে, পোষাকী ভাষার ঝলমলে পোষাকে আমার এ কুটীর-রাণীর ক্ষুদ্র প্রাণটুকু চাপা পড়িয়া মারা যাইবে। অতএব তোমার সমাজ, তোমার সাহিত্য তোমার থাকুক, আমার ভাবের যে সহজ ভাষা তাহাতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

বাস্তবতাপ্রিয় সমালোচক, যাঁদের ভাব ও ভাষার রূপরস বিচার করিবার বাঁধা মাপকাটি আছে, তার বাহ্যিক পরীক্ষার অভ্রান্ত যন্ত্র আছে তাঁরা এ সব কথা হেঁয়ালি বলিয়া, উড়াইয়া দিবেন জানি; এখনও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে এই সব হেঁয়ালির ধোঁয়া উড়াইয়া কবির দল এই গুরুতর বিষয়টির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারের বাধা উৎপাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু কবি নাচার। কাব্য জিনিষটাই যে একটা অবোধ্য ব্যাপার। একটা বীজ মাটিতে ফেলিয়া দিলে সে যে কেন গাছ হইয়া বাহির হয় আর কেন যে তার সারা অঙ্গ বিচিত্র পুষ্পের শোভায় ভরিয়া ওঠে তার কোনও ব্যাখ্যা সে বীজও দিতে পারে না, বাহিরের মানুষও জানে না। তেমনি কেন যে কোনও কোনও মানুষের মনে রসের অনুভূতি প্রবল হইয়া কাব্যে বিকশিত হইয়া ওঠে তারও কোনও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নাই। আর সে

ভাব যে কেন একটা বিশিষ্ট ভাষার আকারে লইয়া কবির চিত্তে জাগিয়া ওঠে তারও কোনও ব্যাখ্যা নাই। যে বেলফুল বাগানে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাকে কেহ পদ্ম হইবার হুকুম করে না। কিন্তু কবির ভাব যে ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে হুকুম করিয়া তার চেহারা বদ্‌লাইবার চেষ্টা অনেকে করেন। কবি গাহিলেন,

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।

সমালোচক বলিবেন এ কথাটা সাধু ভাষায় প্রকাশ করা উচিত ছিল, বলা উচিত ছিল, "তুমি যে সুররূপ অগ্নি আমার অন্তরে প্রজ্বলিত করিয়াছ, সে অগ্নি সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।" অভিধান খুঁজিয়া দেখ ইহাতে অর্থের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বরং রূপকটা আর একটু সুস্পষ্ট হইয়াছে। আরও সুস্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে, "অগ্নি যেমন একস্থানে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তেমনি আমার অন্তরের সুর আমার অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।" অর্থ সুস্পষ্ট হইল। কিন্তু কবির হৃদয় বলিবে যে এ-ভাষা আমার ভাবের রূপ নয়। আমার অন্তরে যে রস জাগিয়াছে এ কথায় সে-রস নাই। সমালোচক যদি দাবী করেন যে তাঁর অনুবাদ সুন্দররূপে ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহাতে ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, যদি তিনি বলেন, কোথায় তোমার বাক্যের সঙ্গে আমার বাক্যের প্রভেদ, তখন ধরিবার ছুঁইবার মত, টেষ্ট-টিউবে পরীক্ষা করিবার মত কিছুই কবি দেখাইতে পারিবেন না। এই দুটি বাক্যের ভিতর যে প্রভেদ তাহা কেবল অন্তরের রসানুভূতির গোচর। এ অনুভূতি যার নাই, তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়াও এ প্রভেদ দেখান যাইবে না। কবির শুধু মহুয়ার মত বলিতে হইবে,

আমার বন্ধু চাঁদ সুরুজ কাঁচা সোণা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বান্ধা জুনি যেমন জ্বলে॥
সোণার তরুয়া বন্ধু একবার দেখি।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইর‍্যা দেখ॥

যে প্রকৃত কবি সে শুধু ভাবে সমৃদ্ধ নয়, তার ভাষার ভিতর তার ভাবের রস ফুটিয়া ওঠে। ভাষার এ রস—ইহাতে রচনার কৌশল আছে, শিক্ষা আছে, সাধনা আছে, কিন্তু সকল কৌশল ও শিক্ষার অতীত এক বস্তু আছে সে কবির অন্তর্নিহিত ভাষার রসবোধ। সেই রসবোধ কবির অন্তরে তার অজ্ঞাতসারে তার প্রকাশের ভাষাকে গড়িয়া তোলে, যতক্ষণ ঠিক মানানসই ভাষাটির সন্ধান না পায় ততক্ষণ সে অতৃপ্ত ও ব্যাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু ঠিক কথাটির সন্ধান পাইলে আনন্দে নাচিয়া উঠে। যে কথায় সে রসানুভূতির তৃপ্তি হয় তাহাতেই সে আপনার ভাব প্রকাশ

করে। সে ভাষার রূপ যে কি হইবে তাহা কবির শিক্ষা, সমাজ ও আবেষ্টনের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। বাঙ্গালী কবি যে ভাব বাঙ্গালায় লেখে, ইংরাজ কবি সেখানে ইংরাজী কথায় তাহা প্রকাশ করে। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সুমার্জ্জিত ভাষায় তাহা প্রকাশ করে, গ্রাম্য কবি তাহা গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ করে। কিন্তু সে ভাষার ভিতরকার মূল বস্তু একটা বিশিষ্ট রস—ফরমায়েস দিয়া সে ভাষার অনুবাদ চলে কিন্তু রসের অনুবাদ, অনুবাদকের সহজ রসানুভূতির অভিব্যক্তি ছাড়া হয় না।

এই সরল সত্য সম্বন্ধে যাঁর সন্দেহ হয় তাঁর ভিতর যদি প্রকৃত রসবোধ থাকে তবে তাঁকে একবার নিরপেক্ষ ভাবে Browning ও Tennyson-এর পাশে Burns-এর কবিতা পড়িতে বলিব। Bruke-এর সঙ্গে Dickens ও Kipling-এর গদ্য পড়িতে বলিব। আর পড়িতে বলিব রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী"র পাশে তাঁর "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর", নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রের পাশে দ্বিজ কানাইর "মহুয়া" ও চন্দ্রাবতীর "মলুয়া", যাঁরা ভাষার স্বরূপ লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন তাঁরা মনে করেন ভাষাটা ষোল আনা কারিগরির ফল, পরিপূর্ণরূপে artificial. তাহা যে নয় তাহা প্রত্যেক কবি একবাক্যে বলিবেন। ভাষা প্রধানতঃ রচয়িতার অন্তরের স্বাভাবিক বিকাশ। তার অন্তরে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার একটা সুরবোধ আছে, সেই সুরবোধ তার ভাষাকে নিয়মিত করে, বাহিরের শাসন তার অল্পই পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

ময়মনসিংহ গীতিকার একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহার ভাষা আদ্যোপান্ত রচয়িতার অন্তরের ভাষা। ইহার ভিতর সমাজের প্রত্যক্ষ শাসনের কোনও পরিচয় নাই। সামাজিক আবেষ্টন কবির অন্তরের সুরবোধ ও তার শব্দসম্পদ নিয়মিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু যে ভাষায় এই সব গীতিকা রচিত হইয়াছে তাহা কবির খাঁটি অন্তরের ভাষা। সে ভাষার সুর যেমন মধুর তাহার অন্তরঙ্গতাও তেমনি হৃদয়গ্রাহী। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিব

"হাড়িয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পড়ে চুল।
মুখেতে ফুট্যা ওঠে কনকচাম্পার ফুল॥
আগল ডাগল আঁখিরে, আশমানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখলে কন্যা না যায় পাশুরা।"

এই সংযমভূয়িষ্ঠ ভাষার ইঙ্গিতে মহুয়ার রূপের যে ছবি শ্রোতার অন্তরে আঁকিয়া দেয় তাহাতে রেখা নাই, ছায়াপাত নাই, কেবল একটা তীব্র আলোকের ঝলক আসিয়া তার রূপের রসাকৃতি অন্তরের ভিতর আঁকিয়া দেয়।

"তিস্তার পাহাড়ীয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি।
এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পারি॥

চর পইরা যাওরে নদী দুই চার দণ্ডের লাগি।
পার হইয়া যাইবাম মোরা এই ভিক্ষা মাগি॥"

মহুয়ার এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণনার বাহুল্য নাই। কিন্তু খুব একটা সুস্পষ্ট রসচিত্র ইহাতে অন্তরে জাগ্রত করিয়া তোলে। "ঢেউয়ে মারে বাড়ি" বলিয়া নদীর যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যে কেহ তেমন নদী দেখিয়াছে তার অন্তরেই সে নদীর ছবি একপায় জাগিয়া উঠিবে। সেই নদীর কূলে বসিয়া মহুয়া। নাগরের সঙ্গে পলায়নপরা পিতার অনুসরণ ভয়ে ব্যাকুলা মহুয়ার প্রাণ এ নদীর সম্মুখে আসিয়া যে কি আকুলভাবে কাঁপিয়া উঠিয়াছে তার পরিচয় দিয়াছেন কবি তার মুখে শুধু দুই কথার এই অসম্ভব প্রার্থনায়।

বনস্পতির চিত্রে যেমন একদিকে অপূর্ব্ব রূপবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি ফুটিয়াছে মহুয়ার চরিত্র-গৌরব।

"ঝরণার জল আনে কন্যা আনে বনের ফল।
তা খাইয়া নদ্যার চান্দের গায়ে হইল বল।
পার ডিঙ্গাইয়া যায় নদ্যার ঠাকুর সাথে।
অনেক দূরতে দুই জনা গেল এই মতে॥
বাড়ী নাইরে ঘর নাইরে থাক্কো যথায় তথায় থাকি।
উইরা ঘুইরা ফিরি যেমন বনের পশু পংখী।
সামনে পাহাড়িয়া নদী সাঁতার দিয়া যায়।
বনের কোকিল পংখী ডালে বইসা গায়॥

০ ০ ০ ০

সামনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।
এইখানে থাকিব মোরা দিবস রজনী।
চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ডালে পাকা ফল।
এইখানে আছয়ে কন্যা মিঠা ঝরণার জল।

তারপর তাদের বন্য জীবনে পরস্পরের যে সরল প্রেমলীলার বর্ণনা আছে তাহা arcadian জীবনের প্রেমের কোনও চিত্রের চেয়ে কম সরস নয়, অথচ ইহার মধ্যে কোনও মিথ্যা অভিনয় নাই—সরল ভাষায় সত্য সরল প্রেমময় জীবনের একটি সরস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা।
বাদ্যার ছেরি মান্যা ধুইছে কালা ধলা পাঠা॥
নদ্যার চান্দের জ্বর উঠ্যাছে মাথায় বেদনা তাত।
বাদ্যার ছেরি কাছে বস্যা শিরে বোলায় হাত।

কাটে যায় রে মইশ্যার চান্দ কোণাকুণি পথ।
বাপ্তার ছেরি ডাক্যা বলে কিন্যা আইলো নথ ॥
বনের ফল তুইল্যা আনে দুই জনে খায়।
মালাম পাথরে দুইয়ে শুইয়া নিদ্রা যায় ॥
রাত্রিতে থাকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুকে।
দিনেতে উঠিয়া দোঁহে ভরমে নানান সুখে ॥
হস্ত ধরি সুন্দর কন্যা ফিরে বনে বন।
পাড়িয়া আনে বনের ফল করিতে ভইক্ষণ।
বাপে ভুলে মায় ভুলে ভুলে ঘর বাড়ী।
দেশ ভুলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী ॥
মনের সুখে দুইজনে কাটে দিন রাত।
শিরেতে পড়িল বাজ এই অকস্মাৎ ॥

এই সরল অনাড়ম্বর মধুর চিত্রের পাশে মাইকেলের সুপরিচিত সীতার বনবাসের চিত্র তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, মাইকেলের ভাষা মার্জ্জিত, অলঙ্কার সুন্দর, ভাব উচ্চাঙ্গের, কিন্তু তাঁর সে চিত্রে এই গ্রাম্য কবির বর্ণনার আন্তরিকতা নাই, কেন না, তাঁহার বর্ণনার ভিতর প্রত্যক্ষ অনুভূতি নাই, ও বর্ণিত জীবনের সঙ্গে প্রকৃত সহানুভূতি নাই; দ্বিজ কানাইয়ের বর্ণনা তাঁর সরল সহানুভূতির রসে যেখানে সজীব হইয়া উঠিয়াছে, মাইকেলের চিত্র সেখানে শত শোভা সত্ত্বেও তার মত প্রাণবান্ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

দেওয়ান ভাবনার প্রথম মিলনের চিত্র কবিত্বরসে ভরপুর।

গাঙ্গের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে মাইল।
মাধবের সঙ্গে সোনাইর গো পরথম দেখা হইল ॥

* * *

চারি চক্ষু এক অইল রে পরাণ কাইড়্যা লইল।
কোন দৈবে মনের মানুষরে আন্যা দেখাইল ॥
কোন বা দেশে থাকে ভমরা রে কোন বাগানে বৈসে।
কোন বা ফুলের মধু খাইতে রে ভমরা উইড়া আইসে ॥
উইড়া উইড়া আইসে ভমরা রে ফির‍্যা ফির‍্যা যায়।
কোন বা ফুলের মধুর আশায় রে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
ধরতাম যদি পারতাম ভমরা রে রাইতের নিশাকালে।
কেশেতে বান্ধিয়া তোমায় রাখতাম খোঁপার ফুলে ॥

খাইতে দিতাম ফুলের মধু বইতে দিতাম পিঁড়ি।
শুইতে দিতাম শীতলপাটী সঙ্গে যাইতাম উড়ি।
পঙ্খী হইলে সোণার বন্ধুরে রাখিতাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোঁপায় রাখতাম তোরে।
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান ভরিয়া।
তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধু দেশান্তরী হইয়া॥

বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে যে কয় ছত্র চক্ষে পড়িল তাহাই উদ্ধার করিলাম। আরও অনেক স্থানের কথা মনে হইতেছে, কিন্তু উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিলাম। এই সব পদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান কথা ইহাদের পরিপূর্ণ আন্তরিকতা। ইহার ভিতর কোথাও ধনীর উদ্যানের সাজান রূপ নাই। এ যেন বনের ফুল, স্বচ্ছন্দভাবে আপন আনন্দের ভরে ফুটিয়া রূপ ছড়াইতেছে। আর এই আন্তরিক ভাষায় কবিগণ তাঁদের অন্তরের সুগভীর রসানুভূতি, প্রকৃতি ও মানব চরিত্র উভয়ের ভিতরকার রূপ-রস-আনন্দের পরিপূর্ণ সম্ভোগ অপরিক্রান্ত ভাষার অনির্ব্বচনীয় রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভাল গল্প, ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিলেই তাহাতে কথাকাব্য চরমোৎকর্ষ লাভ করে না। অবশ্য গল্পের রসটাই কথাকাব্যের প্রধান রস, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বহু গৌণ রসের অবতারণা না হইলে গল্প যতই ভাল হউক কাব্য সুন্দর হয় না। রসাল ভাষায় সুরসাল কল্পনায় বর্ণনার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূরিত হইলেই কথাকাব্য বাস্তবিক সার্থক হইয়া উঠে। এমন গৌণ রসের যে ময়মনসিংহ গীতিকায় অভাব নাই তাহা কতকটা আমার উদ্ধৃত পদগুলি হইতেই সুস্পষ্ট হইবে। ইহা ছাড়াও অনেক পদ উদ্ধার করিতে লোভ হয়, কিন্তু আমার বক্তব্য অতি দীর্ঘ করিয়া সকলের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না। এই গাথাগুলির অনেক স্থলেই অতি সুন্দর সহৃদয় প্রাকৃত বর্ণনা আছে। দুই চারিটি কথার ইঙ্গিতে, দুই চারিটি ক্ষুদ্র চিত্রের বিন্যাসে লক্ষিত বিষয়টির স্বরূপ ফুটিয়া ওঠে যেন জাপানী চিত্রকরের লীলা চালিত তুলিকার কয়েকটি রেখায় আঁকা একটি অপরূপ ছবি। রূপের বর্ণনায় কথাবার্ত্তায় ও অন্যান্য স্থানে বহু সুন্দর চিত্র অযত্নের সহিত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এগুলির মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে। আর সাধারণ প্রাচীন কবিদের রচনা হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে এসব চিত্র বা উপমা গতানুগতিকতা হইতে খুব বেশী পরিমাণে মুক্ত। মুখের রূপের কথা বলিতে গেলে যে পদ্মের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় সে উপমা এত প্রাচীন হইয়া গিয়াছে যে ইহার তলায় কবির চিত্তে যে কোনও বিশিষ্ট অনুভূতি আছে তার পরিচয় আমরা পাই না। কিন্তু যখন কন্যার রূপের বর্ণনায় কবি বলেন,

"মুখেতে ফুট্যা উঠে কনক চাম্পার ফুল"

তখন ইহার ভিতর যে মৌলিকতা আছে তাহা কবির চিত্তের সত্য বিশিষ্ট অনুভূতির পরিচয়

দেয়। এ উপমা সম্পূর্ণ সজীব বলিয়াই ইহা রসজ্ঞ শ্রোতার প্রাণের গোড়ায় একটা ঘা দেয়। তেমনি

সোণার তরুয়া বন্ধু একবার দেখ
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভৈরা দেখ।

এ কথায় "বন্ধুয়া"র যে রূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাহ্যিক রূপের নীরস গতানুগতিক বর্ণনা নয়, ইহার ভিতর অনুভূতির তীব্র আবেগ আছে. নায়িকার অন্তরে নায়কের যে রসরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উচ্ছ্বসিত আবেগে এই কথা কয়টির ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে।

এমন আরও শত শত দৃষ্টান্ত আছে। তাহা হইতে আমরা কবির যে পরিচয় পাই তাহা প্রকৃত কবি হৃদয়ের। এই কবিরা তাঁদের চিরপরিচিত আবেষ্টন হইতে অতি সামান্য সামান্য বিষয়ের লক্ষণধারা যে রস তাঁদের ভাষা ও কবিতায় সঞ্চারিত করিয়াছেন তার ভিতর চেষ্টা নাই, স্বাভাবিক কবিত্বের প্রচুর নিদর্শন আছে। এমন টাটকা, প্রাণভরা কবিতা প্রাচীন কবিদের দুই চারিটি ছাড়া অন্যের ভিতর বড় বিরল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

গিরীশ-স্মৃতি

(৫)

একদিন অপরাহ্ণ বেলায় গিয়ে দেখি শ্রীযুত গিরীশবাবু একাগ্রমনে শ্রীযুত রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী পাঠ ক'রছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি কি রবিবাবুর কবিতা পড়ছেন?"

গিরীশবাবু। রবিবাবু তো বাংলার কবি—তা পড়চি দেখে বিস্মিত হ'চ্চ কেন?

আমি। না—তা নয়। তবে আপনাকে নিবিষ্ট হ'য়ে কোনও দিন এসব বই পড়তে দেখিনি। রবিবাবুর কবিতা আপনার কেমন লাগ্‌চে?

গিরীশবাবু। দেখ ছন্দে আর ভাষার সম্পদে ভারতচন্দ্রের পর আর কেউ এত ক'রে বাংলা ভাষাকে সাজান নি। কবিতায় ইনি ছন্দের অনেক বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। শব্দের লালিত্যও খুব আছে।

আমি। ভাব?

গিরীশবাবু। যে আব্‌হাওয়ায় তিনি শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছেন তারও অনুযায়ী। ইনি প্রতিভাবান্‌ কবি তার সন্দেহ নেই। রবিবাবুর ছোট গল্পের তুলনা নেই —inimitable. তাঁর কবিতায় প্রকৃত কবির প্রাণ আছে।

আমি। অনেকে রবিবাবুর কবিতা পছন্দ করেন না।

গিরীশবাবু। কেন ?

আমি। লোকে ব'লে—অনেক কবিতার মানে বোঝা যায় না—Mystic. কেউ বলে effiminate ভাবে ভরা।

গিরীশবাবু। লোকে কোন্‌ কবিকে বল্‌তে বাকি রাখে ? লোকের কথা শুনে চল্‌তে হ'লে অনেককেই লেখা ছাড়্‌তে হয়। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের এখন এত আদর দেখ্‌ছ কিন্তু প্রথমে কি নিন্দা লাঞ্ছনা না তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে! চিরকাল নূতন কিছু দেখলে পুরানো দল প্রতিবাদ ক'রেছেন। এই দেখনা —আমি। বাংলা দেশে রঙ্গালয়ের সৃষ্টি ক'রেছি ব'লে নূতন পুরানো সবাই বিরোধী—সবাই তো আমার নিন্দে করে। কিন্তু যাঁরা নিন্দে করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই থিয়েটার দেখ্‌তে ছাড়েন কি ? এই জন্য যে-কেউ নূতন জিনিস দেশকে দিতে যাবে—তাকে সব রকম অত্যাচার সহ্য করতে হ'বে—উপায় নেই।

আমি। তবে সব সময়ে লোকমতকে উপেক্ষা করে প্রতিভাবান্‌ লোকে চল্‌বে ?

গিরীশবাবু। তা নয়। লোকমতকে শুন্‌তে হ'বে শুনে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হ'বে। কি জান, আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে নাটক লিখ্‌লেম, রঙ্গালয়ে অভিনয় করলেম, কিন্তু কি নিয়ে তারা নিন্দে করছে সে নিন্দের মূলে কিছু সত্য আছে কি না, তা ভেবে বিচার করে দেখ্‌তে হয়। তা ব'লে লোকমতে guided হতে হবে না। যেখানে তারা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চে না —তা তাদের বোঝাবার উপযোগী কর্‌তে হবে। যাদের জিনিসটা দিতে চাইচো তারা যদি —কি দিচ্ছ তাই না বুঝ্‌তে পারে তবে সে দানের ফল কি ?

আমি। অনেক বই যে গ্রন্থকারের জীবন কালে আদর পায় না কিন্তু পরবর্তী কালে তার আদর হয় —এরকম দেখা যায়। কৈ জীবিতকালে লোকে গ্রন্থকারের দান গ্রহণ করতে পারে নি ? তাই ব'লে গ্রন্থকারকে তো দোষ দেওয়া যায় না।

গিরীশবাবু। প্রতিভাশালী গ্রন্থকার তাঁর বল্‌বার বিষয় প্রাঞ্জল করেই বোঝাবার চেষ্টা করে থাকেন—তবে সেই ভাবগুলো তখন লোকে নিতে পারে না: এটা সত্য বটে। কারণ প্রতিভাবান্‌ কবি বা Prophet তাঁদের পরবর্তীযুগের অগ্রগামী দূত। তাঁদের বাণী নূতন আকারে দেখা দেয়; চলতি কালের লোকে তা সহজে ধরতে পারে না শুনতেও চায় না। কিন্তু এই লোকদের শোনানো বোঝানো দরকার। কেননা যদি তোমার ওস্তাদী রাগরাগিণী বুঝ্‌তে না পেরে লোকের ভাল না লাগে তবে তো তারা জোর ক'রে বল্‌তে পারে না—আহা

বেশ গাইছে ! হয়তো বাস্তবিকই তুমি ভাল গাইছ —সঙ্গীতজ্ঞ থাকলে বুঝ্তে পেরে তোমাকে আদর করতো ; এখানে বুঝ্তে হ'বে তোমার গান সর্ব্বসাধারণের জন্য নয় কেবল শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞের জন্যই । সেই রকম বিচার ক'রতে হবে কবি—শুধু কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট ভাবুকের জন্য—না সকলের জন্য ? তাই বুঝে জনসমাজে তার আদর হয় । একশ্রেণীর আধিপত্য শিক্ষিতের ভিতর অপর শ্রেণীর প্রভাব সর্ব্বসাধারণের উপর ।

আমি । কবি তো প্রকৃতির লীলা গায়ক । সে যাতে স্বতঃই আনন্দ পাবে তাই গেয়ে যাবে । সে তো আনন্দ ভোগ করতে এসেছে । কবি আপন মনে আনন্দে গায় —সে আপনার সুরে আপনি আনন্দে নৃত্য করতে থাকে, লোকে সেই আনন্দে সেই কণ্ঠের ধ্বনিতে আনন্দ পায় ।

গিরীশবাবু । বেশ—যদি কবির আনন্দে লোকে আনন্দ পায়, যদি কবির সুরে লোকের মন আনন্দে উথ্লে উঠে তবে তো বিবাদ তর্ক সব চুকলো ; প্রশ্নের—সন্দেহের তো স্থান নেই ; এই ব'লে গিরীশবাবু হেসে উঠে বল্লেন "তা তো নয় । যেখানে লোকে কবির আনন্দে আনন্দ পায় না—সেখানকার কথা হচ্ছিল না ?"

আমি । আজ্ঞে হাঁ । আমিই ভুল বলছিলাম ।

গিরীশবাবু । বেশ তুমি যদি আপনমনে গাইতে ভালবাস আপনার গানে যদি আপনি স্ফূর্ত্তি পাও তবে তা লোককে শোনাবার জন্য ব্যস্ত হও কেন ? সেটা যাতে সকলের ভিতর প্রচার হয় তা ইচ্ছে কর কেন ?

আমি । আজ্ঞে হাঁ, এটা খুব খাঁটি কথা । কবি শুধু নিজের আনন্দে নিজের জন্য কবিতা লেখেন না—যাতে জনসাধারণে তা প্রচার হয় তাও একটা উদ্দেশ্য বটে ।

গিরীশবাবু । যখন বাইরে প্রচার করবে—তখন লোকের বোঝ্বার মতো ক'রে দিতে হবে ।—কবি ভাবে বিভোর হয়ে গান ক'রে আপনি আনন্দ পান বটে কিন্তু সে আনন্দ লোকের ভিতর ছড়িয়ে দিতে চান । শুধু আপনি একলা ব'সে খেতে ভাল লাগে না —সঙ্গে দু' দশজন লোক ব'সলে আরও আনন্দ পায় ।—দান করার শক্তি সব চেয়ে বড় শক্তি । যে দান করে—সে যদি মান অভিমান রেখে দান করে লোকদেখান হিসেবে দান করে তবে সে দান সার্থক হয় না । কবির সে রসের অনুভূতিও artificial, দানও artificial. যে প্রাণ খুলে ষোল আনা দান করতে পারে তার দান কখনও বৃথা যায় না । সে দানে অসীম শক্তি । কবি যখন লোকের ভিতর সহজ সরল ভাবে লোকের বোঝবার মত ক'রে আপনাকে বিলিয়ে দেয় —তখন লোকের ভিতর একটা response একটা vibration হ'বে—কবির দানকে নিয়ে আনন্দে গৌরবে লোকে নেচে উঠ্বে ।

আমি । আচ্ছা মশায় —কাব্যের আদর্শ তো আনন্দ দেবার জন্য ।

গিরীশবাবু। কাব্যের আদর্শ রস আস্বাদ করা। এই রসাস্বাদে তোমার আনন্দ ব্যক্ত হয়ে উঠ্‌বে। রস না থাক্‌লে আনন্দ থাক্‌তে পারে না।—এই রসের মূলে আনন্দের ধারা ব'য়ে যায়।

আমি। সেক্সপীয়রকে তো বেঁচে থাক্‌তে লোকে গ্রহণ করতে পারে নি।

গিরীশবাবু। কে বলে? সেক্সপীয়রের নাটক সেক্সপীয়রের অভিনয় সে সময় লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুন্‌তো; শুধু পণ্ডিত-সমাজ—তখন তাঁকে সমাদর ক'রে নি। Mass intuitively তাকে নিয়েছিল।—হাজার হাজার লোক তখন তাঁর নাটকের অভিনয় দেখতে শুন্‌তে উদগ্রীব হ'য়ে থাকত—রাণী এলিজাবেথ থেকে সামান্য কুটীর রাণী পর্য্যন্ত। দেখ—আমাকে তো বাংলার সভ্য-সমাজ, পণ্ডিত-সমাজ পোঁছে না—শুনেছি আমার নাম শুন্‌লে তাঁরা নাক সিঁটকোন কিন্তু আমার দেশের আপামর সাধারণ লোক আমাকে ভালবাসে, তাদের ভালবাসাই আমার গৌরব করবার বস্তু। রঙ্গালয়ের পরিপোষক তারা—আমার নাটক গ্রহণ করছে তারা। এই আমার আনন্দ; তাদের—আনন্দে আমার আনন্দ। তাই আমার লক্ষ্য থাকে—তারা নিতে পারচে কি না? যদি তারা কোনও বই না নেয়—তখন আমি ভাবি—প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি—তাদের কি ক'রে বোঝাব—কি করলে আমার বক্তব্য তাদের বোধগম্য হ'বে। তুমি বই লিখে নিজে তারিফ করলে তো আনন্দ হ'বে না। যাদের দিতে চাইচো—তাদের মতন ক'রে দিতে হ'বে। শুধু ভাবের ব্যঞ্জনা—শব্দের দ্যোতনাই art নয়—যদি তা সকলের ভেতর হৃদয় স্পর্শ করতে না পারে। হৃদয় স্পর্শ করতে না পারলে সহৃদয়তা জাগ্‌বে না—সহৃদয়তা না থাক্‌লে সমজাতীয় ভাব হতে পার্‌বে না—সমজাতীয়তা না হ'লে—নাটকের বা অভিনয়ের রসের আস্বাদ—সম্ভোগ হ'বে না।

আমি। আচ্ছা মশায় mystic কবি কি?

গিরীশবাবু। যিনি দু'চার কথায় ইঙ্গিতে বক্তব্য ব'লে যান। সেই ইঙ্গিতেই পাঠকের মন কল্পনায় বিভোর হয়। কবির সেই কবিতার রসের আস্বাদে তখন সে আনন্দ পায়। কিন্তু ইঙ্গিত হ'লেও উদ্দেশ্যের নির্দ্দেশ থাকবে। খেই-ছাড়া ইঙ্গিত—কিছু নয়।—তাকে mystic বলা misnomer—All real poets are more or less mystic.—বিশেষ Lyric poets.

আমি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। ভাব যেখানে গভীর সেখানে সাধারণ লোক পৌঁছাবে কেমন ক'রে? কবি তো তখন একাই রসসম্ভোগ করেন।

গিরীশবাবু। ভাব যেখানে গভীর—লোকে বুঝ্‌বে যে এখানে ভাব গভীর—সেজন্য যদিও সে কবির মত সম্ভোগ ক'র্‌তে পারবে না—তবুও তার সমবেদনা জেগে উঠ্‌বে—কবির উপর শ্রদ্ধা ভালবাসা জেগে উঠ্‌বে সেই বোঝার ইসারাতেই রসের আস্বাদ পাবে আর কবির তাতেই আনন্দ। কবি জানে—একদিন না একদিন এই গভীরতা লোকের উপলব্ধি হবে।—লোকের সেই শ্রদ্ধা ভালবাসা আর অব্যক্ত উপলব্ধিতে কবির সম্ভোগ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠে। সেখানে তো কবি একা নয়!

আমি। আচ্ছা, আপনার বই যখন audience নিতে পারে না—যেটা failure হয়—তাতে আপনার দুঃখ হয় না।

গিরীশবাবু। Audience যখন নিতে পারে না, তখন বুঝি audience-এর মত ক'রে ঠিক বলা হয় নি।—আর success বা failure সব তাঁর হাত। কোন্‌টা কেমন জ'ম্‌বে তা কি আগে থাক্‌তে ঠাউরে কেউ ঠিক বল্‌তে পারে?

আমি। শোনা যায়, সাধারণতঃ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা বলেন যে audience-এর taste এমন হয়েছে যে ভাল বই জ'ম্‌বে না—কিম্বা এ ধরণের বই জ'ম্‌বে না। যাতে খুব নাচ গান আছে তা জ'ম্‌বে! তাঁরা তো audience-এর দোষ দেন।

গিরীশবাবু বিরক্তভাবে বল্লেন—"কি জান—থিয়েটার জমাতে হ'বে বলে কতকগুলো কুরুচিপূর্ণ নাচগানের অবতারণা করলে দর্শকদের রুচি আপনি খারাপ হ'য়ে যায়। যেখানে ভাল জিনিস দেবার কিছু থাকে না—সেখানে নাচগান দিয়ে দর্শকদের ভোলাবার চেষ্টা করা মানে আর্টকে একেবারে জাহান্নামে দেওয়া। ভুনিবাবু (শ্রীযুত অমৃতলাল বসু) আমাকে এক মস্ত লম্বা চিঠি কিছু দিন আগে লিখেছে। কাল এলে সে চিঠি তোমায় শোনাব।

আমি। কিসের বিষয়ে চিঠি?

গিরীশবাবু। বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের দুরবস্থা। আক্ষেপ করেছে এই যে আশা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য সবাই কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছিলেম তা নষ্ট হ'য়ে দর্শকদের রুচি অবনত হ'চ্ছে আর রঙ্গমঞ্চে সব রকম কদর্য্য নাচ-গান হাবভাবে লোকের কুরুচিপূর্ণ হচ্ছে—সবাই মিলে এস তার প্রতিবিধান করি। কিন্তু আমি তার আর এখন কি করবো! আমি তো আশা ক'রেছিলাম যে ভুনিবাবুদের তৈয়ারী ক'রে দিয়ে আমি থিয়েটার থেকে অবসর নিয়ে থাকবো। বিনির বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় একটা আড্ডা ব'স্‌তো—সেখানে up-to-date অভিনয়, অভিনেতা, dramatic art, histrionic art-এর সম্বন্ধে আলোচনা হ'ত। অভিনেতা অভিনেত্রীরা যাতে অভিনয়ের রস পায়—চিন্তাশীল হ'য়ে অভিনয় বিদ্যার মর্ম্মগ্রহণ ক'র্‌তে পারে—আর অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'র্‌তে পারে—সেই সব সেখানে আলোচনা হ'ত। সে সব খারাপ করলে কে? Serious drama-কে স্থানচ্যুত ক'রে শুধু কতকগুলো light society sketch pantomime দর্শকদের সামনে ধ'রে—নাচ গান হাব-ভাবে ভুলিয়ে রঙ্গালয়ের অবনতি করলে কারা? তার climax হ'লো half nude dancing. Histrionic art-এর এই কদর্য্য পরিণতির জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের শেষে পরিতাপ ক'র্‌তে হ'বে। আমার কি? আমার তো দিন ফুরিয়ে এসেছে—এখন নবোৎসাহে মেতে যৌবনের উদ্যমে লাগ্‌বার বয়স নেই!—Mere imitation is no art. স্বাধীন ভাবে যেটা আপনি বিকাশ পায় তাই লক্ষ্য ক'র্‌তে হয়। সে বরং অনুকরণের চেয়ে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ।

আমি। আচ্ছা মশায়, অনেকে বলে আপনার নাটকে কতকগুলো character আছে যা overdrawn—

গিরীশবাবু। যাঁরা বলেন তাঁরা human character, thorough study ক'রেন নি। আমি চোখে না দেখে কিছু লিখিনি। প্রফুল্লের—যোগেশ, রমেশ, হারানিধির—অঘোর—সব আমার চ'খে দেখা। আমার drama গুলো light reading নয়—serious mood-এ seriously think না ক'র্‌লে সব বুঝ্‌তে পার্‌বে না। Superficially আমার drama পড়া চল্‌বে না।

আমি। তা হ'লে আপনার নিজের একটা confidence আছে যে একদিন না একদিন আপনার বই appreciated হবে।

গিরীশবাবু। সব ঠাকুরের ইচ্ছে। তবে আমি বই লিখ্‌তে লোককে ফাঁকি দিই নি। যেটা feel করেছি—যে সত্য practical life-এ realise ক'রেছি—যা জীবনে মরণে পরম সত্য ব'লে জেনেছি—তাই সবার ভিতরে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রেছি। তবে গর্ব্ব করি নি। ঠাকুর ব'লেছেন—এতে অনেকের উপকার হ'বে—তা বিশ্বাস করি। তাঁর কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে গেলে যা কিছু কর্‌চি তাঁর কাজ কর্‌চি—তাঁর কাজ হ'লে নিশ্চয়ই তাতে লোকের কল্যাণ হ'বে। লোকের কল্যাণের জন্য হ'লে বইগুলোও লোকের কল্যাণকর হ'বে। এই বিশ্বাস—এই আমার যা confidence. নিজের শক্তিতে কিছু কর্‌চি নি। বুঝেছ?

আমি। আজ্ঞে হাঁ।

গিরীশবাবু। ঐ ভয় হয়। আমার ইচ্ছেতে কাজ কর্‌চি না তাঁর ইচ্ছেতে কাজ হচ্ছে! কে জান্‌তো বকলম্‌ দেওয়া এত কঠিন। কি জান--যারা ধ্যান কর্‌চে—জপ কর্‌চে—তারা আপনার খুসীতে কর্‌চে। হয়তো একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা - নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। কিন্তু এতে অহর্নিশি তাঁর চিন্তা করতে হয়। নিঃশ্বাস ফেলা কি না ফেলা—আমার ইচ্ছেতে না তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে—অনবরত এইটা লক্ষ্য রাখ্‌তে হয়। বাস্তু-সাপও কামড়ায় না, মানুষ কি সাপের থেকেও নীচ, অকৃতজ্ঞ!

আমি। আপনি যে নাটক লেখেন তা যে inspiration-এ লেখেন তা কি লেখ্‌বার সময় বোধ হয়!

গিরীশবাবু। কি বোধ হবে?—আমি দেখেছি আর-কে যেন আমাকে লিখিয়ে দেয়।—এই লাইনগুলো মা আমাকে হাত ধ'রে লিখিয়ে দিয়েছেন—

"বুঝ, দেবি, কলিযুগে কৃপা তব কত!
শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে
বিকল পরাণ তব,

নাহি জানি তবে
সবে "না" ব'লে তোমারে
ডাকিবে কলির নর।
ব্যাকুল অন্তর কত হবে, হৈমবতি!
ধন্যযুগ,
যাহে নাম—বলে মোক্ষধাম
লভিবে কীটাণু নরে।
সেবা তব শরণ লইবে,
অনন্ত পাবে
মন সম হবে মৃত্যুঞ্জয়
কোলে তুলে লবে তারে সতি।

আমি। এই ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস এখনকার লোকের পছন্দ নয়।—তাঁরা বলেন যতকিছু আজগুবি কুসংস্কার, অজ্ঞতা, জড়তা এই ধর্ম্মের নামে আশ্রয় পেয়েছে। বর্ত্তমান কাল এই মোহ থেকে ভারতকে উদ্ধার করতে চায়।

গিরীশবাবু উত্তেজিত ভাবে বল্লেন, "যারা এসব কথা বলে তাদের মত আহাম্মক দুনিয়ায় নেই! তাঁদের মোট কথা তো এই যে spirituality ছেড়ে ভারত materialismএর সেবা করবে! তা কখনও এ পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে হবে না। যদি কখনও সে দুর্দ্দিন আসে—তবে জগত থেকে ভারতের নাম লুপ্ত হ'বে—তার জায়গায় পাশ্চাত্যের অনুকরণে একটা সঙ্কর জাত জন্মাবে—যারা নাস্তিক, উচ্ছৃঙ্খল, লুব্ধ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, চিরদাসত্বকারী অদ্ভুত জীব! হাজার বছর গোলামী ক'রে—ভারত এখনও যে বেঁচে আছে—সে কেবল এই ধর্ম্ম ব'লে!

আমি। একে কি বেঁচে থাকা বলেন?

গিরীশবাবু। নিশ্চয়ই! ভারত যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ এখনও এদেশে ধর্ম্মবীর জন্মাচ্ছেন, অবতার মহাপুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে—প্রতিভাশালী, প্রখর বুদ্ধিশালী—giant intellect জন্মাচ্ছে এই পরাধীন পরপদদলিত অবস্থায় ভারত জগতকে নূতন message দেবার জন্ম ছুটছে—প্রাণশক্তির এর চেয়ে পরিচয় আর কি চাও? এখনও ভারত নিজস্ব হারায় নি! কিন্তু যেদিন এই পাশ্চাত্যের materialismএর ধাঁধায় এই নিজস্ব হারাবে—সেদিন ভারতের বিনাশ অবশ্য হ'বে জানবে!

আমি। তা হ'লে আমরা শুধু পূর্ব্ব পুরুষদের দোহাই দিয়ে জাম্বুর মত ব'সে থাকবো—আমাদের আর কোনও কাজ নেই?

গিরীশবাবু। কে বল্লে তোমাকে—আর কোনও কাজ নেই? এই আদর্শ মত তোমাকে

প্রস্তুত হ'তে হবে, সত্যকে নিবিড়ভাবে অনুভূতি করতে হবে, আর জগৎকে সে আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তাদের কল্যাণ সাধন ক'রবে! শুধু স্থাণুর মত অচল হ'য়ে ব'সে আছ ব'লে না এই দুর্গতি! দেশকালের সঙ্গে সঙ্গে যে বাইরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে তা তোমাকে adjust ক'রে নিতেই হ'বে। সেটা বাইরের form যেটা always changing—পরিবর্ত্তনশীল। এই দেখ থিয়েটার—ইংরেজ জাত dramaর, অভিনয়ের, stage-এর যা উন্নতি সাধন ক'রেছে—তা আমি নেব। তাদের ways of expressions—তাদের art নেব—কিন্তু সেটা আমাদের মত ক'রে নেব। আমাদের আদর্শ প্রচারে—সেগুলি যাতে সাহায্য করে—আমাদের ভাবগুলি যাতে অভিব্যক্ত করে—তাই ক'রতে হ'বে।—ইংরেজও যখন আমাদের কোনও বিষয় নেবে তখন তাদের মতন ক'রে নেবে।—হয় কি জান নূতনের জন্য সকলেরই একটা hankering আছে—সবাই নূতন চায়—সেই নূতন যদি উজ্জ্বল চাকচিক্যশালী হয়—তবে সহজেই চোখ ঝলসে যায়। মন তখন বিচার-বিমুখ হ'য়ে তার অনুকরণ করে।

আমি। তবে তো materialism সঙ্গে আমাদের spiritualityকে মেশাতে হবে?

গিরীশবাবু। spirituality কখনও materialismএর সঙ্গে মিশ খায়? এখনকার চেষ্টা তাই বটে—কিন্তু জেন spirituality is spirituality—materialism is materialism—ভারতে ধর্ম্মই হচ্ছে মূল প্রাণ—একেই অবলম্বন ক'রে রাজনীতি, সমাজনীতি—সাহিত্য গ'ড়ে উঠবে। সনাতন সত্য যা পূর্ব্বে কতকগুলো লোকের ভিতর আবদ্ধ ছিল—তা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়্চে—লোকের ভিতরে বিস্তৃত হচ্ছে। এই জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষরা বাইরের খোল বদলে দিয়ে যান—যেটা সাধারণ লোকে ধরতে পারে। যতটা সেই সত্য বাইরে প্রচারিত হয় ততটা জাতের ভেতর একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটে। তারই ফলে সমাজ পরিবর্ত্তিত হয়—অধিকতর উদার হ'য়ে সম্প্রসারিত হয়। সমাজে মানুষের ভেতর পরিবর্ত্তন হ'লে অন্যান্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটে। সেটা অনুকরণ নয়—সেটা আপনি সেই সনাতন সত্য বিকসিত হ'য়ে উঠে।

আমি। ধরুন—এই রাজনীতি—এটা তো পূর্ব্বে ছিল না—ইংরেজ প্রভাবে politics ভারতে এসেছে। এটা তো materialistic civilisationএর ফল।

গিরীশবাবু। বর্ত্তমান politics ভারতের রাজনীতি নয়।—materialistic politics ভারতের কোনও কল্যাণ করবে না।—কি জান—যখন বুঝবেনা এই ধর্ম্মভূমি ভারতে ধর্ম্মের বিনাশ হচ্ছে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হ'চ্ছে, ধার্ম্মিক সাধু সন্তানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, দুর্ব্বলের উপর পীড়ন হচ্ছে, স্ত্রীলোক অপমানিতা লাঞ্ছিতা হচ্ছে—কোটী কোটী ভাই অনাহারে কঙ্কালসার হ'য়ে মরে যাচ্ছে—এই ছবি যখন কা'রও প্রাণে জাগে সে ধর্ম্মের নামে জেগে উঠে—সেখানে দলাদলি নেই হিংসা দ্বেষ নেই—সেখানে আছে শুধু বুকে গরলের আগ্নেয়গিরির জ্বালা—প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে নিদারুণ দাহ—প্রতি রক্তবিন্দুতে ভালবাসার উষ্ণ স্রোতঃ।—সেখানে নেতাগিরি নিয়ে

কান্নাকাটা নেই, ফুলের মুকুট পরে রাজাগিরি নেই—বাগ্মিতার অনন্ত নির্ঝর নেই!—এখনকার politics কি জান—যদি একটা লাটগিরি পাই নিদেন লাট সভার সভ্য। দেশের জন্য কার প্রাণ কাঁদে? বিদেশী পোষাকে বিদেশী বুলিতে - বিদেশী হাবভাবে স্বদেশী politics! আর patriotismতো কত—বাপ দাদারা সব fools ছিল—আমি তাদের চেয়ে কত বাহাদুর দেখ! নিজের জাতের নিন্দে, দেশের নিন্দে, ধর্ম্মের নিন্দে—সব এদেশীর নিন্দে—আর বিলেতী সমাজ, বিলেতী পোষাক - বিলেতী খানা, বিলেতী আদব-কায়দায় বাবুদের মুখে জল আসে। এঁরা হ'লেন স্বদেশী-হিতৈষী patriot!

আমি। কিন্তু এখন তো বাংলাদেশে বাংলা বক্তৃতা নেতারা করছেন; স্বদেশী আন্দোলনে নেতারা ধুতি চাদর পেতে ধ'রে নিজেদের জাতীয়তার গর্ব্ব করছেন।

গিরীশবাবু। তাও out of policy. সরলতার দিক দিয়ে নয়। গিয়ে দেখ বাড়ীতে সে সাহেব—সে সাহেব!—এঁদের ভেতর দেখবে বেশীর ভাগ দেশের খবর রাখে না, রামায়ণ মহাভারতের জ্ঞান যা ইংরেজী ইতিহাসে পড়েছে। সেদিন যে ঠাকুর এদেশে অবতীর্ণ হ'লেন—স্বামিজী অবতীর্ণ হ'লেন—তাই যারা জানলে না, বুঝলে না-সেদিকে বুঝতে জানতে চেষ্টাই করলে না তারা আবার patriot—দেশ উদ্ধার করবে!—সে দিন অরবিন্দবাবু এসেছিলেন—তাকে আমি ঠাকুর স্বামিজীর কথাই প্রথম জিজ্ঞেস করলাম।

আমি। অরবিন্দবাবু কি বল্লেন?

গিরীশবাবু। দেখলাম—ঠাকুরকে বিশ্বাস করেন। আমি তাঁকে বল্লাম—তবে তিনি যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন স্বামিজী যা প্রচার করে গেছেন—সেই পথ অনুসরণ ক'রে ভারতের কল্যাণ-সাধান করা কি উচিত নয়?

আমি। অরবিন্দবাবু তার কি জবাব দিলেন?

গিরীশবাবু। চুপ ক'রে রইলেন। আমি যা বল্লাম—তা বেশ চুপ ক'রে শান্তভাবে শুনলেন।

আমি। আপনি অরবিন্দবাবুকে কেমন দেখলেন?

গিরীশবাবু। খুব সরল লোক কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবের একটা আবছায়ায় ঘুরছেন। সব "বাসুদেব" দেখছেন—তাঁর মনে হচ্ছে—এটাই বুঝি তাঁর বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুভূতি—একেই বুঝি বলে সর্ব্বত্র কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি। কিন্তু এটা যে তাঁর ভুল—তা কেউ বোঝাবার নেই। প্রথম আবেগে—অনুরাগের প্রথম তরঙ্গে-যে ছায়াদর্শন হয়—অরবিন্দবাবু ভাবছেন এটাই বুঝি প্রকৃতি দর্শন।

আমি। আপনি তা তাঁকে বললেন না কেন?

গিরীশবাবু। তাঁর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। তিনি যে দয়া ক'রে আমার এখানে এসেছিলেন—তাই যথেষ্ট। তবে আমার তাঁকে যা বলবার ছিল—তাঁকে যা জিজ্ঞেস করবার ছিল—তা ক'রেছি। যখন সরল লোক—তখন কালে সত্য তিনি উপলব্ধি নিশ্চয়ই করবেন। —এই রকম লোক কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে বেশীদিন টিকে থাকতে পারেন না। কি জান—দেশের জন্য সেই অনুভব করতে পারে—যে দেশকে জানে! যে দেশের দোষ গুণ নিয়ে সকলের চেয়ে ভালবাসে; যেমন কাণা খোঁড়া ছেলে মা বাপের কাছে পরম সুন্দর; দেখনি স্বামিজীকে—এক এক সময় সবাইকে গাল্ দিতেন, দেশকে, সমাজকে গাল দিতেন—সে গালের ভিতর ছিল প্রাণঢালা ভালবাসা। কিন্তু যদি কেউ দেশকে নিন্দে করতো তখন তিনি সিংহবিক্রমে তাকে আক্রমণ করতেন। কি জান—যে লোক নিজেকে assert করতে পারে না—তাকে কেউ যেমন পোঁছে না—তেমনি জাত যখন নিজেকে assert করতে পারে না—তখন সে জাত্‌কে কেউ পোঁছে না। যে খান দান ঘরের ছেলে, সে কেন অপরের এঁটো পাতে বস্‌বে!

আমি। মশায়—এটা ঠিক কথা;

গিরীশবাবু। কি?

আমি। যে খান দান ঘরের ছেলে সে কেন অপরের এঁটো পাতে ব'স্‌বে!

গিরীশবাবু। নিশ্চয়ই; এই দেখ নাটকে আমার আদর্শ সেক্সপীর কিন্তু তাই ব'লে কি তাঁর অনুকরণে ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার আঁকতে যাব—যেখানে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য আছে; যে দেশে ব্যাস বাল্মিকী কাশীরাম কৃত্তিবাস আছে—সে দেশে কি বিলেতী আদর্শ দেশকে দিতে যাব তা নয়। তাদের forms নেব as better means of expression. দেখ আমার গান শুনেছি লোকের ভিতর popular—মাঠে ঘাটে চাষা ভুষো পর্যন্ত গায়—তার কারণ যখন আমি গান রচনা করি—তখন আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা আমার আদর্শ থাকেন। তাই চাষার কুটীরে আমার গান হয়।

আমি। মশায়, কেউ কেউ বলে—আপনার নাটকগুলি গদ্যে হ'লে ভাল হ'ত—পদ্যটা কেমন অস্বাভাবিক। লোকে তো পদ্যে কথা বলে না।

গিরীশবাবু। বটে। পদ্যটা কি? ছন্দ সুর নিয়ে তো? আমাদের কথায় কি ছন্দ সুর নেই? শুধু গদ্যে বল্‌লেই স্বাভাবিক হ'ল আর পদ্যে বল্‌লেই অস্বাভাবিক হ'ল—এর মর্ম্ম আমি কিছু বুঝতে পারিনি। আজকাল অনেকে গদ্যে নাটক লেখেন—তা একদম স্বাভাবিক নয়। এত সাজান কথা—সে সে গদ্য পদ্যর বাবা! Most unnatural. সেক্সপীর—যাঁর মত নাট্যপ্রতিভা জগতে জন্মায়নি—তিনি নাটকে পদ্যের ব্যবহার ক'রেছেন। যদি অস্বাভাবিক হ'ত তবে তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। মাইকেল পদ্যে নাটক লিখে শর্ম্মিষ্ঠার ভূমিকায় লিখেছিলেন যে নাট্য সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে অমিত্রাক্ষরের চলন হ'বে। নাটকে পদ্য যে দরকার—তা তিনি

বুঝেছিলেন। মহাকবি কালিদাসও গদ্যে পদ্যে নাটক রচনা ক'রেছেন—তাঁরা সব অস্বাভাবিক ক'রেছেন—আর আমাদের বাবুরা স্বাভাবিকতাটা বুঝি এক চেটে ক'রেছেন।

আমি। রবিবাবুর "রাজারাণী" "বিসর্জ্জন" "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি পদ্যে রচিত।

গিরীশবাবু। হাঁ জানি।—গদ্য পদ্য দিয়ে স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতার বিচার হয় না। তোমার যা ভাব প্রকাশ করছ, যে চরিত্র ফুটিয়ে তুলচো—যে কার্য্য নির্দ্দেশ করচো—তার উপর স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা নির্ভর করছে। নাটককার সৌন্দর্য্য তোমার চোখে ধরবেন, কত ভাবের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করবেন—তা পদ্যে কখনও এত সুন্দর ব্যক্ত হয়, গদ্যে তেমন হয় না। পদ্যে সংক্ষেপে যেটা প্রকাশ করবে—ইঙ্গিত করবে—গদ্যে তা করতে গেলে অনেক বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। সমস্ত কলাবিদ্যার সমন্বয়—নাটক। পদ্যটা তা বাদ যাবে কেন? কোন কোনও বিষয় গদ্যে ভাল প্রকাশ পায় আবার কোনও কোন বিষয় পদ্যে ভাল ব্যক্ত হয়। বিষয়ের অবতারণার উপর সেটা নির্ভর করে। সমালোচকরা তা তলিয়েও দেখেন না—আর তাঁদের সে রসবোধও নেই। অরসিকের জন্য তো কাব্য নাটক নয়!

আমি। আজ্ঞে হাঁ! অনেকে শুধু না পড়ে, না বুঝে শুধু বাজে সমালোচনা করে।

গিরীশবাবু। এই দেখ সীতাহরণে রাবণ চরিত্র আঁকতে আমি তার পবিত্রতা ফুটিয়ে তুলে দেখিয়েছি। প্রথমেই রাবণ বলছেন,—

"এই হেতু—
যাচিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ-বলী!
নাহি নব রাজ্য, নূতন ভুবন
দিগ্বিজয়ে যাব পুনঃ।
নিত্য সেই কঙ্কণ ঝঙ্কার,
ল'য়ে ফুলহার
নিত্য আসে পুরন্দর;
স্বর্গে নাহি বিগ্রহ-সম্ভব।
নাহি রমণী ভুবনে
প্রেম-আশে সাধি যারে,
দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমায় ভজে,
ক্রীড়া রণে মন নাহি পূরে!
কহ নট নটী গণে
নৃত্য গীত করিবারে
অস্ত্রাগারে যাইতে না উঠে মন
বীরহীন এ সংসারে।"

এইটুকু পদ্যে যা expressed হ'ল গদ্যে করতে গেলে ঠিক এমনটি হ'ত না। এই ভাবগুলি বলতে গেলে গদ্যে অনেক ক'রে বলতে হ'ত।

আমি। আচ্ছা রাবণের এই দাম্ভিকতার ভাব আপনি বরাবর রেখেছেন ?

গিরীশবাবু। তুমি সীতাহরণ পড়নি ?

আমি। আজ্ঞে হাঁ আমি পড়িছি। তবে এমন ক'রে পড়িনি।

গিরীশবাবু। দেখ যে character প্রথম এসে নাটকে প্রবেশ করে সেইখানে তার চরিত্রের বীজ থাকে। এর পরে যখন নাককাণ-কাটা সূর্পণখা এল তখন রাবণ বোনের দুর্দ্দশা দেখে অবাক হ'ল—

প্রথমেই বল্লে

একি, একি সূর্পণখা !
এ দুর্গতি কি হেতু তোমার ?

কিন্তু যখন সূর্পণখা কেঁদে জানালে যে সে ফুল তুলতে গিয়ে এই রকম হয়েছে—খর দূষণ মারা গেছে—সে পালিয়ে এসেছে তখন রাবণ বলছে—

একি স্বপনের খেলা !—
তুই সূর্পণখা ?
কাটিয়াছে তোর নাক কাণ ?
অসম্ভব—অসম্ভব কথা,
হত খর যোদ্ধাপতি :
নটীগণে করে খেলা !

দাম্ভিক রাবণ সূর্পণখার কাতর ক্রন্দন—তার নাককাণ কাটা খর দূষণের মৃত্যু—সব ছল মনে ক'র্‌লে—ভাব্‌লে রাক্ষসী নটীরা রাক্ষসী মায়ায় খেলা দেখাচ্ছে ; তার মনেও যে বিভ্রম উৎপন্ন করতে পেরেছে তাই ভেবে রাবণ বলছে—

কহ কিবা নাম তব ?
আশ্চর্য্য নৈপুণ্য তোর
পুরস্কার লহ এ অঙ্গুরী ;
পাইলাম কুবের জিনিয়া !

দেখ একটা আংটা পুরস্কার দিচ্ছে—তাও ব'লে দিচ্ছে যে কুবেরকে হারিয়ে এটা এনেছি ! কিন্তু সূর্পণখা যখন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় ব'ল্লে—যে সে এই দুঃখে সাগরে ঝাঁপ দেবে তখন রাবণ বলছে—

সত্য সূর্পনখা !—
কালচক্র কাহার ফিরিল,
কোন্ কুল নির্ম্মূল উন্মুখ ?
কোন্ রাজ্য সাগর গ্রাসিবে ?
ছিল কেবা কোন্ রসাতলে
রাবণে নাহিক জানে ?

দেখ প্রতি কথা দাম্ভিক রাবণের চরিত্র ফুটিয়ে তুলচে। এইটুকু পদ্যে যত সংক্ষিপ্তভাবে fully expressed হয়েছে—গদ্যে সে রকম হ'ত না। এই সৌন্দর্য্যও থাক্তো না। বিষয় বুঝে আছে—আবার যোগেশের চরিত্র পদ্যে লিখ্লে তেমন ফুটে উঠবে না। "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল?" এই কথাটুকু আবার গদ্যে যেমন সংক্ষিপ্ত আকারে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে তা পদ্যে এক শ' stanzaতে হ'ত না। বিষয় বিশেষে ব্যক্তিগত স্থান বিশেষে নাটকে গদ্য পদ্যের ব্যবহার হ'য়ে থাকে। বুঝ্লে?

আমি। আজ্ঞে হাঁ।

গিরীশবাবু। ভাষার নির্ব্বাচন dramatistদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অভিনয়ের উপর অনেক নির্ভর করে। যাঁরা সমালোচক, নাট্যকার তাঁদের অপেক্ষা অনেক ভাবেন।

এই রকম আলোচনা করতে করতে হঠাৎ বেশ এক পশ্লা ঝড়-বৃষ্টি হ'ল। তখন আমি বল্লাম "বোধ হয় আজ আর কেউ আসবে না।—অবিনাশবাবু তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

গিরীশবাবু। না—আর একজন আস্বে!

আমি। কে, মশায়?

গিরীশবাবু। আমাদের মতিলাল; ঝড় হ'ক বৃষ্টি হ'ক—তাকে আজ পর্য্যন্তও একদিন কামাই করতে দেখিনি। সে একবার আস্বেই আস্বে।

এই কথা বলবার কিছু পরে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। আমিও উঠ্বো উঠ্বো কর্চি—ঠিক এমনি সময় শ্রীযুত শিশির মতিলাল এসে উপস্থিত হ'লেন। তখন আমাদের ভেতর একটা চাপা হাসির লহর ব'য়ে গেল।—অবিনাশবাবুও তখন নিদ্রাভঙ্গে উঠে বস্লেন। —আমি বিদায় নিয়ে চ'লে এলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

রূপ

রূপে তুমি মুগ্ধ প্রিয়?
যৌবনের বিকাশের তাপে
এবে দীপ্তি ভ্রান্তিভরা,—
মরুভূমে মরীচিকা কাঁপে।
এই রূপ—এই দৃষ্টি,
এ যে অদৃষ্টের আবরণ;

মোহের তন্দ্রার পারে
এস প্রিয়, লভি জাগরণ।
প্রাণের তরঙ্গ ভঙ্গে
এ লাবণ্য ফেনিল বুদ্বুদ;
কর স্পর্শ মহাসিন্ধু,
এস বন্ধু, এস দেবদূত।

আধুনিক ভারতীয় প্রতিরূপকলা

পোর্ট্রেট বা প্রতিরূপ আঁকার ভিতর একটা বিশেষ সাধনার ইতিহাস লুকান থাকে। একটা চেহারা দেখে হুবহু নকল করে' আর একটা চেহারা আঁকা অনেক সহজ মনে করে কিন্তু চিত্রকলার যাঁরা রসিক তাঁরা জানেন ওটাই এই শ্রেণীর কলাবিদ্যার ভিতর সব চেয়ে শক্ত কাজ।

কারও চেহারা দেখে ঠিক তেমনি আর একটি তৈরী করতে হ'লে আধুনিক যন্ত্রযুগে কোন পরিশ্রমেরই দরকার হয় না। এযুগে সবই কলে তৈরী হয়—কলে মূর্ত্তি তৈরী হচ্ছে, কলে গান হচ্ছে, কলে ছবিও হচ্ছে। ফটোগ্রাফীর যুগে সজীব চেহারাও অনায়াসে তৈরী করা হচ্ছে। প্রতি গৃহে যেমন কলের গানের ব্যবস্থা আছে—তেমনি ব্রোমাইড্ ছবির সংগ্রহও মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করে' তুলছে। এমনি করে' সাধারণের চোখে চিত্রবিদ্যাকে যেন প্রতিরূপের রাজ্য হ'তে দূর করা হয়েছে মনে হয়। কারণ হুবহু হিসেবে কলের চেয়ে নির্ম্মমভাবে কেউ মানুষের চেহারাকে শৃঙ্খলিত বন্দীর মত দাঁড় করাতে পারে না।

এত করে'ও পোর্ট্রেটের আদর কমেনি—শিল্পীর দুর্লভ হাতে আঁকা, শিল্পীর সুকুমার স্পর্শ-হিল্লোলের ছাপ-দেওয়া ছবির বহুমূল্য আয়োজন হ'তে কোন সভ্যতা বঞ্চিত হ'তে চায় নি। কারণ নকল চেহারা হিসাবে ব্রোমাইড্ ছবি ঠিক হ'তে পারে—কিন্তু চিত্রকলা হিসাবে হয়ত ওরকমের একটা ব্যাপার একেবারে নগণ্য। এজন্য চিত্রকলার ধর্ম্মে সংক্রান্ত করতে না পারলে ব্রোমাইডের নকল চেহারা বা তারই অনুরূপ হাতে আঁকা কোন প্রাণহীন চেহারা চিত্র বলে' দাবী করতে পারে না। একটা হুবহু চেহারারও হয়ত চিত্র হিসাবে এক কাণাকড়িও মূল্য না হতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে হচ্ছে। চিত্রকলা সাময়িক যে বিষয় নিয়ে নিজের ঐশ্বর্য্য উদ্ঘাটন করে, তা অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর হ'তে পারে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তা কলালীলায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে—

সে মুহূর্তে তা একটা অসীমের বাহন ও বার্তারূপে চোখে পড়ে; তা বর্তমানের ক্ষুদ্র পরিধিকে একেবারে ছাড়িয়ে যায়। এই রকম একটা বিশ্বতোমুখী স্বপ্রতিষ্ঠ স্বরূপ দান করতে না পারলে চিত্রকলা হিসাবে তার কোন মূল্য হয় না—নকল চেহারা হিসাবে তাকে যতই বাহবা দেওয়া যাক্ না কেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Rubens এই রকম অসাধ্য সাধন করতেন আশ্চর্য্যভাবে। তাঁর portrait গুলি বিশিষ্ট কাকেও উপলক্ষ্য করে' এমনি ভাবে একটা নূতন বার্ত্তা উপস্থিত করত যে তা'তে মনে হয় যেন দুনিয়ার কতকগুলি চিরন্তন মানবের আশা আহ্বান [illegible] হয়ে উঠ্‌ত Rubens-এর তুলিকাঘাতে; Rubens-এর প্রেয়সী বিখ্যাত Saskia তেমন রূপসী ছিল না। কিন্তু অমন অশোভন চেহারাকেও স্থলবিশেষে ছায়াপাত, ও অন্যত্র আলোকপাত করে' এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ক'রে Rubens অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দান করেছিল।

দুনিয়ায় সব চেহারা দেখ্‌তে ভাল নয়—অনেক সময় ভাল চেহারাও ক্যানভাসের জালে পড়ে' কদর্য্য হ'য়ে পড়ে। Back ground এর পার্থক্যে আলো ও ছায়ার তারতম্যে ছবির আকর্ষণ বদলে যায়। এ সমস্ত কারণে প্রতিকৃতি আঁকার হেরফেরের ভিতর অনেক রকমারি আছে যা' দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকরেরা বোঝে না এবং নিপুণ ভাবে বর্জ্জন, গ্রহণ ও পরিবর্ত্তনের কারুকার্য্যের ভিতর ঢুক্‌তে পারে না। এজন্য তারা যা' আঁকে তা' চেহারা হ'তে পারে—চিত্র হয় না।

অনেকে মনে কর্‌তে পারেন এই রকমের পরিবর্ত্তন ও বর্জ্জন না করেও কি আমাদের কাজ চলে না? কাজ চলে বটে কিন্তু সৌন্দর্য্যচর্চ্চা হয় না। Morgue-এর মৃতদেহের হুবহু চেহারার দরকার হয় কাজের খাতিরে,—ফেরারী আসামীর নকল চেহারার দরকার হয় পুলিস আদালতে—এ সবেরও দরকার আছে বই কি! চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে মানুষের শিরা-উপশিরা পরিপূর্ণ হুবহু duplicate শরীরের একটু ব্যতিক্রম হ'লে চলে না, কিন্তু medical college-কে কেউ সৌন্দর্য্য চর্চ্চার জায়গা মনে করে না এবং কঙ্কালশাস্ত্রকেও কেউ সুন্দরের উপনিষদ্‌রূপে কল্পনা করে নি।

চেহারাকে পটে ফেল্‌তে হলে দুটি উপায়ে করতে হয়—একটা হচ্ছে রেখার বিন্যাসে অন্যটি বর্ণের বিক্ষিপ্তিতে। এর ভিতরও যারা সমজদার তারা রেখা এবং রঙের কালোয়াতি—যেমন সঙ্গীতের কালোয়াতি সহজ কাম্য হয়ে থাকে তেমনি—প্রত্যাশা করে' থাকে। সেটুকু হ'তে বঞ্চিত হলে চিত্রকলার চৌদ্দ আনা নেশা হ'তে দর্শককে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এটুকু কলের সাহায্যে দেওয়া চলে না, Bromide enlargement-এর গণ্ডীর ভিতর এই সীমাহীন কারুপ্রবাহ খুঁজে পাওয়া যাবে না!

সৌন্দর্য্য সংস্কার যেমন মানুষের নৈসর্গিক, তেমনি চেহারাকে decorative করার চেষ্টাও মানুষের আদিম। প্রতিযুগে মানুষ, আভরণ ও অলঙ্কারের বিন্যাস-বৈচিত্র্য, বসনপারিপাট্য ও

আবরণের নিত্যনূতনত্ব, এমন কি সুচিক্কণ কেশকলাপের বন্ধনকলার বহুমুখিত্ব প্রভৃতি দিয়ে চেহারার রূপরেখাকে পরিবর্ত্তিত করে' এসেছে! ত্রিশ বছর আগেকার বাঙ্গালী যুবকের চেহারা এবং আধুনিক কলেজযাত্রী তারুণ্যের রূপভঙ্গীর ভিতর আকাশ পাতাল তফাৎ দেখতে পাওয়া যাবে—দশ বছর আগেকার উরোপীয় তরুণী এবং আজ কালকার তেজস্বী যুবতীদের বসনভূষণাত্মক মুখ ও দেহভঙ্গী কত তফাৎ! মানুষ শরীরকে এমনি ভাবে রূপের বাহন করে' নানা বৈচিত্র্য সম্পাদন করে' সুন্দরের কারু আহ্বানকে শরীরী করে' তোলে।

কাজেই কোন রকম বাঁধা গৎ যেমন তেমনি বাঁধা ভঙ্গীও কারও সুখরোচক হয় না। তাই রূপকলার শোভনত্ব সাধন করতে গিয়ে মানুষ নিজের চেহারাও বদলায়।

তেমনি বদলান চিত্রকলার খাতিরেও দরকার হয় ক্যানভাসের উপর—যাতে করে' চিত্রের স্বধর্ম্ম বজায় থাকে। পরধর্ম্ম অবলম্বন করে' এমন কি জীবন্ত মানুষের ধর্ম্ম অবলম্বন করে'ও ক্যানভাস-স্পর্শ রক্তের মানুষটি বাঁচতে পারেনা। রঙের ও রেখার মানুষটিকে রঙের ও রেখার কারুতার উপর শতদলের মত ফুটে উঠতে হয়। ওটার nervous system, এবং blood circulation-এর সঞ্জীবনী হচ্ছে অন্য জিনিষ। ওটার মূল্য আসল হিসেবে—নকল হিসেবে নয়; অর্থাৎ সুচিত্র হিসেবে mimicry বলে নয়।

সাধারণতঃ প্রতিরূপের ফরমায়েসের ভিতর দুটি জিনিষ কাম্য হয়ে' থাকে—একটা হ'ল চেহারাকে অর্থাৎ physical দিকটাকে সফলভাবে ফুটিয়ে তোলা—আর একটা হ'ল mental দিক অর্থাৎ ভাবের একটা বিশিষ্ট দিককে ফুটিয়ে তোলা। শিল্পীকে কোন লোকের প্রতিকৃতি আঁকতে হ'লে এ দু'টি বিষয় খুব খেয়াল করতে হয়। চেহারার সাদৃশ্য এবং ভাবগত একটা ব্যঞ্জনা থাকা প্রতিরূপকলার ক—খ—গ। সব শিল্পীকেই এসব করতে হয়—তা বলে সব শিল্পী যে উঁচুদরের হয় তা নয়। কলালীলার একটা বিশেষ প্রকাশ-কারুতা না থাকলে দেহের নকল করা যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি মনের অবস্থার নকল করাও অশোভন

হয়। আমাদের দেশের সৌন্দর্য্যশাস্ত্রের ভাষায় বল্‌তে হয়, "রসাত্মক" কর্‌তে না পারলে সমস্ত রচনাই ব্যর্থ তা' যতই চতুর ও প্রগল্‌ভ হোক্ না কেন।

আর্ট রসাত্মক হয় যখন তা'র ভিতর অখণ্ডতা ও পরিপূর্ত্তির শ্রী থাকে। এই অখণ্ডতা কোন rhythmic whole কে উপস্থিত কর্‌তে না পারলে হয়না। এটাই হ'ল কলার প্রাণ। মনের বিশ্লেষণে এবং শরীর বিশ্লেষণে অতি পটু বাক্যসঞ্চয়ও যেমন রসহীন হয় কাব্য-যশঃ আহরণ করতে পারেনা তেমনি হিসেবী ধূর্ত্ত চিত্রকর কৃত্রিমভাবে নানারকমের ভাবের সম্পর্কে প্রতিকৃতিকে অলীকভাবে ভারাক্রান্ত করে' অনেকের মন হরণের চেষ্টা করে। কিন্তু নিপুণ রসিকের পক্ষে মেকী আর্ট ভেদ কর্‌তে ক্ষণমাত্র দেরীও হয়না।

অনেকে এদেশের প্রাচীন প্রথামত চিত্রাঙ্কনের বিরোধী। এদেশের প্রাচীন চিত্রকলার ধারা সমগ্র এশিয়ার ধর্ম্ম ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জড়িত, তা' প্রাচ্যাঞ্চলের রসশাস্ত্র ও রসোপাসনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তা'র ভালমন্দ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব হবেনা অন্যত্র তা করেছি। তবে যারা সে ধারারও প্রতিকূল তারাও এদেশের প্রথামত প্রতিকৃতি রচনার দিকে তেমন বিমুখীন হবে মনে করিনে। কারণ শরীরের সাদৃশ্য বজায় রাখা হ'ল প্রতিরূপকলার একটা অঙ্গ এজন্য চিত্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন প্রতিরূপকলার সাধনা দেশের চোখে পড়া ভাল। ভারতীয় প্রতিরূপকলার চেহারা দেখে' আশা করি কলা সম্বন্ধে অনেকের মত বদলে যেতে পারে। যাঁ'র অদৃষ্টে ভারতীয় প্রথায় এঁকেছেন বলে' যথেষ্ট নিগ্রহ ঘটেছে আশা করি তাঁরই পক্ষে হয়ত সার্ব্বজনীন বরলাভও ঘট্‌তে পারে। অন্ততঃ তাঁর রচনাগুলি যে নিপুণভাবে দ্রষ্টব্য সে বিষয়ে কোন রসার্থীরই বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। এজন্য এ চিত্রগুলিকে মধ্যবিন্দু করে' ভারতীয় প্রতিকৃতিকলার সংগ্রহে পূর্ণ করে' একটা বিশেষ প্রদর্শনী খোলা একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

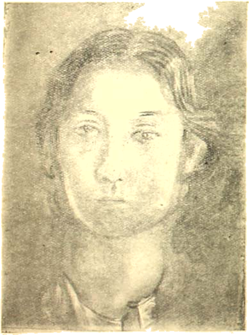

এদেশে পোর্ট্রেট আঁকার নানারকম scheme রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। অজন্তার চেহারার রেখাধর্ম, ও বর্ণযোজনা, বাগ, গ্রীস এমন কি মধ্যএসিয়ার চিত্রেও schematisation of natural forms এর অতি লোভনীয় সঙ্কেত ও পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রতিভার সাহায্যে সেগুলিকে সময়োচিত স্বাধীন আকারে রূপান্তরিত করে' নূতন রস সমাবেশ করা যায়। সে জন্য অনুকরণের প্রয়োজন হয়না। অবনীবাবুর ও' রকম একটা নূতন ধারা ও নূতন রসারোপের প্রতিভা অপূর্ব্ব আছে। শিল্পীর সংস্কারগত প্রেরণা না থাকলে ও' কাজ করা সম্ভব হয় না। এই পোর্ট্রেটগুলিতে দেখা যায় তিনি কোন পদ্ধতির গোঁড়া নন—প্রচুর মুক্ত বায়ু সঞ্চারের অবকাশ দিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। যে সমালোচক বলেছিল "He was moving from style to style" সে অতি খাঁটি কথাই বলেছিল। একজনের পক্ষে পোর্ট্রেটের এতগুলি style সামনে ধরা আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয়। এসব দেখে যদি তরুণ শিল্পীরা উদ্দীপনা লাভ করে তবেই শিল্পীর শ্রম সার্থক হয়।

এই ক্ষুদ্র সূচনায় চিত্রগুলির বিশেষভাবে আলোচনা দুঃসাধ্য। প্রতিচিত্র সম্বন্ধে এদেশে ও নানাদেশে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে—তা' আলোচনা করাও অসম্ভব। বিশেষতঃ উরোপের আধুনিক শিল্পীরা প্রতিচিত্র রচনায় যে রকমের স্বাধীন স্বেচ্ছাচার প্রবর্ত্তন করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করে' এই চিত্রগুলির বিশেষত্ব দেখানও সম্ভব নয়।

কলিকাতার কোন চিত্রায়তনের অধ্যক্ষ একবার লেখকের প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন যে ভারতীয় প্রণালীতে আঁকলে এদেশের ছেলেদের অন্ন জুটবেনা। তিনি বলেছিলেন "বছরের ভিতর এক আধটা প্রদর্শনীতে দু'একখানা ছবি বিক্রী করে'—যদি তাও হয়—কি শিল্পীর অন্ন সংস্থান হতে পারে? কাজেই দেখুন ও পথে যাওয়া ছেলেদের পথে মারাত্মক!"

অন্নপ্রশ্ন উঠলেই অন্য সব প্রশ্ন সামান্য হয়ে পড়ে—তার একটা প্রতিবিধান চাই। আমার মনে হয় অবনীবাবু যদি প্রতিচিত্রকলায় ভারতীয় প্রণালী প্রবর্ত্তিত করতে পারেন তবে শিল্পীদের অন্নসংস্থান-প্রশ্নের একটা মীমাংসা হয় এবং দেশের একটা বড় অভাব দূর হয়।

কারণ অনেক ধনকুবের এবং রাজোপাধিধারীরা ভারতীয় প্রণালীতে নিজেদের এবং আত্মীয়দের পোর্ট্রেট আঁকাতে ইচ্ছুক হ'ন—কিন্তু তেমনি কোন জীবন্ত প্রণালী নেই বলে তাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। অল্পকাল হ'ল বাংলাদেশের কোন নিপুণ কলারসজ্ঞা মহারাণী* লেখককে কোন শিল্পীর সন্ধান দিতে বলেছিলেন যাকে দিয়ে ভারতীয় প্রণালীতে portrait আঁকা সম্ভব হ'তে পারে,—তিনি ভূতপূর্ব্ব মহারাজের একখানা ছবি আঁকাতে চান। বলাবাহুল্য এই রকম ইচ্ছা প্রকাশ স্বাভাবিক অথচ সেই ইচ্ছা পূর্ণ করবার শিল্পী সংখ্যা সামান্য বললে হয়। অবনী বাবু যদি এ রকম একটা নূতন portrait paintingএর রীতি প্রবর্ত্তন করতে পারেন—তবে দেশের গৃহে গৃহে প্রতিচিত্রের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতে ভারতীয় আদর্শের নিপুণ ও গূঢ় রসধারা সহজ ভাবে উৎসারিত হ'য়ে কলালক্ষ্মীর অপূর্ব্ব শ্রী উদ্ভাসিত হবে।

এমন কি পশ্চিমেও এর একটা market তৈরী হ'তে পারে। কারণ ভারতীয় প্রণালীর যে একটা বিশেষ আবহাওয়া ও ভঙ্গী আছে—তা পশ্চিমের চিত্রকর কিছুতেই কোন portraitএ দিতে পারবে না। এজন্য সেখানকার বড়লোকেরা ও এদেশের এই নূতন আবহাওয়ার জন্য ছবির ফরমায়েস করবেন। সাহেব চিত্রকরেরা এদেশের ছবি আঁকলে যেমন তাঁতে একটা উগ্র উরোপীয় ভঙ্গী ও উরোপীয় আবেষ্টন এসে পড়ে তেমনি এদেশের চিত্রেও পশ্চিমের লোক একটা ভারতীয় সৌকুমার্য্য ও প্রাচ্যসাধনের লক্ষ্য ক'রে থাকেন—তা' একান্ত দুর্লভ এবং পশ্চিমের পক্ষে বিশিষ্ট-ভাবে লোভনীয়। কাজেই এ শ্রেণীর চিত্রের আদর সর্ব্বত্র হওয়া সম্ভব।

তা' যদি হয় তবে তরুণ চিত্রকরদের অন্নপ্রশ্ন আর উঠবে না। ব্রোমাইড্ ছবির পরিবর্ত্তে প্রতি গৃহে যদি তরুণ শিল্পীরা নিজেদের কাজ দিয়ে আমাদের গৃহশোভা বৃদ্ধি করতে পারেন তবে তা' খুব আনন্দের বিষয় হয়।

কিন্তু সেটা অবনীবাবুকে অনুকরণ করে' হবে না। ভারতীয় শিল্পের ভিতরও অবনীবাবুর নিজের পথ কোন দ্বিতীয় শিল্পীর পথ নয়। অবনীবাবু যে শিল্পচক্র রচনা করেছেন বা করবেন তিনিই তাঁর আদি, মধ্য ও অন্তনালার সাধক। আর্টের পথ অসীম। ভারতীয় রূপাদর্শ হৃদয়ে গ্রহণ করে' তরুণ শিল্পীদের নিজের পথ কাটতে হবে। তবেই অবনীবাবুর এই বহুমুখী চেষ্টার ফলভোগ তাদের ভাগ্যে ঘটবে।

অবনীবাবুকে যারা নিশ্চেষ্ট মনে করে এবং চিত্রকলা সম্বন্ধে কোন নূতন পথ বের কচ্ছেন না বলতে সঙ্কুচিত নয় তাদের পক্ষে অবনীবাবুর এই নূতন সাধনা চোখে পড়া ভাল। অবনীবাবু তাঁহার ক্ষেত্রে অলস নহেন—এখনও তিনি নিত্য নূতন রূপসৃষ্টিতে ব্রতী—শিল্পের আনন্দে এখনও তিনি ভোর। নিপুণ দ্রষ্টায় সহজেই দেখতে পাবে চিত্রকলাক্ষেত্রে অবনীবাবুর রচনা—তাঁরই পদ্ধতি

---

* কুচবিহারের মহামান্যা মহারাণী ইন্দিরাদেবী।

মতে যারা আঁক্‌ছে—তাদের তুলনায় কত উচ্চে অবস্থিত ; তাঁর অনুগামীরা বহু পশ্চাতে পড়ে' আছে। এই প্রবীণ শিল্পীর স্বপ্নরাজ্য বর্ণ, রেখা ও ভাবাবেশে এখনও সোনার হরিণের মত তরুণ শিল্পীদের দৃষ্টিকে বিপ্রলব্ধ কচ্ছে ! ভারতে নূতনতর আর্টের জন্য যারা উৎসাহী, তাদের আনন্দের বিষয় হচ্ছে এমনি ভাবে আদিম পথ কাট্‌বার প্রতিভাবান্ অন্তর এদেশে আছে।

অবনীবাবুর এই পোর্ট্রেটগুলির মধ্যে এই বহুমুখী চেষ্টার স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল প্রভা রয়েছে। তিনি কোনটিকে রেখালালিত্যের ভিতর দিয়ে এবং কোনটিকে toneএর ভিতর দিয়ে এঁকেছেন। কোনটিকে decorative emphasisএ এক কল্প-কুহেলি সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্তই একটি সুন্দর সন্ধানের নানাদিক্। নানাভাবে যে পোর্ট্রেট্ রচনা করা যায়—তিনি এদেশের পক্ষ থেকে, এদেশের আবহাওয়া ও শিল্পধর্ম বজায় রেখে' দেখাতে চেষ্টা করেছেন। Oil colour, tempera, water colour ও pastel প্রভৃতিতে পোর্ট্রেটের নানা বিচিত্রতা উপস্থিত হয়। কোনটিই অবহেলার বিষয় নয় আর্টের দিক্ হ'তে, কারণ প্রত্যেক পথেই নূতন রসসঞ্চারের সুযোগ থাকে। অবনীবাবুর যে pastel workএর ছবি দেওয়া হ'ল তা আশ্চর্য্যরূপে originalএ সৃষ্ট হয়েছে। ফটোগ্রাফে বর্ণের সূক্ষ্ম হিল্লোল, এবং কারু ভাবোচ্ছ্বাস ফুটে' ওঠে না, কাজেই মূল না দেখ্‌লে অন্ততঃ portrait সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ হয় না।

অবনীবাবু সবদিক্ দিয়েই এ ব্যাপারটিকে সফল কর্‌তে চেষ্টা কচ্ছেন। এজন্য নতশীর্ষে তরুণ শিল্পীদের এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কলিকাতার আর্টস্কুল এ বিষয়ে ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ভাল হয় না ? ওই স্কুল কি চিরকালই ত্রিশঙ্কুরাজ্যে বিচরণ করবে ? সে যা হোক্ এদেশের ধনপতিরা পশ্চিমের শুষ্ক চেহারা রচনা পছন্দ না করে' অবনীবাবুর হাতে কয়েকটা রচনার ভার দিয়ে দেখে একটা নূতন সৃষ্টির উৎসাহ সঞ্চার কর্‌লে ভাল হয় না ? অবনীবাবুরও তা'তে তুলিকাগ্রহণ সার্থক হয় এবং দেশেও নব জীবনের সাড়া পড়ে' যায়।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

লীলাময়ী

তোমার সৌন্দর্য মোরে করিছে পাগল
লক্ষ শত বর্ণ ধরি'
ওগো নারী, ওগো মহীয়সী
হর্ষহর্ষ-হৃদয়-হারিণি।
কতভাবে ধরা দিয়ে
কতরূপে কতবার বঞ্চিয়াছ মোরে,
ও সুন্দর উগ্র ভঙ্গিমা
আপন মাধুর্য দিয়ে করেছ পাগল।

বিক্ষোভ কটাক্ষ ঘাতে
পিপাসিত বুকের বাঁধিতে
জাগিয়া উঠেছে সকল।
তবু, মৃগতৃষ্ণিকার পিছে
ছুটিয়াছি রাত্রিদিন
তৃষ্ণা শুধু বাড়িয়াছে অনিবার।
নবরূপে মোহিনি তোমার
নাচিয়া উঠেছে মন নবোন্মাদ ছন্দে।

নির্ব্বাত প্রদীপ-শিখা,
তোমার ও বহ্নিমাঝে এ প্রাণ আহুতি দিয়া
চেয়েছি নির্ব্বাণ।
যে রূপের দুর্ব্বার জ্বালায় বহ্নিমুখ পতঙ্গ সমান
আপনারে লক্ষবার দিছি বিসর্জ্জন
হৃদয়ের যে তীব্র তিয়াসা
অতৃপ্ত রহিয়া গেছে, পরিত্যক্ত হোমকুণ্ডসম
ধূমায়িত বেদীতলে তার
চিতার লালসা শুধু ফেনাইয়া পড়িছে কেবল।

তুমি শুধু নয়ন সম্মুখে মোর
আপনারে দিকে দিকে বিস্তারিয়া
তুলিতেছ সৌন্দর্য্যের রস উছলিয়া
ভাসাইয়া নিয়ে যাও দূরে বহুদূরে
ভুলাইয়া জীবনের কূল।
চির-আকাঙ্ক্ষিত ধন,
মোহন পরশ তব ছুঁয়ে যায় অঙ্গমন
ছুঁয়ে যায়—সর্ব্বদেহে জাগাইয়া
আকুল পুলক-শিহরণ।
স্মৃতি-সুখবিলাসিনী—চিরপ্রিয়া মোর
কি শুনালে অপূর্ব্ব সঙ্গীত
এ যেন শুনেছি কবে, সে এক বাসন্তী পূর্ণিমায়
চিরপরিচিত সুর—এমনই মধুর।
কণ্ঠে ছিল বিজয়-মালিকা
স্তবকে স্তবকে তার রাশি রাশি কবরী কুসুম
নিখিলের অনুরাগে রঞ্জিন সুন্দর,
মন-ভৃঙ্গে করিল পাগল।
লুব্ধ যে নিরাশ হল—
ব্যথা নিয়ে ফিরিল না তবু,—
নূপুর বাজিয়া গেল,—নৃত্যতান, সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা
দূরে মিলাইয়া গেল;
শুধু তার মৃদুল গুঞ্জন
কানের পশ্চাতে [illegible]
ছায়ার মায়ার মায়া;
দূরাগত সুরের মহিমা
সতত জাগ্রত রাখে মন
যারে হারাইল তারে পুনরায় পাবে কতক্ষণ।
তুমি আস তুমি চলে যাও বরাঙ্গ হইতে
মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়ে লীলায়িত
অপরূপ ললিত ভঙ্গিতে,
নয়নে ঝিকরি' পড়ে তারা
সুকোমল বাহু লতা হ'তে
খসে পড়ে—অশোক মঞ্জরী।
ও নীল-নয়ন দুটি হ'তে
বিশ্বের সকল তৃপ্তি, সব শান্তি, সব বরদান
বৈশাখের মধু বৃষ্টিসম
ঝরে পড়ে তৃষিত ভুবনে।
দুই বিন্দু অশ্রুজল কভু
ছল ছল করি ওঠে স্নিগ্ধ আঁখি-পাতে
বিশ্বের সকল ব্যথা করুণার শুভ্র শতদলে
আপনি ফুটিয়া ওঠে যেন।
কভু হেরি বহ্নি বিদ্যুতের
আকাশের বুক চিরে
দিক্ হতে দিগন্তে চলিয়া যায়;
এ বুক ভাঙিয়া পড়ে, ঝলসিয়া ওঠে চোখ,
নূতন সৃষ্টির পথে দাঁড়াও আসিয়া
প্রত্যাশার চিরাতীত
প্রতীক্ষাকাতর প্রাণে—বড় সুকঠোর।

এ কি লীলা তব নারী,
প্রাণ নিয়ে এ কি খেলা তব?
সহস্র উন্মুখ প্রাণ আপনারে নূপুর করিয়া
দিবারাত্র বাজিতেছে পায়,
তোমার মন্দিরে দেবী
প্রেম-নিবেদন তরে, দাঁড়াইয়া অর্ঘ্য থালি হাতে
নিখিলের সব লোক,

জীবনের সেরা ফুলগুলি
চয়ন করিয়া গাঁথে মিলনের মোহনমালিকা ;
তোমার প্রসন্নদৃষ্টি লভিবার তরে
যুগযুগান্তর ধরি' চলিতেছে কঠোর সাধনা
আদি নাই অন্ত নাই তার,—
যোগাসনে চেয়ে দেখি হায়
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পূজার কুসুম
কখন চলিয়া গেছ মুখ ফিরাইয়া—
তুষ্টি তব কিসে হয়—কি দিলে যে মিলিবে প্রসাদ
বুঝিতে পারি না কিছু।
অতি তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র বনের মল্লিকা
তাও দেখি মৃদুহাস্যে হাতে লও তুমি
কতটুকু শোভা তার,
কতটুকু গন্ধ সে ছড়ায়,
তবু তারে বুকে রাখি, সহাস আননে তব
তৃপ্তির আনন্দ হেসে ওঠে।
আপনারে পরিপূর্ণ করি
নিত্যনব সৌন্দর্য্যবিভায়
উজল করিয়া আছ যৌবনের নব-বৃন্দাবন।
সেথা তব নিত্য নব লীলা
সুখের পিপাসা লয়ে ছুটে যাই আমি
সুধার ভরিয়া করি পান,
আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকি তোমার অমৃতপারাবারে,—
তরঙ্গ তরঙ্গ তোলে, ফেনাইয়া ওঠে রসধারা,
ভাসাইয়া নিয়ে যায়,
ডুবাইয়া দেয় কভু অতল গভীর নির্ব্বাসনে।
তবু যে শুকায়ে ওঠে দেহ
জিহ্বা তালু শুষ্ক হয়ে-যায়,
মনে হয়, জীবনের যত তৃষ্ণা হৃদয়ের যতকিছু আশা
সকলই রহিয়া গেছে,
বিন্দুমাত্র মিটে নাই যেন।
এই যে অতৃপ্তি ভার
যুগ হ'তে যুগান্তরে জীবন মরণ আলোড়িয়া
এ শুধু তোমার লীলা!
প্রাণ লয়ে খেলা করিবার
এ কেবল দুর্ব্বার প্রেরণা
তোমার চঞ্চল করে, আমারে পাগল
সচকিয়া ধরণীরে চলে যায়, ফিরে ফিরে আসে।

তুমি কি চাহ না কিছু?
ঐ রূপ, ও মাধুর্য্য ঐ তব তনুর তনিমা
একি শুধু ভুলাইতে মন?
কাম্য তব কিছু নাহি আর?
নয়নে চাহিছ যাহা, ভঙ্গিমায় যে কামনা তব
লাবণ্যে ভরিয়া ওঠে,
অন্তরের যে গোপনবাণী লজ্জানম্র হাসিতে ফুটিছে
সে ত কভু মিথ্যা নয়।
তুমি চাহ লীলা সহচর,
আমার কাননবনে তুমি মোর নর্ম্মসহচরী
পলে পলে তোমার যে বিচিত্র মাধুরী
আমারে আশ্রয় করি' উঠিছে বিকশি'
তুমি তাহা ভাল জান ভাল জানি আমি।
তবু যে দাও না ধরা
দু' বাহুর বন্ধন ছাড়ায়ে তুমি যে পালাতে চাও
তাই ভাল লাগে
তাই মোর বড় ভাল লাগে।
তোমারে যে বিরহ-বেদনা
অশ্রুর প্রবাহে রচে পুণ্যময়ী শোকের সরযূ
আমি তাহে তীর্থস্নান করি।
তোমারে হারাই তাই, অহর্নিশি তোমারেই চাই ;
চলে যাও তাই ফিরে আস।
পূজার নৈবেদ্য ফেলি মিলনের মন্দার মালিকা
সাগ্রহে তুলিয়া পর গলে,
তাইত তোমারে ভালবাসি
দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘ দিনমান
তোমারি প্রতীক্ষাভরে তাইত রয়েছি জাগি'
অপলক দৃষ্টি প্রসারিয়া।

হৃদয়ে হৃদয়ে মোর প্রেমের সঙ্গিনী তুমি
গো সুন্দরী আনন্দদায়িনী।
প্রতি অঙ্গ তব সঙ্গ-লোভাতুর,
হিয়া কাঁদে হিয়ার পরশ লাগি',
তাইত তোমারে চাই একেবারে নিঃশেষ করিয়া,
বুকে বুক মুখে মুখ
নয়ন জুড়াতে চাই, এই দুটি নয়ন-কমলে;
কুসুম-পেলব ওষ্ঠপুটে
জীবনের সর্বশেষ পরম বাসনা
রহিয়াছে স্থির হয়ে
আমি চাই পরিতৃপ্তি তার।
তোমারে বাঁধিয়া মোর ক্ষুধাতুর বাহু আলিঙ্গনে
আমি চাই মুক্তির প্রসাদ।
যুগে যুগে আমি তব গাহি জয়গান
বদ্ধমানে পরাণের নাহি রব।
আমারে করিও তব লীলা-সহচর
আনন্দের রঙ্গের সাগরে
আমি চাই নিত্য নব লীলা
ওগো মোর লীলার সঙ্গিনী
লীলা তব ধন্য হোক, ধন্য হোক নারীর মহিমা।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দশচক্র

(১৪)

গৌরী আশ্রয় পাইল। গৌরব পাইল না। ইহাকে গৌরব দিতে পারে এত গৌরব খুব কম সমাজেরই আছে। ভূপতি বা প্রতিভার স্নেহে কোন কার্পণ্য ছিল না। বরং প্রতিভার দিক হইতে আদর যত্নের অতিবৃষ্টিই ছিল। কিন্তু দাসদাসীদের কাণাকাণি বন্ধ করিবে কে? অগৌরব সহ্য করা গৌরীর অভ্যাস আছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে যে অশান্তি হইতে লাগিল, তাহাকে লইয়া সরোজ ও তাহার স্ত্রী যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিল, ইহা মরুভূমির তপ্ত বালুর মত তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। অথচ দিগ্‌দিগন্তে কোথাও পলাইবার পথ নাই।

একদিন সরোজের স্ত্রী তাহার সমক্ষেই তাহার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ভূপতিকে বলিলেন "বাবা, আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলুম।"

ভূপতি। বল।

সরোজের স্ত্রী গৌরীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এঁর সম্বন্ধেই। আপনি কি এঁকে বাড়ীতে রাখাই ঠিক করলেন?"

গৌরীকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া ভূপতি বলিলেন, "হাঁ, আপাততঃ। যতদিন না আর কোথাও ঠিক হচ্ছে।"

সরোজ স্ত্রী। একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে—

ভূপতি। আমি দুশ্চরিত্র লোক ভালবাসি। নিজে দুশ্চরিত্র কিনা।

সরোজ স্ত্রী। নিজে আপনি কি, তা আমি জানি না। তবে আমাদের দিকটা ত একটু দেখ্‌তে হয়।

ভূপতি। কৈ, তোমাদের সঙ্গে ত ওর কোন সম্পর্ক নেই।

সরোজ স্ত্রী। বাড়ীর মধ্যে একটা কুদৃষ্টান্ত ত।

ভূপতি। কুদৃষ্টান্ত? ওকে দেখে তোমার ঐ রকম হতে ইচ্ছে হচ্ছে?

সরোজ স্ত্রী। ধিক্, আর কি! ওরকম হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

ভূপতি। তা হ'লে দৃষ্টান্তটা সু বল্‌তে হবে। ও তোমার মনের সৎপ্রবৃত্তি বেশী ক'রে জাগিয়ে দিচ্ছে।

সরোজ স্ত্রী। আপনি যা ইচ্ছে হয় ব্যাখ্যা করতে পারেন। আমি শুধু বল্‌তে এলুম আমি এ কুসংসর্গে থাক্‌বো না।

ভূপতি। ওর সঙ্গে বেশী মেশামেশি করচো না কি? নাই বা কল্লে।

সরোজ স্ত্রী। মেশামেশি নয়। যে বাড়ীতে উনি থাক্‌বেন, সেখানে আমরা থাক্‌বো না এই মাত্র।

ভূপতি। কি করি বল? আমি যা' তাই যদি থাকি ত তোমরা ঘরে টিঁক্‌তে পারবে না, অথচ ফরমাস মত নিজেকে বদলাই কি ক'রে বল?

সরোজ স্ত্রী। আচ্ছা, তবে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন; আমরা যা ভাল বুঝবো, করবো।

ভূপতি। এর চেয়ে ভাল কথা আর কিছু হ'তে পারে না।

সরোজ ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সে বলিল "শেষকালে কিন্তু আমাদের দোষ দেবেন না।"

ভূপতি একবার তাহার দিকে চাহিলেন। নূতন fossil-এর দিকে zoologist যেমন করিয়া চাহিয়া থাকে, তেমনি করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। Fossil-টার মনে হইল সে মাটীর নীচে থাকিলেই ভাল করিত।

(১৫)

নিশি দেখিল সে গৌরীকে বাঁচাইতে গিয়া ভূপতিকে ডুবাইতে বসিয়াছে। তাঁহাকে সংসারের নানা গোলযোগের আবর্ত্তে টানিয়া আনিতেছে। আশ্চর্য্য! গৌরী কি কোথাও খাপ খাইবে না? এত বড় দেশের মধ্যে এই ছোট মানুষটীর দাঁড়াইবার স্থান কি কোথাও নাই? নিশি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল সমাজের লোকের সহিত গৌরী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এটুকু বুঝিয়াছে যে, সে যদি আজ মুখে বলে,—বিশ্বাস করিতে হইবে না,—কেবল যদি মুখে বলে যে, খ্রীষ্ট বা মহম্মদ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, আর কেহ পারেন না, তবে হাজার হাজার লোক পাওয়া যাইবে যাহারা ছুটিয়া

আসিয়া ইহাকে কোলে তুলিয়া লইবে। কিন্তু সে মানুষ, বিপদে পড়িয়াছে,—কেবলমাত্র এই কারণে কেহ তাহাকে আশ্রয় দিবে না। সে যদি আজ দেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, ত ক্রয় করিবার লোকের অভাব হইবে না। সমাজের শিরোমণিরাও তখন দলে দলে আসিবেন, টং করিয়া টাকা ফেলিবেন, আর ইহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া খাইবেন, ইহাকে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া শ্রান্ত-সন্তরে বুকের উপর নাচাইবেন, ইহার রাঁধা ভাত ও সাজা পান সমান নিরুদ্বেগে উদরসাৎ করিবেন। কিন্তু এ যে দেহটাকে অস্পৃষ্ট রাখিতে চাহিতেছে! ভোঁগা বস্তুর এ স্পর্দ্ধা সমাজ সহ্য করিবে কেন? Bird of Paradise নাড় ছাড়িয়া একবার যখন আকাশে উড়িয়াছে, তখন সে উড়িতেই থাকুক, বিশ্বজনের লোলুপ-লোচনের সমক্ষে আপনার দেহটাকে দিবানিশি উন্মুক্ত করিয়াই রাখুক। তাহার পা দুটা কাটিয়া দাও, আর যেন না নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, আর যেন না লতাপাতার ছায়ার কোলে ডানা গুটাইয়া বসিতে পারে। চমৎকার ব্যবস্থা!

নিশি তাহার সমস্ত লইয়া শ্যামবাবুর কাছে উপস্থিত হইল। শ্যামবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "তুমি সমাজের মাথাদের কাছে মিছামিছি ঘুরে বেড়িয়েছ। আমার কাছে একবার আসনি ত।"

নিশি। আপনি কোন সমাজের মাথা নন বলেই আসিনি। আপনি যে সকল সমাজের বাইরে।

শ্যাম। আমরা যে সমাজের পা। দেহের ভেতর ঢুকে থাকি না বলেই একটু নড়তে চড়তে পারি। আমরা এগিয়ে যাই   সমাজ নানা আপত্তি করতে করতে আমাদের পাছু পাছু চলতে থাকে। পাঁচ জায়গায় না ঘুরে তুমি আমার বাড়িতেই এঁকে রাখতে পার।

নিশি। আপনার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নেই—

শ্যাম। সেই জন্য পরস্ত্রীকে রাখা যাবে না। নিজের স্ত্রীকে রাখা যাবে।

নিশি স্তম্ভিত হইল। বলিল "আপনি কি এঁকে বিবাহ করবেন?"

শ্যাম। করতে দোষ কি?

নিশি। আমি জানতুম, বিবাহ করা আপনার principleএর বাইরে।

শ্যাম। কি ক'রে জানলে? principle অচল থাকে, শুধু জড়ের। পাথরের ঢিপি আঘাত করলেই প্রতিঘাত করে, এ principle-এর নড়চড় নেই। কিন্তু একটা জ্যান্ত মানুষের গালে চড় মারলে সে ফিরে চড় মারতে পারে, দাঁড়িয়ে কাঁদতে পারে; পালাতে পারে, আর এক গাল এগিয়ে দিতে পারে, ভাই ব'লে কোলে টেনে নিতে পারে।

নিশি। কিন্তু—

শ্যাম। আমি বুড়ো হয়ে গেছি বলচো? ইনি ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে চান। সে জীবন আমি দিতে পারবো। এতেই তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আমার মাথায় ক'গাছা কাল চুল

আছে এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। আমিও জানিতে চাহি না তিনি ছোলার ডালে কতখানি গুড় দেন।

তখন act ও আইন পাশ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে শ্যামাচরণ গৌরীকে বিবাহ করিলেন। সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা বলিলেন 'ধিক্, ধিক্!' দুঃখের বিষয়, শ্যামাচরণ দমিলেন না। ধিক্কারের দুর্গন্ধসার তাঁহার মনকে বসোরা গোলাপের মত ফুটাইয়া তুলিল।

(১৬)

টোলে বিদ্যালাভ করা শশীর ধাতে সহিল না। তাহার মনে হইল সে যেন মিষ্টান্ন মনে করিয়া খানিকটা গুড়ুক তামাক মুখে পুরিয়াছে। মিষ্টরস কিছু পাইয়াছিল, সত্য। তবে ঐ মিষ্টরসের সহিত মিশান যে বস্তুটা ছিল তাহা তাহার সমস্ত নাড়ীতে পাক দিতে লাগিল। তাহাকে বিশেষ করিয়া পড়িতে হইয়াছিল—স্মৃতি "ডান হাতে খাইবে, কি বাঁ হাতে খাইবে"—ইহা লইয়া এতগুলা পণ্ডিত এতকাল ধরিয়া এত মাথা ঘামাইয়াছেন, কত হাজার হাজার শ্লোক লিখিয়াছেন, ইহাদের আবার ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনীর অন্ত নাই;—এ সমস্ত শশীর কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হইত। এই হাস্যকর বাগ্‌সরঞ্জামের পশ্চাতে প্রাচীন হিন্দু সমাজের যে একটা শ্রদ্ধেয় চিত্র [illegible] ভাণ্ডাগার বরের মত লুকাইয়া বসিয়াছিলেন, তাহাকে শশী ভাল করিয়া দেখে নাই। কাব্যের দিকেও সে বিশেষ আনন্দ পাইল না। তাহার মনে হইল সেকালকার কবিরা মনোজ্ঞ ভাষা ও ভাবসম্পদের অজস্র অপব্যয় করিয়াছেন তুচ্ছ কাজে। ইঁহারা microscope-এর lens গাঁথিয়া পুতুলের হার গড়াইয়াছেন। ইঁহাদের ভাষা বক্তব্যের বাহন না হইয়া অনেক সময় বক্তব্যের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, চার পা তুলিয়া। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে শশীর এ জ্ঞান হইয়াছিল যে, সেকালকার পণ্ডিতেরা রসবোধে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। এ রসবোধ তাঁহাদের আসিল কোথা হইতে? টোলের বিচারে ত বাল্মীকি অপেক্ষা ভবভূতির এবং কালিদাসের অপেক্ষা মাঘের কদর বেশী।

শিবধনের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট থাকিলেও তিনি কাব্যরসিক ছিলেন না। কাব্য মাত্রকেই তিনি অপাঠ্য মনে করিতেন। তিনি ভালবাসিতেন দর্শনশাস্ত্র। এবং এইটাই ভাল পড়াইতে পারিতেন। কিন্তু শশীর কাছে দর্শনের নাম করাও নিষিদ্ধ। দর্শনের সুসংযত, সুসমঞ্জস, ভাষায় অতি গুরু বিষয়ের আলোচনা কেমন অনুদ্ঘাত সুখে করা যাইতে পারে, ইহা দেখিবার সুযোগ যদি শশীর অদৃষ্টে না থাকে, ত শিবধন করিবেন কি? ময়রার খোলা হইতে শিঙাড়া কচুরির বদলে যদি কেহ ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিয়া লইতে চায় ত লোকসান তাহারই।

টোলের ছাত্রদিগকে শশী কুসংসর্গ মনে করিত। এতগুলি শিক্ষিতাভিমানী অশিক্ষিত লোকের একত্র সমাবেশ সে পূর্ব্বে আর কোথাও দেখে নাই। ইঁহারা এত অল্পে সন্তুষ্ট! "ত্রিশ বৎসর কেবল ব্যাকরণ পড়িয়াছি" বলিয়া গর্ব্বে ফাটিয়া পড়েন। ইঁহারা শাস্ত্র হইতে জ্ঞান সংগ্রহ

করেন, কেবল সংগ্রহের জন্য। এ জ্ঞান তাঁহাদের রক্তমাংসে পরিণত হয় না, কেবল অবিকৃত অবস্থায় মাথার মধ্যে জমিতে থাকে, ও মাথাটাকে খুব ফুলাইয়া তুলে। তর্ক করিবার সময় মনে হয়, ইঁহারা নিজের নিজের বিদ্যার থলি ঝাড়িয়া শ্লোকের আরসুলা বাহির করিতে থাকেন।—যাহার থলিতে যত বেশী আরসুলা, তাঁহার তত জিৎ। বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে ইঁহারা একেবারে অনভিজ্ঞ। এবং এই অনভিজ্ঞতাকে বিদ্যালাভের অঙ্গ মনে করেন। স্বদেশ, সমাজ, ইত্যাদি সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণা সংকীর্ণ; চিন্তা সুষুপ্ত, ও আলোচনা একঘেয়ে। ইঁহাদের আলাপের একটা প্রধান উপকরণ আদিরস। এ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ রকমফের নাই। তাঁহারা সকলেই এ রসে রসিক বলিয়া পরিচিত হইতে চান, এবং এ রসের চর্চ্চাকে সংস্কৃতজ্ঞের একটা বিশেষ privilege বলিয়া মনে করেন। এইখানে শশী কিছুতেই ছাত্রদের সহিত যোগ দিতে পারিত না। 'স্ত্রী ভোগের বস্তু'—একথা মুখস্থ করিবার মত শিক্ষা বা ভাবিবার মত বয়স তাহার নয়। আদিরস তাহার কাছে ধিক্কারজনক। এক দিন আবার যখন গৌরী, নিশি ও শ্যামাচরণের চারিপাশে মিছরির কুঁদোর মত দানা বাঁধিল এবং এই কুঁদো তাহার মুখের মধ্যে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা হইল তখন সে অত্যন্ত পীড়াবোধ করিল। গৌরীকে সে খানিকও ক্ষমা করে নাই, তাহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু তাহার উপর অশ্রদ্ধা অপেক্ষা অভিমানই শশীর বেশী ছিল। গৌরীর কথা লইয়া এই ছেলেগুলা শকুনির মত ছেঁড়াছেঁড়ি করিবে ইহা তাহার সহ্য হইত না। অথচ গৌরীর হইয়া লড়াই করিতেও তাহার লজ্জাবোধ হইত। গৌরী সম্বন্ধে তাহার কাছে অনেক প্রশ্ন করা হইয়াছিল। সে সকল প্রশ্নের এক উত্তর দিয়াছিল "জানি না।"

ছাত্রেরা বলিল, 'কিছু জানেন না! কি সাধুরে!'

ছাত্রদের রসনা শুধু গৌরীতেই ক্ষান্ত হইল না। টোলের নিকটে, রাস্তার উপরে একদিন নীলিমার সহিত শশীকে আলাপ করিতে দেখিয়া কয়েকজন ছাত্র বলিয়া উঠিল "সাধুভায়ার এবার মুক্তি হবে দেখ্‌চি। 'মদিরাক্ষী নাবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ।'"

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরা কি বল্লেন?"

শশী। ও—আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না।

নীলিমা। আমাকে লক্ষ্য করেই কি বল্লেন! ঐ ফেন্‌সংস্কৃতে কি বল্লেন, ওর মানে কি?

শশী। ওর মানে—ওর মানে—আমি আপনাকে বল্‌তে পারবো না।

নীলিমা। আপনি মানে জানেন?

শশী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

নীলিমা। আপনারা ভদ্রলোক, শিক্ষা পাচ্চেন, আচার্য্যের কাছে ধর্ম্মশিক্ষা পাচ্চেন,—তার কি এই পরিণাম? আমি আপনাদের মত একজন ভদ্রলোকের মেয়ে, আপনাদের মত একজনের বোন,—আমার সম্বন্ধে এমন সংস্কৃত বল্লেন যার মানে মুখে আন্‌তে পারেন না?

আপনার ধর্ম্ম আপনাদের এই শিখিয়েছে ? অথচ আমারি মত অসহায়া একজন ইংরাজ মহিলা যদি একদল মাতাল গোরার মধ্যে গিয়ে পড়্তো, ত মাতালগুলো তাদের কথা বন্ধ ক'রে সংযত হয়ে বস্তো।

শশী। ওরা বড় জাত।

নীলিমা। এ জাতকে বড় করেছে কে ? তার ধর্ম্ম করেনি ত কে করেছে ?

শশী। ধর্ম্মই বলুন, আর অধর্ম্মই বলুন,—এ কথা আমাকে স্বীকার কর্‌তে হবে যে নারীর প্রতি সম্মান দেখান আমাদের অভ্যাসে নয়।

নীলিমা। অথচ এই নারী আপনার মা, আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তানের মা ; সমস্ত মাতৃজাতির প্রতি অসম্মান কর্‌তে শিখিয়েছে যে ধর্ম্ম, সে আপনাকে বড় হতে দেবে কখনো ?

নীলিমা চলিয়া যাইতেছিলেন। শশী অগ্রসর হইয়া বলিল, আপনি বল্লেন 'ইংরেজ নারীর সম্মান রক্ষা করে।' আপনি কি বল্‌তে চান আমাদের দেশের কোন মেয়ে একটা গোরার সামনে নির্ভয়ে যেতে পারে ?

নীলিমা। আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের চামড়া কালো। আমাদের ত ওরা মানুষ মনে করে না।

শশী। Christianity এ শিক্ষাও ত দিয়েছে।

নীলিমা। Christianity এই শিক্ষা দিয়েছে ! না, যারা Christ-এর বার্ত্তা শোনে নি তারাই এই রকম ব্যবহার করে। যাঁরা প্রকৃত Christian তাঁরা আমাদের মানুষ মনে করেন না, বল্‌তে চান ? মানুষ মনে না করেই, সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে, এই দুর্ভিক্ষ-মহামারীর দেশে এসে, আমাদের এই অধঃপতিত জাতিকে একটু সভ্য, শিক্ষিত, উন্নত কর্‌বার জন্য প্রাণপাত করে গেছেন ? দেশের মুখশ্রী যা একটু ফিরেছে দেখ্‌ছেন, সে কার কল্যাণে ? কে ফিরিয়েছে ? কৃশ্চান পাদ্রী ; আর কেউ নয়। আপনারা ত দেশের অর্দ্ধেক লোককে অস্পৃশ্য বলে ঠেলে রেখেছেন। অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ হাড়ি, ডোমকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এদের মানুষ কর্‌বার চেষ্টা কচ্চেন কে, জানেন ? কৃশ্চান পাদ্রী।

নীলিমা চলিয়া গেলেন। তিনি শশীর হৃদয়তন্ত্রীতে যে গুঞ্জন তুলিয়া গেলেন তাহা কিন্তু সহজে থামিতে চাহিল না। নীলিমার প্রতি ছাত্রদের আজিকার দুর্ব্যবহার সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। টোলের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। এবং, এই টোলের stomach tube দিয়া তাহার মধ্যে যে হিতকর হিন্দুধর্ম্ম ঢুকাইবার চেষ্টা হইতেছিল, তাহার উপরেও সে হাড়ে চটিয়া গেল।

(১৭)

গৌরীকে তাড়াইয়াও তাড়ান যাইতেছে না। ইহাতে রামময় অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। আপদ শ্যামের ঘাড়ে গিয়া চাপিল। তিনি ভাবিলেন 'বাঁচা গেল'। কিন্তু এখন দেখিতেছেন গিনি—পূর্ব্বের মতই শ্যামের কাছে যাতায়াত করিতেছে। দুএকবার তাহাকে বারণ

করিয়াছিলেন। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। নিশির জন্য না হউক, লোকাচারের জন্য অন্ততঃ, তিনি নিশিকে নিবৃত্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রামময় বলিলেন, 'তুমি আবার শ্যামের কাছে গিছ্‌লে, শুনলুম।'

নিশি। হাঁ, গিছ্‌লুম।

রাম। এটা ত আমার মোটেই ভাল লাগ্‌চে না।

নিশি। ভাল লাগবার ত কথা নয়, বাবা। তুমি বৃদ্ধ, আমি যুবা। তুমি ধার্ম্মিক, আমি নাস্তিক। আমাদের ভাল লাগা ত ঠিক একরকম হবে না।

রাম। দেখ, কথায় কথায় ও-রকম 'নাস্তিক', 'নাস্তিক' বলে বড়াই করো না। কর ত বল আমি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।

নিশি। ঠিক ঐ কথা আমিও বল্‌তে পারি। আমার কাছে যদি ধর্ম্মকথা বল্‌তে আস ত, আমিও বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব

রাম। না, তুমি যাবে কেন? যেতে হয় আমিই যাব। আমার বয়স হয়েছে, আমারই যাবার সময়। আমাকে ত যেতেই হবে, আজ, না হয় কাল,—সমস্ত সংসার ছেড়ে।

নিশি। সে ত সকলকেই যেতে হবে। সে কথা এখন উঠ্‌চে কেন? দেখ, তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হয়। তুমি এমন clearheaded মানুষ ছিলে, আর আজ তোমার এমন দুর্গতি হয়েছে যে কথায় কথায় argumentum ad Hominem!

রাম। তর্ক অনেক ক'রে দেখেছি। তর্কে কিছু মেলে না। সব শুষ্ক, নীরস।

নিশি। এইটে কি সত্য কথা হ'ল? তোমার জীবন কি শুষ্ক, নীরস ছিল?

রাম। ছিল বৈ কি। বিপদের সময় চোখের জলে, কাছে গিয়ে দাঁড়াব এমন কেউ নেই, একি কম দুরবস্থার কথা?

নিশি। তা বেশ। আমার এখনও কোন অবলম্বনের দরকার হয়নি। আমার—

রাম। হয়েছে বৈ কি। তুমি হয়ত টের পাচ্ছ না।

নিশি। আমার দুরবস্থা আমি টের পাচ্ছি না। তুমি টের পাওয়াবার জন্য ব্যস্ত কেন?

রাম। তোমার ভালর জন্য।

নিশি। বেশ ত, তোমার কাছে ভাল জিনিষ কিছু থাকে বার কর। আমার পছন্দ হয় নোবো অখন। Thrust কর্‌তে যাও কেন?

রাম। Thrust কল্লুম আবার কবে?

নিশি। কচ্চই ত। আমাকে পৈতা পর্‌তে হবে, সন্ধ্যা কর্‌তে হবে, যে কাজ ভাল ব'লে মনে কর্‌বো সেইটি কর্‌তে পার্‌বো না,—একি অত্যাচার! গাচকত সুতো গলায় ঝুলিয়ে তুমি চরিতার্থ হও; আমি যদি না হই:

রাম। আচ্ছা বাপু, আমি ওসব কথা আর উত্থাপন করবো না। আমার একটা কথা রাখ।

নিশি। বল। কথা ত রেখেই আসচি।

রাম। আমি শুধু বলতে চাই যে এখন তুমি বিবাহিত। এখন তোমার কোন রকম বেচাল হওয়া উচিত নয়।

নিশি। বেচাল যা কিছু, আগেই হওয়া উচিত ছিল?

রাম। যাক্—আমি কথা বাড়াতে চাই না। আমার ইচ্ছা, তুমি শ্যামের বাড়ী আর না যাও।

নিশি ভাল, তোমার ইচ্ছা আমার জানা রইল।

রাম। শুধু জানা রইল?

নিশি। তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হবে এমন আজগুবি প্রত্যাশা কর কেন?

রাম। আজগুবি প্রত্যাশা! ওখানে ঘন ঘন যাতায়াতের মধ্যে একটা কি কদর্য্যতা আছে তাও কি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে?

নিশি। কদর্য্যতা! কি বলতে চাও তুমি?

রাম। আমি বলচি, ওদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দাও।

নিশি। এটা suggestion, না হুকুম? যদি suggestion হয় ত বুঝিয়ে দিচ্চি, suggestionটা অন্যায় হয়েছে। আর যদি হুকুম হয় ত অমান্য করবো।

রাম। অমান্য করবে? আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করবে না?

নিশি। এ অসম্ভব অনুরোধ। রক্ষা করতে পারবো না।

এমন সময়ে শশী ঘরে ঢুকিয়া বলিল "বাবা, আমি কৃশ্চান হতে যাচ্ছি।"

রাম। কৃশ্চান হতে যাচ্ছিস্ কিরে?

নিশিও বলিয়া উঠিল "কৃশ্চান হবি, কি বল্?"

শশী। যে ধর্ম্ম মানুষকে মানুষের মত দেখতে শেখায় সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করবো।

রাম। আর হিন্দু মানুষকে মানুষ বলে না? মানুষ কি,—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

শশী। তা করে। আর মানুষের ছায়া মাড়ালে স্নান ক'রে শুদ্ধ হয়।

শশী চলিয়া যাইতেছিল। রামময় তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, 'যেয়োনা, শশি, যেয়োনা। অমন কর ত, তোমার সামনে আত্মহত্যা করবো।'

শশী। তুমি মিছে বকচো। তোমার ধর্ম্মের কাছে আমাকে বলি দিতে চেয়েছিলে। আমার ধর্ম্মের কাছে তোমাকে বলি দিলুম।—বলিয়া শশী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাম। আঃ! তোদের জন্য আমার সমস্তটা উজাড় করে দিই নি? সারা প্রাণ দিয়ে তোদের সেবা করিনি? আর আজ আমার শেষ সময়ে তোরা আমাকে এতবড় আঘাতটা দিলি!

নিশি হাত ধরিয়া রামময়কে বসাইয়া বলিল, 'অমন কোরো না, বাবা। সংসারে মতভেদ ত থাক্‌বেই।'

রাম। মতভেদের জন্য এতখানি? তুই যখন পাঁচ মাসের, আর আমি পঁচিশ বছরের, তখন কি আমাদের মতের মিল ছিল? তখন তোর সঙ্গে, শিশু হয়ে, শিশুর মত কথা কই নি?

নিশি। হাঁ, বাবা! তুমি অনেক করেছ। তোমার এই দ্বিতীয় শৈশবে আমিও তোমার সঙ্গে শিশুর মত কথা কইব।

রামময় 'আঃ, বাবারে!' বলিয়া নিশিকে আলিঙ্গন করিলেন।

নিশি। তোমার শশী না থাক্, আমি আছি। আমি তোমার কথা শুনবো।

রাম। তা হ'লে আর শ্যামের কাছে যাবি নি?

নিশি। না।

রাম। আঃ বাঁচলুম! এখন শশীকে নিয়ে কি করা যায়? কোথায় গেল সে?

শশী তখন অনেক দূরে গিয়াছে। তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধান পাইলেও কোন লাভ হইত না। কারণ সে তখন স্বর্গপথের যাত্রী।

বৃদ্ধ পিতার কাতরতা দেখিয়া নিশি আজ একটা অসঙ্গত প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। এ প্রতিজ্ঞা কি সে পালন করিতে পারিবে? পালন করা কি উচিত? নিশি মনে মনে বলিল তাহার পিতা কত দিনই বা বাঁচিবেন? এই কটা দিনের জন্য সে তাঁহার মনে একটু শান্তি দিতে পারিবে না? যদি না পারে ত সে কেমন সন্তান? কেমন মানুষ?

(১৮)

কৃশ্চান হইবার পর প্রায় ছ' সাত মাস হইল, শশী বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। কিন্তু খুড়িমার কাছে পূর্ব্বের মতই আসা যাওয়া করিত। শশীর খবর এখন প্রতিভা বা ভূপতির নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইত।

একদিন নিশি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, শশী কিছু বলে?"

ভূপতি। কিসের?

নিশি। কৃশ্চান হতে গেল কেন? হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা হ'ল, অমনি বিশ্বাস হ'ল মেরীর গর্ভে ঈশ্বরের এক পুত্র জন্মালেন এবং তিনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটিতে লাগ্‌লেন! Psychologyটা বুঝ্‌তে পারচি না।

ভূপতি। Psychology বুঝ্‌তে পারনি? ঐ নগেন বিশ্বাসের ছোট মেয়েটাকে দেখেছ?

নিশি। দেখিছি বৈ কি।

ভূপতি। হুম্! Don't you think the argument is convincing?

নিশি। ওকে বিয়ে কর্‌বে নাকি দাদা? উনি যে অনেক বড়।

ভূপতি। বিয়ে কর্‌তে যাবে কেন? ঐ মেয়ে এসে যদি বোঝায় যে Christian হ'লে জাত বড় হয়, তাই ইংরেজ, জার্ম্মাণ বড় হয়েছে, তা হ'লে বুঝ্‌তে বাকী থাকে? তুমি প্রমাণ কর্‌তে চাও ইংরেজ, জার্ম্মাণ বড় হয়েছে পরের পকেট মেরে? Well, send a handsomer girl to prove it.

নিশি। ও কি এখন Christianityতে বিশ্বাস করে?

ভূপতি। Religious dogmaয় সত্যি কেউ বিশ্বাস করে না কি? ও ত profess কর্‌বার জিনিস। বিশ্বাস কর্‌বার জিনিস ত নয়।

নিশি। আমি দেখ্‌চি, ইংরাজির আঁচ পেলেই পুরুষগুলো কৃশ্চান হ'তে চায়, আর মুসলমানে ছুঁয়ে দিলেই মেয়েরা মুসলমান হয়ে যায়! এরা কেউ আর ফিরে হিঁদু হ'তে পারে না। এই রকম ক'রে এক সময়ে কি ভারতবর্ষে বাকী থাক্‌বে শুধু পাচক আর পাউরুটিওলা?

ভূপতি। ভারতবর্ষ বল্‌তে তুমি টিকিওয়ালার ভারতবর্ষ মনে কচ্চ কেন?

নিশি। ভারতবর্ষ আসলে টিকিওয়ালারই দেশ।

ভূপতি। টিকিওয়ালার দেশ নয়। এদের আগেও অন্য জাত ছিল। ভারতবর্ষ তোমারও নয়, আমারও নয়, — যে এখানে বাস করবে তার।

নিশি। আমার কষ্ট হয় যে, এই লোকগুলো কৃশ্চান বা মুসলমান হয়েই তুর্কী আর প্যালেষ্টাইনের জন্য হাহাকার জুড়ে দেবে, আর নিজেদের tradition ভুলে যাবে।

ভূপতি। Tradition ভোলা যায় না। Tradition বল্‌তে যদি মানব জাতির tradition বোঝ, তবে দেখ্‌বে তার এক কণাও নষ্ট হয় না।

নিশি। কৃশ্চান হ'তে গেল!

ভূপতি ধর্ম্মে বিশ্বাস ক'রে আত্মার অবমাননাই যদি কর, ত হিন্দু, জৈন, ব্রাহ্ম কৃশ্চান যে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে পার,—doesn't matter.

নিশি। অন্য ধর্ম্মগুলো তবু একটু liberal. বলে না যে তাদের দিক দিয়ে না গেলে একেবারে অনন্ত নরক!

ভূপতি। ও বলাবলিতে কিছু এসে যায় না। Religion হচ্ছে নিতান্ত বাহিরের জিনিষ, —a sort of a war paint. ওতে রূপ বদলায়, মন বদলায় না। মানুষ বর্ব্বর অবস্থায় এটাকে ব্যবহার করে, সভ্য হ'লে ছেড়ে দেয়।

নিশি। War paintই যদি হয় ত সে paintএ lead আছে। দুদিন ব্যবহার করলে হাতে পায়ে পক্ষাঘাত হয়।

ভূপতি। আমার তা মনে হয় না। ধর্ম্ম মানুষকে গড়ে না, মানুষ ধর্ম্মকে গড়ে! Christianity Christকে তৈরী করে নি Christ Christianityকে তৈরী করেছেন। Man is just too big for his religion. হাঁ,—তোমার বাবার urineটা পরীক্ষা করে দেখেছ, sugar আছে কি না?

নিশি। না দেখিনি। তবে আপনার কথায় মনে হ'ল হয়ত তাঁর Diabetes আছে। যে রকম শীগ্‌গির বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

ভূপতি। ঐ রকম একটা কিছু না থাকলে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস হবে কেন?

ভূপতিকে পাঠে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া নিশি উঠিয়া গেল। প্রতিভার সহিত দেখা হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁরে, গৌরী কেমন আছেরে?"

নিশি। বলতে পারি না। আমি আর তাদের বাড়ী যাই না।

প্রতিভা। তাদের বাড়ী যাস্ না?

নিশি। না বাবা বারণ করে দিয়েছেন। আমিও—

প্রতিভা। তা, ভাল কাজই করেছিস।

নিশি। ভাল কাজ করেছি! তুমি কি বল তাঁর সমস্ত অন্যায় হুকুম আমাকে শুনতে হবে?

প্রতিভা। তা কি কেউ শোনে? তুইই কি শুনেছিলি যখন ঐ মেয়েটিকে রাস্তায় ছেড়ে দিতে বলেছিলেন?

নিশি। সত্যি ত! তখন ত অত বাধ্য ছিলুম না।

প্রতিভা। ঐ রকমই হয়।

নিশি। তুমি বলচো, ওদের বাড়ীতে না যাওয়াতে আমার কিছু স্বার্থ আছে ব'লে পিতৃআজ্ঞা পালন করেছি?

প্রতিভা। ছি ছি! সে কি কথা! ওখানে না গেলেও তোর চলে, এই কথাই বলেছি।

নিশি। না খুড়িমা, ওখানে না যাওয়ায় আমার সত্যই স্বার্থ আছে। তুমি জান না, এক সময়ে আমিই ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম—

প্রতিভা। তোর বৌ দেখালি নি ত। কতদিন মনে করি যাব, একবার দেখে আসবো। তা, তুইও ত নিয়ে যাস্নি কখনো।

নিশি। দেখাবার মত নয় বলেই দেখাই নি। সৎ ব্রাহ্মণের মেয়ে পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর কত কি করেছেন।

প্রতিভা। তত করেছে, এই হল তার দোষ?

নিশি। সে কি কথা ; ঐ চ'ল তাঁর একমাত্র গুণ। — তা যাক্ — তুমি কথাটা চাপা দিলে। যা বল্‌তে গেলুম, শেষ কর্‌তে দিলে না।

প্রতিভা। সব কথা শেষ কর্‌তে নেই।

নিশি কিছুক্ষণ প্রতিভার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "খুড়িমা, আজ তোমাকে একটা প্রণাম করি।" তারপর পদধূলি লইয়া বলিল "পায়ের ধুলো নিলুম আশীর্ব্বাদ কল্লে না ?"

প্রতিভা নিশির মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "করিছি।"

নিশি। কি কল্লে বল।

প্রতিভা হাসিয়া বলিলেন "তা বল্‌বো না।"

সত্যই তাহা বলিবার নহে। প্রতিভা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন — নিশির স্ত্রী যেন তাহাকে সুখী করে। মুখে প্রকাশ করিলে এ কথা যে ঠাট্টার মত শুনাইবে।

(১৯)

আজ প্রতিভাসুন্দরী'র আসিবার কথা আছে। তিনি চারুশীলার সহিত দেখা করিতে আসিবেন। নিশি নিজের পরিবারকে বরাবর খুড়িমার কাছ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত। এবার কিন্তু তিনি নিজে আসিবার জন্য এত জিদ করিলেন যে নিশি বারণ করিতে পারিল না।

নিশির ভয় ছিল চারু হয়ত খুড়িমার সহিত অভদ্রতা করিবে। চারু যে খুব শক্ত লোক এমন কথা বলিতেছি না। সে hair springএর মত নরম, — সহজেই বাঁকিয়া যায়, এবং বাঁকিলে আর সোজা হয় না। নিশি তাই পূর্ব্ব হইতে তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। পাশে বসাইয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল "আমি বল্‌তে ভুলে গিছ্‌লুম, — আজ খুড়িমা তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বেন।"

চারু। আমার সঙ্গে কাউকে দেখা কর্‌তে হবে না।

নিশি। সে কি ! তুমি জান না, খুড়িমা আমার কতখানি।

চারু। তা আমি কি কর্‌বো ? আমি দেখা কর্‌তে পার্‌বো না।

নিশি। আমি যাঁকে অত্যন্ত আপনার মনে করি, তাঁকে তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দেবে ?

চারু। তা তিনি যদি অপমান হন।

নিশি। তবু দেখা কর্‌বে না ?

চারু। আমি দেখা টেখা কর্‌তে পার্‌বো না। তোমার খুড়ির সঙ্গে তোমার খুব বনে, আমার বনে না।

নিশি। আগে থাক্‌তেই বনে না ? — দেখ, আমি যে যে জিনিষ ভালবাসি, ঠিক সেই সেই জিনিষে তোমার অরুচি। অথচ আমাদের একসঙ্গে থাক্‌তে হবে, — বরাবর !

"কে তোমায় থাক্‌তে বল্‌চে ?" বলিয়া চারু কান্না জুড়িয়া দিল।

নিশি তাহার দুই হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল "অমন কোরো না, অমন কোরো না।—ঐ বুঝি তাঁর গাড়ি এলো। তাঁকে অপমান কোরো না।—আমাকে একটু সুখী কর।" চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

প্রতিভা আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈরে, তোর বৌ কোথায় ?'

নিশি। এই যে কোথায় গেল। আচ্ছা, আমি ডেকে আন্‌চি।

নিশি অনেক সাধ্যসাধনা করিল কিন্তু চারুর মন ভিজিল না। শেষে সেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল। চারু ইহাতেও বশ মানিল না। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া, চীৎকার করিল "আমি যাব না, যাব না, যাব না। তুমি আমায় টেনে নিয়ে যাবে নাকি ?" সবশুদ্ধ কাণ্ডটা খুব নোংরা হইয়া উঠিল।

নিশি লজ্জিতমুখে ফিরিয়া আসিতেই প্রতিভা বলিলেন "আচ্ছা, আমিই গিয়ে দেখা কর্‌চি।"

নিশি। যেয়ো না, খুড়িমা। সে তোমাকে অপমান কর্‌বে।

প্রতিভা। তা করুক।

এই সময়ে জগত্তারিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল "শ্বশুর শাশুড়ি চারদিকে ঘুর্‌চে। এর মাঝখানে বৌ'য়ের হাত ধরে টানাটানি! এ সব কি হচ্ছে সব ? উনি বেহ্ম বৌ নিয়ে ঘর করেন। ওঁর ও সব সইতে পারে। আমাদের সইবে না। এ সব বেহায়াপনা এ বাড়ীতে চল্‌বে না।"

প্রতিভাসুন্দরী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন 'আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। তোর মার কাছে আমার আসা উচিত ছিল।'

উচিত ছিল বটে। কিন্তু কথাটা তাঁহার মনেই পড়ে নাই। নিশি আর শশী ছাড়া এ বাড়ীতে আরও যে অনেক লোক আছেন সে কথা তাঁহার মনে উদয়ই হয় নাই।

নিশি বলিল, 'আর বৌ দেখ্‌তে হবে না, খুড়িমা। তুমি চ'লে যাও।'

প্রতিভা। তোর মার সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত।

নিশি। চ'লে যাওয়াই ভাল কিন্তু।

প্রতিভা। আচ্ছা, সে আমি বুঝবো অখন।

প্রতিভা ভিতরে প্রবেশ করিতেই নিশি ডাকিল 'খুড়িমা'।

খুড়িমা ফিরিয়া আসিলেন। "কি বল্‌ছিস্, বল।"

"খুড়িমা" বলিয়া নিশি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল "আমার কিছু বলবার নেই।"

'কিছু ব'লে কাজ নেই।'—বলিয়া প্রতিভা জগত্তারিণীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। নিশি ধপ করিয়া চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরাত্মা বুকের পাঁজরে মাথা কুটিয়া বলিতে

লাগিল হায় ! তাহার জন্ম সূচাগ্র ভূমিও কেহ ছাড়িবে না। তাহার সমস্ত প্রিয়বস্তুকে পায়ে দলিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিবে। নির্ম্মম হস্তে তাহার মর্ম্মস্থল লইয়া ঘাঁটিবে, চটকাইবে। ইহারাই কি তাহার আপনার ? ইহাদের জন্যই কি সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিতে হইবে ? শ্যামবাবুকে ত্যাগ করিতে হইবে, খুড়িমাকে ত্যাগ করিতে হইবে, ভাইটিকে ত্যাগ করিতে হইবে ? নিশি গর্জ্জন করিয়া উঠিল "কেন ?" আগুন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেই রামময় আসিয়া তাহাতে ঘৃতাহুতি দিলেন "এইটে কি ভাল কাজ করেছ ?—লোকজনের মাঝখানে স্ত্রীর হাত ধ'রে টানাটানি ?"

স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানার যৌক্তিকতা লইয়াই রামময় তর্ক করিতে আসেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। ধার্ম্মিক হওয়া অবধি তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়াছিল নিজে স্বর্গে যাওয়া, ও অন্য লোককে ঘাড় ধরিয়া স্বর্গে পাঠান। তাঁহার বিশ্বাস প্রতিভা শশীর স্বর্গপথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। তাই প্রতিভার উপর তাঁহার একটা আক্রোশ ছিল। আজ সামান্য একটা উপলক্ষে সেই আক্রোশ নিশির উপর দিয়া মিটাইতে আসিয়াছেন।

নিশি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াই জবাব দিল "আমার স্ত্রীর হাত ধ'রে আমি টানবো না ত কি পাড়ার লোকে টানবে ?"

রাম। এইটে কি জবাব হ'ল ? হিঁদুর বাড়ী ত ?

নিশি। হিঁদুর বাড়ীতে নিজের স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে নেই ?

রাম। হিন্দুর সকলের চেয়ে বড় সাধনা হচ্ছে, ব্রহ্মচর্য্য !

নিশি। হাত ধরে টানলে বুঝি ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় ? সে তোমাদের মুনি ঋষিদের হ'ত। আমরা কলিকালের ছেলে। অত সহজে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না।

রাম। যাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি। ভূপতিবাবুর স্ত্রী ব্রাহ্ম নিয়ে ঘর করেন, কৃশ্চানের সঙ্গে এক পাতে খান। তাঁর বাড়ীর চালচলন এ বাড়ীতে চালাবার চেষ্টা কোরো না।— তিনিই ত শশীর সর্ব্বনাশটা করলেন ঐ নগেন বিশ্বাসের মেয়েটাকে বাড়ীতে আনিয়ে আনিয়ে।

নিশি। রক্ষা কর ! তিনি হয়ত এখনও এ বাড়ীতে আছেন।

রাম। আমি ত কিছু অন্যায় কথা বলছি না, যে ভয় ক'রে বলবো।

নিশি। না, ন্যায় কথা আজকাল খুব বলতে পার। তবে একটু পরেই না হয় বোলো। আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি।

রাম। নিমন্ত্রণ করেছ, নিমন্ত্রিতের সেবা কর। তা ব'লে সত্য কথা বলবো না ?

নিশি। সত্য কথা বলবে না ! তা কি হয় ! সত্য কথা বলা ধর্ম্ম যে।

রাম। আবার তুমি আমার সামনে ধর্ম্ম নিয়ে বিদ্রূপ করছ ?

নিশি। ধর্ম্ম নিয়ে বিদ্রূপ করবো না ? আমি যে ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান দেখতে পাচ্ছি চ'খের

সামনে। আজ তুমি সত্য কথা ব'লে বড়াই করতে এসেছ। আর দুদিন আগে এমন সত্য কথা বলতে পারতে? ধর্ম্ম না থাকলে এত অমানুষ হতে পারতে? উঃ! একটা জিনিসকে যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি, ত সে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা কইব না? ধর্ম্মের নিন্দা করা আমার ধর্ম্ম যে।

রাম। তাই যদি তোমার ধর্ম্ম হয়, ত আমাদের দূরে দূরে থাকাই ভাল।

নিশি। হাঁ। এই মুহূর্ত্তে।

রাম। তবে তাই কর,—বিদায় ক'রে দাও। সকলেই তাই করচে। তুমি করবে না? তা কি হয়! তুমি বড় হয়েছ, উপযুক্ত হয়েছ, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চলতে শিখেছ। এখন ত আর হাত ধ'রে বেড়াবার জন্য বাপকে দরকার হবে না। বিদায় কর। বুড়ো হয়েছি,—অকর্ম্মণ্য! তোমাদের কোন কাজেই ত লাগ্‌বো না। আর কেন? ভাঙা হাঁড়ি কি ঘরে তুলে রাখ্‌তে আছে? ফেলে দাও! ফেলে দাও! ফেলে দাও!

বলিতে বলিতে রামময় নিজের বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। নিশি তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল, এবং অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

রাম পূর্ব্ব কথার আবৃত্তিরূপে বলিলেন 'ফেলে দাও! ফেলে দাও!'

নিশি কোন উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে তাঁহাকে চৌকির উপর বসাইয়া বাহির হইয়া গেল।

পিতার অভদ্রতা ও অসংযম তাহাকে এতদূর বিচলিত করিয়াছিল যে তাঁহার এই কাতরতা দেখিয়াও তাহার মনে করুণার সঞ্চার হইল না। পিতা যে বৃদ্ধ, এবং হয়ত রোগের বশে দেহ ও মনে দুর্ব্বল হইয়াছেন এ কথা সে ভাবিবার অবসর পাইল না। সে নিজেও যে অত্যন্ত অসংযতভাবে কথা কহিয়াছিল, রীতিমত ঝগড়া করিয়াছিল, তাহাও সে ভুলিয়া গেল। কারণ, আজ সে প্রকৃতিস্থ নয়। তাহার ভক্তির পাত্রকে আর সকলে ভক্তি করুক এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় সে আজ ধার্ম্মিকের মতই ক্ষেপিয়াছে।

(২০)

রামময় বলিয়াছিলেন, "ফেলে দাও।" কিন্তু এত সহজে কি ফেলিয়া দেওয়া যায়? মুখের গন্ধে লোকের সঙ্গে কথা কওয়া যায় না, যন্ত্রণায় সপ্তাহে পাঁচদিন অনিদ্রায় কাটিয়া যায়, খাদ্য পরিপাক হয় না, শরীর শীর্ণ ও ব্যাধির মন্দির,—তবু পোকাধরা দাঁতগুলাকে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। ফেলিতে গেলে প্রতি স্নায়ুতে টান পড়ে। নিশিও তাহার পিতাকে ছাড়িতে পারিল না। এবং পারিল না বলিয়া নিজেকে মোহ-দুর্ব্বল মনে করিল।

সে পিতাকে ছাড়িল না। তবে তাঁহাকে সুখী করিবার অতিচেষ্টা ছাড়িয়া দিল। সে দেখিল পিতা, মাতা বা কোন একজন লোককে সুখী করাই জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। ইহাতে অনেক কাজ পণ্ড হয়, অনেক অকর্ত্তব্য করিতে হয়, অথচ সে লোকটাকে সুখী করা যায়

না। আদুরে ছেলের মত যত তার মন যোগান যায়, তত তার কান্না বাড়ে, তত তার মন উঠে না।

Pendulumএর মত দুলিতে দুলিতে নিশি একদিন শ্যাম হইতে যথাসম্ভব দূরে আটকাইয়া পড়িয়াছিল। যে প্রতিজ্ঞাবন্ধন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা ছিন্ন হইল, এবং নিশি দ্বিগুণ বেগে শ্যামের দিকে ছুটিল।

শ্যামাচরণ বাড়ীতে ছিলেন না। ভৃত্য বলিল তিনি আধঘন্টার মধ্যে ফিরিতে পারেন। নিশি ভাবিল এই আধঘন্টা সে বাহিরের ঘরেই অপেক্ষা করিবে। গৌরী ভিতরে আছে নিশ্চয়। কিন্তু একাকী তাহার সহিত দেখা করিতে নিশির সাহস হইল না। সে পূর্ব্বে প্রতিদিনই এবাড়ীতে আসিত এবং নিঃসঙ্কোচে অন্দরে গিয়া গৌরীর সহিত দেখা করিত। আজ ছয় মাস সে গৌরীকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া নিজেকে দেখিবার অবকাশ পাইয়াছে। সে দেখিয়াছে, দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত গৌরী তাহার মনকে জড়াইয়া আছে। কতবার উহাকে হরণ করা হইল। তথাপি এখনও তেমনি জড়াইয়া আছে, এক পাকও খুলে নাই। সে তাহার পাপ মন লইয়া গৌরীর কাছে যাইবে কিরূপে? সে পরস্ত্রী,—তাহার গুরুপত্নী,—না। নিশি পলাইবার চেষ্টা করিল। এমন সময়ে গৌরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল, এবং হাসিয়া বলিল "আমার সঙ্গে দেখা না করেই চ'লে যাচ্ছেন যে।"

মেঘালোকে কদম্বফুলের মত নিশির সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং একটা অনুপম আবল্য তাহার মনোবাক্কায়কে অভিভূত করিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া গৌরীও লজ্জিত হইয়া উঠিল। তখন নিশি ভাবিল আজ দুইজনে দুইজনের কাছে ধরা পড়িয়াছে।

সে বলিল "হাত ছেড়ে দাও। কি করচো?"

গৌরী হাত ছাড়িয়া বলিল "কেন, কি করেছি?"

নিশি। তোমার স্বামী তোমার জন্য যা করেছেন, ভুলে যেয়ো না।

গৌরী। কি বলছেন আপনি?

"আমিও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করি? কি বলছিলে?"—বলিতে বলিতে শ্যামবাবু পিছন হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নিশি। না, কিছু নয়।

শ্যাম। হাঁ, কিছু হয়। 'স্বামী' 'ভুলে যাওয়া' এই সব বড় বড় কথা কইছিলে। একটা প্রকাণ্ড নভেল জমাবার মত কথা। কিছু নয় বল্লে শুন্‌বো কেন?

নিশি। আমি আপনাকে বল্‌তে চাই না।

শ্যাম। আমি নাস্তিক লোক। সত্যের নগ্ন, নিষ্ঠুর রূপ সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে। আমার কাছে সত্য কথা বলতে পার। যদি বল আমার স্ত্রী তোমাকে আমার চেয়ে বেশী ভালবেসে

ফেলেছেন, তাতে অবাক হব না। এই রকম বাসাই স্বাভাবিক। যদি বল ভালবেসেছেন বলে এই ঘর ভেঙে চলে যাবেন, তা'হলে অবশ্য আমার একটু কষ্ট হবে। নিজের জন্য নয়, ওঁর জন্য। অতএব একটা পিস্তল আর ছোরা নিয়ে মাতামাতি করব না। ভয় নেই।

নিশি কিছু বলিতে চাহে না দেখিয়া গৌরীই বলিল, "আমি বলছি। উনি চলে যাচ্ছিলেন। আমি তাই ওঁর হাত ধ'রে টেনে বলেছি 'আমার সঙ্গে দেখা না করেই পালাচ্ছেন যে।' এর থেকে ওঁর মনে কি হয়েছে জানি না। আমাকে কি উপদেশ দিতে যাচ্ছিলেন।" গৌরী আর দাঁড়াইল না।

শ্যাম। তাই না কি হে?

নিশি। আজ্ঞে, হাঁ।

শ্যাম। এঁর জীবন নতুন ক'রে গড়ার মূলে তুমি। তুমি ছ'মাস বাদে এসে দেখা না করেই পালাচ্ছিলে। তাই ইনি হাত ধ'রে টেনে এনেছেন। অমনি তোমার মনে হ'ল ইনি তোমার প্রতি অনুরক্ত?

নিশি। আমার অন্যায় হয়েছে। আমি—

শ্যাম। তুমি biassed আছ।—Bias দিলে কে? নিশি কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

শ্যাম। আমি বল্‌বো? তুমি লুব্ধ। সন্দেশ দেখেই মনে হয়েছে যে তোমার মুখে পড়্‌বার জন্য উন্মুখ।

নিশি। তাই বোধ হয়।

শ্যাম। তা হ'লে সন্দেশের দোকানে কাজ কর;—এই বাড়ীতে থাক দিন কতক।

নিশি। না। তা পার্‌বো না

শ্যাম। কেন?

নিশি। সাহস হয় না।

শ্যাম। ভয় হচ্ছে আমার সংসার ভাঙ্‌বে ব'লে?

নিশি। না।—হাঁ, সেই রকমই।

শ্যাম। এ মেয়েটাকে তোমার ভাল লাগে। অতএব তাকে দখল কর্‌তেই হবে, তাতে তারই সর্ব্বনাশ হোক্, আর আমারই সর্ব্বনাশ হোক্? এত বেগ!

নিশি। আমি কতটা দুর্ব্বল, আগে থেকে বল্‌তে পারচি না।

শ্যাম। বটে! তোমার টাকার দরকার। না, না, না, টাকা নয়,—একটা চকচকে পকেট বুকের দরকার। তাই পরের পকেট মারতেও পার, এই তোমার মনে হচ্ছে?—দেখ, বুদ্ধিমান্ লোক অমন দুর্ব্বল হ'তে পারে না। ওটা নভেলি দুর্ব্বলতা। ওরকম দুর্ব্বলতার কাজ করার আগে খানিকটা আফিং এনে খাওয়া যেতে পারে, দাড়িকামান খুরের খানিকটা carotid arteryর মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গৌরি, নিশিকে কিছু জল টল খেতে দাও।

নিশি জল খাইবার জন্য অপেক্ষা করিল না: সে তাহার মনটাকে এখনি একবার বাজাইয়া দেখিতে চায়।

(২১)

গৌরী জলখাবার আনিয়া দেখিল নিশি চলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে বড় আঘাত লাগিল। কি অপরাধে নিশি আজ তাহার প্রতি এমন ব্যবহার করিল? সে তাহার হাত ধরিয়াছিল বলিয়া?

গৌরী নিশিকে একখানি পত্র লিখিল। নিশি সে পত্র ফিরাইয়া দিয়াছে। এবং যে উত্তর দিয়াছে তাহার অধিকাংশই সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু দূরাগত ক্রন্দনধ্বনির মত এই দুর্বোধ পত্রে একটী করুণ সুর ছিল, যাহা বার বার গৌরীর চ'খে জল টানিয়া আনিতে লাগিল।

গৌরী শ্যামাচরণকে বলিল " নিশিদা আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন।"

শ্যাম একটা ঘড়ি মেরামত করিতেছিলেন। বলিলেন "পড়।"

গৌরী। তুমিই পড়। আমার একটু সঙ্কোচ হয়।

শ্যাম। আমার কাছে সব কথা বল্‌বার দরকার নেই তবে যেটা বল্‌বে মনে করেছ, সেটা নিঃসঙ্কোচেই বলে যাবে।

গৌরী। চেষ্টা করি। কিন্তু অনেকদিনের সংস্কার।

শ্যাম। ঐ সংস্কারটা একেবারে চুরমার করে ভাঙ্‌তে চাই। স্ত্রী নারী। তাই তার প্রধান গুণ হ'ল পাতিব্রত্য বা প্রভুভক্তি। কোন রকম করে স্বামীর মন যোগাতেই হবে, অর্দ্ধেক কথা চেপে রাখ্‌তে হবে, অর্দ্ধেক কথা ঘুরিয়ে বল্‌তে হবে। এত আস্কারা পেলে সাধারণ মানুষ ঠিক থাক্‌তে পারে কখনো? সে অত্যাচারী হবেই। তার ঝাঁকাই দাঁড়বেই। কাজেই স্ত্রীদের আরও বেশী ক'রে মন যোগাতে হবে,—ছলনা প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা দিয়ে। এ সমস্তটা আমার দু' চক্ষের বিষ।

গৌরী। আমি তাঁকে একখানা চিঠি লিখিছিলুম।

শ্যাম। কি লিখেছিলে?

গৌরী। আমি লিখেছিলুম। 'সে দিন আপনি রাগ ক'রে চলে গেলেন ব'লে আমার এত কষ্ট হচ্ছে যে কি বল্‌বো? আপনার হাত ধরিছিলুম বলে আপনি রাগ কল্লেন। এত দিনেও কি আমার হাত ধরবার অধিকার হয় নি? যা হোক, আমাকে ক্ষমা করুন। একদিন আসুন। এসে সেই আগেকার মত সহজভাবে ব'লে যান যে রাগ করেন নি। আপনাকে কষ্ট দিয়েছি ভেবে আমি মোটেই শান্তি পাচ্ছি না।'

শ্যাম। হুঁ! চিঠিটা ঠিক হয় নি।

গৌরী। এ চিঠি লেখা অন্যায় হয়েছে, বল্‌চো?

শ্যাম অন্যায় হয় নি, অস্পষ্ট হয়েছে। প্রেমপত্র ব'লে ধরে নেওয়া যেতেও পারে।

গৌরী। আমার মনে হয় তিনি সেই রকমই মনে করেছেন।

শ্যাম। সে কি লিখেছে, শুনি!

গৌরী। তুমিই পড়। আমি এ ভাল বুঝ্‌তে পারি নি।

নিশি লিখিয়াছিল, 'তোমার চিঠি পেলুম। প্রবল আগ্রহে তাকে বুকের কাছে চেপে ধরবার ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু রক্তোজ্জ্বল গলিত লৌহের মত তা' অস্থিমাংস জ্বালিয়ে, গলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে চায় যে! পারলুম না। তোমার চিঠি ফেরত দিলুম।

'তোমার স্বামী বলেছেন আমি লুব্ধ। সত্যই আমি লুব্ধ। মরুভূমির মধ্যে বাস করি,—কোথাও এক বিন্দু রসের লেশও দেখ্‌তে পাই না। আমার চোখের সাম্‌নে তোমার স্নেহের সরসমধুর আঙুরগুচ্ছ অমন করে ধরো না,—আমি সাম্‌লাতে পারবো না। পালাই!'

চিঠি পড়িয়া শ্যাম চিন্তিত হইলেন। বলিলেন 'আমি তাকে আত্মহত্যা করতে বলেছিলুম।'

গৌরী। আত্মহত্যা করতে বলেছিলে! কেন বল্‌লে?—তোমার কথা শুনেই—

শ্যাম। আমার কথা শুনেই আত্মহত্যা করবে! বৃদ্ধ বাপ, মা! অক্ষম, অপটু, স্ত্রী,—একমাত্র তাকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রকাণ্ড দারিদ্র ছেড়ে পালিয়ে যাবে?—আমার কথা শুনে! তবে যাক্,—যাক্, ও ছেলের যাওয়াই ভাল। বলিতে বলিতে শ্যাম হাতের চিঠি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন "উঃ! এত দুর্ব্বল! এত দুর্ব্বল!'

'এত দুর্ব্বল' তিনি কাহাকে বলিলেন, নিজেকে না নিশিকে,—ঠিক বলিতে পারি না।

(২২)

প্রতিভা গৌরীর হাত হইতে দুইখানি চিঠি লইয়া, একটার পর একটা বার বার করিয়া দেখিতেছেন। গৌরী চেয়ারের হাতল ধরিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে; আর ভূপতি অপটুহস্তে টেবিলের উপর হইতে time table খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিশিকে যে ইহলোকের কোন কিনারায় কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এ বিশ্বাস বড় কাহারও ছিল না। Tragedyর এমন পরিপুষ্ট ফলটাকে পাকিবার পূর্ব্বেই এক দম্‌কায় ভূমিসাৎ করিয়া হঠাৎ নিশি ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রতিভা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। একবার অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিলেন "তুই!" কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

ভূপতি ফিরিয়া নিশিকে দেখিয়া বলিলেন "বেশ! অঃ!" বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন, গৌরী এক ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

নিশি বলিল "ফিরে এলুম খুড়িমা।"

প্রতিভা। ফিরে এলি!

নিশি। হাঁ খুড়িমা, ফিরে এলুম। ভেবেছিলুম আর ফিরবো না। কিন্তু ট্রেণে যেতে যেতে একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখলুম। দেখলুম, মাঠের ওপর বক বেড়াচ্ছে,—সব নীল রং। এমন কেন হ'ল। চোখে হাত দিয়ে দেখি, রদ্দুর আটকাবার জন্যে একটা নীল চশমা পরেছি। চশমাটা খুলে ফেল্লুম,—আর সমস্ত জগতের রূপ বদলে গেল। তাই ফিরে এলুম, খুড়িমা! আজ আমার নীল চশমাটা খুলে ফেলেছি।

প্রতি। আজ সাদাকে সাদা বলে চিনেছিস্? উঃ! আজ যে আমার কি আনন্দ!

গৌরী অগ্রসর হইয়া বলিল "আমাকে আর ভয় করেন না।"

নিশি। তোমাকে ভয় করবো কি? আমি নিজেকেই যে ভয় করি না। আজ যে জানতে পেরেছি যেটাকে দর্পণের অন্তরের জিনিস মনে করেছিলুম, সেটা আমার নিজেরই প্রতিকৃতি।

নিশির হেঁয়ালি গৌরী বুঝিল কিনা বলিতে পারি না। সে ইহার সমর্থনও করিল না, প্রতিবাদও করিল না। কেবল নত হইয়া নিশির পদধূলি লইল।

(২৩)

ছত্রিশ দিন টাইফয়েডে ভুগিয়া গৌরী আজ প্রথম বিজ্বর হইয়াছে। তাহার শয্যালীন জীর্ণ দেহের দিকে চাহিলে মনে হয় মৃত্যু-মহাসমুদ্রের তলদেশ হইতে সে উপরের স্তরে উঠিয়াছে মাত্র, এখনও ভাসে নাই। তাই Refractionএ তাহাকে তক্তার মত চেপ্টা দেখাইতেছে। তাহার মুখে আজ হাসি নাই, তাহার মাথায় সে চুল নাই। সে যেন দীর্ঘ তপশ্চর্য্যার ফলে নারীজন্ম বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব নব কৌমার্য্য লাভ করিয়াছে।

শ্যামাচরণ তাহার গায়ের চাদরখানা পায়ের তলায় ও পাশে গুঁজিয়া দিতেছিলেন। গৌরী বলিল 'কাছে একটু বসো না।'

শ্যামাচরণ শয্যার উপর বসিয়া গৌরীর কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

গৌরী বলিল 'তুমি আমার জন্য এত কর্‌চো। আমি তোমার কি কল্লুম?'

"আবার কাঁদে!" বলিয়া শ্যাম একখানি রুমালে গৌরীর চোখ মুছিয়া দিলেন।

গৌরী বলিল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি আমার কর্ত্তব্য করি নি।'

শ্যাম। কি? বেদানা চুরি ক'রে খেয়েছ বুঝি?

গৌরী এ কথা গায়ে মাখিল না। বলিল 'তুমি কি আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে? আমি যে তুমি ছাড়া আর একজনকে বরাবর মনে স্থান দিয়েছি।'

শ্যাম। কে? নিশির কথা বল্‌চো?

গৌরী। হ্যাঁ। একদিন আমি সাধু সেজে জিতে গেছ্‌লুম। যেন তাঁরই সব দোষ। কিন্তু আমার মন যে পাপে ভরা--

শ্যাম। আচ্ছা মনে কর, যদি একজন এমন যাদু কর্‌তে পারে, যে তুমি ঘুম থেকে

উঠেই দেখ্‌লে তুমি নিশির স্ত্রী, আমার স্ত্রী নও। তার পর দিন থেকে আমাকে ভুলে যেতে পার্‌বে ?

গৌরী। না। তা কি ক'রে পার্‌বো ?

শ্যাম। ও! তবে শুধু নিশি নয়? পরপুরুষের ধ্যান করাই তোমার স্বভাব দেখ্‌চি।

গৌরী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। তখন শ্যাম বলিলেন, তোমার ভয় নেই। পরলোকে আমার সার্টিফিকেট যদি গ্রাহ্য হয় ত সতী-স্বর্গ-লোকেই তোমার স্থান হবে।

গৌরী। আমি যে মন থেকে এঁকে কিছুতেই তাড়াতে পারি নি।

শ্যাম গৌরীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন 'তার মানে, তুমি বেঁচে আছ।'

* * * *

ইহার পাঁচ ছয় দিন পরে শ্যাম একদিন ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন 'আজ কার কথা চিন্তা কর্‌চো, গৌরি ? এখন যদি কোন দেবতা এসে বর দিতে চান, ত তুমি কাকে চাইবে ?

গৌরী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল 'এখন ? এখন আর কিছু নয়। একটু মাছের ঝোল আর একমুঠো ঝর্‌ঝরে সাদা ভাত।'

কেবল এই টুকু ? ধিক্! ধিক্! গৌরি। দেবতার কাছে আর কিছু কি তোমার চাহিবার নাই ? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, মানব জাতির মোক্ষ, জলাতঙ্ক রোগ নিবারণ, পতির দীর্ঘ জীবন, নিজের ধর্ম্মবুদ্ধি, কিছুতেই কি তোমার প্রয়োজন নাই ? শুধু ঝোলভাত ?

প্রথম স্বামীকে ত ভুলিয়াছ। বর্ত্তমান স্বামীকেও ভুলিলে! কাল নিশির জন্য কাঁদিতে ছিলে। তাহার কথাই বা কৈ মনে পড়িল ? Frailty, thy name is woman!

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

আষাঢ়ে

শ্যাম গম্ভীর নব মেঘে আজি উঠে বাজি' মৃদু মৃদঙ্গে
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি,
তারামঞ্জীরে নভঅঙ্গনা নৃত্য করে সে সঙ্গে
রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি ;
উতলা পবন বিদ্যুতে সাজি' তারি তালে নাচে তর্জিয়া
গুরু গুরু গর গর,
রুদ্রবেতাল তারি ফাঁকে ফাঁকে বজ্রনাকাড়া গর্জিয়া
কড় কড় হর হর ;
সিন্ধুসরিৎ সাথে মাতে সেই আনন্দে
দিগ্‌দিগন্ত পাছে পাছে নাচে সে ছন্দে
মত্তকানন বৃষ্টিসঘন সুগন্ধে
উঠে উদ্দাম হয়ে :
নাচে শাল তাল নারিকেল নাচে সে রঙ্গে
গিরিনির্ঝর ভরে সুর তার সারঙ্গে
মত্ত ময়ূর নাচে জলদের ভ্রূভঙ্গে
ভুজঙ্গে সাথে লয়ে !

দ্যুলোক ভূলোক পুলকে মাতিয়া তারি তাল তুলে উচ্ছ্বাসি'
জল-তরঙ্গে আজি,
মেঘমল্লার নটনারায়ণ তারি সুর তুলে উদ্ভাসি'
কোমলে কণ্ঠ মাজি'
ছন্দে ছন্দে হিল্লোল উঠে, কদম্ব ফুটে ইঙ্গিতে
দুলে' উঠে রস-দোলা,
মানব-চিত্তে জাগে সে নৃত্য ঝর ঝর স্বর সঙ্গীতে
সকল বাঁধন খোলা ;
নরনারী হিয়া কেঁপে উঠে বাহুবন্ধনে,
বাদলের ছায়া ঘনায় মিলন নন্দনে,
পুলকের ব্যথা বাড়িয়ায় ফাটি' ক্রন্দনে
বরষার ধারা সাথে

আষাঢ়ের এই ঘন ছায়াঘেরা মন্দিরে
তারি সুর বাজে উতলা মনের মঞ্জীরে,
অন্তরতলে লুটায় এ কোন্ বন্দীরে
বাণীহীন বেদনাতে !

* * * *

সুরভগীরথ কে সে সন্ন্যাসী মেঘের শঙ্খ ফুৎকারি'
ধারা গঙ্গায় আসিল ধরায় ধরিয়া,
মরা নিখিলের বিপুল ভস্মে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারি'
সঞ্জীবনীর অমৃত কে দিল ভরিয়া ;
মৃত্যুঞ্জয় সে নটনাথের তাণ্ডব-নাচা অভয় চরণতলে
কদম্বকেয়াকুটজ অর্ঘ্য বিরচিল কবি বরষার ধারাজলে !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সাহিত্য ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য

মাননীয় সভাপতি ও সমবেত ভদ্রমহোদয়া ও মহোদয়গণ :—

শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদক মহাশয়ের আদেশে এই বিহার-বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি সংগ্রহ করিতে যাইয়া আমি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম। প্রথম ভদ্রলোক কহিলেন যে তাঁহার কাঠের ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়া সম্ভব, সুতরাং তিনি আসিতে পারিবেন না। বর্ষার সময় নেপালের পাহাড় হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া বর্ষার নদীতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বড় সহরে কাঠ বিক্রয় করা ইঁহার ব্যবসা। এ কথা আমি জানিতাম ; সুতরাং আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে সাহিত্যের এই হাঙ্গামাটা বর্ষার পূর্ব্বেই চুকিয়া যাইবে ; যোগের সময় সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার পক্ষে বিশেষ বাধা হইবেনা। উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমরা শুকনো কাঠের ব্যবসা করি, আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?'

দ্বিতীয় ব্যক্তিও আমাকে হতাশ করিলেন। ইনি চূণের ব্যবসা করেন, এবং ইঁহার বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে, ইনি কর্ম্মস্থল হইতে অনুপস্থিত হইবা মাত্রই, রেলের গাড়ী ইঁহার চূণ লইয়া উপস্থিত হয়, এবং ঠিক সেই সময়েই আকাশে মেঘ সঞ্চার হয়, এবং যে হেতু রেল কোম্পানী চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে 'ওয়াগন' খালি করিয়া খোলা প্লাট-ফরমে চূণ বাহির করিয়া দেয়, এবং যুগপৎ আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টিও নামে, সেই হেতু ইনি সম্মেলন উপলক্ষে বাহিরে যাইতে শঙ্কিত।

তৃতীয় ব্যক্তি দিলেন চাকুরীর দোহাই। বলিলেন 'ছুটি থাক্‌লে কি হবে মশায়—আমাদের ছুটি অ-ছুটি সব সমান।'

এই খানেই আমার আশা-ভঙ্গের পিঠ শেষ হয় নাই, আরও আছে; কিন্তু যত' আপনাদের ধৈর্য্যেরও সীমা আছে, সেই জন্য নিরস্ত হইলাম। তবে সুখের কথাটুকুও বলি। কয়েকজন প্রতিনিধি স্বেচ্ছায় আসিতে প্রস্তুত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ অসুবিধা-স্বীকারও যে না করিয়া তাহা নয়। তাঁহাদিগকে আমি সমুচিত ধন্যবাদ দান করি।

যাঁহারা আসিতে পারিবেন না বলিলেন তাঁহারা যে একান্তই ব্যবসায় বা চাকুরীর খাতিরে আসিতে অক্ষম, এ কথা যে সত্য নহে তাহা তাঁহারাও যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনি আমিও বুঝিয়াছিলাম। আসল কথা বলিয়াছিলেন ঐ কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী, 'আমরা শুকনো কাঠের ব্যবসা করি, সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?'

ব্যবসায়ে এবং চাকুরীতে ইঁহাদের পরম উন্নতি হউক,—চঞ্চলা কমলা ইঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্ম ও চাকুরী ক্ষেত্রে অচলা হউন, আমার কায়-মনো-বাক্যে এই প্রার্থনা!

আমি শুধু এইটুকু নিবেদন করিতে চাই, যে ইঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন,—এ কথা সত্য নহে যে সাহিত্যে ইঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই, বরং সত্য এই যে সাহিত্যের সংস্পর্শ পাইলে ইঁহাদের কঠিন ও কর্কশ ব্যবসায় এবং চাকুরী ও সরস ও প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিত!

আমি এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে সাহিত্য কোনও বিশেষ দুর্ভাগা বা ভাগ্যবানদের একচেটিয়া নহে—সাহিত্য সকলের জন্য। ঈশ্বরের আলো এবং বাতাস যে ব্যক্তি ত্যাগ করিতে চাহে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। তেমনি যে জাতি সাহিত্য ত্যাগ করিতে চাহে, তাহার মঙ্গল সুদূর-পরাহত। শ্বেত-সরোজ-বাসিনীর যে বীণার ঝঙ্কার অনাদি কাল হইতে এই জরা-মৃত্যু-জন্ম-জীর্ণ পৃথিবীকে সঞ্জীবিত উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে যে দুর্ভাগার কর্ণে তাহা পৌঁছিলনা, তাহার সান্ত্বনা কোথায়?

সমস্ত জগৎ যে প্রচণ্ড-বেগে বিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে এ কথা বিদ্বৎ-সমাজে স্বীকৃত। এই বিবর্ত্তনের গোড়াকার সত্য হইতেছে সৃষ্টি এবং বংশরক্ষা অথবা ধারা-রক্ষা। এই যে বংশরক্ষা এবং ধারা-বাহিকতা রক্ষার চেষ্টা ইহার মূলে আছে অমর হইবার প্রচেষ্টা। মানুষ পঞ্চাশ কি ষাট কি এক শত বৎসর বাঁচিয়া মরিয়া গেল, কিন্তু সে রাখিয়া গেল তাহার পুত্র; পুত্র রাখিয়া গেল পৌত্র, এমনি করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর মানুষ বাঁচিয়া রহিয়াছে। এমনি করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা সর্ব্বত্র স্পষ্ট, মানুষের মতই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে বাঁচিয়া থাকিতে—করাল-দংষ্ট্র সর্ব্বধ্বংসী কালের হাত এড়াইতে। এই যে আশ্চর্য্য বিধাতৃ-বিধান, ইহা জাতির পক্ষেও খাটে। চারিদিকে মৃত্যু, বিভীষিকা, সবলের দ্বারা দুর্ব্বলের হত্যা, নিপীড়ন, আবার চারিদিকে জীবন-রক্ষার চেষ্টা, বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা, এবং শুধু তাহাই নহে, বংশ-রক্ষার প্রচেষ্টা। লীলাময়ের এই যে অপূর্ব্ব লীলা-খেলা কবি যাহাকে বলিয়াছেন—

আপনার তুমি আপনি হরিয়া
কি যে কর কে তা জানে
ডান-হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে।

তাহার মধ্যে বাঁচিয়া যায় সেই, যে সব চেয়ে শক্তিশালী! এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমাদের ব্যবসায়ী-চাকুরী-জীবীদিগের অনাদৃত এই সাহিত্যই শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া যায়, অপার শক্তিশালী মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া। কোথায় গেল সেই মথুরাপুরী, কোথায় গেল যদুবংশ, কোথায় গেল অযোধ্যাপুরী, কোথায় গেল তাহাদের অধিপতি! কিন্তু অক্ষয়

হইয়া রহিল তাঁহাদের কীর্ত্তি-গান মহাভারত ও রামায়ণের সাহিত্যাশ্রয়ে আসিয়া, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবকে অপরূপ গান শুনাইয়া পূত-নির্ম্মল করিল। সাহিত্য দুর্ব্বল নহে, সাহিত্য একমাত্র অক্ষমেরই সেবা নহে। পরন্তু সাহিত্য অপার শক্তিশালী, এবং যে ভাগ্যবানেরা বীণাপাণির শ্বেত-কমলবনে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা হইয়া গেলেন অমর।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর এক মহাকবি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে তুলিয়া দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

মানস কৈলাস শৃঙ্গে নির্জ্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দির প্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি—কবি কালিদাস!
নীল-কণ্ঠ দ্যুতিসম স্নিগ্ধ নীল-ভাস
চির-স্থির আষাঢ়ের ঘন মেঘ-দলে,
জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষির তপোলোক তলে।
আজিও মানস-ধামে করিছ বসতি ;—
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি
শঙ্কর-চরিত-গানে ভরিয়া ভুবন।—
মাঝে হতে উজ্জয়িনী রাজ নিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য- নবরত্ন-সভা
কোথা হ'তে দেখা দিল স্বপ্ন-ক্ষণপ্রভা!
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুল ছবি
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি!

সে দিন একখানা কাগজে পড়িতেছিলাম, একজন ইংরাজ প্রশ্ন করিয়াছেন, যে যদি ইংলণ্ডের বহিঃ-সাম্রাজ্য লোপ পাওয়া এবং সেক্সপীয়র লোপ পাওয়া এই দুই অমঙ্গলের মধ্যে একটাকে বাছিয়া লইতে হয়, ত' ইংরাজ কাহাকে বাছিবে? তিনি তাহার উত্তর দিয়াছেন যে, ইংরাজ নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য-লোপরূপী প্রথম অমঙ্গলটাই বাছিয়া লইবে, সেক্সপীয়রকে কিছুতেই ছাড়িবে না। সত্যকার জাতি তাহার সাহিত্যকে এমনই সম্মান করে।

উপনিষদে ভগবানকে বলা হইয়াছে 'রসো বৈ সঃ'। জগৎ-যন্ত্র অতি কঠোর, অতি নির্ম্মম। ইহার নিষ্ঠুর-পেষণে মনুষ্য-জাতি অহরহ রক্তাক্ত। সেই কঠিন যন্ত্র-পেষণের বেদনায় মানুষকে যদি কিছু শান্তিদান করিতে পারে ত সে সাহিত্য। উপনিষদের রস-ব্রহ্মের সাহিত্য-রূপের সমুদ্র উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত, তাহাকে যদি আমরা কাঠের বাজারের অজুহাতে অবহেলা করি ত' আমাদের মত দুর্ভাগা আর কে আছে? 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। ওরে অবোধ, এই আনন্দের সাগর আজ যখন উদ্বেলিত, তখন চুণ বাঁচাইবার অজুহাতে তুমি তোমার কবাট অর্গল-বদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে, তোমাকে বাঁচায় কে?

বৌদ্ধদিগের বীজ-মন্ত্র হইতেছে, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।' এই যে সংঘ, এই যে সংহতি, সাহিত্যও ওই একই কথাই বলে। আপনারা সকলেই জানেন 'সহিত' শব্দ হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। সংহতি না থাকিলে যেমন মনুষ্য-সমাজ থাকে না, তেমনি সাহিত্য না থাকিলে জাতীয়ত্ব সম্ভব নহে।

সাহিত্য দূরকে নিকটে আনে, অজানাকে বন্ধু করে। আজ সাহিত্যই আপনাদের মত সুধীবৃন্দের সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য আমাদিগকে দান করিয়াছে, তাহা না হইলে, আপনাদের চরণ-ধূলি মোজাফ্‌ফরপুরে পড়ার কোন তাগাই ছিল না, এমন কি ডিস্‌পেপ্সিয়ার জন্যও নহে, কারণ মোজাফ্‌ফরপুরের সোরা-বহুল জল বাঙ্গালীর ওই জাতীয় রোগের পক্ষে কাম্য-পদার্থ নহে।

সাহিত্যের এই দিকটাই বিহার, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম খণ্ড প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত মাতৃভূমি বাঙ্গালার বাঙ্গালীর যোগসূত্র। এই অপূর্ব্ব যোগসূত্রকে কোন বাঙ্গালীই অনাদর করিতে পারে না। এই ভাষা ও সাহিত্য-নাড়ীর রক্তই ত' সর্ব্বত্র একতানে নাচিতেছে!

যদি অতিশয়োক্তি দোষ হয় ত আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস জগতে অতুলনীয়। ইহার উন্নতির বেগ সপ্ত-পর্ব্বতনিঃসৃত বৈদিক-ধারার মত, ইহার তেজ—সূর্য্যের মত, ইহার মধুরতা অমৃতের মত, যাহা—

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!

অথচ কত দিনই বা ইহার আরম্ভ—এবং ইহার স্ফুরণের সুযোগ কতই না সীমাবদ্ধ এই অল্প সময়ের মধ্যে কত না দিক্‌পাল এই সাহিত্য-মন্দির আলোকিত করিয়াছেন! এবং আজ এই সাহিত্য, জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সহিত শুধু এক পংক্তিতে যে স্থান পাইয়াছে তাহা নহে, আজ বাঙ্গালার বরেণ্য-কবি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি এবং মহামানব।

বাঙ্গালীর আজ আর গর্ব্ব করিবার কি আছে? জীবনযাত্রার সকল পথ হইতেই সে ধীরে ধীরে স্খলিত হইতেছে—চাকুরীর দুয়ার তাহার পক্ষে সর্ব্বত্রই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে—বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর শিক্ষার পথ অত্যন্ত ব্যাহত, তাহাকে স্কুলে গিয়া হিন্দী বা উর্দ্দু পড়িতে হয়, এবং এত বড় যে একটা বাঙ্গলা ভাষা তাহা শিক্ষা দিবার কোনও ব্যবস্থাই হয় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়াই হয় না। বাঙ্গালীর রাজধানী কলিকাতা আজ পার্ব্বত্য-মরুপ্রদেশবাসীদিগের বিলাস নিকেতন, এবং অ-বাঙ্গালীর লীলাক্ষেত্র। ব্যবসায়ের সমস্ত পথকেই বাঙ্গালী অবহেলা করিয়া আজি নিজে অনাদৃত। নিম্নস্তরের ব্যবসায়ী ধোপা, নাপিত, গোয়ালা এবং মুচি পর্য্যন্ত আজকাল অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গালী ক্রমশঃ যে সরিয়া সরিয়া কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। বাঙ্গালী আজ সত্যই জীবন-যুদ্ধে কাতর।

তাহার জাতীয় জীবনে যদি গর্ব্ব করিবার কিছু থাকে ত এই সাহিত্য। এই যে অপরূপ সাহিত্য ইহার তুলনা নাই। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমাদের একমাত্র কাঙ্গালের ধন সাহিত্যের সমুচিত সমাদর আমরা করিতে শিখিলাম না। কারণ সাহিত্য রাতারাতি আমাদিগকে সাত রাজার ধন এক মাণিক আনিয়া দিতে পারে না।

মাণিক আনিয়া না দিলেও সাহিত্য যাহা দেয় তাহা মাণিকের অপেক্ষা ছোট নয়, এবং সে অপূর্ব্ব বস্তুটী হইতেছে 'কাল্‌চার', যাহার মোটামুটি বাঙ্গলা করা যাইতে পারে শিষ্টতা। এই 'কাল্‌চার' জিনিষটি জীবনযাত্রার পথে অপরূপ সঙ্গ; এবং ইহা অর্থে আসে না, দানে আসে না, সম্ভ্রমে আসে না, লোকবলে আসে না। ইহার জন্ম মানুষের অন্তরের মাঝখানে, রসের সাহায্যে, এবং সেই রস যোগায় বহু পরিমাণে সাহিত্য। দু'একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দি! এন্টনি কবিওয়ালা ছিলেন পর্ত্তুগীজ। তিনি গাহিয়াছিলেন —

খৃষ্ট আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই

আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙ্গাচরণ পাই।

মির্জা হুসেন আলি ছিলেন একজন মুসলমান কবি। তিনি গাহিয়াছিলেন,—'ওরে শমন এবার ফিরি, এসো না মোর আঙ্গিনাতে! * * আমি কি তোমার ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাস-তালুকে বসত করি। বলে মির্জা হুসেন আলি, যা কর মা জয়কালী, পুণ্যে ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।'

আজকালকার ধর্ম্মের চক্রনিনাদের কাছে ইহা কতই না মধুর!

আধুনিক বাঙ্গলা-সাহিত্যের সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়া আমি উপসংহার করিব।

শোনা যায় নাকি আজকালকার বাঙ্গলা-সাহিত্য ধ্বংসের পথে চলিয়াছে; ইহাতে পাঠের যোগ্য নূতন কিছুই লেখা হইতেছে না, এবং লেখকদিগের একমাত্র চেষ্টা হইয়াছে পাপের চিত্র অঙ্কন করিবার। বাঙ্গলা-সাহিত্যের আধুনিক গতি লইয়া এত আলোচনা হইয়াছে যে সেই আলোচনাই মূল সাহিত্য অপেক্ষা বিস্তৃততর হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে; এবং কোন কোন সাহিত্য-চিকিৎসক সাহিত্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেও বসিয়া গেছেন। এ অনুযোগও শুনা যায় কথা-সাহিত্যের আগাছায় বাঙ্গলা ভরিয়া গেল, এবং কোন দেশ হইতে ছোট-গল্প আমদানী হইয়া আসিয়া সৎ-সাহিত্য ধ্বংস করিল।

সৎ-সাহিত্যের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, এবং আমরা উহাকে প্রচুর ভক্তি করি। কিন্তু খাঁটি নির্জ্জলা সৎ-সাহিত্য পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। গীতা, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কতকগুলি পুস্তক আছে, যাহাদের সত্যের আসনে বসান যাইতে পারে। এ-গুলিকে সাহিত্যের ভিতরে না ফেলিয়া ধর্ম্ম-পুস্তক আখ্যা দেওয়াই ভাল।

সাহিত্য হইতেছে উহাই যাহা নর-নারীর মধ্যে যে মধুর ও বিচিত্র রহস্য-ময় সম্বন্ধ আ-সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, যে রহস্য আলোকের সহস্র-রশ্মির মত বিচিত্র-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে, তাহাকেই প্রকট করে মনোরম রূপে, আনন্দ-দায়ক রূপে। ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া মানুষের যে হৃদয়োচ্ছ্বাস তাহাও সাহিত্য, কিন্তু এ-দিকে সাহিত্য কোনও দিনই সুপ্রচুর নহে। আমি অবশ্য কথা-সাহিত্যের কথাই বলিতেছি; বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না।

নর-নারীর মধ্যে এই যে অপার রহস্যময় সম্বন্ধ ইহাই জগতের সকল সাহিত্যের মূল উপাদান। গ্রীক, রোমক সংস্কৃত সাহিত্য এই অপরিসীম রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টা। আধুনিক সমস্ত সাহিত্যও—ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মাণ, রাসিয়ান, নরওয়েজিয়ান, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান ইত্যাদি—সেই এক পথের ঐ পথিক। আর তাহা হওয়াও স্বাভাবিক, কারণ মানুষের কাছে ইহার চেয়ে বড়, ইহার চেয়ে সত্য, এবং ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য রহস্য আর নাই। ইহাই তাহার স্বপ্ন, ইহাই তাহার কাছে প্রতিদিনকার সত্য। ঘরে বাহিরে ইহাকে লইয়াই তাহার নাড়াচাড়া করিতে হয়। এবং যদি ভগবান থাকেন ত' ইহাই তাহার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি বলিয়া মানিতে হইবে। নানা-দিক হইতে নানা-ভাবে বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যিক মনীষিগণ যদি এই রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টা করিয়া থাকেন, ত' তাঁহাদের অপরাধ কি? স্বয়ং বিধাতাই ইহাকে সৃজন করিয়া পাঠাইয়াছেন, স্বয়ং বিধাতাই ত' ইহার নিত্য খোরাক যোগাইয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বত্র এই রহস্যের খেলা চলিয়াছে অব্যাহত, যে অভাগা বই পড়িয়া খারাপ হইতে চাহে বই-পড়ার কষ্ট স্বীকার না করিয়াও যে তাহার পক্ষে মন্দ হইবার পথ আরও সুগম। ক্রমাগত কড়া শাসনের

আড্ডার, অসৎ-সাহিত্য এবং সৎ-সাহিত্যের প্রভেদ বিচারে যে সাহিত্য-বেচারাই অধিব! মলয়ানিল ভাল, এবং বহু-কবি ইহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু মলয়ানিল সেবন করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে লু-এরও প্রাণান্তকর অত্যাচারও সহিতেই হইবে, এবং বিধাতৃ-বিধানকে কোনও রকমে রাজী করিয়া যদি 'লু' বন্ধ করা যায়, ত' সেই দিন হইতে মলয়ানিলও লোপ পাইবে।

সাহিত্যে কুৎসিতের স্থান নাই, অর্থাৎ সেই লেখার যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের নীচ প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। তাহার জন্য রাজপুরুষের হস্তে যথেষ্ট অধিকার আছে; এবং কোন সাধারণ ব্যক্তিই তাহাকে প্রশ্রয় দিবে না, সুতরাং সে নিজেই মরিবে। তাহার জন্য খুব বেশী চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক ও কালি কলম ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

তাহার পর কথা-সাহিত্যের প্রাচুর্য্য। ইহাকে আমি সুলক্ষণ বলিয়াই মনে করি। সকল প্রধান সাহিত্যই কথা সাহিত্যে পুষ্ট। আমাদের বহু পূর্ব্ব-পুরুষগণ হিতোপদেশের গল্প শুনিয়াছেন, আমরাও যদি দুই একটা গল্প শুনি ত' তাহাতে অপরাধ কিসের? নিষ্ঠুর সত্যের তাড়নে, কল্পনা অর্দ্ধমৃত। আমাদের কথা-সাহিত্য যদি গল্পের ভিতর দিয়া আমাদিগকে কল্পনার সিংহদ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়, ত' বাঙ্গালীর বংশধরদের পক্ষে তাহাতে শঙ্কার কিছুই নাই।

এই একটা অনুযোগ প্রায়ই শোনা যায়—যে বাঙ্গলা সাহিত্য 'রাবিশে' পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হয়ত' বা ইহা কতকটা সত্য, কিন্তু ইহাতে অনুযোগের কিছুই ত' দেখিনা। 'রাবিশ' কি একেবারেই প্রয়োজন-শূন্য? ওই যে চাকচিক্যময় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, উহাতে যে অনেক-খানি 'রাবিশ' কাজে লাগিয়াছে। মহত্তের জন্য ক্ষুদ্রের প্রয়োজন সনাতন; সফলের জন্য নিষ্ফলের প্রয়োজন নিত্য। অত্যন্ত কেজো লোকের নিক্তির তৌলে যাহার অপ্রয়োজনীয়তা ধরা পড়িল না, বিশ্ব-বিধানে হয়ত' তাহার প্রয়োজন ঐ কেজো লোকটির চেয়ে ঢের বেশী। বসন্ত-কালে লাল-নীল-সবুজ-হলদে-গোলাপী-বেগুনী-ফুলের অপূর্ব্ব মেলা দেখিয়াছেন,—তাহাদের কি প্রয়োজন আছে এই কঠিন বাস্তব জগতে? তাহারা মানুষকে খাবার জোগাইতে পারে না। অতি-ব্যস্ত মানুষের যখন কর্ম্মের কোলাহল জাগিয়া উঠে, তখন তাহারা সেই কর্ম্মের কোন সহায়তা করে না কিন্তু তবুও এই ফুল ফুটিয়া চলিল নিত্য, এবং তাহার অপরূপ শোভায় ও সম্পদে বিশ্ব-জগৎ চিরদিন রাণীর মত ঝলমল করিতে লাগিল। মানুষের কাছে এই নিষ্প্রয়োজনীয়তাই তাহার সব চেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা, কর্ম্ম-ক্ষত-বিক্ষত মানুষ যখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়ে, তখন বিশ্বজননী ডাকিয়া বলেন, ওরে অবোধ, দেখ তোর জন্য কত বড় প্রয়োজন আমি আজ থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছি; তোর এই প্রাণান্তকর জীবন-যুদ্ধে ক্ষণেকের তরে ক্ষান্তি দিয়া, আয় বাছা আমার আনন্দময় শান্তির মন্দিরে, যেখানে ফুলের গন্ধ ফুলের শোভা তোর প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল হাসিতেছে।

গর্ব্বী সাহিত্যিক কঠিন অনুশাসন করিলেন শতং বদ বা মা লিখ। তাহার পর কালক্রমে তিনি আরও একটু নরম হইয়া কহিলেন, আচ্ছা বাপু শতং লিখ, কিন্তু মা ছাপ! অধম সাহিত্যিকের তরফ হইতে জিজ্ঞাসা করি, কেন প্রভু? আমি যদি আমার পয়সা খরচ করিয়া ছাপাই, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? আমার অক্ষমের লেখা যদি একটি লোকের প্রাণেও সান্ত্বনা দেয়, একটি চক্ষুতেও অশ্রু আনয়ন করে, ত' সে যে তোমার শত অনুশাসনের চেয়ে সার্থক হইয়া গেল! অতবড় যে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র, তিনিও ত' কাঠ-বিড়ালীকে ফেলেন নাই, তাইত' সুবৃহৎ সাগর-বন্ধনে কাঠ-বিড়ালীর একমুষ্টি ধূলি হইয়া রহিল অমর; কাঠ-বিড়ালীর ক্ষমতার

অন্তরের কথা মহাপুরুষের অজ্ঞাত ছিল না, তবু তিনি তাহাকেই শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়া [illegible] পদধূলির চিহ্নে অধমের এই ভক্তি-অর্ঘ্য দানকে চিরদিনের জন্য অক্ষয় করিয়া গেলেন !

আজ সাহিত্যের বাজারে Idealistic, Realistic, বাস্তব, অবাস্তব, শ্লীল, অশ্লীল, সুরুচিসম্পন্ন, রুচি-বিগর্হিত প্রভৃতি রচনার চুল-চেরা শ্রেণী-বিভাগ লইয়া যে আলোচনার কোলাহল জাগিয়াছে, তাহা বহু-স্থলেই সভ্যতার রুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়। কুৎসিৎকে নিন্দা করিয়া যে ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহা নিজেই কুৎসিত।

অশ্লীলতা এবং কুৎসিৎ সাহিত্যে নিন্দনীয়, শুধু সাহিত্যে কেন জীবনের সর্ব্ব-পথে। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং ইহা এমন একটা অদ্ভুত কথা নহে, যাহা মানুষকে উচ্চকণ্ঠে শিখাইয়া না দিলে সে শিখিতে পারিবেনা। কিন্তু আসল গোল হইতেছে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার সীমা-নির্দ্দেশ ব্যাপার লইয়া। কে এই সীমা নির্দ্দেশ করিবে ? যে শক্তিমান লেখক বদ্ধ ও পাঁচীর জানালায় পথে প্রেমের ব্যাপার লইয়া অক্ষম লেখককে আজ উচ্চকণ্ঠে বহু গালি পাড়িয়া গেলেন, কাল সেই ক্ষমতাবান লেখকের নূতন উপন্যাস খুলিয়া দেখুন, তিনিও সেই বদ্ধ-পাচীর প্রেমের কথা লিখিয়াছেন, প্রভেদ এই যে সেই জানালা হইয়াছে গবাক্ষ এবং বদ্ধ পাঁচীও তাহাদের বেশ বদলাইয়া হইয়াছে, দেবেন্দ্র-নন্দনারা, কি এমনি কিছু !

এই তথাকথিত অশ্লীলতা লইয়া এত শঙ্কিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ছেলেবেলায় আমি একজন শুচি-বায়ু-গ্রস্তা নারীকে দেখিয়াছিলাম তিনি অশুচিকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য সমস্ত দিনটাই রাস্তার লম্ফ দিয়া চলিতেন, কিন্তু-রোজই দিনশেষে তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে শুনিতাম যে অশুচিকে তিনি এড়াইতে পারেন নাই। মাঝে হইতে তাঁহার লম্ফঝম্পের পরিশ্রমই সার হইত। সাহিত্যেও এই অত্যাগ্র অশুচি-বায়ু রোগের হাত এড়াইতে হইবে। এই যে এতবড় নিত্য-লীলা-সৌন্দর্য্য-রহস্য পরিপূর্ণ বিশ্ব-গ্রন্থ এখানে কি বিশ্ব-বিধাতা সমস্তই অত্যন্ত ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন ? এই বিশ্বগ্রন্থ ত' কেবল গোপালের কাহিনীই লিপি-বদ্ধ করিয়া শেষ হয় না,—যে গোপাল পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী, সুশীল এবং একান্ত ভাল ছেলে, এ গ্রন্থের প্রতি-পৃষ্ঠা যে দুঃশীল রাখালের দৌরাত্ম্য-কাহিনীতেও পরিপূর্ণ ! এই বিশ্ব-গ্রন্থে নারী-মাংস-লোলুপ মনুষ্য-ব্যাঘ্রের কথাও আছে এবং নররক্ত-পিপাসী নারীর কথাও আছে। ইহাদের অস্বীকার করিলে চলিবেনা, এবং এই অবক্তাবীর জন্য অকারণ দুঃখ করিয়াও কোন ফল নাই। ইহারা পাশাপাশি আছে সত্য, তবুও এ-কথা তারও চেয়ে উচ্চ-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে এই গ্রন্থেই আছে মাতা ও পুত্রের, পিতা ও কন্যার, ভ্রাতা ও ভগিনীর অপরূপ পুণ্য-কাহিনী যাহা যুগে যুগে এই নিত্য-কালীন সংসারকে পুণ্যের প্রলাপে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

যাহা সত্য তাহা যদি কদর্য্যও হয় তথাপি তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই, তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা। বরং তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করিবার সম্ভাবনা কোথায় জানিয়া লইয়া সাবধান হওয়াই বিবেচনার কার্য্য। পুত্রক পাঠে নষ্ট হইয়া যাইবে এই ভয়ে আমরা সযত্নে যে বালককে পুস্তক হইতে দূরে রাখিতে চাহি, সে যখন পথে বাহির হইবে তখন তাহার দৃষ্টি রোধ করিবে কে ? তাহার চেয়ে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী করিয়া বুঝাপড়া করাইয়া দেওয়াই ভাল। হাঙ্গর ও কুম্ভীরের যে বৃহৎ দংষ্ট্রা আছে, কলে-কৌশলে ও ছলে-বলে যে স্নেহশীলা মাতা অনবরতই তাঁহার পুত্রকে তাহা ভুলাইবার চেষ্টা করেন, সেই মাতারই সেদিন সব-চেয়ে বড় দুর্দ্দিন যে-দিন তাঁহার পুত্রের জলে নামিবার সময় আসিবে।

মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে আজ এই হাহাকারই ক্রমাগত শোনা যায় যে বাঙ্গলা সাহিত্যের আজ বড় দুর্দ্দিন। বঙ্গ-সাহিত্য রসাতলে তলিয়া গেল—বাঙ্গলা সাহিত্য ধ্বংসের পথে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে। হাহাকারের

এই একটা মস্ত দোষ যে তাহা অকারণ হইলেও মনকে দমাইয়া দেয়, আমরা মনে হয় আজিও হাহাকার করিতে বসি। এই সভায় সমাগত হে আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত শুভদিনে আপনাদের সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হইয়াছে. এত বড় শুভদিন বাঙ্গলা সাহিত্যের আর আসিয়াছিল কি না জানি না। বাঙ্গলা-সাহিত্য-জননী আজ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্র এই দুই দিক্-পালের জন্ম-দান করিয়া জগৎ-বরেণ্যা। জননীর পূজার জন্য যে বহু বঙ্গ-সন্তান, সক্ষম ও অক্ষম, বড় ও ছোট,—আজ ঘরে ঘরে অর্ঘ্যের ভার লইয়া মন্দির-পথে উৎসুক-নেত্রে ভিড় করিয়া চলিয়াছেন, এ দৃশ্য কি সত্যই মনোরম নহে?

সাহিত্য যদি সংহতি হয়, সংযোগ হয়, ত' ছোটকে অক্ষমকে অবহেলা করিলে চলিবেনা, ক্রমাগত চোখ রাঙাইয়া শাসন করিলে চলিবেনা। সক্ষমকে অক্ষমকে, ছোটকে বড়কে, বৃহৎকে ক্ষুদ্রকে, ভালকে মন্দকে, একই সঙ্গে একই মায়ের মন্দির পথে যাত্রা করিতে হইবে, অন্তরকে দ্বেষ-শূন্য, ক্ষমা-শীল, সুনির্মল, পূত-পবিত্র করিয়া—তবে ত' মা প্রসন্ন হইবেন। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। *

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হাসি

একটু খানি হাসি,—
বিদ্যুতেরি ঝিলিক যেন চমকে ওঠে ভাসি
ঠোঁটের পাশে, চোখের কোণে,—
জানিয়ে সে দেয় মনে মনে,
আঁধার-ভরা হাসির মাঝে
কান্নাও সে লুকিয়ে আছে,
লুকিয়ে বুঝি আছে আরও তীব্র-বাথের জ্বালা,
সাহস যদি না থাকে ত কাছে যেতেই মানা।

একটু খানি হাসি,—
মিঠে যেন মাঠের ধারে রাখাল ছেলের বাঁশি!
কখন্ কোমল কখন্ করুণ,
লজ্জা-রাগে কখন্ অরুণ;
যেন তাহার তলে তলে
প্রেমের ফল্গু লুকিয়ে চলে,
বলে যেন ঐ হাসিতে—"তোমায় ভালবাসি।"
এমনি করে গলায় জড়ায় প্রেমের মোহন ফাঁসি!

হাসির একটু ধারা—
নৃত্যপরা ঝরণা যেন ভেঙে পাষাণ কারা
চপল-চরণ চল্ছে ছুটে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পড়ছে লুটে,
বুকে যে তার যেথায় দুলে
হাসির রাশে উঠছে কূলে,
কল-মুখর কলকণ্ঠে গাইছে নূতন গান,
এই হাসিতে পড়ছে ধরা নবীন তাহার প্রাণ।

হাসির ঈষৎ রেখা,—
ভোরে যেন গগন কোণে মলিন চন্দ্রলেখা!
দেখা তাহার পাই কি না পাই,
এসেই যেন বলে সে—"যাই"!
কান্না হতেও করুণ যেন,—
এর মাঝেও যে 'হাসি' কেন
পাই না মোটে ভেবে ভেবে যতই দেখি একে;
কাঁপনে মোর বুক ভরে যায় এমন হাসি দেখে।

হাসি একটু খানি,—
তারই মাঝে শোনা যে যায় প্রাণের কত বাণী!
কথার অর্থ লুকিয়ে আছে
হাজার রকম হাসির মাঝে;
ভাষায় যে-ভাব দেয় না ধরা
আছে সে সব জমাট করা
অধরপুটে, আঁখিকোণে, হাসির ছদ্মবেশে!
কখনও সে স্বর্গ রচে, কখন্ সর্বনেশে!

শ্রীসুনীতি দেবী

---

* মোজাফ্ফরপুর বিহার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

বড়লোকের স্মৃতি

(কেশবচন্দ্র সেন)

সৌম্যদর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, কেশবচন্দ্র ছিলেন তাহাই। তাঁহার মুখশ্রীর প্রফুল্লতা-ভরা দীপ্তি, সোম বা চাঁদের আলোকের মত স্নিগ্ধ ও মনোহর ছিল। যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই তাঁহারা এল্‌বার্ট হলে রক্ষিত কেশবচন্দ্রের প্রতিকৃতিখানি দেখিলে ইহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমি যখন প্রথমে এই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষকে দেখি তখন তাঁহার বয়স সবে চল্লিশে পৌঁছিয়াছে; কুড়ির কোঠায় থাকিতেই তিনি ভারতবিখ্যাত হইয়াছিলেন, আর একত্রিশ বৎসর বয়সেই ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রকে প্রথম দেখিবার দুই বৎসর পর হইতে ১৮৮৩ অব্দ পর্য্যন্ত যে যুবক ছাত্রদলের সঙ্গে মিলিয়া কেশবচন্দ্রের কাছে বসিতাম ও তাঁহার কথা শুনিতাম তাঁহারা সকলেই অল্প পরিমাণে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে এখন প্রিয়নাথ মল্লিক ছাড়া আর কেহ জীবিত নাই। সেই যুবকদলের একজন নূতন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের দিনে বড় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এই ভবানীচরণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামে

আমি কেশবচন্দ্রকে নানা অবস্থার মধ্যে ও নানা কাজের মধ্যে অনেকবার দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম; সম্পূর্ণ মনে পড়ে যে কখনও তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িতে দেখি নাই,—যখন তিনি উপাসনায় পাপবোধের কথা বলিতেন, অর্দ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে করুণ ভাষায় শ্রোতাদের মন গলাইয়া ভগবানকে ডাকিতেন, তখনও মুখের উপর সরল প্রফুল্লতার সেই দীপ্তি খেলা করিত যাহা ভাষায় বুঝাইবার শব্দ হইত "হাসি"। ইহাতে মনে হইত, এখনও মনে হয়, তিনি যাঁহাকে ডাকিতেন সেই আরাধ্য কেশবের কাছে নিত্য পরিস্ফুট থাকিতেন বলিয়াই এইরূপ হইত; আকুল হইয়া অজানার খোঁজ করিলে ঐরূপ সরলতা ও প্রফুল্লতা থাকিতে পারিত না। যাঁহারা ঈশ্বরকে মানেন না অথবা কল্পিত বস্তু ভাবেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে কেশবচন্দ্র যাহা দেখিতেন তাহা ধাঁধা; কিন্তু ঠিক যে তিনি কিছু প্রত্যক্ষ করিয়া কথা কহিতেন ইহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। এই কথাটা বলিবার জন্যই প্রথমে কেশবচন্দ্রের মুখশ্রীর কথা বলিয়াছি। যে বিশ্ববিখ্যাত রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেশবচন্দ্র প্রথম আবিষ্কার করিয়া এদেশে তাঁহাকে বহুভক্তের পূজ্য করিয়া দিয়াছিলেন তিনি ধ্যানস্থ কেশবচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া অনেক সময়ে গদ্গদস্বরে বলিতেন—গভীর জলের মাছ, অনেক তলায় ডুবিয়া গিয়াছে। আমি ভক্ত নই, তাই একজন ভক্তের মনের ধারণার কথার সাক্ষী দিলাম।

বিদ্যালয়ের যুবক ছাত্রেরা একটি নির্দ্দিষ্ট দিনের অপরাহ্নে কেশবচন্দ্রকে নানা বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অধিকার পাইয়াছিল; অনেকে এমন প্রশ্ন করিত যাহা অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ, আর কেহ কেহ কেশবচন্দ্রের কাছে কৈফিয়ৎ চাহিবার মত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার বিরোধী দলের উপাপিত অভিযোগের উল্লেখ করিত। কেশবচন্দ্র ইহাতে তিলমাত্র উত্যক্ত বা বিরক্ত হইতেন না; তিনি অতি প্রসন্নমুখে সস্নেহে প্রশ্নকারীর মুখের দিকে তাকাইয়া অতি ধীরভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন, আর অনেকের অনেক অসংবদ্ধ প্রশ্ন নিজেই গুছাইয়া তুলিয়া তাহার জবাব দিতেন।

এ সম্পর্কে ছাত্রদলের কথা ছাড়িয়া একজন বড়লোকের কথা বলিব। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিখ্যাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মবিষয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে অনেকবার তর্ক ও আলাপ করিতে যাইতেন। এই কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন সৌম্যদর্শন পুরুষ ছিলেন। আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে একাধিকবার শুনিয়াছি যে তিনি কেশবচন্দ্রের মত ধীর-প্রকৃতি, বিনয়-নম্র, মধুর-ভাষী ও সদালাপী ব্যক্তি বড় দেখেন নাই। যিনি বক্তৃতা করিবার সময়ে সিংহগর্জ্জনে কথা কহিতেন ও গভীর দৃঢ়তায় নিজের মতের সমর্থন করিতেন, তিনি কথা-বার্ত্তার সময় ও তর্কের সময় যে এত কোমল, মধুর ও সহিষ্ণু হইতে পারিতেন তাহা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর ছিল।

তিনি কিরূপ সম্মোহন মন্ত্রে মানুষকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন সে সম্বন্ধে কেবল একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ১৮৮১ অব্দের জানুয়ারী মাসে Beadon Parkএ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল; Park-এর প্রায় মাঝখানে একটা বড় বেদী ছিল, সেইস্থান হইতে Park-এর উত্তর প্রান্তের gate পর্য্যন্ত লোকের ভিড় হইয়াছিল, আর সেই ভিড়ের মধ্যে বহুস্থানে বহুলোক চেঁচাইয়া ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে নিন্দা ও হাসি-তামাসা করিতেছিল। কেশবচন্দ্রের দল যখন আসিয়া বেদীর কাছে পৌঁছিলেন তখনও ভীষণ কোলাহল চলিতেছিল। কেশবচন্দ্র যাই বেদীর উপর দাঁড়াইয়া বাঁ হাতখানি পশ্চিমের দিকে তুলিয়া বলিলেন—"ঐ দেখ সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে," তখন সে জনতার মধ্যে অতি ক্ষীণস্বরেও একটি শব্দ ওঠে নাই। মানুষকে চুপ করাইবার জন্য কোন জনতায় কাহাকেও চেঁচাইতে হইত না, কেশবকে দেখিলেই লোকে নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত, যদিও সেকালের সেই জনতায় কেশবের মতের বিরোধী লোকের সংখ্যাই অতি অধিক থাকিত। বঙ্গবাণীর পাঠকেরা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কয়েকটা প্রবন্ধে পড়িয়া থাকিবেন, যে এযুগে প্রথম স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। এই স্বাধীনতা-মন্ত্রের প্রকৃতির পরিচয় দিতেছি। কেশবচন্দ্র ঠাকুরবাবুদের বাড়ীর ধর্ম্মসাধন মন্দিরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে ও আরও অন্য দশ রকমে দেবেন্দ্রনাথের কাছে কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে কত শ্রদ্ধা করিতেন তাহা একটি দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পারা যাইবে; তিনি দেবেন্দ্রনাথের উপাধি দিয়াছিলেন মহর্ষি, আর সেই যথার্থ উপযোগী উপাধিতেই দেবেন্দ্রনাথ এদেশে স্মৃত ও আদৃত। ঠাকুর বাবুদের বাড়ীর ধর্ম্মমন্দিরে ব্রাহ্মণ উপদেষ্টারাই আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পৈতা ফেলিয়াছিলেন ও কেশবচন্দ্রের যখন একুশ বৎসর বয়স তখন তাঁহাকে আপনার ডাহিনে বসাইয়া উপদেষ্টারূপে বরণ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র নিজে যথেষ্ট আদর ও সম্মান পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঠাকুরবাবুদের বাড়ীর মন্দিরে ব্রাহ্মণ-শাসন রক্ষিত হইতেছিল। কেশবচন্দ্র তখন দাঁড়াইয়াছিলেন প্রতি-লোকের চিন্তা ও ধর্ম্মবুদ্ধির স্বাধীন স্ফূর্ত্তির জন্য ও জাতি-ভেদ তুলিয়া দিয়া সমতা স্থাপন ও প্রচারের জন্য। তিনি তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অনুবর্ত্তী হইয়া নিজে স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন। তিনি ঠাকুরবাবুদের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন বটে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাদ করেন নাই; বরং তাঁহার নূতন মন্দিরের উদ্ঘাটনের দিনে দেবেন্দ্রনাথকে বেদীতে বসাইয়া নিজেদের কাজ আরম্ভ করেন। মানুষ কেবল মতে ও কল্পনায় স্বাধীনতার গল্প করিবে,—সাহসে ভর করিয়া নিজে তাহা জীবনে অনুষ্ঠান করিবে না, ইহা কেশবচন্দ্র তাঁহার

ধর্ম্মবুদ্ধিতে সহিতে পারিতেন না। প্রিয়পাত্রেরা বিমুখ হইলে অথবা পৃথিবী একদিকে টলিয়া গেলেও তিনি তাঁহার স্বাধীন চিন্তা পরিত্যাগ করেন নাই বা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে ভয় পান নাই। মানসিক প্রকৃতিতে যাহার এই ভাব আসে নাই, সে স্বাধীনতার মন্ত্র জপিতে অনধিকারী। কাজেই বলিতে পারি যে ধীরতায় ও প্রফুল্লবদনে দেশ-সুদ্ধ সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াও তিনি কর্ত্তব্য-পালনের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। পাঠকেরা সকলে কেশবের মতানুযায়ী হইবেন, আমি একথা বলিতেছি না; কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে চালিত হইয়া মানুষ যে সারা পৃথিবীর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিবে, সেই দৃষ্টান্তের কথা বলিতেছি।

কেশবচন্দ্র কখনও হুজুগে ধরণের অর্থাৎ Vulgar ধরণের চীৎকার জমাইয়া অথবা মারামারি করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অটলতা দেখান নাই; কেবল ধীরভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। যখন কেশবচন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য আন্দোলনের ঝড় উঠিল, তখন তিনি ধীরভাবে বিদ্রোহীদের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর নিজেই নিজেকে পদচ্যুত হইবার প্রস্তাব করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিরোধীরা ইহাতে ভয় পাইয়া মনে করিয়াছিলেন যে কেশবচন্দ্রের এই ধীরতা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া হয়ত উপস্থিত লোকদের মন গলিয়া যাইতে পারে; তাই বিরোধীরা তাঁহাদের সভাপতি কেশবচন্দ্রকে অগ্রসর হইতে না দিয়া ও কথা কহিতে না দিয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন, কেশবচন্দ্র একটি কথাও না কহিয়া অতিধীরে ঘরে ফিরিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের জীবনের এমন কয়েকটি ঘটনা আমার জানা আছে যাহা আমি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ মনে করি, আর যাহা তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এই চুয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে কোন লেখায় বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। আমি জানি সে সকল কথা মুদ্রিত হইলে কেশবচন্দ্রের পরিবারের কাহারও মনে বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই বরং উহার প্রচারে কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত অধিকতর পরিস্ফুট হইবে, কিন্তু সেই ঘটনার সহিত যাঁহাদের জীবনের কথা জড়াইয়া আছে, তাঁহারা এখন জীবিত ও তাঁহাদের অনুমতি না পাইলে তাহা প্রকাশ করা উচিত না হইতে পারে। অনুমতি না পাইলেও যদি এইটুকু জানিতে পারি যে উহা আমি প্রকাশ করিতে গেলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষুণ্ণ হইবেন না, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর একবার কেশবচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি নূতন কথা বলিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বসন্তিয়া

মন ত নয়, খামখেয়ালী ; দিশা মেলে না কোনোদিন !

প্রয়োজনই বা কি !

জীবনের এই রিক্ত আকাশে রঙের খেলা,—বেলা শেষের মরীচিকা—

এ শুধু বিদায়-গোধূলির ক্লান্ত ক্ষণস্থায়ী সমারোহ।

তারপর—পাণ্ডুর আকাশের শেষ আলোটুকু অন্ধ-রাক্ষসী লেহন করে, নিঃশেষে।

তবু নীড়হারা পাখী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে : বাসা খুঁজিয়া বেড়ায়।

প্রমত্ত ঝঞ্ঝাবাতে দীন আশ্রয়টুকু যার ছিন্নভিন্ন হইয়া গেছে, বৈরাগ্যই ত তার সম্বল !

অথচ এ বৈরাগ্যের কোনো হদিসই পাই না। জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রা-পথে তার ডানা দুটি যে আজ অবেলায় ক্লান্ত হয়,—তার অর্থ কি !

......ভুল ভুল, সব ভুল। গেরুয়ার এই বাহ্যিক ঔদাসীন্য যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আছে, সে অন্তরতম গোপন প্রবৃত্তিকে কেবল আমিই চিনি !

পথের নেশায় যে পাগল, সে ত আমি নয় !

কিন্তু একি ! যাহা ভাবি নাই, কল্পনা করি নাই,—সেই ফাঁদেই আজ পা দিয়া বসিয়াছি ! ছন্নছাড়ার এই এত বড় সন্ন্যাসী-জীবন মন্থন করিয়া যে উঠিল, সে এক আশ্রয়-লোভী কাঙাল ! মমতার দ্বারে ভিখারী সে !

ভুল—ভুল ! হৃদয়কে উপবাসী রাখিয়া মহত্ত্ব দেখানো চলে না। জীবনের সন্ধান পাওয়ার নামে তার প্রতি এতখানি প্রবঞ্চনা,—এ কি আত্মহত্যা নয় !

যাহাকে অন্তর দিয়া, দেহ দিয়া, আত্মার আত্মানুভূতি দিয়া চাই, হাতের মুঠার মধ্যে যাহাকে টিপিয়া ধরিয়া রাখিতে চাই,—তাহাকে এমনি ভাবে ছাড়িয়া দিই ? ক্ষুদ্র এই মহত্ত্বটুকুর বিনিময়ে আপনার ক্ষুধার্ত্ত দেবতার গলা টিপিয়া মারি ?

...... বন্ধু লিখিয়াছে, 'বৈরাগী-জীবনে তোমার বিশ্বাস আর আনন্দে মন ভরে উঠুক।'

জানি, আমি জানি সব ! যাযাবরের জীবনে এই কথাটাই শুধু জানি,—বিশ্বাস যাহার নাই, আনন্দই বা তাহার কোথায় ! অথচ এও দেখি, বিধাতার এই সৃষ্টিটার মধ্যে কোথায় যেন কি একটা ভুল, একটা গলদ রহিয়া গেছে ! আর সেই গলদের ছিদ্রপথে পৃথিবীর সমস্ত বিশ্বাস আর আনন্দ দিনে দিনে আজ নিঃশেষে ঝরিয়া গেছে ! আশ্চর্য্য,—বিধাতার এত বড় লজ্জা কি মানুষের মুখেও কালি মাখাইয়া দেয় নাই ?......

......দিল্লী হইতে আজমীরের পথে ট্রেণে বসিয়া এই সব আজগুবি স্বপ্ন ! সমস্ত রাত্রির এই ক্লান্ত বাষ্পীয়যানখানি সকাল বেলাকার রৌদ্রে আর ছুটিতে চায় না। ঢিমিয়ে চলে যেন ! সেও নিরুদ্দিষ্ট পথে চলে, আমিও সুমুখের সেই শস্য-শ্যামলতাবিহীন উষর প্রান্তরের অবাধ পথে আমার খামখেয়ালীকে ছাড়িয়া দিয়াছি ! যা, যতদূরে পারিস্ ছুটিয়া যা। আকাশে মাথা ঠুকিয়া আয়।

গাড়ীখানি নির্জ্জন। দু একজন যাহারা ছিল, নামিয়া গেছে,—অজ্ঞানতেই। পথের দেখা-শুনা, অপরিচিতের পরিচয়, মুহূর্ত্তেই শেষ! সমস্ত জীবনের চেষ্টায় আর কি দেখা হয়?

প্রান্তর ত নয়, শবদেহ : অসাড়—বৈচিত্র্যহীন!

শুষ্ক বিবর্ণ পাহাড়; যেন মৃতা ধরিত্রীর নীরস রুক্ষ স্তন!

……'গৃহহারা জীবন কি কোথাও ঘর বাঁধ্‌বে না? আলেয়ার মায়া কাট্‌ল যার—তার ঘরে কি কোথাও একখানি রত্নদীপ জ্বলেছে! ক্লান্তি আর বেদনা আর ক্ষিপ্ততার জীবনই শুধু?'

……বন্ধুর এমনি আরও অনেক প্রলাপ!

অথচ কেমন করিয়া জানি না, বাহিরের ওই তৃষাতুর বৈরাগী রিক্ততার দিকে চাহিয়া নিজেরই অজ্ঞাতে আজ কোন্ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করিয়াছে একটি কথা, —ঘর চাই!

যাহাকে চিনি না, বুঝি না, জানি না, —সে ত আর কেউ নয়, আমিই। বিধাতাকে জানি, মানুষগুলিকে বুঝি, নিজেকে ত কই চিনি না! কিন্তু এই চেনার গর্ব্বই ত করিয়া বেড়াই যেখানে সেখানে!

ঘর্ঘর করিয়া গাড়ীখানা ছুটিয়া চলে:

সেও যেন বলে, ঘর ঘর! ঘর তাহার নাই, পথ আছে। পথের কাঙাল পথের নেশায় ছুটিয়া বেড়ায়। পথ চলিয়া চলিয়াই সে জীর্ণ!

লুপ্তির পথে জীবনেরও এই অভিসার!

গৃহহারা ত নয়, গৃহহীন! গৃহ যার ছিল না কোনোদিন, গৃহ হারাইবে সে কেমন করিয়া?

আজ তাই এই জড়ের গতির মধ্যেও যখন শুনিতে পাই —'চল্ চল্ ঘরে চল্,'—চক্ষের জল আর রোধ করিতে পারি না। ঘর যাহার নাই, ঘরের এ মর্ম্মান্তিক প্রলোভন তার তরে কেন? ছোট এই বোঁচ্‌কাটি ভিন্ন আর যে তাহার কোনোই সম্বল নাই!

……ফুলেরা জংশনে একটুখানি থামিয়া গাড়ী আবার চলে।

*

আজমীর সহরের পর পাহাড়-পথ। মরুভূমির সীমানা।

টা টা রৌদ্র। তবে শীতকাল, —বাতাসটি বড় মিঠা।

কাঁধে ছোট বোঁচ্‌কা, হাতে লাঠি।

'আনারিয়া-কি-বাগিচা' আর গজরাজের গম্বুজ পিছনে পড়িয়া রহিল।

আরাবল্লীর ধূসর-পাহাড়ের রাস্তা,—চড়াই-উৎরাই।

দূরে গড়ানে রাস্তা দিয়া উটের দল যায়, একপাল ভেড়াও পিছনে পিছনে। লোহার খাঁচা-গাড়ী করিয়া হরিণ যায়; দেশ বিদেশ চালান যাইবে হয়ত!

মাড়োয়াড়ী রাজপুত মেয়েরা গান করিতে করিতে চলে। মাথায় কলসী, কাঁকালে কলসী,—শূন্য!

রাঙা ধূলা উড়িতে থাকে।

হাসিয়া হাসিয়া গান গাহিয়া এ-ওর গায়ে ঢলিয়া পড়ে। —যেন ফুল!

আবার পথ চলি

মানুষের সাড়া শব্দ ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসে।

'পাকদণ্ডি' পাহাড়ের পথ।—

পাথর-কাটা রাস্তা। অস্ত্রের দাগ আছে, লাল পাথরে রক্তের চিহ্নও মুছে নাই!

ঠন্ ঠন্ করিয়া টাঙা গাড়ীগুলা পাহাড়ী পথে ওঠে। সিপ্‌সিপে রোগা রোগা ঘোড়াগুলি যেন পক্ষীরাজ!

ক্রমে তাহারাও অদৃশ্য হইয়া যায়। সমস্ত পাহাড়ের মর্ম্মে মর্ম্মে তাহাদের পদধ্বনি বাজিতে থাকে।

সম্মুখে চারিদিকে কেবল ঘন নীল আকাশ, লাল ধূসর আব্‌ছা-সবুজ পাহাড় আর উদার উন্মুক্ত মাঠের পর মাঠ,—আর কিছু না।

উৎরাই পথে পায়ের তলাকার এই রাস্তা বহুদূরে গিয়া আকাশের শেষ সীমান্তে একেবারে দিগন্তরেখায় মিলাইয়া গেছে।

পা দুখানা অবসন্ন!

……ভাল লাগেনা, ভাল লাগে না; ক্লান্ত জীবনের এই অস্বাভাবিক বেদনা যেন কণ্ঠায় কণ্ঠায় চাপিয়া ধরে।

কিন্তু কার তরে এই অকারণ গ্লানি অন্তরের সমস্ত সুখ দুঃখকে ছাপাইয়া মত্ত অজিভীপের মত জীবনের বেলাভূমে আছ্‌ড়াইয়া পড়ে?

ঘরের অচ্ছেদ্য টান্‌কে দুই হাতে ছিঁড়িয়াছি কিন্তু তার মায়া ত কই কাটে নাই। ঘর পুড়িয়াছে, বুক পুড়িয়াছে কিন্তু এই মমতার ফাঁসী গলায় পরিয়া,—এই ধূলিধূসর পথে আর কতদূর!

পথের এই আকর্ষণ, কোথায় এর শেষ!

পথ পথ, শুধু পথ! জীবনের সমস্ত প্রয়োজন এই অন্তহীন পথেই নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে হইবে!

হৃদয়ের মধ্যে ডুব দিয়া যতদূর দেখি,—সেই পরিচিত নির্জ্জনতা! শুষ্ক চরভূমি তেমনি খাঁ খাঁ করে! জগতের কাছে মহত্ব দেখাইয়া সে তৃষ্ণা মিটে নাই!

বাসনার সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসী মরণার্ত্ত পিপাসায় ভিতরটাকে আবার লেহন করিতে থাকে, তার সেই লক্‌লকি রসনা দিয়াই।

লেহন করে মেরুদণ্ডের সমস্ত রসটুকু, যা কিছু সব!

পুষ্কর তীর্থ—।

চারিদিকে ধূ ধূ মরুভূমি আর পাহাড়; মাঝে ছোট্ট একখানি গাঁ।

পুষ্কর ঠাকুর নয়, পুকুর। সব্‌জে ঘোলাটে জল, গিজ্‌গিজে কুমীর,—মানুষ মারিবার জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে; বিধাতার মতই।

প্রকাণ্ড নির্জ্জন বাড়ীখানায়—একা। উপায় কি!

……হাঁপাইতে হাঁপাইতে বুড়া জল আনিয়া দেয়, খাবার কিনিয়া আনে। শশব্যস্তে এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া যুৎ করিয়া রাখে।

"নাম কি তোমার ?"

পাকা দাড়ি তুলিয়া বুড়া বলে, "শ্যামসুন্দর।"

যাইবার সময় সে বলিয়া গেল, "বিটিয়া আস্‌বে আজ, আমার বিটিয়া। বড় ভালো।"

হাসিলাম।—বুড়া যেন ছেলেমানুষ, এম্‌নি ভঙ্গী !

ওর বিটিয়াও যে বৃদ্ধা !

……ধীরে ধীরে বাতাস বয়।—শূন্য ঘরগুলির হা-হুতাশ !

সুমুখে বিস্তীর্ণ ধূসর মরুভূমির উপর দিনান্তের আলো রক্তবর্ণ !

জলের ধারে সিঁড়ির উপর গিয়া বসিলাম।

দূরে পাহাড়ের চূড়া তখন লালে-লাল।

স্তিমিত দৃষ্টির সুমুখে নিঃশব্দে একটি প্রজাপতি উড়িয়া বেড়ায়। কি যেন বলে ! গোপন কথাটি তার কানে কানেই হয়ত বলিয়া যাইতে চায়। কিন্তু আমার এই ক্লান্ত মন প্রজাপতিটির সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। পাগল মনকে যতই শাসন করিয়া বাঁধিয়া রাখি, সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া সে অবাধ্য ওই কীটের ডানাদুটির তলায় তলায় ঘুরিয়া মরে।

পরাগ একটুখানি মাখিয়া আসিতে চায় হয়ত ! হয়ত বা কোনো মায়াবী মিথ্যা স্বপ্নের কাজল চোখে পরে।

……হঠাৎ এই ম্লান অন্ধকারে আপনার নিঃসঙ্গ একাকীত্ব অনুভব করিয়া কেমন যেন অসহায় হইয়া উঠিলাম। নিজেকে বড় দীন, বড় দুর্ব্বল, বড় ভীরু বলিয়া মনে হইল।

আশপাশের নির্জ্জন ঘরগুলায় নিঃশব্দে তখন অন্ধকার জমাট বাঁধিতে থাকে।

কি একটা পাখী প্রকাণ্ড দুইটা ডানার শব্দ করিয়া জলের উপর দিয়া উড়িয়া গেল

আস্তে আস্তে ঘরে উঠিয়া আসিয়া আলো জ্বালিলাম। চারিদিকের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝখানে আলোটা অত্যন্ত বিশ্রী বীভৎস দেখায়।

…ঘুম আসে না। অপরিচিত অস্বাভাবিক শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসে

একাকী থাকা অভিশাপ !

গভীর রাত্রে যেন কোথায় বীভৎস চীৎকার !

মনে হয়, দূর কোথায় একটা কোনো ভয়াবহ অপরিচিত জানোয়ার ডাকে প্রকাণ্ড সেই পাহাড়টার চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত রাত্রি তাহার তীব্র সকরুণ আর্ত্তনাদ !

বুকের ভিতর ধক্‌ধক্‌ করে।

বাঘের গর্জ্জনের চেয়েও ভয়ঙ্কর ! যেন সৃষ্টিছাড়া কি একটা শব্দ-বিভীষিকা !

দলে দলে টিয়া-চন্দনার ঝাঁক্ উড়িয়া বেড়ায়।

পালে পালে ময়ূর, কুকুর বিড়ালের মতই। হাতের খাবার ছোঁ মারিয়া ছুটিয়া পলায়।

হরিণও দেখা যায়, এক আধটা ; পথভোলা !

ছোট গাঁয়ের ফাঁকে ফাঁকে মরুভূমি।

বুড়া বলে, "আমার বিটিয়ার আঁখ্ হরিণের মত ! আস্‌লে পরে দেখ্‌তে পাবেন।"

দুইদিনে দুশো বার তাহার 'বিটিয়ার' নাম !

……দোকানে দাঁড়াইয়া খাবার কিনিতেছিলাম।

অদূরে উটের দল মাল বোঝাই লইয়া যায়। মরুভূমির উপর দিয়া মাল আমদানী-রপ্তানী করিবার সময় গাঁয়ে গাঁয়ে আসিয়া তাহারা বিশ্রাম করে; খায়।

ধুপ্ করিয়া একটি মেয়ে লাফাইয়া পড়িল,—উটের পিঠ হইতেই। কোলে একটি ছোট্ট হরিণের বাচ্চা, একটা পোষা প্রকাণ্ড ময়ূরও।

"বসন্তিয়া!"

লোকগুলা হঠাৎ যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মেয়েটি যেন তাহাদের প্রাণশক্তি!

খাবার কিনিতে ভুলিয়া গেলাম।

মেয়েটির পরণে ইরাণী মেয়েদের মত গুজরাটি রেশমের একটি ঘাঘ্রা। সুগোল সুন্দর দুখানি নগ্ন হাত। কপালে একছড়া পলার মালা আঁটিয়া বাঁধা। মাথার শিথিল খোঁপায় একটি বড় ময়ূরের পালক গোঁজা!

লোক জমায়েৎ হইয়া গেল।—মেয়েটার ধরণই আলাদা।

হাসিতে হাসিতে হঠাৎ তাহাদের একজনের পিঠেই একটি চাপড়; আর একজনকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি: এবং অন্য একজনকে জোরে এক ধাক্কা!

মুখ থুব্ড়িয়া লোকটা পড়ে আর কি!

মেয়ে না ডাকাত!

তবু অপ্রতিভ নয়!—খিল্ খিল্ করিয়া আবার উচ্ছ্বসিত হাসি!

এবং সেই রাস্তার ধারেই হাসিয়া নাচিয়া দৌড়াইয়া, উপস্থিত জনকয়েককে আঁচ্ড়াইয়া কামড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

অদূরে মংরু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখে যেমন করিয়া মরীচিকার দিকে চায়।

বসন্তিয়ার খেয়ালই নাই। দৌড়াইয়া সে তখন একটা বাড়ীতে ঢুকিয়াছে।

"বাবু?"

"কি বল্ছ?"—বাহির হইয়া আসিলাম।

"এই দেখ বিটিয়া আমার, বসন্তিয়া!"

গর্ব্বে আনন্দে বুড়ার মুখখানি উজ্জ্বল।

মেয়েটার হাসি তখনও থামে নাই এবং হাসির ধমকে তাহার রেশ্মী ঘাঘ্রার ভিতর সর্ব্বাঙ্গ তরঙ্গিত হইয়া উঠেতেছিল।

উত্তর খুঁজিয়া পাই না।

মেয়েটা তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া আমার হাতটা তাহার দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "অনেকদিন পরে এলাম।"

"ও।"

"হরিণের বাচ্চাটা আমার দেখেছ? আর ময়ূর? অনেক ময়ূর আছে এখানে, চল দেখাই। না না, আসতেই হবে,—ছাড়্ব' না।"

ভাল বিপদ যাহ'ক!

"উট দেখেছ, উট ? ওটা আমারই।—ওই যে ওই রাস্তাটা, ওখান দিয়ে সাবিত্রী যাওয়া যায়। সাবিত্রীর পাহাড় দেখেছ ত ? ওই যে। ঠাকুর আছে ওখানে, ছোট্ট—এতটুকু। —ঘোড়ায় চড়্‌তে পারি, জানো ? টাট্টু ঘোড়া একটা আছে আমার।"

"তোমার নাম কি ?"

একটি পা তাহার নাচাইতে নাচাইতে চোখ পাকাইয়া মেয়েটা বলে, "নাম শোন নি এতক্ষণ ? বসন্তিয়া, বসন্তিয়া ! মংরু বলে, বসন্তি : ওর সঙ্গে কথা বলি না, ভারি দুষ্টু। আর বাসন্ত বলে, বসন্ত !—তুমি কি বলবে ? আচ্ছা, তুমি খুব ভাল লোক, না ? বল না, এই : চুপ করে আছ কেন ?"—হাতটা আমার মুস্‌ড়াইয়া ধরিল।

যাইবার সময় হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া বুড়া শ্যামসুন্দর বলিয়া গেল, "সকল মানুষ ওর আপনার। পর কেউ নাই।"

বলিলাম, "ছাড়ো, ছাড়ো, লাগ্‌ছে হাতে।"

"লাগ্‌ছে ? তোমাদের লাগে ?"

এইবার একটুখানি হাসিয়া বলিলাম, "আমাদেরই বেশী লাগে তোমাদের চেয়ে !"

"কই, আমাকে মারো দেখি গুম গুম্ করে, আমার ত লাগে না ? রুটি খাওনা বুঝি ?"

"না, আমরা ভাত খাই।"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসি ! ভাত যেন তাহার কাছে অপরিচিত !

"ধূলো খেতে পারো, ধূলো ? এই দেখ।"

হেঁট হইয়া তাড়াতাড়ি একমুঠি ধূলা কুড়াইয়া সে হঠাৎ মুখে পুরিয়া কচ্‌মচ্ করিয়া চিবাইতে লাগিল।

জানোয়ার না সর্ব্বভূক !

ঢোক্ গিলিয়া বলিলাম, "বা রে !—এমন দুষ্টু কেন তুমি ?"

ধূলার সহিত লাল্ মিশিয়া টপ্ টপ্ করিয়া তাহার বুকের উপর তখন ঝরিয়া পড়িতেছে।

তারপর নানাকথায়, ভঙ্গীতে, আব্‌দারে এবং চড়-চাপড় টিপুনিতে আমাকে একেবারে সে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।—কথার কোন মাথা মুণ্ড নাই।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনর্গল বকিয়া যায়। কপাল হইতে ঘামের ফোঁটা গালের উপর নামিয়া আসে। দৌড়-ঝাঁপ্ করিয়া সুন্দর মুখখানি তাহার রাঙা !

"যাও, ঘরে যাও। আবার আমি আস্‌ব'। গল্প কর্‌ব'।"

বলিতে বলিতেই অদৃশ্য !

মৃতদীপ ত জ্বলে না ঘরে !

আলেয়ার মায়া কাটিয়াছে কিন্তু আলো কই ?

দীপহীন এই নিরন্ধ্র অন্ধকার, এর বোঝা যে আর বহিতে পারি না !

অভিমান করিতে ইচ্ছা যায় ! কিন্তু কাহার উপর ? নিঃসঙ্গ এই মরুভূমির একান্তে বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে বসিয়া অভিমানের অশ্রুজল ! তাহার মূল্য দিবে কে ?

বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি, অগাধ নীলিমা মিশিয়াছে অনন্ত মরুভূমির সেই এক প্রান্তে।

বালুর পর বালুরাশি ধূ ধূ করে। সূর্য্যের আলো পড়িয়া চোখের সুমুখে ঝল্ ঝল্ করে। তাকাইলে চোখে যেন নেশা লাগে।

আকণ্ঠ পিপাসার অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাস উপর দিকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে। অনেক দূরে অপর্য্যাপ্ত বালি ছানিয়া নির্ব্বিকার উর্দ্ধমুখ উটের দল যায়। গলায় তাহাদের ঘণ্টা বাজে।

নিস্তব্ধ অলস রৌদ্র-বেলায় তাহাদের ঘণ্টার সেই আওয়াজ,—মনটা হা হা করিয়া ওঠে।

চোখ দুটা আপ্‌না হইতেই ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

···সংসারে যে ছন্নছাড়ার কেহ নাই, সে এমন করিয়া সকল দেশে, সকল ঘরে—ঘর খুঁজিয়া বেড়ায় কেন ? অসীম এই আকাশের তলায় ঘর একখানি তাহার কই ?

জীবনের ভার আর যেন বহিতে পারি না।

চোখে তখন জল ভরিয়া আসিয়াছে।

······পথের সাথী যারা —মধ্য পথেই ত তাহারা ফেলিয়া গেছে ; তবে আবার কেন দেহের এই কারাগারে জীবন এমন করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরে ?

······কদম কই, চারু কই,—বাব্‌লিই বা কোথায় ?

এই বুকের ভিতরেই তিনটি রক্তাক্ত পথ কাটিয়া তিনজনেই তাহারা চলিয়া গেছে। সেখানে আজও তাহাদের পদধ্বনি বাজে।

বাজুক—।

কিন্তু সেই রক্ত-রাঙা পথের উপর অবাধ্য হৃদয়টি আমার এমন করিয়া গড়াগড়ি দেয় কেন? ওরে ও পাগল ! তোর এই মর্ম্মভাঙা কান্না থামাইতে গিয়া আমিও যে আজ অকারণে কাঁদিয়া মরি !

"বাবু—টু—"

পিছন হইতে আসিয়া একেবারে পিঠে ধাক্কা :

ফিরিয়া চাহিলাম। কোঁক্‌ড়ানো তামাটে চুল তাহার কপালে ঘাড়ে পিঠে সাপের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

ভাল করিয়া তাহার মুখখানি দেখি। চোখ দুটি কালো নয়,—আব্‌ছা নীল ; সমুদ্রের তলাকার দামী মুক্তার মত। আর তাহাদেরই পল্লবের গোড়ায় সুর্ম্মা টানা।

হরিণীর মতই ; বুড়া মিথ্যা বলে নাই।

হঠাৎ চোখের কাছে একটি আঙ্গুল আনিয়া বসন্তিয়া বলিল, "দেবো ফুটিয়ে ? দেখ্‌ছ কি ?"

আর কোনো কথা না বলিয়াই কর্ কর্ করিয়া সে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

খানিকক্ষণ পরে আবার বাহির হইয়া আসিল।

"সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে এলাম, দেখ গে'।"

"সত্যি ? কিন্তু ভাঙ্গবার মতন ত কিছু নেই আমার ?"

হাসিতে হাসিতে উঠিয়া ঘরে আসিলাম।

ষোড়শ উপচারে খাবার সরঞ্জাম প্রস্তুত : জলের গেলাস, থালা, পান, স্নান করিবার বালতিতে জল, গামছা, ছোট একটি আয়না, চিরুণী,—কোনোটাই বাদ পড়ে নাই। ধব্‌ধবে একখানি কাপড়ও।

একপাশে পরিষ্কার বিছানা, ওয়াড় পরাণো একটি বালিশ ; একধারে তামাকের সরঞ্জাম।

আমার অনুপস্থিতিতেই এসব !

মেয়েটা তখনও হাসিতেছে।

"এসব কি তোমার, বসন্তিয়া ?"

"সব আমি একাই করেছি কিন্তু, সত্যি বলছি,—আর কেউ না।"

মুখটি তাহার গর্ব্বে ও আত্মপ্রসাদের আনন্দে উজ্জ্বল।

"কেন করলে ? এসব ত আমার কোনদিন দরকার হয় না !"

মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানি নিভিয়া গেল।

"ভাল লাগেনি বুঝি তোমার, বাবু ?"

ভাল লাগেনি !—অন্তরের সমস্ত রুদ্ধ কৃতজ্ঞতা কান্নার মতই যেন গলার কাছে ঠেলিয়া উঠিল। হায় মরুবালা ! নিঃস্বের উপর এত করুণা তোমার, কিন্তু দিবার মত যে আমার কিছুই নাই !

"না না তা কেন ! আচ্ছা দেখ……বলছিলাম কি…খাওয়া হয়েছে তোমার ?"

আবার তাহার মুখে আনন্দ ফোটে।

"না হয়নি। তোমার সঙ্গে বসে খাবো।" বলিয়াই আমার হাত ধরিয়া খাবারের থালার কাছে বসাইয়া দিল। "খাও।"

আগে নিজেই সে আরম্ভ করিয়া দিল।

……মুখখানি হাঁ করে আর দেখি, কোকিলের মত মুখটির ভিতর তাহার লাল, পাৎলা ঠোঁট দুখানিও তাই। গাল দুটি ডালিম !

চোখে তাহার আকাশ আর মরুভূমির স্বপ্ন।

খাইতে খাইতে বলে, "বাবু তুমি আমার বন্ধু !"

"হুঁ……দেখ… আচ্ছা, তুমি একলা আস' বসন্তিয়া, কেউ কিছু বলে না ?"

কথার উত্তর দেয় না। খায় আর মৃদু মৃদু হাসে।

"ঘাঘ্‌রা পর কেন, লজ্জা করে না ?"

"লজ্জা কি,—ধ্যেৎ ; লজ্জা আছে কিনা শুধু সেইটাই বুঝি তোমরা দেখো ?"

আপনার দিকে হেঁট হইয়া দেখে আর তেম্‌নি করিয়া হাসে।

খাওয়া হইলে আগেই সে উঠিয়া পড়িল। আমিও উঠিলাম।

জায়গাটা সে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করিল।

হাত মুখ ধুইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছি, পাশ ঘেঁসিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ এই অসভ্য মেয়েটি তাহার অপরিষ্কার এঁটো হাতখানি আমার মুখে বুলাইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইল।

"ওঠ ওঠ, বাবুমশাই ওঠ।"

হাতের ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বসন্তিয়া তখন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে।

সকাল বেলাকার খট্‌খটে রোদ চারিদিকে।

শ্যামসুন্দরও উপস্থিত : "সাবিত্রী যেতে হবে আজকে, বাবু।"

"ও.. ...তা সেখানে না-ই বা গেলাম, ঠাকুর?"

সহসা আমার একটা হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া বসন্তিয়া টানিয়া আনিল, "যেতেই হবে তোমায়, যেতেই হবে। নৈলে ....."

চোখ পাকাইয়া হাসি :

বুড়া বলে, "মেয়ে আমার এম্‌নিই ; যা ধরবে তাই করবে।"

বলিলাম, "ছেলে মানুষ কিনা, হয়েই থাকে অমন।"

বসন্তিয়া তখন গান ধরিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "তোমার আর গিয়ে কি হবে?"

ম্লান মুখে সে বলিল, "থাক্ তবে—যাব না।"

"সেই ভালো।"

বুড়া আর আমি।—

...পথ চলি আর মন খুঁৎ খুঁৎ করে।-

"দেখ—একটি কথা বলি......বুঝ্‌লে?"

বুড়া পিছন ফিরিয়া তাকায়। কথা সে কমই বলে।

একটা ঢোক গিলিয়া বলিলাম, "এতখানি পথ......বুঝ্‌লে? আগে জানতাম না। না এলেই ভাল হত।"

"হাঁ বাবু, অনেকটা রাস্তা বটে।"

পাকা গোঁফ দাড়ির ভিতর বুড়া যেন অতি কষ্টে হাসি চাপে।

মরুভূমির পথ।

উপরে নীল আকাশ আর সাদা মেঘ।

বালিতে পা ডুবিয়া যায় যেন ভারি হইয়া আসে। বুড়া কিন্তু তখন অনেকখানি আগাইয়া গেছে।

... হঠাৎ পিছন হইতে কে কাঁধের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া আমার চোখ দুইটা টিপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। কোমরে হাত বেড়িয়া সুমুখে টানিয়া বলিলাম, "দুষ্টু মেয়ে! তখন সঙ্গে এলে না কেন?"

দৌড়াইয়া আসিয়া বসন্তিয়া তখন হাঁপাইতেছে। গালে ঘামের দুইটি ধারা। নিরাবরণ দুখানি নিটোল হাতও বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজা।

হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "তুমি যে আসতে মানা করেছিলে?"

বুড়া তখন অনেক দূরে আগাইয়া গেছে।

পিঠ বেড়িয়া একখানি হাত আমার কাঁধের উপর রাখিয়া বসন্তিয়া চলিতে লাগিল।

বলিল, "আকাশ দেখেছ কত বড়? আর এই মরুভূমি?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা. এ দেশ তোমার ভাল লাগে না?"

"লাগে, খুব ভাল লাগে।"

ভাবিলাম, এই জনহীন দীর্ঘ মরুভূমির পথ আর যেন শেষ না হয়!

দূরে একটা খেয়ালী ঘূর্ণী বাতাসে চক্রাকারে বালিরাশি উড়িতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া বসন্তিয়া বলিল, "তাড়াতাড়ি চল; ঝড় উঠ্‌বে এখনই, নাকাল্ হতে হবে।"

আমিও তাহার কাঁধে একটি হাত তুলিয়া দিয়া বলিলাম, "সাবিত্রীর পাহাড় ত ওই এসে পড়্‌লো, বসন্তি?"

"দেখাচ্ছে তাই কিন্তু এখনও অনেক………কি হ'ল?"

"ইস্—কাঁটা ফুটে গেছে পায়ে।"—বসিয়া পড়িলাম।

"কই দেখি?"—সেও আমার কাছে বসিয়া পড়িল। এবং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার একটা পা তাহার কোলের উপর পরম যত্নে টানিয়া লইল।

বড় একটা কাঁটা যখন সে পায়ের তলা হইতে টানিয়া বাহির করিল তখন সে স্থানটা দিয়া গল্ গল্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে। আমার বাধা দিবার পূর্ব্বেই সে হেঁট্ হইয়া পায়ের উপর পড়িয়া ক্ষতস্থানটা একবার চুষিয়া লইল আর তেম্‌নি নিঃশব্দেই তাহার রেশ্‌মী ঘাঘ্‌রার একটি প্রান্ত তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া পায়ে বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

অধরে তাহার রক্তের দাগ!

হঠাৎ একটা ভুল করিয়া বসিলাম!

তাহার একটি হাত ধরিয়া বলিলাম, "বসন্তি—?"

"চল চল………ওঠো, দেরী ক'রনা আর।" বলিতে বলিতে আমাকে একরূপ টানিয়া লইয়াই সে চলিতে লাগিল

…প্রকাণ্ড পাহাড়ের চূড়ায় সাবিত্রীর মন্দির; নির্জ্জন মন্দির-মধ্যে এতটুকু একটি শ্বেত প্রতিমা; সালঙ্কারা। দামি পাথরের দুটি চোখ।

মন্দিরের আশে পাশে দুএকটি গাছ উঠিয়াছে। মানুষ দেখিয়া গাছ দুইটি হইতে দুই ঝাঁক বুলবুলি ও টিয়া উড়িয়া গেল।

চূড়ার কাছে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে নজর চলে না; মাথা ঘোরে।

সুমুখে বহুদূরে আকাশ গিয়া কোথায় মিশিয়াছে দেখা যায় না।

ধোঁয়ার মত নীলের একটা উচ্ছ্বাস অনেক দূরে নজরে পড়ে। মনে হয় এই তৃষাদগ্ধ মরুভূমির ঠিক প্রান্তে সমুদ্রের জল যেন টল্ টল্ করিতেছে।

হয়ত উহারই নাম মরীচিকা! হয়ত বা চোখেরই ভুল!

পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া কাঁধের উপর বসন্তিয়া তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে।

সন্ধ্যা বেলায় সিঁড়ির ধারে বসিয়া শ্যামসুন্দরের সহিত গল্প চলিতেছিল।

নানান্ দেশ……

নানান্ তীর্থের কথা—

সুমুখে পুষ্কর হ্রদের উপর তখন ঘনায়মান নিঃশব্দ অন্ধকার!

পিতার পিঠের কাছে শুইয়া শুইয়া বসন্তিয়া বোধ করি আকাশের তারা গোণে।

ভূমিকা করিয়া সে কথা বলে না। হঠাৎ বলিল, "ওঠ ওঠ বাবা, ওঠ, চল যাই।"

বুড়াকে সে টানিয়া তুলিল।

গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া বুড়া কন্যার হাত ধরিয়া অন্ধকারে চলিয়া গেল।

তন্দ্রা—

সহসা অন্ধকারে কোথায় কাহার গোঙানি কানে আসে। নির্জ্জন এই আঁধার রাত্রে অব্যবহৃত পোড়ো ঘরগুলি চক্ষের নিমেষে যেন প্রাণ পাইয়া বীভৎস আকৃতিতে জাগিয়া উঠিল।

ভূত প্রেত কোনোদিন বিশ্বাস করি নাই।

এ যেন সেই অবিশ্বাসের প্রতিশোধ!

গলার কাছটা তখন ধক্ ধক্ করিতেছে, হাত পা একেবারে হিম, অসাড়।

উঠিয়া আলো জ্বালি। গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান ভাঁজিতে চেষ্টা করি কিন্তু স্বর ফোটে না।

দরজাটা বন্ধ করিতে গিয়াই সবিস্ময়ে দেখি,—বসন্তিয়া

হি হি করিয়া সে তখন হাসিতেছে

"ভয় পেয়েছিলে খুব, না?"

আমার নিঃশ্বাস তখনও সরল হয় নাই। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "দূর! আমরা...বুঝলে? ভয় পাবার ছেলে নয়!...দেখ্বে যাবো...ওই অন্ধকার ঘরগুলোর মধ্যে?"

একটা হাত আমার ধরিয়া ফেলিয়া সে বলিল, "থাক্, বাহাদুর তুমি, বসো গিয়ে ওইখানে চুপ্টি ক'রে।"

একধারে গিয়া বসিলাম। দরজার গোড়ায় আলোর সুমুখে সেও আপনার ঘাঘ্রাটি সাম্লাইয়া বসিয়া পড়িল।

অন্ধকার এই নির্জ্জন রাত্রির একান্তে একাকী এই ষোড়শীর সহিত কথা বলিবার ভাষা মুখে আসে না; চুপ করিয়া থাকি।

বুক কাঁপে, হাত কাঁপে, পা কাঁপে; সর্ব্বাঙ্গ কেবল কাঁপিতে থাকে

একটুখানি পরে তেমনি মাথা হেঁট্ করিয়াই সে বলিল, "দেশে গিয়ে আমায় মনে করবে, বাবু?"

বলিলাম, "মনে ক'রে আমার কি লাভ? তুমি থাক্বে দূরে, আমিও থাক্বো দূরে। দিনে দিনে দুজনেই ভুলে যাবো, যেন আমরা কেউ কোনোদিন কাউকে দেখি নি।"

হঠাৎ যেন নিজেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম। এই বিয়োগান্ত নাটকের কি কোনো প্রতিবিধান নাই?

যবনিকার পর যবনিকা মানুষের এই যে ক্রন্দন-কল্লোল আকাশ ছাইয়া উঠিয়াছে, কতদূরে কাহার দ্বারে গিয়া এই কান্না পুঞ্জীভূত হইবে!

অভিভূতের মত কি যেন বলিতেছিলাম, বসন্তিয়া বলিল, "আমাকে তোমার দেশে নিয়ে যাবে বাবু?"

"দেশ ত আমার নেই, বসন্তি!"

কথাটা কোথায় গিয়া যেন তাহাকে ধাক্কা দিল। আচম্‌কা মুখ তুলিয়া বলিল, "ও।"

তাহার গম্ভীর মুখখানির দিকে তাকাইয়া বলিলাম, "আজ যে এত শান্ত ?"

কয়েক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর থাকিয়া বড় বড় সুর্মা-টানা চোখ দুটি আলোর দিকে তুলিয়া ধরিয়া সে কহিল, "মংরু মেরেছে আমাকে আজ।"

"মংরু ! কেন, মারে কেন ?"

নিরুত্তর।

বলিলাম, "তুমিও মারধোর করো না কেন ? সে অভ্যেস ত তোমার –"

"ওকে কি আমি মারতে পারি ?"

"তোমার বাপকে তবে বলে দিলে না কেন ?"

"মংরু মানা করে যে।"

"বা। সে কি রকম ?"

মার খাইয়া সত্যই তাহার কপালটা একটুখানি ফুলো।

মুখ নীচু করিয়া সে বলিল, "ওকে আমি কিছু বলতে পারি না।

"ওঃ.........আচ্ছা, কেন মারে ?"

"এখানে আসি, তাই।"

"তবে আবার এলে কেন ?"

মুখ তুলিয়া, সে কহিল, "যাবো চ'লে ?"

"না না তা বলিনি......শুধু বলছিলাম......শোনো,—যেও না।"

একগুঁয়ে মেয়েটা কথায় কান না দিয়া হন্ হন্ করিয়া অন্ধকারে চলিয়া গেল।

দরজার কাছে গিয়া চাপা গলায় অনেকবার ডাকিলাম, কিন্তু সে তখন অদৃশ্য !

......বুকের মধ্যে এতক্ষণ যেন একটা হিংস্র জন্তুর নিঃশ্বাস অনুভব করিতেছিলাম; সেই মাতাল জন্তুটা।

দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলাম।

গভীর রাত্রে আবার সেই জানোয়ারের ভয়ঙ্কর ডাক শুনিতে পাই।

তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টি খুলিয়া যায়।

......আবার বুজিয়া আসে।

অতি প্রত্যূষে দরজা খুলিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

"এখানে শুয়ে যে ? বাড়ী যাওনি কাল রাতে ?"

মাটিতে মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া বসন্তিয়া শুইয়াছিল। ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "উঁহুঁ—না।"

"অত করে ডাকলাম অন্ধকারে, শুনলে না কেন ?"

চোখ মুছিয়া ঘাঘ্‌রাটি সামলাইয়া সে উঠিয়া বসিল। বলিল, "আর ত কাজ ছিল না তোমার !"

বলিলাম, 'একলা এই অন্ধকারে .....আর শুলেই বা কেন এখানে ?"

"যে তোমার ভয় !"

রাত্রের রণ্টানিতে তাহার ঘাগ্‌রার সুমুখের বোতামগুলি খোলা। তাহার ফাঁকে নিটোল আরক্তিম দুটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত বুক অবাধ্যের মত বাহির হইয়া আসে।

টানিয়া টানিয়া বসন্তিয়া সে দুটিকে ঢাকা দিবার চেষ্টা করে।

লক্ষ্য করিলাম, চোখের জলে তাহার হাতটি ভিজিয়াছে, মাটি ভিজিয়াছে। নাকের কাছে অশ্রুর দাগ তখনও মিলায় নাই।

কিন্তু সে হাসিতে হাসিতেই উঠিয়া চলিয়া গেল ।

মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন পাগল হইয়া ওঠে। কাঁপিতে কাঁপিতে ভিতরে আসিয়া বসি।

নিজেকেই বার বার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা যায় !

অনাদৃত হতভাগ্য লোভাতুর আমার সেই বিকৃত ভগবান বুকের ভিতর কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে।

হয়ত কোথাও যায় নাই। পূজা-প্রার্থী লালসা-জর্জ্জর সে আত্মাটা তাহার মন্দিরের শেষ দীপটি নিভাইয়া দ্বার রোধ করিয়া অন্ধকারেই বুঝি পড়িয়া থাকে।

ইতর জন্তুর মত বোধ করি না দীর্ঘশ্বাসও ফেলে।

ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা যায়, খোল্ ওরে খোল্,—জীবনের ডাক আসিয়াছে; বদ্ধ কপাট তোর খুলিয়া দে। অনাহুতা পূজারিণী তার রক্তপদ্মটি তোর এই রুদ্ধ-দ্বারে উৎসর্গ করিতে আনিয়াছে !—ওরে ও অভিমানী, একবার চাহিয়া দেখ্।

কিন্তু কপাট সে খোলে না। বলে, না না। কুৎসিত অসুন্দর বিকারগ্রস্ত আমি, পূজারিণীর ও-পূজা নেবার মত পবিত্রতা আমার নাই। যাও, ফিরে যাও।

চোখে তাহার উত্তপ্ত অশ্রু অনুভব করি।

আমার সে নিপীড়িত দেবতা পৃথিবীর সমস্ত বিচ্ছেদ-কাতরতা, সমস্ত বেদনা মাথায় তুলিয়া লইয়া আপনাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে চায় !

মৃত জটায়ু পক্ষীর মত বাহিরের ওই উলঙ্গ সুবিস্তার মরুভূমি আকণ্ঠ পিপাসায় যে যুগান্তকাল হইতে শবের মত পড়িয়া আছে, উহারই সহিত ভিতরে যেন কোথায় কে আপনাকে একসুরে বাঁধিয়াছে।—তৃষ্ণা তাহার মিটে নাই,—মিটিবে না !

মিলনের ক্ষণিক রঙিন্ মুহূর্ত্তগুলি অপেক্ষা বিরহের বিবর্ণ দীর্ঘ অবকাশ তার কাছে প্রিয়তর !

ঘর তাহার নাই, প্রয়োজনও হয় না। শুধু কেবল বিচ্ছেদেরই অফুরন্ত পথ !

তার জন্য শুধু কেবল সীমাহীন আকাশ, অনন্ত মরুভূমি, দূর-বিস্তার জলধির ক্রন্দন উচ্ছ্বাস, পাণ্ডুর সন্ধ্যা,—আর কিছু না।

মিলন শুধু তার কাছে প্রলোভন মাত্র !

তবু হাসি পায়।

হাসি পায় নিজেরই কথা শুনিয়া। যাবার বেলায় আপনার কাছে এই অর্থহীন কৈফিয়ৎ কি না দিলেই চলিত না ?

সারা জীবনই আত্মবঞ্চনা করিয়া চলিলাম !

সাধু-বুলি এবং সাধু-যুক্তির স্তূপ আকাশ ছাপাইয়া উঠিল বটে !

তাই ত হাসি !—ঝুটা গল্পের মত এ কাহিনীর বেশ একটি স্পষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট পরিণতি হইয়া গেল ! চমৎকার !

নীতি ও যুক্তির কাছে মানুষ যখন আত্মবিক্রয় করে,—সেই ত তার মরণ !

তাহক্ ।—এ মরণে বেদনা আছে জানি কিন্তু আত্মবঞ্চনাময় রূপান্তরের মিথ্যা শান্তি নাই !

এ বিচ্ছেদ ; ইহাতে কাঁদিবার অবসর আছে কিন্তু হাসিবার ভাণ নাই ।

আবার পিঠে বোঁচ্কা আর হাতে লাঠি ।

পিছনে ফিরিবার প্রয়োজন নিঃশেষ !

বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর ইতিপূর্ব্বেই তীর্থের 'সুফল' করিয়া গেছে, সুতরাং ছল্ করিয়া দেরী করিবার আর উপায় নাই ।

শেষ অশ্রু বিন্দুটি বুকে করিয়া ঘরখানি খোলাই পড়িয়া রহিল । ওই অশ্রু কেন্দ্র করিয়া সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার তেমনি করিয়া আবার এ-ঘরে নিঃশব্দে জমাট্ বাঁধিবে, বাতাসও হা-হুতাশ করিয়া যাইবে !—যাক্ ।

বেলা বাড়িতেছিল ।

অবসাদখিন্ন দেহকে আবার পথে নামাইলাম ।

সুমুখে আঁকা-বাঁকা পথটি বহুদূরে আরাবল্লী পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গেছে

আবার সেই বৈরাগী পথ !

ছুটিতে ছুটিতে বসন্তিয়া পিছন দিক হইতে আসিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল ।

বিদায়ের পালা এবার জমিল ভাল !

কিন্তু এ পাগ্লিকে লইয়া কি করি !

"দুষ্টু, আসবার সময় ডাকোনি ত !"

"না !"

হাসিতে হাসিতেই সে বলিল, "চল্লে ?"

ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম ।

সে বলিল, "ভাব্‌চো তুমি চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে ? একটুও না ।"

হাসিলাম । হায় নারী, এ কি দীনতা তোমার ? যাবার বেলায় নির্লজ্জের মত এমন করিয়া আত্মপ্রকাশ নাই বা করিতে !

তোমার মধ্যে যে আত্মাকে দেখিয়াছি তাহাকে এমন করিয়া অপমান করিবার অধিকার কি তোমারই আছে ?

চলিয়া যাইতেছিলাম । সে আবার ডাকিল, "বাবু মশাই !

নিজের ভিতর নিজেই যেন তিক্ত হইয়া উঠিলাম । ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চোখ পাকাইয়া বলিলাম, "যা—ও । চলে যাও ।"

পিছন হইতে আসিয়া আমার একটি হাত সে কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। বড় বড় নিঃশ্বাস চাপিতে গিয়া তাহার কোমল দুখানি বুক যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।

" একটি জিনিষ নেবে বাবু? এনেছি তোমার জন্যে। "

ঘাগ্‌রার সুমুখের দুতিনটি বোতাম তাড়াতাড়ি খুলিয়া তাহার মধ্যে হাত গলাইয়া ময়ূরের একটি পালক বাহির করিয়া আমার হাতে সে গুঁজিয়া দিল।

"আমায় এবার একটা কিছু দাও?—দেবে না?"

"তোমাকে——"

কিন্তু দিবার মত আমার কিছুই ছিল না। বোঁচ্‌কার ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি একটি টাকা বাহির করিয়া দিলাম।

ছুঁড়িয়া টাকাটি সে দূরে কোথায় ফেলিয়া দিল, "যাও, কিছু চাই না তোমার কাছে—যাও "। গলা তাহার বুজিয়া আসিল।

আঘাত দেওয়ায় বেশ একটু আনন্দ আছে!

বলিলাম, "কিন্তু আমার কি আছে, বসন্তি?"

"আছে একটি বল দেবে?"

"দেবো।"

বোঁচ্‌কাটি আমার টানিয়া লইয়া সে নিজেই খুলিয়া ফেলিল, এটা-ওটা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "ঠিক দেবে ত?"

বলিলাম, "ইচ্ছে হয় যদি, বোঁচ্‌কাটাই নিয়ে যেতে পারো।"

বাহির করিল—একটি দোয়াত আর কলম!

"এই, এতক্ষণ বলতে হয়!" একটু হাসিয়া পুনরায় কহিলাম, "আঁচড় কাটবে নাকি আমার নামে; না - চিঠি লিখ্‌বে?"

সে কিছুই বলিল না। চোখে তাহার জল!

দোয়াতে লাল কালি: কলমটিও লাল।

কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, "যাই এবার?"

সে ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু গেলাম না। মুখোমুখি আজ এই পরিপূর্ণা নারীটির কাছে দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া একবার দেখিলাম।

……মনে হইল, সব এক! হউক্ ইহাদের ভিন্ন দেহ, ভিন্ন রূপ, ভিন্ন হৃদয়,—তবু ইহারা একই!

একই চোখের জলে ইহারা সব একাকার!

কিন্তু… না। ও শুধু নারীজনোচিত মমতার আত্মপ্রকাশ, অজানা অপরিচিতের প্রতি অনুগ্রহ মাত্র!

সন্দিগ্ধ অন্তর আমার মাথা চাড়া দিয়া ওঠে।

* * *

অনেকদূর গিয়া একবার ফিরিয়া দেখি, বসন্তিয়া তখনও চলিতেছে।

সে উদ্দাম চপলতা যেন তাহার আর নাই। অবসন্ন শ্রান্ত পা দুখানি তাহার আর যেন চলে না!

পাহাড়ের উৎরাই পথে ধীরে ধীরে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

আপন কথা

এ-আমোল সে-আমোল)

ঠিক কত বয়সে তা মনে নেই কিন্তু এবারে একটা চাকর পেলেম আমি। চাকরের আসল নামটা শ্রীরামলাল কুণ্ডু, নিবাস বর্দ্ধমান বীরভুঁই। সে কিন্তু বল্‌তো তার নাম শ্রী আম্‌লাল্ কুণ্ডু। ছেলেবেলা থেকে রামলাল্ ছিল আমাদের ছোটকর্ত্তার কাছে। ঘুমের আগে খানিক পায়ে সুড়সুড়ি না দিলে ছোটকর্ত্তার ঘুমই আসতো না, সেই মস্ত ভার পেয়েছিল রামলাল্। কিন্তু কাজে টিঁকতে পারলে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা একেবারে সুনিয়মে বাঁধাচালে চলতো ছোটকর্ত্তার কাজকর্ম্ম সমস্তই, নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হলে ছোটকর্ত্তার মেজাজ খারাপ, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা,—এমনি নানা উৎপাৎ আরম্ভ হতো। চাকরদের এইসব বুঝে চল্‌তে হ'তো, না হলেই তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত! এই সব নিয়মের গোটা কতক বলি, তাহলে হয়তো বোঝা যাবে কেন রামলাল ছোটকর্ত্তার পদসেবা ছেড়ে ছোটবাবু আমার কাছে পালিয়ে এল; শুনেছি—সেকালের বড় বড় পাথরের গোল টেবেলের বাঁকা পায়াগুলো সইতে পারতেন না ছোটকর্ত্তা, এক চাকরকে প্রত্যহ তোয়ালিয়া দিয়ে টেবেলের পায়া তিনটেকে ঘোমটা পরিয়ে রাখতে হতো, এবং সর্ব্বদা নজর রাখতে হতো তোয়ালিয়া বাতাসে সরে পড়লো কিনা। হুঁকোবরদার তার কাযই ছিল যে—প্রথমটানেই সট্‌কা থেকে ধোঁয়া পান যেন কর্ত্তা, একবারের বেশি দুবার না টান দিতে হয়। দেওয়ালে বাঁকা ছবি থাক্‌লে মুস্কিল। ছেলেবেলা থেকে ছোটকর্ত্তার পা না টিপ্‌লে ঘুম আসতোই না, সে জন্যে ছিল বিশেষ চাকর যার হাত পরীক্ষা করে ভর্ত্তি করা হতো কাজে—কড়া হাত না হয়। ঘুমের আগে গল্প-শোনা, সকালে খবর শোনানো—এমনি নানা কাজে নানা লোক ছিল। সব চেয়ে শক্ত কাজ তার—যাকে বারোমাসেই ছোটকর্ত্তার আচমনের জল দিতে হতো, কর্ত্তার অভ্যাস—ছেলেবেলা থেকেই—এক আঁজলা জল চাকরের গায়ে ছিটোতে হবে! তোপ পড়ার সঙ্গে ছোটকর্ত্তা একটা হাঁচ্‌বেনই, যেদিন হাঁচি এলো না সেদিন ডাক্তারের ডাক পড়লো। ছোটকর্ত্তার এই সব অকাট্য নিয়মের কোন্‌টা ভঙ্গ করে যে রামলাল্ বরখাস্ত হয়েছিল তা সেও বলেনি আমিও জানিনে। রামলাল্ যখন এল আমার কাছে তখন সে ছোক্‌রা আর আমি কত বড় মনেই পড়েনা, শুধ্ এইটুকু মনে আছে—আমি ধরা আছি তখনো আমাদের তিনতলার মাঝের হলটাতে। আশপাশের ঘর গুলো থেকে পাঁচ সাতটা ধাপ উঁচুতে এই হলটা—মস্ত ছাত, বারোটা পল্‌তোলা মোটা মোটা থামের উপর ধরা, থামের মাঝে মাঝে লোহার রেলিং; কড়ি বরগা থাম জানলা দরজার বাহুল্য নিয়ে মস্ত ঘরটা যেন একটা অরণ্য বলে মনে হতো। সেকালের বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন ঝোলাবার হুক আর কড়া,

সেগুলোকে দেখে মনে হতো যেন সব টিকটিকি আর বাদুড় ঝুলে আছে মাথার উপরে—দিনের পর দিন এক ভাবেই আছে তারা! এই অনেক থাম অনেক কড়ি বরগা প্রাচীর আর লোহার রেলিং ঘেরা স্থানটা, এর মধ্যে মস্ত খাঁচায় ধরা ছোট্ট জীব—খাই দাই আর ঘুমোই! এই খাঁচার বাইরে কি ঘটে চলেছে কি বা আছে কিছুই জানার উপায় নেই! এক একবার চারিদিকের জান্‌লা কটা খুলে যায়—আলো আসে, বাতাস আসে আবার ঝুপ্ ঝাপ্ বন্ধ হয় জানলা, এই করেই জানি সকাল হল, দুপুর এল, বিকাল হল, রাত হল! সম্পূর্ণ ছাড়া পাইনি তখনো আকাশের তলায়, চলতে ফিরতেও পারিনে ইচ্ছামতো, বাড়ির অন্য অংশ গুলো থেকেও আলাদা করে ধরা আছি। দাসী দু একটা কখন কখন বসে এসে ঘরটায়, তাদের দেশের কথা বলাবলি করে, মনিবদের গালাগালিও দেয় চুপিচুপি। একটা কালো বেড়াল, রোজই সন্ধ্যায় দেখা দেয়—কি খুঁজতে সে আসে কে জানে—এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়! খাট পালং গুলো নড়েনা চড়েনা, দিনের বেলায় বালিশ আর তোষকের পাহাড় সাজিয়ে বসে থাকে, আর সন্ধ্যা হলে মশার ভন্‌ভনানির মধ্যে ধুনোর ধোঁয়াতে মশারীর ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ্‌চাপ্। কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব জাগায় আমার মনে এই ঘরটা, বৈচিত্র নেই বল্লেই হয় ঘরটার মধ্যে, কল্পনা করবারও কিছু নেই এখানটায়! এই অবিচিত্র ফাঁকার মধ্যে রামলাল্ যখন আমাকে তার বাবু বলে স্বীকার করে নিলে তখন ভারি একটা আশ্বাস পেলেম, মনে আহ্লাদও হল—এতদিনে নিজস্ব কিছু পেলেম আমি! রামলাল্ আসার পর থেকেই—বাড়ির আদবকায়দাতে দোরস্ত হয়ে ওঠার পালা সুরু হল আমার। একজন যে ছোটকর্ত্তা আছেন, তাঁর যে একটা মস্ত বাড়ি আছে অনেক মহলা, সেখানে যে পূজায় যাত্রা বসে মথুর কুণ্ডুর—এসব জানলেম! এমনি না-দেখা বাড়ি না-দেখা মানুষদের দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হয়ে গেল বাইরেটাতে আর আমাতে! এই সময়টাতেই আরব্য উপন্যাসের একটুকরোর মতো এই তিনতলার ঘরটার আগের কথা এবং আগের ছবিটাও পেয়ে গেলেম কার কাছ থেকে তা মনে নেই। এই বাড়িটাকে সবাই ডাকে তখন 'বকুলতলার বাড়ি' বলে; শুনেছি বাড়ি ছিল আগে একতলা বৈঠকখানা, এর দক্ষিণের বাগানে ছিল মস্ত একটা বকুল গাছ—পাঁচপুরুষ আগে, সেই গাছের নামে বাড়িখানা 'বকুলতলার বাড়ি' বলে চলছে,—আমি যখন এসেছি তখনও! এমনি ছেলেবেলার চোখে দেখছি যে মস্ত হলটাকে একবারেই ফাঁক, শোনাকথার মধ্যে দিয়ে কল্পনাতে সেই বাল্যকালেই দেখতে পাই হল্‌ঘরটাকে সুসজ্জিত, যখন লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন কর্ত্তার কাছে দিনরাত তখনকার আমলে!

সেই কালের এই হল্ - হল্ বল্লে ঠিক ভাবটা বোঝায় না,—চণ্ডীমণ্ডপ তো নয়ই,—বারোদোয়ারী কতকটা আভাস্ দেয়,—কিন্তু ঠিক বুঝি যদি ভেবে নিই—একটা মস্ত জাহাজের ডেক্, তিনতলার উপরে, জল থেকে তুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে! প্রমাণের অতিরিক্ত মোটা মোটা লম্বা লম্বা কড়ি থাম জানলা দরজা এবং আলো, হাওয়া আসবার জন্য আবশ্যকের চেয়ে বেশি পরিমাণ ফাঁক দিয়ে প্রস্তুত আমাদের এই তিনতলার মাঝের ঘরটা! বাইরেটাকে একটুও না ঠেকিয়ে অথচ বাইরের উৎপাত—রোদ বৃষ্টি লোকের দৃষ্টি ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ আগ্‌লে অদ্ভুত কৌশলে প্রস্তুত করে গেছে ঘরখানা কোন্ এক সাহেব মিস্ত্রী সেই নেপোলিয়ানের আমলের অনেক আগে! এই সাহেবকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—পরচুল পরা, বেণী বাঁধা, কাঁসার মতো মস্ত গোল টুপিটা মাথায়, গায়ে খয়েরী রংএর সাটিনের কোট্, পায়ে বার্ণিস্ জুতো—বক্‌লস্ দেওয়া, সট্ প্যেন্ট্, হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত মোজায় ঢাকা, গলায় একটা সিল্কের রুমাল্ ফুলের মতো ফাঁপিয়ে বাঁধা।

সাহেব এসে উপস্থিত আমাদের কর্ত্তার কাছে পাল্কি চড়ে ! কর্ত্তা সট্‌কায় তখন তামাক খাচ্ছেন হাউসে যাবার পূর্ব্বে, সাহেব মস্ত গোল পাথরের টেবেলে মস্ত একখানা বাড়ির নক্সা মেলিয়ে ধরছে, আর একটা পালকের কলমের উল্টো দিক্ নক্সার উপরে টেনে টেনে কর্ত্তা সাহেবকে বোঝাচ্ছেন এদেশের নাচ্ ঘর, বৈঠকখানা, প্রভৃতির সঠিক্ হিসেব—কর্ত্তা বসে, সাহেব দাঁড়িয়ে, এখন হলে এটা মস্ত বেয়াদবী ঠেকতো, কিন্তু তখন এইটেই ছিল চাল্ এবং চল্, সাহেব ইঞ্জিনিয়ার তখন লিখতো নিজের নাম ইংরিজিতে কিন্তু নিজের পেশাটা লেখা থাকতো সুন্দর বাংলায়—যেমন 'Mr. George Edwards Ives' উপরে, নীচে লেখা 'গৃহনির্ম্মাণ কর্ত্তা' ! কর্ত্তা ছিলেন ক্রোরপতি ব্যবসায়ী সওদাগর এবং ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মান মর্য্যাদার ইয়ত্তা ছিলনা কর্ত্তার, সুতরাং তাঁর খাস মজলিসের স্থানটা কেমনতরো হওয়া উচিত তা যেন সাহেব মিস্ত্রি বুঝে নিয়েই করেছিল সূত্রপাত এই তিন তলার ঘরটার—আলো বাতাস জাহাজ ঘর সমস্তকে একটা চমৎকার মতলবের মধ্যে সে ঘিরে নিয়ে বানিয়ে গেছে ! এই হল্—ঐশ্বর্য্যের, গৌরবের জোয়ারের চিহ্ন ধরে ধরে একতলা থেকে যখন উঠলো ক্রমে আশি ফুট উপরে তখন পৃথিবীতে আমি নাই, কিন্তু শোনা কথার মধ্যে দিয়ে তখনকার ব্যাপার যেন স্পষ্ট দেখতে পাই !—কর্ত্তার খাস মজলিস্ বসেছে রাতের বেলা, আমার থেকে চারপুরুষ পূর্ব্বে এই হলটাতে—দক্ষিণের চল্লিশ ফুট ফালি ঘরে পাড়ছে সাহেবসুবার জন্তে রাত্রিভোজের টেবেল্ অনেকগুলো টেবেলের উপরে চীনের বাসন্ থরে থরে সাজানো, সব বাসনেই সোনার হল করা রঙীণ ফুলের নক্সা, প্রত্যেক বাসনে কর্ত্তার নামের তিনটে অক্ষরের সোনালী ছাপ মারা, ঝক্‌ঝক্ করছে রূপার সামাদানে মোমবাতি, খানসামা সবাই জরী দেওয়া লাল বনাতের উর্দ্দি পরা, কোমরে একখানা করে রুমাল্, উত্তরের দিকে একটা বারাণ্ডা—সেখানে আহারের পর আরামে বসে তামাক খাবার ব্যবস্থা রয়েছে—সেখানটাতে হুক্কাবরদার বড় বড় সোনা রূপোর সট্‌কাতে তামাক সেজে প্রস্তুত, বড় সিঁড়ির উপরে চোব্‌দার খাড়া, আসাসোটা হাতে স্থির যেন পুতুল ! মানুষপ্রমাণ উচুঁতে থাম আর রেলিং ঘেরা বড় হল্ লোকলস্কর থেকে পৃথককরা উঁচু জায়গাটা ঝাড়ে লণ্ঠনে বাতির আলোয় জম্‌জমাট, ঘরজোড়া প্রকাণ্ড একখানা গালিচা—ঘন লাল আর সাদা ফুলের কারিগরি তাতে ; ঘরের পূব-পশ্চিম দুটো বড় দেওয়ালে দুখানা বড় বড় অয়েল পেণ্টিং—সাহেব ওস্তাদের আঁকা—বরবেশে এক ছেলে আর পেশওয়াজ পরা একটি মেয়ে—দুজনেই হীরে মাণিক আর কিংখাবে মোড়া, এই এখন যেমন খোট্টাদের বরসাজ্, তেমনি ধরণের সাজসজ্জা দুজনেরই ; গালিচার উপরে মেহগ্নি কাঠের বাঘ-থাবা বাঘ-মুখো অদ্ভুত গঠনের কৌচ কেদারা তেপায়া একটার মতো অন্যটা নয় ! আরামে বসার জন্যেই তৈরি এই সব কৌচ কেদারায় সেই সেকালের লাট বেলাট সাহেব সওদাগর ও চৌরঙ্গীর বাসিন্দা তারা বড় বড় সট্‌কায় তামাক টানছে, আর তয়ফার নাচ দেখছে—গম্ভীর হয়ে বসে ! সব সাহেবই পাউডার মাখানো পরচুলধারী, হাতে রুমাল্ আর নস্তদানি ; ফুলসারি উর্দ্দিপরা ছোকরা ক্রমান্বয়ে বড় বড় পাখার বাতাস দিচ্ছে তাদের, আর মজলিসে সোনারূপার তবক মোড়া পান বিলি করে চলেছে, আতরদানি গোলাপ পাশ ফিরিয়ে চলেছে হরকরা তারা ; পাশের একটা খাসকামরা—উত্তর দক্ষিণ ও পূব তিন দিক খোলা—সেখানে কর্ত্তার সঙ্গে মুরুব্বি সাহেব দুচার জন বসে—সারি সারি খোলা জানালায় দেখা যায় রাতের আকাশ—যেন কারচোপের বুটি দেওয়া নীল পর্দ্দা অনেকগুলো,—পূবের কটা জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় -খালপারের নারকেল গাছের সারি, তার উপরে চাঁদ উঠছে—যেন কাণাভাঙ্গা সোনার একটা আব্‌খোরার টুকরো, পশ্চিমের খোলা জানালায় দেখা

যাচ্ছে সেকালের সওদাগরি জাহাজের মাস্তুলগুলো, ঘেঁসাঘেঁসি ভিড় করে দাঁড়িয়ে,—উত্তরে সেকালের সহর ও বাড়ির অরণ্য একটা !

যে তিন তলার উপর পশ্চিম থেকে বয় গঙ্গার হাওয়া, পুব দিয়ে আসে বাদলের ঠাণ্ডা বাতাস, উত্তর জানলায় শীতের খবর আসে, দক্ষিণ বাতায়নে বহে বহে বয় সমুদ্রের হাওয়া, সেখানটাতে একটা রাত নয়—আরব্য উপন্যাসের অনেকগুলো রাতের মজলিসের আলো, সারি সারি খোলা জানলা হয়ে, বাইরে রাতের গায়ে ফেলতো, একটার পর একটা সোণালী আভার সোজা টান্ ; আর সমস্ত তিনতলাটা দেখাতো যেন মস্ত একটা নৌকা অনেকগুলো সোনার দাঁড় কালো জলে ফেলে প্রতীক্ষা করছে বন্দর ছেড়ে বার হবার হুকুম ও ঘণ্টা—এ যারা তখন আশপাশের বাড়ির ছাতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কর্ত্তার মজলিসের কাণ্ডখানা সত্যি দেখেছে তাদের মুখে শোনা কথা।

আমি যখন এসেছি—তখন স্বপ্নের আমোল আরব্য উপন্যাসের যুগ বাংলা দেশ থেকেই কেটে গেছে,—বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তখন আরম্ভ, 'গুল্‌বকাওলী' 'ইন্দ্রসভা', হোমার, এসব বইগুলো পর্য্যন্ত সরে পড়বার জোগাড় করেছে—এই সময় রামলাল্ চাকরের সঙ্গে বসে দেখি, দুই দেয়ালে দুই সেই সেকালের ছবির দিকে—বড় বড় চোখ নিয়ে ছবির মানুষ দুটি চেয়ে আছে, মুখে দুজনেরই কেমন একটা উদাস ভাব, ছবির গায়ে আঁকা—হীরে মুক্তোর জড়াও সাজসজ্জা যেন কতকালের কত দূরের বাতির আলোতে একটু একটু ঝিক ঝিক করছে ; আমি অবাক হয়ে এখনো এই ছবি দেখি আর ভাবি কি সুন্দর দেখ্‌তেই ছিল তখনকার ছেলেরা মেয়েরা ; কি চমৎকার কত গহনায় সাজতে ভালবাসতো তারা !

কল্পনা নিয়ে থাকার সুবিধে ছিল না তখন, কেননা রামলাল্ এসে গেছে এবং আমাকে পিটিয়ে গড়বার ভার নিয়ে বসেছে ; বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেরে ধরে, এবাড়ির আদবকায়দা দোরস্ত একজন কেউ করে তুলবেই আমাকে, এই ছিল রামলালের পণ ! ছোটকর্ত্তা ছিলেন রামলালের সামনে মস্ত আদর্শ, কাযেই একালের মত না করে, অনেকটা সেকেলে ছাঁচে ফেলে সে আমাকে—দ্বিতীয় এক ছোট কর্ত্তা করে তোলার মৎলবে ! ছোটকর্ত্তা ছুরি কাঁটাতে খেতেন, কাযেই আমাকেও রামলাল্ মাছের কাঁটাতে ভাতের মণ্ড গেঁথে খাইয়ে সাহেবী দস্তুরে পাকা করতে চল্লো ; জাহাজে করে বিলেত যাওয়া দরকার হতেও পারে, সেজন্যে সাধ্য মতো রামলাল্ ইংরিজির তালিম দিতে লাগলো—ইয়েস্ নো বেরি-ওয়েল্, টেক্ না টেক্ ইত্যাদি নানা মজার কথা ; কোথা থেকে নিজেই সে একখানা বাঁশ ছুলে কাগজে কাপড়ে মস্ত একটা জাহাজ বানিয়ে দিলে আমাকে—সেটা হাওয়া পেলে পাল ভরে আপনি দৌড়োয় মাটির উপর দিয়ে ! এই জাহাজ দিয়ে, আর হাঁসের ডিমের কালিয়া দিয়ে ভুলিয়ে—খানিক বিলিতি শিক্ষা, সওদাগরি ব্যবসা, কারিগরি, রান্না, জাহাজ গড়া, নৌকার হৈ বাঁধা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে পাকা করে তুলতে থাকলো আমাকে রামলাল্ ! তিনতলার ঘরটা, সেখানে বড় কেউ একটা আসতোনা কাছে, থাকতো রামলাল্ তার শিক্ষাতন্ত্র নিয়ে আর আমি তারি কাছে কখন বসে কখন শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ; সেকালের ঝাড় ঝোলানোর মস্ত হুকগুলো সারি সারি হেঁটমুণ্ড কিম্বাচক চিহ্ন—¿ ¿ ¿—চেয়ে দেখতো রামলালকে আমাকে মেঝের উপরে সেই ঘরে সেখান থেকে—ঝাড় লণ্ঠন কার্পেট কেদারার আবরু অনেক কাল হল সরে গেছে !

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আষাঢ়ে

রিফর্ম্মের আতঙ্ক—রিফর্ম্ম শব্দটা এখন প্রায় বাঙ্গলায় দাঁড়াইয়াছে। আগামী ১৯৩০ অব্দ হইতে যে শাসন-বিধি প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে এদেশের লোককে কতখানি "অধিকতর" অধিকার দেওয়া হইবে তাহার বিচারের সূচনা হইয়াছে, কিন্তু এখনও কমিশন বসিতে বিলম্ব আছে। আমরা বহুবার এই সোজা কথাটা বলিয়াছি যে যদি নিক্তির ওজনে আমাদিগকে অধিকার দেওয়ার নামে অনেকখানি কিছুও দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহার অর্থ হইবে যে আমরা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত যাহা প্রত্যেক মানুষই তাহার মনুষ্যত্বলাভের জন্য পূর্ণ অধিকারী ও যাহা পাইবার পথে অতি অনুন্নত বর্ব্বরও বাধা পাইতে পারে না। যে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে সে তাহার সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে বিধাতার দেওয়া অধিকার পাইবেই পাইবে,—প্রতি লোকের স্বাধীন উন্নতির পথ অবাধ ও মুক্ত হওয়াই চাই। শিক্ষার অভাবে ও কর্ম্মক্ষমতার অভাবে যদি কেহ কোন দাবি হাসিল করিতে না পারে তবে তাহার জন্য সেই লোকের ব্যক্তিনিষ্ঠ শিক্ষাই দায়ী, কিন্তু তাহার উন্নত হইবার পক্ষে অপরের ক্ষমতার ইচ্ছার পাষাণ চাপা থাকিতে পারে না। কাজেই "অধিক কিছু" পাইবার জন্য হাত বাড়াইলে আপনাকে নিগৃহীত ও অপমানিত করিতে হয়,—স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে মানুষ মাত্রের উন্নতির জন্য যাহা পাওয়া মানুষের ন্যায্য অধিকার, আমরা সেই অধিকার চাই না।

• ঐ আসল কথাটার দিকে যাহাতে আমাদের দৃষ্টি না পড়ে আর আমরা যাহাতে একটা কোলাহলের মধ্যে আরও কিছু চাই বলিয়া দাবি করি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকি, ইহার জন্য অনেক দিন হইতে একটা কল ফাঁদা আছে। সর্ব্বপ্রথমেই যখন শাসনের নূতন বিধি বা রিফর্ম্ম প্রচলিত করা হয়, তখন কতকগুলি সিবিল সর্বিসের ইংরেজ কর্ম্মচারী আপনাদের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া নিয়া এই অজুহাতে চাকুরি ছাড়িয়া ছিলেন যে এ দেশের লোককে "অতখানি" অধিকার দিলে তাঁহাদের ক্ষমতা ছোট হইয়া যায়! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ উহাতে মনে করিয়া ছিলেন যে তবে বুঝি তাঁহারা নিশ্চয়ই বড় একটা কিছু পাইয়াছেন। আমরা যাহা পাই তাহাই গুছাইয়া নিয়া কোন রকমে, আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় ঘরকন্না করিতেই হইবে; সে স্বতন্ত্র আলাদা কথা, কারণ যাহা পাই তাহার বাড়া কিছু পাইবার যোগাড় করিতে আমরা অক্ষম। কিন্তু অধিকার পাইতেছি বলিয়া উৎফুল্ল হইবার কিছু নাই।

এবারও রিফর্ম্মের উদ্যোগ আসন্ন হইবার গোড়ায় সিবিল সর্বিসের ইংরেজেরা সুর তুলিতেছেন ও সুর তুলিবার জন্য উৎসাহ পাইতেছেন যে নূতন রিফর্ম্মে এদেশের লোককে অধিকতর অধিকার দিলে তাঁহারা চাকুরিতে ইস্তাফা দিবেন। এ কেবল ছল ও ফাঁকি; রিফর্ম্মের দিকে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবার একটা ফন্দি। বারে বারে যাহা বলিয়াছি এবারেও তাহাই বলিব; রাষ্ট্রনীতির এই অসার ফাঁকা আওয়াজে ভুলিয়া দেশের প্রতি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য আছে,—লোকসাধারণকে শিক্ষিত ও সুস্থ করিবার দিকে যে কর্ত্তব্য আছে তাহাই পালন করিবার জন্য আমাদিগকে উদ্যোগী হইতে হইবে। মানুষের মনুষ্যত্ব কি, আর উহা লাভের জন্য মানুষকে কি উদ্যোগ করিতে হইবে তাহাই আমরা নিজেরা শিখিব ও অপরকে শিখাইব। দুর্ভাগ্য এই যে আমরা আকৃষ্ট হইতেছি কোলাহলের দিকে, স্থিরপ্রাণতায় আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনের দিকে নয়। এক একটা ঢেউ আসিয়া আমাদিগকে কেবল উদভ্রান্ত করিয়া দিতেছে।

* * * *

বিহার ও উড়িষ্যায় চলিত ভাষায় উচ্চ শিক্ষা। ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই চলিত ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের বিষয়ে স্তর আশুতোষের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কি পদ্ধতিতে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে তাহার জন্য বিহার গবর্ণমেণ্ট গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাটনায় একটি সভা করিয়াছিলেন ও সেই সভায় বঙ্গদেশের ও যুক্তপ্রদেশের কয়েক জন প্রতিনিধিকে সহকারী সভ্যরূপে আহ্বান করিয়া বিষয়টির বিচার করা হইয়াছিল ও সভার সুযোগ্য নেতা হইয়াছিলেন স্বনামখ্যাত স্তর আলি ইমাম। বিদ্যালয় সমূহে চলিত ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ছাড়াও সুশিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন করা হইয়াছে। যাহাতে ভাষা ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে Research বা অনুসন্ধানের কাজ চলে ও জ্ঞানপ্রদ বিদেশীয় সাহিত্য হিন্দী ও উড়িয়ায় ভাষান্তরিত হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ আশা আছে যে গবর্ণমেণ্ট অচিরে এই ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তন করিবেন। উক্ত সভাটি আহূত হইবার পর বিহারের সেনেটের পক্ষ হইতে সেখানকার সুযোগ্য রেজিষ্ট্রারের আহ্বানে এম্‌-এ পরীক্ষায় চলিত ভাষায় পাঠ্য নির্দ্ধারণের জন্য গত এপ্রিল মাসে আর একটি সভা আহূত হইয়াছিল; এই সভাতেও ফেব্রুয়ারির সভার মত অন্য প্রদেশের প্রতিনিধি আহূত ছিলেন। আমি উভয় সভাতেই সরকারী সভ্যরূপে উপস্থিত ছিলাম; অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে পাটনায় এই দুইটি সভার কাজই সুবিবেচনায় পরিচালিত হইয়াছিল। শেষ সভায় দেশী সাহিত্যের এম্‌-এ পরীক্ষার পাঠ্য যে সুবিচারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। বিহারের ঐ সভা দুইটিতে সভ্যদের মধ্যে তর্ক বাড়াইবার প্রবৃত্তি দেখি নাই,—সকলকেই হিতকর ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের দিকে উৎসাহী দেখিয়াছি। ভারতের জাতীয় উন্নতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মনে হইতেছে।

* * * *

হিতৈষণার জয়ঢাক। যাহা বিনা কোলাহলে চলিতে পারে তাহা বড় কাজ নয়,—হিতৈষণার কাজ নয়, ইহা অনেকের ধারণা। আমরা স্পষ্ট জানি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের কাজ যখন স্তর আশুতোষের নেতৃত্বে চলিতেছিল, স্তর আশুতোষ তখন কাজের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা সময়ে কথা কহিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন; কাজেই সভায় বা কমিটীতে তর্ক বাড়াইবার অবসর থাকিত না,—অল্প কয়েক মিনিটেই প্রস্তাব নির্দ্ধারণের কাজ শেষ হইত। ইহাতে অনেক হিতৈষণাপুষ্ট সম্পাদকেরা কটূক্তি করিয়া বলিতেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা গোলামী বৃত্তিতে আশুতোষের আদেশ শুনিয়া চলেন। এই সমালোচকদের প্রচ্ছন্ন সংস্কার এই যে যেখানে তীব্র তর্কের চুলাচুলি নাই সেখানে মতের স্বাধীনতা নাই। ব্যবস্থাপক সভাগুলির কাজের সমালোচনাতেও দেখিতে পাই যে সকল বক্তারা ক্রুদ্ধ স্বরে ও উত্তেজিত মাথায় গবর্ণমেণ্টকে দু'কথা শুনাইয়া দেন তাঁহারাই সৎসাহসী হিতৈষী নাম পান। এক একটা করিয়া যদি এ কালের হিতৈষীদের প্রতিষ্ঠানগুলির সমালোচনা করা যায়, তবে সর্ব্বত্রই একই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে, যথা—জয়ঢাক বাজিতেছে জোরে কিন্তু একটা কাণাকড়ির কাজও হইতেছে না। ভারতের একতাবিধানের জন্য রাষ্ট্রীয় সভা হইতেছে—প্রাদেশিক ও উপপ্রাদেশিক সভা হইতেছে আর কাজের বেলায় দেখিতে পাই যে পরস্পরের মিলনের নামে "বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়, ও খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়"। পূজার ঢাকের নিনাদে মিলনের মন্ত্র যতই জোরে উচ্চারিত হইতেছে

ততই প্রাদেশিক লড়াই তীব্রতর হইতেছে ; অমুক প্রদেশের লোকেরা বিহারে বা ওড়িষায় বা অন্য কোথাও ঢুকিল কেন বলিয়া যুদ্ধ বাধিতেছে। আমাদের হাতে আছে খালি একখানা অসহযোগের অস্ত্র আর সেই অস্ত্রখানা মানুষকে তাক লাগাইবার জন্য ওঁচাইয়া থাকি বিদেশীয়দের দিকে, কিন্তু উহার আসল ধার বাড়াই মিলনের পাত্রদের ছুঁটিতে ঘষিয়া। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি ইউরোপের ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতির মত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ নয় ; যে কোন প্রদেশের লোক অন্য যে কোন প্রদেশে বাস করিতে বা সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে সে কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত বাধা পায় নাই, ও ইউরোপে যে ডমিসিল্ লইবার আইন আছে এখনও পর্য্যন্ত এদেশে সেরূপ আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই বা হইতে পারে না। অথচ বিলাতি আইনের একটা কল্পিত প্রয়োগের মিথ্যা ধুয়া তুলিয়া অনেকের স্থিতি সম্বন্ধে আপত্তি তোলা হয়। ভারতের প্রদেশে প্রদেশে যদি স্বাতন্ত্র্য কল্পিত হয় আর এদেশীয়দের জন্য যদি বিভিন্ন প্রদেশের অধিকার পাইবার পথে ডমিসিল্ লইবার আইন জারি হয়, তবে এক মুহূর্ত্তে ভারতের ধ্বংস সাধিত হইবে। যাঁহারা কাজের বেলায় মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর স্থিতি দেখিলে আঁৎকাইয়া ওঠেন, ঠিক তাঁহারাই যে ভারতের একতার জন্য করুণ সুরে ও তেজের ভাষায় হাতের তালিতে প্রদীপ্ত বক্তৃতা করেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করা যাইতে পারে। যাঁহারা জ্বালিতেছেন বিদ্বেষের আগুন তাঁহাদেরই হাতে বাজিতেছে হিতৈষণার ঢক্ঢাক।

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতি—৩রা-৪ঠা আষাঢ়ের এই উৎসবের সকল কথা পরে লিখিব রেলের আবর্ত্তে সারা বঙ্গের প্রিয়তম স্মৃতি বঙ্কিমের বাড়ী ও ভিটা ডুবিবার আতঙ্কটুকু সরকার নিশ্চয়ই দূর করিবেন, কারণ এমন **vandalism** ইংরেজেরা করেন না। প্রাচীন স্মৃতি-রক্ষাকল্পে লর্ড কর্জ্জনের কীর্ত্তি যেন অটুট থাকে। মনে পড়ে ঐতিহাসিক লুপ্ত স্মৃতির বেদনায় অমর কমলাকান্তের বাণী—আমাদের মধুও গিয়াছে—বৃন্দাবনও গিয়াছে, আর প্রিয় স্মৃতির মন্দির আস্তাবলের সুরকিতে পরিণত হইতেছে ও ভিটায় পোদেদের লাঙ্গল চলিতেছে ও সেই ঢেঁকির পাড় ও লাঙ্গলের ফাল কমলাকান্তের বুকে বিঁধিতেছে। এই নিদারুণ কল্পনা যেন সত্য না হয়,—বঙ্গের মধুর স্মৃতি যেন নিষ্ঠুররূপে দলিত হইয়া বাঙ্গলার বুকে গভীর বেদনা না দেয়।

Editor : Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works, 76-1A, Baitakkhana Road, Cal.

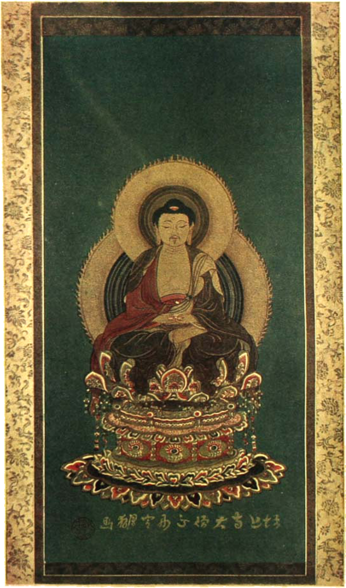

অমিতাভ

[illegible] [illegible] কর্তৃক উনবিংশ
শতাব্দীতে [illegible] [illegible] অঙ্কিত।

[illegible]

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৩৩৩-'৩৪

শ্রাবণ

প্রথমার্দ্ধ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতের ভবিষ্যৎ

শিক্ষিতেরা অনেকে বুঝিয়াছেন আমরা দুঃস্থ, কিন্তু সে শোচনীয় অবস্থা আমাদের কোন নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানকৃত পাপের ফলে, না আমাদের অজ্ঞানতায় উৎপন্ন কোন অবস্থার ফলে, তাহা হয়ত বুঝি নাই অথবা সকলে একভাবে বুঝি নাই। ইতিহাসের সুনিশ্চিত প্রমাণে আমাদের ক্ষয়ের বা হীনতার কারণ ধরিতে না পারিলে মুক্তির পথ পাওয়া অসম্ভব, অথচ এখনও আমরা সেই প্রার্থিত ইতিহাস পাই নাই। আমাদের ইতিহাস লিখিয়াছেন বেশির ভাগ ইউরোপীয়েরা; ইউরোপীয় শিক্ষায় ও সংস্কারে রঞ্জিত অনুভূতির ফলকে আমাদের সামাজিক অবস্থার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহা যে অনেক স্থলে আমাদের সমাজের খাঁটি চিত্র নয় তাহা আমরা অল্প পরিমাণে বুঝিয়া থাকিলেও নিজেরা দেশের একটা খাঁটি ছবি তুলিতে পারি নাই। এমনও ঘটিয়াছে, যেখানে নিজেরা ছবি তুলিতে গিয়াছি সেখানে আত্ম-অভিমানের মোহের কুয়াসায় অথবা পরের উপরে রোষের উত্তেজনার চঞ্চলতায় শিব গড়িতে গিয়া একটি অন্য রকমের জীব গড়িয়া তুলিয়াছি।

সমাজের ক্ষয়-বৃদ্ধির আইন, সাধারণভাবে একটা যাহা পাওয়া যায়—যাহা পৃথিবীর দশটা সমাজের ক্ষয়-বৃদ্ধির ইতিহাস ধরিয়া সমাজ-তত্ত্বজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন, সেই আইন যে-কোন দেশের যে-কোন সমাজে হুবহু চালাইতে পারা যায় না প্রতি সমাজের বিশেষত্ব ধরিয়া সূক্ষ্ম

বিচারে এই আইনটি ধরিতে হয়। গাছপালার বৃদ্ধি বল, মানুষের সমাজের বৃদ্ধিই বল, সকলই অলঙ্ঘ্য প্রকৃতির নিয়মে অথবা প্রকৃতির অধীশ্বরের বাঁধা নিয়মে চলিয়াছে; কোন বীরের বা ধার্ম্মিকের সাধ্য নাই যে সে আইন না মানিয়া—সেই বিধানে সমাজকে না চালাইয়া নিজের প্রবৃত্তি বা রুচি অনুসারে হয় বলশেভিক সাজিয়া, না হয় প্রাচীনতার প্রিয় সাজিয়া সমাজকে ভাঙ্গিবে বা রক্ষা করিবে। যত তাড়াতাড়ি করি, যত লাফালাফি করি, আমরা সামাজিক ঘটনার পরীক্ষা করিয়া—সামাজিক গতির অন্তর্গূঢ় নিয়ম ধরিয়া কাজ না করিলে—অর্থাৎ বিধাতার বিধান ধরিয়া কাজ না করিলে, স্বরাজই বল আর যাহাই বল, কিছুই পাইব না।

সমাজতত্ত্বকে যাঁহারা উপেক্ষা করেন তাঁহারা সংখ্যায় অধিক; স্পষ্ট জানা আছে, যাঁহারা রাষ্ট্রচালকের আসনে বৃত হইয়াছেন অথবা সে-আসনখানি নিজের জোরে অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে কাজের তাড়নায় ও হিতৈষণার উত্তেজনায় ইতিহাসের ও সমাজতত্ত্বের আলোচনাকারীকে অলস, কষ্টভীরু ও ছায়া-শিকারী মনে করেন। ইঁহারা ভাবেন যে যাহা অপ্রার্থনীয় তাহা সকল অবস্থাতেই কেবল গায়ের জোরে দূর করা যায়। ইঁহারা একবারও ভাবেন না যে চিকিৎসা-বিদ্যা না জানিয়া কেবল গভীর প্রেমে মঙ্গল সাধনের ইচ্ছায় আকুপাকু করিলে বা হাত-পা ছুঁড়িলে প্রিয়পাত্রকে রোগ-মুক্ত করা যায় না; ধাতার বিধান ধরিয়া না চলিলে কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। যদি এই সত্যের দিকে একবার দৃষ্টি পড়িত তবে অভ্যাসের বশে যে-সকল প্রথা-পদ্ধতি অতি প্রিয় মনে করিয়া বুকে আঁকড়াইয়া ধরি, তাহা স্থির মস্তিষ্কে বিচারাধীন করিতাম, ও তাহা রক্ষণীয় কি বর্জ্জনীয় বুঝিয়া নিতাম। এ বুদ্ধি না জাগা পর্য্যন্ত আমরা অভ্যাসের বশে আমাদের অনুষ্ঠিত প্রথা-পদ্ধতির সমালোচনা করিতে পারিব না, মুক্তির পথ পাইব না।

অসহিষ্ণু নেতারা বলিবেন যে আমাদের দুরবস্থার প্রকৃতি অতি সহজেই বুঝা যায় ও সে অবস্থা সহজেই দূর করা যায়, অথচ নৃতত্ত্বওয়ালারা বিদ্যার ভড়ং দেখাইয়া অতি সোজা জিনিসকে জটিল করিয়া তুলিতে চায়। তাঁহারা বলিবেন আমাদের এই যে দুঃখ বা দুর্গতি উহার নামান্তর হইতেছে স্বাধীনতার অভাব; অধীনতার বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিলেই সকল দুঃখ, সকল পাপ, সকল জঞ্জাল চলিয়া যাইবে,—আমরা যদি একবার গা-ঝাড়া দিয়া সকলে দাঁড়াই তবে নিমেষে সকল বাধা দূর হইবে। কথাটা আপাতত মানিয়া লইতেছি; কিন্তু যখনই বলা হইল "আমরা সকলে যদি গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াই", তখন প্রথমে বুঝিয়া নিতে হইবে "আমরা সকলে" বলিলে কাহাদের সমষ্টি বুঝিব, আর সেই সমষ্টি যাহাদের যোগে তাহারা একসঙ্গে জুটিবে কি-না। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই, যাহারা গা-ঝাড়া দিবে তাহাদের তাহা করিবার ক্ষমতা আছে কি-না।

প্রথমে "আমরা" বলিতে যাহাদিগকে বুঝিতেই হইবে তাহাদের পরিচয় দিতেছি। যে প্রাচীন যুগে মানুষের মোক্ষ-সাধনার মতবাদের নামে অর্থাৎ যাহাকে একালে ধর্ম্ম বা religion

বলি তাহার নামে এদেশে কোন নামকরণ হয় নাই, তখন সারা ভারতের অধিবাসী বুঝাইবার অর্থে কোন জাতিবাচী শব্দ ছিল না ; তবে ভারতের পশ্চিম দেশের লোকেরা সিন্ধুর পূর্ব্ব পারের ভারতের লোককে হিন্দু বলিত। এখন হিন্দু বলিতে মোটামুটি বুঝিয়া থাকি তাঁহাদিগকেই যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য শাসনের সামাজিক বিধি মান্য মনে করেন। এই অর্থে যাহারা হিন্দু তাহাদের অধিকাংশ দলের বা "জাতির" লোকেরা যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সন্তান নয়, তাহা ব্রাহ্মণ-প্রমুখেরাও বলেন আর বাঙ্গলার মত দেশের বাহিরে সকল শ্রেণীর লোকেরাই প্রায় স্বীকার করে। তবে হইতে পারে যে, বাঙ্গলাদেশে যেমন হিন্দু নামে চিহ্নিত সকল জাতির লোকেরাই বৈদিক কুল হইতে তাহাদের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া আর্য্যগৌরবের ঐতিহ্য নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য বা ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিবার দাবি করিতেছে, সেইরূপ অন্ত প্রদেশের বহুদলের বা জাতির লোকেরা একদিন ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া সেই সমাজের তলায় যে-কোন স্থানে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে চাহিবে : এখনও কিন্তু তাহা হয় নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বংশধর বলিয়া যাঁহারা দাবি করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষা অন্যান্য হিন্দু নামে চিহ্নিতদের দলের সংখ্যা অনেকগুণে অধিক, আর বাঙ্গলাদেশের বাহিরে অনেক প্রদেশে তাহারা আর্য্য-গৌরবের স্মৃতিতে ও সঙ্গীতে ভাবের মোহে মাতে না বা উৎফুল্ল হয় না।

ভারতে যে সাতকোটি মুসলমান আছে তাহারা এদেশের আগেকার কালের লোকের সন্তান বলিয়া প্রমাণিত হইলেও আত্মগৌরবের কথা উচ্চারণ করা পাপ মনে করে ও এদেশের মাটীতে যে সকল ভাষার জন্ম সে সকল ভাষার শব্দে আপনাদের নামকরণ করা অপবিত্র মনে করে, আর "বন্দেমাতরম্" প্রভৃতি জাতীয়ত্বের উদ্বোধনের গান "হারাম্" মনে করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যাহারা খাঁটি অনার্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জিত নয়—যাহারা ব্রাহ্মণের শাসন মানে না, মুসলমান নয়, খৃষ্টিয়ান্‌ও নয়, এই সকল শবর প্রভৃতি বহু জাতির লোকেরা উচ্চস্তরের হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। আমাদের দেশের উচ্চকুলোদ্ভব নেতারা যে একেবারেই ইহাদের খোঁজ-খবর রাখেন না, তাহা তাঁহাদের জাতি গড়নের বিজ্ঞাপনীর দু-একটা প্রস্তাব পড়িলে ধরা যায়। নেতারা বলেন যে উচ্চকুলের হিন্দুরা যদি হীন ও অস্পৃশ্যদিগকে অসঙ্কোচে ছুঁইতে পারেন অথবা একটু মাত্রা বাড়াইয়া তাহাদিগকে জল-চল করিতে পারেন তবেই সকল "অ-মুসলমান" এক সঙ্গে একদলে জুটিবে। মূলে যাহারা অনার্য্যজাতীয়, আর এখন আছে ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজের আওতায়, তাহারাও এই ছোঁয়া-নীতিতে কতখানি আপনার হইবে, সে বিচার অল্প একটু স্থগিত রাখিয়া আর্য্যেতর শবর, কন্দ্‌ প্রভৃতিদের কথা বলিতেছি।

শবর, কোল প্রভৃতি অনেক জাতির লোকেরা আপনাদের জাতির গণ্ডীর বাহিরে কোন জাতির লোকের হাতের জলটুকুও খায় না ; অতবড় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছোঁয়া জলটুকু খাইলেও তাহারা কুলভ্রষ্ট হইয়া পতিত হয়,—তাহাদের জাত যায়। নেতারা উদারতা

দেখাইয়া ইহাদিগকে ছুঁইতে গেলে ইহারা ঠেঙ্গা দেখাইয়া দূরে দাঁড়াইবে। এ সম্পর্কে আর একটি কথা সংস্কারকদের জানা উচিত। আগে যে সকল অরণ্যচারী জাতির লোকেরা আপনাদের জাতির বাহিরের লোকের মাথা কাটিয়া রক্তপাত করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইত মনে করিত, তাহারা এখন ইংরেজের শাসনে মধ্যপ্রদেশের নানাগ্রামের নানাজাতির মধ্যে শান্তভাবেই বাস করে; তবে সুবিধা পাইলেই (অর্থাৎ পুলিসে ধরিবার সুযোগ না থাকিলেই) অন্য জাতির লোক ধরিয়া নরবলি দেয়, অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বাস করে তাহাদের সঙ্গে সমাজস্থিতির নীতি অবলম্বন করিয়া বাস করে না।

যে লোকেরা মূলে ছিল আর্য্যেতর অরণ্যচারী ও আত্মস্থিতির বাঁধন হারাইয়া আর্য্যদের আওতায় আসিয়া প্রথমে নিষাদ, চণ্ডাল প্রভৃতি নাম পাইয়াছিল ও পরে যাহাদের সঙ্গে আমাদের দূরতা এই বঙ্গদেশে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তাহারা মানুষ হইয়া দাঁড়াইলে সমাজের কল্যাণকর এমন অনেক কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারিত যাহা আমরা শরীর পোষার ফলে করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল লোকের মন ও প্রাণ গভীর দাসত্ব বুদ্ধিতে ও সংস্কারে এমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে ইহারা আত্মসম্মানে মাথা-তোলার অর্থ বুঝিয়াছে কোন শ্রেণীর শ্রমসাধ্য কাজ না করা বা সমাজের সেবা না করা; উচ্চতম শ্রেণীর লোকেরা ইহাদিগকে আপনার করুক আর নাই করুক ইহারা তাহাদের দাসত্ব কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে না। দাসত্বের ভাবের বিষে ইহারা এত জর্জ্জর যে যাহাকে যথার্থ গা-ঝাড়া দেওয়া বলে তাহা ইহাদের মধ্যে অসম্ভব হইয়াছে। মনে কর একজন দেশহিতৈষী ব্রাহ্মণ নেতা ইহাদের হাতে কিছু খাইতে চাহিলেন; ইহারা তখন পাপ অর্জ্জনের ভয়ে সে অনুরোধ রক্ষা করিবে না। যদি ব্রাহ্মণ নেতা বলেন তিনি অন্য অস্পৃশ্যের খাদ্য খাইয়াছেন আর তাহার খাদ্যও খাইতে পারেন, তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার উদারতায় আকাঙ্ক্ষিত খাদ্য পাইবেন বটে কিন্তু ঐ দলের ব্রাহ্মণ-পূজক লোকেরা ব্রাহ্মণ নেতাকে পতিত ও অস্পৃশ্য মনে করিবে, ও সেই ব্রাহ্মণের হাতে কেহ খাইবে না। এই হইল ছোঁয়া-নীতি ব্যাপারের ভিতরকার দিক।

গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইতে গেলে যে এই সকল শ্রেণীর লোকের এক সঙ্গে জোটা চাই ও গা-ঝাড়া দেওয়া চাই তাহা শ্রীযুক্ত গান্ধিজি প্রমুখ সকল নেতারাই স্বীকার করেন। স্থূল ভাবে ভারতের জাতি-সঙ্ঘের যে ভাসা-ভাসা পরিচয় দিলাম তাহাতে ত্রিশ লক্ষ খৃষ্টিয়ানের কথা বলি নাই। অনার্য্য জাতির লোকেদের মধ্যে যে খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। বঙ্গদেশে খৃষ্টিয়ান্ বলিলে যাঁহারা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বসু প্রভৃতি উচ্চ-শিক্ষিত সুবুদ্ধি লোকেদের কথা মনে করেন, তাঁহারা যেন নিশ্চিত-রকমে মনে রাখেন যে বেশীর ভাগ লোক যাহারা খৃষ্টিয়ান্ হইয়াছে ও হইতেছে তাহারা যাহাদের দব্‌দবাইয়ের প্রভাবে খৃষ্টিয়ান্ হইয়া একটা নূতন স্পষ্ট ভাবের আওতায় পড়ে তাহাদের শিক্ষায় ও মোহে এই

খৃষ্টিয়ানেরা আমাদের সঙ্কলিত সমাজ হইতে বহুদূরে থাকিতে চায় ও আমাদের প্রাণের উচ্ছ্বাস তাহাদের প্রাণে লাগে না। নাগা প্রভৃতি পাহাড়ে জাতির লোকেরা খুব দলে পুরু নয়, অথচ অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের চল্লিশ হাজার লোক খৃষ্টিয়ান্ হইয়াছে; ইহাঁদের কাছে খৃষ্ট ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যদি সেই সকল দেশী খৃষ্টানেরা প্রচার করিত যাহাদের ভাষা ইহারা বুঝিতে পারে, তবে ইহারা খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিত মনে হয় না; যাহাদের ভাষা বুঝিতে পারে না কিন্তু প্রভাব অনুভব করিতে পারে, নাগারা সেই ইউরোপীয়দের মুখ চাহিয়া খৃষ্টিয়ান্ হয়, আর এই নিয়মই সর্ব্বত্র খাটিতেছে দেখিতে পাই। ইহাতে আমাদের লোকসাধারণের যে মানসিক অবস্থা সূচিত হয় তাহা যেন আমরা ভ্রূ কোঁচ্কাইয়া উপেক্ষা না করি।

মানুষেরা স্বাধীন বিচারে আপনাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে কোন ধর্ম্মমত গ্রহণ করিবে—তাহার বিরুদ্ধে কোন সমাজতত্ত্বজ্ঞ আপত্তি তুলিতে পারেন না। আমাদের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব দেখিয়া যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হন বা শোক করেন তাঁহারা মানসিক সঙ্কীর্ণতায় ক্ষুদ্র। পশু-পক্ষীদের মধ্যে একই বাঁধা সংস্কারে সকলের জীবন চালিত হয়; মানুষের মধ্যে যাহাদের সমাজ যত বর্ব্বর ও যত অনুন্নত তাহাদের মধ্যে সংস্কারের একতা তত অধিক। মতভেদের বৈচিত্র্য মানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রসারের ফলে হয়, তার উহাই সামাজিক উন্নতির লক্ষণ। কে কি খাদ্য খায়, নর-নারীর উন্নতির জন্য কি পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে, অথবা মনের শান্তি ও পরলোকের মুক্তির জন্য কি ধর্ম্ম মানে, ইহা ধরিয়া যেখানে সামাজিক লাঠালাঠি নাই, স্বাধীনভাবে আপনার পথ অনুসরণ করিবার সুবিধা আছে, ও মতের প্রভেদ সত্ত্বেও সকলে মিত্রতা করিয়া চলিতে পারে, সেইখানেই ধরিতে পারা যায় যে মানুষের হাড়ে-মাংসে আত্মম্ভরিতা ও গোলামি বুদ্ধি নাই ও মানুষেরা যথার্থ ই সেই স্বাধীনতার বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ যাহা না থাকিলে কোন শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পরের দানে পাইলেও মানুষ তাহা রক্ষা করিতে পারেনা—স্থায়ী করিতে পারে না।

আমরা প্রায় ত্রিশ কোটি ভারতবাসী কত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও ধর্ম্মমত-বিশিষ্ট বহু দলের বা বহু সমাজের সমষ্টি, তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম। কোন পক্ষের লোকের স্বাধীন ধর্ম্মমতে ও সেই ধর্ম্মমতের অনুযায়ী আচরণে বাধা না দিয়া, ও নিজের নিজের স্বাধীন মতবাদ আলোকে ও মধুরতায় অনুপ্রাণিত করিয়াও তাহা স্বাধীনভাবে প্রচার করিয়া কি উপায়ে এক সঙ্গে মিলিতে পারি—কি সাধারণ সর্ব্বলোকগ্রাহ্য মুক্তির মন্ত্র জপিতে পারি ও সর্ব্বজনের আকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি, তাহাই বুঝিতে হইবে—তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। যদি সঙ্কীর্ণতার কুবুদ্ধিতে আমাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকেরা আপনাদের অপেক্ষাকৃত অধিকতর ক্ষমতার মোহে মনে করেন যে তাঁহাদের রুচি ও সংস্কার সকলের ঘাড়ে চাপাইয়া একতাসাধন করিবেন তবে তাঁহারা আনিবেন আত্মদ্রোহ ও ধ্বংস। কেবল

মুসলমানদের প্রসঙ্গে যে কথা বলি নাই তাহা হয়ত সুস্পষ্ট হইয়াছে। আমরা যেভাবে এই বঙ্গদেশে সাহিত্যের ভাষা পুষ্ট করিতে চাই অথবা জাতীয় সঙ্গীত রচিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে চাই তাহার পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে যে আমাদের শিক্ষার ও উদারতার অভিমানের তলায় কত সঙ্কীর্ণতা ও আত্মম্ভরিতার ক্ষুদ্রতা রহিয়াছে। যেখানে বিনা মন কসাকসিতে কেবল ভাষা-বিজ্ঞানের অল্প জ্ঞানেই বুঝিতে পারি যে, নানা প্রাদেশিক বুলি শাসন করিয়া যে সাহিত্যের ভাষা জন্মে তাহা কোন প্রদেশের নির্দ্দিষ্ট বুলি হইতে পারে না অথচ সমানে সকল প্রদেশের গ্রহণীয় ভাষা হয়, সেখানেও অনেকে আত্মদম্ভে একটি প্রদেশের বুলি ও ভাষার রীতিসিদ্ধ ব্যবহার (idiomatic use) জিদ করিয়া সকলের ঘাড়ে চাপাইতে চান্। আমাদের অনেক অতিপ্রিয় ও সুরচিত সঙ্গীত যে এই প্রবন্ধে বর্ণিত জাতি-সমষ্টির প্রিয় হইতে পারে না ও প্রাণের ভাব জাগাইবার মন্ত্র হইতে পারে না তাহা আমাদের বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতায় ভুলিয়া যাই। কিরূপ মন্ত্র সর্ব্বসাধারণের জপের মন্ত্র হইতে পারে, তাহা যখন আলোচনা করিব, তখন এই সঙ্গীতগুলির প্রকৃতি-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইবে।

এখানে এই শেষ কথাটির প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে যাঁহারা একটি নির্দ্দিষ্ট দেবপূজার পদ্ধতির অনুগামী নন তাঁহারাও সুশিক্ষার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-প্রসিদ্ধ গানের প্রাণগত ভাব অনুভব করিয়া জাতি-সমষ্টির শক্তি বিকাশের সঙ্কল্পে প্রাণ ভরিয়া গাইতে পারেন—ত্বং হি দুর্গে দশ-প্রহরণ-ধারিণি ; কিন্তু জাতিসঙ্ঘের যে বিচ্ছিন্নতার পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে কি সুস্পষ্ট হইবে না যে, গানটীর গায়ক এই সত্যটির উপলব্ধিতে নিরুৎসাহ হইবেন যে তাঁহার দেবী দশ-প্রহরণধারিণী নন্ ? নিম্নপক্ষে নয়খানি হাতের নয়খানি প্রহরণ যে নানা দলের লোকের প্রাদেশিকতার মাটিতে মড়িচা ধরিয়া পড়িয়া আছে, আর নয়খানি হাতও যে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন আছে, তাহা যদি ক্ষুদ্রতার অন্ধকারের আবরণে দেখিতে না পাই, তবে আমাদের উদ্ধার নাই।

কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে ভারতকে খুঁজিয়া না পাইয়া জাগ্রত ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে। ভগবানের দয়া যেমন মানুষের প্রাণ ও হাত বহিয়া পরস্পরকে ধন্য করিতে আসে, আকস্মিকরূপে শূন্য হইতে ঝরিয়া পড়ে না, জাতির জাগরণের ও কর্ম্মের জন্য তাঁহার দুর্জ্জয় আহ্বানও সেইরূপ সারা দেশের লোকের কণ্ঠের পথেই ধ্বনিত হয়। আমাদের বাহুগুলি বিচ্ছিন্ন ; কাজেই উহারা নিস্পন্দ ও নির্ব্বীর্য্য হইবে,—কাজেই আমরা কর্ম্মশক্তিহীন হইতে বাধ্য। কেন যে আমাদের কক্ষ দৈন্য-জীর্ণ, কেন যে আমাদের বক্ষঃ মলিন ও শীর্ণ আশায় পূর্ণ তাহা অচপল দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে হইবে।

আমাদের জাতি-সঙ্ঘের যে সকল অংশ যেখানে সংস্কার ও অভ্যাসের বশে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও কোথাও কোথাও বা বদ্ধমূল সংস্কারে দাসত্ব-প্রিয়, তাহারা, কি লক্ষ্য সাধনের জন্য গা-ঝাড়া দিয়া একসঙ্গে জুটিবে ? যাহারা মজ্জাগত দাসত্বের বুদ্ধিতে জীবনের দশদিকের কাজ

করে তাহারা একাদিক্রমে সাধারণ রূপের খেলায় নিজেদের মূল দাঁত না বদলাইয়া স্বাধীনতা চাহিয়া বিদ্রোহী হইবে, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। তাহাদের উপার্জ্জনের সম্বন্ধের দুই-একটা প্রত্যক্ষ স্বার্থ দেখাইয়া অস্থায়িভাবে উত্তেজিত করিয়া ধর্ম্মঘট করিবার বা বিদ্রোহ করিবার দিকে চালান যাইতে পারে, কিন্তু দশের কাজে দশের সঙ্গে জুটাইয়া নিতে পারা অসম্ভব। স্বার্থের প্রলোভন দেখাইয়া ফাঁকির কৌশলে মুসলমানকে দু-দশ দিনের জন্য দলে জোটাইতে পারা যায়, কিন্তু আত্মস্বার্থ চিরদিনের জন্য বলি দিয়া "অ-মুসলমানেরা" কিছুতেই মুসলমানকে দলে আঁকড়াইয়া রাখিবে না।

যেদিক দিয়া না চলিলে, যে-সাধনা অবলম্বন না করিলে, যে-মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করিতে না পারিলে আমাদের সর্ব্বারম্ভের সম্ভাবনা শূন্যে হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে, অবিলম্বেই সে দিকের কথার আলোচনা করিব। এবারে কেবল আমাদের খাঁটি অবস্থার দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখিতে বলিতেছি যে আমরা অনেক স্থলেই উদ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। অন্য কোন উপায় না পাইয়া যাহারা একটি নির্দ্দিষ্ট "পরের" উপর বিদ্বেষ জাগাইয়া সেই বিদ্বেষের সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন দলকে একসঙ্গে গাঁথিয়া নামতঃ ভাই সাজাইতে চান, তাঁহারা এই অতি সোজা কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন যে মানুষেরা পাপের বুদ্ধিতে উত্তেজিত হইয়া বিদ্বেষের গ্লানিতে আপনাদিগকে কলুষিত করিয়া কিছুতেই স্থায়ী জোট বাঁধিয়া পুণ্যকর্ম্ম সাধন করিতে পারিবে না। কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি, তাহা স্থির-চিত্তে বুঝিয়া লইয়া স্থির সাধনায় ও প্রশান্তচিত্তে কর্ম্মের পথে অগ্রসর না হইলে কোনও কর্ম্মসাধন করা অত্যন্ত অসম্ভব। ইহা ছাড়া অন্য একটা কথা আছে যাহা ভবিষ্যতে বুঝাইয়া বলিতে হইবে; সে কথাটি সংক্ষেপে একটি গানের ছন্দে এইরূপে প্রকাশ করা চলে, যথা :—

পরের পরে কেন এ রোষ—নিজেরই যদি শত্রু হোস্ ?
তোদের যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'।

দেশের দিকে তাকাইয়া স্থির দৃষ্টিতে দেশের অবস্থা বুঝিয়া এই বিশ্বাসকে মনে প্রথমে দৃঢ় করিতে হইবে—বিধাত্রা বিহিতং মার্গং ন কশ্চিৎ অতিবর্ত্ততে। বিধাতার বিহিত যে অটুট আইনে সমাজ ভাঙ্গে ও সমাজ গড়ে, সেই আইন বা বিধান নিশ্চিতরূপে ধরিয়া সমাজ সেবায় না লাগিলে বিন্দুমাত্র ফললাভ করা অসম্ভব। উদ্দেশ্য যতই বড় হোক্, স্বদেশপ্রেম যতই গভীর হোক্, চিকিৎসাবিদ্যা না জানিলে যেমন কেবল স্নেহের বলে প্রিয়তমের রোগকে দূর করা যায় না, তেমনই সমাজের অন্তর্গূঢ় নিয়ম না জানিলে সামাজিক উন্নতি সাধন করা যায় না। তুমি বিশ্বের অতিবড় মিত্র হইলেও, হে বিশ্বের মিত্র বা বিশ্বামিত্র, তুমি ধাতার সৃষ্টির ধারা বদ্‌লাইয়া কিছুতেই নূতন বিশ্ব গড়িতে পারিবে না। বশী হও, বশিষ্ঠের মন্ত্র জপ কর, ধাতার নিয়ম পালন করিয়া অগ্রসর হও, তোমার উত্তেজনাহীন প্রশান্ত মনে মুক্তির অমোঘ উপায় উদ্ভাসিত হইবে।

শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রজাপতির দৌত্য

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

সনাতন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্তমনে একেবারে সরস্বতীর তীরে, মহাকালীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

এক সময়ে কুসুমপুরের লোকেরা মহাকালীকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া জানিত। লোকে দুঃখের দিনে তাঁহার চরণে আশ্রয় লইত; তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলে, তাহাদের বিশ্বাস, মানুষের বিপদের মেঘ কাটিয়া গিয়া আবার ভাগ্য প্রসন্ন হয়।

লোকের বিশ্বাস যে কতখানি অটল ছিল তাহার পরিচয় আজও মন্দির হইতে সরস্বতীতে নামিবার সিঁড়িগুলি দেখিলে পরিষ্কার পাওয়া যায়। বেক্তার গাঁথুনি আজও অটুট রহিয়াছে, কোথাও একটি ফাট নাই, চিড় নাই। মানুষের পায়ে পায়ে লাল ইটগুলি ক্ষইয়া গেছে বটে কিন্তু তাহাতে ক্ষতি হয় নাই কিছুই।

পরন্তু, সরস্বতী লুপ্ত হওয়াতে চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে এবং মানুষের মনের ভক্তি-বিশ্বাসের স্রোতে মন্দা পড়ায়, মন্দিরের বাহিরটা শ্রীহীন দেখায় এবং মহাকালীর পূজারতির ব্যবস্থাগুলি প্রাণহীন, অভ্যাসচালিত কর্ম্মের মত কোনরূপে আছে মাত্র।

পনর কুড়ি বৎসর আগেও সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুসুমপুরের লোকে মন্দিরের প্রশস্ত রোয়াকের উপর সমাগত হইয়া আরতির প্রতীক্ষায় থাকিয়া পরস্পরের সহিত মেলা-মেশা করিত; গ্রামের আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা এবং নিষ্পত্তি সেইখানেই ঘটিত। আরতির পর, চরণামৃত এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সকলে ফিরিয়া আসিত।

আজকাল সন্ধ্যার পর সেখানে কেহ যাইতে চাহে না। সাপের ভয়, জন্তু জানোয়ারের ভয়। পুরোহিত ঠাকুর কোন রকমে প্রাণ হাতে লইয়া আরতির কাজ সারিয়া আসেন। রাত্রে মন্দিরে লোক থাকে না।

মন্দিরের পথে যাইতে হইলে জমিদার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। ব্রজকিশোর বৈকালে ছোট ফুল বাগানের মধ্যে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করেন, এবং গ্রামের বহু সমস্যা সেই অবসরে সমাধান করিয়া থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সনাতনকে কতকটা উদ্‌ভ্রান্তভাবে মন্দিরের পথে ছুটিতে দেখিয়া তিনি প্রথমে বিস্মিত এবং পরে অনেকটা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ সেই সময়ে বড় কেহ মহাকালীর মন্দিরের দিকে যাইতে সাহস করিত না।

মন্দিরের দ্বারে তালা দেওয়া ছিল না। সনাতন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রুর আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া মহামায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন; মা, তুই আমাকে নে, আমি যে আর পারছিনে।

পাষাণীর মুখে সন্ধ্যার আলো পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। মানুষের এতবড় দুঃখ তাঁহার হৃদয়কে যেন স্পর্শই করে না। চক্ষে অবজ্ঞার হাসি! দুই চক্ষু যেন বলিতে চাহে, ওরে মূঢ়, তোরা নিজেদের সৃষ্ট দুঃখে নিজেরা কষ্ট পাস্! একবার সবটা ঠিক ক'রে ভেবে দেখ্ দিকি!

সনাতনের এই হাসি ভাল লাগিল না! তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিলেন, তুই শিবের বুকে নাচিস্, পাষাণী, দয়াহীনা, আমি ত' কোন্ ছার তোর ঐ ভোলানাথের কাছে।

রোয়াকের উপর পায়চারি করিতে করিতে সনাতন যেন বুঝিলেন যে তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে তিনি অন্তরের জোর দিতে পারেন না, তাই মার ঐ বিদ্রূপের হাসি।

সনাতনের মনে হইল, তবে কি এ সংসারের কুল-মান সবই বৃথা-অভিমান মানুষের? মানুষ কি এই সবের মধ্য দিয়া কেবল নিজের ক্ষুদ্র অহঙ্কারটি চরিতার্থ করিতে চায়?

অদূরে একটা গাছের মাথা হইতে একটা পেঁচা যেন চীৎকার করিয়া বলিল, তা নয় তো কি রে, তা নয় তো কি রে!

বাহিরের ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে সনাতনের মনটি অবসাদ তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। তিনি আর যেন দাঁড়াইতে পারেন না। গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন; কি জানি এতক্ষণে বাড়িতে ভবশঙ্কর গাঙ্গুলী কত না তুমুল হাঙ্গাম বাধাইয়া তুলিয়াছে!

পিছন হইতে একটি সস্নেহ হস্তের মৃদু স্পর্শে সনাতন চমকিয়া উঠিলেন, সেই সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, দাদা, কি এত ভাব্‌চো? তোমার ছোট ভাইটিকে সেই ভাবনার একটু অংশ দাও না!......

সনাতন দেখিলেন, ব্রজকিশোর তাঁহার পিছনে আসিয়া বসিয়া আছেন।

সহসা একটা কিছু উত্তর দিতে সনাতনের বাধিল, হয়ত লজ্জা, হয়তো আরো কিছু।

ব্রজকিশোর আবার বলিলেন, দাদা কি হয়েছে?

একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, কর্ম্মফল, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ভোগ!......আজ শুভিকে দেখ্‌তে এসেছিল চণ্ডীতলার জমিদার......

ব্রজকিশোর সনাতনের কথা শেষ না হইতেই একাগ্র আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে সেই বুড়ো ভবশঙ্কর? ...তাহার পর, সনাতনের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া একান্ত অনুনয় ভরে

বলিলেন, দাদা, দিওনা তোমার সোনার প্রতিমা মেয়েটিকে ওই দুশ্চরিত্র বুড়োটার হাতে !…… দাদা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি !

সনাতন ব্রজকিশোরের এই স্নিগ্ধ কোমলতা দেখিয়া এতটা বিস্মিত হইলেন যে তাঁহার মনে হইল যে ইহার কোন নিগূঢ় অর্থ আছে। ,ব্রজকিশোর যে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এই কপট-কোমলতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ধরিয়া ফেলিতে যেন সনাতনের এক মুহূর্ত্তও দেরি হইল না। সঙ্গে সঙ্গে মনে দুর্জ্জয় রাগের সঞ্চার হইল। এবং তাহা প্রকাশের অবসর খুঁজিয়া সর্পের মতই আপন বিবরে বসিয়া ফুঁসিতে লাগিলেন

সনাতন কোন কথার উত্তর না দেওয়াতে খানিকটা সময় স্তব্ধ ভাবেই কাটিয়া গেল।

ব্রজকিশোর কেমন যেন আন্দাজে বুঝিয়াছিলেন যে সনাতনের মনের অবস্থা ভাল নহে। যেন ভিতরের কি-একটা চাপে তাহা ফাটিবার মুখেই আছে। তাই নূতন কোন কথা কহিতে তাঁহার সাহস হইল না। বলিলেন, ভবশঙ্করের পাত্রী পছন্দ হয়েছে ?

সনাতন একটা শব্দ ক'রে হাসিয়া বলিলেন, পছন্দ ? হুঁঃ ; পেলে আজই বিয়ে ক'রে নিয়ে যেতে চায়। বলে কিনা, আর কিসের দেরি, আজই আশীর্ব্বাদ সারি।

ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কি করলে দাদা ?

সনাতন বলিলেন, আমি রাগ করে চ'লে এসেছি ; বাড়িতে আছে নন্দ আর রাম, যা হয় একটা কিছু ক'র্বে

নন্দ আর রামের উল্লেখ হওয়াতে ব্রজকিশোর যেন একটা বিষয়ান্তর খুঁজিয়া পাইলেন। তাঁহার মনের মধ্যে যে কথা কয়টি ছিল—তাহাও যেন ফাঁক খুঁজিয়া ফেরে, আত্মপ্রকাশের বাধায় বাধা-কুণ্ঠিত হইতে ছিল।

ব্রজকিশোর বলিলেন, দুই বন্ধুতে হরিহর-আত্মা ; ভারি ভাল লাগে আমার ওদের ঐ পরস্পরের বন্ধুত্বটি।

কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে সনাতনের কিছুতেই তাহা ভাল লাগিত না। তাই সনাতন মন খুলিয়া এ কথারও কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

ব্রজকিশোর বলিলেন, রাম এবার নিশ্চয় পাশ করবে ; তা' হলে তোমার অনেকটা সুবিধা হবে দাদা ; কি বল ?

সনাতন বলিলেন, গরীবের কপাল, জানি না এ সৌভাগ্য অদৃষ্টে আছে কিনা !

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিতে লাগিল। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া আসে।

ব্রজকিশোরের হঠাৎ মনে কেমন একটু সাহস হইল. তিনি বলিলেন, দাদা রাগ না কর তো, যদি অভয় দাও তো. একটা কথা বলি।

কি, বলিয়া সনাতন সেই অন্ধকারের মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

ব্রজকিশোর বলিলেন, তোমার শুভির বিয়েতে একপয়সাও খরচ পত্র করতে হবে না।

হঠাৎ সনাতনের মনটা আড়ষ্ট স্থূল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, তা আবার কি ক'রে হয়, বুঝি না।……

ব্রজকিশোর বলিলেন, আমি এই কথাটি তোমার পায়ে নিবেদন করছি, দাদা, শুভিকে আমার ঘরে আনতে দাও।

সেখানে বজ্র পড়িলেও বোধকরি সনাতন অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। তিনি অন্ধকারের মধ্যে ক্রোধে দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, চৌধুরীদের ঘরে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে আমার নিপাত কামনা করি……আমার জীবন থাকতে এই দুষ্কর্ম আমি কিছুতেই করতে পারবো না। ভবশঙ্কর যতই বুড়ো হোক যতই কেন দুশ্চরিত্র হোক, তবুও সে কুলীন, এ কথা আমি এক মুহূর্তের জন্য যেন ভুলে না যাই……ভিক্ষা ক'রে শুভির বিয়ে দিতে হয় তা'ও করতে আমি প্রস্তুত ব্রজকিশোর, বুঝেছ কি না?

ব্রজকিশোর এতখানি কঠোরতা আশা করেন নাই। তিনি তবুও কঠিন প্রয়াস করিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন, বলিলেন, কিন্তু দাদা আমি ত কোন জোর করিনি, একটা মনের ইচ্ছা জানিয়েছি মাত্র।

চাবুকের মত শব্দ করিয়া সনাতনের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, এ তোমার স্পর্দ্ধা!

ব্রজকিশোর ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

নির্দ্দয় আঘাত করিয়া সনাতন মনে একটুও সুখ পাইলেন না। বুকের ব্যথা দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল। ব্রজকিশোরকে বলিবার কালে কুলাভিমানের প্রাকার চক্ষের সম্মুখে যত বড় হইয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, পরের মুহূর্ত্তে তাহা এত খাটো খর্ব্ব মনে হইল যে মনের কোণে কোথায় যেন একটু অনুতাপ জাগিল। হয়ত এই অবসর ঘটিত না, যদি ব্রজকিশোর নিজের পক্ষের দু-কথা জোরের সহিত বলিয়া যাইতেন।

মহাকালীর মন্দিরের পুরোহিত কখন আসিয়া আরতি সুরু করিয়া দিয়াছে সনাতন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া তিনি নাম জপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মন শান্ত হয় না। রাগের কথাগুলা এক এক করিয়া উঠিয়া তাঁহার মনকে বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে লাগিল।

ধূনার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে দম যেমন বন্ধ হইয়া আসে মনও তেমনি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে! সনাতন, ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে নিজের অহঙ্কারের সাপের ছবিটি দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

হায়! কি তিনি করিতে বসিয়াছেন? শুভিকে আজ যে পশুর হাতে সমর্পণ করিতে

পাইতেছেন, তাহার কৌলিন্যের কোন গুণ বর্তমান নাই। সে কেবল বংশ গৌরবের মুখসখানি পরিয়া আছে মাত্র। তাহাকে নাড়া দিলে, বাহির হইয়া আসে একটি মানুষ, যে বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়া বিবাহের জন্য কামাতুর,—সে এত বৃদ্ধ যে বালিকার জীবনের কোন সুখের সাধ কোন দিন পূরণ করিতে পারিবে না।

হঠাৎ নন্দকিশোরের প্রসন্ন-সুন্দর মুখখানি তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—মনে হইল এমন সুপাত্র ত আর হইতে পারে না। তবুও সে যে বংশজ!

(৭)

রামের অধ্যয়ন-তপোবনের বেড়া ফাঁক করিয়া নন্দকিশোর এক দ্বিপ্রহরে পলায়ন করিয়া খিড়কির পুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শীতের শেষদিকে হঠাৎ একটু গরম হয়, বিশেষ করিয়া দিবা-দ্বিপ্রহরে। এই সময়ে পুকুরে মাছ ধরিবার উৎসাহ সবচেয়ে বেশী ছিল শুভদার।

পুকুরের পাড়ে একটু পরিষ্কার দেখিয়া একটা জায়গায় বসিয়া সে একমনে মাছ ধরিতেছিল। নন্দ যে পিছনে দাঁড়াইয়া আছে সে তাহা জানিত না।

টোপে মাছ ধরিতেছে কিন্তু ভাল করিয়া পায় না, তাই তুলিতে হইলে অনেক হিসাব করিয়া তুলিতে হয়।

একবার ফাৎনা ডুবিয়াছে, কিন্তু শুভদা টানে নাই, তখন নন্দ হঠাৎ পিছন হইতে কথা কহিয়া উঠিতে সে চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, বাঃ নন্দদা আপনি কখন এসেছেন জানি ত কিছুই জানতে পারিনি!

নন্দ বলিল, অনেকক্ষণ; কিন্তু মাছের চারের কাছে পা টিপে যে আসতে হয়, তা আমি জানি

শুভদা বলিল এ খুব সোজা কথা, এ সব্বাই জানে।

নন্দ বলিল দেখি কটা মাছ ধরেচিস্?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, একটাও না।

নন্দ বলিল, তা হ'লে তুই মাছ ধর্‌তে জানিস্‌নি বল।

তবে, রোজ কে ধরে?

নন্দ বলিল, জেলেনি, নিশ্চয়।

আপনার যা কিছু সব জেলেনি, যান্ না তার কাছে।

নন্দ হাসিল, যাবোই ত, কেবল দেখ্‌চি তোর বিদ্যের দৌড় কত দূর।

শুভদা উত্তর না করিয়া একটা মাছ উপরে তুলিল।

এ কি মাছ খুকি?

তাও ভুলে গেছেন কলকেতায় থেকে থেকে ?

নন্দ বলিল শুভি তোর ক'লকেতার উপর বড় রাগ, না ?

রাগ কেন হ'তে যাবে, ভালই ত।

বটে ; তবে ত' দেখছি বুদ্ধি তোর হয়েছে।

শুভি বলিল, নন্দদা, আপনি বসুন না ছিপে, আমি একবার দেখে আসিগে বাবাকে।

কি হয়েছে তাঁর ? নন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

পরশু থেকে জ্বর।

কৈ, আমি ত কিছুই জানিনে।

সামান্য জ্বর মা গেছেন ও-পাড়ায়, জ্ঞেনি বাবার কাছে আছে, গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বলিয়া শুভদা মুখ টিপিয়া হাসিল।

নন্দ বলিল, আচ্ছা ; কিন্তু বেশী দেরি না হয়।

কিছুক্ষণ পরে শুভদাই ফিরিয়া আসিল, বলিল, জ্ঞেনিকে আপনি কত খোসামুদি করেন, কিন্তু সে তো আসতেও চায় না, একবার।

নন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, এতো খোসামুদির দোষ।

এবার দুইজনেই হাসিল

পিছন হইতে জ্ঞেনি কথা কহিল, না নন্দ দা, তুমি দিদির কথা একটুও বিশ্বাস ক'রো না, দিদি সব নিজের কথা বানিয়ে বানিয়ে আমার নামে বলে।

লজ্জায় শুভদার কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল।

জ্ঞেনি হাসিয়া উঠিল, বলিল, তুমি দেখো নন্দ দা, যদি আমার কথা সত্যি না হ'তো ত' দিদির মুখ কি অত লাল হ'য়ে উঠ্তো ?

নন্দ এবার শুভদাকে রক্ষা করিল, বলিল, জ্ঞেনি তুইতো ভারি দুষ্টু, এমনি ক'রে কি মানুষকে অপ্রস্তুত করতে হয় ?

জ্ঞেনি বলিল, তা' বলে দিদি কেন আমার নামে মিথ্যে বল্বে ? চুপ ক'রে থাক্লেই ত পারে।

নন্দ এবারে গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল, হ্যাঁ এ কথা একশো বার স্বীকার ক'রবো ভাই জ্ঞেনি......তুই ঠিক্ ব'লেছিস্।

নন্দ আদর করিয়া জ্ঞানদাকে ডাকিল, আয় না, আমার কাছে এসে বোস্।

জ্ঞানদা গিয়া বসিল।

নন্দ বলিল, আচ্ছা জ্ঞেনি, তুইও কি ক'লকেতার উপর চটা ? তোর

জ্ঞেনি মাথা নাড়িয়া জোরের সহিত বলিল, না নন্দ দা, আমি দিভাই এত বোকা নই।

নন্দ বলিল, তবে শোন্ জেনি তোকে একটা কথা বলি কিন্তু; শেষকালে আবার বলো বলে চল্‌বে না।

জেনি অধৈর্য্যে রাগ করিল, আঃ বলই না, শুনচি তো।

নন্দ বলিল, জানিস্ ক'লকেতায় আমার একজন বন্ধু আছে সে খুব ভাল লোক। তোর সঙ্গে তার বে' দেবো।……

আঃ, করিয়া জেনি চীৎকার করিল, তুমি বড় দুষ্টু, নন্দ দা। তুমি আমাকে চিড়িয়াখানার গল্প বল।

বাঁদরের ?

হুঁ।

আচ্ছা শোন্ তবে।

শুভদা একমনে মাছ ধরিতে লাগিল।

হঠাৎ পুকুর-পাড়ে মানদা আসিলেন।

নন্দকে সেখানে দেখিয়া তিনি যতখানি উৎফুল্ল হইলেন, শুভদা ততখানি দমিল। নন্দও যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিল, শুভির এতই বা লজ্জা কিসের ?

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, জেঠিমা জেঠামশায়ের জ্বর হয়েছে ?

মানদা উত্তর করিলেন, সেই সেদিনের পর থেকে তাঁর শরীর একটু ভাল নেই। রাতে ভাল ক'রে ঘুমুতে পারেন না। খাওয়া একেবারে নেই বল্লেই হয়; তারপর আবার পরশু রাত থেকে চাপা ঘুষ ঘুষে জ্বর ত' লেগেই আছে। মনের সুখ না থাকলে, শরীর কতক্ষণ বয় ?

নন্দ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু যাই বলুন জেঠিমা, শুভির বে' ঐ চণ্ডীতলার জমিদারের সঙ্গে হ'তেই পারে না।

বুকে অনেকখানি ব্যথা চাপিয়া মানদা বলিলেন, তাতো বুঝি বাবা, সেদিন আপত্তি আমিই সব চেয়ে বেশী ক'রেছিলাম; কিন্তু আর জোটেও না তো………

শুভদা ধীরে ধীরে ছিপ গুটাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

জেনি নন্দর কাণে কাণে বলিল, ঐ দেখো, দিদি কেমন পালালো……বলিয়া সে জোরে হাসিয়া উঠিল।

পাত্র ঢের জুটবে জেঠিমা, বলিয়া নন্দ মানদাকে ডাকিল, শুনছেন জেঠিমা,……রামকে পাশ ক'রে একটা কাজে ঢুক্‌তে দিন, টাকা খরচ কর্‌তে পার্‌লেই—জুট্‌বে

তাতো বুঝি বাপু; কিন্তু ওঁর অধৈর্য্যও যে আর চোখে দেখ্‌তে পারা যায় না। সেকেলে মানুষ, ওঁদের বোধ-বিবেচনা গুলো একটু অন্যরকমের……তাতো বুঝতে পারো বাপু!

পারি বই কি, সেখানেই তো গোল……দেখুন না, রামের পড়াশুনো কি হ'তে পার্‌তো, আপনি যদি অমন জোর না কর্‌তেন ? আপনাকে একটু শক্ত হ'তে হবে জেঠিমা !

মানদা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

শীতের অপরাহ্ণ নিমেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া অন্ধকারের ঘনতর পর্দ্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ভারগ্রস্ত মন লইয়া মানদা বাড়ী ফিরিলেন।

নন্দ পুকুরের পাড়ে নিজেদের বাড়ি গিয়া ডাকিল, ছোড়দি, এক কাপ্‌ চা দেনা, ভাই।

কমলিনী বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিল, তবু ভাল, আমাদের মনে পড়েছে।

নন্দ মনে মনে অপ্রস্তুত হইল ; পরক্ষণেই কিন্তু উত্তর করিল, বুঝেছিস্‌ ছোড়দি, কখনো ও' একজামিনের পাল্লায় পড়িস্‌ নি ...বুঝতিস্‌ একবার...যদি……

কমলিনীর হাসি কিন্তু ও-কথা বিশ্বাস করে না ; সে জানে যে জীবনের পরীক্ষা আরো কঠিনতর।

নন্দকে চা দিয়া কমলিনী তাহার কাছে বসিয়া একটু ঠাট্টা-তামাসা করিবার প্রয়াসই করিতেছিল। কমলিনী বলিতেছিল, বুঝেছি যে একজামিনের এমন তাড়া যে তোর বৌ'র কথা মনে পড়ে না ; কিন্তু আমার যে একজন সঙ্গী চাইরে নন্দ, সেদিক দিয়েও কি তোর একটু দয়া হয় না ?

নন্দ বলিল, বাঃ, আমি কি মানা করেছি ? তবে তোমরা দু'জনে এমন একটা হৈ চৈ ক'রে তুলেছ—যে আমার আর দিন কাট্‌চেনা ; ও-কথা কিন্তু ছোড়দি একটুও সত্যি নয়। যা সত্যি, তাই কেন তোমরা বল না। আমি একটুও আপত্তি ক্‌রবো না।……

কমলিনী কথার কোন উত্তর না দিয়া দোরের দিকে একাগ্রমনে কি দেখিতে লাগিল। নন্দ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, অমন ক'রে কি দেখিস্‌, ছোড়দি ?

কমলিনী খাটো গলায় বলিল, দেখ্‌ কে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ তোকে দেখে যেন লজ্জায় স'রে গেল, তাই ভাব্‌চি, কে ?

গিয়ে দেখে আয় না কেন।—বলিয়া নন্দ চা পানে মনোযোগ দিল।

কমলিনী গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, অবাক কল্লি শুভি, তুই ! তোর আবার এত লজ্জা হলো কবে থেকে লা ? এখন যে ?

শুভদা পুরাতন ঘি লইতে আসিয়াছিল। জমিদার বাড়িতে তাহার অফুরন্ত সংগ্রহ, সকলেই জানে।

কমলিনী ঘি দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সনাতন জেঠার বুকে ব্যথা, কাশি,—আর জ্বরও নাকি বেশী হ'য়েছে, তাই জেঠিমা ঘি চেয়ে পাঠিয়েছেন।……

নন্দ কোন কথার উত্তর দিল না।

৫

কমলিনী নন্দর কাছে আসিয়া বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শুভিকে নিয়ে ওদের ভাব্‌নার শেষ নেই। কিন্তু কি একগুঁয়ে মানুষ জেঠামহাশয়, সত্যি!

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

হঠাৎ কমলিনী বলিল, আচ্ছা নন্দ, একটা সত্যি কথা বল্‌বি ?

কি ?

বল্‌, তুই মনের কথা বল্‌বি ? নইলে বোল্‌বো না।

সে কথা জানি আমি, বলিয়া নন্দ হাসিতে লাগিল।

তবে বল্‌ না, আমার লক্ষ্মীটি,—বলিয়া কমলিনী আদর করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

নন্দ অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না। কিন্তু সে বুঝিল যে কমলিনী একটা উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া আছে। অবশেষে সে বলিল, অত সব আমি জানিনে ছোড়দি, তবে এইটুকু বল্‌তে পারি তোকে, যে ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

নিমেষে কমলিনীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

নন্দ আব্দার করিয়া বলিল, কিন্তু তুই একথা কাউকে জান্‌তে দিবিনে, বল্‌ ?

কমলিনী বলিল, দূর, আমি কি পাগল ?

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অলকা

(মেঘদূত)

ওগো জলধর, তোমারি মত সে শোভা অলকাপুরী,
বিদ্যুৎ সম ললিত ললনা শোভে তার বুক জুড়ি'!
ইন্দ্রচাপের মত বিরাজিছে চিত্র সৌধরাশি,
মেঘবারি সম স্বচ্ছ মাণিক ওঠে সেথা পরকাশি'!
প্রাসাদকক্ষে সঙ্গীতধ্বনি মেঘমুরজ সম,
আকাশচুম্বী অভ্রেরি মত সে পুরী তুঙ্গতর!

সেথা, নারীর হস্তে লীলাউৎপল,—চিকুরে কুন্দফুল,
কর্ণে তাদের শোভে নিরুপম শিরীষ-কুসুম-দুল!
আনন তাহারা করিছে শুভ্র লোধ্ররেণুকা মাখি',
মাধবীবনের নব কুরুবকে চূড়াপাশ দেছে ঢাকি'!
সীঁথিসীমন্ত সাজায়েছে বালা হেমকদম্ব দিয়া,
প্রিয়ের সঙ্গে বিহার করিছে সেথায় যক্ষপ্রিয়া!

তরুরাজি সদা পুষ্পফুল—মদবিহ্বল অলি!
মধুগুঞ্জনে নিত্য রহিছে মুখর বনস্থলী,
সেই অলকার সরোরুহে সদা কমল র'য়েছে ফুটে,'
মেখলার মত চারুচঞ্চল মরাল যেতেছে ছুটে'!
মনোরম সেথা ময়ূরকলাপ,—পোষা ময়ূরের কেকা,—
তিমিরবিহীন যামিনী জুড়িয়া জ্যোৎস্না দিতেছে দেখা!

অশ্রু সেথায় ঝরে আনন্দে, নাহি ক' বিষাদভার,
মদনশরের দাহন ব্যতীত পীড়ন নাহি রে আর!
প্রণয়-কলহ ব্যতীত সেথায় বিরহ কভু না ঘটে,
সেই সে সুদূর কামনার পুর—কল্পলোকের তটে!
জরার প্রহারে অঙ্গ কখনো জর্জর নাহি হয়,—
নরনারী সেথা প্রমোদমুখর—চিরযৌবনময়!

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত।

বার্ণার্ড শ

সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার এ বৎসর জর্জ্জ বার্ণার্ড শ পেয়েছেন। শুধু বার্ণার্ড শ বা 'জি, বি, এস' নামেই তিনি সুপরিচিত। এ সংবাদ পুরণো, এবং এই পারিতোষিকে তিনি ইঙ্গ-সুইডিস সাহিত্যের প্রচারের দ্বারা যে দু'দেশের মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ়তর করবার ইচ্ছা করেছেন,—(যেহেতু ইতিপূর্ব্বেই অর্থ ও যশ দুইই তিনি এত পেয়েছেন যে তাঁর আত্মার তাতে সুস্থ থাকাই দায়)—এ সব সংবাদও পুরণো হয়ে গেছে। নোবেল পুরস্কার সাহিত্য-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ সম্মান; কিন্তু ঐ পুরস্কার কোনো কোনো সাহিত্যিককে দিয়ে নোবেল পুরস্কারের যশ বেড়েছে আরো বেশী। তেমনিতর সাহিত্যিক—রবীন্দ্রনাথ, আনাতোল ফ্রাঁস, আদি।—যদি যশ ও খ্যাতির দিক দিয়ে দেখতে হয় তবে বার্ণার্ড শ'কে এই সাহিত্য মহারথীদের সঙ্গে একত্রিত করে নোবেল কমিটি শ'র পৃথিবীজোড়া নামকে নূতন-কিছু যেমন দেন নি।

যে-কোনো কারণেই হোক ইংরেজীতে যাঁরা রচনা করছেন, সে-সব জীবন্ত লেখকদের মধ্যে সুয়েজ খালের এ পারে বার্ণার্ড শ সমধিক পরিচিত। অথচ, জাতে তিনি আইরিশ। এর পূর্ব্ব বৎসরও সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার আর একটি আইরিশ পেয়েছেন,—নাট্যকবি ইয়েট্স্। তাই ইংরেজ নাকি খুশী হতে পারছেন না। শ'কে যে ইংরেজ ভাল চোখে দেখেন না, তাঁর সপ্ততিতম জন্ম দিবসে তাঁর বক্তৃতাকে রেডিও-যোগে ছড়াবার নিষেধাজ্ঞা থেকেই সে প্রমাণ ইংরেজ সরকার দিয়েছেন। ঠিক তখনি আবার জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্রসচিব হার্ ষ্ট্রেসম্যান তাঁকে অভিনন্দিত করছিলেন। অথচ, প্রথম যৌবন থেকেই শ দেশ-ছাড়া, ইংলণ্ডে আছেন, তাঁর সমস্যা নিয়েই ব্যাপৃত।

শ'র মা ইংলণ্ডে ছিলেন সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী। তাঁরই আশ্রয়ের উপর শ দেশ ছাড়েন, এবং অনেক দিন অনেক কিছুতে হাত দিয়েও নিজের জীবনের সংস্থান করতে পারেন নি। কিন্তু, উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন কলাজ্ঞান, এবং ভাসতে ভাসতে শেষ তিনি সঙ্গীত ও নাট্যকলার সমালোচনা নিয়ে 'সাটারডে রিভিউ' প্রভৃতি সাপ্তাহিকে পৌঁছে নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

পরবর্ত্তী কালে যাকে 'Shawism বা শ-পনা' বলে আমরা চিনি,—সৃষ্টিছাড়া মত, সৃষ্টিছাড়া ধারণা, অদ্ভুত রচনা-নীতি—সে সব এই কালের সংগৃহীত রচনা Dramatic opinions-এর দুই খণ্ডেও আমরা দেখতে পাই। অধিকন্তু নিছক নাট্য-সমালোচনার দিক থেকেও আমরা অত্যন্ত সারবান্ অনেক কিছু পেয়ে কৃতার্থ হই। বাংলা নাট্যমঞ্চেও অনেক রস-পিপাসু দর্শন দিয়েছেন, রূপদক্ষ হয়ে বা রূপ-রসিক হয়ে, বার্ণার্ড শর নাট্য-সমালোচনা পাঠে তাঁরা সকলেই কিছু না কিছু উপকৃত হবেন—অন্ততঃ, আনন্দিত ত হবেনই।

নাট্য-সমালোচক একদিন নাট্যকার হ'য়ে দেখা দিলেন। ঔপন্যাসিক হবার ব্যর্থ-প্রয়াসে তিনি বুঝেছিলেন যে, উপন্যাস তাঁর হাত থেকে ঠিক বেরুবে না,—কিন্তু একদিন নাটক রচনা তাঁর

পক্ষে অসম্ভব নাও হ'তে পারে। উইলিয়ম আর্চারের নাম ইংলণ্ডের নাট্যজগতে ইবসেনের পরিচায়ক হিসাবে চিরদিন থাকবে। আর্চার নাটকের মর্ম্ম বুঝতেন চমৎকার, তাই নাটকের গঠন-প্রণালী তাঁর করায়ত্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কথাবার্ত্তা লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত। তাই, বার্ণার্ড শর সহায়ে নাটকের কথাবার্ত্তার অংশ লিখিয়ে একখানা সুগঠিত নাটক রচনার সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন। এই দুটি মন সমান ছন্দে চলবার মত নয়, আর্চারের উপদেশ ও উদ্দেশ্যকে ভেঙে বার্ণার্ড শ'র বস্তুনিষ্ঠ মন প্রচলিত কতকগুলি অন্যায়ের মুখ থেকে মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দেখাতে গেল যে 'বস্তীর' জীবন কি নিদারুণ এবং এই বস্তী-প্রথার গলদ কোথায়।

এ' নাটক দু' অঙ্কের বেশী অগ্রসর হতে-না-হতেই আর্চার বিদায় নিলেন। সাত বৎসরের মত শ-ও নির্ব্বাক হলেন। সাত বৎসর পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর ও তাঁর মতাবলম্বী বন্ধুদের চেষ্টায় ইংরেজ-রঙ্গমঞ্চে নব-বিধানের সূচনা হচ্ছে,—যে ধারা নরওয়ের বুকে ইব্‌সেন উৎসারিত করেছিলেন, তাকেই ইংরেজ শ্রোতৃসমাজের পুঞ্জীভূত প্রচলিত সংস্কারের প্রস্তর-বন্ধন থেকে মুক্ত করে 'নিউ থিয়েটারে' নবরূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে,—তখন এই নব-নাট্যরসের অন্যতম পীঠস্থান 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটারের' নাটকের অভাব ঘুচাতে তার অধিকারীর কাছে শ এই অসমাপ্ত নাটকখানা নিয়ে উপস্থিত হলেন। নূতন একটি অঙ্ক যোগ করে নাটকখানা সম্পূর্ণ করা হল, নাম দিলেন Widower's Houses (বিপত্নীকের গৃহ)—বাইবেলের ওই কথা কয়টিকে ব্যঙ্গ করে। শ'র নাম রটে গেল—অখ্যাতিতে। যে সৌখীন স্বাধীনজীবী ভদ্রলোকেরা বাড়ীওয়ালাদের সখ-মাফিক গাল. দিয়ে মনে মনে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করতেন, শ দেখিয়ে দিলেন বাড়ীর অমানুষিক জীবনেরই জন্য নিজেদের অনায়াস জীবন ও বিলাসিতা পেয়ে পরোক্ষভাবে এই বস্তী-প্রথাকে তাঁরা চিরস্থায়ী করছেন। বলাবাহুল্য, এই নূতন আলোটা কারুর কাছে উপভোগ্য হল না, কারণ, এ যেমনি রূঢ়, তেমনি সত্য, তার উপরে এর থেকে শ'র ঝাঁঝাল' বিদ্রূপ ও ধারাল' প্যারাডক্স এমনি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে এর থেকে চোখ বুঁজলেও রক্ষা নেই। ফলে, নাটকখানা খুব চলল। বার্ণার্ড শ'র নাট্যকার জীবনের এই সূচনা। ১৮৯৩-তে The Philanderer (নাগর) রচিত হল---সেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটারের জন্য; কিন্তু, বার্ণার্ড শ বুঝেছিলেন যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এ অভিনীত হওয়া দুঃসাধ্য। বিবাহ বন্ধনের সঙ্গে নরনারীর যৌন-লীলার কি সম্বন্ধ, উদ্বাহ-বিমুখ সৌখীন নাগরালির চাতুরী ও উদ্বাহাকাঙ্ক্ষিণীর বিসদৃশ অবস্থা, শ এ নাটকে চার অঙ্কে বিবৃত করেছেন, এবং বলা বাহুল্য তাতে তিনি প্রচলিত ভদ্র নীতি ও ভদ্র রুচির সমস্ত নিয়মকেই অবজ্ঞা করেছেন। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটারকে তিনি তাই নূতন আর একখানা নাটক লিখে দিলেন,—Mrs. Warren's Profession—(মিসেস ওয়ারেনের ব্যবসা)। মিসেস্ ওয়ারেন রূপোপজীবিনী, নারীত্বের বিনিময়ে আপনার জীবিকার সংস্থান করছে, কেননা, অন্যভাবে নারীর জীবিকা-নির্ব্বাহ সহজও নয়, সুবিধারও নয়। পবিত্রতাকে জীবনে বরণ করলে তার এইরূপ বিলাস-বহুল জীবন-যাত্রা ত দূরের কথা, মনুষ্যোচিত আহার-

বিহারের পথও সহজ হত না। শ বলতে চাইলেন, যতদিন সমাজ আপনার অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা এমনিভাবে পরিবর্তন করছে না, যাতে পরিমিত পরিশ্রমের বিনিময়ে নারী মনুষ্যোচিত ভরণপোষণের উপযোগী বেতন পাবেন, ততদিন মিসেস ওয়ারেনদের ব্যবসাও এমনি চলবে। বলা-বাহুল্য, এই কথাটাও যে প্রচলিত নীতি-শাস্ত্র মানবে না তা নিঃসন্দেহ; এবং ঐ কারণে সরকারী 'সেন্সর' (পরীক্ষক) ওকে সাধারণ রঙ্গাগারের অনুপযোগী বলে সিদ্ধান্ত করে দিলেন। ফলে, রঙ্গালয়ে এ নাটকখানা আশ্রয় না পেয়ে ব্যক্তিবিশেষের আলয়ে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের নিকট প্রশ্রয় পেল। অবশ্য নানা আপত্তি সত্ত্বেও আমেরিকায় এ নাটক চল্‌ল।

অ্যাভিনিউ থিয়েটার হস্তান্তরিত হলে (১৮৯৪) তার নূতন অধিকারী নূতন নাট্যকার শ'কে তাড়া দিলেন। ফলে, 'Arms and the Man' নামীয় ব্যঙ্গ-নাট্যের সৃষ্টি। ভার্জিলের মহাকাব্যের এই আদি শব্দ দুটি মহাযুদ্ধের যে রূপটিকে প্রত্যক্ষ করে তোলে মূঢ় মানবের চিত্তের কাছে, তার সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে তার বাস্তব স্বরূপটা দেখানোই বার্ণার্ড শ'র উদ্দেশ্য। যুদ্ধ এবং সৈনিক বৃত্তি নিয়ে মানুষের মন যত রোমান্স গড়ে সে সব মিথ্যা,—সৈনিক সাধারণ মানুষই,—নিতান্ত ভীরু হলেও বিপদের মুখে 'মরিয়া' হয়ে অসাধারণ অসমসাহসিক বীরত্ব দেখায় মাত্র;—অথচ, এই রোমান্সের মোহে মানুষ দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা, জিঘাংসা, পীড়া, মহামারী, দুর্ভিক্ষ আদি যুদ্ধের শত কদাকার বাহনদের চিরদিন সমর্থন করছে। এর পরেরই রচনা Candida (কেণ্ডিডা)—নব খৃষ্টীয় ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষাপটের উপরে। তরুণ কবি যৌবন-প্রান্তবর্ত্তিনী রূপসী ও বুদ্ধিমতী কেণ্ডিডাকে প্রেম নিবেদন করছেন,—তাঁর খৃষ্টভক্ত স্বামী অপেক্ষায় আছেন কেণ্ডিডা কাকে বরণ করবেন। কেণ্ডিডা তাঁর স্বামীকেই গ্রহণ করলেন, কেননা, তিনি দুর্ব্বল, স্নেহ ও মমতা নইলে তার চলে না। প্রেমোন্মত্ত ভাব-বিলাসী কবিকে শুধু মনে মনে জপ করতে বললেন দুটি অতি সুন্দর সাদা কথা, "When I am thirty she will be forty-five, when I am sixty, she will be seventy five." রোমান্স ও ভাববিলাসকে শ নিতান্ত বোকামি বলেই মনে করেন। কেণ্ডিডা অভিনীত হয় একটু দেরীতে, কিন্তু ইতিমধ্যে The Man of Destiny ('ভাগ্যবান্ পুরুষ') নামে নেপোলিয়নকে কেন্দ্র করে এমনি আর একখানা নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। যে নেপোলিয়নের শৌর্য্য ও বীরত্ব একটা রূপকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে বার্ণার্ড শ'র সাদা চোখে তিনি নিতান্তই সাদা মানুষ,—মানুষের কল্পনা-জল্পনা তাঁকে নিরর্থক এতটা অসাধারণ ও অলৌকিক করেছে। এ হচ্ছে শ'র 'মূর্ত্তি-ভাঙারে' একটি সুন্দর নিদর্শন। এখানকার নেপোলিয়ন সুচতুর, কামানের শক্তি তিনি য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম বুঝেছেন, যুদ্ধ-স্থানের দেশটার মানচিত্র তাঁর করতলগত, সময় জিনিষটার মূল্য বুঝেন তিনি অসাধারণ রকম, কিন্তু যেমন কোনো অন্ধ, কল্পনায় মুগ্ধ হন না, তেমনি নিজের ভাগ্যকে খুঁজে বরণ করবার মত সাহসও তাঁর প্রচুর। 'You never can tell'—('বলা যায় না') . এ সময়কার এইরূপ আর একখানা রচনা।

বলতে গেলে শ'র জীবনের এক অধ্যায় এখানে শেষ হয়।—১৮৯৮তে তিনি দু' খণ্ডে তাঁর নাটক প্রকাশিত করলেন—Plays Pleasant and Unpleasant ('নাট্যাবলী—কড়ি কামল')। Widowers' Houses, The Philander, Mrs. Warren's Professionকে তিনি 'কড়ি' বলতে চান, কেননা, সমস্ত সমাজকে তিনি ওই সব নাটকের সমস্যা নিয়ে তীব্র কশাঘাত করেছেন, যেহেতু ব্যক্তিমাত্রেরই অবহিত না হলে এ সব অন্যায় দূর হবে না। 'Arms and the Man' থেকে 'You never can tell' পর্য্যন্ত রচিত নাটক চারখানাকে তিনি 'কোমল' নাম দিয়েছেন, কারণ তাতে সমাজের পাপ চিত্রিত হয় নি; তার "romantic follies and the struggle of individuals against those follies" ভাব-বিলাসী ও কল্পনা-প্রবণদের বোকামি নিয়ে তিনি রঙ্গ করেছেন।

তারপর থেকে বার্ণার্ড শ'র নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। তিনি নব-নব সৃষ্টিতে ইংরেজী নাট্য-রসিকদের আনন্দ ও ইংরেজী সমাজকে সবিদ্রূপ পরিহাস বিলিয়ে দিলেন। 'There Plays for Puritans'-এ ধার্ম্মিকতা ও গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে তিনখানা নাটক একত্র সংবদ্ধ করা হয়—The Devil's Disciple (সয়তানের চ্যালা), Caesar and Cleopetra (সীজার ও ক্লিওপেত্রা), এবং Captain Brassbound's Conversion (কাপ্তেন ব্রাস্‌বাউণ্ডের পরিবর্ত্তন)। এই খণ্ডের ভূমিকায় শ পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন তিনি পিউরিটান্ বা ধর্ম্মধ্বজদের এই নাটকে উদ্দিষ্ট কেন করছেন। কিন্তু, এ খণ্ডের সব চেয়ে উপভোগ্য এবং সব চেয়ে উপাদেয় গ্রন্থ হচ্ছে 'সীজার ও ক্লিওপেত্রা'। ও নাটকের ভূমিকায় সেক্সপিয়রের 'আণ্টনি ও ক্লিওপেত্রা' নাটকের ক্লিওপেত্রার চিত্রকে মূল করে তিনি সেক্সপিয়রের প্রতিভাকে যেরূপভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাঁর অসীম সাহসিকতায় আমরা চমকিত হই। মানব-মনের বিচিত্র অলি-গলির সন্ধান থাকলেও সেক্সপিয়র ইতর সাধারণের ভ্রূকুটি ও অজ্ঞতা-জাত অবহেলার ভয়ে তাঁর নাট্যসমূহে সে-সব অলি-গলির নক্সা দেন নি—সেক্সপীয়র "left no intellectually coherent drama, and could not afford to pursue a genuinely scientific method in his studies of character and society"—এমনিতর দুঃসাহসিক কথাকে কয়জন বরদাস্ত করতে পারেন? শ'র মৌলিকতা স্বীকার্য্য; এও ঠিক যে শ'র দিক থেকে দেখলে হয়ত বোধ হবে যে মনস্তত্ত্বের প্রচলিত-বুলিগুলিকেই মহাকবি রূপ দিয়েছেন, মনস্তত্ত্বের সত্যগুলি এই সব বুলির থেকে এতই বিভিন্ন, যে তা অস্বীকার করবার মত সাহসও তাঁর ছিল না। কিন্তু, শ'র দিকই সত্যকার দিক কিনা তার স্থিরতা কি? তথাপি, স্বীকার করতে হবে কিশোরী চপলা ক্লিওপেত্রার যৌবন-উন্মেষ-ক্ষণে বিগত-যৌবন বিরল-কেশ সীজারের সহিত লীলা-চপল প্রেমাভিনয়ের চিত্র শ' সত্যই অপূর্ব্ব তুলিকাপাতে এঁকেছেন। ক্লিওপেত্রা ও সীজার দু'টি চিত্রই 'শেভিয়ান্' মনের ছায়ায় রঞ্জিত, কিন্তু, সে ছায়া তাঁদের মলিন করে নি—তাঁদের বিচিত্র, তাঁদের অভিনব সুন্দর করেছে।

'Man and Superman' (মানুষ ও অতিমানুষ) শ'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। ওর দীর্ঘ-

ভূমিকায়—Epistle Dedicatory to Arthur Bingham Walkley—তিনি ওর তথ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ওর পিছনের The Revolutionists' Handbook ও Maxims for Revolutionists এ তিনি নিজের মত যেমন বাছা-বাছা বাক্যে দাঁড় করেছেন, প্রচলিত বিধিনিয়মকে তেমনি বাছা-বাছা কথার হুলে বিদ্ধ করেছেন। এই নাটকের তিন অঙ্ক ধরে নায়িকা অ্যানা রহস্যময় সৃষ্টি-প্রবাহের নিগূঢ় সত্তার তাগিদে মনীষী নায়ক টেনারকে আপনার জালে আবদ্ধ করবার জন্য ছুটে ছুটে শেষটা সফল-কাম হলেন। তারপর, চতুর্থ অঙ্কে হঠাৎ যবনিকা উঠে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মাঝখানে অ্যানা ও টেনারের আত্মার বিচারাভিনয় নিয়ে—প্রকৃতির কবলে পুরুষ কেমন করে মোহান্ধ হয়ে আপনার অতিমানবীয় মেধা ও প্রতিভাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্ভাব্যতাকে পরাস্ত করেছেন, তারই কথা এখানে। এ দৃশ্য যেমনি মৌলিক তেমনি অপূর্ব্ব, শ'র মতবাদের এবং কৃতিত্বের একটি বিশেষ নিদর্শন।

John Bull's Other Island বিশেষ উল্লেখযোগ্য ;—কেননা, আয়র্লণ্ডের সন্তান এখানে আয়র্লণ্ড নিয়ে নাট্য-রচনা করছেন। এ নাটক ইয়েটস্-এর বিশেষ অনুরোধে নবপ্রতিষ্ঠিত 'আইরিশ্ থিয়েটার সমাজের' আওতায় অভিনীত হবে আইরিশ নর-নারীর কাছে, এরূপ কথা ছিল। কিন্তু, ইয়েটস্-এর আয়র্লণ্ড, বার্ণার্ড শ'র আয়র্লণ্ড নয় ;—একজনার কাছে সে ছায়ালোকের Archulin—আর একজনার কাছে সে নিতান্ত কায়ালোকের Ireland. তাই, ইয়েটস্ বিদায় নিলে ওর অভিনয় হল ইংরেজ দর্শকদের সমক্ষে। বলা বাহুল্য, নায়ক টম্ ব্রড্‌বেণ্টের স্বদেশীয়েরা খুব খুসী হলেন,—কারণ আইরিশ ডয়লিকে তারা না বুঝেই উপহাসাস্পদ ও নিতান্ত কৃপার পাত্র ঠাউরালেন। অথচ শ'র মতে আইরিশ ডয়লির "freedom from illusion, the powers of facing facts, the nervous industry, the sharpened wits, the sensitive pride of the imaginative man who has fought his way up through social persecution and poverty" ইত্যাদি বহু শক্তি আছে যা ব্রডবেণ্টের নেই। তথাপি, সে এসব সত্ত্বেও ব্রড্‌বেণ্ট সর্ব্বত্র জয়ী হচ্ছেন—এমন কি ডয়লির আশৈশব বান্ধবী ও প্রেমিকা তরুণী নোরার পানিগ্রহণে পর্য্যন্ত তিনিই সমর্থ হলেন, তার কারণ, ডয়লির কথায় "Nora, dear, don't you understand that I am an Irishman and he's an Englishman. He wants you ; and grabs you. I want you ; and I quarrel with you and have to go on wanting you." আইরিশ মনের এ বিচিত্র গতিকে চিত্রিত করে শ' হোম্ রুলের জন্য ভূমিকায় এক পরম যুক্তিপূর্ণ দাবী উপস্থিত করেছেন—কারণ, "Nationalism stands between Ireland and the light of the world" এবং "There is indeed no greater curse to a nation than a nationalist movement, which is only the agonizing symptom of a suppressed natural function." এরই জন্য আয়র্লণ্ড অগ্রসর হতে পারছে না এক পাও—যদিও তার জল

বাতাস ও তার আর্থিক আব্‌হাওয়া আইরিশদের সূক্ষ্ম কল্পনাবৃত্তির এবং তীক্ষ্ণ বস্তু-জ্ঞান বিকাশের পরম সহায়ক। এবং এই কারণেই English stupidity সত্ত্বেও ইংরেজ সেখানে The conquering Englishman. আমরা যাঁরা আজ নিজেদের অনেকাংশে সে-সময়কার আইরিশদের মত ভাগ্যহীন বলে মনে করি,—যাঁদের রাষ্ট্রীয় দৈন্য আজ মনুষ্যত্বের প্রেয় অনেক-কিছু হতেই আমাদের বঞ্চিত রাখছে, যাঁরা ঐ একই কারণে দুনিয়ার পিছনে পড়ে,—যাঁরা স্বরাজকে birth right বলে দাবী করছে, খুব সম্ভব মনোজগতের দিক দিয়েও আমরা,—অন্ততঃ বাঙালীরা—সেই আইরিশদেরই অনুরূপ,—মেধাবী, বুদ্ধিমান্, বিচারবান্, কল্পনা-কুশল। শ' তাঁর স্বজাতিকে যা বলতে চেয়েছেন, তা আমাদের পক্ষে কতটা খাটে, তা একবার ভেবে দেখলে চিন্তাশীল বাঙালী মাত্রই উপকৃত হবেন।

'Major Barbara' এই খণ্ডের তিনটির শেষ নাটক। 'মুক্তিফৌজের' পরমোৎসাহশীলা দারিদ্র্যব্রতধারিণী প্রচারিকা বার্বারা দেখলেন যে দৈন্য-পীড়িত আত্মার মুক্তির জন্যও টাকা আসে, বিরাট অস্ত্র কারখানার অধিকারী তাঁর কোটিপতি পিতা Andrew Undershaft এর থেকে। মুক্তিফৌজ থেকে বিদায় নিলেন বার্বারা; ধীরে ধীরে বুঝলেন যে অর্থই পরমার্থ সাধনার ও একমাত্র পথ। তাই তাঁর প্রেমাস্পদ ও বাগ্‌দত্ত স্বামী কুজিনকে নিয়ে তিনি সেই অস্ত্র কারখানাটা দখল করে 'Gospel of Andrew Undershaft'কে মেনে নিলেন। সে Gospel হচ্ছে এই "that the greatest evils and the worst of crimes i.e. poverty, and that our first duty—a duty to which every others consideration should be sacrificed—is not to be poor." এণ্ড্রু হচ্ছেন ক্রুপের মত মৃত্যুর দূত, Prince of Darkness,—সহস্র সহস্র লোককে তিনি খাটিয়ে স্বচ্ছন্দে আহারের সংস্থান দিচ্ছেন,—অথচ যাঁকে সেই সহস্র সহস্র শ্রমিক নিদারুণ ঈর্ষা করে তাঁদের শ্রম-ফলের ভোক্তা বলে।—বার্বারা দেখছেন "Turning our backs on Bodger and Undershaft is turning our backs on life"—আর জীবনের কোনো dark side নেই—তা অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য,—আবদ্ধ মানবাত্মার মুক্তির পক্ষে তাঁর পিতার বড় কারখানাই ত' একটা বিরাট আয়োজন। এ্যাণ্ড্রু আণ্ডারশেফ্‌টের এই শাস্ত্রটা নিতান্তই ম্যামনের শাস্ত্র নয়।

'Androcles and the Lion'এ (অ্যাণ্ড্রোক্লিস ও সিংহে) পুরাতন আখ্যায়িকাটিকে শ' যে কৌতুককর ও কৌতূহলপূর্ণ নূতন মূর্ত্তি দিয়েছেন তা দেখবার মত। ওই খণ্ডের Pygmilion-এ নিছক ব্যঙ্গ চলেছে নাট্যকার ও আর-আর শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে।

'Back to Methuselah'য় (মেথুসেলার পুনরাবর্ত্তন) শ' অভিব্যক্তিবাদকে নিয়ে একাধারে নিজের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইকেই মিশিয়ে এক অপূর্ব্ব নাট্য সৃষ্টি করেছেন। 'Man and Superman' তাঁর অতি-মানব সম্পর্কে বিশ্বাসের একটা সাক্ষ্য, কিন্তু, এই নূতন নাটকখানায় এসে দেখি যে সে বিশ্বাস পরিমিত কোনো অসম্ভবকেই উৎসাহের সঙ্গে সম্ভব বলে কল্পনা করেন না। এই নাটক শ'র সভ্যতার ইতিহাস,—আদমের কাল থেকে, মেথুসেলার মধ্য দিয়ে বর্ত্তমান অতিক্রম

করে, ভাবী কালে (as far thought can reach) জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষ যেখানে পৌঁছ'বে সেখানে আবার তাঁর আয়ু হবে দশহাজার বৎসর। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে এই যে সব কল্পনা করছে শ' যে এখানকার উদ্ভট আজগুবি চিত্রের মধ্যে তাকে ব্যঙ্গ করেছেন এ সত্য; তেমনি এমনও মনে হয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্পনাতীত প্রসারের সঙ্গে মানব-সভ্যতার প্রগতি কোনও আশ্চর্য্য লোকে গিয়ে ঠেকবে' এরূপ একটা বিশ্বাসও তাঁর মনের তলায় হয়ত আছে। মোটের উপর 'Back to Methuselah'র সঙ্গে Man and Superman মিলিয়ে পড়লে তাঁর একদিক ঠিক বুঝতে পারা যায়।

শ'র আধুনিকতম নাটক তাঁর Saint Joan (তাপসী জোহান্) —ছয় অঙ্ক ও একটি পরিশিষ্ট অঙ্কে এই ঐতিহাসিক নাট্য সমাপ্ত হয়েছে। জোহান্ ড' আর্ক-এর নাম সুপরিচিত।—জোহান্ পবিত্র-প্রাণা ফরাসী কিশোরী। তিনি দেবদূতদের 'আদেশে' স্বদেশ থেকে বিদেশী ইংরেজদের তাড়িয়ে স্বদেশী রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নিলেন, ইংরাজদের অনেক যুদ্ধে সৈনিক বেশে নেতৃত্ব করে পরাস্ত করলেন, অকর্ম্মণ্য চার্লসকে অভিষিক্ত করলেন, শেষটা বন্দী হয়ে পাদ্রীদের বিচারে ধর্ম্ম-বিদ্রোহী বলে সাব্যস্ত হলেন এবং ইংরেজের হাতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেলেন। এই বালিকাকে ফরাসী জাতি পূজা করেছে অনেকদিন, আবার কেউ-কেউ তাঁর আদেশ এবং দিব্য-দর্শন আদির কথা নিয়ে তাকে ভণ্ড বলেছেন। কিন্তু এবারকার যুদ্ধান্তে হঠাৎ যে চর্চ্চের কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা দেন, ১৯২০তে সেই ক্যাথোলিক চর্চ্চই তাঁকে তাপসীর পদে উন্নীত করলে শ এই নাটকখানা লিখে তাঁর সমস্ত জীবনের স্বাভাবিকতাই প্রমাণ করতে বসলেন। যে মেয়ে বিদেশীর অত্যাচারে হঠাৎ দীপ্ত হয়ে উঠেছে,—তরুণী, অতিমাত্রায় ভাবাবেগে কল্পনা যাঁর ছুটে চলেছে—তাঁর পক্ষে দেবদূত দেখা ও তাদের আদেশ শোনা (অবশ্যই তাঁর কল্পনার সৃষ্টি) কি অসম্ভব? এমনি উদ্দীপ্তা কিশোরী যে নিরাশ ফরাসী সৈন্যের বুকে উৎসাহের আগুন ধরিয়ে দিতে পারেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও অনুচরদের জয়ধ্বনিতে উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়ী হবেন, তাই বা কি অস্বাভাবিক? এমনি করে, একদিন বন্দী হলে মৃত্যুর সামনে হঠাৎ তাঁর আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যাদেশ প্রভৃতি অস্বীকার করাও যেমন সম্ভব, মৃত্যু অনিবার্য্য দেখলে সেই প্রত্যাদেশে পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশও তেমনি সম্ভব। এইরূপ যুক্তি ও বিচারের সঙ্গে বার্ণার্ড শ এই বালিকার বিস্ময়াবহ জীবনকে এমনি একটা সহজ সরলতা ও স্বাভাবিকতার আকার দিয়েছেন যে তাঁর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যনিষ্ঠা এবং তাঁর শিল্পশক্তির এই চরম বিকাশ আমাদের চারিদিকে এক অপূর্ব্ব রমণীয় আনন্দলোকের সৃষ্টি করে। পরিশিষ্ট অঙ্কটিতে আমরা হঠাৎ এক রহস্যলোকের মধ্যে (তুল Man and Superman পঞ্চমাঙ্ক) দেখি বিস্ময়-বিমূঢ় জোহান্ শুনছেন তিনি তাপসী '—নগণ্য বালিকা, সে তাপসী !—সেকালের পাদ্রী তাঁর পদতলে তাঁর পবিত্রতার জয় ঘোষণা করছেন, সেনাপতি তাঁকে সৈনিকের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বরণ করছেন, রাজাও তাঁকে সমস্ত রাজার

প্রণতি জানাচ্ছেন, ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ তার কৃপা স্মরণ করছেন, স্বয়ং রাজা তাঁর পদতলে তাঁর যশোগান করছেন। বিস্মিতা জোহান্ বলে উঠলেন,

'Woe unto me when all men praise me! I bid you remember that I am a saint, and that saints can work miracles. And now tell me: shall I rise from the dead and come back to you a living woman?"

সমস্ত উল্টে গেল অন্ধকার ঘিরে এল, জোহান্ আবার বল্লেন,

"What? must I burn again? Are none of you ready to receive me?"

সবাই একে একে বিদায় নিলেন!—পাদ্রী রাজী নন,—ধর্মদ্রোহীর মরাই ভালো, জীবন্ত থাকলে সাধারণ মানুষের চোখ তাঁদের সম্পর্কে ভুল করবেই। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ বলছেন, পোলিটিক্যাল প্রয়োজনে এখনো তাঁদের পূর্ব্ব কাজের পুনরভিনয় করতে হতে পারে। বিচারপতি বলছেন, পুনর্বিচারে তার পূর্ব্বকার শাস্তিরই ব্যবস্থা হবে।—একা একা দাঁড়িয়ে জোহান্ বল্লেন—

"O God that madest this beautiful earth, when will it be ready to receive Thy Saints? How long, O Lord, how long?" নাট্যকার অন্তর থেকে সমগ্র মানবের কল্যাণকামী বার্ণার্ড শ' মানবের সমস্ত অকল্যাণে ব্যথিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন,—'কবে? কবে?' কল্পনার কাজলে তাঁর চোখ তিনি শীতল করেন না, হৃদয়াবেগে রূঢ় সত্যকে রঞ্জিত করে তিনি মিথ্যা সান্ত্বনা খুঁজেন   সস্তা আদর্শবাদের ধোঁয়ায় তিনি স্পষ্ট সত্যকে ধোঁয়াটে অস্পষ্ট করতে নারাজ।

'Saint Joan এ এমন কিছুরই নড়-চড় নেই; বরং এই সঙ্গে যোগ হয়েছে একদিকে সুস্থ সবল কল্পনা যা পঞ্চদশ শতাব্দিকে জীবন্ত করেছে আমাদের নিকটে অথচ তাকে অবাস্তব করে নি, —অপরদিকে মানব-সমাজের অর্থহীন আচরণে বেদনা নাট্যকারের বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ের অতি ক্ষীণ করুণ ক্রন্দন যা এই নাটকের পরিশিষ্টাংশে এমন কোমল সুকুমার হয়ে বাঁশিটির মত বাজছে। তাই Saint Joan বার্ণার্ড শ'র শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নটরাজের পায়ে।

(২)

বার্ণার্ড শ'র নাটক পড়ে আমাদের মনে যে রসটা সর্ব্বাগ্রে জাগে এবং সর্ব্বশেষেও থাকে, সে হচ্ছে 'অদ্ভুত রস'। তাঁর ভাব ও ভঙ্গী, তাঁর নীতি (philosophy) ও রীতি (style) ও সবই একটা অভিনব এবং একটা অভাবনীয় যে সমস্ত ভূতপূর্ব্ব এবং সমস্ত 'সচরাচরতা' তাঁর নাগাল পায় না, —এমন কি তাঁর সন্ধান-ও পায় না। যদি কেউ তাঁর সম্বন্ধে কিছু না জেনে হঠাৎ তাঁর কোন একখানা নাটক নিয়ে বসে যান, তা হলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সন্দেহ হবে যে হয় তাঁর নিজের মাথা বিগড়ে গেছে, নয় নাট্যকারেরই মাথা বিগড়ে আছে। অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে 'Misalliance' প্রভৃতি অনেক নাটকের মাথামুণ্ড' কিছুই নেই। এই জন্যই জীবনে অনেকদিন অনেক রকমের নিন্দা

তাঁকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে, এবং যাঁরা তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের কাছ থেকে ওরূপ নিন্দালাভ এখনো তাঁর ভাগ্যে অনিবার্য্য।

শ'কে বুঝবার পক্ষে প্রধান সহায় অবশ্য তিনি নিজে।—তাঁর নিজের নাটক ও উপন্যাসগুলি ছাড়া যে-সব লেখা আছে সে-সবের সঙ্গে কতকটা জানা-জানি হলে আর তাঁর প্রতিভাকে চেনা শক্ত হয় না। এ-সব লেখা তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত,—তাঁর রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক রচনা সমূহ—'ফ্যাবিয়ান্ সোসাইটির' খ্যাতনামা ধীরপন্থী সমূহ-তন্ত্রী মনীষীদের (যেমন এইচ্., জি ওয়েলস্, সিড্‌নি ওয়েব্ ও তাঁর পত্নী ও এককালে মিসেস্ বেসাণ্ট প্রভৃতি) সঙ্গে মিলিত হয়ে সমূহ-তন্ত্রের আদর্শ প্রচারের জন্য এসব লেখা। বার্ণার্ড-শ এক কালে এই মতবাদের জন্য খুব বক্তৃতাদিও করতেন। তখনো সমূহ-তন্ত্রের এতটা চল হয় নি। বার্ণার্ড শ'র সমস্ত নাটকের মধ্য দিয়ে এই সব উঁকি মারছে—Widowers' Houses থেকে Saint Joan পর্য্যন্ত কোন নাটকই এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। শ'র নিজস্ব রচনা-ভঙ্গী এদের একটি আকর্ষণ। দ্বিতীয়ত, তাঁর আর্ট বা কলা-সমালোচনা, 'Dramatic Opinions' 'The Perfect Wagnerite' 'The Sanity of Art ; এবং সর্ব্বোপরি Quintssence of Ibsenism ; এই শেষোক্ত পুস্তিকাখানা হচ্ছে ভাবের দিক থেকে তাঁর নাট্যসূত্র। 'ইব্‌সেনি' নাট্য-পদ্ধতিকে স্থানোপযোগী ও কালোপযোগী এবং ফ্যাবিয়ান্ চিন্তায় অভিষিক্ত করে চালানোই নাট্যকার হিসাবে বার্ণার্ড শ'র 'মিশন'। কাজেই, তাঁকে বুঝ্‌বার পক্ষে এই পুস্তিকাখানা বেশ প্রয়োজনীয়। তৃতীয়ত, বার্ণার্ড শ'র বিভিন্ন নাটকের ভূমিকাসমূহ। এই ভূমিকাগুলিও এক একটা অদ্ভুত জিনিস—'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'র মত অনেক সময় নাটকখানার চেয়েও লম্বা। তবে, তা যে নাটকগুলি বুঝবার পক্ষে অপরিহার্য্য এ-ও সত্য। 'জন বুল্' হেসে গড়াতে পারেন নাটক দেখে,—কিন্তু একবার 'জন বুলের অপর দ্বীপে'র ভূমিকা পড়লে রাগে ফুলবেন, এ নিঃসন্দেহ। তেমনি, 'Man and Superman'এর উৎসর্গ পত্র' এবং 'Back to Methuselah'র ভূমিকা 'Saint Joan'এর ভূমিকা নইলে ও-সব নাটক যতই উপভোগ্য হোক্, আমরা তাদের মর্ম্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি না।

বার্ণার্ড শ'র নাট্য-সমূহে আমরা সর্ব্বত্র দেখি অদ্ভুত মত, অদ্ভুত ভঙ্গী, ও অদ্ভুত চরিত্র। আমরা অবশ্যই বলব যে শ'র মন অদ্ভুত, তিনি কিন্তু বলছেন যে, ঠিক এর উল্টা। তাঁর এই অদ্ভুতত্ব তাঁর মনের নাকি স্বাভাবিকত্বের প্রমাণ। তাঁর মতে তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত normal—'abnormally normal'—কারণ, দুনিয়ায় শতকরা দশটি লোকমাত্র 'নর্ম্মাল'; —বাদ-বাকীরা হচ্ছে নর্ম্মাল-ছাড়া। তাই, স্বাভাবিক এঁদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। তাঁর পাঠকের যে তাঁর মধ্যে Coherence of thought or sympathy পেলেন না, তাঁকে দোষী করেন "of an inhuman and freakish wantonness, of pre-occupation with 'the seamy side of life' ; of paradox, cynicism and eccentricity, reducible, as some contend, to a trite formula of treating bad as good and good as bad, important as trivial and trivial as important, serious as laughable and laughable as serious, and so forth—' তার জন্ম দায়ী "the underlying fundamental disagreement between the romantic morality of the critics and the realistic morality of the plays"—জনসমাজ আবেগ-চালিত, রোমান্সের ভূত তাদের কাঁধে চেপে বসেছে, idols ও ideals তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, শ'র চোখ একদম খোলা,—তাই, ও সব তাঁর কাছে জঞ্জাল, আগাছা :—রোমান্স, 'spurions, cheap and vulgar : হৃদয়াবেগ অর্থহীন বোকামো ও নানা অনর্থের মূল, আইডিয়ালিজম্ নীতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেই রোমান্সের ভূতেরই চলা-ফেরা-মাত্র। এ সবকে তিনি বিদ্রূপ করেন আমাদের এ সবের মোহ থেকে মুক্তি দিতে; —কারণ genuinely scientific natural histroy'র উপর সমাজের প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্র গুলির বনিয়াদ গড়তে হবে।

এ'কথা অবশ্য ঠিক যে তাঁর sanity সন্দেহ করে চলে না, তাঁর রেশানালিজম্ বা যুক্তিপরতা পাতায় পাতায় জীবন্ত। কিন্তু, তাঁর নিজের কথায় আমরা দেখি যে নর্মাল হচ্ছে দুনিয়া ছাড়া জিনিস, —একটা ভালো-মন্দের মাঝা-মাঝি মন-গড়া আইডিয়া,—যার সাথে কোনো বিশেষ মানবেরই মিল নেই। তাই, বার্ণার্ড শ এমন সৃষ্টি-ছাড়া। তাঁর আদর্শও কোনো আবছায়া জিনিস নয়,—সে বাস্তব; পৌত্তলিক মোহ তাঁকে তার বর্তমান সম্বন্ধে অন্ধ করেনি। তাঁর জোহানের বিস্ময়াবহ জীবন ও দিব্য দৃষ্টি, দৈব-বাণী প্রভৃতি যে তিনি কিরূপ যুক্তিপর মন নিয়ে বিচার করে মেনেছেন তা দেখলেই আমরা বুঝি যে তিনি রোমান্সের বায়ুগ্রস্ত নন। কিন্তু, এই নাটকখানার মধ্যে যে একটি গভীর আদর্শবাদের আভাস আছে, তা কি অস্বীকার করা যায়? আসলে, তাঁর আইডিয়ালিজিমের সাথে সাধারণ আইডিয়ালিজিমের তফাৎ এই যে, তাঁর দৃষ্টি খরতর এবং গভীরতর এবং সদা-জাগ্রত, —তাই তাঁর আইডিয়াল-ও বাস্তব এবং সত্য, তাই বৃহত্তর ও মহত্তর। তাই, তিনি cynic ও নন, romantic-ও নন, তিনি নিজেকে মনে করেন—realist—বস্তু-নিষ্ঠ—বস্তুকেই তিনি উপাদান করেছেন, কিন্তু বলাবাহুল্য যে তিনি অচল, অনড়, বস্তুপিণ্ডকে নিয়েই আঁকড়ে থাকতে বলেন নি, তাকে গড়ে-পিটে ঢালাই করে মানবের মঙ্গলের সহায়কে পরিণত করতে বলেছেন। কেন? মানব-সমাজের এবং মানবাত্মার বৃহত্তর বিকাশের উদ্দেশ্যে।

বার্ণার্ড শ যে বিধি-নিয়মকে মানেন না তা বেশ বোঝা যায়; কিন্তু তাঁর নাটকগুলির মধ্যে একটি বিশ্বাসের মূল-সূত্র দেখা যায়—সে তাঁর Life-force-এ বা প্রাণ-শক্তিতে বিশ্বাস—যে শক্তি নর-নারীর জীবনের তলায় গোপনে-গোপনে সঞ্চারিত হয়ে একদিকে যেমন ব্যষ্টির জীবনকে মিলনোন্মুখ করে সৃষ্টির গভীর অজ্ঞেয় রহস্যকে জয়া করছে, অপরদিকে তেমনি সমষ্টির জীবনের পিছনে অপ্রতিহত তেজে আঘাত করে বলছে, 'আগে চল্, আগে চল্'। স্নেহ-প্রেম-আবেগ-উল্লাসের পশ্চাতের

এই রহস্য-ঘেরা অলক্ষ্য Life-force-কে যেন বার্ণার্ড শ মাঝে মাঝে নতি করেছেন, 'Man and Superman' প্রভৃতি থেকে এরূপ ধারণা করবার একটা হেতু আছে।...

সামাজিক সমস্যাগুলির জন্য তিনি সেই যৌবনের আবিষ্কৃত সমূহ-তন্ত্রকেই ঠিক সমাধান মনে করেন। যুক্তিবাদী, আবেগ-বিরোধী হওয়াতে এখানে-ও তিনি চরমপন্থী হন নি। তাই, সাধারণ সমূহ-তন্ত্রীদের সাথে তাঁর মনের মিল ও মতের মিল অনেক সময় দেখা যায় না। সমূহ-তন্ত্রের ভিত্তি সচরাচর থাকে হৃদয়াবেগের উপর, বার্ণার্ড শ'র মনে তার বনিয়াদ হওয়া উচিত বিশুদ্ধ যুক্তি। এ কারণে তাঁর কথা অনেক সময় হেঁয়ালি হয়ে উঠে। যুদ্ধ ও সৈনিক-বৃত্তি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব Arms and the Man-এ আছে, John Bull's other Island-এর ভূমিকায়ও আছে। তবু মেজর বার্বারা মুক্তি-ফৌজ ছেড়ে কামান-বারুদের কারখানার ভার নিলেন, কারণ, সেখানে দারিদ্র্য দূর করার ব্যবস্থা হয়েছে কারখানা-শ্রমের বিনিময়ে এবং দারিদ্র্য হচ্ছে পৃথিবীর সেরা অভিশাপ। এইরূপ আপাতবিরোধী মতে ও কাজে তাঁর নাটকগুলি পূর্ণ বলেই অনেকে মনে করেন তা' প্রলাপোক্তি, আবার অনেকে ভাবেন ঢং;—শ হয় eccentric, নয় poseur. কিন্তু, আসলে তিনি পরম স্থির-বুদ্ধি এবং স্থির-চিত্ত। অনেক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর বেপরোয়া মত আমরা নাট্য-পরিচয়ের সময়েই দেখেছি, এখন তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।"

ফ্যাবিয়ান সোসাইটির সভ্য যে প্রচারক হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ইবসেন তাঁর গুরু; তাই তিনি নাটকের ভিতর দিয়ে কন-বেঁধে যে সমাজের গলদ ও কেলেঙ্কারীগুলি দেখিয়ে তার প্রতিবিধানের জন্য সামাজিক মনকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইবেন, তা সহজেই অনুমেয়। তিনি স্পষ্ট বলেছেন-ও যে রঙ্গালয় শিক্ষালয়ের সামিল। অবশ্য, রঙ্গালয় যে রঙ্গের আলয়, এ কথা-ও তিনি মানেন। কিন্তু, তাঁর মতে সে রঙ্গ মানুষের সামনেকার প্রশ্নগুলিকে আশ্রয় করেই ফুটবে, কোনো মায়া-লোকের ছায়াবৃন্তের পরে নাটকের এই শতদল বিকশিত হবে না। তাই, বার্ণার্ড শ হচ্ছেন প্রচারক;—সামাজিক গলদের, সামাজিক ভ্রান্তির, সামাজিক ভণ্ডতার,—এবং ব্যক্তির রোমান্টিক বায়ুর, ব্যক্তির হৃদয়াবেগের অস্বাভাবিক খেলার, এবং আদর্শ-বশে বিভ্রমের বিরুদ্ধে তিনি তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়েছেন ক্ষিপ্র হস্তে। বলা বাহুল্য, তাতে করে তাঁকে আমরা প্রায়ই দেখি যোদ্ধবেশে,—চতুর ধনুর্ধর;—কিন্তু লেখনী-হস্তে বা তুলিকা-করে কোনো শিল্পীর নয়নানন্দ মূর্ত্তি আমরা দেখি না। প্রচারক হিসাবে তাঁর পটুতা যেখানে বেশী, শিল্পী হিসাবে তিনি সেখানেই আপনাকে খর্ব্ব করেছেন,—এ কথা অবশ্য তিনি নিজে মোটেই মানবেন না, কিন্তু পাঠকের তা প্রায়ই মনে হবে। এই প্রচারকের দুস্তর মরুপ্রান্তরের মধ্যে তাই, Candida, Cæsar and Cleopetra এবং Saint Joan আমাদের নিকট শিল্পের আনন্দ-উৎস রূপে অনাবিল ধারা নিয়ে দেখা দেয়;—কারণ, প্রচারকের সাময়িক সমস্যা না থেকে এ'তে শিল্পীর চিরন্তনী প্রশ্নগুলি থাকায় ওগুলোতে শ তাঁর প্রচার-ব্রতটা মুখ্য করেন নি। যে-সব নাট্যতে

তাঁর মতবাদগুলির খাড়া মাথা সরস্বতীর মন্দির দুয়ারে-ও নত হতে চায় না. তার মধ্যে বোধ হয় **Man and Superman** এবং **John Bull's other Island**-ই সব চেয়ে আদরণীয়,—কারণ, তাদের ভিতরে একটা কমনীয়তা ও নমনীয়তা আছে বাহিরে যত না ঔদ্ধত্য থাক্।

আর্টিস্ট হিসাবে বার্ণার্ড শ প্রথম পংক্তিতে স্থান পেতে পারেন—গল্স্ওয়ার্দি বা পিনারো প্রভৃতি অনুবর্তীদের অনেক অগ্রে তাঁর আসন :—কিন্তু সে আসন একেবারে সর্বাগ্রে নয়। ইয়েটসের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না কেন, তা সুস্পষ্ট। একজন চোখ বুজে দেখেন স্বপ্ন। আর-একজন চোখ খুলে দেখেন সত্য। এ-ও ঠিক যে ইয়েটস্-এর স্বপ্নাতুরতার মধ্যে একটা অসহজ-ভাব, ক্ষণভঙ্গুরতা আছে; তার পিছনে শক্তি নেই, তাঁর আর্টের প্রাণে রক্ত নেই। বার্ণার্ড শ'কে ও-অপবাদ দেওয়া চলেনা; বরং বলা যেতে পারে রক্তের অতিবৃদ্ধিতেই তাঁর আর্টের জীবন সংশয়। কিপলিং-এর সঙ্গে তাঁর তুলনা চলেনা; একজন যা সৃষ্টি করেছেন, আরজন তাতে হাতই দেন নি,—একজন আধা-ইংরেজ হওয়ার আক্‌শোষ মিটিয়েছেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কর্ণভেদী ঢক্কা-নাদে, আর জন আইরিশ হয়ে সে সাম্রাজ্যবাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে বিদ্ধ করেছেন মর্মভেদী তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণে। তা ছাড়া কিপলিংএর লেখা সহজে ভালো লাগার মত, আর শ'র লেখা প্রথমটায় ভালো-না-লাগার মত। নিত্যকালের দরবারে তাদের দর কি থাকবে নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

শোনা যাচ্ছে, নোবেল পুরস্কার ইংরেজ টমাস্‌হার্ডি পেলে ইংরেজ খুশী হতো। হার্ডির সাথে শ'র তুলনা চলে একমাত্র Dynasty নিয়ে;—নইলে দুজনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ও দু-জনার মন হচ্ছে বিভিন্ন-স্তর—একেবারে দুই দূর প্রান্তের। একজনের মধ্যে যে কবিত্ব মজ্জাগত, আর জনের কাছে তা হাসির উপকরণ; একজনের কাছে বিষাদ ও নৈরাশ্য স্বাভাবিক, আর জন বর্তমানের সমস্ত অপরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও নিতান্তই আশা ও আনন্দে ভরপুর। তথাপি, এ কথা ঠিক-যে হার্ডি শিল্পী হিসাবে শ্রেষ্ঠ; কারণ তাঁর শিল্প-প্রতিভার উন্মুখ বিকাশ কোনো প্রচারকের মতবাদে প্রতিহত হয় নি, তাঁর শিল্প-সাধনার একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা কোনো আর্থিক বা রাষ্ট্রিক সংস্কারের দোটানায় পড়ে বাধা পায় নি। নোবেল পুরস্কার তিনি না-পেলে-ও পৃথিবীর গুণীদের দরবারে তাঁর আসন কারুর পিছনে নয়।

বার্ণার্ড শ'র শিল্পের একটি প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তাঁর রচনা রীতি। তাঁর নাটকের গঠন পদ্ধতি অনেকটা খেয়ালের খেলা বলে ঠেকতে পারে; যেমন Misalliance-এর এরোপ্লেন-অবতরণ,—কিন্তু, তা সাধারণত নির্দোষ। কারণ পূর্ব্বেই থিয়েটারের সমালোচনা ক'রে-ক'রে ও বিষয়ে তিনি অনেক নাট্যকারের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনা-রীতির সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। অমন আপাত-বিরোধী বাক্যের শোভা খুব কম দেখা যায়। ইংরেজি সাহিত্যে অস্কার ওয়াইল্ডের প্যারাডক্স সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু, তা অতিরেবেশী পালিশ করা,

অতি সুকুমার, একটু সূক্ষ্ম। শ'র প্যারাডক্স কিন্তু ধারালো এবং জোরালো ওর ভিতরে একটু ইস্পাত আছে বেশী। চেস্টারটনের প্যারাডক্স-ও সুপ্রসিদ্ধ, খুব সম্ভব এ দু'এর মাঝামাঝি মতবাদের দিক দিয়ে যদিও তিনি শ'র ভীষণ বিরোধী। এই রচনা-রীতির বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বার্ণাড শ'র সকল নাটকের সকল চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। মাঝেমাঝে এ কারণে তাঁর চরিত্র-চিত্রণে দোষ এসেছে—যেমন অস্কার ওয়াইল্ডের-ও এসেছে। শ' গর্ব্ব করেছেন যে মতবাদের দিক দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্র-সৃষ্টি বিভিন্ন, স্বতন্ত্র। এ কথা ঠিক, কিন্তু তাদের মুখের ভাষার রীতিগুলি অল্প-বিস্তর এক ধরণের। শ'র বাক্-রীতির অনুকরণে তারা কথাবার্ত্তা কয়। Myriad minded সেক্সপিয়র myriad tongued; কিন্তু শ' সে গর্ব্ব করতে পারেন কি?

হাস্যরসের দিক দিয়ে শ' এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ওয়াইল্ডের সঙ্গে তাঁর আর্টের আইডিয়াল নিয়ে পার্থক্য সর্ব্বজন জ্ঞাত কিন্তু রঙ্গের ও ব্যঙ্গের দিক দিয়ে তাঁদের এক পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে তফাৎ অবশ্য আছে, ওয়াইল্ডের হাসি হাল্কা, উড়ে যায়; কিন্তু শ'র হাসি বাঁকা ঠোঁটের, নিরতিশয় ব্যঙ্গের ও অসঙ্গ-বিদ্রূপের শ'র ব্যঙ্গের মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে, তা'র নিজের। ইংরেজি কমেডির যে ধারা শেরিডন, গোল্ডস্মিথ থেকে সুরু করে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির মিলনক্ষণে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে চলেছে জে, এম্ ব্যারিতে পর্য্যন্ত,—তা'তে বার্ণাড শ'র একটি বিশেষ স্থান আছে—যদিও তাঁর দান হচ্ছে সব চেয়ে চোখা, সব চেয়ে কড়া এবং সব চেয়ে উৎকট ও উদ্ভট উপহাসের

শ'র সঙ্গে সুপরিচিত হলে দেখা যায় যে তিনি একদিকে যেমন নিতান্ত বেপরোয়া বিধি-নিয়ম-হীন অনাচারী নন, অপর দিকে তেমনি তথাকথিত সমাজ-বিদ্রোহী 'হাম্‌বাগ্'-ও নন. একদিকে যেমন তাঁর মন morbid খেয়ালে ভেসে যায় নি: তেমনি অপর দিকে গতানুগতিক conventionalityতেও আবদ্ধ হয় নি। আমরা দেখি তাঁর প্রাণে-প্রাণে একটা মহামানবতার মন্ত্র প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর সাহিত্য-সাধনার মূল প্রেরণা আসছে তাঁর অন্তরের মানবতা (humanity) থেকে। এই সত্যই শ'র নাট্যের মূলসূত্র, এই সত্যই শ'র জীবনের তাপসিক অনাড়ম্বরের গোড়াকার কথা।

শ্রীগোপাল হালদার

"লক্ষ্মী গিয়াছে ছাড়ি"

সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে নাক আর উজলি কুটীর মোর।
দুয়ারে দুয়ারে জলের ধারা, পড়ে না হইতে ভোর॥
সব এলোমেলো অগোছালো পড়ে', দেখিবার কেহ নাই।
আর ত পারি না, বুক ফেটে মরি—কি করি কোথায় যাই॥

ননীর পুতুলি ঘুমে অচেতন ধূলায় পড়িয়া ঐ,
ধূলি ঝাড়ি' গা'র কোলে তুলি আর কে নেবে, কোথা সে কৈ?
বাক্সের ডালা রহিয়াছে তোলা হারিয়েছে চাবি তা'র।
পিঞ্জরা হইতে উড়ে গেছে পাখী খোলা পেয়ে যেন দ্বার

দিন রাত, খোলা রহিয়াছে পড়ি জানালা-কবাটগুলি।
এখানে-ওখানে ঘটী-বাটি-থালা, কেহ ত রাখে না তুলি॥
বিছানা বালিশ শ্মশানের ছবি সতত জাগায় মনে।
ধূলো-ঝুল-কালি জমিয়েছে খালি মেঝেয় ঘরের কোণে॥

হারিয়েছে ঝাঁটা, ঝাঁট নাহি পড়ে, কলসীতে নাহি জল।
নিশিদিন ঐ খোলা পড়ে' থাকে—বাহিরে-ভিতরে কল।
তোষক-মাদুর-মশারি-চাদর কাঁড়ি করা মাঝ্‌খানে।
যা'র যেটা খুসি—টেনে নিয়ে যায়, আর না ফিরায়ে আনে

জামা যদি মেলে, মেলে না চাদর জুতো এক পাটি নাই।
হারিয়েছে ছাতা, ভাঙ্গিয়াছে লাঠি, যা' খুঁজি কিছু না পাই॥
ছলছল চোখে কচি কচি মুখ সদা ইতি-উতি চায়।
বুঝি সারাদিন ফেরে কা'র খোঁজে, যদি একবার পায়॥

খাওয়া-পরা-আর-ওঠা-বসা-শোওয়া—সব যেন চলে কলে।
সকলি' ত আছে, নাহি শুধু প্রাণ,—বুঝিতেছি পলে পলে॥
গোয়ালেতে বাঁধা পড়ে' আছে গরু খায় না সে ঘাস-জল।
কা'র লাগি যেন আঁখি বেয়ে ধারা পড়ে তার অবিরল॥

শূন্য-নয়নে সারাদিন ব'সে আছি এক দিকে চেয়ে।
কেহ ত আসিয়া বলেনাক আর—"এস তাড়াতাড়ি নেয়ে।"
কত কাজ ছিল, এবে কিছু নাই, সকলি হয়েছে শেষ।
দিবসের আলো—পরিতেছে ক্রমে গাঢ় আঁধারের বেশ॥

ঠাকুর-চাকর সব একজোট, গল্পের নাহি ওর
চেঁচিয়ে ডাকিলে এসে বলে—"বাবু হিসাব করুণ মোর।"
"আমাদের ছাড়া বাবুদের কোন গতি নাহি গতি নাই।"
বুঝিয়াছে সার—তারা এতদিনে,—গরম মেজাজ তাই॥

কত রাঙ্গা-জবা-গোলাপ-টগর-চামেলি-গন্ধরাজ,
বেল জুঁই আর রজনীগন্ধা হেলায় সিনানি' আজ,
নব বরষার নব সাজে মোর উজলি' বাগানখানি,
হাসিয়া হাসিয়া ভাঙ্গিছে আমার বুকের পাঁজর টানি॥

অরুণের হাসি সহ রাশি রাশি কুসুমে ভরিয়া সাজি,
গৃহ-দেবতার পূজার দেউলে কেহ ত বসে না আজি।
সদা কত হাসি-আমোদ-মুখর আছিল আমার বাড়ী।
এবে চুপ্‌চাপ্‌, নীরব শ্রীহীন—লক্ষ্মী গিয়াছে ছাড়ি'॥

সুদর্শন

গিরীশ-স্মৃতি

(৬)

সে দিন বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ক'রে বৃষ্টি নাম্‌ছে। বন্ধুবর ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও আমি সন্ধ্যার পর গিরীশবাবুর বাড়ীতে গেলাম। ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রায় প্রতিদিন গিরীশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। গিরীশবাবুও ডাক্তার কাঞ্জিলালকে অত্যন্ত স্নেহ ক'র্‌তেন এবং দেখা হ'লেই উল্লসিত হ'তেন। এমন কি অন্ততঃ রাত্রি ৯ টার পর যদি ডাক্তার কাঞ্জিলাল না আস্‌তেন তবে বারম্বার জিজ্ঞেস কর্‌তেন "আজ কাঞ্জিলাল এলো না কেন?" ডাক্তার কাঞ্জিলাল খুব সরল, বন্ধুবৎসল এবং ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। পরের কোনও বিপদ দেখ্‌লে সাধ্যমত সাহায্য কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন এবং অনেক গরীবের চিকিৎসা তিনি ভিজিট না নিয়ে কর্‌তেন। তা ছাড়া অন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হ'লেও তা কর্‌তে প্রয়াস পেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী ডাক্তারের খুব প্রিয় ছিল এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের পার্ষদগণের প্রতি কাঞ্জিলাল মহাশয়ের অগাধ প্রীতি ও অচলা ভক্তি ছিল।

গিরীশবাবু এই বাদলা দিনে আমাদের দেখে খুব আহ্লাদিত হ'লেন। হলঘরে তখন অপর কেহ ছিল না। কথা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠ্‌লো। গিরীশবাবু বল্‌লেন "দেখ যখন শঙ্করাচার্য্য বই লেখা হ'ল তখন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের মন ওঠে নি। নরেন্দ্রবাবু বল্‌লেন "মশায়, এ বই জম্‌বে কিনা সন্দেহ।" অবিনাশ বল্‌লে "থার্ড ক্লাস বইয়ের মত run করবে।" আমি চুপচাপ্‌ ক'রে ওদের সব মতামত শুন্‌তাম—মনে ভাবতাম—সাধারণে এই বই কেমন ভাবে নেবে—তা কে বলতে পারে?"

আমি বল্‌লাম "Manuscript অবস্থায় বই পড়ে আমি যা বলেছিলাম—তা কিন্তু মিছে হয় নি।"

গিরীশবাবু ডাক্তার কাঞ্জিলালের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন "কুমুদ আমাকে বলেছিল যে মশায় এই বই খুব জম্‌বে।"—এই বলে গিরীশবাবু হাস্‌লেন।

আমি। আচ্ছা শঙ্করাচার্য্য কি প্রকৃত নাটকের আখ্যায় অভিহিত হ'তে পারে?

গিরীশবাবু। কেন নয়?

আমি। এই সব Passion play কি Drama? নাটকে যে ঘটনা-পরম্পরা যে ঘাত-প্রতিঘাত থাকবে—তা কি শঙ্করাচার্য্যে আছে?

গিরীশ বাবু। নাই কেন?

আমি। Dramatic situation কোথায়? শঙ্করাচার্য্যের অপূর্ব্ব জীবন মুগ্ধ করতে পারে কিন্তু যা কিছু মুগ্ধ করে তা তো dramatic নয়।

গিরীশবাবু। দেখ, তোমরা কতকগুলো তোতাপাখীর মত বুলি আওড়াতে শিখেছ। ভাল ক'রে বিচার করে নিজেরা বুঝ্‌তে শেখনি। Dramatic situation কাকে বলে? এমন অবস্থার সন্নিবেশ—যেখানে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সহজেই ঘটে—স্বাভাবিক গতিতে চরিত্রগুলি বিকাশোন্মুখ হ'বার সুবিধে পায়। বাল্যে পিতৃহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান শঙ্কর—প্রতিভার বরপুত্র শঙ্কর—মাতৃস্নেহের বিমলধারায় অভিসিঞ্চিত ছিলেন। মা ছাড়া সংসারে তাঁর আর কেউ আপনার বল্‌বার নেই আর সেই নিরাশ্রয়া স্নেহময়ী জননীর শঙ্করই একমাত্র নয়নের মণি। কিন্তু স্বভাব-বৈরাগ্যবান শঙ্কর জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, মায়ের এই কঠিন স্নেহ-নিগড় ছিন্ন করতে হ'বে—সে স্নেহ নিগড় সহজে ছিন্ন করবার সাধ্য কার! দৈব অনুকূল—কুম্ভীর মুখে শঙ্কর—ছেলের জীবনের আর কোনও আশা নেই—সংসারে একমাত্র পুত্রসম্বল জননী—সেই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে শুধু বালক পুত্রের জীবনের আশায় সন্ন্যাসের অনুমতি দিতে পারলেন। এগুলো dramatic situation.

আমি। কতকগুলো অলৌকিক ঘটনা miracles-এ ভরা। নাটকে তার স্থান থাকবে কেন?

গিরীশবাবু। কেন? সেক্সপীয়রের Tempest, Midsummer Night's Dream, Hamletএর Ghost—এসব কি? যাদুবলে প্রস্পেরো সাগর বক্ষে ঝড় তুলতে পারে, ভূতপ্রেত জিন পরীকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারে, সব সম্মোহনে বশীভূত দেখাতে পারে, চাঁদনী রাতে পরী-রাণীদের মানুষের-প্রেম-প্রীতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নাটকে থাক্‌তে পারে—মৃত পিতার অশরীরী আত্মা পুত্রকে হত্যার জন্য প্ররোচনা করতে বারম্বার আস্‌তে পারে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ সাধক মহাপুরুষদের জীবনে কোনও একটা অলৌকিক ঘটনা দেখালে সব অশুদ্ধ হ'য়ে গেল? যে miracleএর কথায় বাবুরা শিউরে ওঠেন সে-গুলো প্রত্যেক দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে—মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে আছে। আর আমাদের দেশে যে গুলো আলৌকিক ব'লে নাক সিঁটকোও—তাও প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। কেউ স্বপ্নে ঔষধ পাচ্ছে—কেউ বাবা তারকেশ্বরের নিকট হ'ত্যে দিয়ে আশ্চর্য্য রকম প্রত্যক্ষ ফল পাচ্ছে।—কত সাধু—কত মহাপুরুষ—কত সতী স্ত্রীর জীবনে অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ যে-দেশে দেখা যায়—সেগুলো কয়েকজন ইংরেজী পড়া পণ্ডিত myth ব'লে উড়িয়ে দিলেই তা হবে না!—যাকে তোমরা miracles বল্‌চো—ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে এসে দেখ—সেগুলি সকলের ভিতরে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। সেগুলি সাধারণ ঘটনার মত আমাদের দেশে নিত্য ঘটচে।

আমি। তবে কি এই miracles গুলো সত্য মনে করবো।

গিরীশবাবু। Miracles এর কতকগুলো ভাগ আছে।—অনেক জিনিস আমাদের জ্ঞানের তারতম্যে—miracle বোধ হ'য়ে থাকে। পাড়া গেঁয়ে, পাহাড়ী বা বুনো যে কখনও রেল ষ্টীমার দেখে নি Electric fan বা light দেখে নি—সে যদি এই গুলো দেখে, তবে অবাক্‌ হ'য়ে অলৌকিক শক্তির বিকাশ ব'লে এই গুলোকেই—miracle ব'লে মনে করবে।—Telescope বা Microscope দেখ্‌লে আমাদের অনেক অর্দ্ধ-শিক্ষিত miracle ব'লে মনে ক'রবে। জ্ঞানের তারতম্য এখানে miracle ব'লে বোধ হয়। যে ঘটনা বা মানসিক বিকাশ আমরা আদৌ বুঝ্‌তে পারি না তাও miracle ব'লে অনেকে মনে ক'রে থাকে।—তুমি চখের সামনে দেখ্‌চো যে-রোগীকে ডাক্তার-বদ্যি আরোগ্যের বাহিরে ব'লে declare করচে সে হয় তো স্বপ্নে ঔষধ পেয়ে বেঁচে গেল, কিম্বা তার আত্মীয়েরা তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে কোন হুকুম পেলে—যাতে রোগী বেঁচে গেল।

আমি। আচ্ছা মশায়—এই তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে রোগ ভাল হওয়া—কি স্বপ্নে ঔষধ পাওয়া—এগুলো কি আপনি বিশ্বাস করেন?

গিরীশবাবু। খুব বিশ্বাস করি—আমি নিজে প্রত্যক্ষ ফল পেয়েছি। একবার রোগে আমার জীবনের আশা ছিল না। ন-দিদি বাবা তারকনাথের কাছে হত্যা দিয়ে এলেন—আমি নিজে তখন নাস্তিক, কিছু বিশ্বাস করতাম না—ভগবানকেই বিশ্বাস করতাম না তার আবার

দেবদেবী—মন্দির-গির্জ্জে ; কেননা, আমার বিশ্বাস থাক্‌লেও হয়ত বল্‌তে পারতে **faith cure.** আমি তখন মিল, হার্ব্বার্ট স্পেনসার পড়ে ঠিক ঠাউরেছি যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সব মিছে কথা। যখন আমি প্রত্যক্ষ ফল পেলাম—দেবপ্রভাব প্রত্যক্ষ দেখ্‌লাম তখন আমার মনের অবস্থা একবার মনে কর।—তখন নাস্তিকতার সঙ্গে আস্তিকতার দ্বন্দ্বে মন আলোড়িত হ'য়ে হৃদয়কে ভয়ানক অশান্ত ক'রে তুললে। সেই সময় মানসিক করে—বাবা তারকনাথকে মানত ক'রে শিবরাত্রি করতে লাগ্‌লাম যাতে আমাকে এই সন্দেহ-তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর থেকে গুরু-কর্ণধার এসে হাত ধরে তুলে রক্ষে করেন। শিবরাত্রির ফল প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেম—দুবৎসর যেতে না যেতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীগুরুদেবের দর্শন ও কৃপা পেলাম। রাম শ্যাম—ইংরেজী, দুপাতা—দুচার খানা বই পড়ে বল্‌লে ওসব কিছু নয়—আর রাম-শ্যামের চেলারা জান্‌লেন ওসব কিছু নেই। এত বড় আহাম্মক যারা—তারা নিজেদের সন্দেহের জ্বালায় জ্বল্‌বে ছাড়া আর উপায় কি ?

আমি। তবে কি আপনি নির্ব্বিচারে অন্ধ বিশ্বাস করতে বলেন ?

গিরীশবাবু। হাঁ—ঐ এককথা—**Blind faith**—অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু কোন্‌টা অন্ধ বিশ্বাস আর কোন্‌টা চোখওয়ালা বিশ্বাস বল্‌তে পার ?

আমি। যে বিশ্বাসের ভিত্তি কোনও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—সে বিশ্বাসকেই অন্ধ বিশ্বাস বলে—আর যে বিশ্বাস যুক্তি তর্কের উপর—প্রমাণিত সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকেই প্রকৃত বিশ্বাস বলে।

গিরীশবাবু। যে যুক্তির কথা বল্‌চো—সে যুক্তি কি ভুল হ'তে পারে না ? এতো দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, যা এখন মনে কচ্চ ঠিক—পরে দেখ্‌বে ঠিক নয়। তা হ'লে যে যুক্তির উপর তুমি জোর কচ্চ সে যুক্তিই অন্ধ। কখনও বল্‌তে পার কি যে যুক্তি তোমার চোখওয়ালা—ঠিক ?

আমি। না মশায়, তা হ'লে তো কোনও বিচার করা যেতে পারে না। কারণ যে যুক্তির উপর আমরা সর্ব্বদা বিচার ক'রে থাকি সে বিচারও তো ভুল হবে।

গিরীশবাবু। দেখ যে বিশ্বাসকে অন্ধ ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছিলে—সেই অন্ধ বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই তুমি মনে মনে বিচার ক'রে থাক—সেটা ঠাউরে দেখেছ কি ?

আমি। তা কেন হবে ?

গিরীশবাবু। তবে কেমন ক'রে কর ?

আমি। ধরুন না কেন—কতকগুলো **truths** আছে যেগুলো স্বতঃসিদ্ধ—**self-evident.**

ডাক্তার কাঞ্জিলাল। কি রকম ?

আমি। যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখচি—ছোট ছোট তারা মেঘে ঢেকে গেছে—মেঘগুলো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—মেঘলা আকাশ, বাদলা হাওয়া—জল আসতে পারে। এই সব কার্য্য কারণ সম্বন্ধ দেখে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল—বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

গিরীশবাবু। আচ্ছা, আমি যদি বলি ওগুলো মেঘ নয়—পাখীর ঝাঁক উড়ে চলেছে। তাহ'লে কি বলবে ?

আমি। বাঃ, মেঘ আর পাখী চেনা যায় না !

গিরীশবাবু। কেমন ক'রে চিনলে ?

আমি। দেখে—লোকের কাছে শুনে—জেনে চিনেছি। এখানে শুধু **observation** নয়, **experiences and knowledge** এই দুইটিও আছে।

গিরীশবাবু হেসে বললেন দেখ, তাহ'লে লোকের **knowledge, experiences and observations** এর উপর তোমাকে বিশ্বাস করতে হচ্ছে আর নিজেও যা দেখচো তা ঠিক দেখচো এই রকম একটা বিশ্বাস ধ'রে নিতে হচ্ছে। কেমন না ?

আমি। আজ্ঞে হাঁ।

গিরীশবাবু। এই বিশ্বাসকে কি তুমি চোখওয়ালা বিশ্বাস বলবে ? সেগুলি তো কোন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সিদ্ধান্ত হ'য়ে আসে নি। সেগুলি নিছক তোমাকে বিশ্বাস ক'রে নিতে হচ্ছে। দেখ একবার ঠাকুর স্বামিজীর এই অন্ধ বিশ্বাসের উদ্দেশে প্রশ্ন করেছিলেন যে তুই অন্ধ বিশ্বাস আর চোখওয়ালা বিশ্বাস কি বলছিস্ ? বিশ্বাস—বিশ্বাস। তা আবার চোখওয়ালা বা অন্ধ কি ? স্বামিজী ঠাকুরের কাছে চেষ্টা ক'রেও দেখাতে পারলেন না "কোনটা চোখওয়ালা বিশ্বাস—আর কোনটা অন্ধ বিশ্বাস।" আর হৃদয়ে বোধ না মানলে কি বিশ্বাস করতে পার ? মানুষের জ্ঞান কতটুকু - তার **vision** কতটুকু—পদে পদে মানুষ তার জ্ঞানের ভুল দেখতে পাচ্ছে—পদে পদে যুক্তির অসারতা বুঝতে পারচে—পদে পদে নিজের ক্ষুদ্রতা অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারচে—তবুও সেই মহানের অলৌকিকত্ব অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিকাশ—অসীমের অনন্ত ভাবের অনন্ত রূপের রূপান্তর মানতে চাইবে না। যাকে **miracle** বলচো—যখন প্রকৃত জ্ঞানোদয় হবে তখন বুঝবে তাহা অলৌকিক নয়—তাহা ঘটনা পরম্পরার বিকাশ মাত্র। তা এই সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তিরই প্রকাশ।

যে মহাপুরুষ—কমনীয় জগতের আকর্ষণ ত্যাগ ক'রে নিত্য সত্যের সন্ধানে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে বিপুল দ্বন্দ্ব ক'রে—সেই অনন্ত রহস্যময়—অনন্ত রসময়—অনন্ত আনন্দ উপলব্ধি ক'রে মহাপ্রেমে জগৎকে সেই আনন্দ দান করবার জন্য তাপিত পতিতদের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়ান—তাঁর জীবন—তাঁর সাধনা—তাঁর অনাবিল স্বচ্ছ নিষ্কাম প্রেম—তাঁর জয়ধ্বজা—নাটকের বিষয় হতে পারে না—আর তুমি প্রলোভনে পতিত হ'য়ে মোহে অভিভূত হয়ে যে মদির স্বপ্নে হর্ষ বিষাদে ভাসছো—তোমার সেই জীবন **dramatic**—নাটকের বিষয় ! এই **angle of vision** এর সঙ্গে আমার কোনও মিল নাই। মানুষ যদি এই টুকুকে art বলে তবে সে আর্ট অসম্পূর্ণ। হ'তে পারে সে মহান নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনা আঁকতে অনেকে অক্ষম। কিন্তু মহাপুরুষদের লীলাপূর্ণ

নাটককে Passion play ব'লে উড়িয়ে দিয়ে drama নয় বলে উপেক্ষা করা অজ্ঞানতা বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এটা নিশ্চয় জেন একদিন এমন দিন আসবে যখন এই সব মহাপুরুষদের জীবন—অলৌকিক ঘটনাবলী—উন্নততর আর্টের সম্পদ ব'লে গণ্য হবে।

আমি। আচ্ছা মশায়, নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নানা ঘটনার সন্নিবেশে—নানা বিচিত্র চরিত্রের সৃষ্টিতে বিচিত্র রসের বিকাশই তো নাটকের নাট্যকলা। কিন্তু "শঙ্করাচার্য্য" "চৈতন্য-লীলা" "বুদ্ধদেব" প্রভৃতি নাটকে একটা রসের প্রাধান্য বই তো নয়? সেটা একঘেয়ে, তাই লোকে তাকে প্রকৃত নাটকের পর্য্যায়-ভুক্ত করতে চায় না।

গিরীশবাবু।—ওটা ভুল। ঘটনা চরিত্র ও দ্বন্দ্বের বিচিত্রতা এই সব নাটকে কম নেই—বরং বেশী।—একঘেয়ে কি বল্‌চো?—সর্ব্ববিধ রসের আধার যিনি তাঁর ভিতর সকল রস চরম সার্থকতা লাভ ক'রেছে।—তাঁর প্রাধান্যে সব রসের প্রাধান্য।—দেখ, কুয়োর ব্যাং সাগরের ব্যাংএর কথা জান তো?—কুয়োর ব্যাং মনে করে তার কূপই সমগ্র জগৎ। তেমনি বর্ত্তমানে কতকগুলো লোকের ধারণা আর্ট বুঝি এই টুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নাটক কবিতা কাব্য শিল্প প্রভৃতির সীমা এই গণ্ডী টুকুর ভিতর—যদি সে গণ্ডীর বাইরে কোনও কিছু হয় তবে তা আর্ট ব'লে গণ্য হ'তে পারে না।—তাই মানুষের মূল ভাবকে—বাইরের দ্বন্দ্বকে তারা শুধু আর্টের গণ্ডীর ভিতর মেনে চলেছে।—হরিনামকে কর্ম্মক্লিষ্টজীব যেমন "এখন থাক মরবার সময় করা যাবে" ব'লে থাকে—তেমনি ভগবৎ বা আধ্যাত্মিক সংস্পর্শের নাটক বা কাব্য হ'লে—তাদের সাহিত্যের জাত যায়। দেখ যখন "চৈতন্যলীলা"র অভিনয়ে সমগ্র বাংলাদেশ আন্দোলিত হ'য়েছিল—কত সাধক ভক্ত অভিনয় দর্শন ক'রে আনন্দ লাভ ক'রেছে—তখনও কতকগুলি সাহিত্যিক, Journalist—তারা প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ, সমালোচনার পর সমালোচনা করে আক্ষেপ ক'রেছে যে "দেশের কি দুর্দ্দৈব, শেষে থিয়েটার হরিনাম সংকীর্ত্তনে পরিণত হ'ল।"—আর্ট কাকে বলে—এই সব লোকের তার কোন ও পরিস্ফুট ধারণা নেই—একটা সংকীর্ণ ভাবের গণ্ডীর ভিতরে এরা মনে ক'রে আর্টের সীমা এই পর্য্যন্ত and no further—কিন্তু সকল কলাশিল্পের—সকল সাধনার—সকল রসের শ্রেষ্ঠ দান—চরম লক্ষ্য সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার প্রয়াস।—যে মানুষের চরিত্রে—জীবনে—কর্ম্মে—সাধনায়—সেই অব্যক্ত ব্যক্ত হ'য়ে উঠেন—সমস্ত রস উথ্‌লে উঠে আনন্দের তরঙ্গ হিল্লোল তুলতে থাকে—যে মানুষের দান—অফুরন্ত প্রেম—অপার্থিব সহানুভূতি—সমগ্র বিশ্বের বেদনায় মুখর হ'য়ে, তীব্র হ'য়ে সমস্ত জগৎকে রাঙিয়ে তোলে, ত্যাগের দীপ্ত উজ্জ্বল মহিমায় যিনি ভাস্বর তিনি জীবের ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে পাপী তাপী সাধু অসাধু নির্ব্বিচারে প্রেমদান করেন—তাঁর চরিত্র আর্টের পরম সম্পদ—পরম সার্থকতা। মানুষের চিন্তাপ্রবাহ অস্থির—লক্ষ্যহীন—কিন্তু একদিন জানতে পারবে যে মহাপুরুষদের জয়গীতি প্রকৃত কাব্য, প্রকৃত উৎসব, প্রকৃত শিল্পকলার দানের বিষয়—নাটকের চরম নাটক।—এই রস—এই আনন্দ—লোককে দান করতে ইচ্ছে

আছে—তবে সব তাঁর ইচ্ছা। ঢের নাটক লিখেছি—ঢের গল্প লিখেছি—জগতে যত গল্প আছে—সব এক-রকম একঘেয়ে—একই সুরের উঁচু নিচু পর্দা মাত্র। কিন্তু এই আনন্দ—অন্তর্দ্বন্দ্বে সেই অব্যক্তের প্রকাশ—বিমল গঙ্গাধারার ন্যায় অহেতুকী প্রেমোচ্ছ্বাস আঁকাই আমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাট্যকলা মনে করি।—যদি ঠাকুরের ইচ্ছে হয় তবে পরে পরে এই পরম সুন্দর পরম প্রেম—পরম রসের ছবি আঁকবার ইচ্ছে আছে।

এই সময় ঝম্ ঝম্ ক'রে এক পসলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল।

গিরীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "আজ ভাল মাছ ও মাংসের তরকারী আছে তোমরা খাবে?" আমরাও উৎসাহে বল্লাম "নিশ্চয়ই খাব।" লুচি তরকারী ও মাছ মাংসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম। কিন্তু গিরীশবাবু কিছু খেলেন না দেখে আমি বল্লাম "মশায়, আপনি যে কিছু খেলেন না?" গিরীশবাবু বল্লেন "রাতে heavy food আমার আদৌ সহ্য হয় না।—আর, বাবা, যা আগে খেয়েছি—তার এখন জাবর কাট্‌ছি।—সে তুলনায় তোমাদের খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে তোমরা কিছুই খেতে পারো না। গোটা গোটা মাংসের রাং কত উড়ে গেছে।"

আমি বল্লাম "মশায়—আপনার জীবন বৈচিত্র্যময়। একখানা আপনার নিজের আত্মজীবন চরিত লিখ্‌লে ভাল হ'ত"

গিরীশবাবু।—দেখ আত্মজীবন লেখা মানে কতকগুলো মিথ্যে কথার জাল বোনা। শুধু লোকের কাছে দেখাবার চেষ্টা আমি খুব বাহাদুর, আমার খাওয়া, শোয়া, ঘুম, স্বপ্ন, চিন্তা সব অসাধারণ। দোষগুলি ঢাকা দিয়ে আমি যেন একজন—ভগবানের special মাকার তৈরী এই তো বলতে হ'বে।—দম্ভের এর চেয়ে আর কিছু প্রকাশ হ'তে পারে না। Autobiography—এক লিখেছেন বামদেব। নিজের জন্মের কথা, মায়ের অনুরোধে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীদের গর্ভসঞ্চার প্রভৃতি অকপটে লিখে গেছেন। এই পরমহংসের অবস্থায় আত্মজীবন বলা চলে। নতুবা পালিস ক'রে—নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে লোককে দেখানো যে আমি কত মহৎ—কত উদার—কত প্রতিভাশালী!

আমি। কেন মশায় Autobiographyর কি মূল্য নেই? জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে মহৎ জীবন কেমন গড়ে উঠছে তা আমরা বুঝ্‌তে পারি—কোন্ প্রভাবে জীবন পরিপূর্ণভাবে বিকসিত হয়েছে তা বুঝ্‌তে পারি। তার মূল্য নেই—কেন বলছেন?

গিরীশবাবু। আমরা "আত্মজীবনী" পড়ে আরও deluded হই। প্রকৃত প্রতিভাবান কবি তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে থাকেন,—প্রকৃত মহৎলোক তাঁর কর্ম্মে ছড়িয়ে থাকেন—প্রকৃত চিন্তাশীল দার্শনিক তাঁর চিন্তার ধারায় ছড়িয়ে থাকেন। সেখান থেকে তাঁর জীবন কাহিনী পাবে। আর আত্মজীবনী যাঁরা লেখেন—তাঁরা আধাআধি দিয়ে আরও গোলমাল করেন। তোমার মনে কখন কোন্ প্রলোভন আধিপত্য করেছে, কখন কোন সয়তানী পাপের মোহে তুমি আচ্ছন্ন হয়ে

কোন কাজ করেছ তাতে তোমার জীবনে কি শিক্ষালাভ করেছ এসব কি কেহ খুলে লেখে? জীবনটী যদি দেখাতে চাও তার ভালমন্দ সব খুলে দেখাবে—তবে লোকে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে ভাল মন্দের দ্বন্দ্বে তিনি তোমাকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তা নয়—আত্মজীবনী মানে নিজের ওকালতী করা।

আমি। কেহ কেহ তো আত্মজীবনীতে তার নিজের দুষ্প্রবৃত্তির কথা ব'লে থাকে।

গিরীশবাবু। তাও নিজের মহত্ব প্রকাশ করবার জন্য। মানুষ সরলভাবে অকপট চিত্তে তার দোষগুণ অপরের নিকট ব্যক্ত করতে অক্ষম। নিজের সাথে মানুষ কতদিন এই লুকোচুরী খেলছে;—নিজের স্ত্রীর কাছেও মানুষ সব কথা খুলে বল্‌তে পারে না—তা আবার অপরের কাছে—তার উপর আবার লিখে বই ছাপিয়ে বিক্রয় ক'রে বল্‌বে।

আমি। আপনার "শঙ্করাচার্য্য" বই সম্বন্ধে আমি আপনাকে আর দু একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে চাই।

গিরীশবাবু। কি বল না।

আমি। আপনি নাটকে যে শঙ্করাচার্য্য দেখিয়েছেন—কেহ কেহ বলে তা ঠিক শারীরিক ভাষ্যপ্রণেতা অদ্বৈতবাদী শঙ্করের প্রকৃত ছবি নয়। ঠাকুরের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শঙ্করের মুখে সেই সমন্বয় তত্ব প্রচার ক'রেছেন।

গিরীশবাবু। কেন? শঙ্কর যেমন অদ্বৈতভাব প্রচার ক'রেছেন তেমনি কোনও দেব দেবীর স্তব করতেও তো তিনি বাকী রাখেন নি!

আমি। কেহ কেহ বলেন এসব স্তব ভাষ্যকার শঙ্করের রচিত নয় অন্য শঙ্করাচার্য্যের লেখা। কেননা শঙ্কর মঠের শিষ্যেরা গুরুপরম্পরায় শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হ'য়ে থাকেন।

গিরীশবাবু। দেখ মানুষ যেখানে যেই ধরতে পারে না সেখানে দুজন এনে খাড়া ক'রে। তাই রামপ্রসাদ দুজন, শঙ্কর দুজন, ব্যাস দুজন, এই রকম theory খাড়া করে। যে শঙ্করাচার্য্য কবে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাই আজ কেহ ঠিক নির্ণয় করতে পারেনি—তাতে আবার সেই শঙ্করাচার্য্যের রচনার মৌলিকতা বিচার করবে কেমন ক'রে? আর এক শঙ্করাচার্য্য খাড়া করেছ শুধু স্তব রচনা হয়েছে ব'লে। ধর্‌লাম স্তব রচয়িতা আর এক শঙ্করাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু যিনি স্তব রচনা ক'রেছেন তাঁর প্রতিভাও তো কম নয় স্বীকার করতে হ'বে। তাঁরা কি স্তব রচয়িতা শঙ্করাচার্য্যের অপর কোনও গ্রন্থাদি লেখা দেখাতে পেরেছেন? কোন্ সময়ে কোন শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকি নির্ণয় করতে কেউ পেরেছেন? না শুধু স্তব রচনা আর শারীরিক ভাষ্য দেখে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রেছেন—এ শঙ্করাচার্য্য সে শঙ্করাচার্য্য নয়। এই ব'লে গিরীশবাবু তাঁর নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রে—মিনিট দুই পরে আবার তাঁর আসনে এলেন। তিনি বল্লেন, "দেখ শঙ্করাচার্য্য নাটকে যা দেখানো হয়েছে তা ঠিক হয়েছে। আমি Inspirationএ লিখেছি।

ঠাকুর বল্‌তেন সব শিয়ালের এক রা। প্রত্যেক মহাপুরুষ এক সত্যের প্রচার ক'রে থাকেন। তবে স্বামিজীকে দেখে আমি শঙ্করের ছবি উপলব্ধি ক'রেছি। "শঙ্করাচার্য্য" বই যখন শেষ ক'রে থিয়েটারে পাঠাই তখন আমি ত বারাণসী ধামে। আমি যে বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম—তারই নিকটে একটু নির্জ্জন জঙ্গলের ভিতর শঙ্করের একটি পুরাতন মঠ আছে। সেখানে শঙ্করের অপূর্ব্ব সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমি সেই মূর্ত্তির পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়ে হাতের লেখা বই (manuscript) পাঠিয়ে দি। সে সময় আমার বিশ্বাস ছিল—শঙ্করের বই জমবে। শঙ্কর যথার্থ যা ছিলেন—যে ভাব প্রচার ক'রেছিলেন—শঙ্করের নাটকে ঠিক তাই লেখা হয়েছে। এই বই আমি নিজে লিখিনি—Inspirationএ লেখা হয়েছে।

রাত্রি তখন প্রায় ১টা। আমরা তার নিকটে বিদায় গ্রহণ ক'রে চলে এলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

রস

উৎসরে রসের ধারা আকুলিয়া তৃষিতে,
অমৃত না হলাহল আছে মিশে পৃষিতে।
আকণ্ঠ করগো পান কিবা নর দেবতা—
রসপানে প্রাণে প্রাণে জগতের একতা।
অমৃত কি শুধু মধু দিতে পূর্ণ চেতনা ?
ধ্বংস কি বিষে ভাসে মরণ কি বেদনা ?
নিঙ্গাড়িয়া নিখিলের স্নায়ু-শিরা-ধমনী
উৎসরে রসের ধারা পিপাসিয়া অবনী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ময়মনসিংহের কাব্য-কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

আমি গীতিকাগুলির আর একটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করিব। ময়মনসিংহ গীতিকা অভিজাত সাহিত্য নহে, ইহা সাধারণের সম্পত্তি। স্থানান্তরে আমি আমাদের বর্ত্তমান যুগের কথা সাহিত্যের আভিজাত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।* আমি নিজে এ সাহিত্যে যৎকিঞ্চিৎ ভাগ লইয়াছি, এবং বলা বাহুল্য আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, আমি তাহাকে নিকৃষ্ট মনে করি না; নিজের ছেলের রূপ কেউ কম দেখে না। কাজেই আমাদের সাহিত্য যে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি দিয়া লেখা, এবং ইহা লিখিবার সময় যে আমরা অভিজাত শ্রেণীর শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই লিখি ইহাতে এ সাহিত্যের যে গৌরব-হানি হয় এমন কথা অন্ততঃ আমি বলিব না। কিন্তু বর্ত্তমানযুগের সাহিত্যে যত উৎকর্ষই আমরা লাভ করিয়া থাকি, তাহা যে আপামর সাধারণের সম্পত্তি নয়, এবং তাহাতে যে আমরা সাধারণ লোক, "বাজে লোকের" জীবনকে পরিপূর্ণরূপে অবহেলা করিয়া গিয়াছি এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, আর একথাও আমরা স্বীকার না করিয়া পারি না যে আমাদের সাহিত্য যে বঙ্গবাসী সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে নাই – এ কথাটা একটা পরিতাপের বিষয়।

ময়মনসিংহ গীতিকায় যে সব কথা আছে তাহা অন্ততঃ সেকালের বাঙ্গালা দেশের সকলেরই বোধগম্য ছিল—যে জীবনের পরিচয় ইহাতে আছে যে সব ভাব ও চিন্তা ইহার উপজীব্য সকলই সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনেকগুলিই এমন একটা উচ্চ **culture**এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে তাহা সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষে কালিদাসের মেঘদূতের চেয়ে অধিক সুখবোধ্য নয়। ইহাতে কাব্যহিসাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎকর্ষের পক্ষে কোনও নিন্দার কথা নয় কিন্তু এ কবিতা যে সমগ্র জাতির সম্পত্তি নয় ইহা একটা দুঃখের কথা এবং ভাবিবার কথা।

আমাদের সাহিত্যের এই আভিজাত্য লইয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার গোড়ার কথাটা খুব ভাল করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এ অবস্থার মূল হেতু এই যে আমাদের সমাজে ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর ভিতর একটা প্রকাণ্ড শিক্ষাঘটিত ব্যবধান জন্মিয়া গিয়াছে। আমরা, অর্থাৎ আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়, আমাদের পরম্পরাগত প্রাচীন cultureএর ধারা ছাড়াইয়া

---

* বঙ্গবাণী আষাঢ় ১৩৩১ "বাঙ্গালা কথার আভিজাত্য"।

অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। সমগ্র জগতের cultureএর সঙ্গে আমাদের চিত্তের অল্পবিস্তর সংযোগ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের বাহিরে যে অশিক্ষিত সাধারণ সমাজ তাহা এখনও প্রায় সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র আমাদের দেশের পরম্পরাগত শিক্ষা ও সংস্কার, আমাদের প্রাচীন cultureএর ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে তাই আমাদের চিন্তা ও ভাষা ইহাদের চিন্তা ও ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন, আমাদের সুখ-দুঃখ-বোধ ভিন্ন। জনসাধারণ যাহাতে অশেষ আনন্দলাভ করে তাহাতে আমরা আনন্দ পাই না, তাদের যে বিষয়ে মন বসে আমাদের তাহাতে মন বসে না, আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর আনন্দের যোগ সম্পাদন কাজেই একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বা সাহিত্যের ভিতর আমাদের আনন্দ তাহা জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত। যাহাতে জনসাধারণ আনন্দলাভ করে তাহা আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

ইহার প্রতিকারের জন্য একদল লোক বলেন যে বর্ত্তমান মুছিয়া ফেলিতে হইবে, ইংরাজ অধিকারের পর হইতে আমাদের মনোজগতে বাহির হইতে যে সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে সে সমুদয় বিলুপ্ত করিয়া বাঙ্গলার প্রাণের যে পুরাতন সুর তাহাই আশ্রয় করিতে হইবে। তবেই আমরা সাহিত্য সাধনায় ঠিক জনসাধারণের সমক্ষেত্রে গিয়া পৌঁছিতে পারিব, তবেই সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর আনন্দের যোগ পুনরায় সাধিত হইতে পারিবে। আমার মনে হয় এ মতের ভিতর একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা নিহিত আছে। যদি এমন হইত যে আমাদের বর্ত্তমান যুগের ভাব ও চিন্তা আমাদের চিত্তের প্রকৃত প্রকাশ নয়, ইহা আমাদের ষোল আনা ধার করা জিনিষ; তবে এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু তা' তো নয়। আজকার যে সাহিত্য তাহা আমাদের প্রাণের স্বরূপ অনুভূতির প্রকৃত প্রকাশ। আমাদের সাধনক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে, সমস্ত বিশ্ব হইতে নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া আমাদের অন্তরে শাশ্বত রসমূর্ত্তির সেবা হইতেছে, এ পূজায়, উপচার ঠিক পূর্ব্বের মত নয়, কিন্তু ইহাও পরিপূর্ণরূপে আন্তরিক। তাই ইহাতেও রস নূতন রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ রসের সম্পদ বর্জ্জনীয় নয়। তা ছাড়া হুকুম করিলেই তো কবির অনুভূতির চেহারা বদলান যায় না। কাব্যমাত্রেই খুব বেশী পরিমাণে স্বয়ম্ভূ, কবির অন্তরের যে সহজ অনুভূতি তাহা কাব্যে স্বচ্ছন্দে ফুটিয়া উঠে। সামাজিক প্রয়োজন অপ্রয়োজন দিয়া ইহার সৃষ্টি নিয়মিত করিবার চেষ্টা বৃথা। তার চেয়ে চাঁদের আলোর ভিতর রঙের বৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টায় বেশী কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

এ অবস্থার প্রতিকারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে প্রতিকারের পথ দুইটি, দুই দিক দিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। একদিকে কবির এই নিদারুণ আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অবনত পরিভূত দরিদ্র জনসাধারণের জীবন ও চিন্তার অনুশীলন করিয়া তাহার ভিতর যে রসের উপাদান আছে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে—গরীবের জীবন ও চিন্তা লইয়া রস রচনায়

যত্নবান হইতে হইবে। অপরদিকে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে নানা পথে শিক্ষাবিস্তার করিয়া তাহাদের রসানুভূতির শক্তি উন্নত ও বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

আমাদের বর্ত্তমান যুগের সমস্ত সাহিত্য আমাদের অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া লেখা। ইহার ভাব ও অন্তর্নিহিত চিন্তার ধারা শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাব ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ হইবার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ আমরা আমাদের দরিদ্র ও অশিক্ষিত স্বদেশবাসীদের অন্তরের কোনও পরিচয়ই রাখি না। এক হিসাবে আমরা ইউরোপ বা আমেরিকার নরনারীর চিত্তের সংবাদ যতটা রাখি আমাদের দেশের দরিদ্র ও অবনত শ্রেণীর সংবাদ ততটা রাখি কিনা সন্দেহ। যাহা জানি না সে সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি তেমন স্পষ্ট হয় না, কাজেই তার সম্বন্ধে আমরা কিছু লিখিতে পারি না। ইহার দ্বিতীয় কারণ এই যে আমাদের লেখার পাঠক সম্পূর্ণই অভিজাত শ্রেণীর। "ময়মনসিংহ গীতিকা" প্রভৃতি পুরাতন সাহিত্যের প্রচার ছাপান বইয়ের দ্বারা হইত না, হইত মুখের কথায়—গানে; তার শ্রোতা হইত ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীর। আমাদের কথার প্রচার হয় ছাপান বইয়ে। "কালির আখর যার পেটে নাই" তার পক্ষে আমাদের বাণী অনধিগম্য, তারা আমাদের কথার খবর রাখে না।

পাঠকের যে লেখকের উপর কতখানি প্রভাব তাহা সকলে বুঝিতে পারেন না। লেখক যখন লেখেন তখন তাঁর মনশ্চক্ষে তিনি এক শ্রোতৃমণ্ডলী কল্পনা করিয়া জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক তাহাদিগের গ্রহণ করিবার শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লেখেন। আমাদেরই ইংরাজী লেখার সঙ্গে আমাদের বাঙ্গলা লেখার তুলনা করিলে বোধ হয় একথা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। ইংরাজী লেখা যাঁরা পড়িবেন তাঁদের সকলের ভিতর আমি যে পরিমাণ শিক্ষা ও জ্ঞান কল্পনা করিয়া লইয়া লিখিতে পারি, বাঙ্গলা লিখিবার বেলায় আমার সাধারণ পাঠকের মধ্যে ততটা বিদ্যা বা জ্ঞান কল্পনা করিতে পারি না। আবার বিশেষজ্ঞদের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে গেলে তার চেয়েও অনেক উচ্চস্তরের জ্ঞান ও বিদ্যা কল্পনা করিয়া লিখিতে পারি।

অন্যান্য রচনার ন্যায় রসরচনাও শ্রোতার চিত্তের অবস্থা, তার জ্ঞান ও রস বোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই লেখা হয়। যে কথায় বাঙ্গালী পাঠকের মনে অনায়াসে রস উদ্বুদ্ধ হইবে, ইংরাজ পাঠকের চিত্তে সেই রস উদ্বুদ্ধ করিতে গেলে সে কথায় হইবে না, অন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নহিলে রস জমিবে না। রস জমাইতে হইলে বক্তা ও শ্রোতা, লেখক ও পাঠকের সহকারিতা আবশ্যক। বক্তা বা লেখক যে রস কথায় গাঁথিয়া তোলেন, সে রসের অনুভূতি যদি শ্রোতার মনে না থাকে, তবে সে রসোদ্রেক অসার্থক হয়। কুসুম কলির অপরূপমাধুরী যেমন সন্ধ্যা বায়ুর স্পর্শে বিকশিত হইয়া ওঠে, তেমনি শ্রোতার অন্তরের রসবোধের কোমল স্পর্শে বক্তার ধৃত রসের সকল মাধুরী ফুটিয়া ওঠে। বীণার তারের যে ঝঙ্কার তাহাতেই

তার সুরের জন্ম হয় সত্য কিন্তু সে সুরের আঘাতে বীণার দারুময় কাণ্ডে প্রতিহত হইয়াই তাহা তার সকল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে।

আমরা যে সুরে গান গাই বা কথা কই তার প্রতিধ্বনি খুঁজি অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে, তাই সে সুর আমরা বাঁধি এই অভিজাত সম্প্রদায়ের রসবোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ইহার বাহিরে জন সাধারণের ভিতরে কি রসবোধ আছে না আছে সে সংবাদ আমরা রাখি না। রাখিলেও তাহা কাজে আসে না, কেন না আমাদের রচনা তাহাদের কাছে পৌঁছাইবার কোনও উপায় আমাদের নাই—আমাদের বই তো তাহারা পড়িবে না। কাজেই আমাদের অভিজাত সমাজ যতই বেশী পরিমাণে আমাদের সাধারণ সমাজের cultureএর ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, তাঁদের সাহিত্যও তেমনি উত্তরোত্তর বেশী আভিজাত্য অর্জ্জন করিতেছে।

ময়মনসিংহ গীতিকা হইতে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া আমি আমার বক্তব্য একটু স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। বিরহের কবিতা ও গদ্যনিবন্ধ আপনারা অনেক পড়িয়াছেন, পড়িয়া অনেক অশ্রুপাত করিয়াছেন; কিন্তু যে বিরহিণীর কথা আপনারা পড়েন বা উপভোগ করেন তিনি চাঁদের আলোয় বিমনা হইয়া পড়েন, মলয় বাতাসে তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়, কোকিলের কুহরবে চকিত হইয়া পড়েন। তাঁর পুরু গদি ওয়ালা বিছানা কণ্টকিত হইয়া উঠে, কঙ্কণের ভার ভারী হয়, হৃদয়ে কবিতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বিরহিণী মদিনার এই পত্রখানা ইহার পাশে মিলাইয়া দেখুন। দুলাল মদিনাকে তালাকনামা পাঠাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে—মদিনা ভাবিল,

"আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে॥
দুলালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে।
মদিনারে ভালবাসে যেবা জান পরাণে॥
তারে ছাড়িয়া দুলাল রইতে না পারিব।
কতদিন পরে খসম নির্চয় আসিব॥"
আইজ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী ছিল কত রাইত গোঁয়াইয়া॥
আইজ বানায় তালের পিডা কাইল বানায় খৈ।
ছিকাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্ধা দৈ॥
শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাড়িতে ভরিয়া রাখে ছিকাতে তুলিয়া॥
এই মতন খাদ্য কত মদিনা বানায়।
হায়রে পরাণের খসম ফিরা নাহি চায়॥

ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছালুন।
আইজ আইব বল্যা রাখে খসমের কারণ॥
তেওতো না পরাণের খসম দেশেতে ফিরিল।
অভাগীর কোন দোষ কেমনে ভুলিল॥

ইত্যাদি।

এ চিত্র প্রত্যেক কৃষক কন্যা কৃষক পত্নীর অন্তরে অশ্রুর যে প্রবাহ বহাইয়া দিবে—স্বামী-পরিত্যক্তা সূর্য্যমুখী বা ভ্রমরের অভিজাত বিরহ সে স্রোত বহাইতে পারিবে না। তার কারণ এই যে এ বিরহ গাথা যে সুরে বাঁধা তাহা প্রতি কৃষক নরনারীর অন্তরের সুর, আর সেই সুরের দিকে কাণ খাড়া করিয়া সুরসজ্ঞ কবি ইহা লিখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র এ সুরে ঘা' দিতে পারেন নাই। ইহা তাঁদের অগৌরবের কথা নয়, তাঁদের কাব্যের অপরূপ সৌন্দর্য্যের ইহাতে কোনও হানি করে না, কিন্তু আমাদের জনসাধারণের রসানুভূতির সঙ্গে আমাদের আজকালকার রসসৃষ্টির চেষ্টার এই সুদূর ব্যবধান একটা ভাবিবার কথা—এ ব্যবধান দূর করিবার চেষ্টার প্রয়োজন আছে।

ইহা দূর করিতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ এই সাধারণ জীবনে যে রসের সাগর আছে তাহার ভিতর ডুবুরী হইয়া নামিতে হইবে, তাহার ভিতর হইতে রত্ন সঞ্চয় করিয়া এমন মালা গাঁথিতে হইবে যাহা অভিজাত সম্প্রদায় আদর করিতে পারিবেন, জনসাধারণ উপভোগ করিতে পারিবে। ইহার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের অভিজাত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অজ্ঞানের যে পুরু পরদা পড়িয়া গিয়াছে তাহা ভেদ করিয়া দরিদ্রের জীবন ও অন্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করা। এ কাজের প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশী, শুধু সাহিত্যের জন্য নয়, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতের জন্য। সাহিত্যের যে আভিজাত্যের কথা আমি বলিয়াছি ইহা শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, ইহা আমাদের সামাজিক জীবনকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমাদের নৈতিক, সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক সকল প্রকারের সৎচেষ্টা পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহা অভিভূত করিয়াছে। আমরা যখন আমাদের দেশের বা সমাজের কথা চিন্তা করি তখন আমরা ভাবি আমাদের অভিজাত সমাজের কথা, যখন শিক্ষার কথা আলোচনা করি তখন ভদ্র সমাজের শিক্ষার কথা আমাদের চিত্তের সমগ্র ক্ষেত্র জুড়িয়া বসে, যখন সামাজিক মঙ্গল সাধন করিতে বা সমাজের অমঙ্গল নিবারণ করিতে চাই, তখন যে সমাজের কথা ভাবি সে ভদ্র সমাজ, দারিদ্র্যের কথা দুঃখের কথা যখন বলি তখন ভদ্র সমাজের দারিদ্র্য তাহাদের দুঃখই আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র অধিকার করে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা ভাবিতে গেলে আমরা ঠিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করি না, সমগ্র জাতি, কুটীরবাসী দীন দরিদ্র যে জাতি তার কথা ভাবি না, ভাবি আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা, হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া যখন ঝগড়া করি তখন অভিজাত হিন্দু ও

অভিজাত মুসলমানের কথাই চিন্তা করি। আমরা আমাদের অভিজাত চিত্তের চারিদিকে ক্রমে এত বড় একটা প্রাচীর রচনা করিয়া বসিয়াছি যে আমাদের দৃষ্টি আর কোনও মতেই সে প্রাচীর ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না। সেই প্রাচীরের বাহিরে যে বিরাট জাতি পড়িয়া আছে, যাদের সমৃদ্ধিতে আমাদের সমৃদ্ধি, যাদের জ্ঞানের পরিমাণে আমাদের জ্ঞান, যাদের মুক্তিতে আমাদের মুক্তি, যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা তাহাদিগকে অবহেলা করিয়া করিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগের মঙ্গলের চেয়ে আমাদের মঙ্গলকে বড় করিয়া আসিয়াছি।— কিন্তু বৃটিশ অধিকারের পর হইতে নূতন অভ্যুদয়ের পথে উন্মত্তভাবে অগ্রসর হইতে গিয়া তাহাদিগের কথা যতটা ভুলিয়া গিয়াছি, তাদের উপর যতটা অবজ্ঞা ও অবহেলা বর্ষণ করিয়াছি এতটা বোধহয় কোনও দিনই করি নাই।

অথচ, এই অবনত পরিভূত জাতির সঙ্গে আমাদের অন্তরের সংযোগ যে কত নিবিড় কত গভীর তাহা একটু অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। কূপমণ্ডুকের মত আমরা আপনার গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়া আছি, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি যে যে জলের শীতলতা আমাদের স্নিগ্ধ আশ্রয় রচনা করিয়াছে তাহা বাহির হইতে চুয়াইয়া আসে। আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে এই অবজ্ঞাত জনসঙ্ঘের সেবা ও যত্নের উপর, শুধু তাই নয়, যতদিন ইহারা অজ্ঞতা, অভাব ও অত্যাচারের তলে জর্জ্জরিত হইয়া থাকিবে ততদিন আমাদের জ্ঞানের চরম প্রসার হইবে না, আমাদের অভাব মিটিবে না, আমাদের শক্তি ও সমৃদ্ধি আসিবে না।

উদর ও অন্যান্য অবয়বের ঝগড়ার প্রাচীন কাহিনী আমরা সকলেই জানি। তাতে এই প্রমাণ হয় যে শরীরের কোনও অঙ্গই অপর কোনও অঙ্গকে ছাড়াইয়া বড় হইতে পারে না। এক অঙ্গের উপর আঘাত অপর সমস্ত অঙ্গকে পীড়িত করিবেই করিবে। সমাজের ইতিহাসে এ কথা বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। কোনও সমাজের উপর আধিপত্য করিবার সুযোগ পাইয়া যে জাতি বা সম্প্রদায় তাহাকে অবহেলা বা অত্যাচারে পীড়িত করিয়াছে, বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে সে জাতি বা সম্প্রদায় সেই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় চিরদিনই অভিভূত হইয়াছে। রোমের মত জাতি যখন ঐশ্বর্য্যে মদমত্ত হইয়া সাম্রাজ্যের উপর বাণিজ্য করিয়া সাম্রাজ্যের সকল জাতির সমৃদ্ধি লুণ্ঠন করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে লাগিল, তখন সেই সমৃদ্ধিই কালকূটরূপে তাদের জাতীয় জীবনের ভিতরকার শক্তি হরণ করিল, তাই বর্ব্বর জাতির হস্তে সুসভ্য রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ যখন আপনার গৌরবের ক্ষেত্র হইতে, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ গৌরব সাধনের ব্রত হইতে চ্যুত হইয়া নিজের আভিজাত্যটাকেই প্রধান সম্পদ করিয়া তুলিলেন ও বিরাট শূদ্রজাতিকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন হইতেই তাঁর যে পতন আরম্ভ হইল তাহার জন্য যে শূদ্র জাতির বিদ্রোহের আবশ্যক হইল না, সে পতন সাধন করিল তাঁদের অধিকারের বিষ—তাহাই তাঁহাদের অন্তরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাঁদের আধ্যাত্মিকতার পরম সম্পদ ও শক্তি হরণ করিল। আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরও এই সর্ব্বনাশের বীজ কেমন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা তত্ত্বদর্শীমাত্রই

দেখিতে পারিবেন। ইংলণ্ড ছিল ইউরোপের মধ্যে সব চেয়ে ছোট সব চেয়ে শক্তিহীন দেশ, কিন্তু ইংলণ্ডের গৌরব ছিল তার স্বাধীনতা বোধ। এই প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ তাহাদিগের মধ্যে এমন একটা বৃহৎশক্তি জাগ্রত করিয়াছিল, ইহার তীব্র আলোক তাহাদিগের অন্তর এত উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক সম্পদে মণ্ডিত করিয়াছিল যে দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ড সমগ্র জগতের মধ্যে শক্তি সম্পদে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল! আজ ইংলণ্ড Little England নয়, আজ সে একটা বিরাট সাম্রাজ্য, ভারতের ত্রিংশাধিক কোটি লোক আজ তার পদানত--সমগ্র জগতে তার পতাকা উড়িয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড তার দেবদত্ত সম্পদ যে স্বাধীনতা-বোধ তাহা আজ হারাইতে বসিয়াছে। যে স্বাধীনতার ধ্বজা ইংলণ্ড প্রথম জগতে উড়াইয়াছিল, তাহা সে ভারতে আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—এখানে ইংলণ্ড সম্রাট হইয়া আসিয়াছে—আপনাকে একটা বৃহৎ অধিকারের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া সে ত্রিশ কোটি জীবের ভিতর স্বাধীনতাকে নিষ্পেষিত করিয়া মারিয়াছে। তার ফল আজ দেখা যাইতেছে। আধিপত্য করিতে করিতে অধিপত্যের অভ্যাস তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে—স্বদেশের রাষ্ট্রনীতিতেও আজ ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ Bruke Bright বা Gladstone, Cowper বা Wilberforce-এর মত অখণ্ড বাধাশূন্য নিরুপাধিক স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন না। বিশ্বরাষ্ট্রের সমবায়ে যেখানে Wilson স্বাধীনতার উদাত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন সেখানে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি কেবল স্বাধীনতাকে সর্ব্বথা খর্ব্ব করিবার উপাধি ও বন্ধনের কথাই চিন্তা করিতে পারিয়াছিলেন। যে উদার প্রচণ্ড তীব্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা ইংলণ্ডকে বড় করিয়াছিল, আদর্শের যে উগ্র অনুশীলনচেষ্টা তার সকল কার্য্যকে গৌরব ও সৌভাগ্যমণ্ডিত করিয়াছিল তাহা আজ লোপ পাইয়াছে। যে প্রেমিক বৈরাগী জগৎকে মুক্তির মন্ত্রে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে আজ ঘোর সংসারী হইয়া টাকা আনা পাইয়ের হিসাব করিতে বসিয়াছে। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বাড়িয়াছে, সম্পদের সীমা নাই---কিন্তু সে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইয়াছে। এই আধ্যাত্মিক অধোগতি যে তার বিনাশের বীজ বহন করিতেছে এ আশঙ্কা আজ অনেককে করিতে হইতেছে।

অত্যাচার ও অবহেলায় সমাজের এক অংশ যদি আর এক অংশকে পীড়িত করে তবেও এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। অত্যাচারিত সমাজ হয় তো বিলুপ্ত হইতে পারে, হয় তো তারা তার কোনও প্রতিকার না করিতে পারে কিন্তু যে আধিপত্যের মদে মত্ত হইয়া অধিকৃতের অধিকার বিস্মৃত হয় তার নৈতিক অধোগতি ও সমস্ত আধ্যাত্মিক জীবনের সমাধি অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং আমরা যদি এই পরিণতি লাভ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাই তবে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য আমাদের সকল দিক দিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া এই অবনত পরিভূত জাতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে. সহানুভূতির যতগুলি সূত্র আছে সব ধরিয়া তাহাদিগকে কোলে টানিয়া লইতে হইবে, তাদের ভাষায় আমাদের কথা কহিতে হইবে, তাদের সুরে আমাদের গান বাঁধিতে হইবে—আর আমরা যে বিদ্যা, যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, দুই হাতে তাহা বিতরণ করিয়া

তাহাদিগকে আমাদের সমান ক্ষেত্রে টানিয়া তুলিতে হইবে। নহিলে আমাদের জাতীয়তা পঙ্গু হইয়া যাইবে, সামাজিক জীবন ক্ষুণ্ণ হইবে, সাহিত্য এই বিরাট জীবনদায়ী রসক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে অসার ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। একথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে যুগযুগান্তরের অবহেলা ও অবজ্ঞায় পুষ্ট আমাদের দরিদ্র জাতির অশ্রুসাগরের প্রত্যেকটি বিন্দু আমাদের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শোষণ করিতে হইবে, না হইলে কি রাষ্ট্রনীতি, কি সমাজ, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কোনও দিকেই আমাদের চরম অভ্যুদয় লাভ হইবে না।

আর একটি মাত্র কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সেদিন মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণে মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে সাহিত্য সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলন ক্ষেত্র। এখানে সকল ধর্ম, সকল সম্প্রদায় আপনাদিগের বিরোধ বিস্মৃত হইয়া সহানুভূতির সহিত পরস্পরের সাহচর্য্যে আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। তিনি বিশেষ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সহযোগের কথা বলিয়াছেন। তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা পাঠ করিয়া আমার এই কথাটা খুব প্রবলভাবে মনে হইতেছিল যে যে যুগে এই সব গাথা রচিত হইয়াছিল তখন ইহার ভিতর দিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর কেমন একটা আনন্দের যোগ সাধিত হইত, ইহাতে উভয়ের উভয়ের অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিবার কি সুন্দর রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

সে কালের কবিরা পালা রচিয়া সভায় গাহিতেন, সে সভায় হিন্দু আসিত, মুসলমান আসিত, সকলে ইহাতে আনন্দলাভ করিত। হিন্দু কবি দ্বিজ কানাই তাই তার বন্দনাগীতিতে গাহিয়াছেন,

পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর।
একদিকে উদয় রে ভানু চৌদিকে পশর ॥
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বানিজ্জি করে চান্দ সদাগর ॥
উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্বত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলার মালামের পাথ্‌থর ॥
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উরদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান ॥
সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম ॥
চাইর কুণা পিরথিমি গো বইন্দ্যা মন করলাম স্থির।
সুন্দরবন মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর ॥

আসমানে জমিনে বন্দলাম চান্দ আর সুরুয।
আলাম-কালাম বন্দলাম কিতাব আর কুরাণ॥

ইহার ভিতর হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ স্বীকার করিয়া তাহার কোনও চেষ্টাকৃত সমাধানের আয়োজন নাই, জোর করিয়া প্রীতি দেখাইবার, বা ভয় পাইয়া খোসামোদ করিবার কোনও পরিচয় নাই। কবির সহজ অনুভূতিতে যে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন তাহারই ফলে তিনি এই বন্দনা রচনা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের মূল অনুভূতি এই যে ধর্মজীবনে ও সংস্কারে প্রত্যেকের একটা বিশিষ্ট ক্ষেত্র আছে, সে ক্ষেত্রে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণের অধিকার আছে। আমার যে ক্ষেত্র তাহা তোমার নয়, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তোমার যে আচার তাহাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আমার ক্ষেত্রে আমার আচারকে তুমি শ্রদ্ধা করিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিতরে এই যে তত্ত্ব নিহিত আছে তাহার বিকৃতি স্বরূপ কালক্রমে একটা অত্যাচার ও অবজ্ঞার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হিন্দু আজও তার ধর্ম্মের এ মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হয় নাই। এই তত্ত্বের ক্ষেত্র হইতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ধর্ম্মভেদ সত্ত্বেও আপনার প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

ধর্ম্মের দিক হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ পূর্ব্ববঙ্গে কোনও দিনই ছিল না, আজও নাই স্থানে স্থানে জোর করিয়া এ বিরোধ ইদানী সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু সে বিরোধের ভিতর ধর্ম্মের দিক হইতে কোনও আন্তরিকতা নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস! কিন্তু এখন এক নূতন বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে রাজনৈতিক অধিকার লইয়া। এই বিরোধ সম্বন্ধে রাজনৈতিক হিসাবের আলোচনা আমি অন্যত্র অনেক করিয়াছি, সে কথা এখানে উত্থাপন করিব না। আমি এ বিষয়টি অত্যন্ত যত্নের সহিত আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত সেটি এই। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক বিরোধের বাস্তবিক কোনও স্থায়ী ভিত্তি নাই, ইহা একটা সাময়িক উত্তেজনার ফল মাত্র। কিন্তু এ বিরোধ যে উপস্থিত হইয়াছে তার কারণ এই যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর পরস্পর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাব। মুসলমান হিন্দুকে বিশ্বাস করেন না, হিন্দু মুসলমানকে বিশ্বাস করেন না। এ রকম স্থলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কার্য্য ভাব ও চিন্তার কদর্থ করেন এবং যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব্যাপার তাহা হইতে এই অবিশ্বাসের ফুৎকারে বিষম অগ্নি উভয়ের অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এ রকম বহু দৃষ্টান্তে আমি দেখিয়াছি, এমন অনেক বিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কথা আমি শুনিয়া এই সিদ্ধান্তই করিয়াছি যে বিরোধের বিষয় কিছুই নাই, আছে শুধু অন্তরের এই বিষাক্ত অবিশ্বাস।

এই পরস্পর অবিশ্বাসের হেতু এই যে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর আজকাল সামাজিক সম্বন্ধে বন্ধন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। যেখানে সামাজিক আদানপ্রদান আছে, সেখানে পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা আছে, সেখানে বিরোধ নাই। দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের ভিতর

আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ নাই—কারণ, তাদের ভিতর খানাপিনা না থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের অন্তরের আদান প্রদান আছে, একে অপরের অন্তরের সংবাদ রাখে। বিরোধ যা কিছু আছে তাহা শিক্ষিত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে। তার একটা প্রকাণ্ড কারণ এই যে ভদ্র হিন্দু ও ভদ্র মুসলমান একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কুঠারীতে বাস করেন, একের সঙ্গে অপরের পরিচয়ই নাই। বাহিরে কালেভদ্রে আমরা পরস্পরকে আদাব বা সেলাম করি, কোথাও বা দুটা বাৎচিৎ করি, কিন্তু ঘরের কথা কেউ কারো জানি না। ইহাতে অন্তরঙ্গতা জন্মায় না। কোনও সময়ে আমার একস্থানের ইংরেজ ভদ্রলোকদের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল, তাঁরা আমার বাড়ীতে আসিতেন আমরা তাঁদের বাড়ী যাইতাম, তাঁদের সঙ্গে নানাস্থানে মিলন, হাস্য পরিহাস, আমোদ-প্রমোদ করিতাম। কিন্তু একটা কথা আমার বিশেষ করিয়া মনে হইত যে আমরা উভয় পক্ষই সেখানে বাহ্যিক অন্তরঙ্গতার মুখোস পরিয়া থাকিতাম। কেউ কারও অন্তর খুলিয়া দিতাম না। কেউ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজের প্রকৃত সত্তার পরিচয় দিতাম না, একটা অন্তরাল আমাদের ভিতর থাকিয়া যাইত। আমার অনেক মুসলমানে বন্ধু আছেন যাঁদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় আমার এই অন্তরাল থাকে না, তাঁদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে অন্তরঙ্গতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারি। কিন্তু অধিকাংশস্থলে আমাদের হিন্দু মুসলমানের ভিতর সম্বন্ধের মধ্যে এই আড়ষ্টতা ও অন্তরাল থাকিয়া যায়। তার কারণ এই যে আমরা পরস্পরকে চিনি না, আমাদের স্বাভাবিক যে জীবন তাহা আমাদের গৃহের প্রাচীরের ভিতর যাপিত হয়, হিন্দুর গৃহে মুসলমানের প্রবেশ নাই, মুসলমানের গৃহে হিন্দুর প্রবেশ নাই। এই অবস্থা হইতে স্বভাবতঃই জন্মে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। নির্দ্দোষ কার্য্যেও একে অপরের দুরভিসন্ধির কল্পনা করেন—কেন না তাঁহাদের পরস্পরের অন্তরের সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় নাই।

হিন্দু ও মুসলমানের এই যে অন্তরের বিরোধ আজকাল মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার মূলোচ্ছেদ না করিতে পারিলে কোনও বাহ্যিক প্রচেষ্টা, কোনও পাওনা দেনার হিসাব, কোনও সুবিধার লেন দেনে হিন্দু ও মুসলমান এক হইবে না! আর হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও তাহাদিগকে অন্তরে অন্তরে, সহানুভূতির বন্ধনের দ্বারা এক করিয়া বাঁধিতে না পারিলে, জাতি কখনও গড়িয়া উঠিবে না, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোনও প্রকার অভ্যুদয়ই যথেষ্ট পরিমাণে আমরা লাভ করিতে পারিব না।

ইহার জন্য আমাদের অনেক কিছু করিতে হইবে, আমাদের আচরণ খুলিয়া পরস্পরের হৃদয়কে সামনাসামনি দাঁড় করাইতে হইবে, পরস্পরের অন্তরকে সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে, অন্তরে অন্তরে স্বর্ণসেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল সন্দেহ বর্জ্জন করিয়া একে অপরের দৃষ্টিক্ষেত্র আয়ত্ত করিবার চেষ্টা, একের অপরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার চেষ্টা—আর যত্ন করিয়া অন্তরের ভিতর জাগাইয়া তুলিতে হইবে আন্তরিক স্নেহ ও প্রীতি। অনেক উপায় এজন্য

অবলম্বন করিতে হইবে. অনেক দিক দিয়া পরস্পরের হৃদয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; সেই সব উপায়ের মধ্যে সাহিত্য একটা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে।

সাহিত্য যে আমাদের পরস্পরের অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করিতে কতদূর সহায়তা করিতে পারে তার সামান্য একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব মুসলমানের গৃহ ও অন্তঃপুর হিন্দুর কাছে চিরদিনই অনধিগম্য ছিল, হিন্দুর গৃহ ও অন্তঃপুরও মুসলমানের পক্ষে অনধিগম্য। কিন্তু তবু সেকালে আমাদের এই দেশের হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের অন্তর চিনিত, তার কারণ ছিল তাদের আবেষ্টনের ঐক্য—উভয়ের culture-এর ঐক্য। যদিও মুসলমানের culture-এর ধারার একটা বৃহৎ স্রোত আরব দেশ হইতে আসিয়াছে, তথাপি যুগযুগান্তর ধরিয়া এই দেশের culture-এর আবহাওয়ায় আসিয়া তাহা ইহার অনেকটা ছায়া গ্রহণ করিয়া একটা মিশ্র পদার্থে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুসমাজও নানা দিক দিয়া সমাজের গঠন পারিবারিক বন্ধন, সাহিত্য প্রভৃতির দ্বারা প্রভূত পরিমাণে মুসলমানের culture-এর ক্ষেত্রে খুব বেশী পরিমাণে এক ছিল, তাদের আমোদ-প্রমোদ, হাসি-খেলা সুখ, দুঃখ, culture দ্বারা নিয়ত হইয়াছে। ফলে পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের সকলের ভিতর তাদের ভিতর যোগের প্রণালী ছিল। সে সকল সংযোগ আজ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

. সেকালে যে সব গাথা শুনিয়া লোকে আনন্দ লাভ করিত তার ভিতর হিন্দুর কথা ছিল, মুসলমানের কথা ছিল জারী গানে মুসলমানের হাসান হোসেনের কথা গাহিয়া হিন্দু নর-নারীর চক্ষে অশ্রুধারা বহাইত, ভাসান গাহিয়া হিন্দু ও মুসলমান গায়ক মুসলমানের চক্ষে জল বাহির করিত। মহুয়া মলুয়ার কথা, চন্দ্রাবতীর কথা যেমন লোকে শুনিত, তেমনি শুনিত দেওয়ানা মদিনার কথা।

ইহাতে একটা লাভ হইত এই যে এই সাহিত্যের ভিতর দিয়া হিন্দু মুসলমানের অন্তরের পরিচয় পাইত। মুসলমান হিন্দুর অন্তরের পরিচয় পাইত। পরস্পরের পরস্পরকে বুঝিবার কোনও বাধা হইত না। দেওয়ানা মদিনার উপাখ্যান একটি মুসলমান পরিবারের কথা। ইহার ভিতর মুসলমানের মনের কথা তার ভাব ও চিন্তার সত্য পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এমন কে আছে যে মদিনা বা দুলালের দুঃখে অশ্রু না ফেলিবে এই একটি চিত্র হিন্দুর প্রাণে মুসলমানের সঙ্গে যে একাত্মবোধ যে সহৃদয়তা জাগাইতে পারে, শত শত বক্তৃতায় তাহা সম্ভব নয়। এই সব গাথা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বসিয়া শুনিত, ইহা লইয়া আলোচনা করিত, ইহার গীত কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহার দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর একটা সহানুভূতির কমনীয় বন্ধন সৃষ্ট হইত।

গত শতাব্দীর সাহিত্যের ভিতর এরকম কিছুই দেখিতে পাই না। এ সাহিত্য লিখিয়াছেন হিন্দু, ইহাতে হিন্দুর জীবন ও অন্তরের সুন্দর পরিচয় আছে, হিন্দু জীবনের কথা লইয়া অশেষ রস সঞ্চারিত হইয়াছে. কিন্তু মুসলমানের জীবন লইয়া কেহ কোনও উল্লেখযোগ্য কথা লেখেন নাই,

যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বহু পরিমাণে অসত্য, কেননা যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের মুসলমানের অন্তরের সঙ্গে, তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্যক পরিচয় নাই। কাজেই সাহিত্যের ভিতর দিয়াও আমরা এখন আর মুসলমানের অন্তরের পরিচয় পাই না। অল্প মুসলমানই বাঙ্গলা সাহিত্য পড়িয়া থাকেন, তাই তাঁহারাও হিন্দুর সঙ্গে ইহার দ্বারা অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। তাই দেওয়ানা মদিনা যে যুগে লেখা হইয়াছিল সে যুগে যেমন হিন্দু ও মুসলমান কেবল পাশাপাশি বাস করিত বলিয়া প্রতিবেশী ছিল না, তাদের ভিতরে নানামতে সংযোগের, বন্ধনের সূত্র ছিল, তেমনটি আর আজ হয় না। সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে আমরা স্বতন্ত্র, সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা পরস্পরের পরিচয় পাই না; তাই আমরা পাশাপাশি থাকিয়াও পরস্পরের কাছে অপরিচিত, নিত্য সম্ভাষণ করিয়াও পরস্পরের কাছে অনাত্মীয়—এক দেশে এক সমাজের ভিতর আমরা বাস করি, আর প্রত্যেকে নিজ সমাজের চারি ধারে একটা উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রাচীর গাঁথিয়া চলিয়াছি।

যদি হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ নিবারণে কোনও সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক আগ্রহ থাকে তবে ইহাতে চলিবে না। সে বিরোধ নিবারণের একমাত্র অভ্রান্ত উপায় তাদের অন্তরের বিরোধের মূলোচ্ছেদন। তাদের করিতে হইবে আত্মীয়তা, পরস্পরের অন্তরের সঙ্গে পরিচয়। সাহিত্য ইহার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। হিন্দু যেমন হিন্দুর জীবন ও চিন্তা শতমুখে সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, মুসলমানকেও তেমনি মুসলমানের জীবন ও চিন্তা ব্যক্ত করিতে হইবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। মুসলমানকে হিন্দুর সাহিত্য পাঠ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন ও চিন্তাধারার পরিচয় লইতে হইবে, হিন্দুকে মুসলমানের সাহিত্য পাঠ করিয়া মুসলমানের জীবনের পরিচয় পাইতে হইবে। এমনি করিয়া ক্রমে যখন হিন্দু ও মুসলমানের অন্তরের বিলুপ্ত সংযোগ পথ প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন সকলে দেখিবে যে বাস্তবিক হিন্দু ও মুসলমানের অন্তরের ভেদের অবসরের চেয়ে যোগের অবসর অনেক বেশী, তাদের বাহ্যিক জীবনের সহস্র ফাঁক ভরিয়া আছে এক বাঙ্গালীর প্রাণ, এক বাঙ্গালীর আত্মা। তখন অবিশ্বাসের সকল প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, শুকাইয়া যাইবে বিরোধের বিপুল তরঙ্গিণী, প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হইবে মিলনের এক বিচিত্র রাগিণী, অন্তরে অন্তরে বাঁধিয়া যাইবে এক অচ্ছেদ্য আলিঙ্গন। ভারতীয় প্রাঙ্গণ শুধু হিন্দুর পূজার ধূমে নয়, শুধু অভিজাত কণ্ঠের বন্দনা গীতিতে নয়, পরিপূরিত হইয়া উঠিবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সাধন সঙ্গীতে, তার সুরের ধারায় বহিয়া যাইবে এক বৃহৎ শক্তিমান বিরাট্ জাতীয় জীবন। সেদিন যখন আসিবে বাঙ্গলা ধন্য হইবে, বাঙ্গালী ধন্য হইবে, সমস্ত জগৎ বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে আজকার কুটীর-বাসিনী দীনা জননীর সমৃদ্ধ সন্তানের দিকে, মুগ্ধ হইয়া যাইবে তার কোটিকণ্ঠ নিনাদিত ভারতীয় মঙ্গল গীতিকায়, পুলকিত হইবে বঙ্গবাণীর বিজয় দুন্দুভিরবে।

দীনা বঙ্গভারতীর অকৃতী সেবক আমরা আজ আশার চক্ষে চাহিয়া আছি বাঙ্গলার সে শুভদিনের দিকে, সেই আশায় আমরা আজ আমাদের ক্ষীণকণ্ঠে গান গাহিয়া চলিয়াছি, এ গানের নেশা সবার প্রাণে পৌঁছিবে কি ? বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান এ গানের সুরে মাতিয়া উঠিবে কি একদিন ?

সম্পূর্ণ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শিবস্তোত্র

জয় শিব জয় শঙ্কর জয় স্বর্গমোক্ষদাতা,
জয় কৃপাময় মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বদুঃখত্রাতা,
চির-সুন্দর হে শুভঙ্কর, জয় হর ব্যথাহারী ;
চন্দ্রশেখর পাপতাপহর জয় ভবকাণ্ডারী ।
এসব মন্ত্রে জাগেনা হৃদয়, লাগে যেন পরিহাস ;
ব্যথার দেবতা ! কহ গো গোপন বেদনার ইতিহাস ।

ভালে ছিল লিখা সুধাকরটীকা, ফলে মিলে কালকূট :
তরুণ ললাট ঘেরি বাঁধা কেন দুঃখের জটাজুট ?
সে জটার বাঁধে কুলু কুলু নাদে কাঁদে চিরক্রন্দন,
চাপাবেদনার হাসি কাঁপে মুখে, ব্যথাতুর ত্রিনয়ন ।
নবনী-নিন্দি সুন্দর তনু কামেরও কামনা-ঠাঁই,
কত অভিমানে লেপিলে কে জানে অজানা চিতার ছাই !
কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া প'রেছ হাড়ের মালা,
কটির কাপড় দিয়েছ ফেলিয়া —না জানি সে কত জ্বালা !
বেছে বেছে তুলে ধুতুরার ফুলে ভরাবসন্তরাতে
কি জানি কি মনে ভ্রম' হে কিশোর ভূতভুজঙ্গসাথে !
সুরের জনম যার কণ্ঠে সে বেণুবীণা তেয়াগিয়া
সাপুড়ের রূপে কাটায় কি দিন শিঙা ডুগ্‌ডুগি নিয়া ?

কি জ্বালা ভুলিতে, জ্ঞানের আকর, ধ'রেছ ভাঙের নেশা
অন্নপূর্ণাপতি কম দুখে ভিক্ষা করেনি পেশা।
কহ কহ দিগ্ বাস :
পূজার অর্ঘ্যে চাপাপড়া যত বেদনার ইতিহাস।

সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চিরদুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর, — তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
বিরাটবক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি
মাঝে মাঝে বুঝি ববম্ ববম জেগে উঠে বিদ্রোহী !
পূজা পেয়ে হেসে আবার ঘুমাও আশুতোষ উদাসীন :
তোমার ব্যথার ম্লান সায়াহ্নে মিলায় দীনের দিন ;
তবু শেষ হবে খেলা,—
এই চির অবহেলা,
যবে প্রলয় সন্ধ্যাবেলা
দুঃখ-সিন্ধু ছাপায়ে উঠিবে তোমারও ধৈর্য্য-বেলা।
তখন জাগিবে রাঙাকল্লোল ভীষণ বিষাণ রবে,
লণ্ডভণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড হবে শিব-তাণ্ডবে :
সহস্রফণ অনন্ত ফণী আস্ফালি লাঙ্গুল
তোমার নৃত্য-ঘূর্ণাবর্ত্তে হবে বিচূর্ণধূল।
পলকে জ্বলিয়া লেলিহ শিখায় লক্ষ সুখের বাতি
পলকে নিভিয়া আনিবে প্রলয়-চিরান্ধ দুখরাতি।
জাগিবে একক বিরাট দুঃখী রাখি দুঃখের মান,
মহাশববুকে মহাশিব সুখে জাগাবে মহাশ্মশান :
সেদিনের আশে পরম নিরাশে বাজাবে বগল বাজা,—
জয় শঙ্কর প্রলয়ঙ্কর জয় দুঃখের রাজা !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

নাচগান সম্বন্ধে আনাড়ির উত্তর

বৈশাখ মাসের 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা'য় শ্রদ্ধাস্পদ বিজয় বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'আমরাই যে কেন আমাদের সঙ্গীতকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিব ইহা বুঝিতে পারি না'।

বিজয় বাবুর মতন মনীষাসম্পন্ন সাহিত্যিকের লেখনী হইতে এই সামান্য প্রশ্ন উদ্ভূত হওয়াই বিস্ময়কর। 'বঙ্গবাণীতে' দেখিলাম ধূর্জটি বাবুও একটা ধারাবাহিক সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পণ্ডশ্রমের সার্থকতা কি?

এ সম্বন্ধে আমিও আনাড়ি, কিন্তু 'jack of all trades' উপাধিধারী। অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী (১৮৭৬—১৯২৬) ধরিয়া আমি সঙ্গীতপ্রিয়, এবং প্রাণপণে অনেক পয়সা খরচ করিয়া ওস্তাদি ও কলোয়াতি তরিকাগুলির আদায় ও কসরৎ এক সময় করিয়াছিলাম এমন স্খলিতদন্ত ও গোলকণ্ঠপেশীর সাহায্যে সেগুলির আকার দেখিয়া নিজেই স্তম্ভিত হই। কিন্তু যথারীতি শিকলবদ্ধ না হওয়াতে পাখোয়াজ ও তবলার চাটিকে পরাস্ত করিয়া সভায় যশোলাভ করা অদৃষ্টে ঘটে নাই। তবে, এটুকু বলিতে পারি যে বিজয় বাবুর দুঃখ আমি অনুভব করিয়াছি।

উত্তর দিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা ভাল যে আমি একজন Scientific moderate। আমি বলিতে চাহি যে শিকলে বাঁধাই জগতের নিয়ম, এবং তাহারই মধ্যে স্বাধীনতার চেষ্টা ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তনও জগতের অন্যতম নিয়ম। আমার মতে পুরাকালের শিকলবদ্ধ সূত্রগুলি পুঁথিতে থাকিলেও, বাস্তবিক পক্ষে তাহার পূর্ব্বের রূপ ও ব্যবহার নাই, এবং ক্রমশঃ বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন চলিতেছে ও চলিবে।

সৌরজগত শিকলবদ্ধ, কিন্তু প্রতিবর্ষে বৎসর বৎসর রূপান্তরিত হইতেছে। কেবল কথাটা এই যে শিকল খুলিয়া দিলে গ্রহবর্গের দশা কি হইবে? বেদান্ত সূত্র, তন্ত্র, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ সকলই শিকল বন্ধাবস্থার নিগূঢ় তত্ত্বপ্রকাশক। সঙ্গীতশাস্ত্রের সূত্রগুলিও সেই প্রকার। বেদান্তের ওস্তাদের মতন সঙ্গীতের ওস্তাদও তত্ত্বগুলি আওড়াইয়া যান, কিন্তু ব্যবহারে ও রূপে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার দিকে কেহই দেখে না। নৃত্যগীত সম্বন্ধেও তাই।

আমরা রাগরাগিণীর সূত্রগুলি আওড়াইয়া মনে করি যে গান্ধর্ব্বের বৈদিক রাগরাগিণী গুলি সেই সূত্রের যথার্থ রূপ, যেমন গীতাশাস্ত্র পড়িয়া অনেকে মনে করেন যে নিষ্কামকর্ম্মের অর্থ নিষ্কামভাবে পরকীয় প্রেমে মগ্ন হওয়া। কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে সঙ্গীতশাস্ত্রবর্ণিত আদিরাগরাগিণীর প্রকৃতি, আরোহী অবরোহী, গ্রহ ও ন্যাস প্রভৃতির সহিত এখনকার ব্যবহারিক সঙ্গীতের কোন সম্বন্ধ নাই, যেমন সত্যযুগের নর ও পশুপক্ষী সরীসৃপের কঙ্কালের সহিত এখনকার কঙ্কালের কোন সাদৃশ্য নাই। কেবল আছে স্নায়ুবিভাগের সাতটা কিংবা বারটা (Plexus) চক্র। সে শিকল কখনই কোন দেশে ভাঙ্গিবে না, কিন্তু রাগরাগিণী ক্রমশঃ বদলাইবে। নাচগানের ঢং বদলাইবে।

সুতরাং সঙ্গীত সমালোচকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য যে কোনটুকু শিকলবদ্ধ, এবং কোনটুকু স্বাধীন হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

আমি বলি 'ভাব'টুকুই শিকল; ঈশ্বরের সঙ্গে যাহা দিয়া আমরা বাঁধা সেইটুকুই বন্ধন। নিরীশ্বর সৃষ্টি, নিরীশ্বর জগত, নিরীশ্বর নৃত্যসঙ্গীত কখনই সম্ভবপর নহে। সেই 'ভাব' ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই আসে, স্নায়ুর সঙ্গে বাঁধা। সবই রূপান্তরিত হয়, কিন্তু সেই ভাব অতীন্দ্রিয় এবং অরূপ। তাহা হইতেছে ভক্তি, প্রীতি, শিশুর আবদার ও মধুর দরদ, বুদ্ধের বৈরাগ্য ও অনুতাপ।

তবে যদি বলেন যে শিক্ষণ অর্থে সাময়িক কতকগুলি বন্দোবস্ত, তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে ক্রমশঃই সকলি পরিবর্তিত হয়, কোথাও বা সময় লাগে বেশী, কোথাও কম। যেটা বেশীদিন থাকিয়া যায়, সেটার ততদিন থাকিবার দরকার ছিল বলিয়া থাকে। আমাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে, কিছুই আসে যায় না। মতামতের উপর নির্ভর করে না।

রূপ স্বাধীন হইলেও ভাবের সঙ্গে তার একটা টানাটানি চিরকাল আছে। এইজন্য Ethics কোনো Standard নির্দিষ্ট করা কঠিন। সঙ্গীতেরও সেই সমস্যা।

ধ্রুপদের মধ্যে খানিকটা ভক্তিভাব আছে, খানিকটা মুসলমান ও অন্ধযুগের রূপের (Art) ওস্তাদি আছে। খেয়ালে তাহা পৌঁছায় রঙ্গে ও কাব্যে ভরিয়া গিয়াছে। টপ্পাতে ও গজলে যুবতীর প্রেমকটাক্ষ অপর্যাপ্ত। কিন্তু সকল দেশেই, ভাবের নিগড়ে বদ্ধ হইয়া, Melodyর নানা মূর্তি হইলেও, তারি মধ্যে স্ফূর্তি ও ছন্দের তারতম্যে নৃত্যগীতের মধ্যে একটা ধরন আসিয়া পড়ে, তাহাকে অনেকে বলেন 'নরম', কিংবা 'মিষ্টি পোঁচ', কিংবা 'বিচ্ছিরি ছবি'।

এই যে চটুকু স্ফূর্তির উপর দিয়া নাচিয়া যায় — কেবল বাইশখানা স্ফূর্তি যদি কাহারও গলা দিয়া ক্রমাগতে বাহির হয়, তাহাকেও আমরা স্ফূর্তিধর বলিতে নারাজ। অশিক্ষিত স্ফূর্তির বিকাশ আমরা বাউল সুরে, কীর্তনে, শিশু ও বালিকার কণ্ঠে, সকল দেশেই পাওয়া যায়। অসভ্য জাতির মধ্যে এক একজনের চোখে এমন সৌন্দর্য্য থাকে ও কণ্ঠে এত মধুর স্ফূর্তি থাকে, যে শিক্ষিত ওস্তাদ কখনো তাহার মাধুর্য্যের একাংশও বিকাশ করিতে পারেনা।

রাগরাগিণী গুলি, একালে যাহা আমরা শুনি, এবং সেকালের বলিয়া মানিয়া লই, তাহার মধ্যে কি ভাবের বিকাশ নাই? সকলেই বলিবে আছে। কিন্তু দেখিতে হইবে কোন্ কালের। এক এক যুগে এক এক রকম ভাব সঙ্গীতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই যুগের লোকের যাহা ভাল লাগিয়াছিল, তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ভাবের শিকলবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে তাহার রূপ দেখিয়া আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদের মতো অনেক ঐতিহাসিক রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি। যেমন পুরাতন মন্দির, স্তম্ভ, শিলালিপি প্রভৃতি দেখিয়া, আমরা পুরাকালের আর্টের ও জাতীয় জীবনের মর্ম বুঝিতে সক্ষম হই।

আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে প্রচলিত রাগরাগিণী গুলি relics of ancient art। বটে তাহার বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, কেবল খানিকটা, তাহাদের সা রি গ ম র অর্থাৎ স্বরলিপির মধ্যে পাওয়া যায় যেমন ভগ্নমন্দিরের ভগ্নাংশ জোড়া তাড়া দিয়া আমরা তৎকালীন ধর্মের ও কর্মের আভাস পাই।

একালের যে মন্দির নির্মিত হয়, তাহা ভুবনেশ্বর কিংবা কোনারকের কিংবা মদু Pattern-এর মতো নয়। ভাবেরও ক্রমাগত পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে। বেণীবন্ধন, পাদবিক্ষেপ ও পরিচ্ছদের ত কথাই নাই। সঙ্গীতও সেই রকম স্বাধীনতা লাভ করিয়া আসিয়াছে। এক এক ওস্তাদের এক এক রকম তান, কাহারও গমক সিংহনাদের মতো, কাহারও মীড় মূর্ছনা মধুকরের মতো, কাহারও সিটকিরি ঝিল্লীরবের মতো। যে যে রকম ভাবুক সে সেটা বাছিয়া লয় ও রসের আধিক্যে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলে।

আমি প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থের সূত্রগুলির সহিত আধুনিক রাগরাগিণী মিলাইয়া দেখিয়াছি, যে অতি অল্পই সাদৃশ্য আছে। এইজন্য মহাত্মা ভাতখণ্ডে প্রভৃতি সেই সাহেবের মতো পুরাতন মন্দিরের কাঠামো পরবর্তী মন্দিরের রূপান্তরিত ভগ্নাবশেষ গুলির সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীতের বিষম বিপদ এই যে

চিত্রকলাকে দেখান' যায় না। স্বরলিপির আধুনিক প্রণালী অনেকটা পরিষ্কার এবং গ্রামোফোন রেকর্ড আরও পাকা জিনিষ। কিন্তু আর একটা বিষম বিপদ 'ভাবের' শৃঙ্খল লইয়া। একই সুর ভক্তিভরে, ও কামপরতন্ত্র হইয়া গাহিলে শ্রুতি বদলাইয়া যায়, কম্পন ও গাম্ভীর্য্যের তারতম্য হয়, এবং তাহার উপর যদি ওস্তাদি দেখান' যায়, তাহা হইলে আর্টের বিশ্লেষণ করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। এইজন্য এক এক ঘরের ওস্তাদের শিষ্যগণ সেই ওস্তাদের নাম দিয়া নিজ নিজ ভাবের মূর্ত্তি প্রকটিত করেন।

এই বিষম রূপান্তরিত রাগরাগিণীর মধ্যে তাকাইয়া দেখিলে একটা অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। হেলমহলট্‌জের বিশ্লেষিত য়ুনানী (গ্রীক) ও আরবী Melodyর ঠাট্‌ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইবেন যে আমাদের চলিত রাগিণীর প্রায় অর্দ্ধেক তাহাদের মতো। ভারতবর্ষের পুরাতন মন্দিরের মধ্যে যতটুকু গথিক, ডোরিক্‌, আয়োনিক, ও মক্কার মসজিদের রূপ আছে, তার চেয়েও বেশী আছে রাগরাগিণীগুলির মধ্যে।

যদি হিন্দুদিগের পুরাতন কায়দার সহিত মিশ্রিত গ্রীক, আরব্য, মোগলাই ও পাঠানি কায়দা দেখাইতে কোনো সঙ্গীতাচার্য্য চাহেন, তবে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারেনা। তবে তাহার মধ্যে নিজস্ব দিয়া রূপান্তরিত করিলে, সেটাকে আমরা relics বলিতে পারিনা। এই ভাবভঙ্গী এত বদলাইয়া গিয়াছে যে এখন একটা নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রতীচ্যে ইতালীতে তাহাই ঘটিয়াছিল, এবং ফলে হারমনির সৃষ্টি। অর্থাৎ আমরা যদি melody সম্বন্ধে স্বাধীন হই, অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কারবশে কতকগুলি relics এর অনুকরণ না করি, তবে যন্ত্রের সংযোগে দেখাইতে হইবে যে আমাদের সুরের মধ্যে এমন স্থান আছে যাহার সহিত গোটা দুই তিন স্বরের কর্ড সংযোজিত করিলে একটা ভাববিশেষের স্ফুরণ হয়।

যাঁহারা সাহেবদের সহিত মিশিয়াছেন ও সাহেবী গান শুনিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে আমাদের কোনো ভাব হইলে সুরের যে কম্পন উপস্থিত হয় এবং যে শ্রুতি বাহির হয়, সাহেবদিগের তাহার বিপরীত। আমরা লগুড়াঘাতের কষ্টে যে কণ্ঠস্বর বাহির করি, সাহেবদের প্রেমের উচ্ছ্বাস হইলে সেই রকম স্বর বাহির হয়। তাঁহাদের ভক্তিভাব হইলে যে দশা হয়, আমাদের ম্যালেরিয়ার কম্পজ্বরে সেই রকম হয়। অভিনয়েও তাই দেখিয়াছি। এক একটা by itself অদ্ভুত ও দেখিবার শুনিবার জিনিষ। তবে যেখানটা আমাদের ভাবের বাহিক (সঙ্গীত) রূপের সহিত সেগুলি মিলিয়া যায়, তখন ভাল লাগে। আইরিশ মেলডির সঙ্গে আমাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মেলবা ও প্যাটির অনেক গানে আমাদের কীর্ত্তনের বিরহের ভাব পাওয়া যায়।

যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমিক ও ভাবসর্ব্বস্ব, তাঁহারা স্বভাবত কোনো রাগিণী উপলক্ষ করিয়া গান বাঁধেনও না, কিংবা গাহেনও না। পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ হয়ত কিছু বাউল, কিছু কীর্ত্তন, এবং কিছু ভাঙা রাগরাগিণীর মতো খানিকটা গানের মধ্যে আসিয়া পড়ে। ভাবের সঙ্গে রূপের মিলন হয়। কাজেই ভাবগ্রাহীদের তাহাই ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে তাহা অতিশয় প্রকাশমান। যাঁহারা মূর্ত্তি অর্থাৎ একটা কোন রাগিণীর চলিত রূপ দাঁড় করাইয়া উপাসনায় রত হন, যেমন সাধক রামপ্রসাদ সেন, দেওয়ানজি, বিষ্ণুবাবু প্রভৃতি এবং বিষ্ণুপুরের গোস্বামীবংশ, সেখানেও শোভনীয় হয়, যেমন ব্রাহ্মমন্দির, কালীমন্দির, কিংবা শিবমন্দিরের মধ্যে ভক্তের গান। কিন্তু নিতান্ত মজলিসে, কিংবা গির্জ্জায় বসিয়া যদি শ্যামাবিষয়ক টপ্পা গাওয়া যায়, তাহাও যত অদ্ভুত-রসাত্মক, পিলু রাগিণীতে আপিসের বড় সাহেবকে ডাকাও তা। এমত স্থলে বেশী ওস্তাদি করিলে সকলেই জব্দ হইয়া পড়েন।

সময় এমনিই হইয়া পড়িয়াছে যে ভাবের শৃঙ্খল ও পুরাতন style এর গণ্ডি, উভয়েরই ধ্বংসাবস্থা। কলিকাতা সহরেই অনেক বাড়ীর architecture দেখিতে পাইবেন যে তাহার খানিকটা মসজিদের মতো, খানিকটা চণ্ডী-

মণ্ডপের মতো, খানিকটা বেঙ্গল অফিসের মতো, তাহার নিম্নতলে গোডাউন পুরাতন গুদামগুলির মতো অন্ধকার বিশ্রী। পোষাক পরিচ্ছদ, আহার প্রভৃতিতেও কারো style কাহারও মত নয়। একটা চিত্রে দেখিয়াছি যে শ্রীরাধিকা সেকালের National Theatreএর বড় গোলাপীর মত মোটা, কৃষ্ণ দূতীর চেয়ে লম্বা, গায় জরির জ্যাকেট, চরণে নূপুর, এবং কটাক্ষের চোটে ভগবানের অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ তটস্থ! এটা আধুনিক Half tone। এখনো Full tone বাকি আছে।

এমন হয় কেন? পরমহংসদেবের মতে, আমরা ঊর্দ্ধে উঠিলেও দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে. সুতরাং সাহিত্য সঙ্গীতের অবনতি হইতেছে। অবনতি হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাদের reaction আসিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে। যাহারা দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ তাঁহাদের বিদুরের মত Silence is golden মত অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। এই Commercial যুগে আর্ট টিঁকিবে না, যতই সমালোচনা করুন না কেন। বিজ্ঞাপন ও পয়সাই আর্টের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করে। Demand অনুসারে Supply হয়।

একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে আমরা যেসব গান এখন ওস্তাদি বলিয়া গাই সেগুলি হয়ত হিন্দি কিংবা উর্দ্দু (গজল্ গুলি আদি), কিংবা আধা সংস্কৃত আধা হিন্দি। উড়িষ্যা, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মাহারাষ্ট্র, ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশের আমরা খবরই রাখিনা। কাজেই বৈঠকখানার আলোকে আন্দোলন চালাবো আমরা সেই গানগুলি যে রকম বলিয়া নকল করিয়াছি কিংবা কতকগুলি ওস্তাদের নিকট শুনিয়াছি তাহারই বলে পুরাতন আর্য্য রাগরাগিণী গুলির সমালোচনা করি। আমি নওয়াখালি থাকিবার সময় স্বাধীন ত্রিপুরার একটী গায়ক, এবং রক্সৌলে নেপালের রাণা চন্দ্র সমসের জঙ্গের বাটীর একটী গায়কের নিকট কতকগুলি পুরাতন রাগরাগিণী শুনিয়াছিলাম, বরং তাহাদের সাদৃশ্য সঙ্গীতশাস্ত্রগ্রন্থোক্ত রাগরাগিণী গুলির সহিত বেশী। যদি পুরাকালের গান সংস্কৃত ভাষায় ও সেকালের সুরে গাইতাম, তবে বলিতে পারিতাম যে কোন কালে এদেশে হার্মনি ছিল কিনা, এবং Melodyর বড় বড় Masters আসিয়াছিলেন কিনা। কেবল ভরত, হনুমন্ত, হাহাহুহু প্রভৃতির নাম করিলে, ও নারদের মত আওড়াইলে ও নিজের ঘরগড়া বিদ্যার বলে প্রতীচ্যের নিকট তাহার ব্যাখ্যা করিলে সেদেশের কেন, এদেশেরও শিক্ষিত সমঝদার আমাদের তারিফ করিতে রাজি হইবেন না। যদি অন্ততঃ কালিদাসের সমসময়কার শকুন্তলা নাটকের একটা সংস্কৃত গানও সেই ছন্দের সহিত, সেই সময়কার চলিতসুরে কেহ গাহিতে পারেন তাহা হইলেও অনেকটা হিন্দু সঙ্গীতের আভাষ পাওয়া যাইত। গীতার ('বিশ্বরূপ দর্শন') একাদশ অধ্যায়ের প্রসিদ্ধ গান

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান।

যদি কোনো বৈঠকি গায়ক প্রচলিত রাগ কিংবা রাগিণীতে তানমানের সহিত গাহিয়া, যে ভাবের উদয় হয় তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি আর্য্যসঙ্গীতের পূর্ব্বগৌরবের অনেকটা নমুনা দেখাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সব Masters পুরাকালে আমাদের দেশে এসব গান ও সামগান গাহিয়াছিলেন তাঁহাদের rendering-এ কোনো Record নাই। সুতরাং এসব গানের সঙ্গে দিল্লী আগ্রার roasted ইমনকল্যাণের কাবাব মিশ্রিত করিলে যেমন শুনাইবে, 'বন্দেমাতরং' পিলু রাগিণীতে উহা

করিয়া দিলেও সেই রকম শুনাইবে। জয়দেবের 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে' প্রভৃতি গান ও পিলু রাগিণীতে খেমটা তালে, 'ঐ দেখা যায় আমার বাড়ী চারিদিকে মালঞ্চে ঘেরা' গানের মতো ঢং করিয়া, এবং তাহার সহিত তবলার চাটি ও বাহবা! বা! বা! দিয়াও শুনিয়াছি কিন্তু সেগুলি কবির দলের লড়াইয়ের গান হইতেও নিকৃষ্ট।

শ্রীরাধিকা গোস্বামী, কলিকাতার মোরাদ আলি, রামপুরের আহম্মদ খাঁ, চন্দ্রপুরের চান্দর বক্স, কাশীর রামদাস গোস্বামী, বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট, বেতিয়ার হরেকৃষ্ণ মল্লিক, মোড়াগাছার গোপাল চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ওস্তাদদিগের গান অতিশয় মনোযোগ সহকারে বহুদিন ধরিয়া শুনিয়াছি। তাঁহাদের রাগরাগিণীর reading-এর মধ্যে একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ছিল। সে মাধুর্য্যটুকু কেবল সরিগম-র না। তাঁহারা ছিলেন ভক্ত। সেই ভক্তিভাবের বলে কৃতিগুলি এত মধুর হইত যে আমরা অবাক হইয়া শুনিতাম। একই রাগ, একই সারিগম, একই তাল, কিন্তু তাঁহাদের rendering ও তাঁহাদেরই শিষ্যবর্গের rendering-এর মধ্যে আসমান জমিন তফাৎ। গর্ব্বিত শিষ্যবর্গ কেবল শেখিয়াছেন গ্রহ ও ন্যাস, লাগাইয়াছেন স্বীয় অহংকারবশত কর্কশ কণ্ঠের নিরর্থক গমক ও তান, এবং বাহাদুরি লইয়াছেন বক্তৃতার বলে।

এই গেল ভারতবর্ষের আধুনিক সঙ্গীতের অবস্থা, এবং তাহারই নমুনা Conference। গ্রামোফোনের 'উঁ', 'উঁ', 'উঁহু' 'উঁহু' শব্দের জ্বালায় একদিকে কাণ ঝালাপালা হয়, কর্ণপাট অন্যদিকে। বেশীভাগ গায়ক গায়িকা পিত্তরোগের patient, সুতরাং একটু ধীরে ধীরে ভাবের দিকে লক্ষ্য করিবার পারিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। চটাপট তবলা ও হার্ম্মোনিয়ম চলে। কলে কলেই গায়, এবং সেই কলের গানের ঠেলায় ও ঝোঁকে আসর জমিয়া যায়।

দিলীপকুমারের অসামান্য প্রতিভা আছে, এবং যদি রবীন্দ্রনাথের মত নির্ভীকচিত্তে, ভাবের ও রূপের মিলনে যত্নবান হন, এবং রূপকে ভাবের অধীন করিয়া ফেলেন, তবে সেও একদিন নিজের মনোমত পথ পরিষ্কার করিয়া চলিবে। সমালোচনার ভয়ে সেই পথে তবলার চাটি ও শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থ গিটকিরির প্রাচুর্য্য দেখাইলে আর্টের অবমাননা করা হয়। বিখ্যাত চিত্রলেখক, গায়ক, ভাস্কর, দর্শনশাস্ত্রের টীকাকার, ও সাহিত্যিক সকলেই নিজের নিজের একটা style সৃষ্টি করেন। যাঁহারা সাচ্চা সমঝদার, তাঁহারা মৌলিকতা দেখিয়া খুসি হন। যাঁহারা Scotch reviewers তাঁহাদের 'ঐখানে একটু নীলরং দিলে ভাল হইত', 'ঐখানে পা দুটো অবনীঠাকুরের পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত সরু হয়েছে', 'ঐখানে ইমনকল্যাণের 'ধ'র চেয়ে একটু জোর বেশী হয়েছে, ও বাহারে দুটো নি লেগেছে', 'ঐখানে statue-র নাকটা মানানসই হয় নাই', 'শঙ্করের টীকা একেবারে ভুল্‌লো, আনন্দগিরি ও রামানুজ যাহা বলেন সেটাই ঠিক', 'শরৎ চাটুয্যের গল্পের ঐখানটা একেবারে ওঁচা', 'সোনার তরীর ঐখানটা একেবারে হাস্যাস্পদ', 'নটা পদের ছন্দ যেন খোঁড়ার চাল' ইত্যাদি সমালোচনা আবহমান কাল চলিবেই, ইহাতে ব্যস্ত হইয়া মুসড়িয়া যাওয়ার কোনোই প্রয়োজন নাই। যার যেদিকে ঝোঁক সে সেইদিকে যাইবেই। যাহারা নথ ভালবাসে তাহারা শ্রীরাধিকার নাকে নোলক পছন্দ করে না, সুতরাং নাকটাকে একটু ভাঙ্গিয়া লইয়া রিভিউ করিতে হয়। নথপ্রিয় সমালোচক বলেন 'ওতে নাকটা মাটী হয়ে গেল', নোলকপ্রিয় বলিবেন 'ঠোঁট দুখানা নথের চাপ থেকে অব্যাহতি পেল' ত? তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিবেন 'দুটোই বেমানান, ও অনৈতিহাসিক, বৃন্দাবনে কি নথ ও নোলক ছিল?' চতুর্থ একব্যক্তি বলিবেন 'সেকালের নাকই ছিল ছ আঙ্গুল লম্বা ও পা ছিল চীনেদের মতো, সীতার কাঁকনি একমুঠি প্রমাণ মাত্র'। এখন কাঁহাতক তর্ক করা যায়?

সংক্ষেপে ইহাই।

১। ভাব না হইলে সুর বাঁধা যায় না।

২। বাঁধা গেলেই Expression অর্থাৎ রূপ আসিয়া পড়ে।

৩। রাগরাগিণীর যে সব রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহা চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল হইয়া আসিতেছে। কেহই বলিতে পারেন না যে অমুক রাগিণী ঠিক এই রকম চিরকালই আছে কি থাকিবে।

৪। সারিগম গুলি তান্ত্রিকমন্ত্রের মত। অবশ্য তাহাতে দীক্ষা শিক্ষা দরকার। যেমন ব্যাকরণের কাঠামোটা জানা না থাকিলে সাহিত্য হয় না, গুরুর নিকট দীক্ষা না হইলে প্রাণায়াম ও যোগের সাধন হয় না, তুলি টানিতে ও রং ফলাইতে না জানিলে চিত্রশিক্ষা হয় না।

৫। ভাব না থাকিলে দীক্ষা বৃথা। ভাবের গুণে দীক্ষিত রামকৃষ্ণ পরমহংস যোগী, দীক্ষিত বুদ্ধদেব মহামানব, দীক্ষিত নিতাই বিশ্বপ্রেমিক। ভাবের তারতম্যে দীক্ষাপ্রণালীর তারতম্য হয় ও রূপেরও তারতম্য হয়। যেমন বহুবিধ যৌগিক প্রণালী, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতির পথ।

৬। গুরুপরম্পরা বহুযুগ ধরিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বংশপরম্পরা তাহা শোণিতমজ্জাগত।

৭। পরিবর্ত্তনশীল রাগরাগিণীর ভাঙ্গা গড়া স্বাভাবিক এবং তাহার সমালোচনার কোনো অর্থ নাই। অন্তরে আনন্দ লাভ করিলেই সঙ্গীতের সার্থকতা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

ছিন্নমস্তা

এ কি মূর্ত্তি! ছিন্নমস্তে আত্মরক্ত করিতেছে পান।
বীভৎসের মহোৎসবে পদতলে বিলুণ্ঠিত প্রাণ।
নিরানন্দ প্রকৃতির অফুরন্ত জ্বালার সান্ত্বনা—
রাক্ষসীর প্রমত্ততা, বিলাসের ঘৃণা উন্মাদনা।
কোথা শিব ? কোথা জীব ঘূর্ণিত আবর্ত্তে পড়ে ছুটে :
অশান্তির হাহাকার অট্টহাস্যে কণ্ঠে উঠে ফুটে।
ধূলায় ধূসর শূন্য তাম্ররক্ত আকাশের তলে,
সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে প্রলয়ের অগ্নিশিখা জ্বলে।
আয়রে ঝটিকা আয়, বাজাইয়া প্রলয়ের ভেরী,
নৃশংস ধ্বংসের পারে জীবনের নবজন্ম হেরি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ক্ষেতুলাট

(চিত্র)

(১)

শীতকাল—মাঘমাসের শেষ রাত্রি। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছে, আর বাতাসও একটু উঠিয়াছে। সতীশচন্দ্র সেই সময়ে কাঁথা কম্বল জড়াইয়া বাহিরের বসিবার ঘরের জানালা গুলা বন্ধ করিতে করিতে ও উড়িয়া ভৃত্য স্বপনীর চতুর্দ্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে বলিতে লাগিল "পয়সা দিয়ে লোক রেখে এত কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। উড়ের পোকে কালই ভদ্রকে চালান করবার ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও।"

ঠিক সেই সময়ে সতীশের কাণে একটা আওয়াজ আসিল—"বাবু গো বাবু, আমাকে বাঁচাও বাবু।"

সতীশ ঘরের ভিতর হইতে ত্রস্ত পদে বাহির হইয়া আসিয়া স্বপনীকে ডাক দিয়া কহিল—"স্বপনি, স্বপনি, কি হয়েছে রে স্বপনি?"

কিন্তু স্বপনী কোথায়—সে ত ঘরের বারান্দায় চেটাই পাতিয়া তাহার উপরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সতীশ ভাবিল—স্বপনী হয়ত স্বপ্নাবেশে প্রলাপ বকিয়া থাকিবে। কিন্তু সেইখানে দাঁড়াইয়াই সতীশচন্দ্র আবার সেই কাতর আহ্বান শুনিতে পাইল। রবটা আসিতেছিল—বাটীর প্রবেশ-দ্বারের অপর দিক হইতে।

দ্বারের অর্গল মুক্ত করিতেই সতীশ দেখিতে পাইল—শীর্ণ কায় একটা লোক দ্বারপথে শয়ন করিয়া আছে। শীতের প্রকোপে সে কাঁপিতেছে, আর মুখ দিয়া লালা করিতেছে। পার্শ্বে ময়লা কাপড়ের একটা পুঁটুলী, পায়ে এক জোড়া ছেঁড়া চটি জুতা। অঙ্গে কোনও প্রকার গরম বস্ত্র নাই—ময়লা ছেঁড়া সূতী বস্ত্রই তাহার শীতের সম্বল ও কম্বল।

সতীশ আর্দ্রকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে গা?"

"ও বাবু, আমি ক্ষেতুলাট। বাড়ী ঘর দোর আমার নাই কিছুই। রাস্তায় খাই, রাস্তায় শুই—রাস্তাতেই আমার ঘর দোর।"

"হুঁ, তবে বাবু বাবু ক'রে চেল্লা চিল্লি করছিলে কেন? এই রাত্তির কাল, তা'র উপরে দারুণ শীত! ক্ষেতুলাটের চেল্লাচিল্লিতে মানুষ ঘুমোতেও পারেনা।"

ক্ষেতুলাট উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বারের দুই পার্শ্বের বাজু ধরিয়া সহজভাবে বলিল—"অমনি কি ডেকেছি বাবু? ভারী জ্বর আমার। পাড়ার লোক বলে তোমার দয়া আছে, পাঁচজনকে তুমি দেখ শোন। তাই শুনে তোমার কাছে আশ্রয় পাবার ভরসায় এসেছি। এখন চল আমাকে ঘরে নিয়ে; আমি আর দাঁড়াতে পারছিনা।"

সেই কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র কোনও মতে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল—"ওঃ—বেটা যেন বাবাকেলে জায়গা পেয়েচে। যা সেটা যা, ঐ ঘরটার এক কোণে যে তক্তাখানা প'ড়ে আছে, তা'রি এক পাশে আজ রাতের মত প'ড়ে থাক্‌গে যা। তা'রপর কাল সকালে যে চুলোয় ইচ্ছা সেই চুলোয় চ'লে যাস্।"

কেতুলাট টলিতে টলিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। সতীশচন্দ্র তাহার পশ্চাতে—উদ্দেশ্য কেতু যদিই বা টলিয়া পড়িয়া যায়, সে তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে কেতুলাট শয়ন করিলে সতীশচন্দ্র আপনার কাঁথা কম্বল তাহার গায়ে চাপা দিয়া বলিয়া গেল—"চুপ্ ক'রে শুয়ে থাক্ কেতুলাট। যদি নড়্‌বি চড়্‌বি কি উঠে হেঁটে বেড়াবি, তবে গলা টিপে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেব।"

বাড়ীর ভিতর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সতীশচন্দ্র ডাকিল—"কেতুলাট!"

কম্পিতস্বরে কেতু উত্তর দিল—"কি বাবু?"

"কাঁপ্‌ছিস্ নাকি রে?"

"হাঁ গো বাবু, ভারী শীত, আর জ্বরটাও বোধ করি তেড়ে উঠ্‌ছে। তুমি নাড়ী দেখ্‌তে জান বাবু?"

"হাঁ একটু জানি।"

"তা'হ'লে একবার দেখ্‌ত বাবু।"

কথাটা বলিয়াই দক্ষিণ হস্তখানা সে বাড়াইয়া দিল। সতীশচন্দ্র তাহার হাতও দেখিল আর বগলে জ্বর দেখিবার যন্ত্রটাও বসাইয়া দিল। তাপযন্ত্রে জ্বরের তাপ উঠিল একশো তিন ডিগ্রি পাঁচ পয়েন্ট।

রোগীর মাথায় জলপটি দিয়া সতীশ তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। তাহার কিছুক্ষণ পরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন রোগীর জ্বরের তাপ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। জ্বর তখন প্রায় একশো পাঁচ ডিগ্রি।

(২)

সতীশের মাতা সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁ বাবা সতীশ, তুই এ সব কি পাগ্‌লামী ক'র্‌ছিস্ বল দেখি?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মাতার দিকে চাহিয়া সতীশ প্রতিজিজ্ঞাসা করিল—"কি করছি মা?"

"এই জানা নেই, শোনা নেই, কোথা থেকে রাস্তার লোক ধরে এনে যে ঘরের মধ্যে পুর্‌লি, কেন-বল দেখি?"

"ও যে রাস্তায় প'ড়ে ভারী কষ্ট পাচ্ছিল মা!"

"ওরে পাগল, অমন লোক যে রাস্তায় অনেক প'ড়ে আছে।"

"তা' থাকে থাক, আমাদের দরজায় ত তা'রা আসেনি।"

"এলে তা'দেরও বাড়ীতে স্থান দিস্ নাকি ?"

"তোমার অনুমতি হ'লে তা দিই না!"

"এই সারাবিশ্বের প'থে পড়ে থাকা লোককে!"

"সে বরাত কি আমরা করেছি মা! দরিদ্র নারায়ণের সেবার অধিকার কি যে সে পায় ?"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশের মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর ক্ষেত্তুলাটের ত খুব জ্বর। ডাক্তার কি বলেন বল দেখি ?"

ডাক্তার বলেন—"ক্ষেত্তুলাটের নিউমোনিয়া হয়েছে। ওকে ভারী সাবধানে রাখ্‌তে হবে।"

"তা'ত হ'বে; ওর সেবা করবে কে ?"

খুব উৎসাহ সহকারে সতীশ বলিল—"কেন মা আমি! পাড়ার লোক বলে, তুমি মা রত্নগর্ভা। সে সুনাম ত আমাকেই বজায় রাখ্‌তে হ'বে।"

"আমি ত তোর সংমা সতীশ—"

সতীশ ঘরের মেঝের উপরে "চ্যাপটানি" খাইয়া বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া সে বলিল—"চুপ কর মা। ফের যদি অমন কথা মুখে আনবে, তা' হ'লে, এই শোন, আমি মেসে গিয়ে বাসা নেব—হাঁ সে কথা আমি ব'লে রাখ্‌ছি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবি ?"

"খুব পা'রব। তুমি আবার ঐ কথা বলে দেখনা, আমি কি করি।"

সতীশ আর সে স্থানে দাঁড়াইল না—কথাটা বলিয়াই সে চলিয়া গেল। মাতা আপনা আপনি বলিলেন—"সতীশ দেবতার ছেলে, দেবতার মতনই ওর বুদ্ধি, দেবতার মতই ওর কথা।"

সতীশের স্ত্রী সেই সময়ে গৃহকর্ম্ম ব্যাপদেশে সেইদিকে আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বাতাসের সহিত কথা কহিতে শুনিয়া সাশ্চার্য্য জিজ্ঞাসা করিল—"কা'র দেবতার মত কথা মা ?"

"এই আমার ছেলে সতীশের।"

প্রশ্নকর্ত্রী ঊর্দ্ধশ্বাসে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। যাহা সে করিতে আসিয়াছিল, তাহা আর তাহার করা হইল না। বয়সে ও বুদ্ধিতে সে যে কিশোরী।

(৩)

চিকিৎসকের সুচিকিৎসা ও সতীশের অর্থব্যয় ও সেবাযত্নে ক্ষেত্তুলাট সে যাত্রা জীবন ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু তাহার দুর্ব্বলতা সারিতে অনেক সময় লাগিল। চিকিৎসকের উপদেশে

সতীশ, ক্ষেতুলাটের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। এতাবৎকাল সে তাহাই আহার করে আর বাহিরের জানালার ধারে বসিয়া থাকে। তাহার প্রতি সতীশের তাহাই আদেশ।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্ষেতুলাট জানালাটির ধারে কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়া জানালার ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া দিয়া একটি পথিকের নিকট হইতে একটা পয়সা ভিক্ষা করিয়া বসিল। পথিক জিজ্ঞাসা করিল—"তুই আবার কেরে বাড়ীতে ব'সে ভিক্ষে করছিস্ ?"

"আজ্ঞে আমি ক্ষেতুলাট; আমি এ বাড়ীর মানুষ নই। দাদাবাবুর কৃপায় আমি এখানে মানুষ হচ্ছি। একটা পয়সা দাওনা বাবু! চল্লে যে গো—পয়সা একটা দিলে না!"

পথিক পয়সা না দিয়া হাসিতে হাসিতে আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। সতীশ যে বহির্দ্বারে বসিয়া ক্ষেতুলাটের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল, ক্ষেতু তাহা জানিতে পারে নাই। সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

ও ভাই পয়সা যাহার নাই
জন্ম তা'র বৃথাই
কেউ মানেনা মানুষ ব'লে
সে বড় বালাই।
আবার কাছে গেলে,
চায়না ফিরে
কয়না কথা আপন ভাই।

ক্ষেতুর গানে বাধা পড়িল। সতীশ ডাকিল—"ক্ষেতু!" ক্ষেতু বুঝিল দাদাবাবু তাহার কাণ্ড কারখানা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে এবং তাহাতে বিরক্ত হইয়াছে। বিরক্ত না হইলে সতীশের মুখে লাট শব্দের লোপ হইত না।

ক্ষেতু তাড়াতাড়ি বলিল—"তুমি ও জিজ্ঞাসা করবে, আমি তোমার খাই, তোমার পরি, তোমার বাড়ীতে থাকি, আবার ভিক্ষে করি কেন?"

সতীশ গম্ভীরভাবে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ঠিক তাই।"

"ওটা আমার অভ্যেস, ভিক্ষে না করলে আমি বাঁচ্তেই পারব না। এ কথা শুনে দাদাবাবু, তুমি আমাকে খেতে পরতে দাও আর না দাও—হাঁ।"

সতীশের হস্তে এক গাছা রূপা-বাঁধান ছড়ি ছিল। ছড়িটা মাটিতে ঠুকিয়া সতীশ কহিল—"তোকে বল্‌ছি ক্ষেতু, আজ থেকে তুই আর ভিক্ষে করতে পারবিনি।"

"তোমার হুকুম?"

"হাঁ আমার হুকুম।"

"তুমি খেতে দাও ব'লে—আমাকে বাঁচিয়েছ ব'লে?"

"ওটা জিজ্ঞাসা ক'রবার মানে ?"

"মানে কানে আমি বুঝিনা দাদাবাবু। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছিলুম—তাই খাব।"

কথাটা বলিয়াই ক্ষেতু ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। সতীশ তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল—"যেখানে ব'সেছিলি, সেইখানে ব'সে থাক্। ঘর ছেড়ে বার হয়েছিস্ কি, গুলি করেছি।"

ক্ষেতু সে ভয় প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া কহিল—"হুঃ তা' আর কর্‌তে হয় না, তা' কর্‌তে যদি, তা' হ'লে এত কষ্ট ক'রে তুমি আর আমাকে রোগ থেকে বাঁচাতে না।"

তাহার কথা শুনিয়া সতীশ হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল—"দেখ ক্ষেতুলাট, তুই ঐ ভিক্ষে ব্যাবসাটা ছাড়্,—আমি তোর একটা চাকরী ক'রে দেব।"

"চাক্‌রী! চাক্‌রী করে কে ? চাকরীতে আর ক পয়সা হয় ?"

"তোর ভিক্ষেয় ক পয়সা হয়, তাই শুনি ?"

"হেলায় ছেদ্দায় রোজ দেড়টা দুটো টাকা।"

"তবু ত সে ভিক্ষে ?"

"আর চাকরীও ত গোলামী। গোলামীর চেয়ে ভিক্ষে ভাল।"

"তুই উকীল হ'লে তোর পসার হ'ত ক্ষেতুলাট—এ কথা আমি স্বীকার কর্‌ছি।"

"কিন্তু ও ব্যবসা ক'রলে অনেকের শাপ মন্নি কুড়োতে হয়, তা'র কি দাদাবাবু ?"

"তবে ডাক্তারী ?"

"ওটা করলে যমের ভায়রাভাই হ'তে হয়।"

"গ্রন্থকার ?"

"ও ব্যাবসা ভিক্ষের অধম। একটা সম্প্রদায় আছে, তা'রা গ্রন্থকারের রক্ত শুষে জমীদারী করে, আর গ্রন্থকার না খেতে পেয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে হাত পাতে।"

সতীশ, তাহার কথা শুনিয়া কৌতুকানুভব করিতেছিল। হাসিতে হাসিতে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ক্ষেতুলাট, তোকে যদি স্কুল মাষ্টার কি কেরাণী ক'রে দিই ?"

"বাপ্‌রে, ভিক্ষে তা'র চেয়ে লক্ষগুণে ভাল। ও-কাজে গেলে ঘিয়ে-ভাজা ঘেটিকমাছ হ'তে হয়।"

"বলি, তবে তুই করবি কি ?"

"ভিক্ষে, আমার পুরুষানুক্রমে দা' ব্যবসা।"

"তা' করিস্ না হয়। কিন্তু তা'র সঙ্গে তোর একটা চাকরীও ক'রে দিব। [illegible] বুঝে থাক্‌বি যেমন তেমন ঘি ভাত

"ভাল, সেটা হ'বে উপরি লাভ।"

"আচ্ছা, তাই হ'বে"—বলিয়া সতীশ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেতুলাট জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল।

(৪)

সতীশ যে এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, তাহা তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া বেশ বুঝা গিয়াছে। তাহার স্ত্রী দুর্গা সে-কথা অল্পদিন ঘর সংসার করিয়াই বুঝিয়াছিল। সেই কারণে পতি দেবতার কোনও কথাতেই সে আর কথা কহিত না। ধ্যান জ্ঞান, তপ জপ, মন্ত্র তন্ত্র সকলই তাহার পতি। পতি সেবাই তাহার প্রিয় কার্য্য। সতীশ কিন্তু সকল সময়ে সে কথা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সতীশের একটা স্বভাব পরের ব্যাপার ঘাটা। সমস্ত দিন ব্যাপার ঘাটিয়া আসিয়া দুর্গাকে সে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগো কেতুলাট এখনও আফিস থেকে আসে নাই কেন?"

কেতুর যে আজ হঠাৎ আফিসে চাকুরী হইয়াছে এবং সে চাকুরী যে তাহার স্বামীর চেষ্টাতেই হইয়াছে, সে কথা দুর্গার জানা ছিল না। তাহার আফিস যাওয়ার কথা শুনিয়া দুর্গা আশ্চর্য্য না হইয়া আর থাকিতে পারিল না। সে হাসিয়া বলিল—"তা'র চাকরী ত পথে পথে ভিক্ষা করা। তা'র চাকরী শেষ হ'ক, তবে ত সে বাড়ী আস্‌বে।"

কথাটা শুনিয়া সতীশ অকারণে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া সে বলিল—"জানি গো জানি, তোমরা সবাই মিলে ঐ গরীবের ছেলেটাকে তাড়াবার চেষ্টায় আছ। কে বল্লে তোমাকে সে ভিক্ষে করে? তুমি জান, আজ থেকে আফিসে সে চাকরী কর্‌ছে?"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া দুর্গা চুপ করিয়া রহিল। তাহাতেও তাহার নিস্তার নাই। সতীশ বলিল—"আমার হুকুম, আফিসে সে চাকরী কর্‌বে, আমার বাড়ীতে খাবে, আর তা'র রোজগারের টাকা সমস্তটা জমাবে। এতে তোমরা কেউ কথা কইতে পারবে না।"

দুর্গা তাহাতেও কথা কহিল না। আপন মনে বকিতে বকিতে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সতীশ বাহির বাটীতে চলিয়া গেল। ব্যাপার দেওয়া তখনও তাহার শেষ হয় নাই।

আহারের সময়ে সতীশ যখন অন্দর মহলে আসিল, তখন সতীশ আর পূর্ব্বের সতীশ নাই। গালভরা হাসি হাসিয়া সে বলিল—"শুনেছ দুর্গা, কেতুলাটের বিয়ে?"

আহার্য্য সম্মুখে ধরিয়া দিয়া "শকড়ী" হাত দুইখানা কাপড়ে না ঠেকে সেই রূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া দুর্গা কহিল—"না, আমি ত জানি, সে ভাল বাজার করে, ঘরের কাজকর্ম্ম ভাল করে, মুখ বুজে আপনার কাজ আপনি করে, এই পর্য্যন্ত। আবার কি বিদ্যে হ'ল তা'র?"

"আরে শোন, শোন। শুনে তুমিও হেসে বাঁচবে না। আজ আফিস থেকে আস্‌তে তা'র দেরী কেন জান?"

"না, জান্লে তোমাকে বলতে চা'ত কেন ?"

"তা' বটে, তা' বটে ; এই শোন। ক্ষেতুলাট যে মুখে মোটর গাড়ীর ভেঁপু বাজাতে পারে, তা'ত জান?"

"হুঁ—মুখে সে হুবহু ভেঁপু বাজায়।"

"আজ ঐ গলির মোড়ে এসে যেমন ঐ কার্য্য করা আর অমনি তিনটে চারটে লোকের ভয়ে পথের মাঝখানে চিৎপট্টাং। তা'র ভিতর একজন লোকের হাতে ছিল আড়াই সের সরষের তেল। তেল শুদ্ধ তা'র পপাত চ।"

"তা'রপর ?"

"তা'রপর আর কি ক্ষেতুলাটকে ধ'রে রাস্তার লোকগুলোর টানাটানি। আড়াই সের তেলের দাম দিই আমি, তবে সে নিষ্কৃতি পায়।"

কথা শেষ করিয়াই সতীশ হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে হাসির আওয়াজ দুর্গার কানে সুধা বর্ষণ করিল। এমন হাসি সতীশ না হাসিলে দুর্গার সে রাত্রিতে নিদ্রাই হইত না—আহার ত দূরের কথা।

(৫)

ক্ষেতুলাট এখন সতীশের সংসারে একরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা। হাটবাজার সমস্তই তাহার হস্তে, অতিথি সজ্জনের অভ্যর্থনাও ক্ষেতুলাটকে করিতে হয়। সতীশের গুরুগিরিতে ক্ষেতুলাট এ সকল কার্য্য ভালই শিখিয়াছে।

কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি সে এখনও ছাড়ে নাই। ভিক্ষায় বাহির হয় সে প্রতি রবিবারে। তবে সতীশ তাহা অবগত নহে। দুর্গা সে কথা জানে বটে, কাহারও নিকট সে-কথা সে প্রকাশ করে না।

ক্ষেতু আফিসে মাহিনা পায় আঠার কি কুড়ি টাকা। কিন্তু তাহার টাকা জমিয়াছে বিস্তর। বৌদিদি দুর্গার নিকট টাকা জমা দিবার সময়ে সে বলিয়াছে, আফিসের চাপরাসীগিরি করিয়া সে যাহা পায়, তাহার চতুর্গুণ পায় সে ভিক্ষায়। ভিক্ষা কেমন করিয়া করিতে হয় ক্ষেতুলাট সে বিদ্যা বিলক্ষণ জানে।

ক্ষেতুলাটের আর কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে। ভিখারী দেখিলে সে ভিক্ষা দেয়, পীড়িত পাইলে সে তাহার সেবা করে, পরের বিপদকে সে আপনার বিপদ মনে করে। সে আহার করে ঘোড়ার মত, ছুটিতে পারে ঘোড়ার মত, আর পরিশ্রম করিতে পারে অসুরের মত। ভগবানে তাহার বিশ্বাস আছে, ধর্ম্ম সে মানিয়া চলে। তাহার বন্ধুত্ব অকৃত্রিম, সেবাধর্ম্ম অলৌকিক, কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। মানুষ হইতে হইলে আর কি চাই ; ক্ষেতুলাট পথের ভিখারী হইলে কি হয়—অজ্ঞাতে সে মানবতার অধিকারী।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে,—"ক্ষেতুলাট, এত জিনিস তুই শিখ্‌লি কোথায়," সে তাহার উত্তরে বলে দাদাবাবুর কিরপায়। দাদাবাবু আমার জীবনদাতা, দাদাবাবু আমার অন্নদাতা, আর দাদাবাবুই আমার দীক্ষাগুরু।"

সতীশের কর্ণে এ সকল কথা উঠিলে সতীশ ক্ষেতুকে ভর্ৎসনা করে। ক্ষেতু গম্ভীর হইয়া বলে—আমি ভিক্ষে করতে শিখেছি, কিন্তু কৃতঘ্নতাটা শিখিনি, কি কর্‌ব দাদাবাবু? ও বা'দের ধাতে সব স'ক, আমার ধাতে সহ্য হয় না।"

সতীশ হাসিয়া বলে—"দূর পাগল, সে দা' নয়, তা'কে কি সে আসন দিতে আছে?"

ক্ষেতুলাট তাহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য বশেই বলে—কি ক'রব দাদাবাবু, আমার বুদ্ধিটা কিছু মোটা।

এ করুণ জবাবে সতীশের পরাজয় যে গৌরবময় হইয়া উঠে, তাহা সতীশও বুঝিতে পারে। কিন্তু সতীশ ত কোন মতেই ক্ষেতুলাটের মুখ বন্ধ করিতে পারে না। ক্ষেতুর করুণ জবাবে সতীশ অস্থির হইয়া পড়ে।

এই সকল ব্যাপারের মধ্যেই সতীশ চেষ্টা করিয়া একটা আশ্রয়হীনা বালিকার বিবাহ দেওয়াইয়া কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিল। সতীশের ইচ্ছা ক্ষেতুলাটকেও ঐ পথের পথিক করিয়া সে আরও কিছু পুণ্যসঞ্চয় করে। কিন্তু ক্ষেতুলাট করুণ জবাব দিয়াছে—"দেখ দাদাবাবু, আমি জাতে গোয়ালা, ভারী গোঁয়ার। তুমি যদি অমন ক'রে আমাকে বিরক্ত কর, তা' হ'লে আমাকে চাকরীও ছাড়তে হ'বে, আর তোমার বাড়ীও ছাড়তে হ'বে—হাঁ তা' আমি ব'লে রাখছি।"

সতীশ ও দুর্গা পরামর্শ করিয়া এখনও স্থির করিতে পারিতেছে না ক্ষেতুলাটকে লইয়া তাহারা কি করিবে। ক্ষেতু পূর্ব্বে ছিল উদরপরায়ণ ভিখারী, এখন হইয়াছে, সেবাপরায়ণ সন্ন্যাসী। শিক্ষা, দীক্ষা ও সৎসঙ্গে বসবাসের ফল এমনই হইয়া থাকে। মুক্তাকাশে ভ্রাম্যমাণ ক্ষেতু-বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা এখন ত সহজ ব্যাপার নহে। সে স্থির করিয়াছে, তাহার পরিশ্রম ও ভিক্ষালব্ধ টাকা কড়ি সমস্তই সে বেলুড় মঠে দান করিবে আর সতীশের অন্ন খাইয়া, সতীশের বাড়ীতে থাকিয়া, সতীশের সেবা করিয়া দরিদ্রনারায়ণের সে সন্ধান করিবে। কাজেই সতীশ ও দুর্গার মহাবিপদ। তাহারা চায় ক্ষেতুলাটকে সংসারী করিতে, আর ক্ষেতুলাট চায় নিঃসম্বল সন্ন্যাসী হইতে। বড় কে—সতীশ, না ক্ষেতুলাট—গুরু না শিষ্য—আশ্রয়দাতা না আশ্রিত?

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

"ধ্বংসের মুখে বাঙ্গালার হিন্দু"

গত ফাল্গুন সংখ্যার বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র পাল মহাশয় উল্লিখিত প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাঙ্গলায় হিন্দু ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি ইহার কারণ নির্ণয়েরও প্রয়াস পাইয়াছেন এবং কি করিলে আমরা এই ঘোর বিপদ হইতে নিস্তার পাইতে পারি তাহারও আলোচনা করিয়াছেন।

লেখক মহাশয় এই আলোচনার জন্য বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি ঘটিতেছে তাহা প্রথমে বেশ ভাল করিয়া বোঝা আবশ্যক। রোগ নির্ণয়ে ভুল হইলে ঔষধ প্রয়োগেও ভুল হইতে পারে।

সরকারী লোকগণনার উপরই অবশ্য লেখক মহাশয়কে নির্ভর করিতে হইয়াছে কিন্তু তিনি বোধহয় সকল গুলি লোকগণনার বিবরণ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। গত লোকগণনার বিবরণীতে যে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে হিন্দুর অনুপাতের ক্রমশঃ হ্রাস দেখিয়া হিন্দুর মোট সংখ্যাই ক্রমে কমিয়া যাইতেছে এইরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের এখনও ততটা ভয়ের কারণ ঘটে নাই। হিন্দুর সংখ্যা গত লোকগণনায় দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা খুব সামান্য কিছু কম দেখা যায় বটে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বাড়িয়াই আসিয়াছিল। তবে মুসলমানের সংখ্যা বরাবরই খুব দ্রুতবেগে বাড়িতেছে, তাই প্রতি দশকে মুসলমানের অনুপাতে হিন্দু একটু কমিয়া যাইতেছে। লেখক মহাশয় প্রতি লোকগণনায় বাঙ্গালার মোট জনসংখ্যা ও তাহার মধ্যে হিন্দুর যে অনুপাত দিয়াছেন তাহা হইতে হিসাব করিলেই দেখিতে পাইবেন যে হিন্দুর সংখ্যায় 'হ্রাস' প্রথম দৃষ্টিতে যতটা আশঙ্কাজনক মনে হয় বাস্তবিক ততটা নহে। "একদিকে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, অন্যদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে অন্যান্য ধর্ম্মের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে" এই উক্তির প্রথমাংশ যে নির্ভুল নহে তাহা যে-কোন বিশ বৎসরের হিসাব ধরিলেই দেখা যাইবে। গত লোকগণনায় দেখা যায় হিন্দুর মধ্যে বাস্তবিকই সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে—বাগ্দী, বাউরী, গোয়ালা ইত্যাদি কয়েকটী জাতি। মুসলমানের অনুপাতে না হইলেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বাড়িয়াই যাইতেছে।

এই দারিদ্র্যপীড়িত, ঘনজনাকীর্ণ দেশে লোকসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি যে খুব বাঞ্ছনীয় তাহা নহে। আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীরা সীমা ছাড়াইয়া চলিয়াছেন; ম্যালথাস্ নাই, কে তাঁহাদের গতিরোধ করে? বংশ বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক সুবিধা বাড়িতে পারে কিন্তু অর্থনৈতিক সুবিধা বাড়িতেছে কি না সন্দেহ। অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর পূর্ব্ববঙ্গে প্রধানতঃ বাস করিয়াও বাঙ্গলার মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইতে পারিতেছে না।* শরীর যে কিছু বেশী দৃঢ় তাহার কারণ বোধ হয় অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য জীবিকা নির্ব্বাহের পন্থা।

ইউরোপীয় কোন কোন দেশে লোক চেষ্টা করিয়া বংশবৃদ্ধির নিবারণ করে। উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই চেষ্টার আধিক্য। হিন্দু যে হারে বাড়িতেছে সে হার অন্য অবস্থায় অসুবিধাজনক হইত না, মুসলমানের সহিত প্রতিযোগিতাই নানারূপ অসুবিধা জন্মাইতেছে।

লেখক মহাশয় হিন্দু জাতির ধ্বংসের (এখানে 'ধ্বংস' অর্থে অতিরিক্ত সংখ্যাধিক্যের অভাব বুঝিতে হইবে) যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন্টা কত প্রবল তাহাও একটু ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। 'অস্পৃশ্যতা' দোষ হিন্দু সমাজের অনেক অনিষ্ট করিতেছে সত্য; কালের গতির সহিত ইহার এবং হিন্দু সমাজের আরও অনেক 'প্রেতশাসনের' নিশ্চয়ই সংস্কার আবশ্যক কিন্তু অস্পৃশ্যতার জন্য যে একালে

---

* ১৩৩১, মাঘ মাসের "বঙ্গবাণী"তে "লোকগণনা ও দেশের অবস্থা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

খুব বেশী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ঘটিতেছে তাহা মনে হয় না। লোকগণনার প্রবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পসংখ্যক হিন্দুই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বেশী হিন্দু মুসলমানও হয় নাই। অবৈধ প্রণয় এবং মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন সময়ে সময়ে হিন্দুকে মুসলমানে পরিণত করে ইহা ঠিক, কিন্তু তাহাতেও যে হিন্দুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে তাহা নহে। বিধবাবিবাহের অভাব উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বহুকাল হইতে আছে, যে কারণেই হউক ইহাতে পুরুষের পত্নী লাভের ব্যাঘাত ঘটিতেছে না, বরপণের উগ্রতাও কমিতেছে না। বহুবিবাহের পক্ষপাতী লোক হিন্দুর মধ্যে এখন বিরল, সুতরাং সামাজিক হিসাবে বালবিধবার পত্যন্তরগ্রহণ যতই বাঞ্ছনীয় হউক তাহার অভাবে যে হিন্দুর সংখ্যা কতটা কমিতেছে তাহা বলা বড় কঠিন। দুশ্চরিত্রতার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য বা অন্য কারণে অরক্ষণীয়া বালবিধবার পুনর্বিবাহ সমাজে চালাইলে হয়ত সমাজের পাপের ভার কমিবে, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মান্তরগ্রহণ তাহাতে এতই অল্পপরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইবে যে সমগ্র হিন্দু লোকসংখ্যার তুলনায় তাহা নগণ্য।

বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী হিন্দু চাকরীর জন্য চলিয়া গিয়াছে বলিয়া যে বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে এ উক্তি প্রমাণসাপেক্ষ। যেমন বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গলার বাহিরে যাইতেছে তেমনি বাঙ্গলার বাহিরের হিন্দু বাঙ্গালায় আসিতেছে—মাড়োয়ারী বা হিন্দুস্থানী বণিক্, কলকারখানার মজুর, পাচক, ভৃত্য ইত্যাদি অনেকে বাঙ্গালার বাহির হইতে এদেশে কাজকর্ম্মের জন্য আসে। যাহারা চলিয়া যায় ও যাহারা আসে এই দুই দলের মধ্যে কাহাদের সংখ্যা বেশী বলা কঠিন। লেখক মহাশয় যে শ্রেণীর বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন সে শ্রেণীর বাল্যবিবাহ এখন বেশী হয় না; ক্রমেই উহা উঠিয়া যাইতেছে। ছেলেদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া গিয়াছে, মেয়েদেরও বাড়িতেছে—তবে খুব মন্দগতিতে। বাল্যবিবাহ হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে; প্রভেদ এই যে মুসলমান বালবিধবার পুনর্বিবাহ দেয়, হিন্দু প্রায়ই দেয় না। হিন্দুও কিন্তু দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাল্য বিবাহের "তথাকথিত" বিবিধ দোষ সম্বন্ধে মতান্তর আছে।* বাল্যবিবাহ অবশ্য এদেশে নূতন ব্যাপার নহে। যখন এটা বীরের দেশ ছিল তখনও ষোল বৎসর বয়সের অভিমন্যুকে পুত্রোৎপাদকরূপে দেখিতে পাই।

আমাদের মনে হয় হিন্দুর মধ্যে কোন কোন জাতি যে সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ অত্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত; এই দুই স্থানই হিন্দুপ্রধান—দরিদ্র হিন্দুর সংখ্যাও এইখানেই বেশী। এইটাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কাজনক অবস্থা। অন্নাভাব ও ব্যাধি, অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় নিত্যসহচর। এই দু'য়ের—অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার—অকালমৃত্যুর—নিবারণই হিন্দুর পক্ষে বেশী আবশ্যক।

আমরা মুসলমানের ন্যায় জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেশটাকে আরও দারিদ্র্যপীড়িত করার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু সংখ্যায় অধিক বৃদ্ধিলাভ না হইয়াও যদি সুস্থ, সবল, শিক্ষিত, সঙ্ঘবদ্ধ, নীতিপরায়ণ হইতে পারে তবে তাহাই হিন্দুর পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। পল্লীগ্রামের হিন্দুর প্রধান শত্রু ব্যাধি ও দারিদ্র্য, আবশ্যক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। সামাজিক সংস্কার নিশ্চয়ই আবশ্যক কিন্তু হিন্দুকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই দুইটাকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া যে কিছু সংস্কার—তাহা করিতে হইবে। কতকগুলি রুগ্ন, ক্ষীণজীবী লোকে দেশ পূর্ণ না করিয়া যদি হিন্দু সবল ও সমৃদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় তবে সেই অবস্থাই অধিক বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

* গত ১৩৩২ সালের ভাদ্র ও চৈত্রের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র লিখিত "বাল্যবিবাহ ও অকাল মৃত্যু" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গয়া

বম্বে-মেলে ৪ঠা অক্টোবর ভোর রাত্রি প্রায় চারিটার সময় গয়া ষ্টেশনে নামিলাম। ভাবিয়াছিলাম বাকী রাত্রিটুকু 'ওয়েটিং রুমে' বা বিশ্রামকক্ষে কাটাইয়া দিব কিন্তু উক্ত কক্ষের বেঞ্চি টেবিল প্রভৃতি যত কিছু বসিবার উপকরণ ছিল তাহাকে শয্যায় পরিণত করিয়া কয়েকটি কুম্ভকর্ণ-প্রকৃতি ভদ্রলোক অকাতরে নিদ্রা দিতেছিলেন—শয্যার উপকরণের রূপান্তরে ইঁহাদের নিদ্রার যে কোনরূপ অন্তরায় হইয়াছিল এরূপ মনে হইল না। একটি বিপুল ভুঁড়ি টেবিলের উপর ভীষণ রবে নাক ডাকাইতেছিল। আর একটি রুগ্ন শীর্ণ বোধ হয় ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক, অনধিক দুই হস্ত পরিমিত একখানি বেতের আসনের উপর অশেষ কলা-নৈপুণ্য ও মনোহর অঙ্গবিন্যাস ভঙ্গী সহকারে কোনমতে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ দেহখানি সুবিন্যস্ত করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। অপর দুইটি ভদ্রলোকে—বোধ হয় ইঁহারা পরে আসিয়াছিলেন—উপায়ান্তর না দেখিয়া আরাম কেদারায় দেহ এলাইয়া দিয়া ক্ষুদ্র আর একখানি চৌকীতে পদদ্বয় রক্ষা করিয়া নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিদ্রাসুখভোগ যে রেলকোম্পানীর আইনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ইহা জানিয়াও ইঁহাদিগকে নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং অতি কষ্টে দুই খানি চেয়ার সংগ্রহ করিয়া প্লাটফরমে বসিয়াই বাকী রাতটুকু কাটাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইলাম। তিনটার সময় উঠিয়া জিনিষ পত্র গোছগাছ করিতে হইবে এই আশঙ্কায় রেলগাড়ীতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই। সুতরাং চক্ষু ঢুলিয়া আসিতে লাগিল অবশেষে এক কাপ চায়ের সাহায্যে দেহের সজীবতা ফিরাইয়া আনিয়া কিছুক্ষণ পাইচারি করিবার পর আশ্রয় স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। শুনিলাম রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই কোন নবাবের একটি ডাকবাংলো আছে। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলাম—বাড়ীটি একটি দুর্গন্ধযুক্ত অপরিচ্ছন্ন পাড়ায়, ঘরগুলিও আলোক বাতাসের সংস্পর্শ-রহিত। সুতরাং সেখানকার আশা ত্যাগ করিয়া গাড়ীতে মালপত্র চাপাইয়া একেবারে সরকারী ডাক বাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই বাংলোটি ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে;—একটি সুবিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীটি দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া প্রেতশিলা পর্ব্বত দর্শনে বাহির হইলাম। এই পর্ব্বতটি গয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে—উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। দুইধারে মাঠের মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া পথটি চলিয়াছে আর মাঝে মাঝে বৃহৎকায় তিন্তিড়ী বৃক্ষের শ্রেণী। দূরে মেঘের মত নীলবর্ণ গিরিশিখরশ্রেণী শোভা পাইতেছে। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলির কোন কোনটির কর্কশ বন্ধুর গাত্র, আবার কাহারও গাত্রে বৃক্ষলতাগুল্ম শ্যামল শোভা বিস্তার করিয়াছে। কোথাও কোথাও পথের ধারে জলের মধ্যে রাজহংস বিচরণ

করিতেছে। এই সমুদয় দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমরা পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এখানে গাড়ী হইতে নামিয়া পর্ব্বতে উঠিতে হইবে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম পর্ব্বতের পাদমূলে নাতিবৃহৎ প্রস্তরবদ্ধ জলকুণ্ড। শুনিলাম ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড—প্রেতশিলার গাত্র হইতে নিঃসৃত নির্ঝরিণীই ইহাকে অনন্ত জীবন দান করিয়াছে। এই কুণ্ডের জল অতি পবিত্র বলিয়া তীর্থ-যাত্রিগণ প্রথমে ইহাতে স্নান করিয়া পরে প্রেতশিলার শিখরে উঠিয়া পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ইহার জল তেমন পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইলনা—কিন্তু দেখিলাম বহু লোক স্নান করিতেছে। আর ইহার চারি পাশে বিপুল লোকসমাগম হওয়ায় তুমুল কলরব উঠিয়াছে।

দূর হইতে প্রেতশিলা পাহাড়টিকে একটি বৃহৎকায় নৈবেদ্যের মত দেখায়। পূর্ব্বদিকে ইহার গাত্রে সোপানশ্রেণী কাটিয়া উপরে উঠিবার সুগম পথ প্রস্তুত হইয়াছে। দূর হইতে এই পথটি শৈলবক্ষে একটি প্রকাণ্ড অজগর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

এই সোপানশ্রেণীর নিকট পৌঁছিবামাত্রই কয়েকজন আমাদিগকে ভয় দেখাইল যে এই সোপানশ্রেণীর সংখ্যা এত অধিক যে মাইজী কিছুতেই হাঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। সংসারে প্রকৃত সহানুভূতি ও সহৃদয়তার যেরূপ অভাব তাহাতে এই প্রকার অযাচিত সৌহার্দ্দ্যকে তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্যপ্রসূত মনে করিয়া পুলকিত হইলাম। কিন্তু এ ভ্রম বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেই বুঝিলাম যে যাঁহারা মাইজীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন—স্কন্ধে বাহিত 'ডুলি' নামক শিবিকা করিয়া যাত্রিগণকে প্রেতশিলার চূড়ায় উঠানই তাঁহাদের জীবনযাত্রার উপায়—অবশ্য যথোচিত কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা না দিলে ইঁহারা এই প্রকার

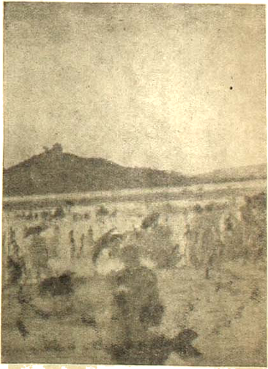
প্রেতশিলা পাহাড়

পরহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। তখন বুঝিলাম মাইজীর ভবিষ্যৎ যতটা না হউক নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই তাঁহারা এরূপ সদুপদেশ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যাহা হউক তাঁহাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া আমরা চরণযুগলের সাহায্যেই গিরিচূড়া অধিরোহণে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। সোপানশ্রেণী বাহিয়া কতক দূর উঠি আর বিশ্রাম করি এইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথের ধারে ধারে পুরাতন বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে কাপড় বিছাইয়া পাণ্ডারা বসিয়া আছে—যাত্রীদিগের নিকট পয়সা আদায় করার জন্যে। দুই একখানি মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে "যে ধর্ম্মাঃ হেতুপ্রভবাঃ" ইত্যাদি সুপরিচিত বৌদ্ধমন্ত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে অথচ এগুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিরূপে যাত্রীদিগের ভক্তিশ্রদ্ধা ও পয়সা আকর্ষণ করিতেছে। দুই এক জায়গায় বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ছায়ায় সাধু বাবাজীরা গায়ে ভস্ম মাখিয়া বসিয়া আছেন। এই সমুদয় দেখিতে দেখিতে ক্রমে পর্ব্বতের শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে তিনটি বৌদ্ধমূর্ত্তি রামলক্ষ্মণ-সীতারূপে পূজিত হইতেছেন। ইহার সম্মুখে কয়েকটি কক্ষে যাত্রিগণ পূর্ব্ব-পুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিতেছেন। একখানি প্রস্তরখণ্ডে একটি ক্ষীণ পদচিহ্নের মত আঁকা আছে। বিপুলকায় পাণ্ডাজী উহাকেই ব্রহ্মার পদচিহ্ন বলিয়া সমাগত যাত্রীদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিকটে বৃক্ষতলে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত পর্ব্বতের উপরিভাগে দেখিবার মত বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হইল না। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রান করিয়া পুনরায় সোপানশ্রেণী অবরোহণ করিয়া নীচে নামিলাম

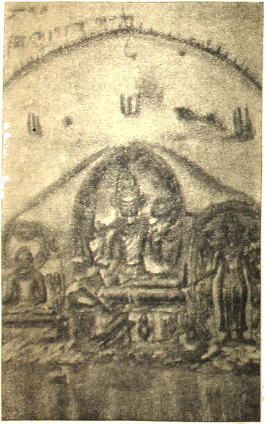

প্রেতশিলার মন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তি (রাম লক্ষ্মণ সীতা রূপে পূজিত)

তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা—সুতরাং আর কোথাও না যাইয়া ডাকবাংলোতে প্রত্যাগমন করিয়া স্নানাহারান্তে বিশ্রাম করিলাম।

বৈকালে রামশিলা পর্ব্বত দেখিতে যাত্রা করিলাম। এটি ফল্গু নদীর পারেই অবস্থিত। ইহার উপরে উঠিবার জন্য শিলাগাত্র কাটিয়া সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথের ধারে ধারে সাধু বাবাজীরা আখড়া পাতিয়াছেন। রামশিলার শীর্ষদেশে দুই একটি অর্দ্ধভগ্ন মন্দির ব্যতীত আর কিছুই নাই—কিন্তু এখান হইতে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোহর দেখায়। পূর্ব্বদিকে ফল্গু নদীর বিস্তৃত বালুকাময় খাত—তাহার মধ্য দিয়া ক্ষীণ জলধারা কোনমতে পথ করিয়া চলিয়াছে,—অপর পারে সুবিস্তৃত সমতল—উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলরাজি-শোভিত। দক্ষিণে সমস্ত গয়া নগরটি গিরিচূড়া হইতে বড় সুন্দর দেখা যায়। বেশ বুঝা যায় যে উত্তরে রামশিলা দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বত ও পূর্ব্বে ফল্গু নদী ইহাই নগরটির প্রাকৃতিক সীমারেখা এবং সম্ভবতঃ সর্ব্বযুগেই এই সীমার মধ্যেই নগরটী অবস্থিত ছিল। খুব দূরে দক্ষিণ দিকে বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের চূড়াটি অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইল। অকস্মাৎ প্রবল বাত্যাসহকারে বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইল। আমাদের পায়ে জুতা থাকায় আমরা মন্দিরের কোন অংশে আশ্রয় পাইলাম না—অগত্যা মন্দিরের অনতিদূরে একটি ঢাকা রোয়াকে আশ্রয় লইলাম। কিছুক্ষণ পরে বাতাস থামিয়া গেলে বিন্দু বিন্দু বারিপতন অগ্রাহ্য করিয়াই আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে গয়ার মন্দিরশ্রেণী দেখিতে যাত্রা করিলাম। ফল্গু নদীর পারে একটি উচ্চ টিলার উপরে বিষ্ণুপদ মন্দির এবং তাহারই আশেপাশে আরও অনেকগুলি

গয়া বিষ্ণুপদ মন্দির

মন্দির আছে। বিষ্ণুপদ মন্দিরটি একটি নাতিবিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার গঠনসৌষ্ঠব মন্দ নহে। মন্দির ভিত্তিটি চতুষ্কোণ নহে —দেখিলে হঠাৎ মনে হয় ইহা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে —ইহার মধ্যে কোন নিয়ম প্রণালী নাই। বস্তুতঃ ইহা সমচতুষ্কোণের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। সমচতুষ্কোণের প্রত্যেক দিকের ঠিক মাঝখানে খানিকটা বাড়াইয়া দিয়া আবার এই বর্দ্ধিত অংশের ঠিক মাঝখানে আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিয়া এইরূপ ভিত্তির সৃষ্টি হয়। নিম্নের চিত্রটি দেখিলেই ইহা সম্যক্ প্রতীয়মান হইবে। মন্দিরের শীর্ষদেশে ও মধ্যস্থলে একটি শিখর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনুরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর কাটিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের মন্দিরগঠনপ্রণালীর ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে উড়িষ্যার মন্দিরে যেরূপ শিখরশ্রেণী দেখা যায়,

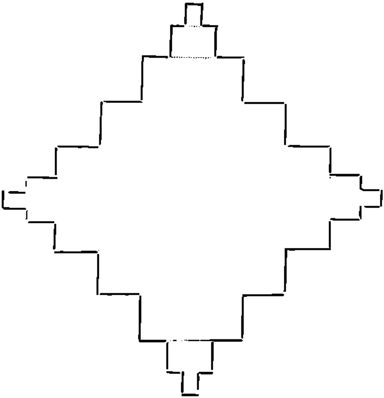

গয়ার বিষ্ণু মন্দিরের ভিত্তির গঠন প্রণালী

তাহারই ক্রমপরিণতির ফলে এই প্রকার শিখরশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে গয়াতে ৩৪টি মন্দির আছে তাহার সাহায্যে শিখরের এই ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিলে বর্ত্তমান বিষ্ণুপদ মন্দিরটিকে ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ ইহা আরও পরবর্ত্তীকালের।

মন্দিরটির সম্মুখে একটি বিস্তৃত স্তম্ভযুক্ত নাটমন্দির ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে অঙ্গনের একটি অংশ স্তম্ভ শ্রেণীযুক্ত ছাদ দ্বারা আবৃত—অঙ্গনের অপর অংশ অনাবৃত। তবে কোন কোন স্থানে কোন দেবমূর্ত্তির উপরে ক্ষুদ্র আচ্ছাদন নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি অনাবৃত অঙ্গনেই রক্ষিত হইয়াছে। এই সমুদয় মূর্ত্তি ও মূল মন্দিরের পার্শ্বস্থ উপমন্দিরে রক্ষিত অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একখানির চিত্র প্রকাশিত হইল। এখানি দেবরাজ ইন্দ্রের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয় কারণ পার্শ্বে একটি হস্তী। মূর্ত্তিখানি খুব প্রাচীন—কুশান যুগের মূর্ত্তির সহিত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। আরও কয়েকখানি মূর্ত্তি নূতন ধরণের বলিয়া মনে হইল। অন্ধকার যায়গায় থাকায় ফটো নিবার সুবিধা হইল না। একটি দেবীমূর্ত্তি—সম্ভবতঃ লক্ষ্মী শাঁক বাজাইতেছেন—ইহার গঠনে বেশ কারুকার্য্য আছে। বিষ্ণুর অবতারের মূর্ত্তি সম্বলিত কয়েকখানি প্রস্তর খণ্ড আছে—কিন্তু কোন খানিতেই পুরাপুরি দশ অবতার দেখিলাম না। অবতারবাদের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি বিশেষ মূল্যবান। শিবের মুখলিঙ্গও কয়েকটি দেখিলাম—ইহাতে শিবলিঙ্গের একপাশে অথবা চারিপাশে একটি বা চারিটি মুখ ক্ষোদিত হইয়াছে।

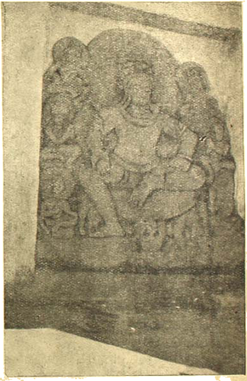
ইন্দ্রমূর্ত্তি (?)

মূল বিষ্ণুপদ মন্দিরের অভ্যন্তরে অথবা গর্ভগৃহে কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন মূর্ত্তি নাই। এই গভীর অন্ধকারময় ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একখণ্ড প্রস্তরের উপর পদচিহ্ন ক্ষোদিত আছে—

ইহার চতুর্দ্দিকে কক্ষপ্রাচীরে সংলগ্ন প্রস্তর বেদীতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কয়েকটি দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। অন্ধকারে দীপবর্ত্তিকার সাহায্যে যতটুকু দেখা গেল তাহাতে এই মূর্ত্তি সমূদয়ে কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারিলাম না।

বিষ্ণুপদ মন্দিরের আশে পাশে যে সমুদয় মন্দির আছে তাহার কোনটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। এগুলি প্রায় সবই নিতান্ত আধুনিক ধরণের ও বিশেষত্ববর্জ্জিত। কিন্তু তীর্থযাত্রিগণের চক্ষে এ সমুদয়ই পুণ্যস্থান—সুতরাং সকল মন্দিরেই বহু যাত্রীর সমাগম হয়। প্রাতঃকালে দলে দলে বিচিত্র বর্ণের বসন ভূষণে সজ্জিত নরনারীগণ ফল্গু নদীতে স্নানান্তে মন্দিরে মন্দিরে পরিভ্রমণ করিতেছেন—এ দৃশ্যটি বড়ই উপভোগ্য। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে এখানে পাণ্ডাদের উৎপাত এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।—কিন্তু অক্ষয়-বট মন্দিরে ইহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। ইহা বিষ্ণুপদ মন্দির হইতে অনেক দূরে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের নিকটে অবস্থিত। এখানে একটি সু-উচ্চ প্রস্তর ও ইষ্টকবদ্ধ অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি বটবৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই আশে পাশে কয়েকখানি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি রাখিয়া ইহাকে পুণ্য স্থানে পরিণত করা হইয়াছে। একখানি প্রাচীন শিলালিপিও এইস্থানে রক্ষিত আছে। ইহা ইতিহাসে অক্ষয়-বট শিলালিপি নামে প্রসিদ্ধ। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপালের রাজ্যের পঞ্চমবর্ষে কোন শৈব ধর্ম্মাবলম্বী এখানে বটেশ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—ইহাই এই লিপির প্রতিপাদ্য বিষয়।

বৌদ্ধগয়ার মন্দির

এই অক্ষয় বটের সন্নিকটে একটি কক্ষাভ্যন্তরে দেখিলাম বিপুলকায় পাণ্ডাজীর সম্মুখে একটি পশ্চিম দেশীয় যাত্রী যুক্তকরে বসিয়া আছে—উভয়ের মধ্যস্থলে থাকে থাকে টাকা সজ্জিত—শুনিলাম ইহার নাম 'আট্কা বান্ধা' যাত্রীটি যতক্ষণ না পাণ্ডাকে পূজা করিয়া তাহার অনুমতি

লাভ করিতে পারিবে ততক্ষণ হাত ছাড়াইতে পারিবে না। প্রায় শ খানেক টাকা দিয়াছে অ.র পাণ্ডাজী তাহ.র চিবুকে হাত দিয়া তাহাকে দাদা ভাই সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া আরও কিছু বাহির করিবার চেষ্টায় আছে।

বৈকালে বৌদ্ধগয়া যাত্রা করিলাম। গয়া হইতে বৌদ্ধগয়া প্রায় ৭ মাইল দূরে। টোঙ্গায় যাওয়া কষ্টকর বিবেচনা করিয়া একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিলাম। বৌদ্ধগয়ার রাস্তাটি বড়ই সুন্দর। দুই ধারে সারি সারি বৃক্ষের শ্রেণী—কখনও ঠিক ফল্গুনদীর পার দিয়া যাইতেছি আবার কখনো বা বৃক্ষের অন্তরালে ফল্গু অদৃশ্য হইতেছে। দূরে গিরিমালা যেন আমাদের সঙ্গে মাথা তুলিয়া চলিতেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলাম। রাস্তা হইতে প্রায় ২০ হাত নীচে একটি বিস্তৃত অঙ্গনের ঠিক মধ্যস্থলে এই বিশাল মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের নিকট দাঁড়াইলে ইহার বিশালতা ও গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের গঠন-পারিপাট্য সম্পূর্ণ নূতন ধরণের—ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর মন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই। আমার অনুমান হয় যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে এই শ্রেণীর মন্দির পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সমস্যা সমাধান করিতে হইলে অনেক নীরস তর্কের অবতারণা করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহার উপযুক্ত স্থান নহে। তবে প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-শিল্পের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের গঠন-প্রণালীর বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন এইখানে মাত্র এইটুকু ইঙ্গিত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

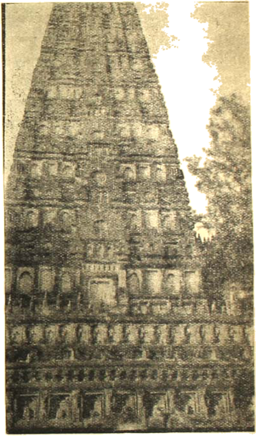

বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের কারুকার্য্য

মন্দিরের অভ্যন্তরে সুন্দর একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শুনিলাম ইহা জাপান সম্রাটের দান। মনের মধ্যে আবছায়ার মত অনেক ভাবের উদয় হইল। একদিন এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক ক্ষীণ ধারাই জাপানে সভ্যতার প্রসার করিয়াছিল। আজ জাপান গৌরবের শীর্ষদেশে—আর ভারতবর্ষ কোথায়? ভারতবর্ষের ঋণ কি জাপান এখনও মনে করে? এই বুদ্ধমূর্ত্তি দান কি তাহারই একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন? নিমেষের মধ্যে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কত চিত্র মানস নয়নে দেখিলাম—কিন্তু সে কথা থাক।

এককালে মন্দিরের চারি পার্শ্বে প্রস্তর-বেষ্টনী ছিল। এখনও তাহার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কতকগুলি সুন্দর ক্ষোদিত চিত্র আছে। দুই হাজার বৎসরের রৌদ্র ও বৃষ্টিতে ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও এখনও অনুধাবন করিলে শিল্পীর কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।—এই বেষ্টনীর অনেক স্থলেই 'আর্য্যা কুরঙ্গীর দান' এইরূপ লিখিত আছে। এই পুণ্যশীলা মহিলা সম্ভবতঃ এই বেষ্টনী নির্ম্মাণের ব্যয়ভার কতকাংশে বহন করিয়াছিলেন—তাই কালসমুদ্রের অপর পার হইতেও তাঁহার স্মৃতি আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে!

মন্দিরের ঠিক উত্তরেই সেই বিশ্ববিশ্রুত বোধিবৃক্ষ। এই অশ্বত্থগাছের নীচে বসিয়াই গৌতম-বুদ্ধ সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গাছটি খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না —বড় জোর ৫০।৬০ বৎসরের হইবে। বৌদ্ধগণের মতে মূল বৃক্ষের গুঁড়ি হইতেই অন্য একটি গাছ জন্মে তাহার গুঁড়ি হইতে আর একটি—এইরূপ বৃক্ষ পরম্পরায় বর্ত্তমান গাছটি সেই বোধিদ্রুমেরই উত্তরাধিকারী। ইহা সত্য হইতে পারে—তবে গাছটি যে মোটামুটি মূল বোধিদ্রুমের অবস্থিতিস্থানেই বর্ত্তমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ প্রাচীন পুণ্য নিদর্শন বুঝি আর নাই।—স্থান মাহাত্ম্যে মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হইল—সসম্ভ্রমে সেই সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম।—আমার স্ত্রীর নিকট ব্যাখ্যাচ্ছলে বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী আবৃত্তি করিলাম। সুপরিচিত ও পুরাতন কাহিনী কতবার কত উপলক্ষ্যে বিবৃত করিয়াছি—কিন্তু সেই বোধিদ্রুমের তলে সেই কাহিনী যেন জীবন্ত বলিয়া বোধ হইল।

হিন্দুগণ যে বৃক্ষকে তাঁহাদের দেবতা[illegible]ণ করিয়া লইয়াছেন—তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। যাঁহারা পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দিবার জন্য গয়ায় আগমন করেন তাঁহারা এই বোধিদ্রুমের তলেও পিণ্ড দিয়া থাকেন—বহুদিনের সঞ্চিত এই পিণ্ডাবশেষের পূতিগন্ধ এমন মনোহর স্থানটির বায়ু দূষিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতীকারের কোন উপায় নাই। বর্ত্তমানে যে বৈষ্ণব বাবাজী এই মন্দিরের অধিকারী—তিনি বিধিমতে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, যেহেতু বুদ্ধ বিষ্ণুরই অবতার বিশেষ—অতএব তাঁহার মন্দিরে বৈষ্ণবদেরই অধিকার, বৌদ্ধদের কোনই অধিকার নাই। একটি বাঙ্গালী পরিব্রাজক এই বাবাজীর প্রধান পরামর্শদাতা—তাঁহার সহিত আমি তর্কবিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলাম— কিন্তু উপরোক্ত যুক্তির

অসারতা তিনি কিছুতেই বুঝিতে চাহিলেন না।—এই বৌদ্ধ মন্দিরটির তত্ত্বাবধানের ভার বৌদ্ধগণের হস্তেই দেওয়া উচিত ইহা বলায় তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আর তর্কযুদ্ধ না চালাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট স্তূপ আছে—আর আশে পাশে অনেক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে কয়েকখানি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এগুলি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন অগত্যা গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।—পরদিন প্রত্যূষে পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া গয়া পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বড়লোকের স্মৃতি

(কেশবচন্দ্র সেনের কথার জের)

[এবারে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের কথা লিখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে পূর্ব্ববারে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে নিম্নলিখিত বাকি কথা কয়েকটি এখানে লিখিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম।]

বহু কৃতী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিয়াছেন ও অনেক খুঁটিনাটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; আমি তবুও মনে করি যে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য এমন কয়েকটি ঘটনা এখনও উল্লিখিত হয় নাই। এখানে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিব: আমি জানি অনেকের কাছে এই সংবাদ নূতন হইবে। যৌনসম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষার দিকে কেশবচন্দ্রের কিরূপ ধারণা ছিল এই ঘটনাটিতে তাহা অনেকখানি স্পষ্ট হইতে পারে।

কেশবচন্দ্রের বড় মেয়ে পুণ্যময়ী মহারাণী সুনীতি দেবীর যখন তের বৎসর বয়স, তখন কুচবিহারের কয়েকজন বড় কর্ম্মচারী কুচবিহারের অধিপতির সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহারা কলিকাতা জেনানা মিশনের মিস্ পিগট্‌কে সেন পরিবারের সঙ্গে সুপরিচিত জানিয়া তাঁহাকে ঐ ঘটকালির কাজে বিশেষ ভার দিয়াছিলেন। কুচবিহারের যুবক অধিপতি যাহাতে কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার দুহিতাকে দেখিতে পান—এইরূপ উদ্যোগ করিবার জন্য মিস্ পিগট্ কেশবচন্দ্রের পত্নীর ও কেশবচন্দ্রের অনুমতি আদায় করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি ঘর-সংসারের দিকে বড় থাকিত না, তাই সেবিষয়ে কিভাবে কি উদ্যোগ হইতেছিল তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ রাখেন নাই। তিনি তরুণবয়স্ক কুচবিহারপতিকে দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শিষ্ট ব্যবহারে প্রীতিলাভই করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার বাড়ীতে ড্রইং-রুম বা বৈঠকখানার ঘরে দুইখানি কাছাকাছি-আসনে কুচবিহারপতি ও তাঁহার ভাবী-পত্নী

এমনভাবে হাতে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন যাহা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সূচনা করে। এই দৃশ্য যখন কেশবচন্দ্রের চোখে পড়িল তখন তিনি পবিত্রতা রক্ষার দিকে তাঁহার নিজের মনের ধারণার অনুরূপে সঙ্কল্প করিলেন যে অবিলম্বে (অর্থাৎ কুচবিহারপতির সেই সময়ের ব্যবস্থিত বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে) বিবাহ অনুষ্ঠান করাইতে হইবে, যদিও ব্রাহ্মদের সামাজিক বিধানে তাঁহার মেয়ের পক্ষে বিবাহের বয়স হইতে আর এক বৎসর বাকি ছিল। তাঁহার এই সঙ্কল্পকে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ মনে করিয়াছিলেন। শীলধর্ম্ম অর্থাৎ morality সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, যেখানে মিলনলাভের প্রবৃত্তিতে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে স্পর্শ করে সেখানে তাহারা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে অথবা অন্যত্র বিবাহ করিলে অপবিত্রতা জন্মে বা পাপ হয়। কুচবিহারপতি ইউরোপ গিয়া নানারূপে মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার দুহিতার পক্ষে অনিষ্ট হইতে পারে, কেন না দুহিতাকে সে অবস্থায় অন্যত্র বিবাহ দিতে গেলে তাঁহার মতের অনুযায়ী পবিত্রতা রক্ষা হয় না। বিবাহ সম্বন্ধে ও পবিত্রতা সম্বন্ধে একালের অন্য অনেক লোকের যে ধারণা তাহাতে তাঁহারা কেশবচন্দ্রের ধারণাকে শুচিবাই বলিতে পারেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাদের সামাজিক নিয়ম না মানিয়া এই বিবাহের অনুষ্ঠান হইতে দিলে পাছে অন্য লোকে মনে করে যে হয়ত বা কোন কারণে তাড়াতাড়ি বিবাহ ঘটাইবার প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি লোকের অযথা সন্দেহ হইতে দুহিতার সুনাম রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে অচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধন ঘটিবার পর প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহিতেরা স্বামীস্ত্রী রূপে মিলিতে পারিবেন না। অনেকেই জানেন যে কুচবিহারপতি তাঁহার বিবাহের এক বৎসরের পর ইউরোপ হইতে যখন দেশে ফিরেন তখন তাঁহাকে তাঁহার পত্নীর সঙ্গে মিলন করাইয়া কেশবচন্দ্র একটি উপাসনার অনুষ্ঠান করেন। কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার অনুবর্ত্তীরা তাঁহার সঙ্কল্পকে সুবিচারিত মনে করিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে অনেকের মনে তাঁহার প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই, তখন তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। নিজের পারিবারিক কথা অন্যকে বলা বা সে বিষয়ে কাহাকেও কৈফিয়ৎ দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই। কিন্তু ইঙ্গিতে একথা অনেককে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে বয়সের হিসাবে তাঁহার দৃষ্টান্ত ধরিয়া অন্য কেহ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বিবাহের অনুষ্ঠান করিলে তিনি সহিবেন না; অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য যে সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। এই শেষকথাটি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা বিবরণে পড়িতে পাওয়া যায়। কোন কারণ না জানাইয়া নিজের কাজকে অসাধারণ ও অবশ্যকর্ত্তব্য বলায় বিরোধীরা অধিকতর উত্যক্ত হইয়াছিলেন। আমি যেরূপ ভাবে ঘটনাটির বিবরণ দিলাম তাহা কেশবচন্দ্রের দৈনিক লিপিতে ও তাঁহার সেই সময়কার উপাসনার অনেক শব্দে পরিস্ফুট আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কাঁদুনে' ছেলে

সত্য। ঐ আবার সুরু করেছে।

অরুণা। খুব কাঁদছে কিন্তু। ঘণ্টা দু' তিন ধরে' সমানে।

সত্য। অনবরত চীৎকার শুনে' শুনে' মাথাটা যেন ঘুরছে'। ঝি টি একটা রাখেনা কেন?

অরুণা। রাখ্‌বে কোত্থেকে বল? আয় ত' বেশী নয়।

সত্য। ছেলেটার মায়ের বুঝি অসুখ?

অরুণা। সম্ভব তাই। নইলে—

সত্য। ভদ্রলোকটিও বুঝি বাড়ী নেই।

অরুণা। না, কাজে বেরিয়েছে। আমরা কখন বেরুবো?

সত্য। এই ত' সবে পাঁচ্‌টা। ছ'টায় আরম্ভ। এই শাড়িখানা প'র্‌লে যা মানায় তোমাকে—

অরুণা। আমি নিজে কিনেছি। তোম্‌রা বল মেয়েদের সখ্‌ আছে কিন্তু পছন্দ নেই—

সত্য। রংটি বড় সুন্দর।

অরুণা। কি রং বল দেখি—

সত্য। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া)—উষালোকে উদ্ভাসিত স্বচ্ছতোয়া তটিনীর মত

অরুণা। সাবাস্‌, সাবাস্‌। সাধারণ ভদ্রলোক না হ'য়ে তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল। ইস, ছেলেটা গেল কেঁদে' কেঁদে'।

সত্য। ছেলে না মেয়ে?

অরুণা। ছেলে।

সত্য। জান্‌তাম, মেয়েদের গলাই চড়ে বেশী—

অরুণা। ছেলেগুলো বুঝি চিঁ চিঁ করে? ছেলেপিলে হওয়া খুব বিপদের কথা দেখ্‌ছি, অস্বস্তির একশেষ। একটা হ'লে কি কর্‌তাম তাই ভাবি।

সত্য। ছেলের প্রস্রাব আর লালা মেখে' সুরভি হয়ে' থাক্‌তে'—

অরুণা। আমিও তা-ই বলি। ছেলের মা হলেই আমাদের সব সখের শেষ হয়ে যায়। স্বামী পর্য্যন্ত তখন আমল পায় না।

সত্য। মনই লাগে না। এ বেশ আছি; রোজই আমাদের হনিমুন্‌ বাসর আর ফুলশয্যা। বলিয়া সত্য অত্যন্ত তরল চক্ষে অরুণার দিকে চাহিয়া রহিল।

অরুণা। চির-কিশোর আর চির-কিশোরী কি বল?

সত্য। হাই। ছেলেমেয়ে চোখের উপর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে অষ্টপ্রহরই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে না, ওরে তোদের বেলা গেল।

অরুণা। আর কিছুক্ষণ এমনি করে কাঁদলে' ছেলেটা গলা শুকিয়ে মারা যাবে। কি হয়েছে বল ত' ?

সত্য। চীৎকার শুনে' মনে হচ্ছে' যত কিছু হতে' পারে সব হয়েছে।

অরুণা। দেখে' আসব ?

সত্য। এস'। শীগ্‌গির এস'।

অরুণা বাহির হইয়া গেল।

অরুণার দেহের গঠন অনিন্দ্য, রূপ অপরিসীম ; তার যৌবনশতদলের একটি পাপ্‌ড়িও স্থানচ্যুত ম্লান হয় নাই—যৌবনসমাগমে যেখানে যে অঙ্গ ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া নিবিড় নিটোল হইয়া উঠিয়াছিল আজিও তেমনই আছে, কোথাও টোল খায় নাই, কোথাও কুঞ্চিত বলহীন হইয়া যায় নাই। তাহার যৌবনসম্পদের উপর স্বর্ণাভরণের দীপ্তচ্ছটা যে অপরূপ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া সত্য বসিয়া রহিল। অরুণার অঙ্গচ্যুত মৃদুগন্ধটুকু বাতাসে লাগিয়াই ছিল—নিঃশ্বাসের সাথে সেই সৌরভ সত্যর বুক ভরিয়া মনোমদ হিল্লোল তুলিতে লাগিল।

সত্য হাত উল্টাইয়া ঘড়িটা একবার দেখিল, ছ'টা বাজিতে দেরী আছে।

দ্রুতপদে নীচের তলায় নামিয়া আসিয়া অরুণা দরজার সম্মুখে থামিল। ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এ অবস্থায় দেখা দেওয়া ভাল হইবে কি না। অযাচিত হিত গ্রহণ করিতে অনেকেই চায় না। এ-টা স্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতাও আছে। দরিদ্র প্রতিবেশী অনায়াসে মনে করিতে পারে, সাজসজ্জা করিয়া আমার দৈন্য আমাকেই দেখাইতে আসিয়াছে।--

দরজা ভেজান' ছিল, কেমন করিয়া হঠাৎ একটু ঠেলা লাগিতেই শিকলটা বাজিয়া উঠিল। শ্রান্ত-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—কে ? সঙ্কোচ করা আর চলিল না—অরুণা দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে শিশু কান্না মুলতুবী রাখিয়াছিল ; অরুণা ঘরে ঢুকিতেই সে আবার চীৎকার জুড়িয়া দিল।

তক্তপোষের উপর অত্যন্ত সাধারণ আধময়লা বিছানা পাতা। শিশুর মা একখানা চাদরে গলা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া নির্জ্জীবের মত শুইয়া আছে ; তাহার প্রচুর কেশ অতিশয় অবিন্যস্ত—চুলের কিছু তার বালিশের উপর, কিছু তার বুকের উপর মুখের উপর লুটাইতেছে ; চোখের চারিদিকে কালো একটা রেখা পড়িয়াছে ; মুখাবয়বে ক্লেশের চিহ্ন খুব স্পষ্ট। শিশুটি জননীর পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে।

অরুণাকে দেখিয়া রুগ্‌ণার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অরুণা বলিল,—ছেলেটি অনেকক্ষণ থেকে বড্ড কাঁদ্‌ছে'। আপনার কি অসুখ ?

—হ্যাঁ। মাথাটি বড় ধরেছে। এ রকম আমার হয়, তবে অনেকদিন পর পর।

—আমাকে যদি দরকার হয় বল্‌তে পারেন। ওষুধ পত্র যদি—

—না, না, ওষুধের দরকার নেই; একটু ঘুমুলেই আমি ভালো হয়ে যাব। ছেলের কান্নায় ঘুমুতে পারছিনে। ছেলেটাকে যদি কিছুক্ষণের জন্য রাখেন—

বলিয়া সে অত্যন্ত কাতর অনুনয়ের দৃষ্টিতে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অরুণা বলিল,—তা' বেশ ত', আমি রাখ্‌বখন। কিন্তু থাক্‌বে ত?

—থাক্‌বে, বড় শান্ত ছেলে। ভাল লাগ্‌ছেনা বলেই কাঁদছে। দুটো কথা কইলেই চুপ করে থাক্‌বে। বলিতে বলিতে ছেলের দিকে চাহিয়া রুগ্‌ণা জননীর চোখ দিয়া স্নেহ যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল।

ছেলেটাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকের উপর দাঁড় করাইয়া ছেলের মা বলিল,—যাও বাবা কাকীমার কোলে। বলিয়া তাহাকে অরুণার কোলে পৌঁছাইয়া দিল।

এইটুকু শ্রমেই রমণীর পীড়ার ক্লেশ বাড়িয়া গেল।

অরুণা বলিল,—বেশী কথা বলাব না আপনাকে। আমি এখন আসি, আপনি ঘুমুন।

—হ্যাঁ, এখন একটু ঘুমতে পারব। ছেলে জেগে থাক্‌লে নির্ভয়ে ঘুমতেও পারতাম না। বলিয়া ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রমণী [illegible] একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অরুণা শিক্ষিতা, এবং দুঃশীলা নহে। মনের ভাব লুকাইয়া রাখিতে সে জানে। শিশুকে কোলে করিয়া চৌকাঠের বাহিরে আসিতেই তার আপনামনে প্রীতি-প্রফুল্ল মুখ বিরক্তিতে বক্র হইয়া গেল। সে যখন উপকারে লাগিতে চাহিয়াছিল তখন ছেলে রাখিবার সম্ভাবনা তাহার মনে উদয়ই হয় নাই। ছেলেকে রাখিবার কথা যখন ছেলের মা বলিয়া ফেলিল, তখন কাতরতা বা অনিচ্ছা দেখাইলে হৃদয়হীনতার কাজ হইত, ইহাও সে জানে, কাজেই মুখখানা অম্লান রাখিয়াই তাহাকে স্বীকৃত হইতে হইয়াছে। শিশু তাহার কোলে আসিয়াই মুখের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া তাহার সাড়ী খানা মুষ্টির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল, সাড়ীর সেই স্থানটা চিহ্নিত হইয়া আছে। "ঊষালোকে উদ্ভাসিত স্বচ্ছতোয়া তটিনীর মত" সে সাড়ীর রং।

[illegible] কতক্ষণ ছেলে সাম্‌লাইতে হইবে তাহারই বা ঠিক কি। যেমন কাঁদুনে ছেলে, আবার কান্না জুড়িতেই বা কতক্ষণ। এতক্ষণ শব্দটা নীচে হইতে আসিতেছিল, এবার কান্না জুড়িলে রোলটা একেবারে তাহার কোলের উপর হইতে উত্থিত হইবে। তোয়াজ করিয়া ছেলেকে ঠাণ্ডা রাখা কি তার কাজ, না এই তার সময়? যেমন আক্কেল ছুঁড়ির, মেয়ে মানুষ হইলেই কি সে ছেলে রাখিতে পারে? এদিকে সময় হইয়া আসিয়াছে, থিয়েটারে যাইতেই হইবে, এই সময়ে এই! আশাভঙ্গে অরুণার কান্না পাইতে লাগিল।

ছেলেটা বেশ নাদুস্ নুদুস, বেশ ভারি। তাহাকে বহন করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে অনভ্যস্ত অরুণার কষ্ট হইতে লাগিল।

সশিশু অরুণাকে দেখিয়া সত্য চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—কি রকম ?

হোক্ না পরের ছেলে ; তাহাকেই কোলে করিয়া অরুণার লাবণ্যের উপর মাতৃত্বের যে মনোরম ছবিটি ফুটিয়াছিল তাহা সত্যর চোখে পড়িল না।

ক্ষুণ্ণস্বরে অরুণা বলিল,—গছিয়ে দিয়েছে। অনুরোধ ঠেলতে পারলুম না।

—তিনি কি করছেন ?

—এতক্ষণ বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাথা ধরে—

—থিয়েটারের কি হবে ?

—আমার যাওয়া হবে না। তুমি যাও !

—তোমার জন্যেই যাওয়া।—বলিয়া সত্য পরম অসন্তোষের সহিত ভ্রূকুটি করিয়া রহিল থিয়েটারে অত্যন্ত আমোদের কল্পনা সে করিতেছিল।

—কতক্ষণ রাখ্তে হবে শুনে' এসেছ কি ?

—তাঁর ঘুম না ভাঙা পর্য্যন্ত। বলিয়া অরুণা ছেলেটির ডানা ধরিয়া তাহাকে টেবিলের উপর দাঁড় করাইল দাঁড়াইয়া সে মহানন্দে নাচিতে লাগিল। কাঁদিবার লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না।

শিশুরও ভাল লাগা মন্দ লাগা আছে। নির্জ্জীব মায়ের কাছে থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না বলিয়াই সে কাঁদিতেছিল। নূতন স্থানে শিশু অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

অরুণা বলিল,—দিব্বি ছেলেটি।

সত্য বলিল,—হুঁ।

শিশু হাসিল, তারপর হাঁ করিয়া অরুণার গালের উপর মুখ লইয়া গেল। অরুণা শিশুর গালের সঙ্গে নিজের গাল চাপিয়া ধরিল, তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। অরুণার চুমু তার ভাল লাগে নাই, এমনি ভাবটি দেখাইয়া শিশু মুখ টানিয়া লইল। সে সশব্দ প্রচণ্ড চুমু ভালবাসে না। সে ভালবাসে গালের সঙ্গে ঠোঁটের অমনি একটু স্পর্শ, একটু সুড়্সুড়ি।

অরুণা শিশুর অসন্তোষটুকু যেন অনুভব করিল। নিজের তর্জ্জনীটা শিশুর মুঠার ভিতর সে ধরাইয়া দিল, শিশু আঙুলটি মুখের মধ্যে লইয়া চুষিতে লাগিল। এই সময়েই অরুণা দেখিল, শিশুর পায়ে ময়লা ছিল, ময়লা তাহার কাপড়ে লাগিয়াছে। দেখিয়া তাহার মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ জন্মিল না। শিশু অরুণার আঙুল ছাড়িয়া দিয়া হাত চাটিতে লাগিল। অরুণার মুখে পরিতৃপ্তির একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সত্য অরুণাকে লক্ষ্য করিতেছিল ; বলিল,—চরম।

সত্যর গম্ভীর কণ্ঠ শুনিয়া ছেলের বুঝি তার বাপকে মনে পড়িল। সত্যর দিকে ঝুঁকিয়া সে বড় মধুর হাসিতে লাগিল। শিশুর এ আদরটুকু সত্য অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। হাসিয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া লইল। শিশুও তৎক্ষণাৎ অরুণাকে ভুলিয়া সত্যর বাহুবেষ্টনের মধ্যে শান্ত হইয়া বসিল। অল্পক্ষণ পরেই সত্যর হাতের উপরেই শিশু ঘুমাইয়া পড়িল।

অরুণা বলিল,—আমার কাছে দাও, তোমার কোলে ওর অসুবিধা হচ্ছে।

সত্য বলিল,—না, বেশ আছে।

একখানা মাসিক পত্রের কয়েকটা পাতা উলটাইয়া অরুণা পুনশ্চ বলিল,—আমারই কাছে দাও, অনেকক্ষণ কোলে করে আছ—

সত্য বলিল,— আমার কিছুই কষ্ট হচ্ছে না।

অরুণা হাত বাড়াইয়া বলিল,—তবু দাও আমার কোলে।

সত্য নিদ্রিত শিশুকে অতিশয় সাবধানতার সহিত অরুণার হাতে পৌঁছাইয়া দিল।

সুখনিদ্রিত শিশু অরুণার কাঁধের উপর মাথাটা একবার এ-পাশ ও-পাশ করিল, ছোট্ট একটা নিশ্বাস ছাড়িল। মাতৃবক্ষ নয়, তথাপি শিশুর এই নিশ্চিন্ত অকাতর নিদ্রা অরুণার অন্তর স্পর্শ করিল। শিশু যেন জানে, এই বুকখানাও মায়ের বুকের মতই নিরাপদ। শিশুর গৌর-কান্তি, মসৃণ ত্বক, ফুরফুরে কোঁকড়া চুলগুলি, নবনীর মত কোমল ছোট্ট হাতখানি অরুণা অনির্ব্বচনীয় লালসার সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শিশুর ক্ষুদ্র নিঃশব্দ নিঃশ্বাস, বুকের মৃদু মৃদু উত্থান পতন সে যেন কেমন ভয়ে ভয়ে অনুভব করিতে লাগিল। সামান্য স্পন্দনটুকু, যদি সহসা থামিয়া যায়!

সত্য বলিল,—খুব ঘুমুচ্ছে।

অরুণা কথা কহিল না, শিশুর যে হাতখানা তার বুকের উপর এলাইয়া ছিল সে তাহাই দেখিতেছিল।

* * * * *

ঘণ্টা দুই পরে যখন অরুণা নিদ্রিত শিশুকে বুকে করিয়া নীচে লইয়া গেল তখন শিশুর মা ঘুম ভাঙ্গিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছে। অরুণা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—আস্তে কথা কইবেন, ছেলে ঘুমুচ্ছে।

সতর্কতা সত্বেও ছেলে জাগিয়া উঠিয়া অরুণার কাঁধের উপর হইতে মাথা তুলিল, একবার অরুণার মুখের পানে চাহিল, তারপর মায়ের মুখের পানে চাহিল। শিশুর চাহনির উত্তরে মা হাসিল। পরক্ষণেই শিশু দুই বাহু উত্তোলিত করিয়া অরুণার কোল হইতে মায়ের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল। অরুণা তাহাকে আস্তে আস্তে নামাইয়া দিল। জননী উঠিয়া বসিয়া শিশুকে কোলের উপর শোয়াইয়া তাহার মুখের উপর নত হইয়া এমন সব কথা অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল যাহার কোনো অর্থ হয় না এবং যাহা অরুণা এমন করিয়া কান পাতিয়া কোনদিন শুনে নাই।

অরুণার মুখখানি ধীরে ধীরে রক্তিম হইয়া উঠিতে লাগিল। অকৃতজ্ঞ শিশু, এমন দুর্ব্যবহার তাহার সঙ্গে করিল। সে যে তাহারই বুকে দুই ঘণ্টা ঘুমাইয়াছে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে ভয়ে সে যে দুইঘণ্টা ধরিয়া ভাল করিয়া নিশ্বাস টানে নাই।

মা পুত্র পরস্পরে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। সে এখন অনাবশ্যক, দর্শকমাত্র। মা বা পুত্র কেহই তাহাকে আর লক্ষ্যও করিতেছে না। শিশুর স্পর্শ এখনও তাহার বুকে উষ্ণ হইয়া আছে, শিশুর নধর হাতখানি কেমন করিয়া তাহার বক্ষ আশ্রয় করিয়া শুইয়া ছিল—সে দৃশ্যের অনুভূতি এখনও তাহার প্রাণের সাথে লগ্ন হইয়া আছে, শিশু-অঙ্গের ঘ্রাণটুকু পর্য্যন্ত সে ভুলিতে পারে নাই।

দরজা ঠেলিয়া শিশুর পিতা ঘরে ঢুকিল। অরুণা দেখিল, দিব্য সুগঠিত সুপুরুষ।

শিশুর বিরুদ্ধে অরুণা মনে মনে অভিমান করিতেছিল। এই অভিমান যে হাস্যকর হইতে পারে ঘুণাক্ষরেও তাহা তাহার মনে হয় নাই। কিন্তু এই পুরুষটিকে দেখিয়া ঐ শয্যাশায়িনা শীর্ণা সন্তানবতী রমণীর বিরুদ্ধে তাহার ঈর্ষা জ্বলিয়া উঠিল। তখন তাহার নিজেকে মনে পড়িল, তাহার নিখুঁৎ রূপ, অটুট যৌবন, অতুল ধনভাগ্য উচ্চ শিক্ষা; আর ঐ রমণী?—

অরুণা অকস্মাৎ অনুভব করিল, শিশুর পিতা বুঝি তাহারই দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে। অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে সে দৃষ্টি নত করিয়াছিল; চোখ তুলিয়া দেখিল, পুরুষটি সবিস্ময়ে তাহাকে দেখিতেছে না, সকাতরে দেখিতেছে নিজের স্ত্রীকে। পুরুষের দৃষ্টিতে অরুণা এতকাল যাহা পাঠ করিয়া আসিয়াছে এ দৃষ্টিতে তাহার ছায়ামাত্রও নাই—লিপ্সা নাই, চাতুর্য্য নাই, আহ্বান নাই, আছে শুধু অনন্ত মমতা।

শিশুর পিতা জিজ্ঞাসা করিল,—আজ আবার মাথা ধরেছে? খুব ধরেছে?

—খুব ধরেছিল, এখন ভাল আছি। তেতলার ইনি এসে খোকাকে নিয়ে গেলেন, তবে একটু ঘুমিয়ে বাঁচি।

শিশুর পিতা মুহূর্ত্তের জন্য অরুণার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। শিশুর মা তখন হাসিতেছিল। হাসি ফুটাইতে তাহার কষ্ট হইতেছিল, তবু যে উঠিয়া স্বামীকে দেখাইতে হইবে সে ভালই আছে।

কিন্তু এ ছলনা ধরা পড়িয়া গেল। স্বামী স্ত্রীর কপালে করস্পর্শ করিয়া চিন্তিতমুখে বলিল,—গরম এখনও আছেই।

—গরমটুকু এখনই যাবে। খোকা সারা দুপুরটা কি কান্নাই কেঁদেছে।

স্বামী স্ত্রী খোকার গল্পে মশগুল হইয়া গেল। খোকা পরমানন্দে একবার বাপের কোলে একবার মায়ের কোলে ফিরিতে লাগিল।

অরুণা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল, তাহার বুকের ভিতর কি যেন একটা গুরুভার দ্রব্য গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। তাহাকে ওরা কেউ চায় না, স্ত্রী না, পুরুষ না, শিশুও না। ওদের কথা যাক্, শিশু কি করিয়া এত শীঘ্র তাহাকে একেবারে ভুলিয়া গেল।

সত্য অন্ধকারেই বসিয়া ছিল। শিশুটির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া ঘরে আলো আনা হয় নাই।

—দিয়ে এলে ?

—হ্যাঁ।

—আজকার আনন্দটাই মাটি হ'ল।

—হ্যাঁ।

—তা হোক্, একটা রাত বৈ ত' নয়। আমাদের ঐ রকম একটা থাক্‌লেও ত' হতে পারত।

—হ্যাঁ।

—ছেলেটি বেশ, হাস্‌লে বেশ দেখায়, নয় ?

—হ্যাঁ।

এবার অরুণার এক অক্ষরের উত্তরটা গলা দিয়া এমনই বিকৃত হইয়া বাহির হইল যে সত্য বিস্মিত হইয়া বলিল,—ব্যাপার কি ? কাঁদছ যে ?

অরুণা টেবিলের উপর হাত ছড়াইয়া দিয়া মাথা গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল। *

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য

১। কার্পাস-শিল্পের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার

বোম্বাই ও আমেদাবাদের কার্পাস-শিল্প সম্প্রতি অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে; বিদেশী আমদানি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, মিলওয়ালারা ব্যবসায়ে যে অনুপাতে মূলধন খাটাইয়াছে সেই অনুপাতে লাভ করিতে পারিতেছে না; বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে তাহাদিগকে যে দরে কাপড় ও সূতা বিক্রয় করিতে হইতেছে তাহাতে শুধু খরচা মাত্র পোষায়, লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

মিলওয়ালারা এই বিদেশী আমদানি বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তুমুল আন্দোলন করিতেছে। এই আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ভারতীয় শুল্ক নির্দ্ধারণ সমিতির উপর আমাদের কার্পাস-শিল্পের দুর্দ্দশার কারণ অনুসন্ধান

---

* (ইংরেজী হইতে গৃহীত)।

করিবার ও তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার ভার দেন। সেই সমিতির মতামত সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতি যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং এই আন্দোলনের মূলে যে-সকল শক্তি কাজ করিতেছে তাহার আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, কার্পাস-শিল্পের দুর্দ্দশার কারণগুলি নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। প্রথম ও মুখ্য কারণ জাপানের কার্পাস-শিল্পের প্রতিযোগিতা। ৩২ কাউণ্টের সূতা জাপান হইতে যে দরে আমদানি হইতেছে সেই দরে বোম্বাই অঞ্চলের মিলওয়ালাদের শুধু খরচাই পোষায়—লাভ তো হয়ই না এমন কি মিলের মেশিনারির ক্ষয় বাবদ যে অর্থ-সংস্থান আবশ্যক সেই অর্থ-সংস্থান হওয়ারও উপায় নাই। সুতরাং বোম্বাই ও আহমেদাবাদের মিলগুলিতে ৩০ কাউণ্টের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম সূতা দিয়া যে কাপড় বোনা হইয়া থাকে সেই কাপড়ের দাম জাপানী কাপড়ের দামের সমান অথবা বেশী। কিন্তু ৩০ কাউণ্টের অপেক্ষা কম সূক্ষ্ম সূতা দিয়া যে মোটা থান বোনা হয় তাহার দাম জাপানী থানের দামের অপেক্ষা বেশী তো নয়ই বরং কম। সুতরাং এক্ষেত্রে জাপানী প্রতিযোগিতার কোন ভয় নাই।

বোম্বায়ের মিলওয়ালারা বলিতেছে যে তাহারা যে জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না তাহার কারণ এই যে জাপান প্রধানতঃ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া সস্তা দরে কাপড় ও সূতা তৈয়ারী করিতেছে। প্রথমতঃ, জাপানের মিলগুলি দিনে ২২ ঘণ্টা চলে এবং এক এক দল শ্রমজীবী ১১ ঘণ্টা করিয়া কাজ করে। এই উপায়ে এক থান কাপড়ের পিছনে মেশিনারির বাবত যে খরচা সেটা কমিয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মিলগুলি দিনে ১০ ঘণ্টা চলে; সুতরাং এই যে বাকি ১০ ঘণ্টা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে তাহার জন্য মেশিনারির বাবত যে খরচা সেটা দ্বিগুণ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, জেনেভায় যে প্রথম আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী সঙ্ঘের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে স্থির হয় যে স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের রাত্রিবেলায় কারখানায় কাজ করা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ভারতবর্ষে এই নিষেধ-আজ্ঞা জারি হইয়া যায়। কিন্তু জাপানে এই নিষেধ আজ্ঞা জারি হয় নাই। সুতরাং শ্রমজীবীদের শোষণ করিয়া জাপান যে সস্তা দরে কাপড় ও সূতা তৈয়ারী করিতেছে তাহা অসঙ্গত এবং তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

জাপানের প্রতিযোগিতা ব্যতীত কার্পাস-শিল্পের দুর্দ্দশার অন্যান্য কারণও আছে। প্রথমতঃ, বোম্বাইয়ের মিলগুলির মূলধন ক্রমশঃই ফাঁপিয়া উঠিয়াছে; আসল মূলধনের প্রমাণ বাড়ে নাই কিন্তু মিলের কর্ত্তারা অংশীদারের সংখ্যা বাড়াইয়া চলিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে বোম্বায়ের মিলগুলি শত করা ১০০৲।১৫০৲ করিয়া অংশীদারদিগকে লাভের অংশ দিয়াছে; দুর্দ্দিনের সংস্থান হিসাবে সংরক্ষিত মূলধন (reserve capital) রাখায় নাই। কাজে কাজেই তাহাদিগকে এখন তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বোম্বায়ের মিলের কর্ত্তারা অত্যন্ত প্রাচীন-পন্থী, এমন কি তাহাদের কল-কারখানাগুলিও অত্যন্ত সেকেলে ধরণের। তৃতীয়তঃ, চীনের যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য বোম্বাই হইতে সে দেশে সূতার রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে এবং যদিও কাপড়ের রপ্তানি বাড়িয়াছে বটে তথাপি তাহাতে বিশেষ ক্ষতিপূরণ হয় নাই। চতুর্থতঃ, বোম্বায়ের মিলগুলি আমেরিকার তুলা কিনিয়া থাকে; সুতরাং আমেরিকার তুলার বাজার-দর চড়িয়া যাওয়াতে মিলগুলির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। অপরপক্ষে আহমেদাবাদের মিলগুলি ব্রোচের তুলা ব্যবহার করে এবং মাদ্রাজ অঞ্চলের মিলগুলি কাম্বোডিয়ার তুলা ব্যবহার করে। এই জন্যই বোম্বায়ের মিলগুলি ভারতের অন্যান্য স্থানের মিলগুলির প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া অন্যান্য স্থানের মিলগুলি খরিদদারদের অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকিয়া কারবার করিতেছে; সুতরাং তাহাদের

সহিত বোম্বায়ের মিলওয়ালাদের পারিয়া উঠা শক্ত। ইহা ছাড়া বোম্বায়ের শ্রমজীবীদের মাহিনার হার অন্যান্য স্থানের মাহিনার হার অপেক্ষা বেশী।

এইবার আমরা ভারতীয় শুল্ক-নির্দ্ধারণ সমিতির মতামত আলোচনা করিব। সমিতির তিনজন সভ্য মিঃ এফ্ নয়েস্, রাজা হরিকিষণ কাউল এবং শ্রী সুব্বা রাও। কি করিয়া বোম্বায়ের কার্পাস-শিল্পের দুর্দ্দশার নিরাকরণ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে রাজা হরিকিষণ কাউল ও শ্রী সুব্বা রাও একমত হইয়াছেন; কিন্তু মিঃ নয়েসের সহিত তাঁহাদের মতদ্বৈধ হইয়াছে।

প্রথমতঃ মিঃ নয়েসের প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া দেখা যাক। সচরাচর সব দেশেই গভর্ণমেন্ট নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক বসাইয়া থাকেন; এই শুল্কের উদ্দেশ্য রাজস্ব সংগ্রহ করা, কোন বিশেষ শিল্পকে সাহায্য করা নয়। বর্ত্তমানে বিদেশী কাপড়ের উপর শতকরা ১১৲ এবং বিদেশী সূতার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে শুল্ক আদায় করা হয়। মিঃ নয়েস্ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে জাপানের মিলগুলি দিনরাতে ২২ ঘণ্টা চলে বলিয়া তাহাদের সূতা ও কাপড় তৈয়ারী করিবার খরচ শতকরা ৪৲ হিসাবে কম। তাহাদের এই লাভ অসঙ্গত, কারণ জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী সঙ্ঘের প্রস্তাব গ্রহণ না করার জন্যই এই প্রকার লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং মিঃ নয়েস্ প্রস্তাব করিয়াছেন যে জাপানী সূতার উপর শতকরা ৫৲ টাকা ছাড়া আরও ৪৲ টাকা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য করা আবশ্যক। তাহা হইলেই জাপানের অন্যায় প্রতিযোগিতার উপশম হইবে। বোম্বায়ের মিলওয়ালারা এবং লাঙ্কেশায়ারের কাপড়ওয়ালারা এই প্রকার একটা ব্যবস্থার জন্যই আন্দোলন করিতেছিলেন।

মিঃ নয়েসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাজা হরিকিষণ কাউল এবং শ্রী সুব্বা রাও অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলিতেছেন যে শুধু সূতার উপর শুল্ক বসাইলে আমাদের দেশী তন্তু-শিল্পকে আঘাত করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ১৯০৪ সালে ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক যে সন্ধি হইয়াছিল সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে শুধু জাপানের সূতার উপর শুল্ক বসান চলিবে না; সুতরাং মিঃ নয়েসের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সেই সন্ধি নাকচ করিয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া সন্ধি এক কথায় নাকচ করা যায় না; ছয় মাস পূর্ব্বে সন্ধি নাকচ করিবার প্রস্তাব করা আবশ্যক। সুতরাং এই ছয় মাস ধরিয়া বোম্বাইয়ের মিলওয়ালাদের ক্ষতিস্বীকার করিতে হইবে, তাহারা সদ্য বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে না।

জাপানে এই বৎসর শ্রমজীবী সম্পর্কীয় যে নূতন আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে জাপানী মিলওয়ালা দিনরাতে ২২ ঘণ্টা কারখানা চালাইতে পারিবে না এবং স্ত্রীলোক অথবা বালকবালিকাদের রাত্রিবেলায় কাজ করাইতে পারিবে না; কিন্তু এই আইন কার্য্যে পরিণত হইবে তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে। সুতরাং এই ২॥০ বৎসরের জন্য বোম্বাইকে বাঁচাইতে হইবে; কিন্তু এই ২॥০ বৎসরের মধ্যে যদি ছয় মাস তাহারা অসহায় অবস্থায় বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের উপকারই বা কতটা হইল। তৃতীয়তঃ, আমেরিকা ও চীনে কাপড়ের মিলগুলিতে শ্রমজীবীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং আমাদের দেশে রাত্রিকালে স্ত্রীলোকদের খাটান সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেখানে সে সকল নিয়ম নাই। সুতরাং জাপানী সূতার উপর শুল্ক বসাইয়া শুধু জাপানকেই যদি জব্দ করার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে সেটা সম্পূর্ণ অন্যায়। চতুর্থতঃ, চীনদেশে জাপানীদের ৪৫টি মিল আছে। শুধু জাপানী সূতার উপর যদি শুল্ক বসে তাহা হইলে এই ৪৫টি তথাকথিত চীনা মিল হইতে সূতার আমদানি চড়িয়া যাইবে—জাপান সম্পূর্ণরূপে জব্দ হইবে না।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে সকল দেশের সুতার উপরই যদি এই শতকরা ৪৲ টাকা হারে শুল্ক বসান হয় তাহা হইলে এই সকল আপত্তি ওঠে না। প্রথমতঃ, ১৯০৫ সালের বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি নাকচ করার প্রয়োজন হয় না, জাপানকেও সন্তুষ্ট করা হয় এবং চীনা মিল হইতে সুতার আমদানি বাড়িয়া যাওয়ার ভয় থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, শুধু জাপানেরই শ্রমজীবীদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং শুধু সেখানকারই শ্রমজীবীদের উপর শোষণ চলিতেছে বলিয়াই বোম্বায়ের মিলওয়ালারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এই অন্যায় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া জাপানের প্রতি অবিচার করিতেও হয় না। তৃতীয়তঃ, বৃটিশ সাম্রাজ্য ও জাপান ব্যতীত অন্যান্য দেশ হইতে অতি অল্প পরিমাণ সুতা ও কাপড়ের আমদানি হয়; সুতরাং সকল দেশের কাপড় অথবা সুতার উপরই যদি শুল্ক বসে তাহা হইলে তাহারা যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা নয়। চতুর্থতঃ, বোম্বায়ের মিলওয়ালাদের এই দীর্ঘ ছয় মাস কাল অসহায় অবস্থায় চলিয়া থাকিতেও হইবে না। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সকল দেশই বিশেষ সুবিধা লাভ করিবে কিন্তু এই Imperial Preference-রূপ অথবা অপবাদে কোন লাভ নাই কারণ আমরা এক্ষেত্রে এই সকল দেশের নিকট কোন উপকারই পাইব না।

সম্প্রতি জাপান প্রবাসী শ্রীরাসবিহারী বসু ফরওয়ার্ড পত্রিকায় জাপানী প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জাপান সম্বন্ধে যে সকল মিথ্যার প্রচার হইতেছে সেই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে জাপানে যে সকল জিনিষ রপ্তানি হয় তাহার ৩/৪ অংশই খাদ্যদ্রব্য অথবা কাঁচা মালমসলা (raw materials) অপরপক্ষে জাপান হইতে যে সকল মাল ভারতবর্ষে আমদানি হয় সে সকল কলে তৈয়ারী ব্যবহারোপযোগী জিনিষ।

ভারতবর্ষ জাপানে যে মাল রপ্তানি করে তাহার মূল্য যে মাল সেখান হইতে আমদানি করে তাহার তিন গুণ সুতরাং যদি শুধু জাপানকে জব্দ করিবার জন্যই জাপানী সুতার উপর শুল্ক বসে তাহা হইলে জাপান ভারতবর্ষকে জব্দ করিবার জন্য ভারতীয় জিনিসের উপর শুল্ক বসাইবে। ইহার ফলে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহা ছাড়া বোম্বায়ের মিলওয়ালাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি দরিদ্র ভারতবাসীর কথা ভাবিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতবাসী যে পরিমাণ তুলার জিনিস ব্যবহার করে তাহার ১০০ ভাগের ৩ ভাগ মাত্র জাপানী জিনিস সুতরাং তাহাদের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে জাপানকে জব্দ করার তাহাদের কোন স্বার্থই নাই। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধাংশ জাপান ক্রয় করে; সুতরাং জাপান যদি ভারতবর্ষকে জব্দ করিবার জন্য আমাদের তুলার উপর শুল্ক বসায় তাহা হইলে চাষীদের যে দারুণ ক্ষতি সে ক্ষতির কথা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া টাটার লোহার কারখানা হইতে বহু পরিমাণ Pig iron জাপানে রপ্তানি হয়, এই Pig iron-এর উপর যদি শুল্ক চলে তাহা হইলে টাটা কোম্পানিকে সমধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে।

রাসবিহারী বাবু দেখাইয়াছেন যে বোম্বায়ের মিলের শ্রমজীবীরা জাপানের মিলের শ্রমজীবীদের অপেক্ষা বেশী মাইনে পায় একথা মিথ্যা। ১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বায়ের ১৮৬ টি সুতা বোনার মিলে শ্রমজীবীরা ৩২/০ করিয়া মাসিক বেতন পাইতেছিল। অপর পক্ষে ১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসের জাপানের মিলগুলিতে শ্রমজীবীদের মাসিক বেতনের হার ৩২·৫২ yen অথবা ৪২।০—ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে জাপানের শ্রমজীবী শতকরা ৩০৲ বেশী বেতন পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া তাহারা ৬ মাস অন্তর বোনাস্ পায় এবং সেখানকার মিলওয়ালারা তাহাদের বসবাস ও ব্যবসা-শিক্ষা বাবত অনেক টাকা খরচ করিয়া থাকে।

জাপানের মিলগুলি দিনমানে ২২ ঘণ্টা চলে এইটাই জাপানের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। ১৯২১ সালের U. S. A. Tariff Commission এর Report-এ দেখা যাইতেছে যে একটা মিলের যে মূলধন ব্যয় করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ এক একটা Spindle-এর পিছনে গ্রেট ব্রিটেনে ৩২ ডলার, আমেরিকায় ৪০ ডলার এবং জাপানে ৬০ ডলার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই বহু মূল্য Machinery-র সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইলে জাপানের মিলওয়ালাদের বাধ্য হইয়া ২২ ঘণ্টা কল চালাইতে হইবে।

জাপানের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ এই যে জাপান আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংঘের Convention মানিয়া চলিতেছে না। কিন্তু এই বিষয়ে জাপানকেই একমাত্র অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না; কারণ ভারতবর্ষ ব্যতীত মাত্র ৪টি জাতি এই International labour conventionএর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া ভূমিকম্পের জন্য জাপানের যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের পক্ষেও এই প্রস্তাব মানিয়া চলা সম্ভবপর হইত না।

এই বার আমরা রাজা হরিকিষণ কাউল ও শ্রী সুব্বা রাওয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাঁহারা বলিতেছেন যে শুধু সূতার উপর শুল্ক বসাইলে আমাদের দেশী বস্ত্র শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহা ছাড়া জাপানী সূতার উপর শুল্ক বসান সম্বন্ধে যে সকল ঘোরতর আপত্তি উঠিয়াছে সে সকল তাঁহারা সমর্থন করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বে এই সকল আপত্তির আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে তুলার জিনিষের উপর যে শতকরা ১১৲ করিয়া শুল্ক আছে তাহা ১৫৲ করিয়া দেওয়া হউক। এই শুল্ক হইতে রাজকোষে যে টাকা আসিবে তাহা হইতে মিলওয়ালাদের ৪ বৎসর ধরিয়া অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। এই অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্য হইবে দেশী মিলে অধিকতর পরিমাণে সূক্ষ্ম সূতা বোনার প্রচলন করা। সুতরাং মিলের যে সকল টেকোতে (spindle) ৩২ কাউন্টের অথবা তদধিক সূক্ষ্ম সূতা বোনা হয় সেই সকল টেকোর উৎপন্ন সূতার উপরই অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে। কিন্তু যতগুলি টেকো এই প্রকার সূতা উৎপন্ন করে ততগুলির পিছনেই অর্থ সাহায্য দিতে গেলে বহু অর্থ ব্যয় হইবে। তাই এই সকল টেকোর শতকরা ১৫টি হইতে যে সূতা উৎপন্ন হয় সেই সূতার প্রত্যেক পাউণ্ডের উপর এক আনা করিয়া অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। সূক্ষ্ম সূতা বয়নে উৎসাহ দিবার প্রস্তাবের মূলে বোধ হয় ভারতবর্ষকে Lancashire-এর কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলার চেষ্টা রহিয়াছে।

এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি। জাপানী সূতার উপর শুল্ক বসান ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে বাদ দিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে সকল দেশের সূতা অথবা কাপড়ের উপর শুল্ক বসানও যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ তাহাতে Imperial Preferenceএর অযথা প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। সুতরাং একমাত্র উপায় সকল দেশের তুলার জিনিসের উপর শুল্ক বসান এবং শুল্কজনিত রাজস্ব হইতে মিলওয়ালাদের অর্থ সাহায্য দেওয়া। কিন্তু এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে যে জাপানী সূতার আমদানির জন্যই মিলওয়ালাদের দুর্দ্দশা। উপরোক্ত প্রস্তাব অনুসারে উৎপন্ন সূতার এক শত ভাগের ১৫ ভাগই রক্ষা পাইবে (কারণ এই ১৫ ভাগের উপরই অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে) কিন্তু অপর ৮৫ ভাগ সূতা জাপানী প্রতিযোগিতার মুখে রক্ষা পাইবে না। সুতরাং এই অর্থ সাহায্যে ফল হইবে এই যে মিলওয়ালাদের লোকসানটা কমিবে অথবা লাভটা বাড়িতে থাকিবে; দ্বিতীয়তঃ, বোম্বাইয়ের দুরবস্থা

শুধু জাপানের প্রতিযোগিতার জন্যই নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানের মিলগুলির প্রতিযোগিতার জন্যও বটে। সুতরাং এই অর্থ সাহায্যে বোম্বাইয়ের কোন বিশেষ সুবিধা হইবে না। তৃতীয়তঃ, ৩০ কাউন্ট অথবা তদধিক সূক্ষ্ম সূতা বোনার উপযোগী তুলা আমাদের দেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না; তাহা ছাড়া Broach-এর তুলা আমেদাবাদের মিলগুলিতেই ব্যবহৃত হইবে এবং Cambodia-র তুলা মাদ্রাজ অঞ্চলের মিলগুলি একচেটিয়া ভাবে ব্যবহার করিবে, সুতরাং বোম্বাইয়ের মিলগুলিকে আমেরিকার অথবা Egypt-এর তুলার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, এই প্রকার অর্থ-সাহায্যের ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবিচার করা হইবে। যে সকল মিলে অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী হইতেছে তাহারা বিশেষরূপে সাহায্য পাইবে কিন্তু যাহারা অল্প পরিমাণে সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী করিতেছে তাহারা অল্প সাহায্য পাইবে এবং তাহার ফলে অধিকতর পরিমাণে সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী করার জন্য যে অর্থব্যয় প্রয়োজন সে অর্থব্যয় তাহারা করিতে পারিবে না; সুতরাং তেলা মাথায় তেল দেওয়াই হইবে। তাহা ছাড়া মিলওয়ালারা এক একটা টেকো হইতে যত বেশী সূতা পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা না করিয়া টেকোর সংখ্যা যত বেশী হয় তাহারই চেষ্টা করিবে, কারণ তাহাতে করিয়া অর্থসাহায্যের প্রমাণ বাড়িয়া যাইবে।

এই সকল তর্কবিতর্কের মধ্যে আসল পথটি নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে এক্ষেত্রে রাজনীতির চাল বাজি আবিষ্কার করা বোধ হয় শক্ত নয়। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা শুধু স্বার্থান্ধ হইয়া Lancashire-এর সহিত দল বাঁধিয়া জাপানকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ কথা তাহারা বোঝে না যে ইংরেজ বণিক আজকাল ভারতীয় বণিকের সহিত এক জোট হইয়া দরিদ্র ভারতবাসীকে শোষণ করিবার উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তুলার জিনিষের আমদানি হইয়া থাকে তাহার ১০০ ভাগের ৩ ভাগ মাত্র জাপানী। সুতরাং এই তিন ভাগের প্রতি যে Lancashire-এর প্রবল লোভ আছে তাহা বলা যায় না। সুতরাং Lancashire-এর উদ্দেশ্য বোম্বাইয়ের ধনী ও দরিদ্র ভারতবাসীর মধ্যে একটা অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনটাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া। অপর পক্ষে রাজা হরিকিষণ কাউল এবং শ্রী সুব্বা রাওয়ের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য দেশীয় কার্পাস শিল্পকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলা। সূতার উপর শুল্ক বসাইলে আমাদের দেশী বয়নশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে তুলার জিনিষের আমদানী হয় তাহার উপর শুল্ক বসাইলে যে Lancashire ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া ৩২ কাউন্ট অথবা তদধিক সূক্ষ্ম সূতা যদি অর্থ সাহায্যের ফলে অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে এমন সময় আসিতে পারে যখন Lancashire এর সূক্ষ্ম বস্ত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইতে পারিবে। সুতরাং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে Lancashire বর্ত্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত তো হইবেই, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষীয় মিলগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠাও তাহার পক্ষে শক্ত হইবে। কিন্তু অপর পক্ষে শুধু জাপানী সূতার উপর যদি শুল্ক বসে তাহা হইলে বোম্বাইয়ের মিলগুলি বর্ত্তমানে হয় তো বাঁচিয়া যাইবে কিন্তু Lancashire-এর প্রতিপত্তি সমানই থাকিয়া যাইবে।

এই সকল তর্কবিতর্কের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথটিই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা মিঃ নয়েসের প্রস্তাব এবং রাজা হরিকিষণ কাউল ও শ্রী সুব্বা রাওয়ের প্রস্তাব এই উভয় প্রস্তাবই নামঞ্জুর করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে মিলের কলকব্জার উপর যে শুল্ক আছে সেই শুল্ক উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আগামী ব্যবস্থাপক সভার বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হইলে সেখানকার শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়ায়ের ফলাফল কি হইবে তাহা আন্দাজ করা বোধ হয় শক্ত নয়।

ভারতের অধীনতা কি ইংল্যাণ্ডের ঘরোয়া ব্যাপার ?

সাধারণতঃ দাবী করা হইয়া থাকে যে ভারতের অধীনতা সম্পূর্ণভাবে ইংল্যাণ্ডের ঘরোয়া কথা—এ বিষয়ে অন্য কোন জাতির কিছু বলিবার নাই, অন্য কোন জাতি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না—যেন ভারতের সম্বন্ধে সকল ব্যাপারেই ইংল্যাণ্ডের বলিবার অধিকার আছে, "থাম থাম. এ বিষয়ে তোমরা মাথা ঘামাইও না, এ যে আমার ঘরোয়া কথা"।

এই দাবী কি ন্যায্য ? যদি তাই হয়, তবে যে Polandকে Germany, Russia ও Austria ত্রিধা ভাগ ক'রেছিল, সেই Polandকে মিত্রশক্তিবর্গ মহাযুদ্ধের পর স্বাধীন ক'রে দিলেন কোন্ অধিকারে ?

যদি আজ চীন দেশকে ইংলণ্ড বা ফ্রান্স বা জাপান অধিকার করিয়া লয়, চীন দেশের অধীনতার কথা বিজেতা শক্তিরই ঘরোয়া কথা হইবে ? তাহা হইলে, জাপান যখন Shantung জিতিল তখন শক্তিবর্গ বাধা দিল না কেন ?

"একটা মহান্ জাতি যার লোকসংখ্যা ত্রিশ কোটির কম নয় আর যা জগতের ব্যাসের তৃতীয়াংশ দূরে সম্পর্কলেশমাত্রশূন্য—একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের কেবল সাড়ে চার কোটি লোকের দ্বারা শাসিত হচ্ছে—এমন জাতির স্বাধীনতা বা অধীনতার কথাকে বিজেতা জাতির কেবল ঘরোয়া কথা বলার মত নিছক পাগলামি বা একান্ত বোকামি আর কি হ'তে পারে ? খাটি সত্য কথা হচ্ছে এই যে ঘরোয়া কথা ব'লে দাবী করবার এর চেয়ে কম অধিকার আর কোন সমস্যার নেই, আর জগতে যদি কোন বিষয় থাকে যার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর স্বার্থ জড়িত, তা' হচ্ছে এই। কারণ :—

(১) ভারতকে নিজের অধিকারে রাখবার জন্য ইংরেজকে মস্ত বড় নৌবহর পুষতে হচ্ছে, আর সমস্ত সমুদ্রপথ নিজের দখলে রাখতে হয়েছে—তাতে জগতের অন্য সমস্ত জাতিই অসুবিধা ভোগ কচ্ছে

(২) গত শত বছরের মধ্যে ইংলণ্ড যত যুদ্ধ করেছে আর কোন জাতি তা করে নি ! আর ইংল্যাণ্ডের প্রায় সমস্ত যুদ্ধেরই কারণ ভারতবর্ষকে নিজ কবলে রাখা।

(৩) অনেকে ভয় করেন ভবিষ্যতে শ্বেতে ও কালোতে সংগ্রাম বাধিবে। ইংলণ্ড যে ভাবে ভারতের সঙ্গে ব্যবহার করে তা'তে এই বিপদ আরও আসন্ন হ'য়ে উঠেছে।

ইংলণ্ড যদি ভারতের অধীনতাকে নিজের ঘরোয়া কথা বলে, তা হ'লে প্রত্যেক জাতিরই যে স্বাধীন হবার একটা অধিকার আছে তা' একেবারে অস্বীকার করতে হয় না কি ?

জগতের সকল জাতিই আজ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ। একটা জাতিকে আঘাত করলে আর সকলে তার ফল ভোগ করবেই। জগতে যদি একটা জাতিও পরাধীন থাকে তা হ'লে স্বাধীনতার ভাব পূর্ণভাবে বজায় রাখা অসম্ভব। সেই জন্য প্রত্যেক জাতিরই কর্ত্তব্য পরাধীন জাতিকে স্বাধীন হতে সাহায্য করা।

ভারতের অধীনতার জন্য কেবল ভারতকে ভুগতে হচ্ছে তা নয় ! অন্যান্য জাতিরও লোকসান কম নয়। অত বড় একটা জাতির সঙ্গে সমস্ত ব্যবসা ইংলণ্ড একেবারে একচেটে ক'রে রেখেছে। আমেরিকা ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় করতে পায় বটে, কিন্তু তা ইংল্যাণ্ডের সর্ত্তের বাঁধনের মধ্যে।

"আজ জগতে ডিমক্রেসির বিরুদ্ধে বা শাসিতদের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর পক্ষে যে সমস্ত শক্তি কাজ ক'চ্ছে তার মধ্যে প্রবলতম শক্তি হচ্ছে ভারতের অধীনতা।

তার কারণ হচ্ছে এই যে একটা মহান্ জাতির অপর এক জাতির স্বার্থে শাসিত ও শোষিত হবার এর চেয়ে বড় উদাহরণ জগতে আর নেই। লোকসংখ্যা ও বিস্তারে ভারত এত বড়, মানবজাতির ইতিহাসে এর স্থান এত উচ্চে, অতীতে এর ঐশ্বর্য্য সম্পদ এত প্রচুর ছিল, বিজেতা জাতিকে এই দেশ এত বেশী ধনসম্পদ দিয়েছে যে, দুই শতাব্দী ধরে বৈদেশিক জাতির দ্বারা এই জাতির শাসন, কেবল যে আধুনিক ইতিহাসে একটা প্রধান ঘটনা বলে স্থান পাবে তা' নয়, আধুনিক জগতে হীনতম রাজনৈতিক অপরাধ ব'লেও গণ্য হবে—কারণ, ভারতের অধীনতার চেয়ে জগতের আর কোন রাজনৈতিক অপরাধের প্রভাব এত প্রসারিত হয় নাই, আর কোন রাজনৈতিক অপরাধে এত বেশী লোক ভোগে নাই বা আর কোন রাজনৈতিক অপরাধ স্বাধীনতার বিস্তারকে এত বেশী বাধা দেয় নাই।"

ইংলাণ্ডের দৃষ্টান্তের কুফলও হয়েছে বড় কম নয়। "এশিয়াতে ইংরেজের একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন জগতের অন্যান্য জাতির মধ্যে হিংসা ও দ্বেষের এমন আগুন জ্বালিয়াছে যা আধুনিক জগতের আর কোন ঘটনা করতে পারে নি।"

"যদি স্বাধীনতার ভাব দেশে দেশে ছড়াতে হয়, তা হ'লে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে সমগ্র জগতে এমন একটি জনমত সৃষ্টি করা যা জগতের প্রাচীনতম এবং দ্বিতীয় বৃহৎ সভ্যজাতি বৈদেশিক তরবারির দ্বারা শাসিত হচ্ছে এই বীভৎস দৃশ্যকে নিন্দা করবে ও ধ্বংস করবে।" যাঁরা বলেন ভারতের অধীনতা ইংলাণ্ডের ঘরোয়া কথা তাঁদের ইতিহাস একটু ভাল ক'রে পড়া উচিত। জগতে যখনই কোন জাতি অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গতে চেষ্টা করেছে, তখনই কোন না কোন জাতির সহায়তা ও সহানুভূতি পেয়েছে। এ বিষয়ে ইংলাণ্ড ও আমেরিকার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। গ্রীস ও ইতালির স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংলাণ্ড সাহায্য করে নাই কি? দক্ষিণ আমেরিকার জাতিদের স্বাধীনতার যুদ্ধে, গ্রীসের ও হাঙ্গেরীর স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকা কি সাহায্য করে নাই?*

হার্কুলেনিয়াম খনন

হার্কুলেনিয়াম নামক ইটালীর যে সহরটি পরপর সাতবার অগ্ন্যুৎপাতে চাপা পড়িয়াছিল বর্ত্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাহাকে খনন করিয়া অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ বিসুবিয়াসের ভস্মরাশিতে আচ্ছাদিত থাকায় সহরটী প্রায় সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে এবং বৈজ্ঞানিকগণের মত এই যে, পম্পি অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর পুরাতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। অনেকে ইহা হইতে অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার আশা করিতেছেন। গত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর খননের ফলে যে সকল বস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহার-মধ্যে নিম্নলিখিত মূর্ত্তি ও চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য—হার্মিস মূর্ত্তি, মল্লমূর্ত্তি, ছয়টী নর্ত্তকীর মূর্ত্তি, সেনেকা প্রভৃতির আবক্ষমূর্ত্তি, চিরণের গৃহচিত্র, একিলিসের শিক্ষার চিত্র, মর্ম্মর প্রস্তরের চিত্র, মেট্রোডোরাস ও ফিলোডেমাসের লিখিত পুস্তকের কতকগুলি অংশ।

আশা করা যাইতেছে যে, ইহা হইতে সেকালের কতকগুলি লাইব্রেরী অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পাওয়া যাইবে। স্যার চার্লস ওয়াল্ডষ্টিনের মতে পুরাতন গ্রীক সাধনার অসংখ্য নিদর্শন ইহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে। যে সকল গ্রীক নাটকের খণ্ড খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যে সকল গ্রীক দর্শনের মাত্র কতকগুলি লাইন আমরা জানিতে পারিয়াছি, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি মনীষিগণের যে সকল রচনা আমরা আজও সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সমগ্র

---

* ২১শে মে (১৯২৭) তারিখের "ফরোয়ার্ডে" প্রকাশিত। ডাক্তার জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড কর্তৃক লিখিত "Is India England's Domestic Concern?" শীর্ষক প্রবন্ধের সারমর্ম।

রোমান সাহিত্য, বিভিন্ন রচনা, পুরাতন বংশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস—এ সমস্তই আমরা হারকুলেনিয়মের অন্ধকার গর্ভ হইতে পাইবার আশা করিতে পারি।—*Observer.*

দেড় লক্ষ টাকায় পাণ্ডুলিপি

বিখ্যাত কবি Allen Poeর Raven কবিতার পাণ্ডুলিপি দেড়লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার কোনো হস্তলেখা এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার Yamerlainie নামক লেখা ৭৫০০০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আমেরিকায় প্রাচীন পাণ্ডুলিপির দাম অত্যন্ত চড়িয়াছে বলিতে হইবে।

কবিতাটির এই একটিমাত্র পাণ্ডুলিপিই বর্ত্তমানে আছে। ইহা কবির স্বহস্ত-লিখিত এবং তাঁহার সহপাঠী ডাক্তার হুইটেকারের নামে অর্পিত। ইহা চমৎকার হস্তাক্ষরে ১৬টি শ্লোকে লেখা এবং শেষে কবির স্বাক্ষর।

কবিতাটির একটু ইতিহাস আছে। ইহার মূল পাণ্ডুলিপিখানির দাম প্রকাশকগণ ৩০৲ টাকা দিয়াছিলেন। কবি যখন কবিতাটি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন তাঁহার দারুণ দুর্দ্দশা। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর তখন অনাহারে দিন কাটিতেছিল।—*Sunday Times.*

ভিক্টর হিউগোর বাসবাটী—

Hanteville House নামক যে গৃহে ভিক্টর Hugo তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস Les Miserables এবং Les Travailleurs de La Mer রচনা করেন তাহা ১৮৭৮ অব্দে তিনি যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত ঠিক্ সেই ভাবেই রক্ষা করা হইয়াছে। এই গৃহ Guernsey নামক স্থানে অবস্থিত।

সম্প্রতি প্যারিস মিউনিসিপালিটী গৃহটীকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য ক্রয় করিয়াছেন এবং গত ১৩ই ও ১৪ই জুন ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে Guernseyতে প্যারিস হইতে অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম হইয়াছিল।—*Snnday Times.*

আর এখানে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের আবাসভূমি ?

অদ্ভুততম অনুবীক্ষণ—

মিঃ জে. ই. বার্ণার্ড বিলাতের রয়াল সোসাইটীতে যে অনুবীক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ। ইহা দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইতে পারে তাহার কতগুলি নিম্নে বিবৃত হইল—

ইহা দ্বারা ১ ইঞ্চির ২১০,০০০ ভাগের একভাগ ফটো লওয়া যাইবে।

Anthrax এর মত অতিক্ষুদ্র জীবাণুর আভ্যন্তরিক শারীরযন্ত্র সমূহ দেখা যাইবে। ইহা দ্বারা যে কোনো বস্তুকে ৩৫০০ গুণ বৃহত্তর দেখাইবে।

Anthrax প্রভৃতি জীবাণু বা কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণুর যে ফটো ইহা দ্বারা পাওয়া যায় তাহাতে ইহাদের শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশের গঠন পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয়।

বিশাল গৃহাদির অতি সামান্য কম্পনও ইহার চোখে ধরা পড়ে।

মিঃ বার্ণার্ড এক বৎসর পূর্ব্বে ক্যান্সার রোগের বীজাণু বিষয়ক এক নূতন আবিষ্কার করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ৩০ বৎসরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা অনুবীক্ষণের আরও উন্নতি হইবে এবং ক্ষুদ্রতম জীবাণু সমূহও মানুষের দৃষ্টিগোচর হইবে।—*Daily Chronicle.*

বৈদ্যুতিক জগতে যুগান্তর—

সাধনার জন্য জীবন পাত করার একটী নূতন দৃষ্টান্ত সাসেক্সের ডাক্তার রিড প্রদর্শন করিয়াছেন। কি করিয়া অল্পব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যায় ইহা লইয়া তিনি বহুকাল ধরিয়া কঠোর শ্রমসাধ্য গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন এবং ইহার জন্য দারিদ্র্যের নির্য্যাতন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সাধনার সাফল্যের দ্বারে আসিয়াই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক লো এই আবিষ্কারকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা নিশ্চিত কার্য্যকর হইবে। ইহা দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার খরচ বর্ত্তমান খরচ অপেক্ষা ২০গুণ সুলভে হইবে। প্রতি পেনিতে ১০ ইউনিট শক্তি পাওয়া যাইবে।—*Sunday Chronicle.*

আপন কথা

(এ-বাড়ি ও-বাড়ি)

তখনো কতক জিনিষ কতকগুলো শব্দ থেকেও নেই আমার কাছে। বাড়ির দক্ষিণের বাগান বলে একটা জায়গা আছে কিন্তু চোখের উপর নেই সেটা, তিনতলা বাড়ির কেবল দুচারটে ঘর ছাড়া বাকিগুলো নেই বল্লেই হয়, উত্তর দিকটা কিন্তু আছে -খড়খড়ি দিয়ে সেটা দেখতে পাই,—সেখানে অনেক লোক যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া কত কী চলে কিন্তু শুধু চক্ষুগোচরই হয়, রূপগুলো তার বেশি পরিচয় এগোতেই পারে না! কেবলি দূরে থেকে জগৎটাকে দেখে চলার অবস্থাটা কখন্ যে পেরিয়ে গেলেম তা মনে নেই। আমাদের বাড়ির পাশেই পুরোণো বাড়িতে প্রহরে প্রহরে একটা পেটা-ঘড়ি বাজতো বরাবরই এবং ঘড়ির শব্দটাও এ-তল্লাটের সবার কানে পৌঁছতো, কেবল আমারি কাছে তখন ঘড়ির শব্দ বলে একটা কিছু ছিল না। এমনি বাড়ির মানুষদের বেলাতেও,—এপারে আমি ওপারে তারা! অপরিচয়ের বেড়া কবে কেমন করে সরলো,—সেটা নিজেই সরালেম কি রামলাল চাকর এসে ভেঙে ফেলে দিলে সেটা, তা ঠিক করা মুস্কিল! রামলাল আসার পর থেকে অন্দরের ধরাবাঁধা থেকে ছাড়া পেলেম। বাড়ির দোতলা একতলা এবং আস্তে আস্তে ওবাড়িতেও গিয়ে ঘুরি ফিরি তখন, চোখকান হাতপা সমস্তই যখন আশপাশের পরিচয় করে নিচ্ছে, সে বয়েসটা ঠিক কতো হবে তা বলা শক্ত,—বয়েসের ধার তখন তো বড় একটা ধারিনে কাযেই কত বয়স হল

জানবারও তাড়া ছিল না। এই গগন অবস্থা তখন কতকগুলো শব্দ আর রূপ এক সঙ্গে—যেন দূরে থেকে এসে—আমার সঙ্গে পরিচয় করে নিতে চলেছে দেখি। জুতো খড়ম খালি-পা জনে জনে রকম রকম শব্দ দেয়, তাই ধরে প্রত্যেকের আসাযাওয়া ঠিক করে চলেছি, দাসী চাকর কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে, কাঠের সিঁড়িতে তাদের এক একজনের পা এক একরকম শব্দ দিয়ে চলেছে, এই শব্দগুলো অনেক সময়ে শাস্তি এড়ানোর পক্ষে খুব কাজে আসতো।—বাবামশায় লালরঙের চামড়ার খুব পাত্‌লা চটি ব্যবহার করতেন, তাঁর চলা এত ধীরে ধীরে ছিল যে অনেক সময়ে হঠাৎ সামনে পড়তেম তাঁর—একদিনের ঘটনা মনে পড়ে—সিঁড়ির পাশেই বাবামশায়ের শয়ন ঘর, আমি সঙ্গী কাউকে হঠাৎ চমকে দেবার মৎলবে দুপানা দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছি, এমন সময়ে দেওয়ালে ছায়া দেখে একটা হুঙ্কার দিয়ে যেমন বার হওয়া দেখি সামনেই বাবামশায়! এখনকার ছেলেদের হটাৎ বাবা দাদা কিম্বা আর কোনো গুরুজনের সামনে হটাৎ এসে পড়াটা দোষের নয় কিন্তু সেকালে সেটা একটা ভয়ঙ্কর বেদস্তুর বলে গণ্য হতো, সেবারে আমার কান আমাকে ঠকিয়ে বিষম মুস্কিলে ফেলেছিল। এমনি আর একটা শব্দ পাখীরা জাগার আগে থেকেই শোবার ঘরে এসে পৌঁছতো,—ভোর চারটে রাত্রে অন্ধকারে তখন চোখ দুটো কিছুই দেখছে না অথচ শব্দ দিয়ে দেখছি—সহিস ঘোড়ার গা মলতে সুরু করেছে, শব্দগুলোকে কথায় তর্জ্জমা করে চলতো মন অন্ধকারে—গাধুস্নে, গাধুস্নে, চট্‌পট্, হটাৎ, খাট্‌খোট্, চাব্‌কান্ পটাং পটাং, গাধুস্ পাধুস্, খাটিস্ খুটিস্ চট্‌পট্,—এই রকম সহিসে ঘোড়ায়, সহিসের হাতের ডলোতে ঘোড়ার খুরে মিলে কতকগুলো শব্দ দিয়ে ঘটনাকে পাচ্ছি। এমনি একটা গানের কথা আর সুর দিয়ে পেয়ে যেতেম সময়ে সময়ে একজন অন্ধ ভিখারীকে,—লোকটি চোখের আড়ালে কিন্তু গানটা ধরে আসতো সে নিকটে একেবারে তিনতলায় উঠে—ভিখারীর গানের একটা ছত্র মনে আছে এখনো—"উমা গো মা তুমি জগতের মা, ওমা কী জন্যে তুমি আমায় মা বলেচো"! সন্ধ্যাবেলায় খিড়কির দুয়োরে একটা মানুষ এসে হাঁক দেয়—'মুস্কিল আসান,'—কথাটার অর্থ উল্টো বুঝতেম—ভয়ে যেন হাত পা কুঁকড়ে যেতো, গা ছম্‌ছম্ করতো আর সেই সঙ্গে পাকা দাড়ি লম্বা টুপি আল্লাখোল্লা কাপড় পরা ভূতুড়ে একটা চেহারা এসে সাম্‌নে দাঁড়াতো দেখতেম! বেলা তিনটের সময় একটা শব্দ—সেটা সুরেতে মানুষেতে এক সঙ্গে মিলিয়ে আসতো,—'চুড়ি চাই খেলোনা চাই'—এবারে কিন্তু মানুষটার চেয়ে পরিষ্কার করে দেখতে পেতেম—রঙ্গীন কাচের ফুলদান, গোছাবাঁধা চুড়ি চিনে মাটির কুকুর বেড়াল। বরফওয়ালার হাঁক, ফুলমালীর হাঁক এমনি অনেকগুলো হাঁক ডাক এখন সহর ছেড়ে পালিয়েছে এবং তার জায়গায়—মটরের ভেঁপু ট্রাম গাড়ির হস্-হাস্ টেলিফোনের ঘণ্টা এসে গেছে সহরে! কোন বয়স থেকে দেখাশোনা আরম্ভ, কখনই বা শেষ সে হিসেব বেঁচে থাকতে বসে দেখার মুস্কিল আছে, তবে জনে জনে দেখাশোনায় প্রভেদ আছে বলতে

পারি। আমাদের পুরোনো বাড়িতে পেটা ঘড়িটা বাজ্‌ছে যখন শুনতে পেলেম তখন তার বাজনের হিসেবের মজাটা দেখতে পেলেম—সকালে উপরোউপরি ছটা সাতটা সাড়ে সাতটা বাজিয়ে ঘড়িটা থামতো তারপরে আটটা নটা দুঘণ্টা ফাঁক, ফের উপরোউপরি দশ আর সাড়ে দশ বাজিয়ে স্নান আহার করে যেন ঘুম দিলে ঘড়িটা দুপুর বেলায়, উঠলো বিকেলে, চার ও পাঁচ বাজিয়ে! ঘড়ির এই রকম খামখেয়ালি চলার অর্থ তখন বুঝতেম না, সকালের ঘড়ি—ঘুম ভাঙ্গাবার জন্তে, সাতটার ঘড়ি উপাসনার জন্তে, সাড়ে সাত হল মাষ্টার আসার পড়তে যাবার ঘড়ি, দশ—স্নানাহারের, সাড়ে দশ—ইস্কুল ও আফিসের, চার—বৈকালিক জলযোগের কাজকর্ম্ম ও কাছারী বন্ধের, পাঁচ হাওয়া খেতে যাবার! ঘুমোতে যাবার ঘণ্টা একটা,—দশটা কি নয়টায় বোধ হয় বাজতোনা, কেন না তখন ঠিক ন'টা রাত্রে কেল্লা থেকে তোপ দাগা হতো আর আমাদের বৈঠকখানায় ঈশ্বর-দাদা 'বোম্‌কালী' বলে এক হুঙ্কার দিতেন তাতেই পেটা ঘড়ির কাজ হয়ে যেতো, বেলা একটার তোপ্ পড়লেই করকর্ ঘরঘর্ ঘড়ির চাবি ঘোরার ধুম পড়তো বাড়িতে, ও-সময়টাতেও পেটা ঘড়ির দরকারই হতো না। এই ঘড়ির হুকুমে দেখি বাড়ির গাড়িঘোড়া চাকরবাকর ছেলেমেয়ে সবাই চলে, হাঁড়ি চড়ে হাঁড়ি নামে, মাষ্টারমশায় বই খোলেন বই বন্ধ করেন! ওবাড়ির এই পেটা ঘড়িটাকে এক একদিন দেখতে চলতেম,—পুরোনো বাড়ির উঠানের দাওয়ায় উঠতে একটা থিলেনের মাঝে ঝোলানো থাকতো ঘড়িটা, দেখতেম—শোভারাম জমাদার সেখানটাতে বসে ময়দা ঠাসছে, চকচকে একটা লোটা হাতের কাছেই রয়েছে, থেকে থেকে সেটা থেকে জল নিয়ে ময়দার লুটিগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছে আর দু'হাতের চাপড়ে এক এক খান মোটা রুটি ফস্‌কস্ গড়ে ফেলছে, বেশ কাজ চলছে এমন সময় শোভারাম হটাৎ রুটি গড়া রেখে ঘড়িটাকে মস্ত একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঘা কয়েক পিটুনি কসিয়ে কাজে বসে গেল! দেখে দেখে আমার ইচ্ছে হতো রুটি গড়তে লেগে যাই, আবার তখনি ঘড়িটা বাজিয়ে নেবার লোভ জন্মাতো, হাতুড়িটায় হাত দেওয়া মাত্র জমাদারজী ধমকে উঠতো—নেহি, কর্ত্তা মহারাজ খাপ্পা হোয়েঙ্গা—কর্ত্তা মহারাজ কে তিনি জানবার ভারি ইচ্ছে হতো তখন, কর্ত্তাদাদামশায় দোতলার বৈঠকখানায় থাকেন, তাঁর ঘরের দরজায় কিশুসিং হরকরা,—উর্দ্দী পোরে বুকে 'Works will Win' আর হাতীর পিঠে নিশেন চড়ানো তখমা ঝুলিয়ে, মোটা রূপোর সোঁটা হাতে টুলে ব'সে পাহারা দেয়, হাতে একটা পেনসিল কাটা ছুরী, কর্ত্তাকে সহজে দেখার উপায় নেই! দেখতেম কর্ত্তা পাহাড় থেকে ফিরে যে ক'দিন বাড়ীতে আছেন সে কয়দিন সব যেন চুপ্‌চাপ্, দরোয়ান,—হারুয়া হারুয়া বলে হাঁকডাক করতে সাহস পায় না, ফটকে গাড়িবারাণ্ডায় গাড়ি ঘোড়া ঢোকে বেরোয় সোয়ারি নিয়ে ধীরে ধীরে, বাবামশায় মা পিসি পিসেএবাড়ি ওবাড়ির সবাই যেন সর্ব্বদা তটস্থ। চাকর চাকরাণীদের চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি বন্ধ, সবাই ফিট্‌ফাট হয়ে ঘোরাফেরা করছে যেন ভাল-মানুষটির মতো।

এই সব দেখে শুনে কর্ত্তার নাম হ'লে কেমন যেন একটু ভয় ভয় করতো। কর্ত্তাদাদা-মশায়কে একবার কাছে গিয়ে দেখে নেবার লোভ, কর্ত্তার সামনা-সামনি হ'য়ে তাঁর ঘরখানা দেখারও কৌতূহল থেকে থেকে জাগতো মনে! কর্ত্তার ঘরে ঢুকতে সাহসে কুলোতো না। কিন্তু চুপি চুপি ঘরের দিকে অনেক সময়ে এগিয়ে যেতেম! দরোয়ান সব সময়ে পেটা ঘড়িকে পাহারা দিয়ে ব'সে থাকতো না, সিদ্ধি ঘোঁটার সময় ছিল তার একটা, সেই সময় একদিন একদিন ঘড়ির সঙ্গে ভাব করতেও এগিয়ে যেতেম, পাছে ধরা পড়ি সেই ভয়ে হাতুড়ি তোলার অবসর হতো না, দুই হাতে ঘড়িটাকে চাপড় কসিয়ে দিতেম—দড়িতে বাঁধা ঘড়ি লাটিমের মতো ঘুরতে থাকতো, যেন এক ঝাঁক ভীমরুলের মতো গুমরে উঠতো রেগে, ঘড়ির শব্দ আকস্মিক করাটা ভয় লাগাতো, কর্ত্তা বুঝি শুনলেন, দরোয়ান এল বুঝি বা! ঘড়ির কাছে থাকা নিরাপদ নয় জেনে এক ছুটে আমাদের তিন তলার ঘরে হাজির হতেম, তারপর সারাক্ষণ যেন দেখতেম—দরোয়ান কর্ত্তার কাছে আমার নামে নালিশ করছে, সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তা ডাকলে কি কি মিছে কথা বলতে হবে তার ফর্দ্দ একটাও তৈরি ক'রে চলতো মন তখন!

কর্ত্তা মশায় সব সময়ে বাড়িতে থাকেন না, —বোলপুরে যান, সিমলের পাহাড়ে যান—আবার হটাৎ একদিন কাউকে কিছু না ব'লে ফিরে আসেন, হটাৎ নামেন কর্ত্তা গাড়ি থেকে ভোরে, দরোয়ানগুলো ধড়মড় ক'রে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ে, এবাড়ি ওবাড়ি সাড়া পড়ে যায়—কর্ত্তা এসেছেন! এই সময়টাও দেখতেম—আমাদের বৈঠকখানায় দাদাদের গানের মজলিস খুব আস্তে চলেছে, কাছারী বসছে নিয়মিত দশটা চারটে, দক্ষিণের বাগানে বৈকালে বিশেশ্বর হুকোবর্দ্দার বড়বড় রূপোর আর কাঁচের সটকাগুলো বার করে দেয় না, বিলিয়ার্ড রুমে আমাদের কেদার দাদার হাঁকডাক একেবারে বন্ধ, যত সব গম্ভীর লোক তাঁরা পুরোণো বাড়িতে সকাল সন্ধ্যা আসা যাওয়া করেন—কেউ গাড়িতে কেউ বা হেঁটে, আমাদের উপর হুকুম আসে গোলমাল না হয় কর্ত্তা শুনতে পাবেন, চাকরগুলো কড়া নজর রাখে, খালি পা কি ময়লা কাপড়ে আছি কি না—পাঠান কুস্তিগীর কজন খুব কসে মাটি মেখে নিয়মিত কসরত করতে লেগে যায়, বুড়ো খানসামা গোবিন্দ সেও ভোরে ভোরে উঠে কর্ত্তার জন্য দুধ আনতে গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢোকে! এই গোবিন্দ ছিল,—কর্ত্তার চাকর,—এর একটা মজার কাহিনী মনে পড়ছে,—ভোরে উঠে গোবিন্দ কর্ত্তার জন্যে দুধ নিয়ে ফিরছে ঠিক সেই সময় পথ আগলে পাঠান সর্দ্দার দুটো কুস্তি লাগিয়েছে, গোবিন্দ যত বলে পথ ছাড়তে পাঠান তারা কানই দেয় না, পাঠান নড়েনা দেখে গোবিন্দ একটু চটে ওঠে অথচ গলার সুর খুব নরম করে বলে—"পাঠান ভাই রাস্তা ছাড়ো, শুনতা ও পাঠান ভাই, দেখ পাঠান ভাই; কাঁদের ওপোর ছাগোল নাপাতা হ্যায়, হাতে দুদের ঘট্টে হ্যায়, দুধটা পড়ে যাবেতো জবাবদিহি করবে কে?" কর্ত্তা বাড়ি এলে বাড়ি দুটো ঢিলে ঢালা ঝিমন্ত ভাব ছেড়ে বেশ যেন

সজাগ হয়ে উঠতো, আবার একদিন দেখতেম কর্তা কখন চলে গেছেন,—বাড়ির সেই আগেকার ভাবটা ফিরে এসেছে—দরোয়ান হাঁকাহাঁকি সুরু করেছে, আমাদের ছাঁরে মেথরে আর বুড়ো জমাদারে বিষম তকরার বেধেছে, জমাদার লাঠি নিয়ে যত ঝেঁকে ওঠে ছাঁরে মেথর ততই নরম হয়, জমাদারের দুই পা জড়িয়ে ধরবে এমনি ভাবটা দেখায়, তখন জমাদারজী রণে ভঙ্গ দিয়ে তফাতে সরেন, ছাঁরেও বুক ফুলিয়ে বাসায় গিয়ে ঢুকে তার বৌটাকে প্রহার আরম্ভ করে আরো চেঁচামেচি বেধে যায়, ওদিকে দাসীতে দাসীতে ঝগড়া—তাও সুরু হয় অন্দরে, বৈঠকখানাতে গানের এজলাস জাঁকিয়ে অক্ষয়বাবু গলা ছাড়েন, আমাদেরও হুটোপাটি আরম্ভ হ'য়ে যায়! কর্তা না থাকলে বাঁধা চালচোল্ এমনি আল্‌গা হয়ে পড়ে যে মনে হয় ঘড়িতে হাতুড়ি পিটিয়ে চল্লেও দরোয়ান কিছুই বলবে না! কর্তার গাড়ি—ফাটক পেরিয়ে যাওয়া মাত্র, ইস্কুল থেকে ছুটি পাওয়া গোছের হয়ে পড়তো বাড়ির এবং বাড়ির সকলের ভাবটা।

শীতকালে যেবারে কর্তাদাদামশায় বাড়ি থাকতেন সেবারে মাঘোৎসব খুব জাঁকিয়ে হতো, একটা উৎসবের কথা মনে আছে একটু—সেবারে সঙ্গীতের আয়োজন বিশেষভাবে করা হয়েছিল, হায়দ্রাবাদ থেকে মৌলাবক্স সেবারে জলতরঙ্গ বাজনা এবং গান করতে আমন্ত্রিত হন, সকাল থেকে বাড়িটা গাঁদা ফুল, দেবদারু পাতা, লাল বনাত, ঝাড়লণ্ঠন লোকজন গাড়িঘোড়াতে গিস্‌গিস্ করছে, আমাদের সবার মুখে এক কথা—মৌলাবাক্‌সোর বাজনা হবে,—সকাল থেকেই খানিক সিন্দুক খানিক বাক্সো মিলিয়ে একটা অদ্ভুত গোছের মানুষের চেহারা যেন চোখে দেখতে থাকলেম। এখনকার মতো তখন টিকিট হতোনা—নিমন্ত্রণ পত্র চলতো বোধ হয়, ছেলেদের পক্ষে উৎসব সভাতে হটাৎ যাওয়া হুকুম না পেলেও অসম্ভব ছিল অথচ মৌলাবাক্সোর গান না শুনলেও নয়, কাযেই হুকুমের জন্যে দরবার করতে ছোটা গেল সকালে উঠেই, আমাদের ছোটখাটো দরবার শোনাতে এবং শুনে তার একটা বিহিত করতে ছিলেন ওবাড়ির বড় পিসেমশায় কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সাফ্ জবাব পাওয়া মুস্কিল হল সেদিন—দেখবো দেখবো বলে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন, তারপর সারাদিন তাঁর আর উচ্চবাচ্য নেই, উৎসবে যাওয়া কি না যাওয়ার বিষয়ে যখন না যাওয়াই স্থির হয়ে গেছে নিজের মনে, তখন রামলাল চাকর এসে বল্লে—হুকুম হয়েছে, চট্‌পট্ কাপড় ছেড়ে নাও! এখনো টিকিটের দরবারে ছোকরাদের ওবাড়ির দরজায় যখন ঘুর ঘুর করতে দেখি তখন আমার সেই দিনটার কথাই মনে আসে! মৌলাবক্সকে একটা অদ্ভুতকর্মা গোছের কিছু ভেবেছিলাম—জলতরঙ্গ আর কালোয়াতী গানের ভালমন্দ বিচার-শক্তি ছিলই না তখন কিন্তু মৌলাবাক্সো দেখে হতাশ হয়েছিলেম মনে আছে, তার গান বাজনা লোকের ভিড় ঝাড়লণ্ঠন সবার উপরে তিনতলার ঘরে কর্তাদিদিমার দেওয়া গরম গরম লুচি ছোকা সন্দেশ, মেঠাই দানা ঢের ভালো লেগেছিল আমার মনে আছে। প্রায় পনেরো আনা শ্রোতাই তখন মাঘোৎসবের ভোজ আর পেলাও-মেঠাই খেতেই আসতো আমারি মতো,—মস্ত মস্ত মেঠাই

ছোটখাটো কামানের গোলার মতো নিঃশেষ হতো দেখতে দেখতে, পরদিনেও আবার কর্ত্তাদিদিমার লোক এসে এক থালা মেঠাই দিয়ে যেতো ছেলেদের খাবার জন্যে। কর্ত্তাদিদিমা আর বড়মা—শাশুড়ি আর বৌ—দুজনেই সমান চওড়া লাল পেড়ে সাড়ি পরে আছেন, বড়মার মাথায় প্রায় আধহাত ঘোমটা কিন্তু কর্ত্তাদিদিমার মাথা অনেকখানি খোলা, সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে দেখে ভারি নতুন ঠেকেছিল। এই মাঘোৎসবে ভোজের বিরাট রকম আয়োজন হতো তিনতলা থেকে একতলা, সকাল থেকে রাত একটা দুটো পর্য্যন্ত খাওয়ানো চলতো, লোকের পর লোক, চেনা অচেনা, আত্মপর যে আসছে খেতে বসে যাচ্ছে, আহারের পর বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে পান কটা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সরে পড়ছে—পাছে ধরা পড়ে অন্যের কাছে, এরা সবাই, মাঘোৎসবের ভোজ আর মেঠাই অনেকেই খেয়ে বাইরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেও চলেছে এও আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তখনকার লোকের মুখেও শুনতেম। মাঘোৎসবের লোকারণ্যের মাঝখানে কর্ত্তাকে পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া মুস্কিল ছিল আমার পক্ষে। অনেকদিন পরে একবার কর্ত্তাদাদামহাশয়কে সামনা সামনি দেখে ফেল্লেম,—সকাল বেলায় উত্তরের ফটকের রেলিংগুলোতে পা রেখে দুল্ দিচ্ছি এমন সময় হঠাৎ কর্ত্তার গাড়ি এসে দাঁড়ালো, লম্বা চাপ্‌কান জোব্বা পাগড়ি পরে কর্ত্তা নামচেন, দেখেই দৌড়ে গিয়ে প্রণাম করে ফেল্লেম, ভারি নরম একখানা হাতে মাথাটাকে আমার ছুঁয়েই কর্ত্তা উপরে উঠে গেলেন। বাড়িতে তখন খবর হয়ে গেছে—কর্ত্তামশায় চীন দেশ থেকে ফিরেছেন, আমি যে কর্ত্তাকে দেখে ফেলেছি প্রণামও করেছি সব আগেই সেটা মায়ের কানে গেল—ময়লা কাপড়ে কর্ত্তার সামনে গিয়ে অন্যায় করেছি বলে একটু ধমকও খেলেম আর তখনি রামলাল এসে আমাকে ধরে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে ছেড়ে দিলে। এই হঠাৎ দেখার কিছুক্ষণ পরে কর্ত্তার কাছ থেকে আমাদের সবার জন্যে একটা একটা চীনের বার্ণিস করা চমৎকার কৌটো এসে পড়লো তার সঙ্গে গোটাকতক বীরভূমের গালার খেলনা—আমার বাক্সটা ছিল রুইতনের আকার তার উপরে একটা উড়ন্ত পাখী আঁকা আর গালার খেলনাটা ছিল একটা মস্ত গোলাকার কচ্ছপ। এর পরেই মা আর আমার দুই পিসির জন্যে হাতীর দাঁতের নৌকো আর সাততলা চীনদেশের মন্দির কর্ত্তার কাছ থেকে বাবামশায় নিয়ে এলেন। চীনের সাততলা মন্দিরটার কি চমৎকার কারিগরিই ছিল, ছোট্ট ছোট্ট ঘণ্টা ঝুলছে, হাতির দাঁতের টবে হাতির দাঁতেরই গাছ, মানুষ সব দাঁতে তৈরি এক একতলায় গম্ভীরভাবে যেন ওঠানাবা করছে, সেই মন্দিরের একটা একটা তলা দেখে চলতে একটা একটা বেলা কেটে যেতো আমার, তার পর একটু বড় হয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেখতে লেগে গেলেম—সেদিনও মন্দিরের দুএকটা টুকরো ছিল বাক্সে! এর পরে কর্ত্তাকে দেখেছিলেম ছেলেবেলাতে আর একবার,—ওবাড়ি থেকে শোভাযাত্রা করে বর বার হল,—এখনকার মতো বরযাত্রা নয়,—বর চল্লো খড়খড়ি দেওয়া মস্ত পাল্কিতে, আগে ঢাক ঢোল, পিছনে কর্ত্তাকে

ঘিরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সঙ্গে অনেকগুলো হাতলণ্ঠন আর নতুন রং করা কাপড় পোরে চাকর দরোয়ান পাইক, সদর ফটক পর্য্যন্ত কর্ত্তা সঙ্গে গেলেন তার পর বরের পাল্কি চলে গেলে কর্ত্তা উপরে চলে গেলেন—গায়ে লাল জরার জামেওয়ার, পরণে গরদের ধুতি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিটেফোঁটা

(১)

পারিবারিক পয়জার

১

কি চমৎকার, এই সমাজের যুক্তপরিবার!
একের ঘাড়ে খায় বসে' সব কুঁড়ের অবতার!
যে জন করে উপার্জ্জন, একাই খেটে নরক্ সে জন,
তাহার তরে 'আহা' 'উহু' বল্‌বে কেবা আর!
সত্র তাহার, চল্‌ছে বাহার অতিথি-সৎকার!
একি চমৎকার

২

বাপের বড় ছেলে হওয়া একটা ভীষণ পাপ!
তাই নাবালক ভাইরা তাকে করছে না আর মাফ!
নিচ্ছে যে যার স্বার্থ বুঝে', অর্থ খাটায় বেকুব খুঁজে',
সুদ আসলে বাড়ছে টাকা, মারছে বসে লাফ!
নিত্য বৌয়ের গয়না গড়ায়, হায়, কি টাকার তাপ!
বড় হওয়াই পাপ!

৩

জ্যেষ্ঠ খেটে যাহার লাগি রক্ত করে জল,
যাহার হিতের তরে দিল সারা বুকের বল,
আশায় যাহার ছিল বসি', সে দিয়েছে মুখে মসী;
লায়েক হয়ে হোলো ভীষণ জান্ মারবার কল!
বাল্যাবধি মানুষ করার সাচ্চা প্রতিফল!
সাপের চেয়ে খল!

৪

বিধবা মা পোষা বড়-র, কারণ বড় সেধে;
টেক্কির পেখম তুলে' তা'রা চল্‌বে বসে সেজে!
ভগিনীরে দেশ বিদেশে, ছুট্‌বে বড় মন বেশে,
নাবালকের খরচ দিয়ে মর্‌বে জ্বালায় ভেজে!
মায়ের সিসির কাশীবাসের সেল্‌টা থাকুক বেজে
কারণ বড় সেধে!

৫

নাবালকের বৌরা কিন্তু বাপের বাড়ী গেলে,
বড়-ই আসায় দেবে খরচ খাওয়া-পরা ফেলে'!
তাদের পুত্র কন্যাগুলি, বড়-র বোঝা, কাঁধের ঝুলি,
অভাব পূরণ করবে সে-ই বত্রিশ দাঁত মেলে'!
কাটুক্ তাহার ছেলে মেয়ের জীবন অবহেলে!
বাঁচ্‌বে মরে গেলে।

৬

জননী জন স্বার্থপর! দেখি নাই তা কভু
তোমার কৃপায় সংসারে এই দেখতে পেলাম, প্রভু!
পুত্র তাহার থাকুক আরো, বলেন, "তোমরা কি আর পারো!"
মাতার কৃপায় কেবল তা'র বংশ বাড়ায় তবু!
জ্যেষ্ঠ উপার্জ্জনের মালিক, সুতরাং একটা 'গরু'!
বুঝেছি এখন, প্রভু!

৭

বড়-র বুকে লাগ্‌ছে আঘাত, লাগ্‌বে সকল রূপে!
জন্মেছে সে খাট্‌তে একাই দুঃখের অন্ধকূপে।
অনাহারে ক্ষুধায় মরে, কেউ কি ভাবে তাহার তরে?
তবু তাহার দুখ বাড়াবার ফন্দি আঁটে চুপে।
মরার পরেই বৌ তাড়িয়ে অংশ নেবে লুফে'!
হাস্‌ছে চুপে চুপে!

৮

এই তো দেশের ধ্বংসোন্মুখ যুক্ত পরিবার!
ভাবুক এবং যুক্তভোগী ভাবুক একটি বার!
ইহার বড়াই করার আগে, পরাণ যেন মরণ মাগে,
মৃত্যু পরে ধ্বংস যেন বাঁচি বারংবার
আদ্‌লেগুলার দুর্গতি হোক্ আসুক্ অন্ধকার।
চাইনা কিছু আর!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(২)

ভিখারী

আঃ ম'ল যা মুখে আগুন ! পড়বি নাকি গায় ?
খেয়েছিস্ কি চোখের মাথা ! চল্‌তে নারিস্—একটুখানি বাঁয় ?
হাঁটছে দেখ ! আহা মরি ! ধরেছে কি শ্রীচরণে বাত্ ?
এদিকে তো 'ঠুস্‌ছো' বেজায়, হচ্ছে সাবাড়—
দু'বেলাতে চার পো চেলের ভাত !
চল্‌তে নারেন মরণ দশা !
পাজি ! ছুঁচো ! গাধা ! ঠস্‌ ! !
'মূচ্ছো' যাবেন দেখ্‌ছি—ফুলের ঘায় !
হতভাগার পথ মেলে না,
চালাকির আর ঠাঁই পেলে না,—
হস্ত মেলি' ভিক্ষে আবার চায় !
কবি বলে,—"দোষ তোমারি, হায় ভিখারি ! হায় !
চল্‌বে নাকি ওঁরা কভু একটা দিনও 'মোটার' ছাড়া পায় ? "

চোখের কথা বোল্‌ছো বাবু ?
পেটের জ্বালায় জেগে, জেগে, খেয়েছি তা' ভেঙ্গে,
অনেক দিনের কথা কিনা 'হজম' হয়ে এল :
আছে যখন সে অমূল্য রতন তোমার 'ঠেঙ্গে',
দেখ্‌লে চেয়ে, দেখ্‌তে পেতে, দেখ্‌তে পেতে ঠিক্—
খেয়ে খেয়ে পা দু'খানি, ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেল।
কবি কহে—"হায় ! ভিখারি ! অন্ধ খোঁড়া, পথের কাঙ্গাল হায় !
জগৎ জোড়া অন্ধ, পোড়া চোখ আছে কার চায় ? "

বোল্‌ছো বাবু ভিখের কথা ?
হাত পাত্‌তে কত ব্যথা
বল্‌লে কি হায়—বুঝ্‌বে কত জ্বালা ?
বুঝবে কি হায় ?—
হয়েছি আজ কত জ্বালায় হাত পাতাতে পাকা ?
পেটের জ্বালায় সকল জ্বালা, পড়েছে আজ ঢাকা
হয়েছি তাই কালা !

কবি কহে,—"হায় কাঙালি! তোমার মতই দীন সকল-ই—
দ্বারে, দ্বারে, ভিক্ষে মেগে ফেরে;
এরা সবাই বিরাট কাঙাল!
মনের কাঙাল! মানের কাঙাল!
টাকা কড়ির সবাই কাঙাল যেরে!
তাই ভিখারী দেখ্‌লে এরা, খাঁৎকে উঠে করে তাড়া,
এক কণিকার অপচয়ও গণ্ডি দিয়ে ঘেরে।
ভিক্ষের গিরিশৃঙ্গে বসেও ভিক্ষে করে যাঁ'রা,
হায় ভিখারী তাই.
ভিখারীকে কেমন করে সইবে বল তারা?
সইতে নারে তাই;
সুদূর হ'লেও 'জাত শত্রুর' কাঙাল প্রতি হায়!
কেমন করে চায়?"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

দশচক্র

তৃতীয় ভাগ

(১)

তৃপতির সাহায্যে শশী বিলাতে যাইতেছে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সে কাকাবাবু ও খুড়িমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছে।

সে প্রথমেই তৃপতির সহিত দেখা করিয়া বলিল "আপনি আমার যে উপকার করলেন তা কখনও ভুলতে পারবো না।"

তৃপতি। বেশ ভুলো না।

শশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল "আমি অবশ্য ভুলতে চাচ্ছি না।"

তৃপতি। তবে 'ভুলতে পারবো না' বলে হতাশ হ'লে কেন?

শশী। ভুলতে পারবো না মানে আমি ভুলবো না।

তৃপতি। এ কথা জেনে আমার লাভ?

শশী আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।

এমন সময়ে নিশি এক খোকা কোলে করিয়া আসিয়া তাহাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিল।

শশী জিজ্ঞাসা করিল "এ ভদ্রলোকটিকে কোথায় পেলে ?"

নিশি। একে দেখনি তুমি ? এ যে গৌরীর ছেলে।

"তাই নাকি ? দেখি !" বলিয়া শশী উঠিয়া খোকার সহিত আলাপ করিতে গেল। তাহার গালে একটা টোকা মারিয়া বলিল "কি গো, খবর কি ?"

খোকা এক গাল হাসিল। তারপর দুই হাতে তাহার মাথাটা ধরিয়া উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করিল।

শশী বলিল "তুমি ত আচ্ছা জবরদস্ত দেখি।" সে নূতন ইস্ত্রী করা সুট পরিয়া আসিয়াছে। তাই দূরে দূরে থাকিয়া আলাপ সারিয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। নবাগতের মত সুকুমার এই শিশু তাহার বক্ষকঠিন Shirt-front-এর মায়া মানিতে চাহিল না। সে ধাঁ করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, যেখানে গৌরী প্রতিভার কাছে বসিয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিল "এ কোন্ পাহারাওয়ালা পাঠিয়েছ, গৌরীদি ? এ যে কিল চড়ে কাবু ক'রে তোমার কাছে ধ'রে নিয়ে এলো। আমি যে তোমার সঙ্গে কথা কইব না ঠিক ক'রেছিলুম।"

গৌরী হাসিয়া বলিল "এমনি দুষ্টু হয়েছে !"

শশী। দুষ্টু হয়েছে, তবে বসে দুষ্টুমী করুক। আমার ওপর এ শাসন কেন ?

গৌরী। হাঁ, ও আজকাল দেশসুদ্ধ লোককে শাসন ক'রে বেড়াচ্ছে।

শশী। এ ত যে সে শাসন নয়। একেবারে কুম্ভকর্ণের শাসন। কিল চড় মারবে। শেষকালে মুখে পুরে দেবে।

গৌরী খুব হাসিল।

শশী বলিল "আচ্ছা, এ কি অত্যাচার তোমাদের, খুড়িমা ? আমি আকাশে ওড়বার চেষ্টা করছি। আমার গলায় এখন এ একটা কি ঝুলিয়ে দিলে ?"

প্রতিভা। বেশ ত তুই ফেলে দে না।

শশী। এই নাও তোমার ছেলে।

খোকাকে গৌরীর কোলে দিয়া শশী বলিল "ওকে ফেলে দিলে কি হবে ? তোমরাই কি আমাদের কম ভারাক্রান্ত ক'রে রাখ ?"

প্রতিভা। সে কথা সত্যি।

নিশি শশীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সে বলিল, "হাঁ, খুড়িমা, সে কথা সত্য। আমাদের বোটে ballast-এর মত তোমরা আমাদের ভারাক্রান্ত ক'রে রাখ।"

(২)

রামময় দেখিলেন একে একে সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে। শশী ত সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছে অনেক দিন। এত দূরদেশে যাইবার পূর্ব্বেও একবার তাঁহার সহিত দেখা করিল না। নিশিও ক্রমে ক্রমে পর হইয়া যাইতেছে, সাধ্যমত কাছে আসিতে চাহে না। রামময় মনে মনে তাঁহার ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া বলিলেন "এই ভাল, এই ভাল! আমার প্রভু তোমার অনেক করুণা, দীননাথ। তাই আমার সকল বন্ধন এমনি করে ছিন্ন করছো। এমন না হ'লে তোমার শরণ চাইব কেন ? তোমাকে পাব কেন ?" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। মনে ভগবৎ প্রেমের উদয় হইতেছে ভাবিয়া একটু আত্মতৃপ্তিও হইল।

রামময় জানিতেন ধর্ম্মের পথে বিঘ্ন অনেক, দুঃখ অনেক। তাঁহাকে যাহা সহিতে হইয়াছে সে ত অতি সামান্য। ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী দুঃখ সহ্য করিয়াও প্রবলভাবে স্বধর্ম্ম পালন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। দেখিতে দেখিতে তাঁহার এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি blow pipe flame-এর মত একাগ্র হইয়া উঠিল, এবং পরিবারবর্গের সুখশান্তি গলাইয়া একাকার করিয়া দিল।

রামময়ের মনে ধর্ম্মভাব জাগরিত হওয়াতে জগত্তারিণী এক সময়ে বড় সুখী হইয়াছিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে ধর্ম্মচর্য্যায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকেও ছাড়াইয়া যাইবেন। আজ স্বামীর সহিত পাল্লা দিতে না পারিয়া তিনি নাকাল হইয়া পড়িতেছেন, এবং বার বার বিরক্তির সহিত বলিতেছেন "ওঁর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। মান্‌বেন না ত কিছু মানবেন না আর মানবেন ত একেবারে হরতুকীর দাগ মিলিয়ে নেবেন। হরতুকীতে দাগ থাক্‌লে ঠাকুরকে দেওয়া যায় না, এমন কথা ত কখনো শুনি নি বাপু।"

চারুশীলার দিকে এতদিন কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। আজ রামময় তাহার সংস্কারের জন্যও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইষ্টমন্ত্র না থাকাতে তাহার হাতের জল যে শুদ্ধ নহে, এবং বিপদে আপদে তাঁহাকেই হয়ত এই জল কোন সময়ে পান করিতে হইবে এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি একজন গুরু ডাকিয়া তাহাকে মন্ত্র দেওয়াইলেন। গুরু করণে নিশির ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু তাহার আপত্তি শুনিবে কে? চারুশীলা নিজেই তখন মন্ত্র লইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। নিশি ভাবিল চারুর সহিত তাহার কোথাও ত কোন যোগ নাই। এক্ষেত্রেও না হয় না রহিল। সে দিনের মধ্যে আঠার ঘণ্টা শুইয়া কাটায়। দুই ঘণ্টা না হয় বসিয়া বসিয়া হ্রীং ক্রিং আবৃত্তি করিল। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। চারুর মাথার খুলিটা এতদিন ছিল শূন্যগর্ভ, নিষ্ক্রিয় ও নিরাপদ। হ্রীং ক্রীংএর ইঁদুর ঢুকিয়া সেটাকে চঞ্চল ও ভয়াবহ করিয়া তুলিল। সে নিশিকে গামছা পরিয়া থাকিতে বলে, সে জুতা পরিয়া ঘরে ঢুকিলে গোলযোগ বাধায় এবং যখন তখন তাহার প্যাণ্ট সার্ট কাচিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখে। নিশির তিন বছরের শিশুকন্যা মিনুকেও আজকাল আচার মানিয়া চলিতে হয়, এবং প্রতি অনাচারের জন্য দণ্ড পাইতে হয়। শুধু তাহাই নহে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও চারু উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধন পূরাদমেই চালাইতে লাগিল। নিশি বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে ইহাতে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা! কিন্তু দেবকার্য্য করিয়া সন্তানের অমঙ্গল হইবে ইহা চারু বুঝিতে পারিল না, সে মনে করিল নিজে নাস্তিক বলিয়া নিশি অকারণ তাহার সহিত ঝগড়া করিতেছে এবং তাহার শিশুর ক্ষতি হইবে বলিয়া অভিশাপ দিতেছে।

নবজাত শিশু ও প্রসূতির প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞান যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছে নিশি তাহার একটিও পালন করিতে পারিলনা। সিঁড়ির তলায়, একটি অন্ধকার ময়লা ঘরে, ময়লা ছেঁড়া কাঁথা ও কাপড়ের উপর, অতি অশিক্ষিত, অনার্য্য ধাত্রীর সাহায্যে চারু খুব সাত্ত্বিক ভাবেই তাহার দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করিল। নিশির উপদেশ কেহ শুনিল না। তাহাকে কেহ আঁতুড় ঘরে ঢুকিতেই দিল না। সে তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি লইয়া নিজের ঘরে বসিয়া মাথা কুটিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল "অন্যায়! অন্যায়!"

বাংলাদেশে লোকক্ষয়ের আয়োজন যথেষ্টই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,—লোকক্ষয় ঠিক আয়োজনের অনুপাতে হয় না। বৃদ্ধ যমরাজ হয়ত সুযোগ বুঝিয়া সকল সময়ে ঠিক হাজির হইতে পারেন না। অনেকগুলা লোক বাঁচিয়া যায়। চারুও মরিল না। অনেক রক্তক্ষয় করিয়া,

অনেকদিন জ্বরে ভুগিয়া সে বাঁচিয়া উঠিল। কিন্তু শিশুকে বহন ও পোষণ করিবার শক্তি হারাইল। শিশুটি feeding bottle এর কল্যাণে সর্দ্দি, কাসি, জ্বর, তড়্কা, অজীর্ণ আমাশয়ের মধ্যে চেড়ী-পরিবৃতা জনকনন্দিনীর ন্যায় দিনে দিনে শুকাইতে লাগিল। এ সমস্তই অদৃষ্টের লিখন ভাবিয়া নিশি নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল এ সমস্তই সে নিবারণ করিতে পারিত। করে নাই শুধু স্বামী স্বামীর মন জোগাইবার জন্য।

সে দেখিল কতকগুলা অপোগণ্ডকে অপ্রতিহত বেগে সংসারে সে আনিবেই; তারপর এই অসহায় জীবগুলাকে হেলাফেলায় নষ্ট করিবে পিতামাতা, বা পাড়ার লোকের মুখ চাহিয়া। ইহাই কি তাহার কর্ত্তব্য? শুধু পিতা মাতা কেন? চারুও ত তাহার প্রতিকূল। সে যে জানালা খুলিয়া মুক্ত বায়ু ঘরে প্রবেশ করাইতে চায়, চারু সেইটাই বন্ধ করিয়া হিম নিবারণ করে, সে যেটাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, চারুর মতে তাহাতেই মেয়ের লিভার হয়, সে চায় সময়মত পর্য্যাপ্ত আহার দিতে, চারু সুবিধামত যথেচ্ছ আহার দিয়া থাকে। এত গেল দেহের কথা। মানুষের আবার মন বলিয়া এক বালাই আছে। এই মনের শিক্ষা চারু কিরূপ দিবে? সে ত সকড়ির প্রকার ভেদ বুঝাইয়াই ক্ষান্ত। কন্যার পক্ষে এই শিক্ষাই হয়ত পর্য্যাপ্ত! তাহার শ্বশুর কুল হয়ত ইহার অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করিবে না; বরং পাইলে অসন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু নিশি যে কন্যাকেও মানুষ মনে করে, এবং তাহাকে মানুষের মত শিক্ষা দিতে চায়। সে দেখিল চারুর মত মাতার শিক্ষা ও সংসর্গ হইতে দূরে সরাইতে না পারিলে মেয়েদের মানুষ করা যাইবে না। কিন্তু দূরে সরাইবে কোন্ সাহসে? মানুষ করা দূরে থাকুক, তাহাদের যে বাঁচাইতে পারিবে একথাও সে জোর করিয়া বলিতে পারে না। মাতার কোল হইতে ছিনাইয়া লইবার পর যদি তাহারা মারা যায় ত সে মুখ দেখাইবে কিরূপে? যদি বাঁচিয়াই থাকে, তাহা হইলেও যে তাহাদের মানুষ করিতে পারিবে ইহার নিশ্চয়তা কি? এমন কোন উপায় ত তাহার জানা নাই যাহাতে যে-কোন শিশুকে মনের মত করিয়া মানুষ করা যায়।

সন্তান তাহারও যেমন, চারুরও তেমন। সে চারুকে একেবারে বাদ দিয়া তাহাদের নিজের মত করিয়া গড়িতে চাহিতেছে কোন্ যুক্তির বলে? তাহার অবশ্য জ্ঞান বেশী, বুদ্ধি বেশী। মেয়েদের কিসে মঙ্গল সে বেশী বুঝে। তাহার বুদ্ধিতে চলিয়া মেয়েদের যদি মঙ্গল হয় তবে তাহাতে চারুরই কল্যাণ। কিন্তু চারু যদি নিজের কল্যাণ না বুঝে, তবে নিশির কি উচিত জোর করিয়া তাহার কল্যাণ সাধন করা? জোর করিয়া পরের ভাল করিতে গিয়াই ত পৃথিবীর অধিকাংশ অত্যাচারের সৃষ্টি হইয়াছে। Inquisitive হইয়াছিল পরের ভালার জন্য, কাফেরের মাথা কাটা হয় তাহার ভালর জন্য, এবং সংসারে রামময় যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন সেও অত্যন্ত হিতৈষণা-প্রণোদিত হইয়া। স্কুলের গুঁতায় কেহ তাহাকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইবে শুনিলে নিশির খুন চাপিয়া যায়। পাহারওয়ালাগিরী কি কেবল চারুর উপরেই বাঞ্ছনীয়? কিন্তু চারুকে যে কিছুতেই বোঝান যায় না। বোঝান যাইবে না ত। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুইটা যে ভিন্ন জাতীয় জীব, বাক্যকর্ম্মে, ক্রীড়াকৌতুকে, আশাআনন্দে, ধ্যানধারণায়, পরস্পরে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। নিশি যে দিন বিবাহ করিয়াছিল সেই দিনই ত সে জানিত যে তাহাদের ভবিষ্যৎ সন্তান লইয়া দুইজনে tug of war করিয়া মরিবে। সে বাড়ির উঠানে পুতিয়াছে আশশেওড়া গাছ। আজ বৃথার জোরে তাহাতে শিউলি ফুল ফুটাইবার চেষ্টা করিলে পারিবে কেন?

কিন্তু চারু শিক্ষিত না হইলেও মানুষ। তাহাকে যুক্তি দিয়া না হউক স্নেহ দিয়া হয়ত বশ করা যাইত। সে চেষ্টা কি নিশি করিয়াছে? কখনও কি তাহাকে স্নেহ করিয়াছে? মনে পড়িল না। অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অনিচ্ছার সহিত সে প্রথম দিন কতক তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তার পর তাহাকে কেরোসিন তৈলের বোতলের মত অগাধ উপেক্ষার আঁস্তাকুড়ের পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছে, এবং দরকার হইলে, গলা টিপিয়া কাজ আদায় করিয়া লইয়াছে। চারু Darwinism বুঝিল না, অমনি নিশির সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। সে যে মানুষ, তাহার যে মাথা ব্যথা করিতে পারে, সে অধিকাংশ সময় শুইয়া থাকে ইহার মূলে যে কোন শারীরিক গ্লানি থাকিতে পারে এ চিন্তাট তাহার মনে হয় নাই। একটি তের বৎসরের বালিকাকে তাহার স্নেহের নীড় হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের পাষাণপুরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। এক দিনের জন্যও ছাড়িয়া দেয় নাই। নিশিকে যদি এমন একঘেয়ে জীবন কাটাইতে হইত,—কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সহচর হইয়া তাহাকে এমনি বন্দী হইয়া থাকিতে হইত, তবে সে কত দিন এই মহাপুরুষের পবিত্র পদপঙ্কজের উপর ভক্তি অচলা রাখিতে পারিত? সে চারুর নিকট হইতে কিছু পায় নাই, সত্য। চারু তাহার কাছে কি পাইয়াছে? সে তাহাকে গৃহিণী করে নাই, সচিব করে নাই, সখী করে নাই। তাহার গর্ভে সন্তান হইয়াছে, অথচ তাহাকে মাতৃত্বের গৌরব দেয় নাই। আর একটি পরিবারের তাঁবেদারীতে তাহাকে কাচ্ছাবাচ্ছা লইয়া বাস করিতে হইতেছে। ইহা কি চারু কামনা করিয়াছিল? তাহার পিতার সংসারকে নিশি নিজে সহ্য করিতে পারে না। চারু করিবে কেন! অথচ এই সংসারে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বাস্তবিক, অতি উপেক্ষিতা ক্রীতদাসীর অপেক্ষা এক কপর্দ্দকও বেশী সম্মান চারু নিশির নিকট হইতে পায় নাই। এ কথা জানিতে পারিলে তাহার সন্তানগণও ত তাহাকে ক্ষমা করিবে না। তাহাদের চক্ষে এই অকর্ম্মণ্য মাতাই হয়ত একদিন সকলের চেয়ে বেশী আপনার হইবে, এবং ইহার প্রতি দুর্ব্যবহার লইয়া হয়ত তাহারা নিশির প্রতিই একদিন কটূক্তি করিবে।

সন্তানের মুখ চাহিয়া মাতাল মদ ছাড়িতে পারে। নিশিও তাহার ঔদাসীন্য পরিহার করিল। এবং পিতার সংসার হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিল। ইহাতে তাহার খরচ অনেক বাড়িয়া গেল।

শশীকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাইয়া এবং বাড়ীর সমস্ত অভাব দূর করিয়া তাহার আয়ের যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে সে ঠিক কুলাইতে পারিত না। পাচকের অভাবে চারুকেই রন্ধনাদি করিতে হইত। নিশি ভাবিয়াছিল পরিশ্রম করিতে হইলেই চারু বাঁকিয়া বসিবে। কিন্তু পরম আশ্চর্য্যের বিষয় যে লোকটি শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে চাহিত না সে আজ হাসিমুখে দাসীর মত খাটিতেছে এবং কাজ খুঁজিয়া বাহির করিতেছে! নিজের ঘরের দারিদ্র্য ছাড়িয়া সে ত একদিনের জন্যও শ্বশুর বাড়ীর স্বর্ণপিঞ্জরে ফিরিতে চাহিল না। আরও আশ্চর্য্য চারু আজকাল নিশির দু-একটী কথা শুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিশি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে চারুর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। এবং আরও বেশী কাজ পাইবার আশায় আরও বেশী করিয়া চারুর মন জোগাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চারুর মত লোকের মনস্তুষ্টি করিতে হয় "ছন্দানুরোধেন"। নিশি তাহাই করিল। সে পৈতা পরিল, মুরগী ছাড়িল, গয়লার সহিত তকরার করিল, এবং কলিকাতার বাজারে খুব রঙচঙে বড়িশ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। সে যদি গৌরীর সহিত দেখা করিত ত সে কথাটা গোপন রাখিত, আর যদি প্রতিভার কাছে সময় কাটাইত ত বাড়ীতে আসিয়া মিথ্যা কথা বলিত।

নিশি দেখিল পাড়ার যাদব, মাধব, গোপাল নেপাল হইতে তাহার আর কোন প্রভেদ নাই। সেও পাঁচজনের মত খায় দায়, ঘুমায়, এবং সৌরজগৎ গলাইয়া গৃহিণীর নথ গড়াইতে চায়।

(৩)

আদর্শ শিক্ষক বলিয়া শ্যামাচরণের খ্যাতি ছিল। শিক্ষা দিবার সময় তিনি ছাত্রদিগের মনের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, কানের দিকে নয়। তিনি চাহিতেন ছাত্রেরা লাভালাভের দিকে না তাকাইয়া জ্ঞানার্জ্জন করুক, নির্ম্মমভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হউক, এবং অনুপহত হইয়া সত্যকে গ্রহণ করুক। কাজেই স্কুলের ঘণ্টা বা text book-এর মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকিতে পারিতেন না। অধ্যাপনার অবকাশে তিনি বন্ধুভাবে তাহাদের সহিত মিশিতেন, তাহাদের সুখদুঃখের সঙ্গী হইতেন, এবং নানা প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তাহাদের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। স্কুলের ছুটীর পর সকল ক্লাসের ছাত্র আসিয়া শ্যামাচরণকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত, এবং সহজে ছাড়িতে চাহিত না।

ছাত্রমহলে শ্যামের এতটা প্রতিপত্তি অন্য শিক্ষকগণের অন্তর্দাহের কারণ হইল। ইঁহারা নানা কৌশলে শ্যামকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছাত্রদের মধ্যে একটা দল সৃষ্টি করিলেন, ইহাদিগকে বুঝাইলেন যে শ্যাম ইহাদের ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, এবং ইহাদের দিয়া এই মর্ম্মে দু-একটা দরখাস্তও লিখাইলেন। দরখাস্তে নাম স্বাক্ষর করিতে ছাত্রদের হাত কাঁপিতে লাগিল, কারণ তাহারা শুনিয়াছে এই দরখাস্তের ফলে "বাছাধনের চাকরীর মাথাটী খাওয়া হইবে।" কিন্তু ধর্ম্মের জন্য কোমলহৃদয় ব্যক্তি পোষা পাঁটাটাকে যেমন করিয়া জগন্মাতার সমীপে বলির জন্য উপস্থাপিত করে, তেমনি করিয়া তাহারা কোনরূপে কর্ত্তব্য সারিয়া লইয়া চোখের জল মুছিল। এ দরখাস্তে কোন ফল হইল না। কারণ কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন শিক্ষক হিসাবে শ্যামের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তথাপি তাঁহারা শ্যামকে শাসাইয়া গেলেন তিনি যেন ছাত্রদের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা না করেন। শ্যামও শাসাইলেন ছাত্রেরা যদি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চায় তবে যেন তাহারা তাঁহার নিকট না আসে। দেখা গেল ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চায় না এমন ছাত্রের সংখ্যাই বেশী।

শ্যাম যখন নাস্তিক-মতে একটা পতিতাকে বিবাহ করিলেন, তখন ভারি সুবিধা হইল। আর ছাত্রদের সাহায্য লইতে হইল না। শিক্ষকগণ নিজেরাই এখন শ্যামের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলেন। এবার কর্ত্তৃপক্ষগণও বুঝিলেন এরূপ দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকের সংসর্গ কোমলমতি বালকদিগের পক্ষে হিতকর নহে। তাঁহারা শ্যামকে বিদায় দিলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্যামের প্রতি অন্য শিক্ষকগণের এ জিঘাংসা কেন? তাঁহারা কি ইচ্ছা করিতেন ছাত্রেরা তাঁহাদের চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াক। না। ছাত্রদিগকে তাঁহারা গোমাংসের ন্যায় অস্পৃশ্য মনে করিতেন। এই অস্পৃশ্য পদার্থটা আর কাহারও প্রীতি উৎপাদন করিবে ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না, এইমাত্র।

কেবল স্কুল হইতে নহে, সমাজ হইতেও শ্যামের চাকুরী গেল। তাঁহার জীবনের একটা প্রধান কাজ ছিল রোগীর সেবা করা। অনাহূত, রবাহূত হইয়া তিনি অনেক বাড়ীতে গিয়াছেন, এবং অনেকদিন ধরিয়া অনেক রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। গৌরীকে বিবাহ করিবার পর

কিছুদিন আর কেহ তাঁহাকে ডাকিল না। তবে ঐ কিছুদিন মাত্র। হাজার হোক, গৃহী লোক, পরকালের জন্য ইহকালকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে না। কুইনিনের মত শ্যাম যে সমাজে ঘোর অনর্থ ঘটাইতেছেন এ বিষয়ে বক্তৃতার অভাব ছিল না। কিন্তু বিপদে আপদে লোকে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে লাগিল,—কেহ বা গোপনে, কেহ বা প্রকাশ্যে।

শ্যাম আর একটী চাকুরী জোগাড় করিলেন বটে। কিন্তু চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা চলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন কেশের দৈর্ঘ্য বা সূত্র বিশেষের গ্রন্থির সাহায্যে যে দেশে শিক্ষক নির্ব্বাচিত হয় সে দেশে তাঁহার চাকুরী যাইবে বহুবার। অল্প দিনের মধ্যে হয়ত তাঁহার ভবের চাকুরীই ছুটিয়া যাইবে। তখন গৌরীর গতি কি হইবে? তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন গৌরীকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার জন্য। তাড়াতাড়ি তাহাকে শিক্ষিত করিয়া School-mistress করা যাইবে না। ঝুড়ি বুনিয়াও তাহার সংসার চলিবে না। শ্যাম স্থির করিলেন তিনি গৌরীকে Nursing শিখাইলেন। তিনি নিজে যাহা জানিতেন, শিখাইলেন, নিশিকে দিয়া কিছু কিছু শিখাইলেন; যেখানে রোগচর্য্যা করিতে যাইতেন গৌরীকে সঙ্গে লইতে লাগিলেন; এবং শেষে তাহাকে একাই ছাড়িয়া দিলেন।

নিশি বলিল "আপনি ওঁকে একা ছেড়ে দেন!"

শ্যাম। কেন বল দিকি! তোমার ভয় হচ্ছে এতে ওঁর দেহের পবিত্রতা রক্ষা না হতে পারে?

নিশি। হাঁ।

শ্যাম। দেহের পবিত্রতা রক্ষা করা ত ওঁর কাজ নয়।

নিশি অবাক্ হইয়া গেল।

শ্যাম বলিলেন "নারীর পবিত্রতা রক্ষা করা পুরুষের কাজ। হয় সে সভ্য হ'য়ে তার সম্মান রক্ষা করবে, নয় সে সবল হ'য়ে তাকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে। নারীর কাজ শুধু নিজেকে পবিত্র রাখবার চেষ্টা করা।

নিশি। তা'ত বটে।

শ্যাম। গৌরী চেষ্টা করবেন না মনে হচ্ছে?

নিশি। না, তা কেন বলবো?

শ্যাম। তিনি চেষ্টা করবেন, এর চেয়ে বেশী কিছু ত আমার জানবার দরকার নেই। চেষ্টা করে নিষ্ফল হ'লে আমার কাছে তাঁর দর কমবে না।

নিশি। কিন্তু—

শ্যাম। আর তাঁর যদি পবিত্র থাকবার চেষ্টা বা ইচ্ছা না থাকে, তবে বেঁধে রাখলেই কি তিনি সাধু হবেন? তা যদি হয়, ত সকলের চেয়ে বেশী সাধু আছে জেলখানায়।

নিশি। আমি তা বলচি না। আমি বলচি, আমাদের দেশ ত' এখনও তেমন সভ্য হয় নি। নারীর সম্মান রাখতে শেখেনি এখনও লোকে।

শ্যাম। তা যদি হয় ত' সেই লোকগুলোকে দণ্ড দাও, ঘরে বন্ধ রেখে। আমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতে চাও কেন? "রাবণস্ত চ দৌরাত্ম্যাৎ"। সীতাকে ত্যাগ করা আমি বুঝতে পারি না।

নিশি। কিন্তু পুরুষদের ত' আমরা বন্ধ করতে পারচি না।

শ্যাম। তাই মেয়েদের বন্ধ করে রাখ্‌তে চাও? কোন্ অধিকারে? তোমরা তাদের মালিক ব'লে?

নিশি। না,—ঠিক—

শ্যাম। ওদের মাটী খুঁড়ে পুতে ফেললে হয় না? তা হলে আর সতীত্ব লোপের সম্ভাবনাই থাকে না।

নিশি। আমি কি এতই বাড়াবাড়ি করচি?

শ্যাম। ও! পুতে ফেললে মরে যেতে পারে। এটা তুমি পছন্দ করনা। দেহকে নষ্ট করতেই তোমার আপত্তি, মনকে নস্ট করতে নয়! মানুষের মনটা দেহের চেয়ে দামী না?

নিশি। মনকে নষ্ট করতে চাই, আপনি কোথা থেকে পেলেন?

শ্যাম। তুমি যে শিক্ষা দিতে বারণ করচো!

নিশি। করি নি ত।

শ্যাম। কর নি? আমাকে nurse করেই কি তিনি nursing শিখ্‌তে পারবেন?

নিশি। Nursing-এর কথা আলাদা।

শ্যাম। Nursing থেকেই ত কথাটা উঠ্‌লো। যাক্—তা হ'লে এমন কতকগুলো শিক্ষা তোমার জানা আছে যার জন্যে বাইরে যেতে হয় না। কি বল দিকি সেগুলো? রাঁধা? বাসন মাজা? ঘর সাজান? ছেলে দেখা? গৃহিণীপনা করা? এ কাজগুলো কিন্তু পুরুষেরা ইচ্ছা করলে মেয়েদের চেয়ে ভাল পারে,—তারা বাইরে থাকে ব'লে।

নিশি। তাঁর ওপর কোন অত্যাচার হ'লে আপনার কষ্ট হবে না?

শ্যাম। কষ্ট হবে বৈ কি। বাজার করতে গিয়ে গাড়ী চাপা পড়লেও ত কষ্ট হয়। তা ব'লে বাজারে যাওয়া বন্ধ করি না ত। দেখ, 'সতীত্ব' জিনিসটা দরকারী, খুবই দরকারী। এমন কি দাঁত পরিষ্কার রাখার মত দরকারী। কিন্তু ওটার ওপর আমরা বড় বেশী দাম দিচ্ছি। আমরা মনে করচি শুধু দাঁত পরিষ্কার রেখেই মানুষ বড় হবে। তা হয় না কিন্তু। তাকে কাজ করতে হবে। কাজ দেখিয়ে তাকে বড় হতে হবে। আজ যদি আমাদের ঘরে এমন কোন 'লক্ষহীরা' জন্মায় যে তার রূপ বিক্রী করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারে, তবে সে মেয়ে অমর হবেই। তোমার ঘোমটাপরা সতীরা বিস্মৃতির মহাপঙ্কে মিলিয়ে যাবার ঢের পরেও সে বেঁচে থাকবে, এবং পূজা পাবে।

নিশি। তা সত্যি।

শ্যাম। খুবই সত্য।—তবে তোমাকে একটা সান্ত্বনা দিই, গৌরার কোন ভয় নেই। আমার বুকের ছাতি এখনও ৪৪ ইঞ্চি।

(৪)

নিমজ্জমানকে জল হইতে টানিয়া তুলিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। বরং তখন হইতেই কর্ত্তব্যের আরম্ভ হয়। Artificial respiration দেওয়া, সেঁক দেওয়া, কম্বল আনা, ডাক্তার ডাকা এমনি দুই শত কাজের মধ্যে পড়িয়া যাইতে হয়। গৌরাকে বিবাহ করিয়া শ্যামাচরণের সেইরূপ অনেক গুলা কাজ বাড়িয়া গেল, এখন হইতে গৌরা শুধু সমাজের পরিত্যক্তা নয়, প্রপীড়িতা। তাহাকে বুক দিয়া রক্ষা করিতে হইবে, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে হইবে। শ্যামাচরণ তাহার উদ্যোগ করিয়াছেন। তারপর গৌরার গর্ভে যে সন্তান হইল বা হইবে তাহাদের যাহাতে

পরের গলগ্রহ না হইতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ কিছু মূলধন রাখিয়া যাইতে হইবে; এবং তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষার পথে কিন্তু বিঘ্ন অনেক। সাধারণ স্কুলে পড়িলে তাহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। কৃশ্চান বা মুসলমান স্কুলে ভর্ত্তি করিলে চলিতে পারে। কিন্তু সেখানে বাইবেল বা কোরাণ পড়ান হইবে। এইটা শ্যামাচরণ পছন্দ করিতেন না। যে প্রতীকার করিতে পারে না, প্রতিবাদ করিতে পারে না, এমন একটা অসহায় শিশুর মনকে এমনি করিয়া একটা বর্ব্বরযুগের সভ্যতার ছাঁচে চিরদিনের মত বিকৃত করিয়া গড়াকে তিনি অতি হীন কাজ মনে করিতেন। তিনি স্থির করিলেন ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তিনি তাহাদের নিজেই শিক্ষা দিতেন।

দুঃখের বিষয় শ্যামাচরণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। স্ত্রীপুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ করেন নাই। তাহাদের অতি অসহায় অবস্থায় সমাজের শরশয্যায় নিক্ষেপ করিয়া একদিন আষাঢ়ের নবঘনপরিম্লান নিশীথে, নিজের চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি লইয়া, কোন অপরিচিত চির-তমিস্রার দেশে পলায়ন করিলেন, কেহ সন্ধান পাইল না। জীবনের খাতায় তিনি কর্ত্তব্যের যে একটা লম্বা list তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহার গোড়ার দিকে একটা কাল দাঁড়ি টানিয়া কৃতান্ত তাড়াতাড়ি হিসাব শেষ করিয়া ফেলিলেন। দাঁড়ির পরের item-গুলা নিরর্থক জঞ্জালের মত পড়িয়া রহিল।

ধনুষ্টঙ্কার রোগে শ্যামাচরণের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একটী ছাত্র উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়, এবং শ্যামাচরণ তাঁহার শুশ্রূষা করেন। ইহাতেই রোগের উৎপত্তি, এইরূপ চিকিৎসকগণের ধারণা। যোগেন্দ্র প্রভৃতি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা শ্যামের প্রচণ্ড নাস্তিকতাকে এই উৎকট রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রামময় যখন শ্যামকে দেখিতে আসিলেন, তাঁহার মনে হইল যোগেন্দ্র প্রভৃতি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। শ্যাম চিরকাল ঈশ্বরকে লইয়া বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন। আজ তাই তাঁহার মুখে একটা ঘৃণা ও বিরক্তি মিশ্রিত বিদ্রূপের ভঙ্গী দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ধর্ম্ম ও সমাজের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া বুক ফুলাইয়া বাহির হইয়াছিলেন, আজও কথায় কথায় বুক চিতাইয়া শয্যা ছাড়িয়া যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং শ্রমাধিক্যে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

রামময় সভয়বিস্ময়ে দেখিলেন সর্ব্বশক্তিমান আজ চানামুল্লুকের নৃশংস নিপুণতার সহিত শ্যামের প্রতিকর্ম্মের প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছেন, কড়ায় গণ্ডায়। তিনি বলিলেন "আর ওষুধ বিষুধে কি হবে? হরিনাম কর। হরিনাম কর। ভগবান্ প্রসন্ন না হ'লে শ্যামকে কেউ বাঁচাতে পার্‌বে না।" কিন্তু হরিনাম শুনিবার অধিকার শ্যামের নাই। শব্দমাত্রেই তাঁহার spasm বাড়িয়া যায়।

পাতকীর ভবপারের খেয়ার কড়ি, অন্তিমকালের হরিনাম, তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। রামের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে শ্যামের প্রতি ভগবান্ আদৌ প্রসন্ন নহেন।

শ্যাম জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অনেকের সেবা করিয়াছেন; নিজে কিন্তু কাহারও সেবা লইলেন না। নিতান্ত অনাথের মত ইহলোক ত্যাগ করিলেন। নিশির ডাক্তারী ও গৌরীর nursing এই চরম মুহূর্ত্তে কোন কাজে লাগিল না। তাহারা পাষাণ-পুত্তলির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পার্শ্বে বসিয়া রহিল, তাহার যন্ত্রণার এক কণাও কমাইতে পারিল না। কমাইবার চেষ্টা

করিলে যন্ত্রণা আরও বাড়িয়া যায়। তাহাকে স্পর্শ করিলে spasm বাড়ে, পাখা করিলে spasm বাড়ে, মুখে জল দিলে spasm বাড়ে, কথা কহিলে spasm বাড়ে। ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ বলিলেন বিধাতার Penal code-এ ইহাও একটা দণ্ড!

ধার্ম্মিকের মনকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত ন্যায়ের জন্য highest penalty-র ব্যবস্থা হইল কেন? তবে সে উত্তর করিত "হইবে না? এখানে ফরিয়াদী নিজেই যে দণ্ডদাতা। ন্যায়ের সমস্ত অপরাধ যে বিচারকেরই বিরুদ্ধে। তিনি যে libel করিয়াছেন, ঈশ্বরকে অসত্য, অশিব অসুন্দর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ত তিনি সেরূপ ন'ন। তিনি যে সত্যং শিবং সুন্দরম্!"

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

রামধনু—কবিতার বই। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ২০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। পুস্তকের নাম রামধনু বলিয়া বোধ হয় নানা রঙের কালীতে ছাপা। মূল্য ১৲ মাত্র।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের নাম বঙ্গসাহিত্যে অবিদিত নহে। রবীন্দ্রশিষ্য কবিগণের মধ্যে ইনি বেশ একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

যতীন্দ্রপ্রসাদের রচনায় ৩।৪টী বেশ বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা উহার নিরপেক্ষনেত্রে স্পষ্টই ধরা পড়ে

১ম। যতীন্দ্রপ্রসাদ আপনার ঢঙের ইঙ্গিতময় একশ্রেণীর Epigrammatic কবিতা লেখা প্রচলন করিয়াছেন। বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ৪টী কি ৬টী পংক্তিতে ইনি প্রচুর ভাবসম্পদ অল্প পরিসরের মধ্যে সঞ্চয়ন করিয়া দেন।

২য়। ইঁহার হাসির গান ও কবিতাগুলি একটু নূতন ঢঙের। সেগুলির রস একটু তরল বটে—কিন্তু কম উপাদেয় নয়। ইনি বেশ প্যারডিও লিখিতে পারেন।

৩য়। আর একশ্রেণীর দীর্ঘ কবিতা ইনি লেখেন—তাহাতেও রস খুব ঘন নয় বটে কিন্তু প্রবাহ অবাধ, সাবলীল, উচ্ছল, উদ্দাম ও ফেনিল। এগুলিতে তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠা, উদ্দীপকতা যথেষ্ট।

৪র্থ। যতীন্দ্রপ্রসাদের প্রকৃত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছন্দোবৈচিত্র্য। বঙ্গসাহিত্যের ছন্দোবৈচিত্র্যের কারু-কৌশলে ইনি কবিবর সত্যেন্দ্রনাথের পরেই,—এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ধারা ইনিই বজায় রাখিতেছেন।

পুস্তকখানিতে ফেনিলোচ্ছল দীর্ঘ কবিতাই অধিক। এ শ্রেণীর কবিতার দোষগুণ সবই এগুলিতে বর্ত্তমান। বইখানিকে কবি তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন—১ম উদ্গীতি। এপর্য্যায়ের রচনাগুলি প্রধানতঃ দেশের জীবিত ও মৃত মনীষিগণের উদ্দেশে অর্ঘ্য-নিবেদন। এ পর্য্যায়ে 'লেনিন' ও 'গোবিন্দদাস'—সুন্দর রচনা। অন্যগুলি মন্দ নহে।

২য়। উত্তাপ—এ পর্য্যায়ে করুণ-রসাত্মক কবিতার সংখ্যাই বেশী। অনিন্দ্য ছন্দোবন্ধে—স্বচ্ছ তরল তরঙ্গে ঝরঝরে ভাষায় বাঙালীজীবনের বেদনার কথা,—ভাল না লাগবার কারণ ত বেশি না। সাহিত্যের সূক্ষ্ম-দণ্ড বিচারে এসকল কবিতা উচ্চস্তরে স্থান পাইবে না,—জানি। কিন্তু দেশের সাধারণ পাঠক এই শ্রেণীর কবিতাই চান। এগুলিতে যে অসংযম ও উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয় তাহা এক হিসাবে দোষ—আর এক হিসাবে গুণ। চোখের জলে রস একটু লবণাক্ত।

৩। উচ্ছ্বাস। পারিবারিক সুখদুঃখ উল্লাস ও শোকের কথাই এ পর্য্যায়ে বেশী। এ পর্য্যায়ে 'পুত্রের প্রতি' কবিতাটি রীতিমত অশ্রুময়ী মর্ম্মবাণী। 'ভারতীর আরতি' এমনি একটি ভাবাবেগে লেখা রচনা। এই পুস্তকেও ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব নাই। বহু দুর্দ্দান্ত দুঃশাসন ছন্দকে কবি পোষাপাখীর মত বশীভূত করিয়াছেন। তাহার পরিচয়ের [illegible]।

পুস্তকে ছোটখাটো খুঁটিনাটি ত্রুটির অবশ্য অভাব নাই—সেগুলি দেখাইবার প্রয়োজন দেখি না—কবি নিজেই দু বছর পরে সেগুলি ধরিতে পারিবেন। যাঁহার অবশ্যপ্রাপ্য যোগ্য সমাদরের বিন্দুমাত্র আমরা দিই নাই—সুযোগ পাইয়া তাঁহার দোষানুসন্ধানে অংশ বর্ত্তিকাকে হারাইতে যাই কোন লজ্জায়?

দেবী-মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা—শ্রীবিভূপদ চক্রবর্ত্তী। পৃঃ ৬০ মূল্য ।০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সুপ্রসিদ্ধ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ নহে, অথচ ইহা পাঠ করিলে উক্ত গ্রন্থের একরকম মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। 'অনুক্রমণিকায়" বেশ অল্প কথায় চণ্ডীপাঠের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয় "দেবীর আবির্ভাব," প্রসঙ্গক্রমে মধুকৈটভ বধ," "মহিষাসুর বধ" "শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ," প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে "দেবীর স্বরূপ" বর্ণনা এবং পরিশিষ্টে আছে "দেবীর স্তুতি।" অবশেষে ঋগ্বেদের অন্তর্গত "দেবীসূক্ত" সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল। বাজারে অনেক রকম "চণ্ডী" চলিতেছে তবুও এখানি চলিবে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া।

কাশীধাম—(২য় সংস্করণ)—শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যকলাবিদ্যার্ণব কর্তৃক প্রণীত ও শ্রীশ্যামলাল কাব্যশিল্প বিশারদ দ্বারা বহুবাজার ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হইতে প্রকাশিত,—৩৬৮ পৃষ্ঠা,—ছাপা, কাগজ ও বাঁধা উত্তম, রুচিসঙ্গত,—৩৬ খানি চিত্রশোভিত,—মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ,—আবাঁধা ১৸০ সাতসিকা ও বাঁধা দুই টাকা মাত্র।

পুস্তকখানি পুণ্যতীর্থ বারাণসীর ইতিবৃত্ত,—সত্য বলিতে গেলে ইতিবৃত্ত বলিলে যাহা বুঝি পুস্তকখানি তার চেয়েও বেশী। ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কাশী, কাশীর বিভিন্ন স্থান, তথাকার দেবদেবী ও মন্দিরাদির ইতিহাস-মূলক ও প্রত্নতত্ত্বমূলক বিবরণ সবিশেষ বর্ণনাকারে পুরাণাদি, ইংরাজি ঐতিহাসিকগণের পুস্তক, গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টাদি ও কিম্বদন্তী প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, অধিকন্তু কাশীযাত্রী পুণ্যার্থিগণের কি করিয়া কাশী যাইতে হয়, কাশীতে কোথায় কি আছে, কোথায় কিরূপে থাকা যায়, কিরূপ ব্যয় পড়ে, কোথায় কি দ্রষ্টব্য আছে, কিরূপে তাহা দেখা যায়, কোন্ সময়ে কোন্ মন্দিরে কি উৎসব হয়, কোথায় কোন্ দেবতার কোন্ মন্দির প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য সমস্ত বিবরণই প্রদত্ত হইয়াছে। এক কথায় ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাত্রীর "গাইড্ বুক"। কাশীর মানচিত্র ও চিত্রাদির সমাবেশে বইখানির উপযোগিতা বহুল বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিয়তি—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সেন মজুমদার প্রণীত, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ কর্তৃক প্রকাশিত,—১১৪৬ পৃষ্ঠা,—দুই খণ্ডে সমাপ্ত,—মূল্য চারি টাকা।

এখানি সুবৃহৎ উপন্যাস। প্রথম যখন পড়িতে আরম্ভ করি, তখন বিশেষ ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিলাম,—ইহা গতানুগতিকভাবে লিখিত নহে,—ইহাতে উদ্দেশ্য আছে, সাহসিকতা আছে, আখ্যান বস্তুর নূতনত্ব আছে, এবং ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লেখকের পাণ্ডিত্য, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালী ছাত্রগণের "মোহের পুতুলদের" বিরুদ্ধে ইহা মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ। সুরেশ গ্রন্থকারের আদর্শ চরিত্র, নবীন তাহার সহায়ক, মাসীমা তাহার শক্তি, জোবেদা তাহার সাধনা ও ভবানীপ্রসাদ সিদ্ধিদাতা। আমাদের আশঙ্কা আছে রুচিবাগীশগণের ইহা ভাল লাগিবে না। তথাপি আমরা বলিব, ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না।

ফুলের পাখা—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে এস্, এম্ চৌধুরী এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত,—৮০ পৃষ্ঠা,—মূল্য আট আনা মাত্র।

ইহাতে ছেলেদের জন্য লিখিত চারিটী গল্প ও একটি ছোট্ট গাথা আছে। গল্পগুলি নিঃসন্দেহ ছেলেদের আনন্দবর্দ্ধক।

আশমানতারা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা চারি আনা। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

তিনশো সাতাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই বৃহৎ উপন্যাসখানি প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে রাজা গণেশের নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও মালিন্যের ভাব কাটিয়া গিয়া সমস্ত দেশব্যাপী যাহাতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে একটা সাম্যের ভাব জাগিয়া উঠে তাহার জন্য রাজা গণেশের চেষ্টা চিরস্মরণীয়। তৎপুত্র যদুনারায়ণও পিতার অবর্ত্তমানে পিতৃপদাঙ্ক যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া লেখক তাঁহার সুন্দর লিখন ভঙ্গীর দ্বারা ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও চরিত্র-চিত্রণে পুস্তকখানিকে মনোরম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অত্যুৎপাত দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া হিন্দু ও মুসলমান দুইটি জাতিকে যেরূপভাবে বিপন্নপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। এই সমস্যা পূরণের জন্যই গ্রন্থকার সত্য ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তকের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের চেষ্টা সফল হইয়াছে। নবাব-নন্দিনী আশমানে তাহার চরিত্রটি বেশ সুসঙ্গত ও সাম্যের সহায়ক। পিতা সাহাজাদা আজিমকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা পূরণের জন্য যে সময় বলিল "মনে কর বাবা, তোমার দুটী মেয়ে, একটি আমি, আর একটি তুমি উদ্যান মরু-প্রান্তর থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছ। এখন এই যে তোমার দুটী—এর কোনটাকে তুমি বেশী ভালবাসবে—আমাকে না তাকে?" পিতা উত্তর দিলেন যে আশমানকে তিনি বেশী ভালবাসবেন। কন্যা রাগ করিয়া বলিল,—"আমি যে তোমার কাছে যেমন দাবি কর্ত্তে পারি, আর সে যে মেয়ের ভিখারী হয়েও সে দাবি করে,—সে জোর করে আদায় করে নিতে পারে, আর সে চায়,—সে না পেলে ব্যথা পেয়ে ফিরে যায়। মানুষের প্রাণে ব্যথা দেওয়ার অধিকার ত মানুষের নেই।"

গ্রন্থারম্ভেই এই যে মিলনের সূচনা গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত আশমানের চরিত্রে এ ভাব আমরা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান দেখিতে পাই। যদুনারায়ণ স্বদেশভক্ত, প্রতিভাবান্ সাম্যের পরিপোষক। তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জাতি-বিরোধের সমাধান, হিন্দু-মুসলমানের এক-প্রাণতা সাধন, হিন্দু মুসলমানের মিলন। বিমলা দেবীর চরিত্রটি তেজোমণ্ডিত—আদর্শ হিন্দু রমণীর সর্ব্বগুণে অভিব্যক্ত। একদিকে মাতৃস্নেহে ভরপুর অপর দিকে কর্ত্তব্যে অটল অচলা চিত্রটি খুব চমৎকার। পরিশেষে এইটুকু বলিতে চাহি যে পুস্তকখানির সমস্ত বাহুল্য অংশ বাদ দিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকার করিলে ভাল হইত।

সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায় অনূদিত। ২১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট খ্রীষ্টতত্ত্বপ্রচার সমিতি হইতে রেভাঃ ফাদার ডি. ই. ডি. ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞানকে অনেকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহার কারণ লেখক ভূমিকাতেই উল্লেখ করিয়াছেন "সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞান ইহুদীদের অপ্রামাণিক ধর্ম্ম সাহিত্যের অন্তর্গত।" কিন্তু মতামতের কূটতর্ক দূরে রাখিলে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞানের মূলভাবগুলি একান্ত গভীর, মনোহর ও আলোচনার যোগ্য। তত্ত্বজ্ঞানে বিদেশীয় চিন্তার প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও ইহার কয়েকটী পৃষ্ঠার মধ্যেই ইহুদীধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও অপরিসীম বীর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই পুস্তক আলোচনা করিতে বসিয়া সর্ব্বপ্রথমে চোখে পড়ে ইহার সুন্দর সুললিত ভাষা। ভাষার দিকে একটা অর্থহীন গোঁড়ামীর অনুসরণ করিতে গিয়া বঙ্গীয় খ্রীষ্টান সমাজ তাঁহাদের অনূদিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের নিকট অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তকখানিতে তাহার ব্যতিক্রম সাধন করিয়া লেখক যথেষ্ট সৎসাহস ও সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাষার ওজস্বিতা, মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণে সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞান বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ পুস্তকাবলীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

লেখক এই পুস্তক প্রণয়নে যে সমধিক পরিশ্রম, সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়াছেন তাহা পুস্তকের [illegible] ভূমিকা হইতেই বুঝা যায়। পুস্তকখানি বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট যোগ্য সমাদর লাভ করিয়া লেখকের শ্রম সার্থক করিয়া তুলিবে আশা করি। বইখানির ছাপা, বাঁধাই, কাগজ চমৎকার।

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বাঙ্গালার শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গত ১৮ই আষাঢ়, রবিবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় ৬৩ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমানে তিনিই বোধ হয় একমাত্র অনন্যকর্ম্মা নাট্যকার এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম ভরসাস্থল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যের ও নাট্য-শালার যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ১২৭১ বঙ্গাব্দে খড়দহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে বারাকপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি পরিশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ও পরে জেনেরাল এসেম্ব্রিজ ইনষ্টিটিউসনে কেমেষ্ট্রির প্রফেসার নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন ও পরে প্রফেসারি পরিত্যাগ করিয়া নাটক রচনায় সম্পূর্ণ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায় চল্লিশখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার অধিকাংশ নাটকই কোন না কোন নাট্যশালায় সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার "আলমগীর" ও "নর-নারায়ণ" অল্পদিন পূর্ব্বেও প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার কোন কোন নাটক নাটক-রচনায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। তাঁহার রচিত "আলিবাবা" অভিনয়কালে নাট্যামোদিগণের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি প্রতি রাত্রিতে বহুদিন পর্য্যন্ত বহু দর্শকই স্থানাভাবে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আলিবাবা সেই সময়ে এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে তাহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন নাট্যশালায় গীতিনাট্যই অভিনীত হইতে থাকে। তাঁহার "প্রতাপাদিত্য" আর এক খানি যুগান্তরকারী নাটক। এই প্রতাপাদিত্য হইতেই রঙ্গমঞ্চে জাতীয়তা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক নাটকের প্রচলন আরম্ভ হয়। এক্ষণে অনেক নাটকই একক্রমে ১৫০।২০০ রাত্রি অভিনীত হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু প্রতাপাদিত্য নাটকই প্রথম একাদিক্রমে প্রায় ৬০ রজনী অভিনীত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে কোন নাটকই বোধ হয় এত অধিক সম্মান লাভ করিতে পারে নাই। ইহার পরে প্রতাপাদিত্য অভিনয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে স্থানে স্থানে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের পরে ইহা আবার অভিনীত হইতেছে। প্রতাপাদিত্য ব্যতীত তাঁহার "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" "রাজা নন্দকুমার", "দাদা ও দিদি" প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠাপন্ন নাটকগুলিরও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাট্যশালা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ কিছুদিন পর্য্যন্ত থিওসফিক্যাল সোসাইটির সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে উক্ত সোসাইটির মুখপত্র "অলৌকিক রহস্য" কিছুদিন প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় নাট্যশালার ও নাট্যসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা ভবিষ্যতে কতদিনে পূর্ণ হইবে কে জানে!

শ্রাবণে

জাতি ও জাগরণ—উন্নতিবিধানের বা দেশ-সংস্কারের অবলম্বনীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষিতদের দলে দলে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সকলের কাছে স্বীকৃত যে পৃথিবীর সকল উন্নতিশীল দেশের সকল জাতির মত আমাদিগকে দায়িত্ববোধে কর্ম্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। দায় ঘাড়ে না পড়িলে দায়িত্ববোধ জন্মে না, কাজে না লাগিলে কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ হয় না, ইহাও সকলেই জানি। সম্মুখে কি লক্ষ্য রাখিয়া ও কিরূপ কাজে ভিড়িয়া সকলকে চলিতে হইবে সে বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে; যেদিকে মতভেদ নাই বা থাকিতে পারে না সেদিকে দৃষ্টি না দিলে কোলাহলে ও আত্মদ্রোহে আমাদের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে কাজে দেশের প্রত্যেক নর-নারীর জীবন বিকাশের ও মনুষ্যত্ব লাভের পথ অবাধ হয়, যে শিক্ষায় এ চেতনা জন্মে যে কোন ব্যক্তিই অন্য কোন দেশের বা জাতির বা সম্প্রদায়ের কোন লোক অপেক্ষা মানুষের হিসাবে ছোট নয়, যেরূপ কার্য্যে ও আচরণে বুঝিতে পারে যে সারা ভারতবর্ষ তাহার দেশ ও দেশের উন্নতি বিধানের প্রত্যেক কাজে তাহার দায়িত্ব আছে ও করিবার জন্য অনেক আছে, সেই কাজ, সেই শিক্ষা ও সেই আচরণ যে প্রবর্ত্তিত হওয়া চাই তাহাতে মতভেদ থাকিতে পারে না। দেশের কোন্ দিকের সংস্কার আগে করিতে হইবে, কোন্ দিকের চেতনা আগে ফুটাইতে হইবে, এ সকল কথার তর্ক তুলিয়া হিতৈষীদের বা কর্ম্মীদের দলে বিদ্রোহের বিবাদ বাধে কেন? যে-দিকের কাজ করিবার জন্য যাহার একাগ্রতা জন্মিয়াছে, সে যদি সেই দিকের কাজ করে, তাহাতে ক্ষতি হইতে পারে না; সকলে একজোটে এক পদ্ধতিতে ও একমতে কিছুতেই কাজ করিতে পারে না। যে সকল কাজ জাতীয় জাগরণের সহায় তাহার একটি করিতে হইবে আগে আর অপরটি করিতে হইবে পরে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মে নিজের নিজের দলের প্রতি গোঁড়ামির অনুরাগে। একথাও সত্য যে সকল দিকের সকল কাজ একটি দলের লোকে করিতে পারে না, সকল শ্রেণীর কাজই যে লক্ষ্য-সাধনের জন্য প্রয়োজন, এ বিষয়ের স্পষ্ট ধারণার অভাবেই প্রত্যেক দলের লোকেরাই একটা মামুলি উপমার জোরে অপরের কাজকে দূষিয়া বলেন যে অপরের কাজ ঠিক যেন গাড়ির পিছনে ঘোড়া যোতার মত হইতেছে। কথাটা খুব জাঁকাল, যে আগে চাই স্বাধীনতা, তাহার পর অন্য কিছু; কিন্তু এই স্বাধীনতার শরীর "অন্য কিছু" দিয়া গড়া কি-না, তাহা সকল সময়ে বিচারিত য় না।

এখানে এমন একটা কাজের দৃষ্টান্ত দিব যাহা সারা দেশের লোকের পক্ষে করিবার সুযোগ আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, আর যাহা জাতীয় জাগরণের বিরোধী নয়, বরং অনুকূল। কংগ্রেসের ষ্টির পূর্ব্বে ও আমাদের বড় বড় দাবির আন্দোলন উঠিবার পূর্ব্বে ছোটলাট ইডেন্ স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়া ১৮৮২-৮৩ অব্দে বড়লাট রিপন্ যে সকল

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডগুলিতে ও মিউনিসিপেলিটিগুলিতে বেসরকারি লোকেদের নির্ব্বাচিত সভ্য হইয়া দেশের কাজ করিবার দিকে প্রথম ব্যবস্থা হইয়াছিল। তখনকার সে ব্যবস্থা আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও যথার্থ দাবির অনুরূপ হয় নাই বটে, তবে আমরা তখন উন্নততর ব্যবস্থার জন্য কোন পদ্ধতির কাঠাম গড়িয়া আমাদের দাবি উপস্থিত করি নাই; গবর্ণমেণ্ট যাহা দিয়াছিলেন, তাহা প্রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দিয়াছিলেন। সেদিনকার সে সকল ব্যবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ও অনেক সংখ্যায় লোকেল্ বোর্ড ও গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ড সৃষ্ট হইয়াছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের অনেক কাজ আছে, আর সেই সকল খানিকটা পরিমাণে বেসরকারি লোকের পক্ষে করিবার সুবিধা আছে। কাজ যত ছোট হইলেও বা সীমাবদ্ধ হইলেও উহা না করিলে কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে পরিচয় হয় না, কাজ পরিচালন করিবার শক্তি জন্মে না,—লোকে করিৎ-কর্ম্মা (practical) হইতে পারে না। হাতে বড় কাজ না পাইলে আমরা কাজই করিব না, এরূপ জিদ ধরিলে একদিকে দেশের লোকের পক্ষে কাজের শিক্ষা হয় না আর অন্যদিকে সরকারের ইঙ্গিতে চালিত অসার লোকেদের আধিপত্য বাড়িয়া যায়। প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছোট বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু যাহা আইনমতে প্রতিষ্ঠিত তাহার শাসনে আমাদের ভাগ্য নিয়মিত হইবার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি না।

এই বঙ্গদেশে জেলায় জেলায় যত গ্রাম্য ইউনিয়ন্ বোর্ড হইয়াছে তাহার সংখ্যা প্রায় তেইশ শত। এখন ঐ ইউনিয়ন্ বোর্ড পরিচালনের যে নিয়ম আছে তাহাতে গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য বিধান করিবার, শিক্ষাবিস্তার করিবার ও অনেক ছোটখাট বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইবার কাজ বোর্ডের সভ্যদের অধিকারে আছে। বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে এক-তৃতীয় সরকারি মনোনয়নে হয় ও বাকি দুই-তৃতীয় দেশের লোকের নির্ব্বাচনে হয়; ২৩০০ ইউনিয়ন বোর্ডে একুশ হাজার সভ্য আছে ও উহার মধ্যে চৌদ্দ হাজার সভ্য বেসরকারি লোক। দেশের পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে স্ত্রীলোক বাদ যায় অর্দ্ধেক, আর বাকি অর্দ্ধেকের এক-চতুর্থ লোক বয়ঃপ্রাপ্ত—যাহারা বোর্ডে সভ্য হইবার উপযোগী। অর্থাৎ এখনকার একুশ হাজার সভ্য পঞ্চাশ লক্ষের প্রতিনিধি। আমরা চেষ্টা করিলে ইউনিয়ন বোর্ডের, বোর্ডের সভ্যদের ও নির্ব্বাচিত সভ্যদের সংখ্যা বাড়াইতে পারি, কিন্তু সেদিকে আদপে আমাদের দৃষ্টি নাই। কর্ত্তব্যের যে ছোট-বড় নাই,—আমাদের জীবনের এক-একটা বড় আঁটি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণের সমষ্টি, সে-কথা ভুলিয়াই বুঝি আমাদের "নীচু নজর" একেবারেই নাই। গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত ও অতি অল্প শিক্ষিত লোকেরাই ইউনিয়ন্ বোর্ডের সভ্য; তাহাদিগকে সুবুদ্ধি দিয়া দেশের কাজ শিখাইবার জন্য আমাদের টনক নড়ে না,—আমাদের আসন টলে না। আমরা নামজাদা বড় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য ঐ সকল লোকের ভোট আদায় করিয়া থাকি, কিন্তু যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে লোকেরা কাজের মর্ম্ম বুঝিয়া, দেশের দরদ অনুভব করিয়া, সকল ভড়ং ভুলিয়া উপযুক্ত লোককে ভোট দিতে পারে তাহার কোন উদ্যোগ

করি না অথবা তাহা করা ছোট কাজ মনে করি। নিদান পক্ষে একুশ হাজার গ্রামবাসীদের মধ্যে চৌদ্দ হাজার যে সরকারি লোককে আমরা অনায়াসে দায়িত্ব বোধ দিয়া জাগাইতে পারি, কিন্তু তাহা করি না। এখন ইউনিয়ন্ বোর্ডের নিয়মে আছে যে, বোর্ডগুলিতে নির্ব্বাচিত সভ্যেরা আপনাদের সভা-পরিচালক সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু কাজের বেলায় তাহা সভ্যদের মনের বলের অভাব ও শিক্ষার অভাবে ঘটিতেছে না। নিজের হাতে নিজেদের জীবন-মরণ সম্পর্কের কাজ করিবার এমন সুবিধা আমরা যদি এই আবদারে পায়ে ঠেলি যে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত এ অধিকার অতি অল্প, তবে আমাদের দায়িত্ব বোধ জন্মাইবার ও করিৎ-কর্ম্মা হইবার সুযোগ ও সুবিধা ধ্বংস করিতে হয়। আমাদের স্বরাজ্য-সাধনারূপ গাছের শিকড় এইখানে কি-না একবার ভাবিয়া দেখিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা—একালের অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা না হইলে আমরা কিছুতেই কোনদিকে উন্নতিলাভ করিতে পারিব না। সেকালের সে অবস্থা নাই যে সম্রাট আকবরের মত সমাজের উচ্চতম স্থানের ব্যক্তিও নিরক্ষর থাকিয়া কেবল পণ্ডিতদের সহবাসে আসিয়া জ্ঞানী হইতে পারেন; লেখাপড়া না শিখিয়া কেবল স্বাভাবিক বুদ্ধির চতুরতায় সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবে, সে দিনও আর নাই। সকল চাষা ও শিল্পীকেই স্বদেশের ও বিদেশের বাণিজ্যের অনেক কথা জানিতে হইবে, কি শিক্ষার অভাবে তাহারা ধনীদের চক্র না বুঝিতে পারিয়া ঠকিয়া যাইতেছে ও হটিয়া যাইতেছে, তাহা খানিকটা লেখাপড়া না শিখিলে কিছুতেই জানা যায় না। আমরা উন্নতির কল্পে যাহা করিতে যাই তাহা বিফল হইয়া যায় জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবে। আমরা এসকল কথা জানিয়া-শুনিয়াও মনে করিতেছি যে আপাতক এগুলি উপেক্ষা করিয়াই আমরা একটি প্রার্থিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব।

অন্যদিকে আবার জাতিগড়নের উদ্যোগে যখন প্রাইমারি শিক্ষার কথা পড়ে, তখন অনেক হিতৈষী এলাহি হুকুম দিয়া থাকেন যে বিনা পয়সায় পল্লীর সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা যাহাতে প্রাইমারি শিক্ষা পায়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিতে হইবে। সেই কাজটির হিসাবে যে কত ধানে কত চাল মেলে তাহার খবর না রাখিয়াই এই দরাজ উদার-নীতি প্রচার করা হয়। এখন প্রাইমারি স্কুল কত আছে কত লোকে সেখানে পড়ে আর তাহাতে কত খরচ হয়, তাহা বুঝিয়া না নিলে পল্লীতে পল্লীতে বিনা পয়সায় শিক্ষা বিস্তারের দাবি করা চলে না। এখন এই ৫ কোটি অধিবাসীদের দেশে প্রাইমারি স্কুল বা পাঠশালা বা চউপাড়ি আছে ৫০,৯২৩; এই পাঠশালাগুলিতে যত ছেলেমেয়ে পড়ে তাহাদের সংখ্যা ১৬,৫০,৫৫৫। এই পাঠশালাগুলির ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা খরচ করেন তাহাতে প্রতি পাঠশালার জন্য খরচ হয় বার্ষিক ১২২৲ টাকা। পাঠশালার শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা মাসিক যে বেতন পান, তাহা একজন ইংরেজের ঘরের খিদ্‌মৎগারের মাসিক মাইনার এক-তৃতীয়াংশ বলিয়া

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর প্রকাশ করিয়াছেন। যে টাকায় নীচশ্রেণীর মজুরের খরচ চলে না সে টাকায় যে ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না তাহা বলিতে হইবে না; যে শিক্ষক পাওয়া যায় তাহারাও পেটের ভাতের জন্য যথালাভ খুঁজিয়া পাঠশালার কাজে অমনোযোগী হয়। এই পাঁচ কোটি অধিবাসীর দেশে যদি দেশের উন্নতির কামনায় প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা বাড়াইতে হয় তবে নিদানপক্ষে এখনকার পাঠশালার চারগুণ অধিক পাঠশালা না বসাইলে যে চলে না তাহাও ডিরেক্টর বাহাদুরের মন্তব্যে পাওয়া যায়। ডিরেক্টর একথাও বলিয়াছেন, যদি উপযুক্ত সংখ্যায় পাঠশালা বাড়াইতে হয় ও শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হয় তবে যাহা ব্যয় হইবে সে টাকা লক্ষের কোঠায় রাখিলে চলিবে না,—উহা কোটির কোঠায় পড়িবে। ডিরেক্টর বলিয়াছেন যে এত টাকা দিবার ক্ষমতা রাজসরকারের নাই; ক্ষমতা আছে কি-না তাহার বিচার করিতে হইলে আয়-ব্যয়ের যেরূপ হিসাব নিতে হয় তাহাও এ পর্য্যন্ত আমাদের মিনিষ্টরেরা অথবা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা নেন নাই। রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য নানা বিভাগ আছে; সে সকল বিভাগের কত টাকা কি পরিমাণে কমাইলে সে সকল বিভাগের কার্য্যকারিতায় বাধা না ঘটাইয়া প্রাইমারি শিক্ষার জন্য কত টাকা পাওয়া যায় তাহার হিসাব হওয়া উচিত অতিশয় কর্ম্মদক্ষ বিজ্ঞের হাতে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য অতিরিক্ত টেক্স বসান যাইতে পারে কি-না আর এদেশের ধনী ব্যক্তিরা দেশের গুরুতর প্রয়োজন বুঝিয়া এ সম্বন্ধে অর্থদান করিবেন কিনা তাহাও তীব্র অনুসন্ধানে জানা উচিত। যাহা হউক প্রাইমারি শিক্ষার নূতন ব্যবস্থার জন্য শীঘ্রই সরকারি আইনের খসড়া বা বিল উপস্থাপিত হইবে। তখন কেবল এটা মানি না—সেটা মানি না বলিয়া ওজর না তুলিয়া যাহাতে দেশের নির্ব্বাচিত সভ্যেরা সকল বিবরণ অবগত হন ও ধীরতার সহিত সকল বিষয় আলোচনা করিতে পারেন তাহার জন্য শ্রমসাধ্য উদ্যোগ হওয়া উচিত।

ভ্রম-সংশোধন

আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত ত্রিবর্ণ চিত্র "ওমার খৈয়াম" মিঃ এ. ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

Editor: Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road, Cal.